









# ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়



( ১৩২৫ কার্তিক হইতে চৈত্র )

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ ] ভারতী কার্যালয়, [ বার্ষিক মূল্য ৩০০ ]

২২, হুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩২৫ সালের

# ভারতীর বর্ণনাত্মক সূচী

( কার্তিক—চৈত্র )

বিষয়	লেখক	
অলঙ্কার-শাস্ত্র ও কাব্যের ধারণা	শ্রীশ্রীশীলকুমার দে এম-এ, পি, আই, এম,	
আধুনিক ভারতের অশিক্ষিত বাণিজ্য		
আর্থিক ব্যবস্থা ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৬৮
উন্মাদক ( গল্প ) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৫৬৭
উন্মেষণা ( গল্প ) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৮২৫
এলো শীত ঘিরে কুমার ( কবিতা )	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	৬০২
কলকী ( গল্প ) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৬১১
কবির তিরোধান ( কবিতা ) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৭৪৭
কিকরী ( গল্প ) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল ...	৫২৭
কে ? ( গল্প ) ...	শ্রীকল্যাণী দেবী ...	৭০৫
গগন ( কবিতা ) ...	শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৮২২
চোখ ভরে দেখি আর ( কবিতা )	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	৫৯৩
চোখের দেখা ( কবিতা ) ...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ ...	৬৯৭
জলের-আলনা ( উপন্যাস ) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ৫৪৬, ৬৫০, ৬৮৩, ৮১৭	
ঝরা পাতার গান ( কবিতা ) ...	শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ...	২০৬
টুকনি ( গল্প ) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৮৫২
ডাঁক-পয়ন ( গল্প ) ...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ...	৮৯৬
দুর্ঘটনা ( গল্প ) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৮৭৭
নাদিরশাহের আগরণ ( কবিতা )	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ ...	৭৭৪
নাদিরশাহের শেষ ( কবিতা )	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ ...	৮৬০
নেপালের কথা ( সচিত্র ) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল ...	৬৬০
পাণ্ডেল বিল ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	৮৪১
পাতিল-প্রমাদ বা প্রসঙ্গ-প্রতিবাদ	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ...	৮৪৮
প্রতিভার লক্ষণ ...	শ্রীপ্রমোদকর আতর্ষী ...	৬২৬
প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এল ...	২৫১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বরণ ( কবিতা )	শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনী দেবী বি-এ	১০০০
সমস্ত সঙ্গীত ( গান )	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৯২৩
বর্ণ-বিশ্লেষণ ও রাগ-বিশ্লেষণ	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য এম-এ	৬৬১
বন্দেমাতরম্ ( গল্প )	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৫৮১
বংশাঙ্কন ও পারিপার্শ্বিক	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	৬২৮
বাংলাব ব্রত	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৫৬, ৬০২, ৭১২, ৭৭৭, ৮৮২	
বাল্যায়ী পণ্টনের যুদ্ধযাত্রা সঙ্গীত	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৭০৭
বাইস্পাত স্মৃতি	শ্রীঅক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	৭৬৭
বৃক্কের ধন ( কবিতা )	শ্রীকালিদাস বার বি-এ	৫৮১
বিদায়ের পর ( কবিতা )	শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনী দেবী বি-এ	৫৯১
ভারতের গ্রাম	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৪৪
ভাষ্যের বিভিন্ন প্রদেশের ভূ-প্রকৃতি ও চাষাবাস	ঐ	৭৩৮
ভারতের নগর	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮০৮
ভারতের দারিদ্র্যের কারণ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৫৮
মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধ শিল্প-কলা	শ্রীকালিদাস মিত্র এম-এ, বি-এল	৯২৭
মনের কুয়াসা ( গল্প )	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৯৩৮
"মাতৃগুপ্ত"	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৫৫
মাসকাবারি—	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী বি-এ	
আধুনিক সাহিত্য কি অবনতিশীল ?	...	৫৪
বাংলার মাসিকপত্র	...	৭৬৩
ভারতের স্থান	...	৬৭৮
যুদ্ধ শৈল্য	...	৬৭৭
মাল্যদান ( গল্প )	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৭২৮
ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৬৩৩
রাজা রামমোহনের স্বরূপ	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী বি-এ	৬৪৬
রেখা লেখা ( সচিত্র )	ঐ :—	৫৬২
শরৎ-স্মরণী ( গান )	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৫১৯
শিক্ষা ও সাধনা	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	৭২৪
সত্যতা বনাম বর্জিততা	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	৫৪১
সমসাময়িক ভারতের বৈষয়িক সভ্যতা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭৫
সমালোচনা	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৯৮, ৬৮০, ৮৩৭, ৯২০, ১০০০	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শ্রুতময় ( কবিতা ) ...	শ্রীনিবাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	৯৯৯
সোনার কাঠি ( গল্প ) ...	শ্রীসৌরভমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৭০৭
স্বর্ণ-মৃগ ( কবিতা ) ...	শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৩৬
স্বরলিপি ...	শ্রীত্রেজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ৫২২, ৬৭৪, ৭০৮, ৮২২, ৮৮৯, ৯২৩	
স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী ...	...	৮৩৫
স্বপ্ন	শ্রীশ্রীদাসকুমার চৌধুরী ... ১০২, ১১০	
স্বরণে ( কবিতা ) ...	শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৯৮৯
স্রাবাইন-রমণী ( নাটিকা ) ...	শ্রীশ্রীশ্রী চট্টোপাধ্যায় ... ৭১৫, ১০৭	
হিন্দুদিগের মন্তকাবরণে পুঁজিত	শ্রীশ্রীশ্রী চক্রবর্তী রমণী ...	৬১৪

## চিত্রসূচী

চন্দ্রমুখী ( বহুবর্ণ )	করাসী শিল্পী বুশে'র নক্সা ...	৫৬৮
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত	৬৮১	শ্রীমসেন থাপা ... ৫৬৯
জলকে ( বহুবর্ণ )	৭৬৫	মা—শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত ৯২১
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত	৬৭২	মাইকেল এঞ্জিলের নক্সা ... ৫৬৫
জলবাহিনী ...	৬৭২	রোদার নক্সা ... ৫৬৬
ভীষণাঙ্গী	৭৫৫	শাপসম্প্রদ অনল্যা ( বহুবর্ণ )
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত	৬৭১	শ্রীযুক্ত নারায়ণ প্রসাদ অঙ্কিত ৮৩৯
নেপালের বর্তমান রাজমন্ত্রী ...	৬৬৭	সচকিতা
পাহাড় ...	৬৬৭	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ৫২৯
পৃথ্বীনারায়ণ ...	৬৬৭	স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী ... ৮৩৬
প্রাচীন জাপানী ছবির রেখা ...	৬৬৭	হব-পার্কিতা ( বহুবর্ণ )
ঐ ...	৬৬৪	প্রাচীন চিত্র হইতে ১ ... ৫১৭





৮৮  
১৯৫৫



275

# ভারতী

৪২শ বর্ষ ]

কাৰ্ত্তিক, ১৩২৫

[ ৭ম সংখ্যা

## শরৎ-স্মরণী

( গান )

হাতে মুখ আড়াল ক'রে

কে যায় পথের বাক দিয়ে !

আঁখি এর কার পানে যায়

আঙুল গুলির ফাঁক দিয়ে !

সখীরা জান্লে না কেউ

হৃদয়ে উঠল কি ঢেউ !

হাসি ওর খুসী ভরা

যায় নিকষে আঁক দিয়ে !

গোপনের ওই হাসি ওর দেখে কি সাঁঝের রবি

পুলকের পাঞ্জাখানির আকাশে আঁকায় ছবি !

হেরে তাই চ'ল কিও

সরমে রমণীয় !

ম'ল সব মাতাল আঁখি

ভোমরা হেন পাক দিয়ে !

আলোতে কিনিক কোটে রূপসীর চলন লীলায় !

হু'টি টোঁট না যায় আঁখা, আঁখা ঠিক যায় না হাসি, ভুবনে ঝড় যে ওঠে হাসি ওর যেমনি মিলায় !

বাঁকা চোখ মিটিয়ে চেয়ে ফোঁটালে শিউলি রাশি !

ওকি গো থাম্বেয়ালি

হাসে কি থাম্কা খালি !

কাঁখে ওর কলসী অধির

যেমেছে ছলটি মোতির

নেমেছে কৌকড়ানো চুল

চাঁদ কপালে থাক দিয়ে ।

আঁখি ওর চায় না শুধুই

যায় নীরবে ডাক দিয়ে !

ঐসত্যোজ্ঞনাথ দত্ত ।



# কিঙ্করী

( গল্প )

কিঙ্করী সাধন বৈষ্ণবের মেয়ে। তাহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন বাপের মৃত্যু হয়। ধানগায়ে বাপের একখানি ছোট দোকান ছিল; বাপ সাধনের মৃত্যুর পর কিঙ্করার মা রাধা বৈষ্ণবা স্বামীর দোকান খুলিতে না খুলিতে পাওনাদারের দল আদালতের পেয়াদা-সমেত আসিয়া সব জিনিস-পত্র বাহির করিয়া দোকান-ঘর সংকরিয় ফেলিল। পাঁচ বৎসরের মেয়ে কিঙ্করীকে লইয়া রাধা বৈষ্ণবা দারুণ দুর্ভাবনায় পড়িল।

কি করিবে কিছুই সে যখন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না, তখন ও-পাড়ার ষড় গোঁসাই আসিয়া বলিলেন, “দিগম্বরের মেয়ে-যাত্রার দলে মেয়েটিকে দে,—সখী সাজিয়া এইবেলা হইতে\* কিছু-কিছু সে রোজগার করুক!” ইচ্ছা থাকিলে গোঁসাইয়ের গৃহে রাধা বাসন-কোসন মাজিয়া দুইবেলা দুইমুঠা ভাত অনায়াসে খাইতে পারে, সে বিষয়ে গোঁসাইজীর কোন আপত্তি নাই, কারণ তিনি বাঁচিয়া থাকিতে—দেশের মেয়ে না থাইয়া মরিবে, ইহা ত আর তিনি চোখে দেখিতে পারেন না! একথাটাও সেই সঙ্গে তিনি বলিয়া ফেলিলেন।

রাধা অকূলে কূল পাইল। মেয়েটি ছিল দেখিতে সুশ্রী; দিগম্বর একেবারে তাহাকে মাসিক পাচ-সিকা মাহিনায় যাত্রার-দলে ভক্তি করিয়া লইল। পায়ে ঘুঙুর আঁটিয়া

মেয়ে রাখাল-বাগল সাজিয়া নাচিতে নাচিতে আধ-আধ ভাষায় কখনো গাহিত, “আম্ন রে কানাই, আম্ন গোঠে যাই, বাজায়ে নোহন বেণু—”, কখনো-বা মাথায় রঙিন ঝাকড়ার ফুলের মুকুট পরিয়া বিশাখা সাজিয়া গাহিত, “ও রাঙ, ছেড়োনা ছেড়োনা এ মান—” তখন সে-গান শুনিয়া আনন্দে-গর্জে মার চোখে জল আসিত।

এমান করিয়া পাঁচ-সাত বৎসর বেশ কাটিয়া গেল। তারপর নানা দিক দিয়া বিস্তর পরিবর্তন ঘটিল। কিঙ্করী এখন পাঁচ-সিকার জায়গায় সাত টাকা মাহিনা ও বিদেশে গেলে অতিরিক্ত আরও-কিছু পায়, এবং স্বখীর দল ছাড়িয়া সে এখন নায়িকার গ্রেডে প্রমোশন পাইয়াছে। বছর-খানেক পূর্বে মেয়েকে মানভঞ্জন পালায় শ্রীরাধা সাজিতে দেখিয়া রাধা প্রসন্নচিত্তে ইহলোকের দেনা-পাওনা চুকাইয়া চলিয়া গিয়াছে। দিগম্বরের দলে কেনারাম এখন মালিক। কেনারাম পূর্বে দিগম্বরের দলে পালা বাঁধিত, সেজন্ত দলে তাহার খাতির ছিল খুবই। সুতরাং দিগম্বরের মৃত্যুর পর ছত্র-ভঙ্গ দলটাকে হাত করিয়া বাঁধিয়া লইতে তাহার একটুও অসুবিধা হইল না। কেনারাম গুণের কদর বুঝিত। কিঙ্করী গাহিত ভাল, তার উপর চেহারায় চটক ছিল, তাই সে আড়াই টাকার জায়গায় কিঙ্করীর একেবারে সাত টাকা মাহিনা করিয়া দিয়াছে।

এই গুণের উপর আরো-একটা কারণ ছিল। কেনারামের তিন কুলে আপনার বলিতে কত ছিল না; সংসারে শুধু একটিনাত্র আকর্ষণ ছিল, সে এই গান-বাজনার নেশা,—এই গান-বাজনার নেশাই তাহাকে দেশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; নাহলে সে যে এতদিনে কোথায় থাকিত, কি করিত, কেহ তাহা বলিতে পারে না। ছেলেবেলায় গ্রামে স্কুলে যাইবার পথে সে এক চাক-আখড়াইয়ের দলে ছুটিয়া পড়ে, সেখানে তামাক সাজিয়া ফরমাস খাটিয়া সে সকলের মন পাইয়াছিল; তারপর হঠাৎ একমাত্র অভিভাবক মাতুলের মৃত্যু হইলে লেখাপড়ায় ইন্সফা দিয়া দস্তরমত সে আসরে নামিয়া পড়িল;—কবির দলেই তাহার যাত্রার পালা বাঁধার হাতেখড়ি হয়, এবং সহসা একদিন “রাবণ-বধের” পালা লইয়া দিগম্বরের দলে আসিয়া সে যোগ দিল।

দলে আসিয়া কিঙ্করীর উপর প্রথমতঃ তাহার নজর পড়িল। চমৎকার মেয়েটি! দেখিতে যেমন সুশ্রী, নাচিতে-গাহিতেও তেমনি মজবুত! এই কিঙ্করীকে একটু-আধটু লেখাপড়া শিখাইতে পারিলে যাত্রার পশার যেমন বাড়িবে, তাহার পালাগুলোও তেমনি উত্তরাইয়া যাইবে। অমনি সে কাজে সে লাগিয়া গেল। কিঙ্করীরও এদিকে একটা আশ্চর্য্য টান ছিল—অত্যন্ত সহজেই সে এই সুযোগটুকুকে আয়ত্ত এবং সফল করিয়া তুলিল। কিঙ্করীর চেহারা, হারভাবের লীলায় আর অভিনয়-কৌশলে দেশময় যাত্রার দলের সুখ্যাতি পড়িয়া গেল।

মাঝের-পাড়ায় জমিদার-বাড়ীতে যাত্রা করিতে গিয়া কিঙ্করী দৈবাৎ কলিকাতার এক থিয়েটার-ওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একে থিয়েটার-ওয়ালার, তাম্র কলিকাতার লোক, সে বুঝিল, কিঙ্করীকে কলিকাতার থিয়েটারে লইয়া যাইতে পারিলে শ্রুতায় অনেকখানি লাভের সম্ভাবনা! গোপনে কিঙ্করীর সাহিত কথাবাত্তা কহিয়া এ বিষয়ে বন্দোবস্তও সে পাকা করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু যাইবার দিন কেনারামকে না বলিয়া চলিয়া যাইতে কিছুতেই কিঙ্করীর মন সাবল না। ব্যাপার বুঝিয়া কেনারাম চিন্তিত হইল, স্থিরদৃষ্টিতে কিঙ্করীর মুখের পানে চাহিল। চাহতেই আর-একটা জিনিষ কেনারামের চোখে পড়িল। কিঙ্করীর সারা অবয়বে এক অপূর্ণ তাকণোর ছটা দেখা দিয়াছিল। আজ কিঙ্করীকে সে দেখিল, সম্পূর্ণ নূতন চোখে, নূতন মুক্তিতে! দেখিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। কিঙ্করীও কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু মুখ নীচু করিয়া দাড়াইয়া রহিল। নিজের পালায় যশের কথাও সেহ দৃষ্টে কেনারামের মনে পড়িল; কেনারাম তখন পাকা চাল চালিল। সে কিঙ্করীকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। থিয়েটার-ওয়ালাকে অত্যন্ত নিরাশ-চিত্তে কলিকাতায় ফিরিতে হইল।

কিঙ্করীর বয়স তখন পনেরো বৎসর। সুমধুর লাগিয়া কিঙ্করীর দেহে তখন অপূর্ণ ভরস্ব তুলিয়া নাচিয়া খেলা সুরু করিয়াছে।

২

তারপর হঠাৎ একদিন যাত্রার দুদিন আসিল। কলিকাতার স্কল-কলেজ-ফেরত

ছোকরার দল পাড়ার-পাড়ার সখের খিয়েটার খুলিয়া যাত্রার সর্বনাশ সাধিল। ছেঁড়া জাকড়ায় রঙ মাখাইয়া বাঁশের মাচায় চড়িয়া চরেক রকমের চৌৎকার করিয়া সারা গ্রামে তাহার্য্য এমন চমক লাগাইয়া দিল যে কেনারামের বাবসা তাহাতে একেবারে মাটি হইতে বসিল। যাত্রায় খরচ ও বায়নালা বিস্তর, তাহার উপর ঐ ছুড়িদের গানে নব্য পল্লীর কান ঝালাপালা, এবং ঐ যে আসরে বসিয়া যশোদা বৃন্দা প্রভৃতির নিলজ্জ ধূমপান—এ সমস্ত ব্যাপার দর্শকের চোখে খিয়েটারের নেপথ্য-যবনিকার ফাঁক দিয়া অত্যন্ত বীভৎস কদর্যা ঠেকিতে সুরু করিয়াছিল, কাজেই সখের খিয়েটারগুলি পদ্ম খাটাইয়া আমোদ জোগাইয়া অতি-সহজেই সকলের চিত্ত অধিকার করিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দাওয়ার বসিয়া চালের খুঁটিতে শিঠ-ঠেস্ দিয়া কিকরী অনেক কথা ভাবিতেছিল

আকাশের পূর্ব দিকে একটু-একটু করিয়া মেঘ জমিতেছিল, বাতাসে ভিজা মাটির একটা মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। কিকরী স্বামীর আশায় পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। কেনারাম গিয়াছিল ও-পাড়ায়, তাহারই কথায় বিধু গাঙ্গুলির বাড়ী দুর্গোৎসবে বায়না ঠিক করিতে।

বিধু গাঙ্গুলি দিগব্বরের আমলের যাত্রার পৃষ্ঠপোষক, দেশের একজন প্রবীণ সৌখীন ব্যক্তি। দুর্গোৎসবে পূজার কয়টা দিন এ-ঘলের সাধর-নিমন্ত্রণ সে-বাড়ীতে বাধা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এবারে মহালয়ার পর-

দিনও যখন বুড়া সরকার মহাশয় আসিয়া পালা ঠিক করিয়া দিয়া গেল না, তখন কেনারামের কেমন ভাবনা হইল, বুকটাও ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এখনকার অন্নও বুঝি-বা মারা গেল!

আখড়ায় সকালে কমলে-কামিনী পালার মহলা চলিয়াছিল;—স্বামী কিকরী সাজিয়া গাহিতেছিল—

“ঘাটেতে সাজানো শত তরী,  
যেতে দাও মাগো তরা করি—  
আঁখি-জল মুছি হাসিমুখে বল,  
এসো রে আমার বাছনি রে—”

এমন সময় কেনারাম আসিয়া বলিল, “গান পামা কিকরী—বিধু গাঙ্গুলির লোকের আঙ্গো দেখা নেই, কার জন্তে আর এ-সব করছি?”

তখন দলে চকিতে কেমন বিমর্ষতার ছায়া পড়িল, বিপুল উৎসাহ দারুণ অবহেলার ষা খাইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। আখড়ায় লোক হদ্যনো পূর্বোক্তার মত নিতাই আসে, গান হয়, গল্পও চলে, কিন্তু কোনটাই তেমন জমে না। আজ কেনারামের কথায় সকলেরই মুখ শুকাইয়া হুঃখে বুক ভরিয়া উঠিল। দেখিয়া কিকরীই তাই স্বামীকে বলিয়া কহিয়া ওপূর্ববেলায় গাঙ্গুলি-বাড়ীতে বায়নার সন্ধানে পাঠাইয়াছিল, এবং এই সন্ধ্যার সময় স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া সে পুরানো সেই দিনের নানান কথা ভাবিতেছিল। দিনের শেষ আলোটুকু যখন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে, তখন বাহিরে কেনারামের গলা শুনা গেল—“আখড়া ভুলেদে রে বিত্ত, দেশে আর থাকা হল না।”

কিঙ্করী উঠিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাড়াইল, বলিল, “কি হলো?”

“কি আর হবে! বাবুর ছেলে, ইয়ান কলকতায় পড়েন, সেই চোখে চসমা-আঁটা, তিনি বলেছেন, যাত্রা-ফাত্রা হবে না আব! শুধু কতকগুলো মুখ্য গুলিখোরের বিকট চাঁৎকার, প্রাণ জলে যায়, তার চেয়ে থিয়েটার হোক। তারা না কি, কি ঐ “মহম্মদ খলিজী” আর “বেদম প্রহারের” পালা দেখাবে। কেনারামের চোখ ছিলছিল করিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী বলিল, “তাহলে আর উপায় কি!”

কেনারাম আগাইয়া আসিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল, বলিল, “বাবুর আমাদের দয়ার শরীর। আজকালের ছেলে, তার কথা একেবারে ত আর ওড়াতে পারেন না, অথচ আমাদেরই বা ফেলেন কি বলে?—তাই তিনি বললেন, বেশ, তিন দিন ৩—তার দুদিন ছেলেদের দল থিয়েটার দেখাক্ আর বাকী দিনটায় যাত্রা হোক! যাত্রা আমি একবারে বন্ধ করতে পারি না। যে ক’দিন আমি বেঁচে আছি, সে ক’দিন অন্ততঃ ৩ নয়। তাই ঐ শেষের দিনের জন্ত আমার বললেন, তোমার কমলে-কামিনার পালা দেখিয়ে দাও হে কেনারাম।”

কিঙ্করী বলিল, “ভগবান তাহলে একে-বারে বিক্রপ হননি। যাক্, তাহলে ভালো করে আখড়া বসাও—”

“আর কিসের আখড়া কিঙ্করী! বছরে একদিন একটা বাড়ীতে পালা দেখাবার জন্যে এত মাথা ঘামানোর লাভ কি? এত খরচ-পত্র—”

“তা ঠিক—” কিঙ্করীর মুখে আর কথা ফুটিল না। নবমীর দিন পালা দেখানো হইবে ভাবিয়া একটুখানি আনন্দ তাহার বুক-ভরা বিপুল আধারের মধ্যে প্রদাপের আলোর মত যে ক্ষণ রশ্মিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীও এই শেষ-কথার ফুৎকারে সে আলোটুকুও নিবিয়া গেল। অহা, স্বামী কত যত্নে এই নূতন পালাটি বাঁধিয়াছে—এত টানাটানির মধ্যেও ঘরের জিনিষ বেচিয়া পরমা কুটাইয়া কতখানি আশায় আখড়া বসাইয়াছে। থিয়েটারের দলগুলোকে গানে, অভিনয়ের ভঙ্গীতে হারাইয়া দিবে বলিয়া স্বামী বড় দমে বুক বাঁধিয়াছে যে,—সে ও কত করিয়া বিচিত্র নূতন সুরে আমন্ত্রণের গানগুলিতে প্রাণ জোগাইয়াছে—অত সাধে, অত আশায়, এমন করিয়াই কি নিদ্রার আঘাত দিতে হয়, ভগবান?

যাত্রার দলে কিঙ্করা মালুম হইয়াছে, এত যাত্রার দল একদিন তাহার শিশু-চিন্তে অপূর্ণ নোহের সন্ধার কল্পিয়াছিল, আর আজ বিচিত্র-রঙ্গে তাহার তরুণ-যৌবনটিকে ফেনিলোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে! গানের ছন্দের দাপ্ত মায়্যা-লোকে বাসিয়া কতদিন যে সে আপনাকে অসামান্য মনে করিয়া গল্পে সাড়া হইয়া উঠিয়াছে! আবার এই যাত্রার দলের অীরাদ্য প্রেম-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া তাহার কিশোর হৃদয়ে প্রেমের সাড়া মিলিয়াছে! কত সাধ, কত আশা, কত ক্ষোভ, কত তৃপ্তি বিচিত্র লীলায় চেউ তুলিয়া গিয়াছে! এই যাত্রার দল তাকে প্রাণ দিয়াছে, তাহার মনের খোরাক জোগাইয়াছে! সে-ও এই দলের জন্ত কি না করিয়াছে

ছোটখাট সমস্ত ক্রটির দিকে সর্বক্ষণ কি  
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে রাখিয়া আসিয়াছে! এ দলে  
এই যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, অদ্ভুত পারিপাট্য  
বিরাজ করিতেছে, এ শুধু তাহারই গুণে!  
যাত্রার দলের দ্রুত খাটিয়া কখনও তাহার  
শ্রাস্তি হয় নাই—বিদেশে দলের সামগ্র্য  
একজনের অসুখ হইলেও স্বামী যখন ভাবিয়া  
কুল পায় নাই, কিঙ্করী তখন অপরূপ সহজ  
ভঙ্গীতে সেই রোগীর সেবার ভার নিজের হাতে  
তুলিয়া লইয়াছে। দলের কাহারো টাকা-  
কড়ির প্রয়োজন হইলে গোপনে আসিয়া  
যখনই তাহার কিঙ্করীর কাছে হাত পাতিয়াছে,  
তখনই কিঙ্করী টাকা দিয়াছে, কখনও একটা  
সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই! কেহ  
সে টাকা শোধ না দিলে কিঙ্করী কোনদিন  
অনুযোগ করে নাই বা স্বামীর কাছে  
নালিশের সুরে ইঙ্গিতেও সে কথা উত্থাপন  
করে নাই! তাই আজ দলের লোক  
পরস্পর না পাইলেও নিত্য এখনও আত্মভর্য  
আসিয়া যোগ দেয়, ভবিষ্যতের রঙিন চিত্র  
আঁকিয়া কিঙ্করীর নিরাশ চিত্তে আশার সঞ্চার  
করিয়া তোলে! আজ নিজের প্রয়োজনে  
টাকার টান দেখিয়া কিঙ্করী একান্তে বসিয়া  
শুধু চোখ মুছিত, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া  
হুঃখ জানায় নাই।

৩

নানা হুঁতাবনায় কেনারামের শরীর-  
মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; ভাদ্রমাস পড়িতেই  
রাত্রিে অন্ন অন্ন জর দেখা দিল, এবং সঙ্গে  
সঙ্গে কাশি। দেখিয়া কিঙ্করীর সর্বশরীর  
শিহরিয়া উঠিল। একনিমেষে তাহার মুখ  
শাদা হইয়া গেল।

আর এখন দল! কিসের জন্ত কাহার  
জন্ত বা দল! কেনারামের বলিয়াই না  
যাত্রার দলের উপর তাহার এতখানি টান  
ছিল! দল ভাঙ্গিয়া দিয়া গায়ের গহনা বেচিয়া  
স্বামীর চিকিৎসার জন্ত সে স্বামীকে লইয়া  
কলিকাতায় আসিল; সঙ্গে আসিল শুধু বিত্ত।

কাহিনীর শেষে জরটা একটু ছাড়িতে  
ডাক্তার বলিল, এইবেলা! হাওয়া বদলাইতে  
পারো ত সারিবার সম্ভাবনা আছে, না  
হইলে—

কথাটা ছুরির ফলার মত কিঙ্করীর মস্ত  
বিঁধিল। কেনারামের কঙ্কাল-সার দেহের  
পানে চাহিয়া তাহার অন্তর একেবারে  
ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘর-বাড়ী সব  
বেচিয়া স্বামীকে সে পশ্চিমের একটা জায়গায়  
হাওয়া বদলাইতে পাঠাইল। নিজে সঙ্গে  
গেল না, যাওয়া চলে না—সে গেলে বিদেশে  
স্বামীর খরচ যোগান হয় কি করিয়া?  
তাই সে কলিকাতায় থাকিয়া গেল। বিত্ত  
চালক ছোঁকরা—রোগ তত্ত্বিরের ফাঁকে  
ফাঁকে কোথায় সে একটা কাজ বাগাইয়া  
লইয়াছিল; এখন বিত্তই কিঙ্করীকে এক  
অফিসের বাবুদের মেশে একটা বয়্যের চাকরি  
জুটাইয়া দিল। তাহার মহা-হুঁতাবনা দূর  
হইল।

সারাদিন কাজ-কর্মের মধ্যে সময়  
একরূপ কাটিয়া যাইত, কিন্তু বিপদ ঘটত  
রাত্রিবেলায়। চারিধার যখন নিশ্চল আঁধারে  
চাকিয়া আসিত, তখন সেই আঁধারের অতল  
গহ্বর হইতে দূষিত বাত্মের মত রাশি রাশি  
হুঁশ্চিন্তা আসিয়া কিঙ্করীকে ছাইয়া একেবারে  
অজ্ঞারিত করিয়া ফেলত। মাথার শিররের

জানালা খুলিয়া দিয়া সে একটা মাছবে  
গা গড়াইয়া শুইয়া পড়িত। কলিকাতার  
রাজপথে অত রাত্রিতে চলন্ত মানুষের জুতার  
ভারী শব্দ,—অদূরে তেলের কলের এক-  
ষেয়ে বর্ষরধ্বনি—গাড়ী-বোড়া-মোটর-মা-এল-  
পুলিশের বিচিত্র কলরব বিচিত্র সুরে চাৰিধার  
মুখারত করিয়া চলিয়াছে—কছুই তাহার  
মনে একটা আঁচড় টানিতে পারিত না। সে  
জানালায় ফাঁক দিয়া আকাশের পানে  
চাহিয়াই পড়িয়া থাকিত। থানার ঘড়িতে  
বারোটা, একটা, দুইটা, তিনটা বাজিয়া  
যাইত, তবুও চোখে ঘুম আসিত না! অতীতের  
সহস্র স্মৃতি অল্পশ পর সন্ধান করিয়া তাহাকে  
কাতর ব্যাধিত করিয়া তুলিত। তারে,  
বেচারি স্বামী কোথায় কতদূরে কোন্ বিদেশে  
সেই ক্রম পরীর লইয়া পড়িয়া আছে!  
দেখিবার কেহ নাই, কথা কহিয়া দুইদণ্ড  
সাম্বনা কি আশ্বাস দিতেও কেহ নাই!  
পিপাসায় না জানি শুইয়া পড়িয়া কত ছটফট  
করিতে হয়, মুখে জলটুকুও হয়ত পড়ে না—  
আহার জোটে কি না, তাই বা কে জানে!  
ভাবিয়া সে আর কোন কুল পাইত না! হুখে  
ঢোপে হু-হু করিয়া জল ঝরিত, বেদনায়  
বুকের পাঞ্জরাগুলি টুন্ টুন্ করিয়া উঠিত।  
নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিত, কাহার শাপে  
তাহাদের অমন সোনার নীড় আজ এমন  
ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল!

এমনি হুঁতাবনার মধ্যে একদিন চূড়ান্ত  
ঘটনাটাও ঘটয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যার পর  
বন্ধে বিস্তর পোষ্ট অফিসের ছাপ পরিয়া এক  
চিঠি আসিয়া হাজির, খামের উপরে নানান  
বেশের অসংখ্য অস্পষ্ট ছাপ, খামের মধ্যে

চিঠিতে আঁকাবাকা অক্ষরে লেখা আছে,  
“কাল রাত্রে মুখে রক্ত উঠিয়া কেনারাম বাবু  
হঠাৎ মারা গিয়াছেন।”

সব ফুরাইয়াছে! চিরদিনের সহচর, বন্ধু  
সহসা স্বপ্নের মত কোথায় কোন্ ছায়ায়  
মল্লো চকিতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! বাহিরের  
আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার গায়ে কে যেন  
কালি ঢালিয়া দিল! “মাগো—” বলিয়া  
চীৎকার করিয়া কিষ্করী ধূলায় মুচ্ছিত হইয়া  
পড়িল।

৪

তিনমাস পরে হঠাৎ একদিন গঙ্গার ধারে  
বিস্তর সঙ্গে কিষ্করীর দেখা। কেনারামের  
মৃত্যুর পর কিষ্করী মেশের চাকরি ছাড়িয়া  
দিয়াছিল—দিক্‌বিদিকের জ্ঞান হারাষ্টয়া  
গঙ্গার ধারের ঠাকুর-বাড়ীতে যে সে কি  
করিয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, সে সব  
কথা কিষ্করীরও স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে  
পড়ে না।

বিস্ত বলিল, “জন্ম-মৃত্যু বিধাতার লিখন,  
কিষ্করী। এ রকম ভেবে-কেঁদে আর কি  
করবে, বল? তোমার চেহারা যা হয়েছে  
দেখচি, তাতে হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না  
মোটে! আমার প্রথমটা চিনতে কষ্ট  
হিচ্ছিল! যাক্, জানো ত বিপদে ধৈর্য ধরতে  
হয়। তুমি ত বোঝো সব, তোমায় আর  
কি বোঝাব, বল?”

বিস্তর পানে চাহিয়া কিষ্করী একটা  
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, কোন কথা বলিল না।  
বিস্তকে দেখিয়া অতীতের সব কথা আবার  
নূতন করিয়া তাহার মনে পড়িল। সেই  
গান-বাজনার বিপুল সমারোহ, আনন্দ-

কোতূকের বিরাট মেলা! সে কি খটা! আর আজ?

বিশ্ব বলিল, “কিস্তির কথা যখন ভাবি, তখন আর জ্ঞান থাকে না—আহা, বেচোরে প্রাণটা দিলে বেচারা! তোমার সঙ্গেও বোধ হয় শেষটা আর দেখা হয়নি! আহা!”

কিস্তরী মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখের কোণে জল উপ্ছাইয়া আসিল।

বিশ্ব আবার ডাকিল, “কিস্তরী—” বিশ্বর গলার স্বর ঈষৎ ভারী। কিস্তরী মুখ তুলিয়া বিশ্বর পানে চাহিল, দেখিল, বিশ্বর চোখে জল।

কিস্তরী আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না—তাহার চোখে বস্তা নামিল।

বিশ্ব বলিল, “এখানে পড়ে থাকে না, কিস্তরী—এসো, আমার সঙ্গে এসো—। বিধাতার কৃপায় আমার অবস্থা একটু যাহোক ফিরেছে এখন। নিজে ছোট-খাট একটা খাবারের দোকান করেছি—মন্দ চলছে না। তুমি পুরোনো বন্ধু—আমি থাকতে তুমি পথে দাঁড়াবে, এ হতেই পারে না!”

বিশ্বর খাবারের দোকান বেশ চলিতে-ছিল। এই দোকানটিকে আশ্রয় করিয়া তাহার অবস্থাও ফিরিয়া গিয়াছিল। তবে দোকানে সে একা। স্ত্রী বেচারী দেশে ছিল, অবস্থা ফিরাইয়া স্ত্রীটিকে সে কলিকাতায় আনিয়াছিল, কিন্তু বেচারীর অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য সহিল না। সে আজ ছয়-সাত মাসের কথা, জীবন মৃত্যু হইয়াছে! সংসারে আবার সে একা। দোকানে পরসার মুখ দেখিয়া

ও পাচটা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়াই সে স্ত্রীর শোক তুলিয়াছিল। তবে রাতে দোকান বন্ধ করিবার পর নিরালায় একলা যখন সে পড়িয়া থাকে, তখন সমস্ত জগৎ তার বিরাট শূন্যতা লইয়া বিশ্বর বুকের উপর চাপিয়া বসে! এই যে কাজ করা, গতর খাটানো, পরস-উপার্জন, এ কেন রে কেন? কাহার জন্য? কি হইবে এ টাকা উপার্জন করিয়া? বিশ্বর সমস্ত মন টলমল করিয়া উঠিত। তাহার মনে হইত, দোকান-পাঠ বেচিয়া দিয়া কোথাও সে চলিয়া যায়। কিস্ত রাত্রেই সে সঙ্কল্প দিনে কাজের ঝড়োটে চাপা পড়িত! সকালে দোকানের ঘর খুলিতে না খুলিতে একটি-দুইটি করিয়া লোক আসিয়া দেখা দিত,—কাভেই কথা এবং কাজের ভিড়ে রাত্রের বৈরাগ্যের সঙ্কল্প মন হইতে মুছিয়া যাইত।

এমনি করিয়াই বিশ্বর দিন কাটিতেছিল,—হঠাৎ এমন সময় গঙ্গার ধারে কিস্তরীর সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল।

কিস্তরী বিশ্বর কথায় রাজী হইয়া দোকানে আসিল। দোকান হাল-ভাঙ্গা নৌকার মত স্রোতের মুখে এতদিন নিজের ভাবেই ভাসিয়া চলিয়া ছিল—আজ কিস্তরী আসিয়া পাকা-হাতে নতুন করিয়া সেখানে হাল ধরিল।

সারাদিন কাজের, ভিড়ে দুই জনের কথা-বার্তা বড় হইত না। রাত্রের নিঃসন্তান দুই জনে বুকের মধ্য হইতে অতীত-স্মৃতির তন্নী বাহির করিয়া বসিত,—হাসি ও অশ্রুর রাশি সে! দুইজনে তখন নানা কথা হইত।

পল্লীর সেই বাত্রার আসর, মিথ্র শ্রামল  
সেই তরু-কুঞ্জ, অব্যাহত পথ-ঘাট, ছায়ায়  
ঘেরা সেই ছোট্ট নদীর তীর বায়োঙ্কোপের  
ছবির মতই কিঙ্করীর চোখের সামনে দিয়া  
অপরূপ বৈচিত্র্যে ভাসিয়া যাইত।

কাজের অন্ত ছিল না—তবু দুইজনেই  
বুঝিয়াছিল, কাহারও জন্তই বা কাজ করা!  
নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন জীবন-দুইটাকে  
বোঝার মত দুই জনে ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে!  
সীমা-হীন এক অনন্ত পারাবারে দুইজনে যেন  
গা ভাসাইয়া চলিয়াছে—কোনদিকে কুলের  
রেখাও দেখা যায় না! কি উদ্দেশ্যে, কিসের  
সন্ধানই বা মিছা এই-ভাবে ভাসিয়া  
বেড়ানো—! তার চেয়ে হাত-পা এলাটয়া  
এই অসীম অনন্ত পারাবারে ডুব দিলেই ত  
সব গোল মিটিয়া যায়।

কিন্তু ডোবা গেল না। তাই একদিন  
ভাসিতে ভাসিতে একটা কথা বিস্তর মনে  
হইল। আকাশে সেদিন বেশ জ্যোৎস্না  
দুটিয়াছিল—দোকানের পিছনে গোলা একটু  
জায়গা ছিল—সেইখানে একটা বেঞ্চে বসিয়া  
দেওয়ালে পিঠ ঠেঁশ দিয়া কিঙ্করী আপন-মনে  
ঐরাধার বিরহ-গাথা গাহিতেছিল,

“এমন জোছনা রাত, এমন মধুর বায়

তোমার বিরহ বঁধু, আর ত না সওয়া যায়—”

ঠিক রে ঠিক! সত্যই আর সহ্য হয় না!  
বিস্তর বুকের মধ্যে এক অসহ্য বেদনা ঠেলিয়া  
ফুলিয়া উঠিল। কিঙ্করী মৃদু স্বরে গান গাহিতে  
ছিল। বিস্তর পা টিপিয়া আসিয়া সেখানে  
দাঁড়াইল। কিঙ্করীর মুখে জ্যোৎস্না একেবারে  
লুটাইয়া পড়িয়াছিল— তাহার সে মূর্তি দেখিয়া  
আর তাহার কণ্ঠে ঐ গান শুনিয়া বিস্তর

মনে হইল, কিঙ্করীকে আশ্রয় করিয়া বিস্তরের  
বিরহ-বেদনা যেন আজ এই চাঁদের আলোর  
আপনাকে মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে!

গাঢ় স্বরে বিস্তর ডাকিল, “কিঙ্করী—”

কিঙ্করী চমকিয়া উঠিল।

• বিস্তর বলিল, “আবার তুমি সেই সব কথা  
ভাবছ!”

কিঙ্করীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল।  
সে বলিল, “না ভেবে পারি কৈ?”

বিস্তর কহিল, “ঠিক বলেছ। আমিও  
আর পারছি না! ভেবে লাভই বা কি বল,—  
শুধু মন খারাপ করা বই ত নয়। তাই  
আমি ভাবছিলাম, এ রকম করে ত আর  
টেকা যায় না, তাই বলছিলাম কি,  
জানো?”

কিঙ্করী বিস্তর পানে চাহিল,—চোখের  
দৃষ্টি তাহার পুতুলের চিত্র-করা দৃষ্টির মত।  
কিঙ্করী কহিল, “কি?” স্বরটা শুষ্ক রুদ্ধ  
মনে হইল। সে স্বর শুনিয়া বিস্তর কেমন  
ভড়কাইয়া গেল—তবুও সে জোর করিয়া  
কথা কহিল; বলিল, “আমার সঙ্গে যদি  
কণ্ঠী-বদল—”

কথাটা শেষ হইল না। কিঙ্করী ডাকিল,  
“বিস্তর—” এই ছোট ডাকটুকুতে আগুনের  
হল্কার মত এতখানি তীব্র ভৎসনা  
টিক্রিয়া পড়িল যে বিস্তর সমস্ত সাধ-আশা  
শুকাইয়া করিয়া পড়িল।

এ ঘটনার পর দোকানের কাজে কিন্তু  
কোন গোল দেখা গেল না। বিস্তর ভৃত্যের  
মত কাজ করিতে লাগিল, এবং কিঙ্করীরও  
তাহাকে ফাঁদ-ফরাস করিতে এতটুকু সঙ্কোচ



দেখা গেল না। অর্থাৎ দুইজনের মনে-মনে এতখানি সংঘর্ষ হইয়া গেলেও বাহিরের লোক তাহার এতটুকু আঁচ পাইল না। দুইজনে পূর্বের মতই কাজ করিতে লাগিল,— ঠিক যেন কলের পুতুল কলে কাজ করিতেছে।

ইহার একমাস পরে বিত্তকে হঠাৎ একটা বড় কাজের অর্ডার লইয়া মফঃব্বলে যাইতে হইল।

কিঙ্করী নিজের হাতে বিত্তর জিনিষ-পত্র গুছাইয়া দিল, বিদেশে সাবধানে থাকিতে সহস্রবার উপদেশ দিল। যাইবার সময় বিত্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আমার আবার ভাল থাকা—!”

“কেন?” অসলিধ্ব অচপল স্বরেই কিঙ্করী এ প্রশ্ন করিল। বিত্ত অত্যন্ত হতাশভাবে কিঙ্করীর পানে চাহিল; কিঙ্করী সে দৃষ্টি দেখিল। সে মুখ ফিরাইয়া লইল—তাহার চোখ সজল অর্ধ হইয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে একটা নিশ্বাস চাপিল। মুখে কোন কথা ফুটিল না।

বিত্ত চলিয়া গেলে কিঙ্করীর পক্ষে কিন্তু একলা দোকানে টেকা দায় হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, জীবনের ফাঁকগুলো কোথা দিয়া ভরিয়া আসিতেছিল, আবার সব শূন্য হইয়া গেছে। রাত্রে বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া চাপা গলায় সে ডাকিল, “বিত্ত—” কেহ সাড়া দিল না; কিন্তু কবেকার সেই জ্যোৎস্না-রাত্রির এক হতাশ-কাতর দৃষ্টি কিঙ্করীর মনে ফুটিয়া উঠিল— জগতে আজ যেন আর কিছু নাই, শুধু ঐ হতাশ-কাতর-দৃষ্টি!

দোকানে বিত্তর এক বন্ধু জুটিয়াছিল, বনমালী। বনমালী প্রায় তাহারই বয়সী; সে বিত্তর কথা কহিতে পারে, এক মার্চেন্ট অফিসের হেড-বিল-সরকার। তাহার দৌলতে অফিসে বিত্তর কয়েকটি বাঁধা খরিদদারও জুটিয়াছিল।

কিঙ্করীর অবস্থা দেখিয়া বনমালীর দুঃখ হইল। বিত্ত ও কিঙ্করীর মধ্যে সম্পর্কটা সঠিক না জানিলেও রসজ্ঞ সে নিজে হইতে একটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। কাজেই রাত্রের নির্জনে অবকাশে বনমালী প্রায়ই আসিয়া দেয়া দিত, যদি কথায় বার্তায় কিঙ্করীকে সে একটুখানিও সাস্থনা দিতে পারে! বনমালী বেশ ভাল বাঁশী বাজাইতে পারিত। সে দোকানে বসিয়া বাঁশী বাজাইত, অনেক সময় বাঁশীর সুরে সব ভুলিয়া কিঙ্করীও সে বাঁশীর সঙ্গে গান ধরিত। তা-ছাড়া বনমালীর প্রতি কিঙ্করীর একটু মায়্যা পড়িয়াছিল; মায়্যা পড়িবার কারণ ছিল।

বনমালীর বাড়ী আমতার ওদিকে; এখানে চাঁপাতলায় একটা মেসে সে থাকিত—দেশে ছিল জ্বী ও একটি ছেলে। জ্বীর সঙ্গে মোটেই বনিবনা ছিল না। জ্বীর চরিত্র-সম্বন্ধে দেশের লোকে কাণাবুঝাও একটু-আধটু করিত। সে রহস্যলাপ বনমালীর অশ্রুত ছিল না, এবং জ্বীর চিত্তও বনমালীর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিল না, কাজেই জ্বীকে বনমালী মোটেই দেখিতে পারিত না,—তবে ছেলেটির জন্ত তাহার থাকিয়া থাকিয়া মন কেমন করিত, তাই মাসে একটি দিনের জন্তও অন্ততঃ সে একবার দেশে গিয়া ছেলেটিকে

দেখিয়া আসিও। সে-সময় ছেলের জ্ঞান নানান জিনিষ সে কিনিয়া লইয়া যাইত, পুতুল, লজ্জুচুৰ, লাটু, টিনের বাশী—এই সব মাঝে মাঝে টাকাও পাঠাইত।

কিঙ্করী বনমালীর এ হুঃখের কাহিনী শুনিয়াছিল। শুনিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল। আহা, বেচারী বনমালী! ব্যাপারটা তাহার কেমন আশ্চর্য্য ঠেকিত। জীলোক ভাল না বাসিয়া কি করিয়া থাকে! জীলোক যে বড় হুঃখল, একটা অবলম্বন যে তাহার চাইই! তাহা সে বনমালীকে প্রায়ই বলিত, “বউটিকে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এস, ঠাকুরপো,—নিজের কাছে নিয়ে এসে তাদের রাখো—ছেলেটির মুখ চেয়ে বোকে সহ করে চল তাই, তার উপর কোন হুঃখবাহার করো না। ছেলেমাছুষ, কাছে থাকলে ও-সব বুজি তার সেরে যাবে’খন।”

বনমালী বলিত, “তুমিও যেমন বিস্তর বো! বনমালী কিঙ্করীকে বিস্তর বো বলিয়া ডাকিত—শুনিয়া কিঙ্করী মনে মনে হাসিত, কিন্তু কথায় বা ভঙ্গীতে কখনও আপত্তি কি বিরক্তি প্রকাশ করে নাই! আজ এ সম্বোধনটা প্রাণের মধ্যে কোথায় এক স্পৃহা তারে ঘা দিল। সমস্ত প্রাণটা অব্যক্ত যাতনায় ছটফট করিয়া উঠিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী বলিল, “কেন আনবে না, গুনি!”

বনমালী বলিল, “পাগল হয়েছ তুমি! এখানে একটা কেলেঙ্কারী হবে কি শেষে?”

কিঙ্করী বলিল, “কিসের কেলেঙ্কারী! আচ্ছা, আমার কাছে নিয়ে এসে তুমি রাখো দেখি। আমি কেমন না বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে ভাল করে দি, দেখ।” বনমালীর চোখ

ছলছল করিয়া আসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, “আচ্ছা, সে দেখা যাবে তখন—” বলিয়াই বাশীটা উঠাইয়া লইয়া বাকাইতে বাসিল। কিঙ্করী নির্গমেষ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বাশীর ককণ শ্রবণে তাহার চিন্তে দারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল। সে অপলক দ্বিধা দৃষ্টিতে বনমালীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার সে দৃষ্টি বনমালীর বাহিরটা ভেদ করিয়া সমস্ত অন্তরখানা দেখিয়া লইল—অশ্রুর রাশি সেখানে একেবারে টল টল করিতেছে! সেই সঙ্গে আর-একটা ছবিও চোখে পড়িল,—পল্লীর মাজা-ঘরা ছোট্ট একটি আঙিনা, চারিদিকের মত ছেলেটি লাফাইয়া-খেলিয়া বেড়াইতেছে, আর মেটে দাওয়ায় বনমালীর তরুণী স্ত্রী বাসিয়া দাতে ফিতা চাপিয়া ধরিয়া চুল বাঁধিতেছে, সম্মুখে আর্শি চিকরী পড়িয়া আছে! আর্শির বুকে নবমৌবনা রূপসীর দৃষ্টির সগর্ভ ভক্তটুকুও তাহার দৃষ্টি এড়াইল না।

মফঃল হইতে বিস্তর বাড়ী ফিরিল জর-গায়ে। কিঙ্করী চিন্তিত হইল, এতটুকু বিলম্ব না করিয়া বড় বড় ডাক্তার আনাইল, ঔষধের শিশিতে ঘর ভরাইয়া ফেলিল। ঔষধ খাওয়াইয়া গা ফুড়িয়া ডাক্তারের দল নিমকের মধ্যাদা এতটুকু অক্ষুর রাখিলেন না। শিরের বলিয়া কিঙ্করী বিস্তর সেবা করিল, রাত্রি জাগিল, কাঁদিয়া কত ঠাকুরের মানত করিল, কিন্তু সে সমস্তই ব্যর্থ করিয়া এক মাস রোগে ভুগিয়া বিস্তর এক প্রত্যাষে ইহজীবনের লীলা সাজ করিয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেল।

ঘাট হইতে কিস্করীকে অতি কষ্টে যখন ঘরে আনা হইল, তখন সকলে দেখিল, এখন সে কিস্করী নয়, একটা ম্লান ছায়া! ঘরে ফিরিয়া কিস্করী সেই যে শয্যা লইল, আর উঠিতে চাহিল না,—দেখিয়া সকলে বলিল, সবই বাড়াবাড়ি!

বনমালী পূর্বের মতই দেখা করিতে আসিত, সাশ্বনা দিত। সে বুঝাইত, জীবনটা হেলায় নষ্ট করিবার জন্ত তৈয়ার হয় নাই। জীবনটাকে যখন রাখিতেই হইবে, নষ্ট করা চলে না, তখন মানুষের মতই সেটা রাখা দরকার। নহিলে পরের হাতে পুতুল হইয়া থাকটা কিছু নয়! পরের দয়্যার চলা-ফেরা বসা-দাঁড়ানো—ছিঃ! কিস্করী তাহার কথায় উঠিয়া বলিল। বনমালী তখন শোক ভ্লাইবার জন্ত রাজ্যের খবর বহিয়া আনিতে লাগিল, কিস্করীও বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে সব শুনিত,—কিন্তু মনে সে সব ঢুকিত কি না, কে জানে! দোকানের কাজেও অত্যন্ত ক্রটি দেখা দিল। বনমালী মাহিনা দিয়া লোক রাখিল। কিস্করীকে দেখিবার শুনিবার জন্ত অবশেষে বনমালীকে মেস ছাড়িতে হইল। সে এখন এখানেই থাকে, খাওয়া-দাওয়াও এই-খানেই, রাত্রে এইখানেই শোয়। কিস্করীর মনে সাশ্বনা দিবার জন্ত বাশীও মাঝে মাঝে বাজাইতে হয়, গল্পও বাদ যায় না।

পাড়ার লোকে রহস্তের সন্ধানে উন্মুখ হইয়াছিল, এই ছোট-খাট ব্যাপারটার তাহারা নিখাস ফেলিয়া বাঁচিল,—ব্যাপারটা তাহাদের অনেকখানি রসালাপের খোরাক জোগাইয়া দিল—তাহারা এই বিষয়ের আলোচনার মতিয়া মসৃণ হইয়া উঠিল।

আলোচনার দুই-একটা ইঙ্গিত বনমালী ও কিস্করী--দুই জনেরই কানে গেল। শুনিয়া বনমালী হাসিল, কিস্করী ক্রকৃৎকৃত করিল।

রহস্তের বিচিত্র ইঙ্গিত-সংঘেও দিনগুলি আবার সহজ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কিস্করীর অদৃষ্টে দিনগুলি নাকি অবিরাম সহজে কাটিতে পারে না, তাই সাহেবের হুকুমে বনমালীকে অকস্মাৎ একদিন চাটগাঁয়ে চলিয়া যাইতে হইল; সেইখানেই তাহাকে এখন থাকিতে হইবে। সে চলিয়া গেল। কিস্করী নিৰ্জ্জন অবসরে নিভৃত ঘরের কোণে পড়িয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা একবার আলোচনা করিয়া দেখিল; দেখিয়া দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে চারিধারে বিপুল পরিবর্তন চলিয়াছে—পুরাতন মহল্লা ভাঙ্গিয়া নূতন মহল্লার পত্তন, বহুকালের সাবেক বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন পথ-ঘাট দেখা দিতেছে। সময় চলিয়াছে না শ্রোত ছুটিয়াছে! কিস্করীর দোকান-ঘর অথচ কদম্বা হইয়া উঠিয়াছে, সম্মুখের পদ্মখানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ঘরের দেওয়াল ধোয়ায় খুলে আচ্ছন্ন, তাহার নিজের মাথার চুলে অবধি পাক ধারিয়াছে। তাহার উপর লোক-গুলাও বদলাইয়া গিয়াছে,—পূর্বে যাহারা ডাকিয়া কথা কহিত, এখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়! কিস্করী ইহার অর্থ বুঝিল। বুঝিয়া চূপ করিয়া রহিল। কি অসহ জীবন! কাহারো চিত্তে এতটুকু সহানুভূতি নাই। এই একলা শোকের বোঝা ঝড়ে করিয়া চলিতে চলিতে তাহার শ্রান্তি ধরিয়াছে, পা আর চলিতে চাহে না, ইহার জন্ত করুণা দূরে থাক—নিশ্চয় নিষ্ঠুর

সমালোচকের মত ক্রুর হাসি মুখে লইয়াই সব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছদ্মলের পানে চাহিয়া আছে! কিঙ্করী ভাবিল, আর না! সেই অতীত—মধুর অতীত,—আহা, তেমন দিন কী জীবনে আর কোন দিন মিলিবে! না, না, না! দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে ঝড়ের মত আধালি-পাধালি করিয়া উঠিল। বুকে কে যেন মুণ্ডরের ঘা মারিল। মনের ছন্দটুকু বেদনার শৈবালে এমন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল যে সে বাহরের কোন আঘাতে আর এতটুকু চঞ্চল হয় না। বিছানার শুইয়া আঁকাশের পানে শূন্য দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে—আকাশে সেই চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, সন্ধ্যা বনাইয়া আসে, রাত্রি হয়, সবই ঠিক পূর্বস্কেতার মত, কিন্তু তাহার প্রাণে কোনটাই আর তটুকু আলো বা আঁধারের পরশ লাগাইতে পারে না! আজ সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে!

৬

শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যা। কিঙ্করী একা দোকানে বসিয়াছিল—সরকার তাগাদায় বাহির হইয়াছে, এমন সময় মস্‌মস্‌ করিয়া একজন লোক আসিয়া দোকানে ঢুকিল। কিঙ্করী চাহিয়া দেখিল, এ কি! স্বপ্ন? না, এ যে বনমালী! সত্যই ত, বনমালীই! বনমালীর চুল পাকিয়াছে, অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে সে—হঠাৎ দেখিলে তাহাকে চেনা যায় না! সেই বনমালী দুইদিনে এ কি হইয়া গিয়াছে!

বিস্ময়ের মোহ কাটিলে কিঙ্করী একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। বনমালী জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন আছ কিঙ্করী?”

কিঙ্করী বলিল “সত্যই মনে পড়েছে? আবার তুমি ফিরে এসেছ!”

“এসেছি কিঙ্করী—কিন্তু শোনে, অনেক কথা আছে। আমি আবার কল্‌কতায় বদলি হইয়াছি। এখানে থাকতে চাই। ছুট্টেটি বড় হয়ে উঠেছে, তাকে স্থলে পড়াতে হবে কি না! আর তোমার কথাই রেখেছি—ঐ ছেলের জন্তই আমার সঙ্গে বানবনা করে ফেলোছি!”

“কোথায় তারা?”

“তারা আমার এক আত্মীয়ের বাসায় এসে উঠেছে, রামকৃষ্ণপুরে—কিন্তু সেখানে থাকলে ত চলবে না। আমার ভারী অসুবিধা হবে, দেখব-ভুলবো কি করে? তাই এখানে একটা বাসা খুঁজতে বেরিয়েছি। ভাবলুম, দেখি, তুমি কেমন আছ—তাই—”

“বাসা চাই!” আনন্দে কিঙ্করীর প্রাণটা গুলিয়া উঠিল। “কেন, এইখানেই তোমরা থাকো না! আমি দোকানের একধারে পড়ে থাকবো’খন। বতরদিন আমি বেচে আছি, আর যতক্ষণ হেঁথায় আমার একটু ঠাই আছে, ততক্ষণ কোথায় আবার তুমি পরশা ধরচ করে আলাদা বাসা নিতে যাবে! কি বল?”

চারিধারে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বনমালী বলিল, “বেশ।”

পরদিন মিত্রী ডাকা হইল—ভাঁজা দেওয়ালে চূণ-বাণি পড়িল—জানালাগুলি রঙের পরশ পাইয়া হাসিয়া উঠিল। কিঙ্করী নিজে ঘুরিয়া ফিরিয়া দোকান-ঘরটিকে পরিপাটি ছাঁদে সাজাইয়া তুলিল। আজ তাহার জীর্ণ দেহে-মনে নূতন বল নূতন শক্তি সে ফিরিয়া পাইয়াছে!

স্বী-পুত্র গঠিয়া বনমালী অর্চিয়েই দেখা দিল। স্বীটি সাদা-সিঁধা ধরণের মানুষ—তবে ভারী কড়া মেজাজ। দশ বৎসরের ছেলে খাঁহু রোগা—গালের উপর মন্ত একটা জড়ুল—ছেলেটি শান্ত। খাবারের পাহাড় দেখিয়া সানন্দে খাঁহু বলিল, “এত খাবার কে খাবে, মাসিমা?”

কিঙ্করী তাহাকে বুকে টানিয়া বলিল, “তুমি খাবে বাবা।”

“এ-সব আমি খাব?”

“হ্যাঁ বাবা”—বলিয়া কিঙ্করী মিষ্টান্ন তুলিয়া খাঁহুর হাতে দিল। খাঁহু সানন্দে তাহা মুখে পুরিল।

এই ছেলেটিকে বুকে ধারণা আজ কিঙ্করীর প্রাণ জুড়াইয়া গেল—এতদিনকার এত বেদনা মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হইল! খাঁহুর মুখে চুমা দিয়া কিঙ্করী আদর করিল, “খাঁহু আমার—মাণিক আমার—সোনা আমার—”

খাঁহু কহিল, “আমি অনেক বই পড়ি মাসিমা—সব মুখস্ত আছে—শুনবে? স্বীপ কাকে বলে জানো? যে ভূখণ্ডের চতুর্দিকে জল,—তাহাকে বলে স্বীপ। কেমন, শুনলে ত? তার চারদিকে শুধু জল—কোন দিকে ডাঙা নেই। তুমি স্বীপ দেখেছ, মাসিমা?”

“না বাবা।”

খাঁহুর সঙ্গে কিঙ্করীর দুই দিনেই বেশ ভাব জমিয়া গেল। কিঙ্করী বলিয়া বলিয়া রূপকথা বলিত, আর খাঁহু নিবিষ্ট চিত্তে তাহা শুনিত—শুনিতে শুনিতে নানা প্রশ্ন তুলিত, “রাজার নাম কি? কত বড় বাড়ী? রাজা যুদ্ধ জানে? আমি বড় হলে যুদ্ধ করতে যাবো মাসিমা। পরীর ডানা কি

পাখীর মত? তার লাজ আছে? তুমি পরা দেখেছ মাসিমা?” এমনি বিস্তর কথা! কিঙ্করী নিজের হাতে খাঁহুকে স্নান করাইত, খাবার দিত, পোষাক পরাইত—খাঁহুর বাপ-মা অনেকখানি ঝগাটের হাত হইতে রক্ষা পাইল। খাঁহু খাইতে বসিলে কিঙ্করী বলিত, “দেখ, খাঁহুকে একটা ভাল স্কুলে দাও, ও লেখা-পড়া শিখে মানুষ হবে—ডাক্তার হবে, উকিল হবে, কত পরমা আনবে ও। কি বল বাবা, তুমি উকিল হবে, ডাক্তার হবে, কেমন?”

“হ্যাঁ মাসিমা, আমি ডাক্তার হব, উকিল হব।”

খাঁহুকে স্কুলে দেওয়া হইল। কিঙ্করী মাহিনা ঘোগাইত—মাহিনা দিয়া বাড়ীতেও সে মাষ্টার রাখিল। ছেলেটিকে লইয়া সে এক নূতন জীবনের পত্তন করিল।

খাঁহুর মার কিস্তি এখানে মন টিকিতে ছিল না,—মাসখানেক পরে একদিন সে বলিল, “দেশে বোনের বড় ব্যামো। বোনের দ্যাওর এসেছে আমার নিতে। তার সঙ্গে গিয়ে বোনকে দেখে আসব—” কিঙ্করীকে বলিল, “ছেলে ত দিদি তোমারই স্ত্রীওটা হয়েছে—আমাকে ছেড়ে খুবই ও থাকতে পারবে—ওকে আর নিয়ে যাব না, কি বল? রাখতে পারবে ওকে?” একমুখ হাসিয়া কিঙ্করী বলিল, “তা ওকে আমি খুব রাখতে পারব বো। তুমি স্বচ্ছন্দে ঘুরে এসো গে!”

মা চলিয়া গেল। বনমালী বাড়ী ফিরিয়া কিঙ্করীর মুখে স্ত্রীপতির ভাইয়ের বর্ণনা শুনিয়া দৃষ্টিটাকে একবার ভীক্স করিল,—

পরে একটা নিখাস ফেলিয়া বলিল, “রাখতে পারলে না ত, বিস্তর বৌ!”

খাঁড় রাত্রে কিঙ্করীর কাছেই ভিতরের ঘরে শয়ন করিত। বনমালী আজকাল প্রায়ই বাড়ী থাকিত না; যেদিন থাকিত, সেদিন দোকান-ঘরে শুইয়াই রাত্রি কাটাইত। রাত্রে বিছানায় শুইয়া খাঁড় লক্ষ্মীছেলেটির মত মাসির কাছে গল্প শুনিত—নিজেও কত গল্প বলিত—স্কুলের কথা, মাষ্টারদের কথা, পোড়োদের কথা! বেহারী সেদিন পড়া বলিতে পারে নাই বলিয়া মাষ্টার মশাইয়ের কাছে কি মারটাই খাইয়াছে! মোধো এমনি পাক্কা যে পিণ্ডিত মশাইয়ের ক্রোধে বইয়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া রোজ গাধার ডাক ডাকে, সেদিন ভূতো তাহাকে ধরাইয়া দিয়া হেডমাষ্টারের কাছে আচ্ছা বেত খাওয়াইয়াছিল, মোধোও কিন্তু তেমনি, স্কুলের ছুটির পর ভূতকে ঠ্যাঙাইয়া দিয়াছিল, শাণের উপর পড়িয়া ভূতের দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়! নূতন মাষ্টারটা এত-বেশী পড়া দেয় যে কোন ছেলেই তা মুখস্থ করিতে পারে না। নিজের কি, মুখস্থ ত করিতে হয় না, শুধু বই ধরিয়া পড়া লওয়া—বাস্! মাষ্টারদের ভারী মজা! না, সে বড় হইয়া ডাক্তার হইবে না, ডাক্তার হইবে না, স্কুলের মাষ্টার হইবে। এমনি নানান্ কথা অনর্গল সে বলিয়া বাইত, আর কিঙ্করী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রুদ্ধ নিখাসে সমস্ত শুনিত

এই দশ বৎসরের বালকটি কিঙ্করীর মনের মধ্যে এমনি আধিপত্য বিস্তার করিল যে তাহার আর কেহ রহিল না, কিছু রহিল না। দশটা বাজিলে খাঁড়কে সাজাইয়া-

গুছাইয়া সে স্কুলে পাঠাইত—নিজে তারে দাড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া থাকিত। সে মোড় বাকিলে কখন যে নিজের অজ্ঞাতে কিঙ্করী তাহার পিছু-পিছু স্কুলের ফটক-অবধি আসিয়া পড়িত, সেদিকে তাহার ভ্রমই থাকিত না। খাঁড় তষ্ঠাৎ পিছনে মাসিকে দেখিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলিত, “আঃ, কি করছ মাসিমা? চলে যাও না, তুমি—এখনি ছেলেরা দেখতে পেলে আমার ক্ষাপাবে যে!” তখন মাসির চমক ভাঙিত—তাইত! এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে সে! ফিরিবার পূর্বে আর একবার খাঁড়কে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার সলজ্জ মুখখানিতে চুমা দিয়া মাসি বলিত, “এই যে যাচ্ছি, বাবা।” বলিয়া আবার ই স্কুলের পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে কিঙ্করী দোকানে চলিয়া আসিত।

স্কুলের ছুটির পর দোকানের গলিতে ঢুকিয়া খাঁড় দেখিত, মাসিমা পনের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! খাঁড়র প্রতি কিঙ্করীর ভালবাসার সীমা ছিল না। খাঁড়র মুখে হাসি দেখিবার জন্য সে আপনার প্রাণটাকে আজ বল দিতে পারে! এ যে কি সুখ! এত সুখ, এত আনন্দ তাহার অদৃষ্টে ছিল, একজননাও যে তাহার মনে কোনদিন ঠাই পায় নাই! আর খাঁড়ও তেমনি ‘মাসি’ বলিতে অজ্ঞান! মাসির আদরে নিজের মা ও বাপের কথা সে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল।

কিন্তু এ আনন্দের মধ্যে বেদনাও অল ছিল না। যখন-তখন এক অজানা ভয়ে কিঙ্করীর বুক থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিত,

—যদি হঠাৎ খাঁড়র মা আসিয়া এমন ছেলের দাবী করে! খাঁড়কে কাড়িয়া লইয়া যায়! ভাবিতে গা শিহরিয়া উঠিত! তাহার উপর ছেলে আসিয়া যখন অন্তঃকণের সুরে বলিত, “আমি ও ক্ষুণ্ণে পড়ব না আর, মাসিমা—এত পড়া দেয় যে মুখস্থ হয় না!” তখন সে অস্থির হইয়া উঠিত, নিজের ভয় ভুলিয়া রাগে সে পথে ঘাটে সকলকে ডাকিয়া বলিত, “দেখদেখি দিদি, মিসেদের আক্কেল! এই দশবছরের ছেলে, ওকে কিনা বায়ো খানা বই পড়তে দেছে! ছেলেটা কাল রাত দশটা অবধি জেগে বসে পড়ছিল, ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল তবু শোবে না! এত বললুম, শো বাবা, শো, ঘুমো—তা বললে, না মাসিমা, ঘুমুলে পড়া হবে না, আর পড়া না হলে মাষ্টার মশায় মারবে। আমার ভাই ভারী ভাবনা হয়েছে, ছেলেটা দিন-দিন পড়ার চাপে গুকিয়ে যেন দড়ি হয়ে যাচ্ছে। পরের ছেলে ভালোর ভালোর—” এই কথাটা মনে হইতই আবার বুক কাঁপিয়া

—জিভ্ কাটিয়া মনে মনে সে বলিত, না, না, না, খাঁড় আমার, আমার! যে মা জমন করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার আবার কিসের দাবী! সে আবার মা হইতে আসে কি বলিয়া? ওদিকে বাপেরও ত ঐ দশা! না, না, খাঁড় পরের নয়, সে আমার, আমার!

সেদিন রাতে বিছানায় শুইয়া ভাল ঘুম হইতেছিল না। শুইয়া সে ভবিষ্যতের নানা কথা ভাবিতেছিল,—খাঁড় বড় হইলে ডাক্তার হইবে, খুব বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে

তাহার বিবাহ হইবে। গাড়ী-ষোড়ী, লোকজন, কত সে, ওঃ! কি অগাধ ঐশ্বর্য্যে চারিদিক বলমল করিবে—খাঁড়র ছেলেমেয়ের ঘর ভরিয়া যাইবে! তাহাদের কল-কল হাসি, সরল হুটামি—! ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সহসা বাহিরের দ্বারে করাঘাত-শব্দ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বনমালী সে রাতে দোকানে ছিল না, থিরেটার দেখিতে গিয়াছিল। বুড়া বয়সে তাহার প্রাণে নিত্য নূতন সখ দেখা দিতেছিল।

উঠিয়া দ্বার খুলিয়া কিছরী দেখে, এত বনমালী নয়,—এ যে খাঁড়র মাসির সেই দ্যাওরটি, তাহার সহিত খাঁড়র মা বোনের বাড়ী গিয়াছিল। খাঁড়র মার কাছ হইতে সে আসিয়াছে, খাঁড়কে লইয়া যাইবে, সেইখানেই সে এখন থাকিবে, সেখানে স্কুল আছে, ভগ্নীপতি ছেলেকে দেখিবে-শুনিবে। খাঁড়র মা কলিকাতায় আর আসিবে না। বনমালী ত ঐ! নেশা খরিয়াছে, বদখেয়ালিও খুব, রাতে ঘরে থাকে না—খাঁড়র মার এ-সব সহ্য হইবে না। ছেলেকে এখনই চাই! না,—বনমালীর জন্ত দাঁড়াইয়া দেরী করা চলিবে না—গাড়ী হাজির। খাঁড়কে ডাকিয়া দাও,—এখনই।

এই রাতে?

লোকটি কহিল, “হ্যাঁ, নৌকো এখনই ছাড়বে!”

ভয়ে কিছরীর মূৰ্ছশরীর হিম হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে সে? তাহার ত কোন জোর নাই! জোর করিলেই বা শুনিবে কে? আঁচলে চোখের জল মুছিয়া খাঁড়র কাপড়-চোপড়, বই-স্টেট, ব্যাট-বল

যেখানে যাহা ছিল, সমস্ত গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া  
খাঁড়র বিছানার পাশে আসিয়া সে দাঁড়াইল।  
খাঁড় ঘুমাইতেছে, মুখে ফুলের মতই শুভ্র  
নির্মল হাসি! স্ব-স্বপ্ন দেখিয়াছে বুঝি! আহা,  
বাছারে! কিঙ্করী লুটাইয়া পড়িয়া তাহার  
কচি মুখখানি অজস্র চুমায় ভরাইয়া দিল।

বাহিরে ডাক পড়িল, “দেবী হয়ে যাচ্ছে  
যে গো—শীগগির খাঁড়কে নিয়ে এসো না।”

নিরীক বেদনায় কিঙ্করীর বুক ফাটিয়া  
যাইতেছিল। কিন্তু কি করবে সে! তাহার  
কোন প্রকার নাই—পরের ছেলে খাঁড়—  
কিঙ্করী খাঁড়র কে? কেহ নয়—সে পর,  
পর—ওগো পর!

—কিন্তু সত্যই কি সে খাঁড়র কেহ  
নয়? বোনের ত্যাগের আবার বাহির হইতে  
তাড়া দিল, “আঃ, মিছে দেবী করছ কেন  
গো! না পারো ত বল, আমি নিজে গিয়ে  
নিয়ে আসি—”

না, না, না—চোখের জল মুছিয়া খাঁড়কে  
বুকে করিয়া আনিয়া কিঙ্করী গাড়ীতে তুলিয়া  
দিল, অত্যন্ত সাবধানে। বাছার ঘুমটুকু  
না ভাঙে! আহা, কাল সকালে উঠিয়া  
যখন খাঁড় আর মাসিমাকে দেখিতে পাইবে  
না, তখন—! তাহাকেও আর কাল  
হইতে ভোরে উঠিয়া কাহারো প্রজ্ঞা খাবার  
সাজাইতে হইবে না! কতদূরে কোথায়  
থাকিবে খাঁড় কে জানে! প্রভ বা জন্মশোধ  
এই দেখা! গাড়োয়ান বলিল, “এই মাগী,  
হঠাৎ—” বলিয়া সে ঘোড়ার পাশে টান দিল।  
গাড়ী চলিল।

যতক্ষণ দেখা যায়, কিঙ্করী গাড়ীর পানে  
অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল। গাড়ী গড়্ গড়্  
শব্দে কলিকাতার নিস্তর রাজপথ সচকিত  
করিয়া ছুটিল—কিঙ্করীর মনে হইল, তাহার  
বুকের উপর দিয়া তাহার অস্থি-পঞ্জরগুলিকে  
• মড়-মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া  
গাড়ী চলিয়া গেল! গাড়ী চোখের আড়ালে  
অদৃশ্য হইলে “খাঁড়, বাবা আমার—” বলিয়া  
চাবকাব করিয়া সে দ্বারের সম্মুখে মুচ্ছিত  
হইল।

মুচ্ছা ভাঙ্গিলে চোখ মেলিয়া কিঙ্করী  
চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া খাঁড়, মুহু  
ঠেলা দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, “মাসিমা,  
ও মাসিমা ওঠোনা,—অনেক বেলা হয়ে  
গেছে যে। আজ আমার এগ্জামিন, মনে  
নেই বুঝি? বাঃ! সকাল সকাল স্কুলে  
যেতে হবে না? কাল রাত্তির থেকেই ও  
বলে রেখেছি—বা রে—”

ঘরে সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িয়াছে,  
ধড়মড়িয়া উঠিয়া কিঙ্করী খাঁড়কে বুকে টানিয়া  
লইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া ভালো  
করিয়া আবার চোখ মেলিয়া তাহার পানে  
চাহিয়া দেখিল, না—এ ঘুম নয়, স্বপ্ন নয়,  
সত্য, সত্যই যে খাঁড়! খাঁড়কে প্রাণ্ণপণে  
জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে-চোখে ধাক্কা  
বুলাইয়া চুমা দিয়া সমস্ত অকল্যাণ মুছিয়া  
লইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী  
তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরের দিকে ছুটিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।



## স্মরণ-স্মৃগ

কে এখানে পাঠিয়ে দিলে এই জাগরণ-মাক ?

মাথার 'পরে মেঘ-নগরে বজ্রধাগে ধ্রুপদ বাজে আজ ।

পর্দা দিয়ে আড়াল করে'

লুকোচুরি! থেলেছে ওরে !

সম্বন্ধাইতে পারিনে সেই মহাশিবের মহান্ অভিশ্রায় ;—

নিবল দিনের শেষ-সোনালি, আমার দিনের আঁধার কিনারায় ।

ডঃখ-সুখে অবিচ্ছেদে থাকি দিয়ে দিয়ে

করছ পরখ্ কে গো আমার নিয়ে ?

কে তুমি মোর চিন্তা হবে ? কখনে আছ শুধাই গো তোমায় ।

ছিলাম না কি জন্মের আগে, বিশ্ববী বৈতরণীর পারে

রইব কিনা বলবে কে আমারে ?

মাক্‌খানে এষ্ট আধেক-ভীতি-আধেক-পুলকভরা,

কারাহাসির এষ্ট দেয়লা, একটু আশা একটু পীতি-ঝরা,

'স্বপ্ন বলে'ই হচ্চে মনে—বুঝব কি গো সার্থকতা এর ?

আললটুকু কখন পাব টের ?

মরছি ঘুরে' গোলোক-দাঁধায়, বাইরে যাবার দ্বার

কোন মরণে, দিগ্‌বিদিকের পার ?—

পথের ধারেই ফুল-কিশোরীর স্বয়ংবরে আজ

রজনীগন্ধার সোহাগে মাতাল গন্ধরাজ,

কিন্তু পলক না ফেলতে হয়

মধুর কণা সোয়াদ হারায়—

উঠল গেজে রসের তাড়ী, এক চুমুকে নিঃশেষিয়া

ইন্ডিয়েরা বাউরা হ'য়ে যায় ।

এই প্রমাদী শত্রুগুলোর কেমন করে' করব ওগো জয়, -

কোন সে পুরুষচরণ শেষে ভয়কে আমি করব না আর ভয় ।

দৃগ্-গণিতে ঐকা নাহি, সঙ্কগ্রাসী সৃষ্টিগ্রহণ হ'ল,  
 আমার মনের দূর্বীনে তার কালীর ছায়া প'ল।  
 উঠল তুফান বুকের তলায়, কপটতার তৃপ্তি ছুটে যায়,  
 বরের যারা পর হোল' রে—পুঁতুল সম কাঁচের চোখে চায়,  
 দৃষ্টিভরা শুক দেমাক, সহজ হাসি লুকিয়েছে কোণায়।  
 পাড়লে কথা তাদের কলচে,  
 বথরা দিতে হয় গো পাছে  
 তাদের সুখের একটি রতি, আশঙ্কাতে পাশ কাটায় যায়,  
 চাইনে কিছু তাদের কাছে—একটা কথা শুন্তে নাহি চায়।

দন দৌলৎ জোয়ার-ভাঁটা ; সুবতি-খেলায় পড়'তা পড়ে কারো,  
 যে যত পায়, চায় সে ততই আরো ;—  
 ছেলেখেলায় দোলায় শুয়ে, হারিয়ে গেলে রঙীন 'চাঁষকাঠি'  
 বায়না ধরে' অবুঝ কারাকাটি।

র্যালা করে' সেই বোকামি হয়  
 পড়'লে মনে আজকে হাসি পায়—  
 আজও কি সেই তেমনিতরই ফেল'ছি না রে চোখের নোনা জল  
 হারাই যখন সোনার কুচি, ষাটকরার কটাক্ষ টল্‌মল ?  
 প্রাণ-কমলের পাপড়িগুলির মাঝখানে  
 লুকিয়ে তারে রাখ'ছি না কি সাবধানে ?  
 সে যদি হয় চায়না আমার, ফল-সমান বহায় সে উজান  
 সোহাগ-অভিমান।

বুঝতে যদি পারি গো তার ভালবাসার ভাণ  
 আজও কেন ডুক্রে ওঠে প্রাণ ?  
 বুঝে-সুঝেও আঁকড়ে ধরি ঢেউএর মাণিক হয়  
 •  
 ঝাঁপিয়ে পড়ি ভুলের দরিয়ায়।

ঝুটো বলে'ই মান'ছি বটে,—ক্ষেপার মতন তবু গো তাই থাঁজি !  
 সঁজা বলে'ই কর'ছি না কি থাঁজি ?

বারেই দেখি শুধাই এ নিখিলে  
 রয় ছনিয়া অবাধ হ'য়ে, এঁই হেঁয়ালির জবাব নাহি মিলে।

চাঁদের হাসি ডুবল কবে পাঠাডুল্লোর পিঠে ?

সুধার নেশা লাগছে না আর মিঠে ।

বুড়ো হয়েই গেছে সে চাঁদ আমার সাথে সাথে,

নেই সে চুমু শারদ জোছনাতে,

চুষকেরি টানে যখন যুগল এসে মিলে হাতে হাতে,

টান পড়িত ফুলের সে 'ছিলা'তে !

শিশু এসে জড়িয়ে গলা দিচ্ছে হেসে থুসির পরিচয়,

পুরাণে এহ খেলার দেশে নতুন অভিনয় ।

অক্ষণ রঙে রঙিন যে তার প্রাণ,

পূর্ণিমাকে দেয় সে হাসি, হাওয়া'কে দেয় গান ।—

আমার সাথে ফুটে গো তার রাত-পোহানোর আলো,

তার সে শাদা আমার কাছে কাণো ।

ওই যে হোণা হাসছে হাসি যুগল-তারার আলো,

কবির মত লাগছে গো তার কতই না সে ভালো ।

বুঝে না সে কী যে আলা, কি বদ্রোহ লাল-শিখাতে,

পুড়ে-পুড়েই বকের পাঙ্কর ছাই হ'ল রে দিবস-রাতে !

এমুনি খেলাই খেলছে মহাকাল—

'রাই' হয়ে সে ঢালছে সোহাগ, বিলাস-দোলে দিচ্ছে জলদ তাল ;

পা'র কাছে তার ভেট দিয়েছে স্বত্বপতি ফুলের শিরস্রাণ,

মিলন-দিনে নিধুবনে ফাঙন-মধুপান ।

চুলটি বাধা

রইল আধা,

হঠাৎ কাণে লাগল বাঁশীর তান,

চমকে ওঠে সম্পা সম চম্পাতরংগ প্রাণ ;

সেই মরমীর মুখের কঁচি বক্ষে চাপি' পাগল সে মুকুর

যুগে-যুগের বাঁশীর কঁাদন, মিলন-রতি বিচ্ছেদে-মধুর ।

ডাক দিয়েছে বর-নাগর উপমাহীন পরম-মনোরম,

ক্ষয় নাহি তার যৌবনেরি— ব্যাকুল ব্রজে অনন্ত সঙ্গম

মন-যমুনার চেউ তুলেছে বাঁশীর ব্যঞ্জনা,

বাজিয়ে নুপুর আর রে রঞ্জনা,

আয় রে আয় জন্মকারি,  
 চাটগো তায় চাইছি বারি।  
 পরকে চাই, পরকে চাই,  
 নহিলে পর সুখ তো নাহি।  
 মুাছে নীর পর চোপের,  
 বুচিয়ে ছথ পর বকের,  
 চাইতে মোর কিচ্ছু নাহি।  
 সুখ-দাধন উন্মাদন,  
 প্রেম-রভস রাস-বুলন  
 রঙ্গ মোর রস-লীলাটি।  
 চাউনি আর রয় না পির,  
 লাগল মিল দিলু আপির।'  
 ভাঙ্গিয়ে নিদু গায় তো তার,—  
 'মন্-চোরার সিধু কোথায়!'  
 কুল-ফাঁদের বন্দীকে  
 দিগ্ ভোগায় কোন্ দিকে!  
 ঘোবনের নোকোতে  
 বাইছে দাড় জোর-শ্রোতে—  
 সাঁঝ-বেলায় জল-কৈলির  
 জল-তিরং সুর মদির  
 ভাসিয়ে দেয় লাজ-বসন,  
 স্তন-কদম আধ-মগন।  
 মুখ-মদের মো-ধারায়  
 মন মাতায় সুখ-বাধায়।  
 নিখাসের খোসবোতে  
 লিখছে নাম দাস-খতে;  
 গুল্ফ-মূল পা'র পাতায়  
 রক্তগুল্ফ লজ্জা পায়।  
 লাক্ষাকোট ঢালছে রাগ  
 আলতা-পায় খেলতে ফাগ।  
 কস্তুরীর যশ লুকায়  
 শৈল-পার কুঞ্জ-ছায়।

কোন্ শাওণ রোদ-জলে  
 মগ্নে কার মন গলে!  
 কোন্ বিহান স্বপ্ন-পুল  
 ঝারয়ে দেয় সব বকুল।  
 গাণ্ছে তার, নাহি সে ফাঁদ,  
 টুটছে আধ—ঘোমটা-পাশ।  
 মুখ-পবন চুম্-সরস,  
 অক্ষ আর বয় না বশ;  
 রোম-কুপের ফাঁক দিয়ে  
 সব সুধাই নেয় পিয়ে।  
 মঞ্জিয়ে দেয় এক 'পেয়ার'  
 লাখ জনম, লাখ ক্রিয়ার,  
 লাখ যুগের তৃষ্ণাতে  
 সাধ মেটায় দিন-রাতে।  
 সয় দরদু বেদনাতে,  
 ছয় ধতুর গুলনাতে।  
 তয় তিলেক অন্তরাল,  
 কল্জে তল দেয় বে তাল,—  
 মন হাজির হয় কাণে,●  
 চোখ বুঞ্জে তাব ধানে,  
 তার পথে, মন্-রণে  
 জয় করে' মন্থণে,  
 নেয় বরে' কুল-ডোরে  
 প্রাণ-বধুর হাত ধরে'।  
 বন-বিহার ফুল-খেলায় ●  
 চন্দনের গন্ধ বায়,  
 বিলয়ে দেয় নয় প্রাণ,  
 মাজতে ভিক্ চায় না মান,  
 আল্পেষের সম্মোহন,  
 রয় না ভেদ পর-আপন।  
 লয় যায়, লয় যায়,  
 আয় রে রাই আয় রে আয়—

ভাঙ্কে মান বংশীর ইন্দ্রজাল,  
রসিয়ে দেয় অশোক লালে লাল।  
এমনি করে'ই খেলছে মধ্যকাল।

খেলছে যারা দেয়ু'ছি দিনে-রাতে,  
ঐ খেলাতে মন যে নাহি মাতে ;—  
নতুন খেলার ধ্যান করে চোখ অক্ষ-কোটর-তলে  
অগাধ কৌতুহলে—  
হারিয়েছে মোর ভাবের ঘরে অসার অভাব শুনে'  
ক্রান্তি কড়া নিইছি মিছে গুণে'।

বুঝি এখন কি বকুমারি !  
রাত-ভিখারী দিন-ভিখারী  
করেছি হায় মনটিকে মোর, তাই তো ভুগে মরি,  
স্বার্থ-বেড়ায় আপ্নাকে হায় থর' করি' করি'।  
রসাতলের পাশায় ছকে, হার জিতে হায় ফতুর হ'ল প্রাপ,  
মেরির হাটে সওদা করে' আসল-পুঁজি হ'ল রে লোকসান।

পূজার সাজির অপ্ৰাজিতা ফুটেছে আমার সন্ধ্যামণির পানে,  
মিঠা বিয়ের মখন-শেষে আনন্দ-সন্ধ্যানে।  
সম না দেরি, মূলতুবৌ আর—যে সুখ-রসে নিখিল পরিপূর,  
এই সরাইএর দুয়ার থেকে আবছায়া তার দেখ'ছি বহুদূর।  
সাগর-বারির বৃন্দদেরা চায় আকাশের নীল বিথারেই চায়,  
সৈকতে দেয় কইমে কথা, গোপ্পদে তার কুলায় না যে হায় !—

চাইছে বুক  
দিব্য সুখ,  
সুখ অভয়,  
দম্ব-ক্ষয়,  
মৃত্যুজিৎ  
ছন্দগীত,  
তার নাগাল পায় না মৃৎ।  
নিভা-রূপ, কল্পভূপ,

এক অমুপ পূর্ণ সেই—

সেই ভূমায় অর্থা দেই ।

নিখিল-শ্রীর তারার নাট-

মন্দিরের ময়ূপাঠ,

সাবিকের শান্তি-শ্লোক,

মৃত ওই চৌদ্ধ লোক—

বিশ্বাসের বিরাট্ মেরুর জ্যোতি

চিরস্তন করছে দীপারতি ।

ওগো আমার যুগেযুগের জীবন-ভূলানো,

কই গো তোমার পরশ-মণির হরষ-বুলানো !

দাও গো দেখা, দাও গো মোরে দেখা,

জাগতে নারি পারের বাসর এমন একা-একা -

দাও রাঙায়ে আঁদার রাতে আলোর অভিসার,

বন্ধ হে আমার ।

শ্রীকরণানিধান বন্দোপাধ্যায় ।

## সভ্যতা বনাম বর্বরতা

পূর্বে একটা প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, 'সভ্যতা' মানবজাতির পক্ষে আশীর্বাদ না অভিশাপ তাহা বলা কঠিন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে, সভ্যজাতিরা বর্বরজাতিদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। এই হিসাবে বলিতে হয় 'সভ্যতা' মানুষের পক্ষে 'উন্নতি' নয়,—'অধোগতি'। শক্তিমন্দের প্রচারক আধুনিক যুগের কোলাহলকান পণ্ডিতও এমন কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কথাটা এত সহজে মীমাংসা করা চলে না। সুতরাং এ-সম্বন্ধে আমরা আর-একটু ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

এই যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ জম্মানীর সঙ্গে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের লড়াই বাধিয়াছে, তাহাতে একটা বড় রহস্যময় ব্যাপার দেখা যাইতেছে। জম্মানী বলিতেছে যে, জম্মান 'Kultur'ই মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বস্তু। পৃথিবীর আর সকল জাতি—টাকা-কড়ি ধন-দৌলত লইয়াই ব্যস্ত—সুতরাং প্রকৃত সভ্যতা লাভ করে নাই। আর পৃথিবীময় বাহাতে সেই অপূর্ণ জম্মান 'Kultur' বিতরণ করা যায়, তাহাই জম্মানীর উদ্দেশ্য—আর তাহারই ফলে এই ঘোরতর যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ অস্ত্র জাতিরা বলিতেছে যে, জোর করিয়া পৃথিবীর অস্ত্র দুর্বল-জাতিদিগকে পদানত

করাই জর্মানীর উদ্দেশ্য আর 'সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়৷ জর্মানী যোগাড়-যয় করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এতকালের মানব-সভ্যতা কি জর্মানীর শক্তিমস্তের ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে! অতীত দুর্কলতর জাতির শাস্তি ও স্বাধীনতা—কি তাহার নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণীকৃত হইবে? আধুনিক যুগের উন্নত আদর্শ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার পরম বাণী কি জর্মানীর বর্বরতার কবলে পড়িয়া বিলীন হইয়া যাইবে? না, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। সেই দুর্কলতর জাতিদের স্বাধীনতা-রক্ষা, পৃথিব্যময় শাস্তি ও প্রেমের আদর্শ-স্থাপন, বিশ্বমানবের মুক্তির জন্যই বর্বর জর্মানীকে পদদলিত করা দরকার।—তাহার বিষদাঁত না ভাঙ্গিলে পৃথিবীর আর মঙ্গল নাই।

বেশ কথা। কথাটা শুনিলে প্রাণে আশা হয়; বৃদ্ধদেবের দেশের লোক আমরা—আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু এতকাল আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম যে জর্মানীই প্রতীচা 'সভ্যতা'র মুকুটমণি। ইউরোপের অন্তান্ত দেশের লোকেরা যে সভ্যতার গর্ব করে, জর্মানীর সভ্যতা যে তাহা হইতে কিছু ভিন্ন রকমের ছিল, ইহা ত আমরা এতদিন শুনি নাই! বরং যে কাব্য-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-দৌলত, বিলাস-বাসনের জন্য জর্মানী বিখ্যাত ছিল, তাহা যে ইউরোপীয় সভ্যতারই শ্রেষ্ঠ দান এবং উহারই আবহাওয়ার 'আওতার' মধ্যে তাহা যে বাড়িয়া উঠিয়াছে এই কথাই প্রতিনিয়ত শুনিয়া আসিয়াছি। সম্ভবতঃ যে মুহূর্তে

জর্মানী বেলজিয়াম ও ফ্রান্সকে পদদলিত করিল, সেই মুহূর্তেই তাহার সভ্যতা ভিন্ন-রকমের হইয়া উঠিল! উহার বদলে জর্মানী যদি চীন ও তুর্কীস্থান আক্রমণ করিয়া দখল করিত, তাহা হইলে কথাটা কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা এখন আন্দাজ করিয়া বলা শক্ত।

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই দেখা যাইবে যে, জর্মানী নূতন বিশেষ কিছুই করে নাই সর্বযুগে ও সর্বকালেই যে-সকল জাতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাও অল্প দুর্কল জাতিকে জোর করিয়া পদানত,—এমন-কি, ধ্বংস পর্য্যন্ত করিয়াছে। তাহাদের সকলেরই যে উদ্দেশ্য খুব মহৎ ছিল, এমন কথা বোধ হয় বলা যায় না। আখ্যাত্যক্তি যখন সিদ্ধান্ত পার হইয়া ভারতের আদিমনিবাসী দ্রবিড় প্রভৃতি জাতিদ্বিগকে কতক মারিয়া, কতক বনে-জঙ্গলে তাড়াইয়া এই 'মুজনা মুক্লা' ভূমিকে দখল করিয়া ছিল, তখন যে তাহাদের 'বৈদিক সভ্যতা' প্রচারের খুব বড়রকম একটা উদ্দেশ্য ছিল, এমন কথা বলাও শক্ত। 'নেবুচেদনেজারের' কর্তৃত্বে পারস্যীক বাবিলন যখন হিব্রুজাতিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ছিল, তখন যে তাহাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, এমন সন্দেহ কেহই করে না। রোমের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য যে পরমার্থ-তত্ত্ব প্রচার নয়—পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যভোগ, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। আর তৈমুরলঙ্গ ও চেঙ্গিস খাঁর বিপুল বাহিনী যখন ইউরোপ

বহাইয়া, গ্রাম-নগর ধ্বংস করিয়া, দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গকারী শিবায়ুচর প্রমথদের তাণ্ডবলীলার পুনরভিনয় করিতেছিল, তখন যে কোন সুগভীর তাতার Culture প্রচার করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইতিহাসে তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মহাম্মদের নূতন মস্জে জাগ্রৎ হইয়া আরবজাতি যখন বিশ্ববিজয়ে বাহির হইয়াছিল, তখন প্রথমটা তাহাদের মধ্যে নবধর্ম-প্রচারের একটা মহৎ উদ্দেশ্য যে ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত ইউরোপ ও এশিয়ার কতকগুলি সিংহাসন দখল করাটী যে তাহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে সেখানে যখন দলে দলে ইউরোপীয় নানা জাতি আড্ডা করিয়াছিল ও প্রাচীন অধিবাসাদিগকে শিকার করিয়া মারিয়াছিল তখন তাহাদের মধ্যে বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রীর কোন নূতন বার্তা প্রচার করা উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। আর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের জাতিরা যে এশিয়ার শাস্তিপ্রিয়, 'অমূল্যত' নানা জাতির পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া-ছিল, তাহার মধ্যে খৃষ্টধর্মের মহতী বাণী প্রচার করাই যে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এতখানি বিশ্বাস করাও কঠিন হইয়া উঠে। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে জন্মাবীর পৃথিবী-বিজয়ের চেষ্টা যে তথাকথিত দ্বিগুণ-পরম্পরারই শেষ ফল, তাহা বলিলে বোধ হয় ঐতিহাসিক ভুল হয় না।

সোজা কথায় পশু-জগতের স্থায় মানব-জগতেও এ-যাবৎ মারামারি কাড়াকাড়ি

জীবনের প্রধান কার্য্য ও নিজের স্বার্থের পরিধি বাড়ানোই প্রধান আদর্শ হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের দ্বিবাদ্বিষ্টিতে আচার্য্য ডারুইন সাধারণ জীব ও উদ্ভিদ-জগতে যে জীবনসংগ্রাম ও যোগাত্মের উদ্ভবের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মানব-রূপ বিশেষ জীবের মধ্যে যে তাহা অপেক্ষা অগ্র তত্ত্ব বা নীতি কার্য্য করিয়াছে, তাহার ত কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে 'যোগাত্মের' আদর্শ যে যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে, একথা কতকটা মানা যায়। নিম্নতর জীব ও আদিম মানবের ভিতর একমাত্র গায়ের জোরই 'যোগাত্মের' মাপকাটি ছিল। 'জোর যার মূলুক তার' একথা তখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে শুধু 'গায়ের জোর' আর প্রধান মাপকাটি থাকিল না। গায়ের জোরের সঙ্গে বুদ্ধির জোরও আসিয়া যখন যোগ দিল, তখন যাহাদেব গায়ের জোর ও বুদ্ধির জোর উভয়ই প্রবল ছিল, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে লাগিল। শুধু গায়ের জোর বা শুধু 'বুদ্ধির জোর'র বিশেষ-কিছু মূল্য কোন কালেই হয় নাই। সেইজন্য যে-সকল জাতি গায়ের জোরের দিকে তেমন মন না দিয়া কেবল বুদ্ধির চালনাই করিতে ছিল, তাহাদের সেই অসম্পূর্ণ 'মানসিক' সভ্যতা—প্রবলতর 'বৈহিক' সভ্যতার কাছে বিধ্বস্ত হইয়া ছিল। প্রমাণ, গথ-দিগের দ্বারা রোমের ধ্বংস, মোগল-পাঠানদের দ্বারা ভারতীয় হিন্দুর নির্যাতন।



অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে' যে ইউরোপীয় জাতিরা পৃথিবীময় আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, তাহারা আসল কারণ এই যে, তাহারা গায়ের জোর ও বুদ্ধির জোর—দৈহিক ও মানসিক সভ্যতা—উভয় হিসাবেই 'যোগ্যতম' ছিল। তাই একদিকে নিগ্রোদের কেবল 'গায়ের জোর' ও আর-একদিকে এসিয়ার সভ্যজাতিদের কেবল বুদ্ধির জোর, কিছুই তাদের কাছে টিকে নাই। আর বলা বাহুল্য আধুনিক ইউরোপের মধ্যে জর্মানীই সেই 'গায়ের জোর' ও 'বুদ্ধির জোর' উভয় হিসাবেই সকলের চোখে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। তাই জর্মানীর পৃথিবী-জয়ের চেষ্টা আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতারই চরম পরিণতির চেষ্টা। এই চেষ্টার ফলে যে বিষম প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই বর্তমানে এই মহাযুদ্ধের আকারে দেখা দিয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, এই 'সভ্যতার' মধ্যে কোথাও যেন 'খুঁৎ' আছে, কোথাও এমন মারাত্মক ব্যাধির বাজ লুকাইয়া আছে যে, তাহাতে সমস্ত বিশ্ব-মানবের দেহটাই বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

এই যে স্বার্থের আদর্শ, ভোগের আদর্শ, ঐশ্বর্যের আদর্শ, মারামারি-কাড়াকাড়ির আদর্শ মানবসমাজে এ-পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়া কি আর কোন আদর্শের ইঙ্গিত মানবসমাজে এ-পর্যন্ত দেখা যায় নাই? এই যে দম্ভ, অহঙ্কার ও প্রতিযোগিতা ইহার বিপরীত প্রেম, সহযোগিতা ও ত্যাগের বাণী মানবসমাজ কি কোনদিন শোনে নাই? শুনিয়াছে বৈকি! কিন্তু কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে

নাই। পৃথিবীতে 'প্রধানতঃ তিনজন মহা-পুরুষ বা তগবানের অবতার (যাহার গালা ইচ্ছা বলিতে পারেন) এই প্রেম ও ত্যাগের বাণী শুনাইয়াছেন। প্রথম রাজ-পুত্র সিদ্ধার্থ—যিনি রাজা, ভোগ-ঐশ্বর্য সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া মানবের দুঃখে কাঁদিয়া ভিক্ষার বেশে বিশ্বের মধ্যে ঝাঁপটিয়া পড়িয়াছিলেন—এই সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার পরমবাণী তিনি জগৎকে শুনাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়—জৈন-জৈন্যের বীণ-ব্রীড়, যিনি সহস্র নির্যাতন সহ করিয়াও প্রেম ও ত্যাগের আদর্শ মানুষের জন্ত প্রচার করিয়াছিলেন, নিজের প্রাণ দিয়াও অহঙ্কারী, ধনগর্বী, অত্যাচারী মানবের মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন। তৃতীয়—নদীয়াবহারী খ্রীস্টো—যিনি সমস্ত বাহ্য ঐশ্বর্য ও জ্ঞানগর্বের ভিতর হইতে টানিয়া আনিয়া মানুষকে প্রেমের রাজ্যের পথ দেখাইয়াছিলেন, বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতার কুহকে আত্মবিস্মৃত মানুষকে বিশ্ব-প্রেমের বার্তা শুনাইয়া ছিলেন। ইহাদের সকলের কথাই মানুষ শুনিয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল; আর এখনও পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ইহাদেরই শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। কিন্তু সত্যকথা এই যে, মানবসমাজ কোনস্থলেই গভীরভাবে ইহাদের কথা উপলব্ধি করে নাট,—রাষ্ট্রে, সমাজে, জীবনে কোনদিনই ইহাদের ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুখে মানুষ বত-বড় কথাই বলুক না কেন, কার্যত তাহারা সেই স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার সভ্যতাই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। তাই পৃথিবীর

অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান বা বৈষ্ণব হইলেও, জাতিতে জাতিতে মারামারি কাড়াকাড়ি কিছুমাত্র কমে নাই।

এই যে ত্যাগ, সহযোগিতা ও প্রেমের আদর্শ, উঠা থাওয়া এসুয়ার আদর্শ। যদি মানব-সভ্যতাকে এই নব আদর্শের উপর স্থাপন করিতে পারা যায় তবেই তাহার মঙ্গল হইতে পারে। অবশ্য আমরা জানি যে অনেক পণ্ডিত এই “ত্যাগ”ের আদর্শকে “দুঃখের ধর্ম” বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন। কিন্তু তথাকথিত “সবলের ধর্ম”—ভোগ ঐশ্বর্য্য প্রতিযোগিতার আদর্শ মানুষকে কি কোন শাস্তি দিতে পারিয়াছে? উহার অন্তরে যে লালসা—উহার বাণী যে “আরো চাহ, আরো চাহ”—উহা মানুষের স্বত্বপুকে “হবিষা কৃষ্ণবর্ষেব ভূয় এবাভিবদ্ধতে”।

আর ইহাই প্রকৃত ‘বর্বরতা’। উহার যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের গন্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বহর, ধন-দৌলতের পরিমাণ ও আরাম-বিলাসের উপকরণ থাকুক না কেন—উহা মূলতঃ বর্বরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে হয়ত হুণ, তাতার ও গণদের মত স্থূল বর্বরতা নহে—জ্ঞানবিজ্ঞানের বার্ণিণে মার্জিত নূতন ধরণের বর্বরতা। আর বতর্দিন ইউরোপ এই বৈজ্ঞানিক বর্বরতার আদর্শকে ধরিয়া চলিবে, ততদিন সে “Pan-christianism”, “League of Nations”, “Freedom of the World” প্রভৃতি যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, পৃথিবীতে কিছুতেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে না। মারামারি, কাড়াকাড়ি ও প্রবলের জয়,—ইহাই নিষিদ্ধারে চলিতে থাকিবে।

কেহ যুক্ত বলিতে পারেন যে, জীব-হিসাবে মানুষ জীবজগতের সাধারণ নিয়মের অধীন স্তবরাং তাহার মধ্যে “Struggle for existence”, “Natural Selection” (প্রাকৃতিক নির্বাচন) প্রভৃতিই স্বাভাবিক। জোর করিয়া ত্যাগ, প্রেম ও সহযোগিতার আদর্শ তাহার মধ্যে প্রবর্তন করা যাইবে না। কিন্তু আধুনিক জীবতত্ত্বের আবিষ্কার এ-বিষয়ে আমাদেরকে আশা দিয়াছে! প্রতিযোগিতা ও জীবন-সংগ্রামই যে জীবজগতের সমগ্র নীতি নহে, একাংশ মাত্র—তাহা আমরা আজকাল বুঝিতেছি। জীবজগতের নিম্নতম স্তরেও প্রেম ও সহযোগিতার ক্রিয়া চলিতেছে। আর যতই জীবরাজ্যের উচ্চস্তরে উঠা যায়, ততই এই নিয়মের সফলতা দেখা যায়। মানুষের জন্মাবকাশের উচ্চস্তরে কালে যে এই উচ্চতর নীতি কার্য্য করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; বরং ইহাই যে মানুষের পক্ষে সত্য নীতি—দান ও প্রতিযোগিতা নহে—ভবিষ্যতের জীবিতক তাহা হয়ত প্রমাণ করিয়া দিবে।

আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয় যে, এই ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শ জাতিতে দুঃখল করিয়া ফেলে, প্রবলের হস্তে আত্মরক্ষায় তাহাকে অক্ষম করিয়া তোলে। কথাটা কিরদংশ সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু পণ্ডবলী কি মানুষের একমাত্র বল? সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন দৌলত, ক্ষমতা, প্রভূত্ব—ইহাই কি জাতির একমাত্র লাভ? ইহা ছাড়া মানুষের আর কি কিছু কার্য্য নাই? জাতির আর কি কোন লক্ষ্য নাই? এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, হয়ত-বা এই

সকলের বাহিরে আরও কিছু মহৎ বস্তু আছে। আর তাগ ও প্রেমের আদর্শের ভিত্তর দিয়াই সেই বস্তু লাভ হইতে পারে। ইহাতে হয়ত মানুষের “Efficiency” বাড়িবে না, হয়ত-বা অনেক জাতি পরপদদলিত হইবে, হয়ত-বা কেহ কেহ প্রবলের অত্যাচারে ধ্বংস হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত এই তাগ ও প্রেমের ‘সভ্যতা’ই জয়ী হইবে, —এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা উহাই বিশ্বমানবের চরম পরিণতি। বর্তমান যুগের

লোমহর্ষণ বাপার’ দেখিয়া অর্জুমান করা যায় যে, এই ভীষণ বর্বর-‘সভ্যতার’ একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে। বলগব্বী ও ধনগব্বী জাতিরা ধনে-প্রাণে সর্বস্বাস্ত হইয়া হয়ত-বা ত্যাগের মহিমা বুঝিতেও পারে। রক্তেরাঙ্গা পৃথিবীর বুকে হয়ত বা একদিন প্রেম ও শান্তির নিশান উড়িতেও পারে। আর তাহাই যদি হয়, তবে এই ভয়াবহ নরমেধ যজ্ঞ বৃণা যায় নাই বলিতে হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

## জলের আশ্পনা

পনেরো

আল্‌বোলায় নলটি মুখে লাগাইয়া জগৎবাবু স্তিমিত চক্ষে সোফার উপরে আড় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার ঠোঁটের ছইপাশ দিয়া ধোঁয়ার ভূটি সাদা রেখা ফুটিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া জান্নার দিকে উড়িয়া যাইতেছিল।

তাঁহার প্রিয় ভৃত্য মাণিক একখানা পত্র হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। জগৎবাবুর হাতে পত্রখানা দিয়া বলিল, “একজন লোক এসে এই চিঠিখানা দিবে গেল। বল্লে, জরুরি চিঠি।”

চিঠিখানা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিয়া জগৎবাবু বলিলেন, “কার চিঠি এ? কোথেকে এসেছে, তা বল্লে না?”

—“না হজুর! দিবেই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।”

তামাকের নল ফেলিয়া জগৎবাবু ভালো-করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তারপর টেবিলের উপর হইতে চশ্মার খাপখানা তুলিয়া লইয়া, চশ্মা বাহির করিতে গিয়া দেখেন, খাপ খালি। এদিকে-ওদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও চশ্মা নাই।

—“মানকে!”

—“হজুর!”

—“আমার চশ্মা কোথায় গেল?”

—“জানি না, হজুর!”

—“তাপ্ দেখি, নীচে পড়ে গেছে কিনা!”

মাণিক টেবিল, চেয়ার সোকার তলা ও ঘরের আশপাশ আঁতিপাতি করিয়া গুঞ্জিয়া বলিল, “চশ্মা নেই হুজুর!”

জগৎবাবু খাপ্পা হইয়া বলিলেন, “নেই ত গেল কোথায়?”

—“জানি না হুজুর!”

—“আল্‌বৎ জানিস্! দেখ্‌ছিস্ জরুরি চিঠি, জানি না বল্‌লেই হোলো? দে, চশ্মা বার করে’ দে!”

—“আমার কাছে নেই হুজুর!”

—“আল্‌বৎ আছে! নেই বল্‌লেই হোলো! খাপ্‌ রইল টেবিলে আর চশ্মা গেল উড়ে? চশ্মার ডানা আছে—না?”

বেগতিক বুঝিয়া মাণিক কাঁচুমাচু মুখে মাথা চুলকাইতে শুরু করিল।

জগৎবাবুর মেজাজ ক্রমেই বেশী গরম হইতে লাগিল। সপ্তমে গলা চড়াইয়া তিনি বলিলেন, “পাজী, চোর কোথাকার! বলা নেই, কওয়া নেই—চোখের সামনে চশ্মা লোপাট্‌, দিনে ডাকাতি? বার কর্‌ চশ্মা!”

—“জানি না হুজুর!”

জগৎবাবু সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া রুখিয়া বলিলেন, “এম্‌নি এক চড়্‌ নার্ব মান্‌কে, যে মাথাটা তোর ঘুরে যাবে! খালি-খালি এক কথা—চালাকি পেয়েছিস্, না?”

হঠাৎ জগৎবাবুর কপালের উপরে চোখ পড়িতেই, মাণিক ভাড়াভাড়ি বলিয়া উঠিল, “হুজুর, চশ্মা ত আপনার কপালেই রয়েছে!”

কপালে হাত বুলাইয়া জগৎবাবু দেখিলেন, অ্যা, তাই ত! তখন তাঁহার মনে পড়িল, খবরের কাগজ-পড়া হইয়া গেলে পর,

চশ্মাখানা নাকের উপর হঠতে টানিয়া সরাইয়া তিনি কপালে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। বেকুব বনিয়া তিনি আবার বাসিয়া পড়িলেন এবং অপ্রতিভ স্বরে বলিলেন, “মাণিক, কিচু মনে করিস্-নে বাবা!”

• প্রিয় তা মাণিকচাঁদ জো পাইয়া মূগধানা কঁাদোকঁাদে করিয়া বলিল, “হুজুর আমাকে চোর বললেন!”

—“বড্ড ভুল হয়ে গেছে মাণিক, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! আচ্ছা, আচ্ছা,—দাঁড়া!” বলিয়া, পকেটে হাত পুরিয়া জগৎবাবু তিনটি টাকা বাহির করিয়া, সশব্দে মেঝের উপরে ফেলিয়া দিলেন।

মাণিকচাঁদের প্রকৃতিে একটুও ধৈর্য হইল না যে, টাকা-তিনটি তাহারই বংশীষ! কেননা, এমন লাভ তাহার অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে;—ধমক, চড়্‌চাপড় এবং বংশীষ দিতে জগৎবাবুর মত সমান তৎপর লোক অল্প-কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ!

চশ্মাখানা ফের নাকের ডগায় নামাইয়া জগৎবাবু চিঠিখানা গুলিলেন। তাতে লেখা ছিল:—

“জগৎবাবু,

আপনার মজলের জন্তে এই পত্র লেখা হচ্ছে।

• আপনি যার হাতে কল্‌তা-সম্প্রদান করবেন, সেই জয়ন্তের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত কদর্যা; আপনার অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি,—অথচ, এক বাইজীর সঙ্গে তার বিশেষ মাথামাথি আছে। প্রায়ই সন্ধ্যার সময়ে সেই বাইজীর বাড়ীতে গিয়ে সে গানবাজনা করে’ থাকে। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে

আপনি এখন -- নঃ বোবাজার ষ্টেটে  
সেই বাইজীর বাড়ীতে গেলে জয়ন্তের  
দেখা পাবেন।”

পত্রে লেখকের নাম-ধাম কিছুট ছিল  
না।

জগৎবাবু পত্রখানা হাতে-করিয়া  
জড়ীভূতের মত বসিয়া রহিলেন।

এও কি সম্ভব? জয়ন্ত,—যার স্বভাবে,  
ভাবে-ভঙ্গীতে, কথায়-বার্তায় আকর্ষণীয়  
তিনি কোন খুৎ দেখিতে পান নাই,—সে  
কিনা—সে কিনা—আরে ডাং, এ হ’তেই  
পারে না!

জগৎবাবু আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন,  
“না, এ মিথ্যেকথা—ডাং মিথ্যে।”

কিন্তু পত্রের শেষে এ কী লেখা  
রাহিয়াছে? বোবাজার ষ্টেটে বাইজীর বাড়ীতে  
এখনি গেলে জয়ন্তের দেখা পাওয়া যাইবে!

জগৎবাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া আপন  
মনেই বলিলেন, “হ্যা, দাখা অম্মিন পেলেই  
হ’ল কিনা! ‘এ উড়ো-চিঠি নিশ্চয় কোন  
হিস্কুটে বদলোক পাঠিয়েছে!’—একটু  
ভাবিয়া আবার বলিলেন, “আচ্ছা, সত্যি  
হোক মিথ্যে হোক...একবার খোঁজ নিয়ে  
এলে মন্দ কি? মনের ভেতরে মিছে একটা  
খোঁকা রাখা কিছু নয়!”

জগৎবাবু চিঠিখানা আবার খামের ভিতরে  
পুুরিয়া হাঁকিলেন, “মাগকে!”

মাগকচাঁদ তখন চাকর-মহলে মেঝের  
উপরে পা-ছড়াইয়া বসিয়া কর্তার চশমা-চুরি  
ও তাহার বখশীষ-লাভের কাহিনীটা প্রাঞ্জল  
ভাষায় বর্ণনা করিতেছিল,—কর্তার ডাক  
শুনিয়া সাড়া দিল, “হজুর!”

...“মাগগির গাড়ী জুত্বে বল!”

—“আচ্ছা হজুর।”

জগৎবাবু মনের ভিতরে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস  
লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু  
গাড়ী বোবাজার ষ্টেটে পৌঁছিলে পর, সাঁহস  
যখন বাইজীর বাড়ীটা খুঁজিয়া বাহির  
করিল, তখন উপর হইতে গানের শব্দ  
পাইয়া জগৎবাবু গাড়ীর ভিতর হইতে  
মুখ বাহির করিয়া যাত্রা দেখিলেন, তাহা  
স্বপ্নাতীত!

ইলেকট্রিকের আলোকে রাস্তা হইতে  
দিতলের একটা ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত  
পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। সেখানে নারী-  
কণ্ঠে গান হইতেছে—এবং সেইসঙ্গে বাজনা  
ও পায়ের ঘুড়ুরের শব্দও শোনা যাইতেছে।  
আর, সেই ঘরেরই একটা জানালার কাছে  
বসিয়া আছে,—জয়ন্ত!

জগৎবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আবার চাহিয়া  
দেখিলেন,—হ্যা, ও মূর্তি জয়ন্তেরই!

তাহার চোখ যেন পুড়িয়া গেল,  
বিকৃতস্বরে হাঁকিয়া উঠিলেন, “এই! গাড়ী  
ঘুমাও!”

ঘোলা

হারমোনিয়ামের সামনে হন্দুলেখা  
মাসিকপত্রের স্বরলিপি দেখিয়া একটা গান  
অভ্যাস করিতেছিল, এমনসময়ে জগৎবাবু  
সজোরে ধাক্কা মারিয়া দুরজাটা খুলিয়া ঘরের  
মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

—“উঃ, অত জোরে কি দরজা খুলতে  
হয়, বাবা? একেবারে চমকে গিয়েছিলুম!”

—“তোরা বাজনা থামা ইন্দু!”

পিতার গলার স্বর শুনিয়া, বাজনা বন্ধ করিয়া ইন্দুলেখা অবাকমুখে চাহিয়া রহিল।

—“ওঃ, মানুষ এমন কপট হ’তে পারে—এতদিন আমি কোন সন্দেহ করত পারি-নি।”

—“কি হয়েছে বাবা?”

—“হবে আর কি, আমার মাথা আর মণ্ড! কি আশ্চর্য্য, তুমিয়ার লোক-চেনা দায়।”

—“হ্যাঁ বাবা, তুমি কার কথা বলছ?”

জগৎবাবু ঘরের ভিতরে এলমেল পায়ে ঘুরিতে-ঘুরিতে আপনমনেই বলিয়া যাঠিতে লাগিলেন, “হ্যাঁ, আমার ঘেয়েকে অবৈকটু হ’লেই পথে বসিয়েছিলুম ত! ভগবান ভারি বাচিয়ে দিয়েছেন।”

ইন্দুলেখার বুকটা কি-এক অশুভ আশঙ্কায় ঢপঢপ করিয়া উঠিল। কাতর স্বরে বলিল, “তোমার পায়ে পড়ি বাবা, বল-না, কি হয়েছে?”

জগৎবাবু হঠাৎ ইন্দুর সমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “জানিস ইন্দু, জয়ন্তের সঙ্গে তোরা বিবাহ হওয়া অসম্ভব।”

অসম্ভব! কেন,—কিছুই না-বুঝিয়া ইন্দু ফ্যালফ্যেলে চোখে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া চূপ করিয়া রহিল।

—“জানিস, জয়ন্ত খারাপ দ্বালোকের বাড়ীতে যায়,—সে দুষ্টরিজ।”

ইন্দুর প্রাণটা যেন দমিয়া বকের ভিতরে বসিয়া গেল—সে নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; ফস্-করিয়া বলিয়া ফেলিল, “না বাবা, না—এ মিছে কথা।”

—“মিথো কথা! তুই কি আমাকে মিথো-

বাদী বলিতে চাস্ ইন্দু? আমি যে এইমাত্র স্বচক্ষে দেখে এলাম!”

ইন্দুর মুখ মোমের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। এলাহিয়া একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া ন’ড়িয়া হাপাইতে-হাপাইতে সে বলিল, “তুমি দেখে এলে? তুমি?”

—“হ্যাঁ, আমি—আমি! জয়ন্ত দুষ্টরিজ—তার সঙ্গে তোরা বিবাহ? সে হয় না ইন্দু!”—এই বলিয়া জগৎবাবু ঘর ছাড়িয়া অস্থির পদে আবার বাহির হইয়া গেলেন।

শুক ও স্থির হইয়া ইন্দু সেটখানে বসিয়া রহিল।... ..

বহুদূরের ভিমিরে-লিপ্ত প্রাসাদ-শ্রেণীর উপরে অতি-দীর্ঘ বক্ররাঙা চন্দ্রলেখা কুটিয়া উঠিতেছিল। অস্পষ্ট আলোকে বাগানের উপর হঠতে অন্ধকারের পর্দা আস্তে-আস্তে সরিয়া যাইতেছে এবং ঘরের সামনেই একটা বকুলগাছ বাতাসে পূর্ণপূর্ণ কাঁপিয়া আকুলস্বরে মর্মমর্ম করিয়া উঠিতেছে।

চাকর আসিয়া খবর দিল “দিদিমণি, খাবার তৈরি হয়েছে।”

ইন্দু তাহার স্বরে চমকিয়া উঠিল; ধমক দিয়া বলিল, “কি চাস্ তুই?”

—“খাবার তৈরি হয়েছে।”

—“না, চলে যা এখন থেকে! আমি খাব না।”

চাকরটা অবাক হইয়া চলিয়া গেল।

ইন্দু তেমনি ভাবে অনেকক্ষণ ঠায় বসিয়া রহিল।... ..তারপর ধীরে-ধীরে উঠিয়া আগে দরজাটা ভিতর হঠতে বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিল। কিন্তু ঘর তবু অন্ধকার হইল না—বাহির হঠতে দরজা একটু

মেয়ের মত, হান্তময়ী জোৎস্না আসিয়া ঘরের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িল !

ইন্দু একে-একে সমস্ত জান্না ভেজাইয়া বাহিরের সমস্ত আলো-কে ঘর হইতে নির্বাসিত করিল। ঘরের বাহিরে শব্দময়ী, গীতিময়ী, দীপ্তিময়ী ধরণী ; ঘরের ভিতরে স্তম্ভ নিস্তব্ধ, নিবিড়, নিরঙ্কুশ অন্ধকার ! .. ...

সে অন্ধকার তাহার দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত এবং চোখের জলে সিক্ত হইয়া উঠিল

\* \* \* \*

ইন্দুর কাছ হইতে চলিয়া আসিয়া জগৎবাবু বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকিলেন। সেখানে তখন অনেক লোকজন আসিয়া জমিয়াছে। ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের গোল টেবিলের চারিদিকে বসিয়া জনচারেক ভদ্রলোক ‘ব্রিজ’ খেলায় অত্যন্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন ; আর-এক কোণে কৈলাসবাবুর সামনে বসিয়া অবনী দাবার ছকের উপরে বিভোরভাবে কুঁকিয়া পড়িয়াছে।

জগৎবাবুকে দেখিয়া কৈলাসবাবু বলিলেন, “এই যে! এতক্ষণ ছিলেন কোথায়?”

—“বাড়ীর ভেতরে”—এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া জগৎবাবু একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িলেন। ঘরের ভিতরে সবাই তখন খেলায় তন্ময় হইয়া আছে,—তাই জগৎবাবুর মুখের অস্বাভাবিক ভাব কাহারো নজরে ঠেকিল না।

মানিক আসিয়া আলবোলের মাধ্যম কলকে চড়াইয়া দিয়া গেল।

জগৎবাবু চিন্তিতমুখে মাঝে-মাঝে তামাকে এক-একটি টান দিতে লাগিলেন।

এমনসময় জয়ন্ত<sup>\*</sup> ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল।

জগৎবাবু এতক্ষণ তাহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন,—জয়ন্তকে দেখিয়াই তিনি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

নমস্কার করিয়াই জয়ন্ত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল ; কিন্তু জগৎবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, “দাঁড়াও জয়ন্ত!”

যাইতে-যাইতে জয়ন্ত আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

জগৎবাবু তেমনি স্বরে বলিলেন, “জ্ঞাথ জয়ন্ত, ভবিষ্যতে তুমি আমার অন্তঃপুরে না-গেলে আমি সুখী হব!”

দ্রু-সঙ্কোচ করিয়া জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বলিল, “কি বলছেন!”

—“ভবিষ্যতে তুমি আমার অন্তঃপুরে আর না-ঢুকলেই আমি সুখী হব!”

—“আপনি এইকথা বলছেন!”

—“হাঁ, আমার অন্তঃপুরে দুশ্চরিত্রের প্রবেশ নিষেধ।”

জয়ন্তের মুখ পাণ্ডাশ হইয়া গেল। জগৎবাবু কি তাহা হইলে—

—“তুমি যে এত অসং আমি তা জানতুম না। ছিঃ, ছিঃ, যাকে আমি সরল প্রাণে অনায়াসে আমার অন্তঃপুরে ঢুকতে দিগেছি, সে কিনা অভদ্র ইতর স্ত্রীলোকের বাড়ীতে গিয়ে—”

বাধা দিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে জয়ন্ত বলিল, “দেখুন জগৎবাবু, এ-সব কথা আপনি আমাকে পোপনে বলতে পারতেন।”

—“তাতে আবশ্যক? আমি ইচ্ছে করেই সকলের সামনে এই কথা তুলেছি।

লুকাচুরিকে আমি স্মৃণা করি। দশজনের সামনে আমি তোমার মুখোঁস খুলে দিতে চাই। আজ থেকে তুমি আমার সদর মহলে আর পাঁচজনের মতই আসতে-যেতে পার—তাতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু আমার বাড়ীর ভেতরে আর তুমি যেতে পারবে না।”

ঘরের ভিতরে ততক্ষণে সকলের খেলা-ধুলো সব ঘুরিয়া গিয়াছে—লোকগুলির মুখ দেখিলে মনে হয়, এরা-সবাই যেন অকাশ হইতে সম্ভ-সম্ভ খসিয়া পড়িয়াছে।

বিশেষ-করিয়া দেখিবার মত হইয়াছিল, অবনীর মুখ! বিস্ময়, ঘৃণা ও আনন্দ প্রভৃতি নানা ভাবের আভাসে তাহার মুখখানা এমনি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে মুখ অনায়াসে একজন ভালো চিত্রকরের চিত্রাদর্শ হইতে পারিত।

জয়ন্ত একবার সকলকার মুখের উপরে কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “জগৎ-বাবু, অকারণে আমাকে অপমান করবেন না, আগে আমার কথা শুনুন—”

—“অকারণে! তুমি কি বলতে চাও অকারণে আমি তোমাকে এ-সব কথা বলছি?”

—“নিশ্চয়। আমি নিন্দোষ।”

—“কী! তুমি এতবড় মিথ্যাবাদী! জানো, আমি শুক্রে তোমাকে কুস্থানে দেখে এসেছি?”

—“তা দেখতে পছন্দন। কিন্তু, আমি সেখানে গিয়ে থাকলেও—”

—“ধাক্, যথেষ্ট হয়েছে—আর আমি কোন কথা শুনে চাই না।”

—“জগৎবাবু!—”

—“চুপ্। তোমার কপটতা অসহ্য। আমার ধৈর্যের সীমা আছে।”

জয়ন্ত একটা নিখাস ফেলিয়া বলিল, “বেশ, আমি চলুম। কিন্তু যে অপমান আজ আমাকে করলেন তার জন্তে পরে আপনাকে অশ্রুতাপ করতে হবে। আমি নিন্দোষ।”—বলিতে-বলিতে জয়ন্তের চোখের পাতা জলে ভিজিয়া আসিল; কিন্তু তাড়াড়াড়ি আপনাকে সামলাইয়া সে চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতরে সকলে তখনো হাঁ-করিয়া নিকরাক হইয়া বসিয়া আছে।

সকলের আগে অবনী মুখ খুলিয়া বলিল, “কি আশ্চর্য্য, জয়ন্তবাবুর চরিত্র এত খারাপ!”

জগৎবাবু আলবোলায় নলটা আবার তুলিয়া লইয়া তিস্ত-বিরক্ত স্বরে বলিলেন, “ধাক্, ও আলোচনার আর কাজ নেই, অত্র কথা বলুন।”

অবনী আর-কিছু না-বলিয়া একটুখানি টোটি-টেপা হাসি হাসিয়া, আবার দাবার ছকের উপরে হেঁট্ হইল;—জয়ন্তের অপমানে তাহার মত খুঁসি আজ এখানে আর কেউ হয় নাই!

### সতেরো

এমেল পায় জগৎবাবুর বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া জয়ন্ত যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, রাগে হুঃখে অপমানে তখন তাহার আর হৃৎ-দীর্ঘ জ্ঞান ছিল না। দিশেগারার মত সামনে সে যে রাস্তা পাইল সেইদিকেই আপনমনে চলিয়া গেল। এমনি ভাবে অনেকক্ষণ সে এ-পথে সে-পথে ঘুরিতে



লাগিল ;—কতবার লোকের গায়ের উপরে পড়িয়া যা-তা গালাগালি খাইল, একবার এক-খানা গাড়ীর স্রুমুখে গিয়া পড়াতে গাড়োয়ান ছিপ্টি মারিয়া তাহার গণ্ড ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল—জয়ন্ত আজ কিন্তু কিছুতেই উচ্চবাচ্য করিতেছে না। তাহার বুদ্ধি এং অমুভব-শক্তি আজ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

গভীর নিশীথে গীর্জার ঘড়ীটা আচম্কা যেন একটা প্রঃস্থপ দেখিয়া আর্ন্তনাদ করিয়া উঠিল! পথে তখন লোকজন নাই বলিলেও হয়; কেবল একটা মাতাল গ্যাস্পোটে ঠাসান্ দিয়া কোনমতে খাড়া হইয়া নেপার ঘোরে আপনমনে বিম্বাইতেছিল; হঠাৎ গাড়ীর শব্দে চমকাইয়া বিড়বিড় করিয়া জড়াইয়া-জড়াইয়া বলিল, “এই, চাঁচাস্ নে— চাঁচাস্ নে, অনেক কষ্টের নেশা বাবা, এক্ষুনি চট-করে’ চটে যাবে!”—বলিতে বলিতে গ্যাস্পোষ্ট ধরিয়া রাস্তার উপরেই সটান লম্বা হইয়া পড়িল।

তখন জয়ন্তের খেয়াল হইল। বুঝিল, অনেক রাত হইয়া গিয়াছে, ভজহরি এখনো তাহার জন্ত জাগিয়া বসিয়া আছে। এমন ভাবে পাগলের মত পথেপথে ঘুরিয়া মরিয়া লাভ কি?... তাড়াতাড়ি ফিরিয়া সে জ্বাবার বাড়ীমুখে হইল।

জয়ন্ত বুঝিতে পারিল, তাহার বিরুদ্ধে একটা মন্ত চক্রান্ত হইয়াছে। নইলে স্বর্ণেন্দু আজ খাম্কা তাহাকে বাইজীর বাড়ীতে লইয়া যাইবেই-বা কেন, আর তাহার সেখানে যাওয়ার খবর জগৎবাবুই-বা এত-শীঘ্র টের পাইবেন কি-করিয়া?... কিন্তু স্বর্ণেন্দুর এতে স্বার্থ কি? আরো-খানিক ভাবিয়া জয়ন্ত

আন্দাজ করিল, এর-মধ্যে অবনীরও হাত আছে; অবনী ইন্দুকে বিবাহ করিতে চায়, সে-ই তার পথের কাঁটা হইয়াছে; তাই অবনী তাহার বন্ধু স্বর্ণেন্দুর সাহায্যে আজ তাহাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে! জয়ন্ত যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার সন্দেহ ততই দৃঢ় হইয়া উঠিল; ইহা, আজকের ব্যাপারের মূলে আছে, ঐ অবনী!... ..

সারারাত অনিদ্রায় কাটাইয়া, খুব ভোরবেলায় জয়ন্ত যখন বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, ধরণীর মুখ হঠাতে তখনো কালো ছায়ার ঘোমটা খসিয়া পড়ে নাই। পূর্ব-তোরণে প্রাতঃসন্ধ্যার আরতি-প্রদীপে তখন আলোর ক্ষীণ শিখাটি সবেমাত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং নীলগগনের ছেঁড়া মেঘের ভাঙা আসরে চিরমৌন শুকতারটি করুণ নয়ন মেলিয়া পৃথিবীর পানে চাহিয়া আছে।

জয়ন্ত আপনমনে ভাবিতে-ভাবিতে বারান্দায় পায়েচারি করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া ভোঁয়ের হাওয়ায় তাহার চিন্তাক্রান্ত প্রাণ অনেকটা শান্ত হইল। আন্তেআন্তে সে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছিল—কিন্তু হঠাৎ জগৎবাবুর বাড়ীর বাগানের দিকে চোখ পড়িতেই সে আবার দাঁড়াইয়া পড়িল।

হাসনানাহানার সবুজ বোঁণের পাশে, ঠিক একটা প্রতিমূর্তির মত স্থির হইয়া ইন্দু একলাটি দাঁড়াইয়া আছে।

ডুবডুব লোক ধেমন-করিয়া দূরের নৌকার দিকে তাকাইয়া থাকে, তেমনি করিয়া জয়ন্তও ইন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ইন্দুও নিশ্চয় পিতার মুখে সমস্ত

ভুনিয়াছে—আজ তাহার হৃদয়ে হয়ত তার আর একটুও ঠাঁও নাই—তাহার চোখে সে এখন নিষ্ঠুর প্রতারক বৈ অতৃপ্ত নয়! জয়ন্তের মনটা হা-হা করিয়া উঠিল।

তারপরেই সে ভাবিল, ‘আচ্ছা, মিথ্যা একলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবন্তে শাস্তিস্থল থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকব কেন? ইন্দু ত জানেনা, চক্রীর চক্রান্তে পড়ে আজ আমার এই বদনাম! তার কাছে যদি সমস্ত খুলে বলি, সে কি আমার কথায় বিশ্বাস করবে না? আমি কি তার চোখে এতটা নীচু হয়ে পড়েছি?’... ..

আরো-খানিক ভাবিয়া জয়ন্ত স্থির করিল, সে এখনি ইন্দুর কাছে গিয়া তাহার ভুল ভাঙিয়া দিয়া আসিবে! ইন্দু বিশ্বাস করুক না-করুক, সে পরের কথা।

জয়ন্ত তখনি নীচে নামিয়া গেল।

বাগানের ফটক তত-সকালে খোলা ছিল না। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া জয়ন্ত দেখিল, ইন্দু তখনো ঠিক সেইখানটিতে তেঁমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে।

কম্পিত, সঙ্কুচিত স্বরে জয়ন্ত ডাকিল, “ইন্দু!”

ইন্দু চমকিয়া পিছন ফিরিল। জয়ন্তকে এ-সময়ে এখানে দেখিবার জ্ঞান সে প্রস্তুত ছিল না; সমস্ত ভুলিয়া ঠিক আগেকার মতই হাসিমুখে তাড়াতাড়ি তাহাকে কি বলিতে গিয়াই সে জ্বাঝর খামিয়া পড়িল। —গেল কালেক্টর সেই ব্যাপারটার কথা মনে হওয়াতে তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! অড়সড় হইয়া চুপ-করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়ন্ত বলিল, “ইন্দু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ফটকটা একবার খুলে দেবে?”

ইন্দু কি যে কানবে, বুঝিতে পারিল না। সে জানিত জয়ন্তের সঙ্গে মেলামেশা করিলে তাহার পিতা রাগ কাববেন; অথচ জয়ন্ত হে চোখের স্রুমুখে তাহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইবে, এও ত সে প্রাণ দিয়া সহিতে পারিবে না!

ইন্দুর হতস্রুত দেখিয়া জয়ন্ত সমস্ত বাকিল। আভ্যমানে তাহার মনটা ফুলিয়া উঠিল—আক্ষেপভরে বলিল, “থাক ইন্দু, থাক থাক, আর আমার বলবার কিছু নেই—শ্রোতের শেওলার মত তোমাদের কাছে আমি ভেসে বসেছিলাম—আবার ভেসেই চলে যাব—আমি তোমাদের কোণাকার কে!”

মনের হুঃখ মনেই চাপিয়া মিনতির স্বরে ইন্দু বলিল, “জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু!”

জয়ন্ত তাহার কথায় কাণ না-দিয়াহ বলিল, “তোমার বাবা আমার ওপরে অবিচার করেছেন আর তুমিও আমার কি বলবার আছে তা না শুনেই কুকুর-বড়ালের মত আমাকে—”

গভীর যাতনার ইন্দুর বুক যেন ফাটিয়া যাইবার মত হইল। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, “খামুন জয়ন্তবাবু, খামুন! এমন কথা আর বলবেন না, আপনি ভিতরে আসুন—আমি ফটক খুলে দিচ্ছি!”

ইন্দু আগাইয়া গিয়া ফটকের অর্গল খুলিয়া দিল।

ফটক ঠেলিয়া জয়ন্ত ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছে, সহসা উপর হইতে ফুৎ—তিরকারের স্বর আসিল—“ইন্দু!”

সচমকে দুজনেই উপরে চাফিয়া দেখিল, বারান্দার রেলিং ধরিয়া জগৎবাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

আকাশের মেঘের উপরে তখন প্রদীপ্ত আলোক-পদ্মের মত সূর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু ইন্দু চারিদিকে চাহিয়া দেখিল স্তম্ভ অন্ধকার আর অন্ধকার! নতমুখে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

জগৎবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, “জয়ন্ত, তুমি আর যাঁই হও—আমি তোমাকে অন্তত ভদ্রলোক বলেও জানতুম!”

জয়ন্ত আর দাঁড়াইল না—কালকের অপমানের উপরে আবার এই নতুন অপমানে পাগলের মত হইয়া, দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল।

... ..

জয়ন্ত যখন নিজের বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল, তখন তাহার দেহের রক্ত ফুটন্ত তেলের মত তপ্ত হইয়া সর্বাঙ্গ ঘেন পড়াইয়া দিতেছে।

অবশ হইয়া বিছানার উপরে গুইয়া পড়িয়া, দুইচোখ বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ সে চুপচাপ রহিল—চাপা আবেগের নিশ্বাসে বুকখানা তাহার ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

খানিক পরে হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া, দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রুদ্ধ আক্রোশের স্বরে বলিল, “না—এমন চুপ করে’ থাকা চলবে না—আমি এখনি আবার জগৎবাবুর কাছে যাব—তাঁর মেয়ের সঙ্গে তিনি আমার বিবাহ দিন আর না-দিন—আমি তাঁকে

যেমন করে’ পারি ‘প্রিয়’ে দেবচঁ দেব, যে আমি কোন দোষে দোষী নই!”

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া দেখিল, বুকখানা টেলিগ্রামের লেপাফা হাতে করিয়া ভজহরি উপরে উঠিতেছে।

সামুনেই বাধা পাইয়া জয়ন্তের মনটা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ভজহরি বলিল, “খোকন, তোর নামে একটা তার এসেচে রে!”

—“টেলিগ্রাম! কোথেকে?”

—“আমি ত আর তোর মতন অ্যাংরেজি পড়া পণ্ডিত নই, তাহলে আর ভাবনা কি ছিল! এই নে,—পড়!”

ভজহরি টেলিগ্রামখানা জয়ন্তের হাতে অর্পণ করিল।

জয়ন্ত কম্পিত ভীত হস্তে টেলিগ্রামের মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল—কেননা, বাঙালীর সংসারে তারবার্তায় ভালো খবর পাওয়া যায় খুব কম।

টেলিগ্রামে স্তম্ভ লেখা ছিল—

“অন্নপূর্ণা মৃত।”

—“মাগো!”—বলিয়া জয়ন্ত সেইখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মন হইতে সমস্ত অপমানের কথা, জগৎবাবু ও ইন্দুর কথা চেউএর টানে খড়-কুটোর মত কোথায় ভাসিয়া গেল।

ভজহরি খবর শুনিবার জন্ত উন্মুখ হইয়া ছিল—জয়ন্তের ভাব দেখিয়া তাহার বুক উড়িয়া গেল। খানিকক্ষণ ভাষাচ্যাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে সে

বলিল, “অ বোকন, ‘অমন করে’ উঠলি ক্যানো, কি হয়েছে, বল্ ভাই, বল্ !”

জয়ন্ত ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, “ওরে ভজা, মা আর নেইরে !”

—“আঁ, মা-ঠাকুরোণ ? মা-ঠাকুরোণ নেই ?”—ভজহারি স্তম্ভিত হইয়া গেল !

শৈশবে, বালো, যৌবনে অল্পপূর্ণ্যকে কত মুহুর্তেই জয়ন্ত দেখিয়াছে, তাঁহার মেতে যত্নে প্রেমে হৃদয় তাহার কানায়-কানায় ধরিয়া আছে—সেই-সব তাহার চোখের সমুখে এক-লহরায় যেন আকার ধরিয়া বিড়াতের মত খেলিয়া গেল। অল্পপূর্ণ্য মখে তাহাকে যতই কড়া কথা বলিয়া থাকুন, তবু সে জানে তিনি তাহারই করুণাময়ী জননী—তিনি বিমাতা নন—তাঁহার পায়ে বাধা লাগিবার ভয়ে তিনি আপন বুক পাতিয়া দিতে পারিতেন, হাসিমুখে অবহেলায় ! নিজের ছেলেকে ত সকল মা ভালোবাসেন, কিন্তু পরের ছেলেকে এমন নিজের মত ভালোবাসিতে আর কোন্ মা পারেন ? এই মাকে সে কিনা বিমাতা বলিয়া গালি দিয়াছে ! হয়ত সে কথা শানিত অস্ত্রের মত তাঁহার বৃকে গিয়া বিধিয়াছিল, হয়ত সে আঘাত সহিতে না-পারিয়াই তিনি আজ তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন !

কুঁপাইতে-কুঁপাইতে জয়ন্ত বলিয়া উঠিল, “ভজা, আমার জন্মেই মা গেলেন, আমি মাতৃহস্তা রে, মাতৃহস্তা !”—বলিয়া, সে নিজের কপালে সজোরে করাঘাত করিল।

ভজহারি সান্ধচোখে জয়ন্তের হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, “এখন আর ও-সব কথা ভেবে মন পারাপ করিস্ নে রে, মারুতে কেউ কাঁকে পারে না—ভাঙ, কপাল ছাড়া পথ নেই !”

• জয়ন্ত উদাস ভাবে দেয়ালের দিকে চাতিয়া বসিয়া রহিল।

ভজহারি বলিল, “বোকন, এখন যে দেশে যেতে হবে ভাই, কখন গাড়ী আছে জানিস্ ?”

—“দেশে ফির্তে মন আর সন্নে না ভজা ! কোথায় যাব, কার কাছে যাব, কে আর আমাকে আগ্-বাড়িয়ে নিয়ে যাবে ?”

—“তা বললে ত চলবে না ভাই ! মা-ঠাকুরোণের শ্রাদ্ধ যে এখনো হয়-নি, গোরী দিদি ছেলেমাছুষ—সে যে সেখানে একলাটি চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, তাকে দেখ্বে কে, তার ভার যে এখন তোর ওপরেই !”

গোরীর মুখ মনে করিয়া জয়ন্তের শ্রোণ শিহরিয়া উঠিল—গোরী, গোরী ! তার সামনে গিয়া সে কেমন করিয়া কোন্ মুখে দাঁড়াইবে !... ..

কিন্তু যাচাতেই হইবে ! এ যে কর্তব্য !

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘরের দেয়ালে পিঠ রাখিয়া, অল্পপূর্ণ্য মুখ ভাবিতে-ভাবিতে চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

ক্রমশ

শ্রীকৃষ্ণকুমার রায়

## বাংলার ব্রত

আমাদের দেশে ছ'রকমের ব্রত চলিত রয়েছে দেখা যায়। কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত, আর-কতকগুলি শাস্ত্রে থাকে বলছে বোধিত প্রচলিত বা মেয়েলী ব্রত। এই মেয়েলী ব্রতেরও দুটো ভাগ; এক প্রস্থ ব্রত কুমারী-ব্রত—পাঁচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা এগুলি করে, আর বাকিগুলি নারী-ব্রত, বড় মেয়েরা বিয়ের পর থেকে এগুলি করতে আরম্ভ করে। এই শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রত যেগুলি হিন্দুধর্মের সঙ্গে এদেশে প্রচার লাভ করেছে, এবং দুই-থাকে বিভক্ত এই মেয়েলী ব্রত যার অনুষ্ঠানগুলি খুঁটিয়ে দেখলে পুরাণেরও পুর্নেকার বলে বোধ হয় এবং যার মধ্যে হিন্দু-পুর্ন এবং হিন্দু এই দুই ধর্মের একটা আদান-প্রদানের ইতিহাস পড়তে পারি, এই দুই প্রস্থ ব্রতের গঠনের ভিন্নতা বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। শাস্ত্রীয় ব্রত, নারী-ব্রত এবং কুমারী-ব্রত, ব্রতকে এই তিনভাগে রেখে প্রত্যেকটির গঠন কেমন দেখা যাক। কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বর্গি ব্রত।

**শাস্ত্রীয় ব্রত**—প্রথমে সামান্যকাণ্ড—যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন, কস্মীরন্ত, সঙ্কর, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্যশোধন, শাস্তিমন্ত্রঃ, সামান্যার্ঘ, আসনগুচ্ছ, ভূতগুচ্ছ, মাতৃকা-বাগাদি এবং বিশেষার্ঘস্থাপন। এর পরে ভূজি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা

দিয়া কথা-শ্রবণ বা রোচনার্থে ফলশ্রুতি, ব্রতে যাতে রুচি জন্মায় সেজন্ত ব্রতকথা শোনা। সামান্যকাণ্ড এবং ব্রতকথা এই দুই চ'ল পৌরাণিক ব্রতের উপাদান।

**নারীব্রত**—শাস্ত্রীয় ব্রতের অনেকখানি এবং খাটি মেয়েলী-ব্রতেরও কতকটা মিলিয়ে এগুলি। এইগুলি শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় দুই অনুষ্ঠানের যুগলমুষ্টি বলা যেতে পারে। বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সম্ভবতা অনেকখানি চলে গিয়ে এবং লৌকিক ব্রতের সরলতাও প্রায় নষ্ট হয়ে পূজারী ব্রাহ্মণ এবং সামান্য কাণ্ডের জটিল অনুষ্ঠান-ভাস-মুদ্রা-তন্ত্র-মন্ত্রই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

**কুমারীব্রত**—এই ব্রতগুলিই অনেকখানি খাটি অবস্থায় পাওয়া যায়, এদের গঠন এইরূপ—আহরণ যেমন, ব্রত করতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা, আচরণ যেমন, কামনার প্রতিচ্ছবি, আল্পনা দেওয়া, পুকুর-কাটা ইত্যাদি এবং কামনা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতিতে ফুল ধরা, শেষে যদি কোনো ব্রতকথা থাকে তো সেটা শোনা, নয়তো ফুল ধরেই শেষ-কামনা জানিয়ে ব্রত সাক্ষ। পূজারী এবং তন্ত্র-মন্ত্রের জাংগাই এখানে নেই।

লোকের মধ্যে হিন্দুধর্মের জটিল অনুষ্ঠান এবং নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ও পুরাণকে ব্রতের ছাঁচ দিয়ে

রচনা করা হয়েছে। বৈশ্ব বোঝা যায় হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ হিন্দুত্বমাল্য-বিধান চিনির ডেলার আকারে যেন কুইনাইনপিল! খাটি পুরাণগুলির ইতিহাস-হিসাবে একটা দাঁম আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি না পুরাতন আচার-ব্যবহারের চর্চার বেলায় না লোক-সাহিত্য বা লৌকিক ধর্মোচরণের অনুসন্ধানের সময় কাজে লাগে। লোকের সঙ্গে এই ব্রতগুলির খুব কম যোগ, লোকের চেষ্টা লোকের চিন্তার ছাপ এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি মোটেই নয়। চাঁচটা এদের ব্রতের মতো তলেও জোড়া-তাড়া দেওয়া কৃত্রিম পদার্থে যে জড়তা সেটা এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির সমস্তটার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যজু এবং সাম বেদের অনেক মন্ত্র ও অনুষ্ঠান এই ব্রত-গুলিতে থাকলেও বৈদিক ক্রিয়ার সঙ্গে এগুলির কলের পুতুলে আর জীবন্ত মানুষের মত প্রভেদ, শুধু তাই নয়—যে লৌকিক ব্রতের ছদ্মবেশে এগুলিকে সাজানো হয়েছে সেই খাটি মেয়েলী-ব্রতগুলির সঙ্গেও এদের ঐ একই রকম প্রভেদ। খাটি মেয়েলী ব্রতগুলিতে তার ছড়ায় এবং আল্পনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের স্ক্রুগুলিতেও সমগ্র আখ্যাত্তির একটা চিন্তা, তার উজ্জ্বল উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি। এ হৃয়েরই মধ্যে লোকের আশা আশঙ্কা চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং হৃয়ের মধ্যে এইজন্তে বেশ-একটা মিল দেখা যাচ্ছে। নদী সূর্য্য এমনি অনেক বৈদিক দেবতা, মেয়েলী-ব্রতেও দেখি এঁদেরই

উদ্দেশ্যে ছড়া বলা হচ্ছে। বৈদিক যুগে ঋষিরা উষাকে এবং সূর্য্যের উদয়কে আবাধন কচ্ছেন—

(উষাদেবতা। ঋগ্বেদপুত্র কুংস ঋষি ॥)

“সূর্য্যের মাতা শুভবর্ণা দাম্প্রমতী উষা আসিয়াছেন!”

(সূর্য্যাদেবতা। কথপুত্র প্রহ্লাদ ঋষি ॥)

“তাহার অধগণ তাহাকে সমস্ত জগতের উর্দ্ধে বহন করিতেছে।”

আবার নদী-সকলকে উদ্দেশ্য করে—  
“কোনো কোনো জল একত্রে মিলিত হয়, অন্ত জল তাহাদের সহিত মিলিত তহ্মা সমুদ্রের বাড়বানলকে প্রাণিত করে।”

এর পরে যেগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত বলে মেয়েদের মধ্যে চলেছে তার একটি সূর্য্যস্তব—

“নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কাবণ,  
ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎ-কারণ  
ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তুমি পায়,  
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করেন প্রভু দেবরায় ॥”

বৈদিক সূর্য্য আর শাস্ত্রীয় ব্রতের সূর্য্য—  
জুয়ে তফাৎ যে কতটা তা দেখতে পাচ্ছি। এইবার খাটি মেয়েলী-ব্রতের ছড়াতে সূর্য্যকে উষাকে এবং নন্দনদীকে কি ভাবে লোকে বর্ণন করছে দেখি—

(নদী থেকে জল-তোলবার মন্ত্র বা ছড়া।)

“এ নদী সে নদী একখানে মুখ  
ভাঙ্গলী-ঠাকুরাণী বুঢ়াবেন দখ”  
“এ নদী সে নদী একখানে মুখ  
দিবেন ভাঙ্গলী তিনকুণে সুখ ॥”

(সমুদ্রে ফুল-ধরবার মন্ত্র বা ছড়া।)

“পাত সমুদ্রে বাতাস খেলে,  
কোন সমুদ্রে ঢেউ তুলে?”

( সন্ধ্যার কুয়াশা-ভাঙার মজ্জা । )

“কুয়া ভাস্কর, কুয়া ভাস্কর বেথলার আগে—  
সকল কুয়া গেল ওই বরই গাছটির আগে”

( উষা ও সূর্য্যোদয়ের ছড়া । )

“উরু উরু দেখা যায় বড় বড় বাড়ি

ঐ যে দেখা যায় সূর্য্যোর মার বাড়ি !

সূর্য্যোর মা লো ! কি কর ছুয়ারে বসিয়া !

তোমার সূর্য্য আসতেছেন

ঘোড় ঘোড়ার চাপিয়া ।”

তারপর বসন্তের কত্কা চন্দ্রকলার সঙ্গে  
সূর্য্যোর প্রেমের একটুখানি রূপক যেমন—  
“চন্দ্রকলা মাধবের কত্কা মেলিয়া দিছেন কেশ,  
তাই দেখিয়া সূর্য্য ঠাকুর ফিরেন নানা দেশ ।  
চন্দ্রকলা মাধবের কত্কা মেলিয়া দিছেন সাদি,  
তাই দেখিয়া সূর্য্য ঠাকুর ফিরেন বাড়ি বাড়ি ।  
চন্দ্রকলা মাধবের কত্কা গোল-খাড়ুয়া পায়,  
তাই দেখিয়া সূর্য্য ঠাকুর বিয়া করিতে চায় ।”

বেদের সূক্ত সাধু ভাষায় তর্জমা করা  
হয়েছে আর ছড়ার ভাষা চলিত বাংলা,  
সেইজন্মে একটা শোনাচ্ছে গম্ভীর, আর  
একটা শোনাচ্ছে ছেলেমানুষি রকম, কিন্তু  
যদি ইংরিজি ভাষায় তর্জমা করা যায় তবে  
যেয়েলী ছড়া আর বৈদিক সূক্ত দুইই প্রায়  
একই জিনিষ বোধ হবে ।

“Young Moon, daughter of  
Spring has united her tresses, and  
the Sun goes seeking her through  
many lands. Spring's daughter  
the Young Moon has unfolded her  
silver robe and the Sun peeps into  
many houses seeking her. The  
slender Moon the Spring's lovely

maiden is wearing the silver  
anklet, seeing which the Sun seeks  
her union in marriage.”

কিন্তু তাই বলে পুরাণ ভেঙে যেমন  
শাস্ত্রীয় ব্রত তেমনই বেদ ভেঙে এই মেয়েলী  
ব্রতগুলির সৃষ্টি হয়েছে একথা একেবারেই  
বলা যায়না । কেননা সমস্ত প্রাচীন জাতির  
ইতিহাসেই দেখা যায় আদিম মানুষের মধ্যে  
বায়ু সূর্য্য চন্দ্র এঁরা উপাসিত হচ্চেন  
ভারতবর্ষে ইজিপ্তে মেক্সিকোতে ! সূর্য্যরং  
বাংলার ব্রতের ছড়াগুলি বাঙালীর ঘরের  
জিনিষ বলে ধরা যেতে পারে, এটা আরো  
পরিষ্কার হয়ে উঠবে ব্রতগুলির সম্পূর্ণ  
চেহারাটি আমরা যখন দেখবো । একদিকে  
ভারতে প্রবাসী আৰ্য্যাদের অনুষ্ঠান, আর-এক-  
দিকে ভারতের নিবাসীদের ব্রত, একদল  
তপোবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন আর  
একদল নদীমাতৃক পাণ্ডুরামের নিভৃত  
নীড়ে বসতি করছেন ! এই প্রবাসী এবং  
নিবাসী দুই দলের মধ্যে রয়েছে হিন্দুজাতি,  
যারা বেদের দেবতাদের দেখছে বিরাট সব  
মুষ্টিতে এবং তারি বিরাট অনুষ্ঠানের ভার  
চাপাতে চাচ্ছে আদিম যারা তাদের মনের  
উপরে, কর্মের উপরে, তাদের সমস্ত চেষ্টা  
ও চিন্তার স্বাধীনতা ও সৃষ্টি সবলে নিষ্পেষিত  
করে দিয়ে, বেদ, পুরাণ এবং পুরাণের  
চেয়েও যা পুরোনো এই সব লৌকিক ব্রত-  
অনুষ্ঠান, এদের ইতিহাস এইটেই প্রমাণ  
করছে—দুইদিকে ছোটো বড় জাতির প্রাণের  
কথা, মাঝে একটি দল-বিশেষের স্বপ্ন !

আর্য্য এবং আর্য্য-পূর্ব্ব দুজনেরই সম্পর্ক  
যে পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে,

এবং তুলনায়ই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বন্ধ, ধন ধান সৌভাগ্য স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন-সব পার্থিব জিনিষ; তজ্জনে ব্রত করেছে যা কামনা করে' সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে, কেবল পুরুষের চাওয়া আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত-অনুষ্ঠান মেয়েদের এই যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন—ইন্দ্র আমাদের সতায় ছোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক ইত্যাদি; আর বাঙালীর মেয়েরা চাইছে—‘রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সূয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।’ এর সঙ্গে পৃথিবী-ব্রতের শাস্ত্রীয় প্রণাম-মন্ত্রটি দেখি—

‘বসুমাতা দেবী গো! করি নমস্কার।

পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।’

এই যে পৃথিবীর যাকিছু তার উপরে ঘোর বিভীষিকা এবং ‘গোক’লে গোকুলে বাস গরুর মুখে দিয়ে ঘাস আমার যেন হয় স্বর্গে বাস’ এই অস্বাভাবিক প্রার্থনা ও স্বপ্ন, এটা বেদেরও নয় ব্রতেরও নয়। বৈদিক সূক্তগুলি আর ব্রতের ছড়াগুলিকে আমাদের রূপকথার বিহঙ্গম বিহঙ্গমা দুটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তজ্জনেই পৃথিবীর, কিন্তু বেদসূক্তগুলি ছাড়া ও স্বাদীন, বনের সবুজের উপরে নীল আকাশের গান, উদার পৃথিবীর গান, আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে, ঘন-সবুজের আড়ালে পক্ষিমাতার মধুর কাকলী—কিন্তু তই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা!

বাঁটি ব্রতের অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া এবং শাস্ত্রীয় ব্রত-অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া, দুয়ের মূলত:

যে ভিন্নতা রয়েছে সেইটে পরিষ্কার ধরবার চেষ্টা করলে দেখবো যে, শাস্ত্রীয় ব্রতে প্রায় সকলগুলিতে যে-কামনা করেই ব্রত হোক না, কামনা চরিতার্থ করবার উপায় বা অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া অনেকটা একই, যেমন—অজলকীদাদশী ব্রত, প্রথম অস্তিবাচনপুষ্পক “ও সূর্যাসোমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকর করিবে—ও আত্মেতানি মাঘে মাসি শুক্রেপক্ষে দ্বাদশ্রাশ্রুণৌ অমুকগোত্রো হ্রীঃমুকী দেবী ( বা শূদ্র হ’লে দাসী ) পুত্র-পৌত্রাদানবজ্রিয় সন্ততি ধনধাত্তসৌভাগ্যাди পাপান্তে বিষ্ণুলোকগমনকামা অস্ত্রাভা একবষ পয়াম্তঃ পাত্মমাসীয় ব্রহ্মদ্বাদশ্রাঃ গণপত্যাদি দেবতাপূজাপুষ্পক বা মলমলক বিষ্ণুপূজামলকীব্রতভোজাদানপুষ্পকং ব্রহ্ম-পুরাণোক্ত বিধিমানলকীদাদশীব্রত মতঃ করিযো—পরে সামান্তার্য্য আসনশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি সামান্তকাণ্ডের পুরো অনুষ্ঠান করে ব্রতকথা শ্রবণ,—মোটামুটি সব ব্রতেরই এত প্রক্রিয়া! পুত্রপৌত্র ধনধাত্ত কামনা, তারও চরিতার্থতার যে মন্ত্র যে ক্রিয়া, অতঃকিছু কামনা করেও সেই-সব মন্ত্র, সেই-সব ক্রিয়া; কেবল কোনটা ব্রহ্মপুরাণের মতে, কোনটা বিষ্ণুপুরাণের মতে একটু-আধটু এদিক-ওদিক করে’। সব কামনার এক ক্রিয়া, সব রোগের এক ওষুধ বা সব সন্দেহের একই চাবি!

মেয়েলী-ব্রত বা বাঁটি ব্রত তা নয়। সেখানে কামনা যতরকম তার চরিতার্থতার প্রক্রিয়াও তত-রকম। বৈশাখে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমে গাছ না মরে এই কামনা করে পূর্ণিপকুর, সেখানে ক্রিয়া হচ্ছে পুকুর-



কাটা, তার মধ্যে বেলের 'ডাল-পোতা',  
পুকুর জল ঢেলে পূর্ণ করা, তারপর বেলের  
ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারিদিকে  
ফুল-সাজানো এবং ছড়া বলে বেলের ডালে  
ফুল-ধরা—

“পূর্ণপুকুর পুষ্পমালা

কে পূজেরে হপুরবেলা ?

আমি সতী লীলাবতী,

ভাইয়ের বোন পূজবতী,

হয়ে পুত্র মরবে না

পৃথিবীতে ধরবে না” ইত্যাদি।

আবার যখন বৃষ্টির কামনা করে’  
বসুধারা ব্রত, তখন আল্পনায় আট তারা  
আঁকতে হচ্ছে, একটি মাটির ঘটে ফুটো  
করে’ বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথায় জল  
ঢালা হচ্ছে—এমনি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে  
দিয়ে মানুষ কামনা জানাচ্ছে—

“গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বায়ুকাঁ

তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী”।

হিন্দুধর্মের প্রাচুর্য্যবের সঙ্গে লৌকিক  
এতের চেহারা এমন অদল-বদল হয়ে  
গিয়েছে যে, এখন যে-ব্রতগুলি খাটি অবস্থায়  
পাওয়া যাচ্ছে তা অতি অল্প, এবং ৬-চারটি  
ছাড়া সেগুলিও খণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমরা  
পাই। বাংলার ব্রতগুলি কতক-কতক  
'সংগ্রহ' হ'তে আশ্রয় নিয়েছে, সবগুলি সম্পূর্ণ  
আকারে এখনো সংগ্রহ ও প্রকাশ হবার  
অনেক দেরী, এবং অশুভ-পুণ্যের জীবন-যাত্রার  
বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই-সব ব্রত করবার  
এবং ব্রতগুলির অনুষ্ঠান ঠিকঠাক মনে  
রাখবার চেষ্টাও ক্রমে চলে গিয়েছে। এ  
অবস্থায় যা হচ্ছে তাতে খাটি-নকল সম্পূর্ণ

অসম্পূর্ণ সবই আঁমরা গ্রহণ করিতে চলেছি।  
ব্রতের আল্পনার মধ্যে আমরা দেখতে  
পাই খাটি নক্সার মধ্যে মেকিও চলেছে।  
তেমনি ছড়াগুলির মধ্যেও হয়তো যেখানকার  
যা সেগুলো উল্টে কোথাও একছত্র নতুন,  
কোথাও এক ব্রতের ছড়া অল্প ব্রতে—  
এমনি সব কাণ্ড! এ ছাড়া নানাগ্রামের  
নানা অনুষ্ঠান, একই ব্রত এখানে এক-  
রকম ওখানে অল্প! এমনি সব নানা  
জঞ্জালের মধ্যে থেকে খাটি ব্রতের চেহারাটির  
একটা আদর্শ বার করে’ আনতে হ’লে শুধু  
এদেশের ব্রতগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে’  
ফল হবে না, পৃথিবীতে সমস্ত আদিম জাতির  
মধ্যে ব্রত-অনুষ্ঠান কি ভাবে চলেছে তার  
ইতিহাসগুলিও দেখা চাহ। আমাদের যা-কিছু  
সমস্তই আখ্যায়িকার দেওয়া, শিল্প-সাহিত্য ধর্ম-  
কর্ম সমস্তই—এই ধারণাটার মূলে অনেকটা  
সত্যও যেমন আছে মিথ্যেও তেমনি রয়েছে।  
সূর্য্য আখ্যায়িকারই দেবতা এটা আর এখন  
বলা চলেনা, আখ্যায়িকার জাতি ধারা ভারত-  
বর্ষের এবং পৃথিবীর নানা দেশের আদিম  
অধিবাসী, তাঁরাও সূর্য্যকে উপাসনা কচ্ছেন  
দেখি। এদেশে ব্রতের ছড়া থেকে দেখা  
যাচ্ছে সূর্য্যকে ‘রাজ’ বা ‘রায়’ কিনা ‘রাজা’  
অথবা রাউল বা রাওল কি না রাজপুত্র  
বলে ডাকা হচ্ছে। হাঁজপ্তে সূর্য্যকে ডাকা  
হচ্ছে ‘রা’ বা রাআ, আবার সুদূর মেক্সিকোর  
অধিবাসী সূর্য্যকে ডাকছে ‘রায়ম’! এবং  
এই সূর্য্যের নানা ব্রত সূর্য্যের উদয়-অস্ত  
যজ্ঞতুর মধ্যে দিয়ে তাঁর আনাগোনা নিয়ে  
নানা রূপক ও অনুষ্ঠান চলেছে। মেক্সিকোর  
পুরাণ ও ইতিকথা থেকে এই অংশটুকু,—

"The most picturesque if not the most important solar festival was that of 'Citoc Raymi' (gradually increasing sun) held in June when nine days were given up to the ceremonial. A rigorous fast was observed for three days previous to the event, during which no fire was kindled. On the fourth day the Inca accompanied by the people en-masse proceeded to the great square of Cuzco to hail the rising sun, which they awaited in silence. On its appearance they greeted it with a joyous tumult, and, joining in procession marched to the Golden Temple of the Sun, where Llamas were sacrificed and a new fire was kindled by means of an arched mirror followed by sacrificial offerings of grain, flowers &c."

(The Myths of Mexico and Peru. Luis Spence)

এমনি আবার মা-লক্ষ্মীকে আমরা হিন্দুদেরই বলে জানি, কিন্তু মেক্সিকোরও এক লক্ষ্মী আছেন যিনি অনেকটা আমাদেরই লক্ষ্মীর মত। আবার ত্তেক মণ্ডুক বা বেঙ—কোন হিন্দুই তাঁকে দেবতা বলেন না, কিন্তু মেক্সিকোতে বেঙ হলেন জলদেবতার স্ত্রী এবং ঋগ্বেদে মণ্ডুক-দেবতার স্তব দেখতে পাচ্ছি—(৭ মণ্ডলে ১০৩ স্তব মণ্ডুকদেবতা,

বশিষ্ঠ ঋষি) 'বৃষ্টিকামনা করে' এই মণ্ডুক স্তব উচ্চারিত হচ্ছে। নিকরু বলছেন, বশিষ্ঠ বৃষ্টি কামনা করে যখন পঙ্কজ-বত অমুঠান করেছিলেন, সেই সময়ে মণ্ডুক সকল পঙ্কজ-দেবতার স্তব পাঠের সময় ধ্বনি করে' আপনাদের অনুরোধের দ্বারা ঋগ্বেদে জানিয়েছিল সেইজন্ম বশিষ্ঠ সেই মণ্ডুকগণকে স্তুতি করলেন এই বলে—

(মণ্ডুকদেবতা। বশিষ্ঠঋষি)

১। সন্ধ্যার ৭৩টারি স্তোতাগণের ত্রায় (সন্ধ্যার) শয়ান থাকিয়া (এখন) মণ্ডুক-গণ পঙ্কজের প্রাণিকর বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

৩। বর্ষাকাল আগত হইলে পঙ্কজ যখন কামনাবান ও তৃষ্ণাষ্ঠ মণ্ডুকগণকে জল দ্বারা সিক্ত করেন তখন পুত্র যেমন অখণ্ড শব্দ করতঃ পিতার নিকটে গমন করে সেইরূপ এক মণ্ডুক অন্তের নিকট গমন করে।

৭। হে মণ্ডুকগণ! অতিরাত্রি তুমি নামক সোমবারে স্তোতাগণের ত্রায় সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ (সরোবরের) চতুর্দিকে শব্দ করতঃ যেদিন প্রাবৃষ্ট সন্ধ্যার হইল সেইদিন চতুর্দিকে অবস্থিতি কর।

৯। নেতা মণ্ডুকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, ইহার দ্বাদশ (মাসের) ঋতুকে হিংসা করেন। সন্ধ্যার পূর্ণ হইয়া বর্ষা আগত হইলে, গ্রীষ্ম তাপপীড়িত মণ্ডুকগণ গর্জ হইতে বিমুক্ত লাভ করে।

১০। ধেনুবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডুক আমাদেরই ধনধান করুক, অজবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডুক আমাদেরই ধনধান করুক, ধূম্রবৎ

মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক, হরিদ্রণ  
মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক। সহস্র  
(ওষধি) প্রসবকারী (বর্ষা-ঋতুতে) মণ্ডুকগণ  
অপরিমিত গো-প্রদান করতঃ আমাদিগের  
আয়ু বদ্ধিত করুন। (ঋগ্বেদ-সংহিতা,  
ঐরমেশচন্দ্র দত্ত)

আমাদের লক্ষ্মীর মন্দিরে লক্ষ্মীর বাহন  
পেঁচা থাকেন, মেক্সিকোতে লক্ষ্মীপেঁচার  
মন্দিরই ছিল যেটির নাম The Kneue  
(Palace of Owls)।

ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সন্মতি,

কোন ধর্মবিশেষের কিছা বিশেষ দলের  
মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা  
যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতু-  
পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা-বিপর্যায়  
ঘটতো সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং  
চেঁটা থেকেই ব্রত-ক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র  
অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষের বিচিত্র কামনা  
সফল করতে চাচ্ছে, এই হ'ল ব্রত-পুরাণের  
চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সম-সাময়িক  
কিছা তারো পূর্বস্কার মানুষদের অনুষ্ঠান।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## রেখা লেখা

আর্ট-স্কুলের ছাত্রদের প্রথম কাজ হচ্ছে,  
ভালো রেখা টানতে শেখা। ভার্য প্রথম  
শিক্ষা যেমন বর্ণপরিচয়, শিল্পশিক্ষারও প্রথম  
ভাগ তেমনি রেখা লেখা।

কিন্তু শিল্পের এই প্রথম কাজটি,—  
এই রেখাপাত করে' নক্সা লেখা, এতে  
'রপ্ত হওয়া বড়ই শক্ত। প্রত্যেক শিল্পীই  
ছাত্রজীবনে সর্বপ্রথমেই হাত-মক্স করতে  
নক্সা লিপ্তে বাধ্য হন; এবং এ-  
বিভাগে পুরো-দখল না-হলে তাঁরা বর্ণ-  
চিত্রের ক্লাশে প্রমোশন পান না। তবু,  
এতটা কড়াকড়ি সত্বেও—প্রত্যেক শিল্পীই  
পরলা নব্বয়ের নক্সা-লেখক (draughts-  
man) নন। এমন অনেক বিখ্যাত চিত্রকর  
এবং ভাস্কর আছেন যারা উচ্চদের ড্রইংয়ে  
খুব কম পটু। (এখানে বলে রাখা দরকার

ড্রইং মানে নক্সা ছাড়া আমরা আর-কিছু  
ধরছি না।)

বিশেষ-করে' যুরোপীয় তৈলচিত্রের হাতে  
এই ড্রইং বা নক্সার আদর ভারি কম। যারা  
তৈল-চিত্র আঁকেন তাঁদের মতে, নক্সাতে  
মোটামুটি একরকম দক্ষতা জন্মালেই শিল্পীর  
কাজ চলে যায়। ইংরেজ শিল্পী Collier  
ছাত্রদের শিক্ষা দিতে বসে দিব্যি সোজা-  
সুজি বলে দিয়েছেন, "In oil paint-  
ing the original drawing may be  
clumsy, untidy, vacillating—in  
short, have every possible fault  
of execution" প্রভৃতি। (A Manual  
of Oil Painting, p. 5.) এর কারণ  
হচ্ছে এই যে, তৈল-চিত্রের পটে ভাল করে'  
নক্সা লেখা শিল্পীর পক্ষে মস্ত-একটা পণ্ডপ্রম

কর, কেননা ছবিতে রং-মাথাবার সময়ে খুব-  
মন দিয়ে-আঁকা নক্সাও—মেথের আঁড়ালে  
চাঁদের মত—ঢাকা পড়ে যায়। কাজেই নক্সা  
ভালো হোনো কি মন্দ হোনো তা নিয়ে  
শিল্পীরা মোটেই মাথা-বামাতে রাঞ্জি নন।

কিন্তু আমাদের প্রাচ্য চিত্রকলায় এটি  
হবার যো নেই। চৈনিক, জাপানী বা  
ভারতীয় চিত্র সাধারণত জলায় রঙে আঁকা  
হয়। কাজেই, স্বচ্ছ জলের তলায় যেমন  
মৎস্তদের লীলা দেখা যায়, প্রাচ্য চিত্রের  
বর্ণ-আলিঙ্গনের তলা থেকে রেখার খেলাও  
ওম্নি দৃশ্যকদের চোখের সামনে জেগে  
ওঠে। প্রতীচ্যের অনেক চিত্রকর অনভ্যাসের  
দরুণ নিবৃত্ত নক্সা আঁকতে পারেন না,  
কিন্তু প্রাচ্য চিত্রকররা একসঙ্গে রেখা আর  
রঙের জুড়ী চালিয়ে-চালিয়ে এমন গা-ত-দ্রুত  
করে' ফেলেন যে, প্রতীচ্য এখানে প্রাচ্যের  
কাছে হার মানতে বাধ্য! ছোট-বড় সমস্ত  
জাপানী ছবিতেই রেখার এই আশ্চর্য  
বাহ্য্যর দেখা যায়। অজস্র সুপ্রাচীন  
ভিত্তি-পটেও রেখা-কাব্যের মাধুর্য্য বড় অল-  
নয়। মধ্য-যুগের মোগল-চিত্রে এবং  
আধুনিক যুগের ভারত-চিত্রেও কারু রেখার  
চাক্ মায়া-লেখা সকলকে মুগ্ধ করবে।  
বিশেষ-করে' গগনেন্দ্রনাথের স্পষ্ট, শক্তি-  
বাক্ক ও নিবৃত্ত রেখার টান এবং  
অবনীন্দ্রনাথের আধ-ফোটা চিত্রকলার মত  
বিলীয়মান, কোমল ও মুহুরেখার স্বপ্ন-সুখমা  
সকলের প্রাণ-মন ভুলিয়ে দেবেই-দেবে।  
এই শিল্পী-ভ্রাতৃযুগের রেখার ভঙ্গী সম্পূর্ণ  
আলাদা হ'লেও একবিষয়ে এঁদের নজর  
একটা মিল পাওয়া যায়। এঁদের হাতের



প্রাচীন জাপানী ছবির রেখা



প্রাচীন জাপানী ছবির রেখা

বেধা অনেকসময়ে পরারিনী ও হীন্দিময়ী  
গীতি-কবিতার মত।

যুরোপের অনেক আর্টিষ্ট রেখাপাতে  
ভাগ্যেরকম কারদানি দেখাতে পারেননি  
বটে; কিন্তু তাহ'লে কি হয়,—নক্সা  
লেখাতেও দেখানে আবার এত বেশী শিল্পী  
উৎকর্ষ লাভ করেছেন যে, এখানে তাঁদের  
নামাবলী দিতে গেলে 'ভারতী'র পূর্ণ-এক-  
সংখ্যায় কুলিয়ে ওঠা ভার। তাঁদের সকলকার  
নক্সা হৃৎস্তায় জাপানী ছবির সঙ্গে তুলনীয়  
না-হ'লেও, কল্পনা-বৈচিত্র্যে তাঁরা প্রাচ্য  
শিল্পীদের ছাড়িয়ে গেছেন।—কথাটা কঠোর  
বটে, কিন্তু অত্যন্ত সত্য।

ফ্রান্স, হল্যান্ড ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে  
রেখা-চিত্রের আদর বর্ণ-চিত্রের চেয়ে কম  
নয়। জার্মানী রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে যুরোপের  
অন্যান্য দেশে যত-বেশী বিখ্যাত, তার বর্ণচিত্র  
ততটা-বেশী সুখ্যাতি অর্জন করতে পারে  
নি। ষোড়শ শতাব্দীতে Dürer, নক্সা-  
লেখায় অদ্বিতীয় বলে যুরোপে ষোড়া নাম  
কিনোছিলেন। এ-যুগে ফ্রান্সের মত, সে  
যুগে ইতালী শিল্প-সাম্রাজ্যের সিংহাসন  
অধিকার করেছিল। ইতালীর শিল্পীরা তখন  
আটের আর সব-দিকেই অধিক-অগ্রসর হয়েও  
Dürer-এর এই রেখাচিত্রের কাছে মাথা  
হেঁট করত্রে বাধ্য হয়েছিলেন! এমন-কি  
Compagnola ও Marcantonio প্রভৃতির  
মত অনেক ওস্তাদ-চিলকরও, Dürer-এর  
নক্সার সুধু নকল নয়—চুরি-পর্যন্ত করতেও  
পিছপাও হন-নি! Martin Schongauer  
নামে আর-একজন জার্মান শিল্পীর আঁকা নক্সা  
(Temptation of St. Anthony) দেখে

মাইকেল এঞ্জেলোর মত  
লোকেরও রীতিমত তাক  
লেগে গিয়েছিল!

কিন্তু বাঙলা দেশে রেখা-  
চিত্রের আদর একরকম নেই  
বললেই হয়। খুব খ্যাতি  
আর জ্যাড়া করে' হরেক-  
রকম রং লেপে না-দিলে  
যে-দেশের লোক ছবিকে  
ভালো বলতে নারাজ, সে  
দেশে নক্সার মত বর্ণহীন  
ছাবর আদর হওয়াও শক্ত  
কথা বটে। আমরা—  
বাঙালীরা তারওবর্ষের মধ্যে  
নানাবিধানে শ্রেষ্ঠজাতি  
বলে প্রসিদ্ধ এবং গর্বিত;  
কিন্তু আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ  
যে প্রায় মাড়োয়াড়ীদের  
মতই চোতা আর ভোতা,  
তা না-মেনে আর উপায়  
নাই! তা-নইলে হাজার-  
হাজার বাঙলা গল্পের বইয়ে

নিভাই রেখাচিত্রের নামে যে বিঘম কেলেঙ্কারী  
বেরুচ্ছে, আমরা অম্লানবদনে তা সহ  
করছি কি-করে? ... ..

বাঁধা দস্তবের মোহ কাটাতে না-পারলে  
আটিষ্টের পক্ষে ভালো নক্সা লেখা অসম্ভব।  
একটা চলিত আদর্শ সামনে রেখে যারা  
রেখাপাত করেন, তাঁরা নিভান্তই শিক্ষানবীশ।  
তৈল-চিত্রে এ-পদ্ধতিতে কাজ চলে যায় বটে,  
কিন্তু নক্সাতে এটি একেবারেই অচল।  
কারণ, নক্সার মধ্যে ছোট-বড়, সফ-মোটা



মাইকেল এঞ্জেলোর নক্সা

প্রত্যেক রেখার টানে এক-এক বিশেষ  
শিল্পীর বিশেষ ব্যক্তিত্ব ফটে উঠা চাই;—

“A drawing should be a personal  
expression” ইত্যাদির এক শিল্প-  
সমালোচক এই খাঁটি কথাটি বলেছেন,  
এবং এ কথাটি কোন রেখা-শিল্পীরই ভোলা  
উচিত নয়। যে-সব বড় শিল্পী রেখা-  
চিত্রে একে সুখ্যাতি পেয়েছেন, মন দিয়ে  
দেখলে দেখা যাবে, তাঁদের প্রত্যেকের  
রেখাই প্রত্যেকের নিজের মতন। Rem-

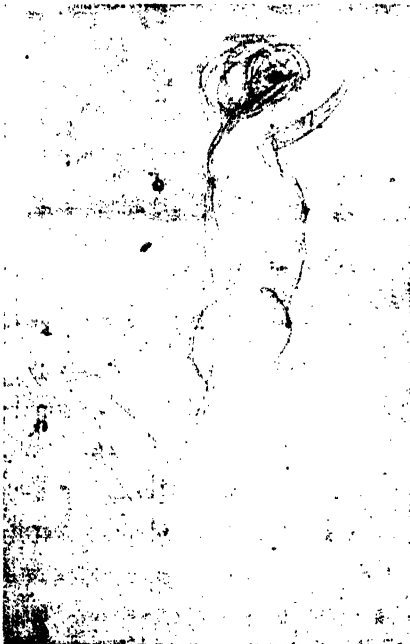
brandt-এর রেখা হচ্ছে ত্বরিত, 'বিচিত্র ও জীবন্ত'; Dürer-এর স্পষ্ট, স্থানিষ্ঠ ও ব্যাপকভাবে সজ্জিত রেখা এথেকে ভিন্ন। আবার, Gainsborough-র অনায়াস ও স্বাভাবিক সুষমার ভরা রেখাগুলি থেকে Watteau-র সৌন্দর্যের ইচ্ছাকৃত মনো-রেখাগুলি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এমনি Holbein, Leonardo da Vinci ও Michel Angelo প্রভৃতি শিল্পী,—যাঁরা রেখা-চিত্রে ওস্তাদ বলে বিখ্যাত,—এঁদের প্রত্যেকেই রেখার মধ্যে আপনাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব জাগিয়ে রেখে গেছেন। কিন্তু এঁরা যদি বাঁধা-দস্তুরের বাইরে পা না-ফেলতেন, তাহলে এঁদের নক্সাগুলি বাজারের আর-

পাঁচজনের আঁকা নক্সার মতই চলিত ছবি হয়ে থাকত,—কারুর মনে বিশেষ ভাবে একটা নতুন ভাবের সংকেত দেগে দিতে পারত না।

বর্ণচিত্রের চেয়ে রেখা-চিত্রের গুণ বোঝাও আরো শক্ত। বর্ণচিত্র একেই ত রঙ-চঙে হয়; তার-উপরে তাতে যে মাজা-ঘষা রূপ ও সম্পূর্ণতা থাকে, রেখা-চিত্রে তা আদৌ থাকে না;—সুতরাং জনকতক বাছা-বাছা সমঝদার ছাড়া নক্সার আসল গুণাগুণ আর-কেউ বুঝতে পারবে না। দৃষ্টান্তরূপ এখানে আমরা ফরাসী-দেশের প্রসিদ্ধ রেখা-শিল্পী Steinlen-এর আঁকা "পাত্ত" নামে ছবিখানি দিলাম।

... দীর্ঘ পথের কিনারায় কাঙালী  
তুই নয়নারী। আর হাঁটতে না-পেরে  
ছেলেকে বুকে জড়িয়ে রমণী মাঠের উপরেই  
অবশ হয়ে বসে পড়েছে;—দৃষ্টি তার দৃষ্টিহীন!  
পৃষ্ঠের বোঝা ও বাক্কোর ভারে ভুয়ে  
পড়ে, বুক পুরুষটি যষ্টিতে ভর নিয়ে দাঁড়িয়ে  
আছে—চক্ষু তার স্তূদরে বিক্ষিপ্ত। জননেরই  
শীর্ণ চেহারা ও জীর্ণ পোষাক তাদের  
কঠোর দারিদ্র্যের পরিচয় দিচ্ছে। বহু-  
দূরে—প্রান্তর-প্রান্তে হয়ত কোন্-এক  
ভোগবিলাসীর রম্য প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে—  
কিন্তু মাহুয় হয়েও এই তুই অভাগা আজ  
মাতৃষের কাছ থেকে একটুও দয়া-মায়ার  
প্রত্যাশা রাখে না, ক্লান্তই সেদিকে তারা  
ফিরেও দেখছে না।

সাধারণের চোখে দেখলে, এ নক্সা-  
খানিতে স্থখ্যাতি করবার কিছুই পাওয়া  
যাবে না। ছবিখানি সম্পূর্ণ নয়, অনেক



রোদার নক্সা



পাণ্ডু

জায়গাই কেবল ঠিকিত দিয়েই সারা হয়েছে—সবটা এঁকে দেখানো হয়-নি; লাইন-গুলিও সুন্দর ও সুন্দর নয়—অনেকটা ঠিক হিজিবিজির মতই! কাজেই, সকলে একে ছেলেমানুষের হাতের ‘কাকের ছানা বকের ছানা’ বলে হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইবেন।

কিন্তু যিনি বোম্বার্ডার, তিনি দেখবেন, সম্পূর্ণতার চেয়ে ইচ্ছিতে বক্তব্য বিষয় ফোটাও যখন অধিক-কঠিন, তখন শিল্পী এখানে যথার্থ আর্টিস্টের কাজই করেছেন। ছবির রেখা এখানে কেন যে সুন্দরসুন্দর

নয়, কলারসজ্জ তাও অনায়াসে বুঝতে পারবেন। সুখীর, সুখীর, বিলাসীর ছবি আঁকবার সময়েই নকসার রেখা হয় সুন্দর, সুন্দর ও কোমল; কিন্তু শোক-দুঃখ-হাহাকারের ছবি, ভগ্নজীবনের অশ্রুসজল ‘ট্র্যাজেডী’,—অসমান, ক- , ও ভাঙা-ভাঙা রেখাপাতেই ফোটে ভালো।

সাহিত্যেও ওস্তাদ-লেখকরা আটের এই গুণকথাটি অনেক স্থলেই ব্যক্ত করে’ দিয়েছেন। কঠিনকে তাঁরা কোথাও কোমল ভাষার স্কুটিয়ে তোলেন-নি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হেমচন্দ্রের “কুর্শ-কমঠী কুট উন্মিত্তে





ফরাসী-শিল্পী বুশে'র নক্সা

লটপট" প্রভৃতি পংক্তি এবং রবীন্দ্রনাথের "বৈশাখ" প্রভৃতি স্মরণ করুন।

উপরে যে ইঙ্গিতের কথা বলেছি, রেখাচিত্রে তার সার্থকতা যতদূর হ'তে হয়! একখানি ছবির সমস্তটা এঁকে দেখালে তা চোখের উপরেই সম্পূর্ণ হয়ে জেগে ওঠে;—গুণী দর্শকের কল্পনা তা-থেকে কোন খোঁরাক্ পায় না। কিন্তু কোন বিষয়ের একটুখানি ইঙ্গিতমাত্র দিলে, চিত্রকরের অসম্পূর্ণতা দর্শককেই সম্পূর্ণ করে' নিতে হয়—এখানে যাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ভাববার ক্ষমতা যতটা-বেশী, ছবির রস আপন-আপন যোগ্যতা-অনুসারে তিনি ততটা বেশী উপভোগ করতে পারেন। নক্সাতে সম্পূর্ণতার চেয়ে ইঙ্গিত (Suggestion) অনেকসময়ে বেশী ফলপ্রদ হয় কেন,

একজন জার্মান-শিল্প-সমালোচক তার আর একটি উত্তর দিয়েছেন;—

"We are fully aware of the fact that often an apparently slight sketch embodies more genuine knowledge of natural forms than one has seen compassed by careful drawings, the "solidity" of which approximates them dangerously near to, what might be called, the "photographic" style of execution."

সম্পূর্ণ ছবি আঁকলে শিল্পী সর্বসাধারণের প্রীতিভাজন হ'তে পারেন; কিন্তু ইঙ্গিত-প্রধান চিত্রের আদর কেবল চ-দর্শজন ভাবুক দর্শকের কাছে। ভারতীয় চিত্র-কলা-পদ্ধতি

অনেকস্থলিই এমনি ইঙ্গিতপ্রধান বলেই Majority ভাতে সাড়া দিচ্ছে না।

আর এইজন্তেই রেখাচিত্র বোঝা বড় শক্ত কথা। এমন এক সময় গিয়েছে, যখন রেম্ভ্রাণ্ডের মত 'প্রতিভাবানের অঙ্কিত নক্সাকেও লোকে ভুচ্ছ করে' উড়িয়ে দিত। যদিও সেদিন আর নেই, তবু রেম্ভ্রাণ্ডকে সকলে কি এখনো বুঝতে পারেন? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রেম্ভ্রাণ্ডের একখানি নক্সা আছে, তার বিষয়, 'ছটি রমণী একটা শিশুকে হাঁটুতে শেখাচ্ছেন'। এই নক্সাখানি কিন্তে একজন ধনকুবের অনেক টাকা খরচ করে-ছিলেন। এ ছবির রেখাগুলি আশ্চর্য্যরকমের জীবন্ত,—দেখলেই মনে হয়, রমণীগুলির পরধার-আঁকা মুক্তি যেন জ্যাস্ত মানুষের মতই নড়ছে আর সেইসঙ্গে শিশুটিও যেন সত্য-

সত্যই ক্ষুদ্রে মাতালের মত টলে-টলে চলতে শিখছে! কিন্তু সাধারণ দর্শকরা তবু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, এই সামান্য গুটিকতক আঁচড়ের মত রেখার জন্ত একজন কোটিপতি খামুকা কেন জুতগুলো টাকা বাজেখরচ করলেন! মেয়ে-দর্শকরা হয়ত ভাববেন, 'ঐ টাকায় স্ত্রীর গলায় একছড়া মুক্তোর মালা গড়িয়ে দিলে তবু যা-হোক একটা দেখবার মত প্রিন্স হোত!'

ললিতকলা জীবনের যাত্রাপথে বলে হাতেনাতে কাজ-কর্ম করতে পারে না। সংসারী মানুষ একেজো জিনিষের 'পরে হাড়ে-হাড়ে চটা। শিল্পী ও কবি তাই জিনিষের কাজের হাতে অপদার্থ নাম কিনেছেন।

শ্রী:—

## উন্পাঁজুরে

আমার বয়স কত জানো?... আট-বছর! কিন্তু বয়স শুনেই তোমরা যেন মুখ বেঁকিয়ে বোসো না—কারণ, আমি কম-বয়সেই ভারি চালাক ছেলে! লোকে তাই বলে, আমি নাকি এঁচড়ে-পাকা!

কিন্তু চালাক ছেলেদেরও যে ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করে' মরতে হয়, এ ছাড়া আমার রাখবার ঠাই নেই। লেখাপড়ার সময়ে আমার চালাকি একেবারেই খাটে না। এই আখনা কেন, কাল সকালবেলায় একটু কৃষ্টি করে' লাটুতে সবে লেভতিটি জড়াতে

সুন্দর করেচি, আর অমনি কিনা দাঁ-করে' দাদা এসে আমার কাণ মলে লাটু, কেড়ে নিলে! আচ্ছা বাবা, আমারও দিন আসবে; দাঁড়াও না, আগে আর-একটু বড়সড় হই, তখন দাদার দাদাগিরি ফলানো বার করে' দেব!... বড় হয়ে আমি দিন রাত খালি মার্কেল খেলব, লাটু, ঘোরাব আর বুঁড়ি ওড়াব। মা, বাবা, দাদা কারুর কথা শুন্ব না—বক্লে-টক্লে বলব, আমি এখন বড় হয়েচি, বুড়ো-মিন্‌সের আবার পড়া-শুনো কি!

বড় হয়ে কিন্তু আর-একটা কাজ করতেই হবে! আমাদের ছিদামের মত একটা মণিহারীর দোকান না-করলে ত কিছুতেই চলবে না! ছিদামটা হচ্ছে পাজীর পা-বাঁড়া—তায় কাছে কিছু কিনতে গেলেই ১০০ভাগাটা পরসা চেয়ে বসে! এটুকু বুদ্ধি তার মাথায় নেই যে, আমি হলুম গিয়ে ছেলে-মানুষ, পরসা-টয়সা কোথায় পাব! হ্যাঁ, বড় হয়ে আমাকে একটা মণিহারীর দোকান করতে হবেই-হবে! তাতে টিনের বাঁশী, ভেঁপু, মস্তমস্ত কাঠের দোঁড়া, হাজার হাজার রাঙা-টুকটুকে লাঠি, বস্তা-বস্তা রজপুস, ব্যাটম্বল, ফুটবল এই-সব থাকবে। আমার যখন যেটা খুসি হবে সেইটেই নেব, ছিদাম দাম চাইতে এলে মারব ব্যাটাকে এক থাবা—চোখ রাঙিয়ে বলব, আমার দোকান, আমি নিচ্ছি, তুই পরসা চাইবার কে রে ইষ্টপিড়? ছিদাম তখন আচ্ছা জ্বল হয়ে মুখখানি চুণ করে' চলবে—ওহো, কি মজা!...

এই-সব ভাবচি, এমনসময় দাদা এসে চোখ পার্কিয়ে বললে, “হ্যাঁ রে হয়ে, বাদরের মত হাঁ-করে' বসে-বসে কড়িকাঠ গোনা হচ্ছে বুঝি?”

দাদার দিকে আমি রেগে-মেগে কটমট করি' তাকালুম।

দাদা সামনের চেয়ারখানা জান্‌লার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে বললে, “হুজুমানের মত আবার চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌চিস্ কি? দেব একুনি চোখে পাঁচু করে' ছুঁচ্‌ বিধিয়ে! নে, নে, চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ কর!”

এঃ! দাদাটা জালালে দেখাচ্‌! একটু-

খানি যে গিন্নি হয়ে বসে থাকব, তার ঘোটি নেই! খালি পড়, পড়, পড়! কেন, পড়ে কি আমার চারটে হাত বেরুবে?

কি আর করি, মার খাবার ভয়ে হুড়-হুড় করে' টেবিলের কাছে গিয়ে চাণক্য-শ্লোক পড়তে বসলুম। এক জায়গায় লেখা রয়েছে—

“অতএব কিবা পুত্র কিবা ছাত্রগণে  
না দিবে আদর সদা রাখিবে শাসনে।”

দাদা মস্ত মুকব্বির মত মাথা নেড়ে পা নাচাতে-নাচাতে বললে, “গুন্‌চিস্ ত হয়ে, চাণক্যের মত অত-বড় পণ্ডিত কি বলছেন! এই সব বুঝ-সুঝে ঠাণ্ডা হয়ে পড়াশুনো কর—নৈলে তোর পিঠের ছাল-চামড়া আর আস্ত থাকবে না! গুন্‌তে পাচ্‌িস্?”—এই বলে দাদা পাখার বাঁটটা দিয়ে ঠকাং করে' আমার পিঠের ওপরে এক ঘা বসিয়ে দিলে।

মার খেয়ে-খেয়ে আমার পিঠখানা গরুর গাড়ীর গরুর মত এমুনি শক্ত হয়ে গেছে যে, পাখার বাঁটের অমন এক-আধ ঘায়ে আমার কিছু আসে-যায় না! ... কিন্তু এই চাণক্য লোকটা কে? তার ওপরে আমার এমুনি রাগ হচ্ছে! আমি যখন বড় হব, আমার গায়ে যখন জমিদার-বাবুদের দরওয়ান রঘুবীর পাঁড়ের মত খুব জোর হবে, তখন যদি এই চাণক্য-পণ্ডিতের একবার দেখাটি পাই, তাহলে আর ছেড়ে কুথাটি কইব না—একেবারে তার মাথা থেকে টিকিটি ধরে, পটাস্ করে' উড়ে নেব!

দাদা আমার দিকে পিছন কিয়ে বসে গুন্‌গুন্‌ করে একটা গান গাইছিল, তার

মানেটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না—কিন্তু  
কথাস্থলের কতক-কতক মনে আছে—  
“রয়ে রয়ে কেন তার মুখ মনে পড়ে,  
ও মেঘেরি বারি বিনে চাতকিনী প্রাণে মরে।

এই লও তীক্ষ্ণ ছুরি, হান মম বক্ষোপরে,  
নিভে থাক অশ্রিতারা হেরিতে হেরিতে তোরে!”  
—মাথা নাড়তে-নাড়তে টেবিল বাজিয়ে দাদা  
গান গাইতে লাগল, আমিও জিত্ বার  
করে’ তাকে ভ্যাংচাতে লাগলুম! দাদা  
আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না, কাজেই  
কিছু বুঝতেও পারলে না। কেমন কষ্ট!

ইঠাং দাদা বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে  
বাইরের দিকে চেয়ে কি দেখতে লাগল।  
তুরপরে আমার দিকে ফিরে বললে,  
“হরে, তুই এইবার কথামালা পড়—  
আমি ততক্ষণ বাইরে থেকে একবার চট-  
করে’ ঘুরে আসি।”

লক্ষীছেলের মত ঘাড় গুঁজে আমি  
‘কথামালা’ পড়তে লাগলুম। “এক সিংহ,  
বুদ্ধ ও দুর্বল হইয়া, আর শিকার করিতে  
পারিত না; স্ততরাং তাহার আহার বন্ধ  
হইয়া আসিল। \* \* \* \* এক শৃগাল,  
সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত গুহার দ্বারে  
উপস্থিত হইল। \* \* \* \* সিংহ, শৃগালকে  
দেখিয়া, অতিশয় অহ্লাদ প্রকাশ করিয়া  
বলিল, “কেও, আমার পরম বন্ধু শৃগাল।  
আইস ভাই আইস; আমি ভাবিতেছিলাম—”

দাদা তাড়াতাড়ি চলে গেল—আমারও  
অমনি বায়ুন গেল ঘর ত লাঙল তুলে  
ধর! বইখানা ছুঁড়ে একদিকে ফেলে দিয়ে  
ভাবতে লাগলুম, দাদাটা গেল কোথায়?

এই ঠিক তুপুরবেলা, রোদ করচে ঝাঁঝী,  
এটা ত আর গারে হাওয়া লাগিয়ে বাবুর  
মত বেড়াবার সময় নয়! অথচ দেখছি  
দাদা বাঁশবাগানটা ঘুরে ডানদিকের পথ  
ধরে কোথায় চলে গেল!... .. ভাবতে-  
ভাবতে দাদার মংলব্টা ঠিক এঁচে  
ফেললুম—আমি কম-বয়সেই খুব চালাক  
ছেলে কিনা! হুঁঃ, এ আর কিছু নয়,  
মুকুণ্ডোদের বাগানে বড়-বড় বাতাবি লেবু  
হয়েছে, দাদা নিশ্চয় সেই লেবু চুরি করার  
ফিকিরে আছে! ঐ লেবুগুলোর ওপরে  
আমারও খুব নজর ছিল; কাজে-কাজেই  
আমি যে হাঁদা-গন্ধারামের মত বসে-বসে  
পড়া মুখস্থ করে’ মরব, আর দাদা  
বেড়ে মজা করে’ লেবু পেড়ে-পেড়ে বাবে,  
তা কিছুতেই হ’তে পারে না! আমাকেও  
দেখতে হ’ল—হুঁ—একটা লেবুতে যদি  
আড়াল থেকে চোঁ লাগাতে পারি!

চটপট উঠে পড়ে তখন দাদার পেছু  
নেওয়া গেল। বাঁশবাগানের ঝোড় ফিল্ডেই  
পুকুরের ধারে, একটা পেয়রা-গাছের ওলার  
দাদাকে দেখতে পেলুম। শুধু দাদা নয়—  
তার সামনেই পটলি-দিদিও চুপ করে’ দাঁড়িয়ে  
আছে!

পটলি-দিদি আমাদের গায়ের যজ্ঞজ্যাঠা-  
মশায়ের মেয়ে! ওরা আমাদেরই জাত—  
ওদের বাড়ীতে আমরা খুব যাওয়া-আসা করি  
বলে পটলি-দিদির বাপকে আমি জ্যাঠামশাই  
বলে ডাকি। শুনেছি পটলি-দিদির সঙ্গে  
আমার দাদার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

কিন্তু পটলি-দিদি অমন চোরের মত  
দাঁড়িয়ে আছে কেন? দূর থেকেই দেখতে

পেলুম, দাদা কি যেন বলচে, আর পটলি-দিদি তাই শুনে মাথা হেঁট করে' ফিরে দাঁড়াচ্ছে। ও, বুঝেছি, পটলি-দিদি নিশ্চয় আমাদের গাছ থেকে পেয়ারা চুরি কবে' খাচ্ছিল, আর তাই দেখতে পেয়ে দাদা তাকে ধমকাচ্ছে! ঐ যে, পটলি-দিদির হাতে আধখানা পেয়ারা রয়েছে!

একটা কুষ্কলির ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে বসে, আমি তাদের রকম-সকম দেখতে লাগলুম। পাছে দাদা আমাকে দেখে ফেলে, সেই ভয়ে আমি মাথাটা নীচু করে' বসে রইলুম।

খানিক পরেই দেখি, দাদা ভয়ে-ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে কি দেখলে—তারপর কন্ডে কিনা—আন্তে আন্তে পটলি-দিদির হাত না ধরে টপ করে' তার মুখে একটা চুমু খেয়ে নিলে! পটলি-দিদি অমনি দাদার হাত না ছাড়িয়ে, নিজেকে বাড়ীর দিকে ধে-ছুট ত ধে-ছুট!

ও হরি, চুমু খাওয়া? কম-বয়সেই আমি বেজার চালাক কিনা,—কাজেই মেরেমানুষের মুখে বাটাচ্ছেলের চুমু খাওয়া যে ভারি খারাপ, সেটা জানতে আমার বাকি ছিল না! দাঁড়াও দাদা, মজাটা টের পাওয়াচ্ছি—ভারি যে আমাকে মার-ধর করা হয়, এবার কে আমাকে মারে একবার দেখে নেব!

দাদা আবার বাড়ীর দিকে আসতে লাগল—আমিও লুকিয়ে-লুকিয়ে উঠে, সেখান থেকে একছুটে একদম বাড়ীতে এসে হাজির! দাদাকে আজ আমার হাতে মুঠোর ভিতরে পেরেচি বলে প্রাণটা যেন আক্সাদে আটখানা হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি 'কঁখামালা'-খানা টেনে নিয়ে পুব চৌচিরে-চৌচিরে 'সর্প ও কৃষক'র গল্পের একটা জায়গা পড়তে লাগলুম, "কৃষক দেখিয়া, অশ্রিয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পকে বলিল, অরে ক্রূর, তুই অতি কৃতঘ্ন। তোর প্রাণ নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, দয়া করিয়া, গৃহে আনিয়া, আমি তোর প্রাণরক্ষা করিলাম; তুই সে সকল ভুলিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে দংশন করিতে উদ্বৃত্ত হইলি।—"

দাদা আন্তে-আন্তে ঘরে এসে ঢুকল। আমি আড়-চোখে চেয়ে দেখলুম, দাদা ভারি হাঁপাচ্ছে। একবার আমার দিকে তাকিয়ে দাদা আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। আমিও অমনি বইখানা মুড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

দাদা বললে, "কিরে, উঠলি যে?"

আমি দরজার দিকে এগুতে-এগুতে বললুম, "পড়তে আর ভালো লাগে না।"

—"কী! পড়তে তোর ভালো লাগে না?"

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, "নাঃ!"

—"আবার 'না'! নবাব-বাহাদুর হুজুচিস্ দেখেচি যে! ঘুসি মেরে দাঁত ভেঙে দেব, জানিস্?"

আমিও রেগে-মেগে বললুম, "ওঃ, ঘুসি অমনি মারলেই হ'ল কিনা। দাঁড়াও-না, আগে মাকে গিয়ে সব বলে দিয়ে আসি, তারপর তুমি ঘুসি খাও কি আমি ঘুসি খাই জাখা বাবে।"

দাদা মুখ খিঁচিয়ে ভেড়ে এসে বললে, "মাকে গিয়ে বলবি? আমাকে আবার ভয় জাখানো হচ্ছে?"—বলেই আমার একটা কাণ টেনে ধরল।

—“কাণ ছাড়ো বল্চি দাদা, নইলে মার কাছে গিয়ে এখন বলে দেব যে, দাদা পেয়রাগাছের তলার গিয়ে—”

আমার মুখের কথা মুখেই রইল—সব কথা শোনার আগেই দাদা চমকে আমার কাণ ছেড়ে দিলে,—তার মুখ ভয়ে শুকিয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল!

আমি আজ দাদার সামনে এই প্রথম বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ফিক্-ফিক্ করে’ হাসতে লাগলুম।

দাদার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কথাই বেরুল না। অনেকক্ষণ পরে খুব চুপিচুপি দাদা বললে, “হরি, কি বলছিলি ভাই?”

—“কী আবার বল্ছিলুম! পটলি-দ্বিদি কে চুমু খাওয়ার কথা বল্ছিলুম! এখন—”

তাড়াহাড়ি জ-হাতে আমার মুখ চেপে ধরে দাদা বলে উঠল, “চুপ, চুপ! অত চ্যাচাস নে ভাই, সবাই শুনে পাবে যে!”

—“কেন, তুমি যে বড় মারবে বল্ছিলে! এখন মার-না দেখি!”

—“সে কি ভাই, আমি কি তোকে সত্যি-সত্যিই আর মারতুম হরি, আমি যে ঠাট্টা কর্ছিলুম!”

—“তোমার ও-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।”

—“আচ্ছা, আচ্ছা, আর ও-রকম ঠাট্টা করব না। কিন্তু তুই ভাই মাকে আর বাবাকে কি আর-কাককে কিছু বলিস্-নে যেন! লক্ষী মণিক আমার!”

—“বেশ, তা যেন বলব না! কিন্তু তুমি আমাকে কি দেবে বল?”

—“কি নিবি বল! টাকা নিবি, টাকা? নিবি? এই নে! যা, খেলনা কিন্-গে যা—আমি আর তোকে বকব না!”

হেঁ-মেয়ে দাদার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে আমি আগে একটা ডিগবাজি খেয়ে নিলুম। তারপর উঠেই তখন ছিদামের দোকানে দৌড়লুম। মগ্ন একটা বোমা-লাটাই, ক’কাটিম কাকের ডিমে মাজা-দেওয়া হতো আর অনেকগুলো দো-ঘরলা ঘুঁড়—টাকা দিয়ে আজ এহ-সব কিনতে হবে!

তারপর থেকে দাদার কাছ থেকে আরই টাকাটা সিকটা আদায় কর্চুম। আমি হাত পাতলে দাদা আর না-বলতে ভরসা পেত না! বাবা আমাকে দাদার তাতে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্ত, এদিকে দাদা যে আমার হাতের মুঠোর, সে খোঁজ কেউ পেলে না! পড়াশুনাও আমাকে আর বেগা করতে হয় না—যখন-খুঁসি পড়তে বাসি, যখন-খুঁসি গায়ে চাওয়া গাগিয়ে বেড়াই, ঘুঁড়ি ওড়াই, লাটু ঘোরাই আর মনের সুখে ডিগবাজি খাই! দাদা-বেচারী জুল-জুল করে’ আমার দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে থাকত—মনে-মনে সে যে আমার ওপরে ভয়ানক চটে আছে, বাগে পেলে সে যে আমার মুণ্ডটা এক্ষুনি কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খায়, এ আমি তার মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারি!

এদিকে সেই কথাটা মা-বাবাকে বলে দেবার জন্তে আমার মুখ যেন নিস্পিস করতে থাকত! কিন্তু আমারও কিছু বলবার যো নেই, কারণ এখন যদি আমি পেটের কথা ফাঁস করে’ ফেলি, তাহলে আর কি

আমার রক্ষে আছে? সব জানাজানি হয়ে গেলে, দাদার ভয় একবার ভেঙে গেলে, আমাকে বিষম মুঞ্চিলে পড়তে হবে! আমি কম-বয়সেই ভারি চালাক ছেলে কিনা, কাজেই এটুকু বুঝতে আমার একটুও দেরি লাগল না।

তবু একদিন প্রায় বলে ফেলেছিলুম আর কি! সেদিন দাদা, আমি আর বাবা একসঙ্গে খেতে বসেছি, মা পরিবেশন করছেন।

হঠাৎ আমার মাথায় কি খেয়াল ঢুকল, আমি বলে ফেলুম, “মা, পেয়রা-গাছের তলায় সেদিন কাঁ মজাটাই হয়েছে!”

মা জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হয়েছে রে?”

—“পটলি-দিদিকে দাদা—”বলতে-বলতে আমি থেমে গেলুম। দাদার মুখ তখন ভয়ে আর রাগে কেমন-একরকম হয়ে উঠল।

মা বললেন, “খাম্বলি ক্যান্ বে হবে, কি বলছিলি বলনা!”

কম-বয়সেই আমি খুব চালাক বলে, ধাঁ-করে’ কথাটা বুঝিয়ে নিলুম। :—“পটলি-দিদি আমাদের গাছ থেকে পেয়রা চুরি করে’ খাচ্ছিল, দাদা তাকে ধরে ফেলেচে!”

মা হাসলেন, বাবা হাসলেন, দাদা নিশ্চয় ফেলে বাঁচলেন।

... ..

এর-মধ্যে একদিন দাদার সঙ্গে পটলি-দিদির খুব ষটা করে’ বিয়ে হয়ে গেল।... ..

বিয়ের দিন-পাঁচেক পরে, দাদা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়তে, আমি গিয়ে বললুম, “আমাকে গোটা-ছয়েক টাকা দিতে হবে দাদা!”

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে, দাদা

খিচিয়ে উঠে বললে, “টাকা পোছের ফল পেয়েচিস্, না? বেরো এখানে থেকে!”

অনেকদিন পরে দাদা ফের আমার সঙ্গে চড়া-গলায় কথা কইলেন। আমিও গরম হয়ে বললুম, “আমি পায়রা কিনব, টাকা দেবে ত দাও বল্চি!”

দাদা খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বললে, “তুই কি ভেবেচিস্ বল্ দেখি করে? আমাকে তোর গোলাম পেয়েচিস্ শুয়ার?”

দাদার জোর-জোর কথা শুনে আমার হাড় যেন অগে গেল। আমিও তেরিয়া হয়ে বললুম, “টাকা দেবে না তাহলে?”

—“তবে রে রাঙ্কেল! খালি খালি শাসানো?”—এই বলেই দাদা হুম্ করে’ আমার পিঠে এক বোম্বাষ্ট কিল বসিয়ে দিলে।

কিল খেলে ঘে-রকম করে’ চ্যাঁচাতে হয় তেমনি করে’ই চোঁচিয়ে আমি বলে উঠলুম, “কাঁ! আবার কিল মারা? আমি এই চলুম মার কাছ পেই কপাটা বলতে!”

—“মা, বল্-গে যা উল্লুক, বল্গে যা, তোকে আমি আর খোড়াই কেয়ার করি!”—বলতে-বলতে দাদা আমার পিঠের ওপরে হু-হাতে ক্রমাগত ঘুসি আর চড় মারতে লাগল।

আমি রাগের আর মারের জ্বালায় অস্তির হয়ে, একছুটে মার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। মা আর বাবা দুজনে বসে কি কথা কইছিলেন, আমি চোঁচিয়ে ঘর ফাটিয়ে বললুম, “মা মা, দাদা আমাকে মেরেচে!”

—“কেন, কি ছষ্টমি করেছিলি?”

—“কিছু না মা! দাঁদা পটলি-দিদিকে  
চুমু খেয়েছিল, সেই কথা আমি তোমাদের  
বলে দেব বলাতে দাদা আমাকে—”

বাবার দিকে তাকিয়ে মা তাড়াতাড়ি  
বলে উঠলেন, “থাম্ হতভাগা, থাম্,—ও-সব  
কণায় তোর দরকার কি? এমন উন্পাঁজুরে  
ছেলেও ত কোথাও দেখি-নি বাপু!”

বাবা আমার কাণ মলে দিয়ে বললেন,  
“পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার! এখন থেকে এঁচড়ে  
পেকে উঠ্চ? দূর হ, দূর হ!”

৪০৭০ হয়ে সেখান থেকে চলে  
এলুম। ... ..

অনেক ভাবলুম। কিন্তু কম-বয়সে আমি  
এত-বেশী চালাক হয়েও, এটা কিছুতেই  
বুঝতে পারলুম না যে, দাদার ভয়টা হঠাৎ  
ভেঙে গেছে-বা কেন, আর চুমু-খাওয়ার  
এ-পা শুনে মা বাবা উন্টে আমাকেই-বা ধমক  
দিলেন কেন?... .. আচ্ছা, আচ্ছা, এখন  
না-পারি ছুঁদিন পরেই সব সম্মুখে নেব—এ সব  
কথা হয়ত বড় না-হ’লে বোঝা যায় না! \*

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বায়।

## সমসাময়িক ভারতের বৈষয়িক সভ্যতা

যে সকল বৈষয়িক ও নৈতিক উপাদানের  
সমবায়ে কোন সভ্যতা গড়িয়া উঠে,  
তাহা একই ক্রমবিকাশের সহিত একসূত্রে  
অাবদ্ধ এবং একই ক্রমবিকাশের অনুসরণ  
করে। কোন বিশেষ নির্দিষ্ট যুগে, কোন  
জাতির বা লোকসমূহের মধ্যে যে সকল  
প্রবণতা থাকে, সেই সকল প্রবণতাই  
আবার তাহাদের পরিবারের মধ্যে,  
সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে, আচার-ব্যবহারের  
মধ্যে, বিধিব্যবস্থার মধ্যে, শাসন-তন্ত্রের  
মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, শিল্পকলার মধ্যে,  
বিজ্ঞানের মধ্যে, শ্রমশিল্পের মধ্যে, কৃষি-

বাণিজ্যের বিবিধ শাখার মধ্যে দেখিতে  
পাওয়া যায়। এবং এই সকল প্রবণতার  
ক্রমাগতই অল্পবল্প পরিবর্তন হয়; কারণ  
যুগধর্ম্য ও নূতন নূতন ঘটনা, লোকের  
ও জাতির চরিত্রেও ক্রমাগত অল্পবল্প  
পরিবর্তন আনয়ন করে। অবশ্য, কোন  
বিশেষ ধরণের মানসিক প্রবণতা কোন বিশেষ  
বুদ্ধি-বৃত্তির প্রতিকূল হইতে পারে, কোন  
বিশেষধরণের সাধারণ মনোভাব, চরিত্রগুণ  
কোন বিশেষ গুণের অস্তুরায় হইতে পারে  
কিংবা কোন বিশেষ গুণকে বিকৃত করিতে  
পারে; কিন্তু সকলেই একই পরিমাণে

\* এই গল্পে আস্তন শেখভের যৎসামান্ত ছায়া আছে। এই যৎসামান্ত ছায়াকে কেউ যেন অসামান্ত  
কায় বলিয়া ভাবিবেন না! লেখক



সেই বিশেষ প্রবণতা ও মনোভাবের বশবর্তী হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইটি সর্বপ্রধান প্রবণতা কি? একটি—মৌলিকতা (rationalism) এবং আর-একটি স্বাভাবিকতা (naturalism)। এই দুই প্রবণতা মহাকাব্যেরও প্রতিকূল, গীতিকাব্যেরও প্রতিকূল; তাই ঐ শতাব্দীতে, ঐ দুই শ্রেণীর কাব্যসাহিত্যে নিতান্ত মাঝারি ধরনের রচনা বাহির হইয়াছে। ঐ যুগে যে সকল রচনা বাহির হইয়াছে—যথা Henriade, La Pucelle, ভল্টেয়ারের হান্সা ধরনের কবিতা, রুসো ও Parny-র গীতিকবিতা—সে সমস্তই যুক্তিবাদমূলক কিংবা উচ্ছৃঙ্খল স্বভাববাদমূলক। সেইরূপ আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, অবরোহণ-পদ্ধতি অনুসারে এবং কতকগুলি সাধারণ প্রতীতি অনুসারে চলিয়াছে; পক্ষান্তরে উনবিংশতি শতাব্দীতে বিজ্ঞান, আরোহণ-পদ্ধতি ও পরীক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছে। এইজন্যই উনবিংশতি শতাব্দীর পূর্বে বৈষয়িক সভ্যতার উপর বিজ্ঞানের প্রভাব অল্পই লক্ষিত হয়; উনবিংশতি শতাব্দী, বৈষয়িক সভ্যতাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। সেইরূপ আবার সভ্যতার বিভিন্ন রূপের সহিত, শাসন-তন্ত্রের প্রত্যেক রূপের মিল আছে; এবং কোন বিশেষ অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য, তত্ত্বতা অধিবাসাদিগের দৈহিক ও নৈতিক গুণসমূহ,—মানব-ক্রমবিকাশের কোন এক সময়ে, কোন জাতির প্রাধান্য যেমন একদিকে নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করে সেইরূপ আবার অন্য এক সময়ে ক্রতবেগে তাহাকে অবনতির পথে লইয়া যায়।

সমসাময়িক ভারতের বৈষয়িক সভ্যতার মধ্যে আমরা সেই একই লক্ষণ সকল দেখিতে পাই যাহা ভারতের নৈতিক সভ্যতার আলোচনায়, আমাদের চোখে ঠেকিয়াছিল—সেই ইত্তত্ত ভাব, সেই গোলযোগ, সেই লৌকিক আচার-ব্যবহারের পরস্পর-বৈপরীত্য, সেই সহসা-সংসাধিত মৌলিক পরিবর্তন—সবগুণ্ড মিলিয়া সেই এসায় ও যুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে একদিকে মিলন-চেষ্টা, আর-একদিকে সংগ্রাম।

\* \* \*

ভারতের অধিকাংশ লোকই পল্লী-অঞ্চলে বাস করে। অতএব ভারতের বৈষয়িক আলোচনার আরম্ভেই কৃষিপ্রধান ভারতের আলোচনা করা আবশ্যিক।

তিনটি আলোচ্য বিষয় যথা,—ভূ-স্বাধিকারের পদ্ধতি; গ্রামের গঠনপদ্ধতি; প্রধান প্রধান চাষের বিবরণ।

\* \* \*

এই ভূ-স্বাধিকার পদ্ধতিটি বড়ই জটিল ও গোলমালে ধরনের; এই পদ্ধতি হইতেই ভারতীয় সভ্যতার সমস্ত ক্রমবিকাশ আমরা অবগত হই।

\* \* \*

প্রথমে, যে-সকল সমাজ অ-সমাক্ষ-পরিপুষ্ট তাহাদের সমাজ-গঠন সাধারণসম্পত্তিমূলক হইয়া থাকে। কেহ কেহ কস-দেশীয় “মিরের” সহিত ও জাপানী ‘মুরার’ সহিত ভারতীয় গ্রামের তুলনা করিয়া থাকেন।

দুই ধাঁচার গ্রাম আছে।

প্রথম ধাঁচার গ্রাম দাক্ষিণাত্যে খুব

সাধারণ।<sup>১</sup> প্রত্যেক পরিবারের পৃথক পৃথক গৃহ, পৃথক পৃথক মাঠ। কিন্তু সকল অধিবাসীই সাধারণ ধনসম্পত্তির অধিকারী, উৎপন্ন দ্রব্য সকলেই আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লয়। দ্বিতীয় ধাঁচার গ্রাম, কোন এক জাতের, কোন এক পরিবারের কিংবা কতকগুলি পরিবারের অধিকার-ভুক্ত। যে জাত এই গ্রামের স্বত্বাধিকারী সেই জাতের লোকই সাধারণধনসম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকে; অথ জাতের লোকেরা নিজের নিজের বাড়ীর ও মাঠের ক্ষুদ্র ভাড়াস্বরূপ নির্দিষ্ট কর দেয়। তাহারা গ্রামের স্বত্বাধিকারী নহে, তাহারা অধিবাসী মাত্র। এই ধাঁচার গ্রাম উত্তর-পশ্চিমফলে খুব সাধারণ।

এই আদিম-ধরনের সমাজ-গঠনের উপর আবার সামন্তপদ্ধতি চাপান হইয়াছে। 'মোগল শাসন-পদ্ধতির অধানে এই সামন্ত তন্ত্রও একটু পরিবর্তিত হইয়াছিল। লোকেরা সম্ভ্রান্ত ও দাস এই দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল; এখন দাসদিগের দাসত্ব মোচন হইয়াছে, কিন্তু অনেক প্রদেশেই পুরাতন জাগীরদার বা সামন্তদিগের অধীনস্থ শ্রমী এখনও বস্তুমান আছে— বাঙ্গলার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার, মধ্যভারতের মালগুজার ইত্যাদি (১)।

যে তত্ত্বটি প্রথমে প্রাচীন হিন্দু আইন স্থাপন করে, এবং মোগলেরা চীনেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরিপুষ্ট করে, সেই তত্ত্বটি এই:—সমস্ত জাম সরকারের; এবং রাজস্ব ও ভূমিকর একই; উহার মধ্যে কোন পাখ্যাক্য নাই! পরিশেষে হংকোংয়ের শাসন-তন্ত্রও এই তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া সমস্ত আনান্দ ও অস্থায়ী অধিকারের বিরোধ নিবারণার্থ কতকগুলি উপ-স্বত্বাধিকারী সৃষ্টি করে। ছয়টি বড় রকমের পদ্ধতি। বঙ্গদেশে, জমিদারের জাম:—কৃষকেরা জমিদারের রায়ৎ; রাজতেরা জমিদারকে বাজনা দেয়। জমিদারেরা আবার ১৭৯৩ অব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে সরকারকে চিরনির্দিষ্ট বাৎসরিক বাজনা দেয়: এই রাজস্বের পরিমাণ আজকাল—উৎপন্ন কাচা মালের উপর শতকরা ৫ হইতে ৬। নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া জমিদার ও রায়তের মধ্যে মামলা চালাইতে 'সরকারী বাধা' দেন না। কিন্তু ১৮৫২ অব্দের ১০ আইন, ১৮৬৮ অব্দের ৮ আইন, এবং রায়ৎকে ১৮ ৫ অব্দের রায়তী স্বত্ত্বের আইনের সর্ত্ত অনুসারে জমিদার রায়ৎকে জাম হইতে অন্ত্যায়রূপে উচ্ছেদ করারিতে পারেন না, এবং অন্ত্যায়রূপে বাজনাও বাড়াইতে পারেন না। রায়ৎদিগের কৃষিকার্ত্তি জীব্যের মূল্যের পঞ্চমাংশ বা ষষ্ঠাংশ জমিদারের

(১) M. Baden Powell-এর বিবেচনায়, (Land Systems of British India) এই দ্বিতীয় ধাঁচার গ্রামগুলি—সামন্ততন্ত্র হইতে উৎপন্ন, গ্রামের স্বত্বাধিকারী কোনও জাত—প্রাচীন কোন অধিপতির বংশ। আমায় মতে, অনেক স্থলেই, এই স্বত্বাধিকারী জাত—প্রথম-বাসিন্দার বংশ, সামন্ততন্ত্রাধীন বংশ নহে।

খাজনা হিসাবে প্রাপ্য (২)। অযোধ্যায় ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে, জমি যেমন রায়তের তেমন বড় বড় ভূস্বামীরও (জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি); উহাদিগকে রায়তের খাজনা দিতে হয়। কেবল বেনারস জেলাটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন; অষ্ট স্বর্ক্সত্র, রাজস্ব বিভাগের কন্সটারীরা ৩০ বৎসর অন্তর জমি নতুন করিয়া জরিপ জমাবন্দী করে; ভূমির উৎপন্ন মূল্যের শতকরা ৮ হইতে ১০ অংশ পরিমাণ ভূস্বামীদিগকে রাজস্ব দিতে হয়। ১৮৫৫ অব্দের শাহারানপুরে যে নিয়ম প্রবর্তিত হয় তাহাতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সরকার উহাদের নিকট হইতে ভূমিকরের অর্দ্ধাংশের বেশী দাবী করিতে পারিবেন না (পূর্বে সরকার কখন কখন ৬ দাবী করিতেন) বঙ্গদেশের গ্রাম এই সকল প্রদেশে জমিদারের অত্যাচার হইতে রায়তের স্বত্বাধিকার তেমন সুরক্ষিত নহে, রায়তেরা ভূস্বামীকে গড়-পড়তায় উৎপন্ন মূল্যের পঞ্চমাংশ খাজনা দেয়।

পঞ্জাবে অধিকাংশ ভূমি গ্রামের জনসাধারণ-মণ্ডলীর অধিকারভুক্ত:—রাজস্বের হার সাধারণত: ৩০ বৎসরের জন্য স্থিতিশীল। শাহারানপুরের প্রবর্তিত নিয়ম উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের গ্রাম পঞ্জাবেও প্রচলিত রহিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গ্রাম পঞ্জাবেও রাজস্ব ও ভূমিকরের হার প্রায় একই সীমায় পৌঁছিয়াছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বড় বড় ভূস্বামী-কারী খুবই কম এবং রায়তেরা সরকারেরই খাস প্রজা; ভূমি-কর ও রাজস্ব সেখানে একীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রতি ৩০ বৎসর অন্তর রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়। এই রাজস্বের হার অতিশয় উচ্চ; M. Dutt বলেন,—কাঁচামালের হিসাবে, শতকরা ২০ হইতে ৩৩ অংশ; কিন্তু ইংরেজ-সরকার তাহার এট নির্দ্ধারণের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে, অল্প কতকগুলি জমিদার আছে—তাহাদের সাহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রায় সকল চাষাই সরকারের খাস প্রজা; সরকার তাহাদিগকে ৩০ বৎসরের মুদতে কিংবা তাহারও কম মুদতে পাট্টা দিয়া থাকেন। সরকার উহাদের নিকট হইতে বাদ-খরচা মোট আয়ের অর্দ্ধেক দাবী করেন, কাঁচামালের হিসাবে ৬ ম বা ৬ ম-এর অধিক দাবী করেন না। M. Dutt-এর গণনা-অনুসারে, শুষ্ক জমি শতকরা ১২ হইতে ২০ অংশ পরিমাণ এবং জল-সিক্ত জমি (সরকার-কৃত খালের স্বলে সিক্ত বৃত্তিতে হইবে) শতকরা ১৬ হইতে ৩০ অংশ পরিমাণ

(২) বঙ্গদেশে যে সকল জমিদারের ভূসম্পত্তি আরতনে ১১,৭৮৬,৭২৫ square acres, (১ acre = ৩ বিঘা), তাহাদিগকে ৫০,০০০ টাকার অধিক রাজস্ব দিতে হয়। ১১টা জমিদারির আরতন গড়-পড়তায় ৩৯৭,৮৯৬ acre এবং উহাদিগকে গড়-পড়তায় ২৭৬,৫০২ টাকা রাজস্ব দিতে হয়। অযোধ্যায় ভূসম্পত্তি আরতনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আরও ক্ষুদ্র।

Tenancy Act রায়দিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে, এক—বাহাদের দখলীদখ, আর এক—বাহাদের উঠ বন্দী বহ। প্রথমোক্ত শ্রেণীর দখাধিকার জমিদারেরই হইয়া থাকাপোক্ত।

খাজনা দেয়। এই সংখ্যকগুলি অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়। (৩)

মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি ভূস্বামী আছে, এবং কতকগুলি রায়ও আছে। জমিদারের নিকট সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব এবং রায়তের নিকট জমিদারের প্রাপ্য ভূমি-কর বা খাজনা উভয়ই সরকার স্থিরনির্দিষ্ট করিয়া দেন। ভূমি-করের অর্ধেক বা শতকরা ৬০ অংশ পর্য্যন্ত রাজস্বের হার উঠিতে পারে। M. Dutt বলেন, ১৮৯০ অব্দের পুনর্বন্দোবস্ত অনুসারে কতকগুলি জমিকে ভূমিকরের সমান রাজস্ব দিতে হইবে। কিন্তু এ কথা সরকার অস্বীকার করেন।

এই ভূস্বাম্যের পক্ষাতি হইতে কতকগুলি কথা মনোমধ্যে স্বতঃ আশিয়া উপস্থিত হয়।

প্রথমতঃ সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী একমাত্র সরকার—এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ অশিরাদেশলীয়া।

তাহার পর, হংরেজ আচার-ব্যবহার ও ভারতীয় আচার-ব্যবহারের মধ্যে একটা রফা করিয়া সমস্ত ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী যে সরকার, সেই সরকার কতকগুলি উপ-স্বত্বাধিকারীর সৃষ্টি করিয়াছেন :—বস্তুতঃ এই উপ-ভূস্বামীদিগের স্বত্বাধিকার প্রকৃত ভূস্বামীর স্বত্বাধিকারেরই অনুরূপ ; যেহেতু—উহাদের প্রাপ্য খাজনা ভূমি-করের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তথাপি মধ্যপ্রদেশে, রায়তের নিকট হইতে প্রাপ্য

উপ-ভূস্বামীর খাজনা সরকার স্থিরনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ সেই হংরেজী মতামতের প্রভাব, এমন কি, যে-সকল মূলতঃ হংরেজের বড় ছই রাজনৈতিক দলকে পারিচালিত করে, সেই সকল মূলতঃের প্রভাব-হহার মধ্যে পরিচালিত হয়। যে “জমিদার” বড় কৃষক মাত্র সেই জমিদারকে হংরেজদের রক্ষণশীল দল Land lord করিয়া দিলেন ; যে দাস-কৃষকদিগের কখনই কিছুই ছিল না, উদার-নৈতিকদল তাহাদিগকে ভূস্বত্বাধিকারী করিয়া দিলেন।

পরিণেয়ে ভারত জয় করিতে, এবং ভারতের প্রতিষ্ঠানাদির মধ্য ব্যাঘা ভারতের শাসন-প্রণালী স্থির করিতে ইংলণ্ড যে-সকল বাধা পাইয়াছিল, তাহা স্থিতিপথে পতিত হয়। কোনও দেশে আইন-ঘটিত এমন কোন ব্যবস্থা কি আছে—বাস্তলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে? কোন ভূস্বামী তাহার রায়বদিগের খাজনা কখনও বাড়াইবে না বলিয়া বচন-বদ্ধ হইলে, তাহাও বরং বুঝা যায়, কিন্তু কতকগুলি প্রজাদিগের রাজস্ব কখনও বাড়াইবে না বলিয়া কোন গভর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, অর্থাৎ অল্প সমস্ত করদাতাদের সহিত কোন চুক্তি না করিয়া সরকারের সমস্ত ভাবী খরচের বোঝা সমস্ত করদাতার উপর চাপাইয়া দেওয়া—এই যে বন্দোবস্ত ইহা নিশ্চয়ই ত্রাণ-বিরুদ্ধ, সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে ৩০ বৎসরের বন্দোবস্তটা আরও অস্বস্ত।

যে ভ্রমীতে যখন রায় ভূস্বামী বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাকে “রায়ভোগ্য প্রণালী” বলে।

অবশ্য সাধারণ ভূস্বামী শুধু ৩০ বৎসরের জন্য  
রায়বাদের সহিত বন্দোবস্ত করতে পারেন ;  
এবং ৩০ বৎসর অতীত হইলে আবার  
খাজনা বাড়াইতে পারেন। কিন্তু ভারতের  
রাজ-সরকার সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী এবং  
এমন দেশে স্বত্বাধিকারী যেখানে অধিকাংশ  
আধবাসী কৃষির দ্বারা জীবিকা-নির্যাস  
করে ; তাহ, সরকার রায়বাদের সহিত  
আপসে চুক্তি করেন না, পরস্পর নিদ্রয়ভাবে  
স্বকীয় স্বত্ব ভাহাদের উপর চাপাইয়া  
দেন। ভারত-সরকার শুধু ভূমি-কর-নিষ্কারণ-  
কারী ভূস্বামী নহেন,—ভারত-সরকারের  
অসীম আধিপত্য ; ভারত-সরকার কোন  
জনসভার সম্মতি না লইয়াই রাজস্বের তার  
নিষ্কারণ করেন। প্রজার নিজের ভূমির যে  
উন্নতি সাধন করে, সেহাতিসাবে যদি কোন  
গভর্ণমেণ্ট কোন প্রদেশে বিশ বৎসরের জন্য

কোন প্রদেশে দশ বৎসরের জন্য ভূমির মূল্য  
নির্দিষ্ট করেন এবং প্রজারা স্বকীয় কার্যিক  
শ্রমে যে আয় বৃদ্ধি করে, সেহা আয়ের তুল্য  
পরিমাণ কিংবা প্রায়-তুল্য পরিমাণ রাজস্ব  
যদি কোন গভর্ণমেণ্ট নিষ্কারণ করেন তাহা  
হইলে সেহ গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে ভূমি কি  
বলিবে ? ইহার দ্বারা কৃষকদিগকে নিরুৎসাহ  
ও কৃষিসংক্রান্ত সমস্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ করা  
হয় না কি ?

উপরি-উক্ত কথাগুলি হইতে দুইটি  
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ভারতের  
ভূমি-কর-পদ্ধতি হইতে ইহাই প্রদর্শিত হয়  
যে ভারতীয় সমাজ এখনো পরিবর্তনের পথে  
চলিয়াছে, এবং এই পরিবর্তন দেশ স্বকীয় দারিদ্র্য  
হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে চেষ্টা প্রবর্তন করে,  
এই পদ্ধতি অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে তাহার  
অস্তরায় (৪)।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

( ৪ ) এইজন্য ইংরেজ-শাসনকে ধোঁয়া করা আমার আদৌ অভিপ্রায় নহে। আমি শুধু দেখাইতেছি,  
যে দেশে একটা বিশেষ সমাজ-কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত জিনিসকোটি লোক, সে দেশকে রূপান্তরিত করিবার  
বাধা প্রায় অলঙ্ঘনীয় বলিলেও চলে। কিন্তু আমি আর একটা কথা বলিব। ভারতে কোন কোন  
প্রদেশে এতোক নূতন জমাবন্দিতে, রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারীরা, কৃষকদিগের কিংবা পত্তনীদারদিগের দ্বারা  
সংসাধিত উন্নতির মূল্য হিসাবে সেই মূল্যের তুল্য পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ; কিন্তু ইংলণ্ডে  
ভূস্বামী কোন জমি কাছাকেও ভাড়া দিলে, একশো বৎসরের পর, সেই ভাড়াটিয়ার নিশ্চিত সমস্ত ইমারৎ-আদি  
সহ সেই ভূমি পুনরাবহণ করিতে পারে ; যদি সেই ব্যক্তি আবার ভাড়া লইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে  
তাহার স্ব-নির্দিষ্ট ইমারতাদির জন্যও ভূস্বামীকে হ্রদ দিতে হয়। কিন্তু ভারতের পক্ষে তিনটি কথা  
বলিবার আছে। প্রথমতঃ ভারতের সম্বন্ধে এমন একটা আইন প্রয়োগ করা হয় কেন, যে আইন সমস্ত অর্থ-  
শাস্ত্রবেত্তারা দুই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ? তার পর, ইংরেজ ভাড়াটিয়া স্বাধীন, ভারতীয় রায়ৎ স্বাধীন  
নহে। ( যে আইরিশ রায়তের অবস্থা ভারতীয় রায়তের অপেক্ষা কম প্রতিফল ছিল,—ইংলণ্ডের মহাসভা  
সেই আইরিশ রায়ৎদিগের স্বত্বাধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন )। পরিশেষে বক্তব্য, ভারত-সরকারের  
ভূমিকর সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাটা ( বাস্তব পক্ষে ভারতের রাজস্ব একটি কর, ভূমির ভাড়া নহে ) সাধারণের  
স্বত্বাধিকারবিধি হইতে গৃহীত হয় নাই ; প্রকৃত ইংলণ্ডের ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার-বিধি হইতে গৃহীত হইয়াছে।

## বুকের ধন

পেলেছি যে ছাগলছানা একরত্তি হ'তে  
দাদাঠাকুর বেচতে ওহা নারবো কোনমতে ।  
শূন্য বুকে ভরতে আমি ছাগল পুঁথি ঘরে  
করিনক ব্যবসা পাঠার তোমার পেটের তরে ।  
ব'লছ তুমি কালোপুজার জন্ত নিবে পাঠা,  
সেই ভয়েতে আমার গায়ে দিচ্ছেনাক কাঁটা ।  
উচ্ছসে যেতে হ'বে বল্ছো বটে ডাকি'  
উচ্ছসে যেতে আমার নেই কিছু বাকী ।

অনেকগুলি ডাঁটো এবং অনেকগুলি কাঁচা  
মা কালীয়ে বছর বছর দিয়েছি ও বাছা ।  
দুখা হ'লে বলে ঠাকুর এবার শ্রামা-মায়  
পাগল বুড়ী ছাগল দিতে হয়না রাজা হায় ।  
পেটের ছেলে অনেক দেছে মটোন তার ক্ষোভ,  
শেষ-বয়সের বুকের ধনে কেন গো মার লোভ ?  
সবই যদি নেবে তাহার এক নিয়ে সে থাকে ?  
তার চেয়ে না সকাল-সকাল নিন্দা বুড়ীটাকে !  
আকালদাস রায় ।

## বন্দেমাতরম

( ৭ )

“আর বলো না পণ্ডিতমশায়, আমার  
সকলরারে রক্ত চন্‌চন্‌ ক'রে উঠছে, আমি  
আর শুনতে পারি নে।” বলিল রাজকুমারী  
জ্যোতিষ্ময়ী তাহার পণ্ডিত দেবব্রত  
ভট্টাচার্য্যাকে ।

প্রায় দুই বৎসরকাল ভট্টচাষ মহাশয়  
বালিকার সংস্কৃত শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইয়াছেন,  
বাড়ীর সকলেই প্রত্যাশা করিয়া আছে—  
এইবার অচিরে ভারতে দ্বিতীয় ‘গান্ধী’ বা  
‘উত্তর ভারতীয়’ অভ্যাদয় তাহার দেখিবে ।  
পণ্ডিতমহাশয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা আরও  
অধিক,—দ্বিতীয় কেন ছাত্রীকে অদ্বিতীয়  
পণ্ডিত করিয়া তোলাই তাহার অভিপ্রায় ।  
কেন না এই জন্তই তিনি বেতনভোগী,  
অধিকতম এই কার্য্য সাধন করিতে পারিলে—

পরশেকের অপেক্ষায় আর তাঁহাকে থাকিতে  
হয় না, ইহলোকেই তাতে-তাতে পুরস্কৃত  
কহিতে পারেন । কিন্তু সকলের এত বাসনা  
কামনা বাগ্ন করিয়া জ্যোতিষ্ময়ী সংস্কৃত  
শিক্ষার উপলক্ষে দাক্ষিণ্য কইল কিসে ?  
না দেখানুরাগে ।

রাজকুমারীর সংবাদপত্র পাড়বার নেশা  
কখনও ছিল না—এখনো নাই, কিন্তু জ্যোতি-  
ষ্ময়ী শুনতে চাহুক বা নাহ চাহুক, তাহাতে  
হুই আসে-যায় না,—যতরাজ্যের সংবাদ  
বচন করিয়া আনিয়া পণ্ডিতমশায় ছাত্রীকে  
শুনাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন । কোন  
ইংরাজের পদাধিপত্য, কোন কুলির শ্রীচা  
ফাটিয়াছে, ট্রেনের গাড়িতে, ট্রাম গাড়িতে  
ইংরাজ ফিরিজি কর্তৃক কোনদিন কোন  
ভারতবাসী লাহিও অপমানিত কইয়াছে,

কোটে ইংরাজ ভারতবাসীর মকদ্দমান্ন কখন  
কিরূপ অবিচার চর্চতেছে, এই সব খবর  
প্রধানত পণ্ডিতমশায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া  
বলেন। শুনিয়া ক্রোধে বেদনায় জ্যোতিষ্মদ্যর  
গোলাপী বর্ণ আগুনের মত রাগা হইয়া  
উঠে, তাহা দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের দেখ-  
পীড়নজনিত মনের আগা যেন প্রশমিত  
হইয়া আসে।

এখন পণ্ডিতমশায় বলিতেছিলেন, মফ-  
সলের একজন ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট অস্বাভাবিক  
স্রমণ করিবার সময় পার্শ্ববর্তী একজন ভদ্র-  
লোককে চাবুক মারিয়াছে। ভদ্রলোকটির  
অপরাধ, 'অন্তমনাবসত' তাঁহাকে সেলাম  
করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।"

এই সংবাদে জ্যোতিষ্মদ্য যেন নিজের  
অগ্রেষ্ঠ কশাঘাত অনুভব করিয়া উদ্ধীপ্ত  
কাতরস্বরে কহিল—“আমি আর ভুলিতে  
পারি না।” পণ্ডিতমশায় এত সহজে যদিও  
দমিবার পাত্র নহেন, কেন না মুখ বন্ধ  
রাখিতে হইলৈ দম ফাটিয়া তাঁহার প্রাণবায়  
বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তথাপি  
তিনি একটু ইতাসার স্বরে কহিলেন—“তবে  
থাক্, এসব কথা তোমার মত বালিকার  
না শোনাট ভাল। পড়।”

“না এখন আমার পড়তেও চেষ্টা করছে  
না।

পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার হাতের অমৃতবাজার  
পত্রিকাখানির পাতা উন্টাইয়া তাহার দিকে  
দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অন্তর্যম্বে বলিলেন “তবে  
অস্বয় কর? কস্মিনশ্চিবনে ভাস্করকো নামঃ  
সিংহঃ প্রতিবসতিস্ম।”

প্রথম পাঠ বালিকার অনেকদিন শেষ

হইয়াছে—এখন সে পড়ে রঘুবংশ মুণ্ডবোধ  
ইত্যাদি। কিন্তু পণ্ডিতের কথার প্রতিবাদ  
না করিয়া বালিকা অস্বয় করিল—কস্মিন-  
শ্চিবনে ভাস্করকো নামঃ সিংহঃ ত্রাসয়তি  
সংহানি জনগণাম্।

পণ্ডিতমহাশয় বুঝিলেন, একটা গল্প  
করিয়া ফেলিয়াছেন, বালিকার দিকে চাহিয়া  
একটু উত্তোজিত স্বরে বলিলেন—“দেখ  
রাজকুমারি, হাসি গামাসার কাল এখন।”

“আমি হাসি গামাসা করিনি—প্রাণ থেকে  
গা অনুভব করছি তাই বলছি। পড়তে পারব  
না এখন পণ্ডিতমশায়।” বলিয়া হাতের বই-  
খানা জ্যোতিষ্মদ্য ছুড়িয়া নীচে ফেলিয়া দিল।

গৃহের একপাশে তাহার শিক্ষয়িত্রী কুন্দ  
বালা চৌকিতে বসিয়া নীরবে সেলাই করিতে-  
ছিল। বইখানা উঠাইয়া টেবিলে রাখিয়া  
সে কহিল, “রাজকুমারি—সংবাদপত্রে কটা  
পীড়নের কথাই বা প্রকাশ হয়—! আপনি  
তাই ভুলেই এত অধীর হয়ে ওঠেন, সব  
কথা কানে গেলে না জানি কি করতেন!  
দেখুন দুর্জল হলেই সহ্য করতে হয়, এটা  
জগতের নিয়ম, ইংরাজ বাঙ্গালীর কথা ছেড়ে  
দিন, আমাদের দেশে দুর্জল অসহ্য নারী  
জাতির যে কিরূপ কষ্ট, কত লাঞ্ছনা ভোগ  
করতে হয় একটু বড় হলে তখন বুঝবেন।”

পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন বেগতিক, কিছু  
দিন পুস্তকই তাঁহার জীববিয়োগ হইয়াছে,  
আর তাঁহার অস্বয় অনুদর যে কতক পরিমাণে  
ইহার কারণ নয় তাহা তিনি মনে করিতে  
পারেন না। একটু তাড়াতাড়ি তিনি বলিলেন,  
—“তবে আমি আজ উঠি, আজ ত দেখছি  
তোমার পড়া হবেই না।”

“না পণ্ডিতমশায় বসুন, আর কিছু খবর থাকেত বলুন। আমি ভেবে দেখছি—কষ্ট হয় ব’লে বখাগুলো শোনা বন্ধ করাটা ঠিক নয়। তাতে ত পীড়ন বন্ধ হবে না।” জ্যোতিষ্ময়ীর অমুজ্জায় পণ্ডিতমশায় পরিত্যক্ত চেয়ার পুনর্গ্রহণ করিলেন। কন্দালা বলিল—“আমি প্রত্যক্ষ ঘটনা ছ-একটা জানি, শুনবেন রাজকুমারি? আমার একটি খুড়ত ভাই ভাগলপুরের ষ্টেশন-মাষ্টার, তিনি স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখেছেন।”

“বল না কন্দালা?” বালিকা কিছু বলবার পূর্বেই পণ্ডিতমহাশয় তাকে এই অমুরোধ করিলেন।

কন্দালা পণ্ডিতের দিকে চাহিতে গিয়া সম্মুখের দেয়ালের আয়নাখানায় অগ্রে দৃষ্টিপাত করিল,—মাখার শিখিল সাড়ীখানা ঠিক করিয়া লইবার ছলে কপালের কেশদাম অলক্ষ্যে ঠিক করিয়া লইয়া কহিল—“সেখানকার একজন বড় সাহেব—নাম করব না, কলকাতায় যাবেন,—ট্রেন ছাড়তে একটু দেরী ছিল, ষ্টেশনের খানায় বসে গেলাশের উপর গেলাশে মদ ঢালছেন—আর খাচ্ছেন, হুট ঘণ্টা দিলেও তাঁর হুঁস নেই, তৃতীয় ঘণ্টা পড়লো—আমার ভাই তাঁকে খবর দিলে যে এইবার গাড়ী ছাড়বে। তাড়াতাড়ি উঠে তিনি গাড়ীর উদ্দেশে ছুটলেন। তিনি তখন নেশায় চুরচুরে। পথে ছ-চারজন কুলি জনতা করে দাঁড়িয়েছিল, লাধি-মেয়ে তাঁদের সরিয়ে পথ করে নিলেন—খাকার একজন লোক ঠিক গাড়ীর সামনে পড়ে গেল, তিনি এমন জোরে জুতোর দ্বারা তাকে ঠেলে দিলেন—যে তার মাথা

ফেটে রক্তারক্তি হয়ে উঠল,—সাহেব তাতে ক্রক্ষেপ না করে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।” জ্যোতিষ্ময়ী নিস্তক হইয়া শুনিল, তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। খানিক পরে বলিল—“পণ্ডিতমশায় একটা কথা বলব? আমার মনে হয় খবরের কাগজে এ রকম দুর্বল-পীড়নের কথা পড়ে আপনারা আনন্দভোগ করেন। আর জানেন, সেই মনে করেই আমার বেশী কষ্ট হয়।”

“আনন্দভোগ করি?” পণ্ডিতমহাশয়ের নয়ন বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

“নিশ্চয়ই! যেমন রাস্তায় মারমারি হলে, পাথকেরা মজা অনুভব করে সেই রকম। নইলে ভাট বোন মা-বাপ লাঞ্চিত হচ্ছে দেখলে বা শুনলে কেউ কি চুপ করে থাকতে পারে?”

“কি করব বল? উপায় কি?”

“কি করবেন? প্রতিকারের চেষ্টা করুন।”

“প্রতিকারের চেষ্টা!” পণ্ডিতমহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। লম্বা দাড়ীতে হাত বুলাইয়া উদ্বেগে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“ভগবান যদি ইচ্ছা করেন তবেই প্রতিকার হবে। আমাদের মত দুর্বল জীবের প্রতিকার চেষ্টা, আর যুগকাণ্ডে কণ্ঠদান—একই কথা।”

“প্রতিদিন জীবন্ত দণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে যুগকাণ্ডে কণ্ঠদানও আমি ভাল মনে করি।” পণ্ডিতমহাশয় অসহায় বালকের মত কন্দালাকে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বেন নীরবে প্রশ্ন করিলেন—“এ মেয়ে পাগলের মত বলে কি?”



জ্যোতিষ্ময়ী বলিল—“আপনি ত আমাকে পড়িয়েছেন—উদ্ভমেন হি সিদ্ধান্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ। হংবাজিতো একটা প্রবাদ আছে নিজেকে যে সাহায্য করে ভগবান তার সহায় হন। জাতির মঙ্গল চেষ্টা করুন ত আর বিদোহিতা নয়—যে আপান ফাঁসি যাবেন। আলসেমির আরামটুকু ছাড়তে চান না বলেই এসব কাজে আপনারা উদ্ভম-হীন। আমি জ্ঞানলোক হয়ে যে কাজ অসাধ্য-সাধন মনে করি না—আপনারা পুরুষ হয়ে সে কাজে ভগবানের মুখ চেয়ে নিরন্তর থাকেন। ভগবান ত মাছুষের দ্বারাই কাজ করিয়ে নেন।”

পাণ্ডু ত মহাশয়ের ব্যবসায় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, তিনি সুখের মত কহিলেন—“কি কর্ত্তে বল ভূমি?”

“সহরে নগরে, গ্রামে পল্লীতে বিজ্ঞানায়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে শারীরিক তেজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে মনের তেজও বাড়বে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। তখন তাদের পীড়ন করতে কারো সাহসই হবে না।”

কুন্দবালা বলিল—“এক সময় হিন্দু মেলা নামে কল্কাতায় একটা মেলা হয়েছিল,—তার উদ্বোধনে দিনকতক নাকি ছেলেদের মধ্যে ব্যায়াম চর্চার খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল।”

পাণ্ডু মহাশয় বলিলেন—“হাঁ সে অনেক দিনের কথা,—আমরা তখন ছেলেমানুষ।”

জ্যোতিষ্ময়ী প্রশ্ন করিল—“বন্ধ হোল কেন?”

কুন্দবালা উত্তর কারণ—“আমাদের ত কার্যের উৎসাহ স্বর্ষা চন্দ্রের আলোক নয়

যে স্থায়ী হবে; তেলের বাতি আর কতক্ষণ জ্বলে?”

“সংসারে ত তেলের বাতির প্রভাব কম নয়। স্বর্ষা চন্দ্রকে ধরে রাখা যায় না,—কিন্তু সহজেই আমরা প্রদীপে তেলের যোগান দিতে পারি। আমাদের দেশের কবিরা দেশনাৎকরা কি বহুদিন ধরে তাই করছেন না? যখন পড়ি “তোমার তরে মা সঁপেছি দেহ তোমার তরে মা সঁপেছি প্রাণ”—তখন আমার দেহপ্রাণ নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে,—যখন পড়ি—

“তবু—তারা হাসে খেলে—

ভূমি ক্ষুধা কৃপাতুর—গৃহ ধন ধাতু পূর

অন্নজল তবু নাহি মেলে—

তবু— তারা হাসে খেলে।”

তখন আর হাসতে খেলতে ইচ্ছা করে না।”

“কিন্তু শকলের মনের ভাব এই রকম না হলে ত কোন কাজ হয় না।” বলিল কুন্দবালা;—উত্তর স্বরূপ পাণ্ডু মহাশয় বলিলেন—“মনের ভাবের অভাব বশতই যে লোকে নিরুত্তম—আমরা তা মনে হয় না। গভরমেন্টের অসম্মতি বলে ত একটা জিনিস আছে।”

বালিকা জ্যোতিষ্ময়ী এইবার অবাক হইয়া গেল,—কথাটা এমনই তাহার নিকট হস্তজনক মনে হইল। হাসিয়া সে বলিল—“গভরমেন্টের ভয়? কেন? গভরমেন্ট, আমাদের ত শত্রু নয়, আমাদের মঙ্গলাকাজী রাজা। আমাদের পীড়ন করে যারা—তারা সাধারণতঃ ছোট লোক ইংরাজ—নয়ত হানচেতা গভরমেন্ট কর্মচারী। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের অপরাধের দ্বায়ী কি গভরমেন্ট?

গভরমেন্টই আমাদের মঙ্গল কামনায় সহবে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন,—আর আমরা ব্যায়াম চর্চা করতে গেলে তারা নিষেধ করবেন? এ কখনই হতে পারে না। দেশের লোকের মন যে কত তীব্র ছন্দল হয়ে পড়েছে—এইরূপ বৃথা ভয়ই তার প্রমাণ। একথা শুনে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিশ্চয়ই হাসবেন।”

পণ্ডিত বলিলেন—“আমরা ও গভরমেন্ট কর্মচারীকে গভরমেন্ট থেকে পৃথক করতে পারি নে। তাঁরা পদে পদে তাদের কার্যে জানিয়ে দেন যে, আমরা তাঁদের জুত বহনেরও যোগা নই—কর্মচারীদের আমাদের প্রতি এই যে অসম্মান রণা, গভরমেন্ট তা থেকে কি আমাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেন?”

জ্যোতিষ্ময়ী বলিল—“অবশ্যই করেন, নইলে শাসননীতির অর্থ কি? গভরমেন্ট ও আর আমাদের জন্তে আর ইংরাজের জন্তে আলাদা আইন করেন নি। দণ্ডনীতি ও ইংরাজ ভারতবাসী উভয়ের পক্ষে একই! এই খানেই ব্রিটিশ রাজ্যের উদারতা।”

“হ্যাঁ বহির পাতাতে বটে, কিন্তু কাঁথা ও ঠিক বিপরীত।”

“আপনি আবার ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে গভরমেন্টকে এক করছেন। গভরমেন্ট যে অত্যাচারী পক্ষপাতী—এইরূপ মনে করাই যথার্থ বিদ্রোহিত। \* আমি যদি বিচারক হতুম—আর দেখতুম কোন বাঙ্গালী ইংরাজের প্রতি অত্যাচার করেছে—তাহলে তাকে এক তিলও কম দণ্ড দিতুম না।—এ আমি খুব জানি। তায়ের কাছে ত স্বদেশ বিদেশ নেই। আর এত বড় ভারত-সাম্রাজ্য ধারা

শাসন করছেন—এ একম পক্ষপাতী নীতি কি তাঁরা অবলম্বন করতে পারেন?”

পণ্ডিত বলিলেন—“তুমি এখনো অসাঁচীন পরে বুঝবে তা পারেন কি না এবং করেন কি না? আমরা যদি ইংরাজের সমাদিকার পেতুম—তাহলে ও আমাদেরই ক্ষমতাবার কোন কারণ থাকে না! তখন তুলে আশীর্বাদ করতে করতে পৃথকভাবে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে বুদ্ধকালে নিশ্চিন্ত মনে বনগমন করতুম। চলবাটবিলেব সময় কি হয়েছিল রাজাবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা কোরো। আর একজন ট্যাসফারিঙ্গও অঙ্গ দারবের অধিকারী কিছু ভোমাব বাবারও লাঠিসেন্স দিয়ে তবে ঘরে অঙ্গ রাখতে হয়। তিনি ও কনগ্রেসের একজন নেতা, কোন ভংগে কনগ্রেসের মূচনা—তাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানবে। তুমি এতমাত্র বলে রাজা আমাদের মঙ্গল চেষ্টার বিরোধী হতে পারেন না, কিন্তু কোন গভরমেন্ট কর্মচারী দেশের লোকের কনগ্রেসে যোগ দিতে সাহস করেন না কেন?—না গভরমেন্ট কনগ্রেসকে মনছবে দেখেন না। আর রাজপুরুষের এই বৃথা সন্দেহ ভুল বিশ্বাসই আমাদের উত্তম-ধীনতার প্রকৃত কারণ।”

জ্যোতিষ্ময়ী নিশ্চক্ৰভাবে সকল কথা শুনি, এই বিষয়ের একটা দিক যেন সে আজ প্রথম দেখিতে পাইল। কিছু পরে বলিয়া উঠিল—“কোন মিথ্যা বা ভুল চিরদিন কখনো স্থায়ী হয় না। এমন এক সময় নিশ্চয় আসবে যখন রাজা প্রজা উভয়েই আপনাদের ভুল বুঝতে পারবে। প্রজা বুঝবে আমাদের নিজেদের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের

জগে রাজ-ভয়ের বাধা কাটিয়ে উঠতে হবে, আর রাজ্যও বুঝবেন, প্রজার মঙ্গলে রাজারই মঙ্গল—তাঁহারই শক্তি বৃদ্ধি, অতএব প্রজা-শক্তিকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে প্রশ্রয় দেওয়াই রাজ-কর্তব্য।”

কুন্দবালা বলিল—“কোন ভুল কি সহজে ভাঙ্গে রাজকুমারি? তুল ভাঙ্গতে অনেক সময় জীবন পর্যন্ত নাশ হয়।”

জ্যোতিষ্মার নয়নে অনুরাগ-আলোক,—  
সরে উৎসাহ-বাহু জলিয়া উঠিল, মুহূর্তমতী  
কল্যাণী যেন কাহিল—“বেশ, প্রাণ দিয়েও  
যদি এ ভুল ভাঙ্গাতে হয় তাতেও আনন্দ  
ছাড়া ভুগে কব্বার কি আছে? আমি  
একজন সামান্য বাঙ্গালী মেয়ে, অজ্ঞায়ের  
দমনে এত তেজ এত বল অনুভব করছি  
আমি কোথা থেকে? আমাদের দেশের  
আকাশে বাতাসেই কি সে তেজ ছড়ানো  
নেই? আমি নিশ্চয় বলছি, আমি যেমন  
আজ এখানে এরকম করে ভাবছি—তেমনি  
আরও অনেকেই ভাবছেন। প্রাণে প্রাণে  
আমাদের বৈজ্ঞানিক সংবাদ চলিত হচ্ছে।  
আমরা কৃতকায্য হবই হবে। সময় এসেছে—  
সময় এসেছে,—অজ্ঞায় চিরদিন জয়া হয় না।”

দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের নয়নে আনন্দময়ের  
দেবীমূর্তি সহসা বিভাসিত হইয়া উঠিল,  
তাঁহার কণ্ঠ হইতে বায়ুধ্বনির প্রথম গীতি  
ধ্বনির থায়া উচ্চারিত হইল—দেবী, মা, তুমি  
ধন্য! বন্দেমাতরং!

(৮)

অতুলেশ্বর যখন নিভান্ত শিশু তখন তাঁহার  
পিতা রাজা ধমেশ্বরের মৃত্যু হয়। তাঁহার  
অভিভাবক পিতৃবা নিঃসন্তান রাজা ধমেশ্বর

দাক্ষপুত্রকে সম্ভানের মতই স্নেহ করিতেন।  
কম্পের লোক মন্দ ছিলেন না—কিন্তু পান-  
দোষে তাহাকে নিপুঞ্জ ও অকর্মণ্য করিয়া  
ঢ়ালিয়াছিল।

প্রসাদপুরের রাজাগণ চিরদিনই কথা-  
বিত্তার অল্পরাগী এবং উৎসাহদাতা।  
অতুলেশ্বরের পিতামহ রচিত সঙ্গীতাবলী  
বেঞ্চব কবিদিগের পদাবলীর জায় পূর্য্যকালে  
সমাদরে গীত হইয়া থাকে। ধমেশ্বরের  
যদিও রচনা ক্ষমতা নাই কিন্তু গানবাণী  
লইয়াই প্রায় তাঁহার সময় কাটে। যাত্রাদি  
পর্বের ও কথাই নাই—সময় সময় কলিকাতা  
হইতে বাহাজির আসে—এবং পিয়েটারও  
আসে। তিনি ভাষা রাখিলেন—কলিকাতার  
কোন ধনীভবনে হারা বুলবুল নামে দুই  
স্বাধীনতা গায়িকার সাহিত সঙ্গত্ করিতে  
গিয়া অদ্বিতীয় পাখোয়াজি গোলাম আব্বাসের  
এত পারশ্রম হইয়াছিল যে গান শেষে হাটফেল  
করিয়া তখান তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়  
গোলাম আব্বাসের অভাবে তিনি যে বাহাজি  
দুই জনকে রাজসভায় ডাকিতে আহ্বান  
করিতে পারলেন না—এই আপশোষে  
তাঁহারও হাট ফেল করবার উপক্রম  
হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার মোসাহেব  
দল মাঝে মাঝে সখের যাত্রাও করিত এবং  
তাঁহার সভায় কবির লড়াইও চলিত। এই  
যুদ্ধে তিনি যাহাকে বহুবা প্রদান করিতেন—  
তাঁহার অবস্থা ফিরিয়া যাইত। নিম্নে একটি  
উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

একটু ফিকা-রঙের খোস মেজাজে রাজা  
কাহিলেন—“আজ অমাবস্তার রাত, চাঁদ উঠবে  
কিনা বল ত হে?”

একজন তৎক্ষণাত্ উঠিয়া গান দরিল—

আমরা মোদের রাজারেই আনি ;

হুয়া চল্লের না পার পার যমকে না মানি।

রাজা মোদের ঢালেন সুখা—

তৃপ্ত করেন তৃষ্ণা ক্ষুধা—

সমুপ্রাণে স্তুতিগানে—তীরেই পাখান।

তাহার গান শেষ হইলে দ্বিতীয় জন গায়িল—

শ্রীবৃন্দাবনে ওগো শ্রীবৃন্দাবনে—

ধরা দিল আমার শরী রাধিকার সনে।

যে দেখিল সেই মজিল—প্রাণে মনে।

তৃতীয় জন তখন উঠিয়া গায়িল—

প্রেমের বস্তা উথলে যখন উঠেগো মনে—

আধারের বাঁধ আপনি যায় টুটে—

অমাবস্তায় ভরা চাঁদ ফোটে

আলোক-দূলের ঝরণা লোটে—বিশ্ব-ভবনে।

রাজা ইহাকেই সভা-কবির শিরোপা প্রদান করিলেন।

রীতিমত নেশা শুরু হইলে কিছু রাজা ভিন্ন লোক হইয়া পড়েন—তখন তাহাকে সামলান দায় হইয়া উঠে। সে সময় প্রায়ই তিনি পদবজে ভ্রমণে বাহির্গত হন। তাহার দল-বল সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে থাকে। অগ্রগামী রাজার আশ্বে পার্শ্বে পশ্চাতে থাকিয়া—মোসাত্তেবুগল কেত ধরেন আলবোলা ( নলটি কিছু রাজার মুখে ) কাহারো দ্বাতে মদের বোতল, কেহ লইয়াছেন গ্লাস, কাহারো গলায় মুদঙ্গ ঝুলিতেছে—কেহ বা সেতার তান-পুরা বহিয়া চলিয়াছেন। এই অপরূপ দৃশ্য যে দেখে তাহার হাত্ত সঞ্চরণ করা হঃসাধা হইয়া উঠে।

অতুলেশ্বর কলিকাতায় থাকিয়া পড়া-

শুনা করিতেন। ছুটিতে যখন বাড়া

আসিতেন তখন কয়েশ্বর পূব সাবদান হইয়া

চলিতেন—একদম দৃশ্য তাহার নজরে পড়িত

না। একবার মনে আসময়ে বাড়া আসিয়া

পুল্লভাতের গ্রহ অবস্থা তিনি দেখিয়াছিলেন।

কিছু দেখিয়া তাহার হাসি পায় নাহ, জুদয়

লক্ষ্যায় বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার সমবয়সা দূরসম্পর্কীয় একজন

আত্মীয়কে তখন হাসিতে দেখিয়া তিনি

আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাহ, তাহাকে

চপেটাঘাত পুষ্পক গৃহে গিয়া বলকের

স্তায় রোদন করিয়াছিলেন। মদ্যপানে

যাহ্নস যে কিকরূপ পশুর অদম হইয়া পড়ে

এই দৃষ্টান্তে তাহা তিনি শিক্ষাগ্রাহ্য করিয়া-

ছিলেন। তিনি মদ সম্পর্ক করিতেন না।

কয়েশ্বর পাদতপক্ষে চংরাজদের সতিত

মিশিতেন না—কিন্তু দেখা হইলে নত হইয়া

সেলাম করিতে বা মন যোগাঙ্গী' কথা কহিতে

ফ্রটি করিতেন না। জমাদারের পক্ষে কাহা

উদ্ধারের হুহাহ অব্যর্থ পলিসি বলিয়া সেকালে

জ্ঞান ছিল। কিন্তু কলেজের শিক্ষাদীক্ষার

ফলে অতুলেশ্বরের ভিন্নরূপ মেজাজ হইয়া

উঠিল, কোন ম্যাজিকট্রেট দেখা করিতে আসিলে

বা তিনি কাহারও নিকট গমন করিলে

কখনো সেলাম করিতেন না। কিন্তু যেখানে

কয়েশ্বর করেন সেলাম—সেখানে তাহার

ভ্রাতৃপুত্র কেবল সেকহাণ্ড করিবার

জন্ত হাত বাড়াইয়া দিলে দেখায় নিতান্ত

অদ্ভুত, সেইজন্ত, কয়েশ্বরের নিকটে কোন

চংরাজ আসিলে তিনি সেখানে অমুপস্থিত

থাকিতেন। তাহাতে কয়েশ্বর অসন্তুষ্ট

হইতেন। একদিন কিছু অতুলেশ্বর দর  
পাড়িলেন। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া বৈঠক-  
খানায় পদার্পণ করিয়াই দেখিলেন—কশ্মীর  
দুই একজন ইংরাজের সহিত বসিয়া গল্পগুস্তা  
করিতেছেন। কুমার আসিতেই তিনি পত-  
স্পরের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। কিছু  
অতুল ত কই কাতাকেও সেলাম করিল না।  
জামুখে সকলকে ভাত বাড়াইয়া দিল।  
কশ্মীর মনে মনে প্রমাদ গণিলেন,—একদিন  
যে এ শিক্ষার ফলভোগ করিতে হইবে  
তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ রহিল না।  
অতুলেশ্বর যে-কয়দিন বাড়ী রহিলেন পুনঃ  
পুনঃ নিজের কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে  
হিতোপদেশ দিতে লাগিলেন। সে কয়দিন  
ভাবনায় চিন্তায় মদের ঘাস পর্য্যন্ত তাঁহার  
মুখে উঠিল না—সভা নিশ্চক্ৰাব ধারণ করিল,  
—মোসাহেবগণ সূত্রে নিদ্রা দিয়া বাঁচিল।  
কশ্মীরের উপদেষ্টার ফল যে নিতাস্তই  
বিফলে পরিণত হইয়াছে,—অচিরে রাজা  
একদিন বুঝিতে পারিলেন। ইলবাট বিলের  
সময় বালক অতুলেশ্বর প্রসাদপুরে এক  
প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করিয়া স্বয়ং হইলেন  
তাহার প্রেসিডেন্ট। ইহার পর মাজিষ্ট্রেট  
সাহেব আসিয়া কশ্মীরের সহিত কি  
কথাবার্তা করিয়া গেলেন কেজানে, রাজা  
বোম্বিত হইল—অতুলেশ্বর এখন নাবালক—  
তাঁহার কোন কার্যকলাপ রাজার অনুমোদিত  
নহে। কুমার অতুলেশ্বরের কোন কার্যে  
প্রজাগণ যেন বোগদান না করে। ইহার  
অব্যবহিত পূর্বে অতুলেশ্বর ব্যায়াম-সমিতি  
প্রভৃতি দেশহিতকর নানা সভা সমিতি স্থাপন  
করিয়াছেন; রাজার আদেশে—অকালে সে

সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল কুমার মর্শ্বসীড়িত  
হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সেখানে  
তিনি নানারূপ দেশহিতকর অশুষ্ঠানে যোগ  
দিতেন—কিছু নিজের রাজ্যে তিনি নগণ্য  
পুরুষ হইয়া রহিলেন। কার্য্যতঃ কিছু করিতে  
না পারিলেও গানে কাবিতায় তাঁহার দেশাত্ম-  
বাগ প্রকাশিত হইতে লাগিল।—

কশ্মীরের যত্ন চাইল—জ্যোতিষ্ময়ী  
জন্মিবার দুই একমাস মাত্র পূর্বে। অতুলেশ্বর  
যখন রাজা হইলেন তখন তাঁহার বয়স  
প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। তাঁহার পর  
রাজার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে  
এবং তাহার ফলে তাহার জীবনের গতি  
কোন্ দিকে ফিরিয়াছে তাহা পাঠক অবগত  
আছেন।

প্রাসাদসংলগ্ন নবান্মিত গৃহে বসিয়া  
রাজা অতুলেশ্বর লেখাপড়া করেন। গৃহে  
জানালা দরজা অনেকগুলি, দক্ষিণের জানালা  
হইতে শীতকালে ধলেশ্বরী রক্ত-পাতের মত  
নয়নে প্রতিভাত হয়,—বর্ষাকালে ইঁহাই বিশাল  
আকার ধারণ করিয়া তেজস্বিনী শ্রোতস্বিনী  
মুষ্টিতে রাজবাটীর অনতিদূরে বহিয়া যায়।  
গৃহের সম্মুখেই মুক্তছাদ—সকালে সন্ধ্যায়  
রাজা এইখানে বসিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন  
করেন—জ্যোতিষ্ময়ী সময় পাইলেই পিতার  
কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। আসিবার সময়  
বাগান হইতে তাঁহার জন্ত কতকগুলি  
ফুল ভুলিয়া আনে। রাজা প্রভাতে অরুণ-  
রাগ-রঞ্জিত আকাশে নবোদিত সূর্যের শোভা  
দেখিয়া তন্ময়ভাবে স্বরচিত গানে ঈশ্বর-বন্দনা  
করেন—বালিকা মুগ্ধভাবে তাহা শুনিয়া—

তাহার সঙ্গে সঙ্গে তান ধরে। বৈকালিক বায়ু সন্ধ্যার পরেও প্রশান্ত রজনীতে পিতাপুত্রীতে এইখানে আসিয়া বসেন। রাত্রি জ্যোতিষ্ময়া হইলে রাজা কন্যাকে সেতার বাজাইতে বলেন; কখনো কখনো তাহার হাত হইতে সেতারটা টানিয়া লইয়া নিজেই বাজাইতে থাকেন। জ্যোতিষ্ময়ার সেতার শিখা হইয়াছে তাহার পিতার চ নিকটে। মাঝে মাঝে রাজা যখন কন্যার সংস্কৃত বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করেন, তখনই জ্যোতিষ্ময়া মনে মনে বিপদ গণে। বিভ্রাটশিখায় সে যে আশাভরূপ মনোযোগ দিতে পারিতেছে না—হতা সে নিজে বেশ বোঝে।—রাজা কিন্তু পরাক্রম অসম্বলিত কোন কারণ পান না। প্রথম প্রথম জ্যোতিষ্ময়া পণ্ডিতের কাছে যখন দেশ-পীড়নের কথা শুনিতে তখন পিতার নিকট সে কথা তুলিয়া তাহাব সত্যমিত্যা সে যাচাই করিয়া লইতে চাহিত। রাজা কিন্তু এসকল কথায় তাহাকে প্রশ্রয় দিতেন না—প্রায়ই রাগ করিয়া বলিতেন “এসব খবর তোমাকে কে দেয়? খবরের কাগজ পড় বুঝ? অনিবারণ করে দেব—বাড়া ভিতরে যেন খবরের কাগজ না যায়। বেশ কেনো খবরের কাগজের অনেক কথাই অতিরঞ্জিত, তোমার কোমল মনের উপর ওসব খবরে অনর্থক আঘাত দিচ্ছে।” জ্যোতিষ্ময়ার মত বুদ্ধিমত্তা বালিকার নিকট পিতার মনের ভাব অপ্রচ্ছন্ন রহিল না,—তিনি যে কেন এসব কথা কন্যাকে জানিতে দিতে চান না—তাহার সে বেশ একরকম অর্থ করিয়া লহল। পণ্ডিত মহাশয় যে তাহার গেজেট—এ কথা কিন্তু একেবারেই পিতাকে জানাইল না, বুঝিল

তাহা হইলে তাহার কাজটি থাকবে না। জ্যোতিষ্ময়া এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ সাবধানে পিতার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল—এই এক বিষয়ে তাহার মনের ভাব পিতার নিকট অপ্রকাশিত রাখিল, ভাবিল যদি বিদ্যাতা দিন দেন তখন পিতাকেও তাহার পক্ষ করিয়া লহবে।

রাজা আপাততঃ উল্লসিত ঘরে ঢৌবলের নিকট চৌকিতে বসিয়াছিলেন। তাহার সম্মুখে কাঁবতার বড় একখানা খোলা কিস্তি সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাহ; গৃহদেয়ালে টাঙ্গান রাজপরিবারের বহু তৈলাচবের মধ্যে একখানির দিকে তিনি তন্ময়ভাবে চাহিয়া ছিলেন। ঐখানি তাহার প্রমত্তামতী যোগমায়া দেবার বালাকালের অশ্রুজ্ঞা মুদ্রি। রাণী যোগমায়ার পিতা সোমেশ্বর রায়ের অঙ্কিত ছোট পেন্সিল-স্কেচ হইতে পরে হতা একখানি বড় তৈলাচবে পরিণত হইয়াছে। এ-চিত্রে বালাকা যোগমায়া • যোদ্ধা পুরুষের সঙ্গে সাজিত। তাহার মস্তকে শিরদ্বাপ, বক্ষে ঢাল, হস্তে বর্ষা এবং কটিদেশে তরবারী বিলম্বিত। এই সঙ্গে তাহাকে অতি সুন্দর দেখাতোছিল। রাণী যোগমায়া দেবার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ বাক্য রাজ্য মধ্যে প্রচলিত। তাহার মধ্যে একটি এই যে, একসময় রাজ্যে বর্গি আক্রমণের বড় ভয় হইয়াছিল। তখন রাজজামাতা—রাণীর স্বামী দেশে ছিলেন না। দেওয়ান কোতোয়ালের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে বালক পুত্রহইটির সহিত রাণীকে অত্রই কোথাও পাঠাইয়া দিয়া পণদানে সন্তুষ্ট করিয়া তাহারা বর্গিকে বিদায় দিবেন। কিন্তু রাণী

এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং সৈন্তবাহিনীর নায়করূপে অস্বারোহণ করিলেন। সৈন্ত-গণের মধ্যে তখন প্রবল উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। স্বয়ং মহিষমর্দিনী যুদ্ধে আগত এই বিবেচনা করিয়া ভীত বগৌদল বাণীমূর্ত্তিকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া পলায়নপর হইল।

যোগমায়ার এই অস্বারোহণ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আজ রাজা ভাবিতেছিলেন এই তেজস্বিনী রাণীর বংশধরগণ এখন কিরূপ হীনবল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। এখন রাজভবনে প্রহরীর হস্তেই বন্দুক তলোয়ার শোভা পায়! শৌকারের সময় ছাড়া সৈন্ত বেশে অস্ত্র ধরিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহাদের এখন নাই। ধীরে ধীরে তাঁহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। জ্যোতির্শ্বরীকে তিনি ঘাহাই বোঝান, নিজের মনে এ হীনতা তিনি খুবই অনুভব করেন। কিন্তু ইহা ভাবিয়া তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মাত্র—উফ শোণিত পূর্ব্বের জ্ঞান এখন আর চঞ্চল হইয়া ওঠেনা, মরিবার জন্ত প্রবল আকাজকা জন্মায় না।

একসময় কস্তুর জ্ঞান অত্যাচার-পীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্ত অস্ত্রাঘের বিরুদ্ধে তিনি বেকরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, সে তেজ সে উত্তেজনা তাঁহার স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল।

অনেককণ ধরিয়া রাণী যোগমায়া দেবীর ছবিখানি রাজা নিরীকূর্ণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখনই তিনি এ ছবি দেখেন তাঁহার মনে হয় এ যেন জ্যোতির্শ্বরীই প্রতিকৃতি। পুরুষ-বেশ ধারণ করিলে বুঝি বা তাহাকে ঠিক এই রকমই দেখাইবে। বড় ইচ্ছা করে এইরূপ সাজে তিনি কস্তার

একখানি ছবি তুলিয়া লন। যোগমায়া দেবীর সেই বসন ভূষণ শিরস্ত্রাণ এখনও মাতার নিকট সমস্তে রক্ষিত আছে তাহাও তিনি জানেন। তবে এ প্রস্তাবে মাতা পুত্রে যে একটা তুমুল দম্ব বাধিয়া উঠিবে—সেই কল্পনাতেই তিনি এ ইচ্ছাটাকে মনে মনেই চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

হঠাৎ তাঁহার চিন্তাতে বাধা পড়িল; ধারস্থ হরকরা গৃহপ্রবেশ করিয়া রাজাকে জানাইল যে “গৃহকণ্ঠচরী জ্ঞানবাবু জরুরি সংবাদ দিতে আসিয়াছেন।”

রাজাদেশে জ্ঞানবাবু সমীপস্থ হইয়া কাহলেন—“ধর্ম্মাবতার, মহারাণীর অনন্ত-ব্রতের ভেট ভট্টপল্লীতে পৌছিয়া দিয়া পুরোহিত শ্রীমারে ফিরিয়া আসিয়াছেন।”

“এ সংবাদ আমাকে দিতেছ কেন? মহারাণীকে গিয়া বল।”

“পুরোহিত জখম হইয়া আসিয়াছেন?”

“জখম! কেন? কে করিল?”

“ভুল ক্রমে তিনি মেমসাহেবদের ক্যাবিনে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন—তাই—”

“তাই—কি? মেমসাহেবরা মারিয়াছেন নাকি?”

রাজা অধীর হইয়া বাজের ভাবে এই প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে জ্ঞানবাবু বুলিলেন “সত্যই মেমসাহেবরা তাঁহাকে মারিয়াছেন—কুকুরের শিকল দ্বিরা মারিয়া ঠাকুরকে রক্তারক্ত করিয়া তুলিয়াছেন—তাঁহার অবস্থা বড় খারাপ।”

ক্রোধে রাজার শোণিত সর্কাজে যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, তিনি আরক্ত নয়নে বলিলেন—“কোথায় তিনি?”

“আমরা তাঁহাকে রাজবাড়ীর উঠানে আনিয়া ফেলিয়াছি।”

রাজা দ্রুতপদে অবতীর্ণ হইলেন। উঠানে আসিয়া দেখিলেন,—বৃদ্ধ পুরোহিতের আহত মস্তক কোলে রাখিয়া জ্যোতিষ্ময়ী তাঁহাকে বীজ্ঞন করিতেছে—সম্মুখে এসিয়া চকৎসক আহত স্থানে পড়া রাখিতেছেন—আর রাজ-বাড়ীর লোকেরা উভাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং জ্যোতিষ্ময়ীর আদেশে করমাস খাটিতেছে। রাজা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই জ্যোতিষ্ময়ী নত মুখ উন্নত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিল—তাহাব যত্নরূপ অশ্রুজল

আর বাধ মানিল না, আরক্ত নয়ন হইতে ক্রুদ্ধ করুণার দারা উথলিয়া উঠিয়া তাহার গণ্ড বাহিয়া পুরোহিতের মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল। সেই তেজস্বিনী নারীমূর্তির দিকে চাহিয়া রাজার পুনরায় মনে হ'ল, যোগমায়ার অঙ্কনটি নবশরীর ধারণ করিয়া বৃদ্ধ জ্যোতিষ্ময়ীতে পুনরাবর্তিত হইয়াছে!

এই সময় ভিড় চৌলয়া পণ্ডিতমহাশয় জ্যোতিষ্ময়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া অক্ষুট মুহু কণ্ঠে এসিয়া উঠিলেন—“বন্দে মাতরং!”

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

## বিদায়ের পর

( Alice Meynell )

বলোছি বিদায় বাণী হ'ল বহুদিন,

নিবেদিত তুমি সে আমাব,

শুধু তব নাম-মন্ত্র মর্ষ মাঝে গান

অস্তরের অনন্দ অপার!

কোন ধর্ম দরি আমি উঠিব আবার

তোমারে রাখিয়া দ্বাপাস্তরে?

দয়্য অর্থ কাম মোক্ষ তুমি যে আমার,

স্বর্গের সোপান স্তরে স্তরে।

প্রাতি তীর্থ পথ দ্বারে তুমি যে প্রহর,

অধিষ্ঠিত প্রত্যেক মন্দিরে,

আমার আরতি পূজা ধ্যান চিত্ত ভরি

জাগে শুধু তোমারেই ঘিরে!

দ্রাস্তি ত্যজি এক পদ হ'লে অগ্রসর

তোমারেই হোর আরো কাছে,

সম্মুখ যাত্রার পথে, ভরি চরাচর

তোমারি করুণা জাগিয়াছে!

কেমনে সরাব দূরে, কিসাধ্য আমার

তোমারে করিতে বিসর্জন?

পূর্ণ করি দিবা রাত্রি আলোক আঁধার

নিয়মিত করিচ জীবন।

প্রাণের কামনা আশা সম্পদ শোভার

পরিপূর্ণ মিলিত ত্রিধারা,

সব ধায় তোমাপানে আজি একাকার

অবারিত জাহ্নবীর পায়া!

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী।



# স্বরলিপি

মিশ্র ছায়ানট—ঋষপতাল ।

আমারো আঁখি কেন ভাসে পো জলে ।

সুখ বা দুঃখ দিতে কে আছে ধরনীতে,  
একেলা পড়ে আছি মক্ হলে ।

(১) আমিও কোন্ ভুলে মালিকা গাঁধি ফুলে,  
পরতে মধুরাতে কাহার গলে,—  
আমিও রচি গান ললিত নব তান  
নিভতে গায়ি মরি কিসের ছলে ।

(২) আমিও কি আশায় বিজনে সাজি হায়,  
বাসনা বাধা বচি মরম তলে,  
আমিও কাদি হাসি, কাহারে ভালবাসি  
মোরে কে মনে করে আপনা ব'লে ॥

রচনা—শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বরলিপি ও সুর—শ্রীযুক্ত ব্রজেনলাল গাঙ্গুলী ।

II	১	সাঁ	সাঁ	।	০	সাঁ	—	—	।	১	ধা	ধা	।	১	পক্ষা	পা	—	।					
		আ	মা			রো	০	০			আঁ	খি			কে	ন	০						
I	১	রা	—	গা	।	০	—	মা	—	পা	—	।	১	মা	মগমা	।	১	রা	সন্	—	সা	II	
		ভা	০				০		০		০		সে	গো	০০		জ	লে	০				
II	১	সা	রা	।	১	গা	—	পা	—	।	১	নধা	সাঁ	।	১	সাঁ	সাঁ	—	নধা	।			
		সু	খ			বা	০	০	০		দুঃ	খ			দি	তে	০						
I	১	ধা	না	।	১	সাঁ	—	রা	—	।	১	সাঁ	নসা	।	১	ধা	পক্ষা	পা	।				
		কে	আ			ছে	০	০			ধ	র			নী	তে	০						
I	১	পা	পা	।	১	পা	—	—	ধা	।	১	মা	পা	।	১	মা	গা	—	মরা	।			
		এ	কে			লা	০	০			প	ড়ে			আ	ছি	০০						
I	১	বা	গা	।	১	—	মা	—	পা	—	।	১	—	গা	—	মা	।	১	রা	সন্	—	সা	II
		ম	ক				০	০	০			০	০		হ	লে	০						

II সা সা । রা - । - । রা - । রা রা - ।  
 (১) আ মি ও কোন্ ভূ রা  
 (২) আ মি ও কি আ শায়

রা গা । মা -পা - । গা গমা । রা সা - ।  
 (১) মা লি কা গাঁ থি ফু লে  
 (২) বি জ নে সা জি হায় ০

I সা সা রা -জ্ঞা - । রা -সা গুধা - পা ।  
 (১) প রা তে ০ ০ ম ধু রা ০ ০ তে  
 (২) বা স না ০ ০ বা থা ব ০ হি ০

ধা সা সা - সা । রগা -মপা । -মগা -রা - ।  
 (১) কা হ র ০ গা লে ০ ০ ০ ০ ০  
 (২) ম ব ম ০ ত লে ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা । নধা -না -সা । সা সা । রসা - -নধা ।  
 (১) আ মি ও ০ ০ র চি গান ০ ০  
 (২) আ মি ও ০ ০ কা দি হা সি ০

I ধা না । সা -রা - । সনা সা । ধা -পক্ষা -পা ।  
 (১) ল লি ত ন ০ ব গান্ ০ ০  
 (২) কা হা রে গা ০ ল বা সি ০

I পা পা । পা - -ধা । মা পা । মা গমা -রা ।  
 (১) নি ভূ তে ০ গা যি ম রি ০  
 (২) মো রে কে ০ ম নে রে ০

I রা গা । মা -পা পা । মগা -মা । -গরা -সনা -সা II  
 (১) কি সে র ০ ছ লে ০ ০ ০ ০

I সা রা । গা - পা । ধনা -সরা । -সনা -ধপা -ক্ষপা II  
 (২) আ প না ০ ব ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

## চোখ ভরে দেখি আর

চোখ ভরে দেখি আর

বুক ভরে যায়

আলোর সোঁতাগে,

আঁধার জালিবার আগে

ভূপাঙ্কুর তোলে মাথা

কিশলয় খোলে পাঁতা,

ফোটে কল অকণের রাঙা অস্তুরাগে ।

চুপ করে শুনি আর, চুপে চুপে মনে

গানের জোয়ার,

হয়ে আসে আশুসার,

মাগরের পারে পারে

ধরার বুকের তারে

সে স্তর বাজায়ে চাদ ফিরে অনিবার ।

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী ।

## মাসকাবারি

আধুনিক সাহিত্য কি অবনতিশীল ?

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, আধুনিক আর্ট-সাহিত্য decadent অর্থাৎ অবনতিশীল। যুগ-ধারার যেমন অবসান হয়, তেমনি যুগরূপভূমিট আর্ট-সাহিত্যের ধারাও ক্ষুণ্ণবেগ ও মন্দগতি হইয়া ন না পঙ্কিলতা ও আবিলতার আকর হয়। এখন একটা যুগান্ত উপস্থিত; আর্ট-সাহিত্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল ভাব ও রূপ, যে সকল রস ও তার বিগ্রহ উপচায়মান হইয়াছে, তাদের বিখ-প্রতিবিম্ব-পরম্পরা রচিয়া রচিয়া আলোকের আদিতম উৎসকে, প্রেরণার গভীরতম প্রৈতিক আর্ট হারাইয়া বসিয়াছে। তাই অনেকে বলেন যে, সকল যুগান্তের আর্ট-সাহিত্যের বিলয়মান দশায় যে সকল লক্ষণী ফুটিয়া উঠে, এ যুগাবসানের প্রদোষ সময়ে

সেই সকল লক্ষণাবহ পরিচয় জাজ্জল্যমান। একটা অতি-সচেতনতা, অতি-বিশ্লেষ ও সর্ব-বিষয়ে অস্বস্থ ওৎসুক্য, অতি-স্বল্প ভাব-বিলাস ও শিল্পের কুঁদানি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকৃতি—এই সকল লক্ষণ অবনতিশীল আর্টের পরিচায়ক।

এ যুগের আর্ট-সাহিত্যকে decadent বলিব কিনা, সেটা পরে বিবেচ্য; কিন্তু এখানে দেখা কর্তব্য যে যুগান্তের আর্ট-সাহিত্যে মাত্রই কি উপরি-উক্ত লক্ষণাক্রান্ত? দান্তের Divinia Comedia মহাকাব্যও ত এক decadent সাহিত্যের যুগান্তবর্তী; অথচ তার মতঃ সর্গ-মর্ত্য-পাতালব্যাপী মানবাত্মার মহাঅভিযান পৃথিবীর আর কোন্ মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে? এই রূপরসগন্ধস্পর্শময় ঐন্দ্রিয় জগৎ যে আর একটা Super-world অতীন্দ্রিয় অদৃশ্য

জগতের দ্বারা পরিবৃত্ত দাস্তের এই বিপুল  
অনুভূতিময় কাব্য মধ্যযুগীয় শতদ্বা-বিচ্ছিন্ন,  
সংস্কারকুক্ষিগত, তমঃপ্রভাবাচ্ছন্ন মানুষকে  
মুক্তির কি দিবারূপট দেখাছিল! একদিকে  
দাস্তের এই দিব অধ্যাত্ম মুক্তির বাস্তবতা;  
অন্যদিকে লুক্রেসিয়াসের নাস্তিকতা, প্রকৃতি-  
সর্বস্বতা ও জড়বাদ—decadent বা  
বিলীয়মান সাহিত্যের সেই একটা পক্ষের ৩ষ্ঠ  
বিপরীত দিক হইতে দাখে ও লুক্রেসিয়াস  
মানুষকে এষ্টা মুক্তির আনন্দ একটা  
বিশ্বেচেতনায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন।  
অতএব, কেমন করিয়া বলি যে যুগান্তের  
সাহিত্যের নক্ষণ শুধু রোগ-লক্ষণ মাত্র,  
শুধু আত্ম-সর্বস্বতা, শুধু শিল্পের কুদানি,  
শুধু আধ্যাত্মিক বিকার?

বরং মনে হয় যে, সূর্য্যাস্তের পরে যেমন  
সমস্ত আকাশ অপূর্ণ রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া  
উঠে, তেমনি বোধ হয় কোন বৃহৎ যুগের  
অবসান-কালে যুগান্তের আট-সাহিত্য তার  
সকলোচ্চ মহিমায় প্রদীপ্ততম বিভাসে দীপ্যমান  
হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং decadent  
কথাটি বলা মাত্র মানুষের মনে যে একটা  
তাচ্ছল্যের ভাব জাগিয়া ওঠে, তথ্যাত্মক  
অবনতিশীল আট-সাহিত্যের কোন পক্ষেই  
সে ভাবের উদয় হওয়ার সম্ভব কারণ খুঁজিয়া  
পাই না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ডেকেডেন্ট যুগে  
পাস্তোরাল সাহিত্য দেখা দিয়াছিল। তারও  
একটা সৌন্দর্য্য ঐই দিক দিয়া পাই যে  
মনে হয়, রেসিন, বোরালিনো, পোপ, ড্রাইডেন  
প্রভৃতি কৃত্রিম সাহিত্য-রচয়িতাবর্গ, আর  
ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ও পরবর্তী কালো,  
গায়টে, ওয়াউস্ ওয়াপ, শেলি প্রভৃতি বন্ধনমুক্ত

সাহিত্য-স্রষ্টাব দল—এদের পবনস্পর্শের মধ্যে  
পাস্তোরাল সাহিত্যটি ছিল সৌন্দর্য্যবন্ধনের মত।  
Return to Nature—প্রকৃতিতে ফিরিয়া  
চল—এই মহামত্বের উদ্বোধন সম্ভাব্য হইত  
না, যদি পাস্তোরাল কাব্য-সাহিত্যে প্রকৃতিব  
সৌন্দর্য্যামৃত্তব মানুষের মনকে স্তম্বাসিক্ত না  
করিত।

ডেকেডেন্ট সাহিত্যের পক্ষে অনেক কথা  
বলবার আছে দেখা গেল। কিন্তু কুর্জ  
বার্ণাড শ এ যুগের আট-সাহিত্যকে অবনতিশীল  
বলিতেই প্রস্তুত নহেন। “The sanity of  
art : An exposure of the current  
nonsense about artists being  
degenerate”—এই নামে বার্ণাড শয়ের  
একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। আট-সমালোচক  
ম্যাক্স নর্দো এক সময়ে আধুনিক আটকে  
“অবনতিশীল” বলিয়াছিলেন বলিয়া বার্ণাড শ  
তার মতের প্রতিবাদ উপলক্ষে ঐ পুস্তিকাটি  
রচনা করেন। বার্ণাড শ বলেন “at every  
new wave of energy in art the  
same alarm has been raised”—  
আটের শক্তির লীলায় কোন নূতন তরঙ্গ  
দেখা দিবামাত্র ঐ রকমের ভীতি-প্রদর্শনের  
চেষ্টা হইয়াছে যে, এ সব আট অবনতিশীল।

Impressionism—একালের আট-  
সাহিত্যের একটা বিশেষ ধারা। শিল্পরসিক  
অর্থার সাইমনস্ “The decadent move-  
ment in literature” শীর্ষক সম্প্রতি-  
প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তার এইরূপ ব্যাখ্যা  
দিয়াছেন :—“The impressionist, in  
literature as in painting, would  
flash upon you in a new, sudden

way so exact an image of what you have just seen, just as you have seen it, that you may say, as a young American Sculptor, a pupil of Rodin said to me on seeing for the first time a picture of Whistler's "Whistler seems to think his picture upon canvas and there it is!" or you may find with Sainte Beuve, writing of Goncourt, "the soul of the landscape."—the soul of whatever corner of the visible world has to be realised." অর্থাৎ সাহিত্যে অথবা চিত্রকলায় ইম্প্রেশনিষ্ট এমন একটা অভিনব ও আকর্ষক দিক হইতে এইমাত্র ত্রাম যাহা দেখিয়াছ এবং যেমনটি দেখিয়াছ তার প্রতিক্রমের আলোকপাত করিবেন যে, ছইস্লারের ছবি প্রথম দেখিয়া রোঁদা-শিষ্য এক আমেরিকান মুক্তিকার যে কথা আমার বলিয়াছিল, তোমাকেও সেই কথাই বলিতে হইবে। সে বলিয়াছিল:—ছইস্লার যেন চিত্রপটের উপর তার চিত্রটিকে ধ্যান করিয়াছেন—বাস্, অমনি দেখ চিত্রখানি! গন্-কোট সম্বন্ধে সঁতবান্ডও তাহাই বলিয়াছিলেন যে তাঁর ভূচিত্রে (landscape) ভূচিত্রের আত্মাকে পাওয়া যায়—দৃশ্যমান জগতের যে কোন কোনটিই শিল্পীর উপলব্ধিগম্য, তার যেন আত্মস্বরূপটিকে পাওয়া যায়। এই যে দৃষ্টির ভিতরে দৃষ্টি, ছায়াভাসের ভিতরে ছায়াভাস, আলোকের অন্তর্মুখনিহিত আলোক—এই ইম্প্রেশনিজম্ আট-সাহিত্যে অধুনা যথেষ্ট

বিহাশমান। মনে প্রাণিতে হইবেশ্বে, ইহা আধুনিক আট-সাহিত্যের একটিমাত্র ধাবা। ইহা ভিন্ন—পার্বেশিয়ানিজম্, সিম্বলিজম্, ইমাজিজম্, পোষ্ট-ইম্প্রেশনিজম্, ফিউচারিজম্ প্রভৃতি আট-সাহিত্যের অত্যন্ত বিশিষ্ট রূপ ও ধারাও আছে। এবং এসকলই নূনান্যক পারমাণে অবনতিশীল আটের রোগ লক্ষণা-পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে। আর্থার সাইমন্সও বলিয়াছেন যে, একালের এই সব সাহিত্য যতই সুন্দর ও আত্মনব হউক না কেন, ইহা অভিনব সুন্দর এবং উৎসুকাজনক রোগ ভিন্ন আর কিছুই নয় ( "a new and beautiful and interesting disease"। )

বাণাড শ এই কথাটাই মানিতে নারাজ। তিনি বলেন ইম্প্রেশনিষ্ট চিত্রকলারীতি যখন প্রথম দেখা দিল, তখন লোকে তার রসগ্রহণে অসমর্থ হইয়া তার নিন্দা করিল বটে, কিন্তু কালক্রমে দু-চারজন কলারসিকের প্রশংসাবাণী শুনিতে শুনিতে তারাও অবশেষে বোল্ ফিরাইল তখন গাড়াইল এই যে, নিতাঙ পোটো ছবিতে (daub) শিল্পী অক্ষমতাবশতঃ যে অঙ্গসমাবেশ ঘটাইতে অপারগ হইয়াছে, তার সঙ্গে আর ইম্প্রেশনিষ্টের তথাকথিত প্রমাণ-রহিত অঙ্গ-সমাবেশ-রহিত ছবিগুলার পার্থক্য সাধারণের বোধগম্য হইল না। কিন্তু এই অজ্ঞতামূলক রসগ্রহণের বিকৃতির জন্য ইম্প্রেশনিষ্ট কোন মতেই দায়ী নন। ঠিক তেমনি "ইব্‌সেনিজম্" প্রভৃতি ষণ্মার্থভাবে ব্যাখ্যাত ও আয়ত্ত না হইবার দরুণ, তাদের সম্বন্ধে নানা ভীতিপূর্ণ সংস্কার ও বিকল্পভাব প্রাকৃত সাধারণের মনে পোষিত হইতেছে।

বার্ণার্ড শয়ের এই কথাগুলি আমার ত মনে হয় খুবই ঠিক। ম্যাক্সনর্দো লিখিয়াছেন যে, আধুনিক কাব্যে প্রতিধ্বনি প্রয়োগ একটা রোগবিশেষ। সুইনবার্ণ তার উদাহরণ। ছন্দকে বাজাইবার জন্ত, ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিবার জন্ত, শব্দাঙ্কুর ও ধ্বনির আঙ্কুর আধুনিক কাব্যতার একটা রোগলক্ষণ। নর্দোর এই কথার প্রতিবাদে বার্ণার্ড শ লিখিয়াছেন যে স্বয়ং শেক্সপিয়ারের অনেক গানে,— যেমন with hey, ho, the wind and the rain—গানটির অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে— এই ধ্বনি প্রয়োগ দোষ দেখা যায়। ডি, জি, রসেট্‌র Blessed damosel নামক কাব্যতার বৈয়াকরণ যদি অবনতিশীল ও ক্রান্ত (insane) আটের লক্ষণ হয়, তবে প্যায়টে তার Faust-এর দ্বিতীয় খণ্ডে বৈয়াকরণের ছড়াছাড়ি ও ছয়লাপ সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রাক্ত, স্থিরবুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক কাব্য হইবে কেন করিয়া? বার্ণার্ড শয়ের এই জবাবেরও প্রত্যুত্তর দেওয়া শক্ত।

মাসল কথা, হংরাঙ্গিতে যেমন প্রগাধ-বচন আছে যে, give the dog a bad name and then hang it,—সেইরূপ ‘কিছুনা কিছুনা’ বলিতে বলিতেই আমরা কোন জিনিসকে বিকৃত করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি।

যে সব কারণে এ যুগের আটকে অবনতি-শীল বলা হয়, সে সব কারণ প্রাচীন আটেও বিদ্যমান, ইহা বার্ণার্ড শ দেখাইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন আটে ঐ লক্ষণগুলিই সর্বপ্রধান

হইয়া উঠে নাই, বার্ণার্ড শয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। গ্যায়টে, শেক্সপিয়ার প্রভৃতি সম্বোধিত কাব্যের মধ্যে, আধুনিক আটের অনেক রূপের আভাস দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সে সব আভাস আভাসেই পরিসমাপ্ত, প্রাচীন কাব্যে তাদের বিকাশও নাই বিশিষ্টতাও নাই। এ যুগে সেই আভাসিত দিক্‌গুলি যদি একান্ত হইয়া আর সকল দিক্কে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তবেই কারো কারো মনে তাকে রোগ-লক্ষণ বা বিকার লক্ষণ অথবা অবনতি বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়। যদিচ সে সিদ্ধান্তে উপনাত হইবার আগে এ কথাটাও ভাবা দরকার যে, ঐ লক্ষণগুলি অভিনব বলিয়াহঁক একরূপ কঠিন বিচারযোগ্য হইতেছে, না সত্যি উহাদের মধ্যে বিকারধর্ম সুপারফুট?

আমরা পূর্বে মাসে বলিয়াছি যে, আটের অভিব্যক্তি শেষ হইয়া যায় নাই। হিগেল মনে করিয়াছিলেন যে রোমান্টিক আটেই আটের শেষ পরিণতি। কিন্তু তার পরে কত ধারায় আর্ট ধাবমান ও পূর্যমান, তাহা তো দেখাইয়াইহঁতেছে। আধুনিক আর্ট বিকাশমান কি বিলোপমান তাহা বিচার করা যাইবে তখন, যখন কালের একটা পরিপ্রেক্ষণ (perspective) পাওয়া যাইবে। দার্শনিকালের শেষে যখন কতকটা দূরে এই সব আর্ট-সাহিত্যকে ফেলিয়া দেয়া সম্ভাবনীয় হইবে, তখনই আধুনিক আর্ট বিকাশমান কি বিলোপমান তার বিচারও সম্ভাবনীয় হইবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী।

## সমালোচনা

সচিত্র রামায়ণ ।

শ্রীনিবাস রাও গুরুগোবিন্দ সিং, শ্রীনিবাস রাও গুরুগোবিন্দ সিং সাহেব পণ্ডিত পান্ডু প্রতিনিধি, বি-এ, অঙ্ক-অধিপতি কর্তৃক সংকলিত ও চিত্র সম্ভবিত। বোম্বাই, মাদ্রাস, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান, কলিকাতা, আরিসন রোড, রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়। মূল্য বারো টাকা। এ গ্রন্থখানি বাঙালি এক অভিনব সামগ্রী। অঙ্ক-অধিপতি রামায়ণের বিবিধ বিষয়ে বিবিধ চিত্র সহজে আঁকিয়া এ গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। রামায়ণের ঘটনা ভারতবর্ষে হিন্দুর ঘরে কাহারো অবদিত নয়—তাহারই মূল ঘটনাগুলির চিত্র এ্যালবাশের ধরণে এ-প্রধান সংগ্রহীত হয় নাই। এ গ্রন্থে ঘাটখানি ছবি আছে—সবগুলিই বেশ ভাল মোটা কাগজে চাপা এবং বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। ছবির রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হনুমান প্রভৃতি নিত্য নিষ্ঠা বনর, তাহাদের মুখে-চোখে ভাব আছে; আট-হিসাবে উৎকৃষ্ট না-হইলেও চলনসই। প্রত্যেক ছবির পর-পৃষ্ঠায় ছবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। যুরোপ হইলে এরূপ সর্বজন-প্রিয় কাব্যের চিত্রাবলী এতদিনে বিপুল বিক্রয় হইয়া যাউত। বাংলাদেশেও রম্য বাঙালীর অভাব নাই, তাই আমাদের আশা আছে, বাংলাদেশের ঘরে-ঘরেও কটো-এ্যালবাশের মত এই রামায়ণের চিত্র-এ্যালবাশখানি সম্বন্ধে রক্ষিত হইবে—গৃহের শোভা ইহাতে বাড়িবে, তত্ত্ব রামায়ণের ঘটনাবলীর ও পাত্র-পাত্রীর সহিত অঙ্গবসন হইতেই ছেলেমেয়েদের অভ্যাস সহজ উপায়ে পরিচয়-লাভেরও সুযোগ ঘটিবে। বহিধানির বাঁধাই ছাপা প্রভৃতিও চমৎকার—স্বাক্ষরি আঁকায়ের পেটবোর্ডের বাজে সম্বন্ধে রক্ষিত, অর্থাৎ ভিতর-বাহির দুইই লোভনীয়। তবে গ্রন্থের মূল্য এ-দেশের পক্ষে একটু বেশী হইয়াছে।

গুরুগোবিন্দ সিং। শ্রীযুক্ত তিমকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা; মেটাকাক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র। এখানি শিব-গুরু গোবিন্দের জীবন-চরিত। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ পরিচুপ্ত হইয়াছি। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে শিবজাতির অভ্যুত্থানের বিচিত্র ইতিহাস গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবন-কথার সহিত বেশ মৃদুশ্রবণ ধারায় বিবৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যগুলির মূল্যও যথেষ্ট আছে—কারণ লেখক গুরুমুখী ভাষা জানেন, এবং শিবজাতির প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতেই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসাধারণ। রচনার শৃঙ্গে এই জীবন-চরিতখানি উপজ্ঞানের মতই হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে। পাতিমালার মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র সিং মাহিন্দার বাহাদুর জি. সি. আই. ই মহোদয় এ গ্রন্থ-প্রকাশে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তিনি প্রত্যেক বাঙালীরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। গ্রন্থে বহু শিবগুরুর চিত্র ও মানচিত্রাদি সম্মিলিত হইয়াছে—অর্থাৎ নানা দিক দিয়া গ্রন্থখানি বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস ও জীবন-চরিত-বিভাগে সম্পদ-স্বরূপ হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা-কাগজ-বাঁধাই ভাল।

পিতৃ-বিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা।

শ্রীযুক্ত হরীকেশ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅমল্য কুমার দত্ত, আড়ংপাড়া খুলনা। কলিকাতা মেটাকাক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা, বাঁধাই পাঁচ সিকা মাত্র। এখানি কবিতার গ্রন্থ। ভূমিকা-লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “পর পর প্রাণ-প্রতিম চারিটি পুত্রকে জন্মের মত বিদায় দিয়া কবি তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে এই মর্ম্মব্যথাগুলি গ্রথিত করিয়াছেন।” হুতরাং এ কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমরা কেনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না—তবে অপর কবিতা-গুলিতে কিছু মাত্র বিশেষদ নাই। ভূমিকা-লেখকের গবেষণা-মিশ্রিত স্নেহাঙ্ক, টিপনী পাঠ করিয়াও গ্রন্থের সহিত বলিতেছি, সেগুলিতে “প্রসাদ-গুণ” কিছুমাত্র দেখিলাম না।

শ্রীসত্যজিত শর্মা।

কলিকাতা—২২, হুকারি স্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিশরণ মাসী কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, হুকারি স্ট্রীট হইতে

শ্রীকালচাঁদ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত।







# রত্ন

৪২শ বর্ষ ]

অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

[ ৮ম সংখ্যা

## এলো শীত ঘিরে কুয়াসায়

এলো শীত ঘিরে কুয়াসায়

বরণের ব্যবসায়,

পড়ে গেল ছাই !

বুসরের অধিকার, লাল নীল নাই আর

স্নান মুখে ধরা কান্দে তাই !

সবুজের বসবাস ছিল যেথা বারো মাস

আজ সেই দেব-দাকু দান,

খালি গায়ে হিমবায়ে কাঁপে সারাদিন ।

ফুলবন আজিকে উজাড়,

ঝুমকো ফুলের ঝাড়

দোলেনা সোহাগে,

কামিনী সে অভিমানে চলে গেছে কোনখানে,

কাঞ্চন প্রবাসী তার আগে ।

মাদবা, মালতী, বেলা, চলে গেছে ভেঙে মেলা,

উদাসিনী হয়েছে পারুল,

ফোটেনা তাম্বুল-রাগ দাড়িয়ের ফুল !

নেড়া গাছ, যেন ভাঙা খাঁচা

পরান পাখীটি কাঁচা

সবুজ পাখায়,

উড়ে গেছে কোন দেশ, কুলায়ের অবশেষ

পড়ে শুধু করে হায় হায়

ডালপালা ঝাঁকচোরা শুকান বাকলে মোড়া'

ঝড়ে উড়ে টলে যাবে বলে',

দিন নাই, রাত নাই, অনিবার দোলে !

পলাশের অনল কোথায় ?

গোলাপের আলতায

বুটল শিশিরে,

সোনার বরণ চাঁপা, পাতার তলায় চাঁপা

একবারে মরে' গেল কিরে !

বর্ণ-গন্ধে প্রাণ ভরা ললাটে চন্দন পরা

করবীরা নিয়েছে বিদায় !

“কুসুম ফুলের রং” আর না বিকায় ।

শ্রীপ্রিয়দা দেবী ।

## বাংলার ব্রত

( ২ )

ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারত-বর্ষের মধ্যে আর্থ্যোরা যাঁদের দেখা পেলেন, তাঁদের ডাকলেন তাঁরা ‘অন্ত-ব্রত’ বলে। এটা ঠিক যে আর্থ্যোরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব ‘অন্তব্রত’—ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়োবুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ—নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান দেবতা-অপদেবতা কলাকৌশল ভয়-ভরসা হাসি-কান্না নিয়ে বাস করছিল। এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্থ্যা এবং না-আর্থ্যা বা ‘অন্ত-ব্রত’দের মধ্যে সবদিক দিয়ে, এমন কি বিয়েতে এবং ভোজ্যেতেও, আদান-প্রদান চলছিল। পুরাণের দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান-প্রদানের ইতিহাস; ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই; কেবল এই মেয়েলী ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেইসব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্বতন পুরুষ অন্তব্রতেরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। পর পর স্তর পড়তে-পড়তে মাটির উপরের অংশ ক্রমে নীচে চলে যায়; তখন পুরোনো জিনিস বা পৃথিবীর পুরোনো জীব-জন্তুর সন্ধান নীচের তলায় গিয়ে জমা হয়। মানুষের ইতিহাসেও তাই। মানুষ যতই অদল-বদলের মধ্যে দিগ্বিদিক চলুক না কেন,

এমন কতকগুলো জায়গা থাকে যার মধ্যে মানুষের পূর্ব-পূর্ব সঞ্চিত জিনিসগুলি ভাঁজের পর ভাঁজ পরে-পরে সাজানো থাকে;—আলমারিতে তার নিজের ব্যবহারের ছেলেবেলা থেকে বুড়ো-বয়সের পরনের কাপড়, খেলার টুকটাকি, নানা খাতাপত্র আসবাবের মতো।

সব-উপরে হিন্দু-অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গোরিক—এমন সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর; তারপর বেদিক আমলের মূল্যবান ধাতু স্তর; তারও তলায় অন্ত-ব্রতদের এই সব ব্রত—একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে।

এই সব অতি-পুরাতন ব্রত এখনো কেমন করে বাঙালীর ঘরে-ঘরে করা হয়, এর উত্তরে বলা চলে আমাদের সঙ্গর অংশটা যতটা বদলে গেছে, আমাদের অন্তঃপুরটা তার সঙ্গে-সঙ্গে তো বদলে যার্নি! সেটা কাল, তার পূর্বে, এবং তার—তার—তারো পূর্বে যা, আজও তা। অন্ততঃ বেশির ভাগ মেয়েলী কাণ্ডই এইরূপ। সেখানে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতনীর এবং ঠাকুরমাতে ও তাঁর ঠাকুরমাতে খুব তফাৎ নেই। শিবের বিয়ে যেভাবে হয়েছিল Bar-at-lawর বিয়েও ঠিক সেই-ভাবেই এখনো ঘটছে! শুধু আমাদের দেশে নয়, ইউরোপেও এমনি Roman Lawর মতো অনেক জিনিসই এখনো অটুট ভাবে কাজ করছে দেখা যায়।

কাজেই এই ব্রতগুলি মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত।  
ক্রমে এতকাল চলে আসা আশ্চর্য্য নয়।  
মানুষ মরে যায়, জাতিকে জাতি লোপ পেয়ে  
যায়, কিন্তু তাদের ইচ্ছা এবং চেষ্টার প্রবাহ  
তাদের পরেও বর্তমান থেকে কাজ করতে  
থাকে। আমেরিকার আদিম অধিবাসার  
এমন হৃদয়া ক্রিস্টিয়ান জাতিরা করলে যে  
তাদের পৃথিবীতে থাকবার জায়গাই রইল  
না! কিন্তু তাদের শিল্প, তাদের মন্দির-মঠ,  
ঘরবাড়ি কতক মাটির মধ্যে, কতক মাটির  
উপরে জঙ্গলে, কতক বা লোকস্বস্তির অণ্ড:-  
পুরে বেচে রইল,—যারা মারলে তাদের  
দিয়ে যারা মরল তাদের ইতিহাস বলবার  
জন্ত! বাংলার এই ব্রতগুলিও তেমন  
আমাদের মেয়েদের দিয়ে তখনকার মন্ত-  
এতচারিগীদের জীবন্ত বর্ণনা;—কখনো আল-  
পনার শিল্পে, কখনো কবিতা নাটক ও সাহিত্য  
কলার মধ্যে দিয়ে, কখনো-বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের  
দিক দিয়ে। এই ছবির উপরে কালে  
কালে যে-সব নানা-মুনির আঁচড়, নানা  
দিক থেকে নানা জঙ্ঘাল পড়েছে সেগুলিকে  
আন্তে আন্তে না সরিয়ে দেখলে আমরা কিছু  
যে দেখতে পাবো তাতো বোধ হয় না।

মেয়েদের মধ্যে ব্রতগুলি এখন যেভাবে  
অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাকেই ব্রত-অনুষ্ঠানের আদর্শ  
বলে নিতে পারি কি না প্রথমে সেটা দেখা  
যাক; এবং সেটা যদি আদর্শ ব্রত না হয়  
তবে ব্রতের আদর্শটা পৃথিবীর কোথাও  
খুঁজে পাই কি না দেখি। মানুষের এবং  
সব জীবেরই বিচিত্র কামনা, চরিতার্থ হবার  
পূর্বে, বিচিত্র চেষ্টার আপনাকে ব্যক্ত করে।  
তৃষ্ণা জাগল, জলপান ক্রিয়াটি করলে, তৃষ্ণার

শান্তি হল। ক্ষুধা বা খাবার কামনা জাগল,  
আহাযা সংগ্রহ, রন্ধন-ব্যাপার পরিবেষণ ও  
ভোজন-ক্রিয়া করলে, ক্ষুধার শান্তি হল।  
বনের কামনা জাগল, কাজ করতে দেশ  
বিদেশ চলেম।—এইভাবে মানুষ আজীবন  
কামনা ও তার চরিতার্থতার নানা ক্রিয়া করে  
চলেছে। কি অনুষ্ঠান করলে যে কি হবে,  
তার কতক মানুষ আপনা-হতেই আবিষ্কার  
করে; কতক দেখে শিখে নেয়; কতক  
ঠেকে শিখে নেয়—এমনি। জীবনের কামনা  
যতক্ষণ না মরণে গিয়ে থামছে ততক্ষণ,  
ধরতে গেলে, সমস্ত জীবজন্তুতে মিলে বিশ্ব-  
ব্যাপী একটা ব্রত-অনুষ্ঠান করছে। জলের  
কামনা কচ্চি কিন্তু উঠে গিয়ে জলের  
ঘটিটা না ধরে, ঘরে বসে জলখাবার জন্মাটা  
অনুষ্ঠান করছি, কিম্বা জলের কামনায়  
চলেছি উত্তরের ধারে—এ হলে কামনা চরিতার্থ  
হলনা, কাজেই যে অনুষ্ঠান কলেম সেগুলো  
ভুল অনুষ্ঠান হল। ব্রতে জলের কামনা  
জলরূপে এবং পান-ক্রিয়া হয়ে কোটা চাহ।  
এবং যখন এটা হল তখনই কামনার ক্রিয়া  
যোগ হয়ে ঠিক ফলটি পাওয়া গেল।  
মানুষের এই সহজ-বিবেচনার ছাঁচেই  
কতকটা তাদের আদিকালের ব্রতগুলি  
চালা হয়েছে দেখা যায়।

একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থ-  
তার ক্রিয়া, ব্রত-অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না।  
যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার  
জন্ত ক্রিয়া; কিন্তু ব্রত তখন, যখন দেশে মিলে  
এক কাজ এক-উদ্দেশ্যে করছে। ব্রতের  
মোটামুটি আদর্শ এই হল—একের কামনা  
দলের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান

হয়ে উঠছে। একের সঙ্গে অন্য দশ-জনে কেন যে মিলছে—কেন যে একেব অমুকরণ দশে করছে—সেটা দেখবার বিষয় হলেও আমরা সে-সব জটিল প্রশ্নে এখন বাবো না। একজনকে দিয়ে নাচ চলে কিন্তু নাটক চলে না; তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্ত্র দেবতার উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত-অমুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুইই ক্রিয়া—কামনার চরিতার্থতার অঙ্গ; কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম; আর-একটি দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—কামনার সফলতাই তার শেষ—এই তফাৎ। ব্রত যে কি ও ব্রত যে কেন তা এদেশের এবং অঙ্গ দেশের দুটি ব্রত পাঁশাপাশি রাখলেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আমেরিকার ‘হুইচল’ জাতির মধ্যে বৃষ্টি কামনা করে একটি ব্রত :—একটি মাটির চাকুতি বা সরা; তার একপিঠে আগুন দিয়ে সূর্য্যের চারিদিকে গতিবিধি বোঝাতে ক্রশের মত একটা চিহ্ন; সেই চিহ্নের মাঝে একটি গোল ফোঁটা—মধ্যদিনের সূর্য্যকে বুঝিয়ে; এর চারিদিকে সরার কিনারায় সব পক্ষান্তের চূড়া, এবং চূড়াগুলির ধারে ধারে ধান-ক্ষেত বোঝাবার জন্যে লাল ও হলুদের সব বিন্দু; জারি ধারে বৃষ্টি বুঝিয়ে কতকগুলি বাঁকা বাঁকা টান। সরার অন্তর্পিঠে লাল-নীল-হলুদে রঙের বাণে ঘেরা চক্রাকার সূর্য্যমূর্ত্তির আল্পনা লিখে পূজা বাড়িতে রেখে ব্রত করা। হয়তো এই আল্পনা দিয়েই ব্রত শেষ, হয়তো বা ছড়াও কিছু বলা হয়।

আমাদের দেশের একটি ব্রত ‘ভাঙ্গলী’।

এটি বৃষ্টির পরে। আত্মীয়-স্বজনের বিদেশ থেকে, সমুদ্রযাত্রা থেকে, জল-পথে স্থলপথে নিরাপদে ফিরে আসার কামনায়। ভাঙ্গলীর মূর্ত্তি—জোড়াছত্র মাথায় জোড়া-নোকায় লিখে, চারিদিকে নদী সমুদ্র কাঁটাবন নানা হিংস্র জন্তু নোকো ইত্যাদি আল্পনায় দিয়ে, এই ব্রত করা হয়। এক-একটি আল্পনার চিত্রে ফুল ধরে, এবং সেই আল্পনা যে কামনার প্রতিচ্ছবি একটির পর একটি ছড়ায় সেই কামনাটি উচ্চারণ ক’রে—যেমন নদীর আল্পনায় ফুল ধরে বলা “নদী, নদী! কোথায় যাও? বাপ-ভায়ের বাঁধা দাও।”—এমনি প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন আল্পনাতে রকম-রকম ছড়া ব’লে ফুল ধরে ভাঙ্গলীকে প্রণাম ক’রে ব্রত শেষ। যেমন এই ব্রতে, তেমনি অন্ত অন্ত ব্রতেও কখনো ফুল, কখনো সিঁহরের ফোঁটা, এমনি নানা জিনিস এক-একটি আল্পনার উপরে রেখে ছড়া-কাটা ও শেষে ব্রতকথা শোনা হচ্ছে এ দেশের ব্রত করা। ব্রতের ফুল ধরায় আর পূজার ফুল দেবতার চরণে দেওয়ার একটু তফাৎ রয়েছে। ব্রতে ফুল ধরার অর্থ এ নয় যে নদীকে কি বাঘ মোষ ইত্যাদির চিত্রমূর্ত্তিকে ফুল দিয়ে উপাসনা; নদীর কামনা শেষ, বনের কামনা শেষ এইটে মনে রাখবার জন্যেই ফুলটা;—কতকটা হিসেবের খাতায় লাল-পেঙ্গিলের দাগ—গণনা ঠিক রাখতে। যার উপর ফুল পড়লো তিনি সাক্ষী রইলেন যে ব্রতী তার কামনা জানিয়েছে; যেমন বসুধারা ব্রতের ছড়াটিতে স্পষ্ট বলা হল—

“অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,

আট দিকে আট ফল আমরা রাখি।

অষ্টবস্তু অষ্টতারা তোমস্তু হলে সাক্ষী,  
আট দিকে আট ফুল আমরা রাখি ॥”

চুই দেশের চুটি ব্রতের মধ্যে একটি জিনিষ কতকগুলি রয়েছে। কিছু কামনা করে চুটোই করা হচ্ছে। কামনার প্রতিচ্ছবি আল্পনাথ; যেমন জল-পথে নিরাপদে আসার কামনা নদীর আল্পনায় ব্যক্ত হচ্ছে। এমন কামনার প্রতিধ্বনিটি দিচ্ছে ছড়া; যেমন—“নদী নদী! কোথায় যাও? বাপ-ভায়ের বাস্তা দাও।” এই হল—জলযাত্রীর যখন যখন জলপথে ছাড়া বিনা-তারের সাহায্যে আকাশ দিয়ে আসবার সম্ভাবনা ছিল না। ব্রতের পর সকল ব্রতীরা মিলে ব্রতকথা শোনা। ব্রতের এ অংশটার সঙ্গে কামনার যোগাযোগ এবং অনুষ্ঠানেরও যোগাযোগ ততটা নেই। কেননা দেখি কোনো ব্রতে কথা আছে, কোনো ব্রতে নেই; এটা কতকটা ক্রিয়াকর্ম শেষ করে গল্প গুজব করা—গ্রামের পাঁচজনে মিলে। ব্রতে এই সবই রয়েছে—কবিতা চিত্র উপাখ্যান গল্প পল্প এবং মণ্ডল শিল্প! এর মধ্যে ছড়াগুলি সব একরকম নয়; কোথাও দেখবো সেগুলি নাটকের মত পাত্রপাত্রী এবং নানা দৃশ্য ও অঙ্ক ভেদে সাজানো। যদিও খুব ছোট কিন্তু এই সব ছড়াকে অভিনয় করার উদ্দেশ্যেই যে গাথা হয়েছে সেটা বেশ বোঝা যায়। ব্রতগুলিকে সম্পূর্ণ-আকারে যখন দেখবো তখন পরিষ্কার বোঝা যাবে সেটা নাটক কি ছড়া। \* ব্রতের মধ্যে পুরাকালের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা নাট্যকলা নৃত্যকলা গীতকলা উপন্যাস উপাখ্যান পর্য্যন্ত পাচ্ছি। কাজেই ব্রতগুলি

আমাদের কাছে তুচ্ছ জিনিষ নয় এবং শিল্প ও আর আর সভ্যতার লক্ষণ যাদের মধ্যে পাওয়া শক্ত এমন কোনো বর্ষের জাতির অন্ধ-বিশ্বাসের নিদর্শন বলেও এগুলিকে ধরব না।

আরোয়া যাদের অস্ত্র-ব্রত অকস্মা দশা দাঁস ইত্যাদি বলছেন, এই সব ব্রত এবং ভারতবর্ষে শিল্প কলার ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে সেই সব অস্ত্রব্রতদের সম্বন্ধে অস্ত্র রকম সাক্ষ্য আমরা পাচ্ছি। যেমন বাস্তবিশ্বা, নয়শাস্ত্র; এবং ময় ছিলেন দানব! আরোয়া যখন ইন্দ্রকে হোম করে যুদ্ধে বিজয় কামনা করছেন, ততক্ষণ অস্ত্র-ব্রতরা তাদের পুরী-সকল অস্ত্রশস্ত্রে পাষণ-প্রাচীরে সূদৃঢ় করে তুলছে—ইন্দ্রকে খুসি করতে বসে না থেকে। এবং সে সময় তাদের মেয়েরা যে কি ব্রত করছে তারও কতকটা আভাষ ‘রণে এয়ো’ ব্রতের এই ছড়াটি থেকে আমরা পাচ্ছি :—“রণে রণে এয়ো রব, জনে জনে গুয়ো হব, আকাশে লম্বী হব, সময়ে পূত্রবতা হব।” এ কামনা যাদের মেয়েরা করতে পারে তারা অস্ত্রব্রত হলেও আর্ঘ্যদের চেয়েও যে সভ্যতায় নাচে ছিল তাতে বলা যায় না। রণচণ্ডার যে মূর্তিখানি এই ছড়ার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, মেয়েদের হৃদয়ের যে একটি সংযত স্ত্রীশোভন আদর্শ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তাতে করে তাঁদের অস্ত্রব্রত ছাড়া, অকস্মা অমস্ত এসব উপাধি দেওয়া চলেনা।

ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়েও আর্ঘ্যজাতি এই সব অস্ত্র-জাতির চেয়েও বেশীদূর অগ্রসর হননি। জগৎ-সংসারের এক নিয়ন্তাকে

স্বীকার বৈদিক আৰ্ঘ্যদেরও মধ্যে অনেক দেবীতে ঘটেছে। তার পূর্বে জলের এক দেবতা; আগুনের দেবতা; মেঘের দেবতা; বৃষ্টির দেবতা; এমন কি মধুক পয়ামু। অস্ত্র-ব্রতদের মধ্যেও এত সব দেবতা পৃথিবীর নানা স্থানে উপাসিত হইছেন—কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে দেখি। যেমন বেদের ‘স্বা’ হজিগ্গে ‘রা’ অথবা ‘রাআ’ মোজাকোতে ‘রায়মা’ বাংলায় ‘রায়া’ বা ‘রাজী’। বেদের অনেক দেবতাকেই আমরা অস্ত্র-ব্রতদের মধ্যে খুঁজে পাবো। নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে, নানা সব ঘটনা, মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানা রকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্ত্র-কামনায়, সৌভাগ্য-কামনায়—এমনি নানা কামনা চারতাল করবার জন্ত ব্রত করছে, কি আৰ্ঘ্য কি অস্ত্রব্রত সব দলেই,—এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের ব্রত-অমুষ্ঠানের আর-এক পরিচ্ছেদ আমরা পড়তে পাই। লোকে আৰ্ঘ্যধর্মের চরম এক-নিয়ন্ত্রার নিকাম উপাসনার গিয়ে পৌছে হিন্দু-ধর্মের নানা দেবদেবী আবার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে;—সেই প্রাচীন অবস্থা, সেই অস্ত্রব্রতদের সমান অবস্থায় আর-বার ফিরে যাচ্ছে মনের গতি! কেবল এইটুকু তফাৎ যে, এখানে অস্ত্রব্রতদের দেবতাকে এবং সেই-সেই দেবতার ব্রত-অমুষ্ঠানকে আৰ্ঘ্যদের মতো সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে, তাদের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা চলেছে। হিন্দুধর্মের এই উদারতার পিছনে রয়েছে সম্পূর্ণ অন্তর্দার

ভাবটি,—সবাই নিজের নিজের ধর্মচারণ করতে থাকে এটা নয়, সবাই আনুগত্য এক হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কবলে; এবং এঁর জন্ত শাস্ত্রের ছাঁচ সবটার উপরে বেড়া-জালের মতো দেওয়া হচ্ছে। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকারেরাই এর সাক্ষী দিচ্ছেন; যেমন বাসুদেব বলছেন—“দেশান্তরীণঃ কুলধন্যমগ্রং, সগোত্রধন্যং নহি সংত্যজেচ্চ।” অর্থাৎ ধন্যশাস্ত্র অবিরোধী; যে দেশ-ব্যবহার সেহেই প্রথম পালনীয়; কিন্তু সগোত্র পরিগ্রহ করা উচিত নয়। স্মৃতি রঘুনন্দন শুদ্ধিতবে জ্ঞীলোকনিগের হিন্দু-অমুষ্ঠের কাৰ্য্য অর্থাৎ “যে যে কাৰ্য্য তাহারা ধন্যবোধে করিয়া আসিতেছে অথচ মুনপ্রণীত কোন বচনপ্রমাণে যে সকল ব্যবহার ও ক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়না তাহা যোষিৎ ব্যবহার সিদ্ধা” বলে ধরেছেন।

পশ্চিম-দেশে ‘হোলির’ উৎসব একটি অতি প্রাচীন অমুষ্ঠান। মেড়া পোড়ানোর মতো একটা অমুষ্ঠান এখনো Bohemiaর গ্রামে গ্রামে চলেছে। সেখানে এই উৎসবকে বলে—“Driving out the death”—“In Bohemia the children carry out a straw puppet and burn it. While they are burning it they sing— ‘Now carry we death out of the village, the New Summer into the village,’ &c. কিম্বা “We have carried away death and brought back life”.

এই যে পশ্চিম-দেশের হোলি-উৎসব বা বসন্তের ব্রত, এটিকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলে

ধরার জন্তে মীমাংসা-দর্শনে হোলিকাধিকরণ বলে একটা অধ্যায় লিখতে হয়েছে। এবং এই অধ্যায়ে বে-সমস্ত হিন্দুর ধর্মকন্ঠের বা ব্যবহারের বেদাদি-শাস্ত্র-প্রমাণ পাওয়া যায়না সে-সমস্তই হোলিকাধিকরণে ভ্রায় মূলক সিদ্ধি বলা হয়েছে। বিলাতের May pole আমাদের চড়ক; গ্রীসের Spring festival বসন্ত-উৎসব এদেশের হোরি; এবং চাঁচড় মেড়াপোড়ানো, শীতকে তাড়িয়ে বসন্তের আগমনের রূপক থেকে এসেছে। এই ঋতুর উৎসবের অনুষ্ঠানে কোথাও মেঘ কোথাও ঝাঁড়, কোথাও ভল্লুক এবং কোথাও বা মানুষ বলির প্রথা রয়েছে। এটিকে হিন্দুশাস্ত্রকার মেনে নিলেন এবং এর সঙ্গে সমস্ত লৌকিক ব্রতকে হিন্দুর বলে স্বীকার করেও নিলেন দেখছি; কিন্তু শুধু এইখানে শাস্ত্রকারদের কন্ম শেষ হলনা; পুরানো এবং অশাস্ত্রীয় ব্রতগুলোকে রূপান্তর করে শাস্ত্রীয় বলে চালাবার চেষ্টাও হয়েছে দেখি। আবার নতুন নতুন ব্রত, নিজেদের মনগড়া, তাও সৃষ্টি হচ্ছে দেখা যায়। যেমন অক্ষয় তৃতীয়া, অঘোর চতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী, নৃসিংহ চতুর্দশী, এমনি কতকগুলি ব্রত তিথি-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্ত। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বিশেষ তিথিতে যদি কোনো পুণ্যকার্য করা যায় তবে তার দ্বারা মানুষের পুণ্য অর্জন এবং সৌভাগ্য ঘটে—এই হল ব্রতগুলির মোট কথা। আর কতকগুলি ব্রত হিন্দুদের দেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্ত। যেমন অনন্ত ব্রত ইত্যাদি। কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত,—পুত্র কামনা সর্পভয়নিবারণ এমনি সব কামনা করে।

এগুলি মেয়েরাই করে; যেমন অরুণ্যবতী, নাগপঞ্চমী, নিত্যবতী, সুবচনী, শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মুলাই ইত্যাদি।

এই সব গ্রাম্য-দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ কতকগুলি শাস্ত্রীয় দেবতা এবং তাঁদের ব্রত রয়েছে; যেমন কাষ্টিকের ব্রত। বস্ত্রদেবী পুত্রদান করেন, কাষ্টিকও তাই। তারপর কতকগুলি ব্রাহ্মণদের মন-গড়া ব্রত—যেমন দধিসংক্রান্তি, কলাছড়া, গুপ্তধন, দ্বুতসংক্রান্তি, দাড়িহুসংক্রান্তি ধন-গচ্ছানো। এগুলি কেবল নৈবেদ্য আর দক্ষিণার লোভ থেকে পূজারীরা সৃষ্টি করেছে। কলাছড়ায় ব্রাহ্মণকে কলা দান; সন্দেশের ভিতর পয়সা দিয়ে গুপ্তধন; দ্বুত দাড়িহু এইসব জিনিষ বিশেষ-বিশেষ তিথিতে ব্রাহ্মণকে দিলে ভালো হয়—এই ব্রত-গুলির মূল-কথাটা এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর, কতকগুলি ব্রত সম্পূর্ণ মেয়েদের সৃষ্টি; যেমন, আদর-সিংহাসন—স্বামীর আদর কামনা করে একটি স্বামীসোহাগিনীকে সাক্ষিয়ে-গুজিয়ে আদর-আপ্যায়নে খুসি করা—এবং আরো অনেক অশাস্ত্রীয় ব্রত, ঋতুর উৎসব, এর মধ্যে আসছে। এই যেগুলি সম্পূর্ণ মেয়েদের ব্রত, এইগুলিই হল লৌকিক বা লোকপরম্পরায় পুরাকাল থেকে দেশে চলে আসছে। এর মধ্যে শাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণ ছয়েরই জায়গা নেই। যদিও এইসব ব্রত অনেক শাস্ত্রের মধ্যে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়েছে তবু এখনো অনেক-গুলি ঋটি অবস্থায় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা লৌকিক-ব্রতের স্থান কেমন করে দখল করতে চাচ্ছে, নতুন-নতুন ব্রত এবং নিজেদের শাস্ত্র ও দেবদেবীকে এনে



সেটাকে পুঁটিয়ে দেখতে হলে, আর-একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখতে হয়; সুতরাং চ-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটা বোঝাবো।

আদর-সিংহাসন ব্রত—এটি সম্পূর্ণ মেয়েলি ব্রত :—“মহাবিশুব সংক্রান্তিতে এক স্বামী-সোহাগিনী সম্বা স্ত্রীকে বহু পূর্বক নিজগৃহে ডাকিয়া আনিয়া পিঠালির দ্বারা বিচিত্র সিংহাসন রচনা করিয়া তত্পরি তাহাকে উপবেশন করাইবে, নাপিতাঙ্গনা দ্বারা হস্তপদের নখাদি ছেদন করাইয়া অলঙ্কৃত রাগে চণ্ডদয় রঞ্জিত করিয়া দিবে এবং তৈল হরিদ্রা ও কবরী বন্ধন করতঃ সীমন্তদেশে সিন্দূর রাগে রঞ্জিত করিবে এবং পুষ্পমালা প্রদান পূর্বক স্তব্ধ দ্রব্য গাত্রে লেপন করিবে, পরে মনোহর দ্রব্য-জাত সমাধর পূর্বক ভোজন করাইয়া বিদায় করিবে। এইরূপে সমস্ত বৈশাখ প্রাতিদিবস এক এক জন অথবা এক জনকেই আদর অভ্যর্থনা ও অর্চনা। বস-চতুষ্টয় পূর্ণ হইলে উদ্ঘোষন।” স্বামীর সোহাগ কামনা করে এই মানুষ-পুঞ্জ মেয়েদের মধ্যে খুব চলছে দেখে পুজারী-ব্রাহ্মণদের লোভ হল; অমান তাঁরা এক ব্রত সৃষ্টি করলেন “ব্রাহ্মণাদর।” “মহাবিশুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৈশাখ মাস প্রাতিদিন এক এক অথবা একই ব্রাহ্মণকে নানা উপকরণে ভোজন করাইয়া ধূক্ষণা দিবে। চারিবৎসরে উদ্ঘোষন।” এমন, মধুসংক্রান্তি মিষ্টসংক্রান্তি—নিজের কথা মিষ্ট হবে এবং শাণ্ডিল্ল-নদের বাক্য-যজ্ঞা সহিতে হবে না এই কামনা করে মেয়েরা যেমন নিজেরদের মধ্যে ব্রত করছে অমান মধু আর মিষ্টানের চারিদিকে ব্রাহ্মণ-মাছি আস্তে আস্তে এসেছে দেখি—

‘ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীতসহ লজ্জ ক দান কর’—বোলে।

তারপর, গ্রামাদেবতার পূজোপলি; যেমন মনসা, শীতলা, সতাপীর। এগুলিকে শাস্ত্রীয় করে নিয়ে ব্রাহ্মণেরা কিছু সুবিধা করে নিলেন। মুসলমানদের পীরকে লোকে যেমন পূজা দিতে আরম্ভ, অমান তাঁকে সত্যানারায়ণ বলে প্রচার করে ব্রতটির উপর হিন্দুধর্ম দখল বসালেন! কিন্তু বাংলায় সত্যানারায়ণের যে পাঁচালী তাতে পীরকে মুসলমানী পোষাকেই দেওয়া হয়েছে। কলা পর্য্যন্ত উর্দু, যেমন—“জয় জয় সতাপীর সনাতন দম্ভগীর” ইত্যাদি। এই মুসলমান পীরের উপাসনা ও সিঁগি ভট্টাচার্য্যদেরও ঘরে চলে এসেছে ও চলছে, কিন্তু এর মধ্যে বাংলায় আজকাল ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা এই ব্রতে মুসলমানী অংশটাকে একেবারে চেপে দেবার চেষ্টায় রয়েছেন। “ব্রতমালা বিধানের” ভূমিকায় ভাটপাড়ার শ্রীবীরেশ নাথ শর্ম্মা লিখেছেন—“সত্যানারায়ণের বাঙ্গলা পাঁচালী বহু পুরোহিতের অসম্মত বলিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহা সন্নিবেশিত করিলাম না—”! পীরের সিঁগি বা ভোগটা হচ্ছে স্নজ্জি, বাতাসা, হিন্দুনীতে বাধে না এমন সব জিনিষ; এবং পায়ের দলে সেটা প্রায় চলে গেছে। এখন, বাংলা পাঁচালী, যেটা থেকে মেয়েরা ধর্ম্মান্ত সহজে বুঝতে পারে যে পীর তিনি পীরই;—বিষ্ণুও নন্ সত্যানারায়ণও নন্, সেই পাঁচালীটাকে লৌপ করে দিতে পারলেই সত্যানারায়ণের হিন্দুত্ব নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে।

আর-কতকগুলি ব্রত; যার নামটা রয়েছে পুরোনো কিন্তু ভিতরের মাল-মসলা সমস্তই

নৃতন,—যেভাবে পেটেন্ট ওষুধের নকল হয়ে থাকে কতকটা সেইরূপে! কুকুটী ব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিকই ছোট-নাগপুরের পার্শ্বভা জাতির এ ব্রতটি; কুকুটী হলেন তাদের দেবী; এবং যেমন নানা অহিন্দু দেবতাকে, তেমনই কুকুটী-দেবীকেও এককালে লোকে পূজো দিতে আরম্ভ করেছিল। মৃতবৎসা-দোষ-নিবারণ এবং তেজস্বী বহু-সন্তানলাভ হচ্ছে কুকুটী ব্রতের ফল। আমাদের শাস্ত্র এটিকে যেমন করে গড়ে নিয়েছে তাতে ব্রতকথার সঙ্গে অমুষ্ঠানের যোগ নেই এবং অমুষ্ঠানের যে সঙ্কল্প তার সঙ্গে ব্রতকথার যে কামনা তারও মিল নেই। সংস্কৃত অমুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সঙ্কল্প হল, যথা—আন্তে আদি ভাদ্রে মাসি শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারভা যাবজ্জীব-পর্যন্তম্ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পায়ণ্ডধর্ম্মরাহিত্য পুত্রপোত্র-ধনধাত্রাতুলসর্ক-সম্পত্তিপ্রাপ্তিপূর্বক শিবলোকপ্রাপ্তিকামা যথাশক্তি যথাজ্ঞানঃ ভবিষ্যপুরাণোক্ত কুকুটী-ব্রতমহং করিষ্যে।” পাছে কুকুটী-ব্রত করে অহিন্দু-পুত্রসন্তান হয়, সেজন্য আগেই সাবধান হওয়া হচ্ছে—“পায়ণ্ডধর্ম্মরাহিত পুত্র” যেন হয়। তার পর “শিবলোকপ্রাপ্তি।” সেখানে কুকুটের আদি-পুরুষ যে ময়ূরের ছানা, তর্কের বেলায় চাই কি, তাঁকে হাজির করা যেতে পারে! অমুষ্ঠানের মধ্যে এই ভাবে আটঘাট বেঁধে পণ্ডিতেরা ব্রতকথাটিকে কাটা-ছাঁটা করতে বসলেন। ব্রতকথাগুলি হচ্ছে ব্রতটির উৎপত্তির ইতিহাস। সেটাকে ঠিক রাখলে তো ধরা পড়বার সম্ভাবনা; এবং ব্রতকথাটা চলতি

ভাষায় বলা চাই, কাজেই ব্রতীর কামনা ও ব্রতের ফলাফল সেখানে ঠিকঠাক বজায় রাখা দরকার। শাস্ত্রে এই সমস্তার যে ভাবে মীমাংসা কল্লেন তা এইঃ—ফলটি পরিষ্কার রইলো—মৃতবৎসা-দোষ-নিবারণ হয়, দীর্ঘ-জীবী পুত্র হয় এবং স্ত্রী কালান্তিপাত ও অন্তে শিবলোক। এ ক’টা বেশ সহজে মিলিয়ে দিয়ে পণ্ডিত ব্রতের উৎপত্তি নিয়ে পড়লেন। রাজা নহুষের রাণী চন্দ্রমুখী এবং পুরোহিতপত্নী মালিকা দেখলেন সরসু-তটে উর্কশী, মেনকা ওঁরা হাতে আটখী স্ত্রীতোর মাট-গাঁট দেওয়া ডোঁরা বেঁধে শিবপূজো কল্লেন। রাণীর প্রস্নে অঙ্গরাসকল উত্তর দিলেন তাঁরা কুকুটীব্রত কল্লেন। রাণী স্বচক্ষে দেখলেন শিবপূজো হচ্ছে কিন্তু গুললেন যে সেটা কুকুটীব্রত। গল্পের বাঁধুনিতে মস্ত একটা ফাঁকি রয়ে গেল। তার পরে মালিকা আর চন্দ্রমুখী ব্রতের অমুষ্ঠান-প্রণালী জেনে নিলেন। এখানে শাস্ত্রীয় অমুষ্ঠানটাই দেওয়া হল। তার পর ব্রতের নামটা কেন যে কুকুটীব্রত হল তার একটা মীমাংসা পণ্ডিতেরা আবিষ্কার কল্লেনঃ—রাণী চন্দ্রমুখী ব্রত করতে ভুল্লেন এবং মালিকা ভুল্লেন না। সেই ফলে চন্দ্রমুখী-সুন্দরী হলেন বানরী; এবং মালিকা হলেন কুকুটী ব্রতের ফলে জাতিস্মরা কুকুটী। তার পর জন্মে জন্মে মালিকা ব্রত করে স্ত্রী থাকেন, চন্দ্রমুখী দুঃখ পান; শেষে একদিন মালিকা দয়া করে চন্দ্রমুখীকে আবার ব্রত করতে শেখালেন। কুকুটী-জন্মেও মালিকা ব্রত করেছিলেন সেই জন্ত ব্রতের নাম হল কুকুটী ব্রত! ব্রতকথা ও অমুষ্ঠানের মধ্যে যে সব

কাঁকি সেগুলো যে পণ্ডিতেরা ধরতে পারেনি তা নয়। ফক্স-গেরোকে আরো গেরো দিখে তাঁরা কসে কুকুটীব্রতের সবটাকে ভবিষ্য-পুরাণের সঙ্গে বাঁধলেন; ব্রতকথা আরম্ভ হল—শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—বার বার পুত্রশোকে দেবকী রোদন কচেন দেখে লোমশ মুনি তাঁকে এই কুকুটীব্রতকথা বলে আশ্বাস দিচ্ছেলেন।

এ এক রকমের প্রক্ৰিয়া, যেখানে ব্রতের নাম ভবন্ত বজায় রেখে তার অমুষ্ঠান ও উৎপত্তির ইতিহাস একেবারে বদলে ফেলা। আর-একরকমের কারিগরি হচ্ছে নামটা পুরো নয় তো আধাআধি বদলে দেওয়া—অমুষ্ঠান অনেকটা বজায় রেখে! প্রাচীন দেবতা আর হিন্দুর দেবতায় একটা মিটমাটের চেষ্টা এই রা'ল দুর্গা ব্রতটি। হরপার্বতী পাশা খেলছিলেন; হঠাৎ শিব পাশা ফেলে বলেন—‘কার জিৎ?’ দুর্গাও বলেন—‘কার জিৎ?’ বড়ুর ব্রাহ্মণ ছিলেন পাশে, বলে উঠলেন—‘মা’র জিৎ।’ অমনি শিবের অভিশম্পাতে ব্রাহ্মণের কুণ্ডব্যাধি। দুর্গার দয়া হল। তিনি তাঁকে সূর্য্য-অর্ঘ্য দিয়ে রা'ল দুর্গার ব্রত করতে শিখিয়ে দিলেন। এখানে সূর্য্যও রইলেন, দুর্গাও রইলেন। সূর্য্যের প্রাচীন নাম রা' বা রা'ল বোঝালে এটি সূর্য্যপূজা; কিন্তু “রা'ল দুর্গা” বলে এটি দুর্গার ব্রত। এই

ভাবে ‘অথ ব্রজেন্দ্রপতি’ বিবরণ লেখা হল ছই দেবতারই মান বজায় রেখে যেমন—

নমঃ নমঃ সদাশিব তুমি প্রাণেশ্বর।

ভক্তিবাহনে প্রভুদেব দিবাকর।

হরগৌরীর চরণে করিয়া নমস্কার।

যাহার প্রচারে হল দেবীর প্রচার।

শুন হবে সর্বলোক হয়ে হরাষত।

বড়ই আশ্চর্য্য কথা সূর্য্যের চরিত।

( ইত্যাদি )

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি কাক প্রক্ৰিয়ার ফল তার কতকটা আভাষ পাওয়া গেল। সব ব্রতগুলিকে সমগ্র ভাবে দেখার কাজ বড় সহজ নয়। প্রকাণ্ড একটা ব্রতপ্রকরণ না লিখলে শাস্ত্রপুরাণের জট ছাড়িয়ে আমাদের দেশের হিন্দুধর্মের পুরাণের পূর্বেকারও ব্রতগুলির নিখুঁৎ চেহারা বার করে আনা কঠিন। তবে ব্রতগুলি যে “আর্য্যগৃহের এবং আর্য্য-জন্মের ছবি নয়” সেটা ঠিক। আর্য্যের চেয়ে রং অনার্য্যের—মন্ত্র-ব্রতদের গৃহলক্ষ্মীর পদাঙ্ক এই সব ব্রতের আল্পনায়, ছড়ায়, ব্রতকথায় সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনার্য্য-অংশ শাস্ত্রীয়-ব্রতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট রয়েছে এবং সেই অংশগুলোকে হিন্দুপুরাণ ও তন্ত্রমন্ত্রের আবরণে ঢাকবার চেষ্টাও হয়েছে কিন্তু সব-সময়ে সে চেষ্টা সফল হয় নি দেখি।

ঐঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## কলকৌ

এবার পূজোর ছুটিতে দেশে গিয়ে দেখি, গাঁয়ের শিবতলার ঘাটে লোক একেবারে গিস্গিস্ করছে। শুনলুম সেখানে নাকি কে-একজন সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গেড়ে বসেছে, আর তাকে দেখে গাঁয়ের যত-সব নিকর্যার ভক্তির সাগর একেবারে উথ্পে উঠেছে।

সাধু-সন্ন্যাসীর জন্তে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। হাতের ঐ ত্রিশূল লুইয়ে সহরের ভিতরে তারা প্রণামী আদায় করে; আবার ঐ ত্রিশূলই উচিয়ে এবং খুঁচিয়ে সহরের বাইরে তারা নির্জন পথের একলা-পথিকের সর্স্ব কেড়ে নেয়! তাদের ঐ ছাইমাথা দেহ আর গেকরা-রঙের কাপড়, ও-সব হচ্ছে পুলিশ ভোলাবার ছদ্মবেশ! গুণ্ডা-বদমায়েসকে দেখলেই চেনা যায়, তাই তাদের আমি ততক্ষণ ভয় করি না—যতটা ভয় করি এই ছদ্মবেশী সাধু-সন্ন্যাসীদের। ..... কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর নামে কী মোহ আছে জানি না, তাই এ-দেশের স্রু মূৰ্খ বলে নয়,—পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত সন্ন্যাসের এই জীবন্ত ‘ক্যারিকেটার’গুলির পদতলে মাথা বিকিরে দেবার জন্তে উদ্ভ্রীব!

আমার এক শিক্ষিত বন্ধু আছেন, তিনি তাঁর সন্ন্যাসী-গুরুকে ভক্তি করেন দেবতার মত। গুরুকে এতটা ভক্তি করার কারণ জানতে চাইলে তিনি সন্মমে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, “তুমি জান না হে, আমাদের গুরু হচ্ছেন অসাধারণ লোক! তিনি একাসনে

বসে পাঁচবৌতিল মদ, দশ-ছিলিম গাঁজা, একটা আস্ত পাঁটা খেয়ে হাস্তে-হাস্তে হজম করতে পারেন!” আমি বলুম “এইজন্তে তুমি তাকে ভক্তি কর?” তিনি বলেন, “হ্যাঁ।”... ..

বিকালবেলায় কি করব, ভেবে পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম, যাই, একবার ঘুরতে-ঘুরতে শিবতলার ঘাটের সন্ন্যাসীটিকে দেখে আসি। সারাদিন লোকমুখে সন্ন্যাসীর যে-রকম গুণগান শুন্ছি, তাতে-করে’ লোকটার মিথ্যা ভড়ং আর বাজে বৃজরূপিক ভেসে দেবার জন্তেও মনের মধ্য থেকে একটা দুর্দম ইচ্ছা ক্রমেই অসহনায় হয়ে উঠছিল!

শিবতলার ঘাটে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য। সেই জনতার মধ্যে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। বাংলাদেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা আর মাসিকপত্রের সম্পাদকেরা নারীজাতির কাছে একবিষয়ে সমান-ধনী;—অশ্লঃপূরের নির্কিঁচর উদারতার গুণেই আজ-পর্য্যন্ত এঁরা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচেবর্তে আছেন!

চারপাশের পাঁচ-সাতখানা গ্রাম থেকে আজ এখানে লোক এসে জুটেছে—সেই শব্দব্যস্ত জনতার মধ্যে সন্ন্যাসী-ঠাকুরের ভস্মাবৃত দেহ ও লটপটে জটাছুট যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, প্রথমে তা কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারলুম না।... ..

অবশেষে যখন ভস্মাবৃত দেহ ও দীর্ঘ

জটাজুট,—সন্ন্যাসী-ক্লাবের এই অপরিহার্য ইউনিফর্ম দেখবার আশায় জলাঞ্জলি দান করলুম, তখন হঠাৎ দেখা গেল, বটতলার বাঁধানো রোয়াকের উপরে যে লোকটির পায়ের তলায় এতগুলো লোক মাথা খুঁড়ে কপাল কুলিয়ে মরছে, তার মাথায় জটাজুটের বহর বা গায়ে কাঠকয়লার ছাঁধ—এ-সব কোন জালা-জঞ্জাল নেই! পাশেই ত্রিশূল আর ভিক্ষার ঝুলি আছে কিনা দেখবার জন্তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লুম—কী আশ্চর্য্য, সেখানে শুধু একটা দামী চামড়ার পেটমোটা ব্যাগ পড়ে হাঁস্কাস্ করছে!

ভেবে নেই, ভিক্ষে মিলছে! কিন্তু একটু ভাবতেই এই সন্ন্যাসীটির ব্যবসাবুদ্ধি যে কতটা ধারালো, তা পরিষ্কার বোঝা গেল। ভ্রমাবৃত দেহ ও দীর্ঘ জটাজুট প্রভৃতির কাছে ক্রমাগত ঠেকে-ঠেকে লোকের ভক্তি ক্রমেই শ্রান্ত ও 'অবিশ্বাসী' হয়ে পড়েছে—অতএব এখন ভোল না-ফেরালে সন্ন্যাসের ব্যবসা আর ভালোরকম চলা শক্ত!

ইতিমধ্যে 'আতাই-কোলা'র ছোটতরফ এসে সন্ন্যাসীর সামনে দণ্ডবৎ হয়ে, ঝনাত করে' এক গিনি প্রণামী ছাড়লেন। সন্ন্যাসী স্নিগ্ধ স্বরে প্রতি-নমস্কার করে' বলেন, "ভগবান আপনার মঙ্গল করুন!" ,... .. হুঁ, ঠাকুরটির ভদ্রতা আর ব্যবসা-বুদ্ধি দুইই দিবাচিন্তনে দেখছি! ইনি চালাকের মত প্রণাম ফিরিয়ে দেন, কিন্তু বোকার মত প্রণামী ফিরিয়ে দেন না!

একটু তফাতে বসে-বসে মজা দেখতে লাগলুম। কত লোক এল, কত লোক গেল। সন্ন্যাসী কারকে ওষুধ দিলেন,

কারকে দুটো মিষ্টি কথায় তুষ্ট করেই বিদায় করলেন। অনেকে হাত দেখাতে এল, কিন্তু সন্ন্যাসী বলেন ও-সব ~~সোলাস-কৌতুক~~ তাঁর আসে না। কেউ-কেউ বক্যা নারীর ছেলে হবার জন্তে ধর্না দিয়ে পড়ল, সন্ন্যাসী এঁই বলে তাদের মুখবন্ধ করে' দিলেন যে, খোদার উপরে খোদাকারী করা তাঁর ব্যবসায় নয়!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠল। বটতলা থেকে ভক্তের দল ক্রমেই কমতে লাগল। আমি কিন্তু তখনো উঠলুম না—এই সন্ন্যাসীটি কি দরের লোক তা না জেনে আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না।

বটতলা যখন প্রায় জনশূন্য, সন্ন্যাসীর চোখ তখন আমার উপরে পড়ল। খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে, সন্ন্যাসী হঠাৎ হেসে উঠে বলেন, "আপনি যখন আমাকে বিশ্বাস করেন না, তখন এখানে বসে মিছে সময় নষ্ট করছেন কেন?"

আমি একেবারে হতভম্ব!

সন্ন্যাসী আবার হেসে বলেন, "আপনি পূজোর ছুটিতে সবে আজ কলকাতা থেকে এখানে এসেছেন, এসেই আমাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছেন? ছিঃ, মানুষ হয়ে মানুষকে এত সহজেই কি অবিশ্বাস করতে আছে ফণীবাবু?"

তাই ত, অবাক করলে যে! আমি এঁকে অবিশ্বাস করি, আমি কলকাতার থাকি, পূজোর ছুটিতে আজই দেশে ফিরেছি, আমার নাম ফণী, সন্ন্যাসী যে সমস্তই ঠিকঠাক বলছেন! যে হু-চারজন দর্শক তখনো

সেখানে বসে ছিল, বিষম বিষয়ে তাদের চোখ যেন কোটরের ভিতর থেকে ঠিকরে পড়বার মত হয়ে উঠল!

তবে কি এ সন্ন্যাসী খাঁটি লোক—সত্যিই কি এঁর দৈবশক্তি আছে? ... .. হঠাৎ সন্ন্যাসীর সামনের থালায় একরাশ টাকার দিকে আমার নজর পড়ল—সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনটা ফের কখে আর বঁেকে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী খরচোখে আমার হাব-ভাব নিরীক্ষণ করছিলেন। যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই তেমনি হাস্তে-হাস্তে বললেন, “ফণীবাবু, আপনি ভাবচেন যে, লোকের কাছে প্রণামী আদায় করে’ যে লোকের দিন চলে, সে নিশ্চয়ই ভণ্ড, চোর, জোচ্ছোর! কেমন, আমি ঠিক বলেছি কি না?”

সন্ন্যাসী কি অন্তর্ধামী? আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করলুম।

—“ফণীবাবু, যান, বাড়ী গিয়ে আপনার ফাউন্টেন পেন দিয়ে, আপনি যে সবুজ কালিতে লেখেন, সেই কালিতে পকেটবুকে বড়-বড় করে’ লিখে রাখুন-গে যে, মাহুষকে ভালো করে’ না-চিনে অবিশ্বাস করা মহাপাপ!”

আমি ফাউন্টেন পেনে সবুজ কালিতে লিখি, এটাও সত্য!

সন্ন্যাসী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বকুলেন, “ফণী-বাবু, এ টাকা আমি নিজের পেট-ভরাবার জন্তে নিচ্ছি না—ঐ টাকায় আমি দরিদ্র-নারায়ণের পূজা করব। ... .. সন্ধ্যা হোলো, এখন বাড়ী যান। কাল বৈকালে আবার যদি আসেন ত, আমি খুসি হব। এখানে

কাঙালী ভোজন হবে, আপনি তাতে আমার সাহায্য করবেন।”

আমি সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে একখানি পাঁচ টাকার নোট রেখে অশ্রুতপ্ত স্বরে বল্লম, “আপনার দরিদ্র-নারায়ণের পূজায় আমার এই সামান্য অংশ গ্রহণ করুন।”

• সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন মুখে বল্লেন, “আপনার মঙ্গল হোক।”

... ..

খুব খটা করে’ কাঙালী-ভোজন হয়ে গেল। স্নুধু পেট-ভরে খাওয়া নয়—সেই সঙ্গে প্রত্যেক কাঙালী এক-একখানি করে’ নতুন কাপড় ও চাদরও পেয়ে, হাসিমুখে সন্ন্যাসীর নামে জয়ধ্বনি করতে-করতে বিদায় হ’ল।

কাঙালী ও দলকের দল যখন একে-একে চলে গেল, সন্ন্যাসী তখন আন্তে আন্তে ঘাটের কিনারায় গিয়ে নদীমুখো হয়ে বসে পড়লেন।

পূর্ণিমার রাত্রি,—তরল জ্যোৎস্নার চিকণ রোপ্য-রঙে তুলি ডুবিয়ে, চাঁদ তখন কালো মেঘের ধারে-ধারে বল্মলে আলোর পাড় এঁকে দিচ্ছিল।

সন্ন্যাসী শুক হয়ে বসে রইলেন। আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে’ শেষটা তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম;—এই সন্ন্যাসীটির মনের ভিতরটা পর্য্যাপ্ত তলিয়ে দেখবো,—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছে!

গায়ের উপরে আমার ছায়া পড়তেই সন্ন্যাসী চমকে উঠে মুখ তুললেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থিরনেত্র্যে তাকিয়ে থেকে বল্লেন, “আপনি এখনো যান-নি!”

—“না, আপনার কাছ থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।”

—“তাহলে বসুন।”

সন্ন্যাসীর পাশে বাটের পৈঠার উপরে বসে পড়লুম।

একটু চুপ করে’ থেকে সন্ন্যাসী বল্লেন, “আপনার দেখুচি আমার উপরে খুব বিশ্বাস’ হয়েছে! যারা যত সহজে অবিশ্বাস করে, তারা তত সহজে বিশ্বাসও করে!”

আমি মৃদুস্বরে বল্লুম, “আপনার অলৌকিক শক্তি দেখেও আপনাকে যদি বিশ্বাস না করি, তাহলে—”

বাধা দিয়ে ক্ষুদ্রস্বরে সন্ন্যাসী বল্লেন, “অলৌকিক শক্তি দেখে সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস! তাহলে যাহুকরের মত মহাযোগী আর কে আছে ফণীবাবু?”

—“কিন্তু যাহুকররা যে ভেঙ্কা দেখায়, সেটা যে একটা লোকঠকানো ব্যাপার!”

—“আমিও অলৌকিক কিছু দেখাই-নি, যা দেখিয়েছি তা আপনাকে ঠকবার জন্তেই দেখিয়েছি। একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকলে আপনিও আমার মত শক্তি দেখাতে পারতেন!”

—“কিন্তু আপনি আমাকে দেখে যে-সব কথা বলেছেন, তা কি যে-সে লোক বলতে পারত?”

—“সবাই পারত! আপনার চোখ-মুখের ভাব দেখে আমি বুঝেছিলুম, আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন।...আপনার বাঁ হাতে উকীতে নামের তিনটি আদ্য অক্ষর আছে, এক, এন, জি। এক আর এন-এ সাধারণত ফণীস্রনাথ ছাড়া অন্য নাম হয় না, সুতরাং আপনার নাম আন্দাজ করাও

কিছু শক্ত নয়।...এই ছোট গ্রামটিতে আমি এসেছি আজ কুড়ি-পঁচিশদিন। গায়ের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সবাই আনাকে দেখতে এসেছে—সবাইকে আমি চিনি। কিন্তু আপনাকে আমি কাল বিকালে প্রথম দেখলুম, তা’থেকে বুল্লুম আপনিন নতুন আগন্তুক। ... এখন পূজোর ছুটি পড়েছে, অতএব পূজোর ছুটিতেই আপনি এসেছেন; আপনার পায়ের চটিজুতো, মাথার চুল-ছাঁটা, গায়ের পাজাবী—সব কল্কাতার হাল-ক্যাসানের বাবুর মত, কাজেই ধরে নিলুম আপনি আসছেন কল্কাতা থেকে।...

আপনার পাজাবীর বুক-পকেটের এককোণে দেখলুম, সবুজ কালির অম্পষ্ট দাগ। বুক-পকেটের ও-রকম জায়গায় ও-রকম কালির দাগ সহজে লাগে না—আপনি যদি ওখানে কাউন্টেন পেন গুঁজে না-রাখেন। ... ফণীবাবু, আপনি কত সহজে ঠকে গেছেন, দেখছেন ত? সন্ন্যাসীর কাছে অলৌকিক ব্যাপারের প্রত্যাশা করলে এমনিভাবেই ঠকতে হয়! আমরা—সন্ন্যাসীরা মাহুৰ মাত্র;—মাহুৰের মতই আমাদের দেখবেন।”

সন্ন্যাসী মুখ ফিরিয়ে নদীর ওপারের দিকে তাকালেন। সেখানে গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় দেবার আলোর ফুলঝুরি বয়ে পড়ছিল—আজ যেন জ্যোৎস্নার দেওয়ালি-উৎসব ভরপুর জমে উঠেছে!...সন্ন্যাসীর কথা শুনে, আমিও বিস্মিত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী আবার ধীরে ধীরে বল্লেন, “আমার ওপরে আপনার বোধহয় আর-একটুও ভ্রম নেই?”

—“আপনি এমন কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?”

—“কারণ, আপনি এখন বুঝেছেন যে, আমি কোন অলৌকিক কাজ করতে পারি না।”

—“হ্যাঁ, এ-কথা সত্যি যে আমি আপনাকে ত্রিকালদশী মহাপুরুষ ভেবেছিলুম। কিন্তু আপনি নিজেই যখন আমার সে ভ্রম ভেঙে দিলেন, তখন এটা বুঝতে পারছি, আপনিই ষষ্ঠাধি—লোক-ঠকাতে আপনি সন্ন্যাস-ব্রত নেন-নি।”

সন্ন্যাসী শূভ-দৃষ্টিতে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে, অন্তমনস্ক ভাবে খুব মুছ স্বরে বলেন, “না, লোক-ঠকাতে সন্ন্যাস-ব্রত নিই-নি—আমি সন্ন্যাসী হয়েছি নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।”

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা অব্যক্ত হাহাকারের প্রতিধ্বনি ছিল। আমি আশ্চর্য হয়ে মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম।

সন্ন্যাসী যেন অর্দ্ধস্বগত ভাবে আবার বলেন, “কিন্তু আজও বুঝতে পারি না, আমি যা করেছি তা জ্ঞায় কি অন্তায় ... .. আমার অবস্থায় পড়লে অন্ত লোক কী করত?.....আমি তা জানতে চাই!” —সন্ন্যাসী ঘাড় হেঁট করে’ কি-যেন ভাবতে লাগলেন। বেশ বুঝলুম, তাঁর মন এখন বর্তমান থেকে একেবারে অতীতে ফিরে গেছে!

আচমকা মাথা তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি বলতে পারেন?”

এই অসংলগ্ন প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে আমি বলুম, “আপনি কি বলছেন?”

—“আমি যা করেছি তা জ্ঞায় কি অন্তায়?”

—“কিন্তু আপনি কী করেছেন?”

সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে মুখ ফিরিয়ে, শান্ত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল আমার দিকে চেয়ে থেকে, বলেন, “ও, আপনি আমার কথা কিছুই জানেন না,—না? আচ্ছা, আজ তবে আপনাকে আমার কথা বলব,—দেখি, এই দুঃখ-স্বতির কথা প্রকাশ করে’ দিয়ে প্রাণে একটু শান্তি পাওয়া যায় কিনা।”

—এই বলেই সন্ন্যাসী হঠাৎ তাঁর কথা শুরু করে’ দিলেন,—তিনি কে, কাদের কথা বলছেন সে-সব পরিচয়ের দার দিয়েও গেলেন না!

“কনকলতাকে শুধু আমি ভালোবাসতুম না, তাকে আমি পূজা করতুম দেবীর মত। এই কথাটি আপনাকে মনে রাখতে হবে... .. শুধু ভালোবাসলে তার জন্তে আমি যা করেছি, হয়ত আমার দ্বারা তা সম্ভব হতো না; কিন্তু সম্ভব যে হয়েছে তার আসল কারণ আমি তাকে পূজা করতুম, পূজা!

তার প্রতি আমার এই অন্ধ ভক্তির কথা, সে জানত। কিন্তু আমাকে সে কি চোখে দেখত, আমি আগে তা জানতুম পারি-নি।.....খালি এইটুকু বুঝতে পারতুম, আমাকে সে ঘৃণা করত না।

লেখা-পড়ার দিকে তার কি টান ছিল! তাকে পড়াতে বসে, কথাপ্রসঙ্গে আমি যখন তার কাছে পৃথিবীর নানা দেশের কথা, নানা জাতির কথা, নানা সাহিত্যের



কথা সরল ভাষায় বলে যেতুম, সে তখন কী আগ্রহভরে তার ডাগর চোখদুটি তুলে আমার দিকে চেয়ে পাকত! তার সে দৃষ্টি আমি এখনো ভুলি-নি।

দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল আমি তাকে পড়িয়েছিলুম! ছয়বৎসর আমার সামনে সে রোজই এসে দাঁড়িয়েছে...সেই ছয় বৎসরের দিকে আজও আমার সমগ্র জীবন একাগ্র হয়ে আছে! আমার চোখের স্মৃতিতেই তার কিশোরী তরুণতায় যৌবনের প্রথম কুল ফুটে উঠেছিল; কৈশোর ও যৌবনের মিলন-ক্ষেত্রে তার চোখে-মুখে রূপ-মহিমার যে অপূর্ণ শিখা জ্বলতে দেখেছি, আজ-পর্যন্ত আর-কোথাও তার তুলনা পাই-নি।

তখন এক দীর্ঘ স্বপ্নের মধ্যে বাস করতুম। যখন যেখানে, যে কাজে থাকতুম, কনকলতার স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করে' রাখত। পৃথিবীর এত দৃশ্য, এত শোভা, এত লোকজন, আনন্দ-উল্লাসের ঢেউ, এ-সবই যেন মনে হ'ত তুচ্ছ, অকারণ, খাপছাড়া, —স্বপ্নের সৃষ্টি যেন সার্থক হয়েছে একমাত্র ঐ কনকলতার জন্তেই!

... ..আপনি বোধহয় বুঝছেন, যার অবস্থা এমন,—সে কখনো মনের ভাব লুপ্ত হয়ে রাখতে পারে না। তখনো পর্যন্ত যুগ ফুটে যদিও আমি কনকলতার কাছে মনের একটি কথাও খুলে বলি-নি, কিন্তু ওবুহুত আমার মুখে-চোখে, ভাবে-ভঙ্গিতে আমার গুপ্তকথা ব্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। কনকলতা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে, তার প্রতি আমার যে ভাব, সেটা, ছাত্রীর

প্রতি ঠিক শিক্ষকের ভাবের মত নয়! কারণ, পড়তে-পড়তে হঠাৎ মাথা তুলে ইদানীং যখন সে দেখত, টেবিলের এক-কোণে বসে আমি নিঃশেষ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছি, তখন সে আবার বাড় হেঁট করে' ফেলত, আর তার সারা মুখখানি —কৌকড়া চুলে ভরা ছোট্ট কপাল-খানি থেকে স্ফুটল চিবুকের তলাটি পর্যন্ত,—একেবারে লালে লাল হয়ে উঠত! এমন-কি, তার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হ'লে, অনেকসময়ে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আর বলতে পারত না!... ..কনকলতার সঙ্গে আমার ত আর নূতন পরিচয় নহ, এর আগে সে আমাকে কতবার দেখেছে, আমার সঙ্গে অসঙ্কোচে, প্রাণ খুলে কত কথাই না করেছে! এতদিন পরে আজ তবে তার এমন ভাব কেন? এত লজ্জা, এত সঙ্কোচ কেন?... ..হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছে! এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নেই,—কারণ, এদিকে রমণীর অনুভূতি পুরুষের চেয়ে ঢের-বেগী সচেতন।

এখানে আমি অনেকটা সাস্থনা পেতুম। আমাকে সে কি ভাবে দেখে, তা জানতুম না—খালি এইটুকু দেখতে পেতুম, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যখন তার ঘরটিতে গিয়ে ঢুকতুম, তখন তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত:—‘আমি গেলে, সে খুসি হয়, এই-টুকুই আমার যথা-লাভ!

এর বেগী আর-কিছুর আশাও আমার ছিল না। আমি আর সে যত-কাছাকাছিই থাকি না কেন, আমাদের মাঝখানে এক

অসম্ভবের পাঁচিল দাঁড়িয়ে, তাকে আর আমাকে আজীবন আলাদা করে' রাখবেই রাখবে! কনকলতার সঙ্গে আমার বিবাহ যে অসম্ভব, তা আমি জানতুম। সমাজের পাহারা এখানে বড় কড়া—কারণ, আমি হচ্ছি ব্রাহ্মণ আর সে ছিল কায়স্থ!

.....এইভাবে দিন যাচ্ছিল। কনকলতা কখনো আমার হবে না, একথা স্নেহেও, অস্তিত্ব এই ভেবেও আমি হুঁপুঁ ছিলাম যে, তাকে ত আমি রোজ দেখতে পাচ্ছি, তার মধুর বাকী, তার কোমল স্পর্শ থেকে ত আমি বঞ্চিত নই! কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র স্বপ্নের মেঘেও আঁচড়িতে আগুন লাগবার উপক্রম হ'ল!

কনকলতার বাপ-মায়ের অকস্মাত মনে পড়ে গেল যে, তাঁদের মেয়ের বয়স অত্যন্ত বেশী হয়ে গেছে—এইবার তার আইবুড়ো নাম ঘোচানো দরকার। অতএব অবিলম্বে পাত্র-সকানের ঘটা লেগে গেল।

নদীর ভাঙন-ধরা কূলের মত আমার মনের একদিকটা যেন ধ্বসে পড়ল। বুঝলুম, বিবাহ হ'লে কনকলতাকে আর-কখনো চোখেও দেখতে পাব না! অপচ এ বিবাহে বাধা দি, এমন শক্তিও আমার নেই! কিন্তু, তবু—তবু—

চর্চাবনায় ছ-রাত্রি আমি ঠায় জেগে-জেগে কাটিয়ে দিলাম।

চঠাৎ মোহিতকে মনে পড়ল। এন্ট্রান্স পরীক্ষা গতে-আমাতে একসঙ্গে পড়েছিলাম। এখনো তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়—তবে কালে-ভদ্রে, পথে-ঘাটে! মোহিত গৃহস্থের ছেলে, এম এ বি-এল পাশ দিয়ে

আজকাল পুলিশ-কোটে ওকালতি করছে। দেখতেও ভালো, জাতেও কায়স্থ। আর, এখনো অবিবাহিত।

মোহিতের সঙ্গে কনকলতার বিবাহ দেবার জন্তে কৌমর বেঁধে আমি ঘটকালি শুরু করলুম। পাত্রের গুণবর্ণনা শুনে কনকলতার বাপ খুশি হয়ে এককথার উপরে আর ছ-কথা বললেন না! মোহিত প্রথমটা বিবাহে নারাজ হয়েছিল; কিন্তু বরপণের পরিমাণ শুনে তার উকিলা বুদ্ধি নিম্ন-রাজি হয়ে পড়ল এবং স্বচক্ষে যেদিন সে মেয়েকে দেখলে, সেইদিনই একসঙ্গে মোহিতের চক্ষু, মত আর বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল!

আমিও কতকটা নিশ্চিত হলাম। ঠিক করলুম, মোহিতের সঙ্গে এখন দিনকতক খুব মেলা-মেশা করে' আমাদের আগেকার সম্বন্ধটা বন্ধুত্ব পরিণত করতে হবে। তাহ'লে বিবাহের পরেও কনকলতা আর আমার চোখের আড়াল হবে না! এই ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির অগোঁই মোহিতের সঙ্গে কনকলতার বিবাহ-ব্যাপারে আমি ঘটক সেজেছি! অল্প-কোথাও বিবাহ হ'লে কনকলতাকে আমি ত আর দেখতে পেতুম না!

আজ এতদিন পরে মনে হচ্ছে, আমি কী ভ্রম করেছিলাম! কনকলতাকে চোখে দেখতে পাব—এই সামান্য ওকালতায় আমি এখন একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, তখন জানতুম না যে, সেই ছন্দিতার শাস্তি আমাকে চিরজীবন ধরে ভোগ করতে হবে।

কিন্তু এক ভ্রমের উপরে আমি আবার আর এক ভ্রম করে' বসলুম। এই দ্বিতীয়

ভ্রমের যে শোচনীয় ফল হয়েছিল, জন্ম-জন্মান্তরেও আমি কি তা ভুলব।

... ..অনেক চেষ্টা করে'ও, কনকলতার বিবাহের আগের দিনে আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলে রাখতে পারলুম না। কখনো যা করি-নি, সেদিন আমি মনের ঝোঁকে তাই করে' ফেললুম। জানি না, সেদিন আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলুম কিনা!

বিবাহের আগের দিনে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। কনকলতার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব জেনেও, তাকে ছাত্রীরূপে পেয়ে এতদিন আমি তবু কতকটা পারত্পূর্ণ ছিলাম; কিন্তু এ দুর্লভ অধিকার থেকে এখন আমি বঞ্চিত হ'তে চলেছি, এই দুঃশিস্তা আমাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ক্রমেই কাতর করে' তুললে

মনের আবেগে সেদিন কনকলতাকে এক চিঠি লিখে ফেললুম।—

“কনকলতা,

কাল থেকে তুমি আর আমার ছাত্রী নও—আমার কাছ থেকে সমাজ তোমাকে কেড়ে নেবে। তোমার অভাব আমি জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। এতদিনের পরিচয় একদিনে ভোলা যায় না,—আর, আমি ভুলতেও চাই না! কারণ তোমাকে ভুললে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব,—আমার অন্ধকার জীবন-পথে তোমার স্মৃতিই যে এখন পূর্ণিমার চন্দ্রালোক!

কনক, তোমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু আমার এ প্রেম তোমার দেহকে তোমার রূপবোবনকে প্রার্থনা করে না—

এ চায় শুধু তোমার স্মৃতিতে পূজা করতে। এইটুকু বুঝে আমার এই অভাগা প্রেমকে তুমি মার্জনা কোরো।

তোমার বিবাহিত জীবন সুন্দর হোক, সফল হোক, সুখের হোক, এই আমার শেষ-কামনা।”

চিঠি পড়ে কনকলতার মনের ভাব কি-রকম হয়েছিল, তা আমি জানি না।

কিন্তু এখন ভাবি, উপজ্ঞাসের হতাশ ও নির্যোধ প্রেমিকের মত এই হা-হতাশে ভরা পত্রখানা, তখন আমি লিখেছিলুম কোন্ উদ্দেশ্যে? আসন্ন বিবাহ-লগ্নে আমি কি তাকে প্রকারান্তরে এই কথাই বলতে চেয়েছিলুম যে, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমিও আমাকে ভালো না। স্বামীর সংসারে গিয়েও তুমি আমার প্রেমকে মনে রেখ’?

আমার অবস্থায় পড়লে মানুষের মনে এমনি চিন্তা আসাই স্বাভাবিক বটে! আজ এতদিন পরে যদিও ঠিক করে' কিছু বলতে পারি না, তবু মনে হয়, আমার পত্র-লেখার উদ্দেশ্য ছিল সত্যই। আমি বোধ হয়, আর-কিছু না ভেবে-চিন্তেই, কনকলতাকে শুধু আমার মনের অবস্থাটা জানাতে চেয়েছিলুম। কেন না, আমার প্রতি কনকলতার মনের ভাব কি-রকম, আমি তা জানতুম না—সুতরাং, বিবাহের পরেও সে যে আমাকে মনে রাখবে, এমন ভাববার কোন সম্ভব কারণ আমার ছিল না।

ভক্ত শুধু আপন মনে দেবীকে পূজা করে'ই তুষ্ট থাকতে পারে না। তার পূজা গোপন হ'লেও দেবীর কাছে যে তা গোপন নেই অন্তত এটা জানতে পারলেও ভক্তের

প্রাণে একটা শাস্তি ও জাতিবার সন্কার হয়। এইজন্তেই, পূজা নিন আর নাই নিন। ভক্ত তার পূজাব কথা দেবীকে নিবেদন করতে চায়।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের কথা এখন থাক। আমার তখনকার মনের ভাব বাই হোক, কনকলতাকে আমি যে পত্র লিখেছিলুম, এটোটেই হচ্ছে সব-চেয়ে সত্য আর বড় কথা। এবং এই পত্র-লেখা যে আমার পক্ষে অতিশয় গহিত কার্য্য হয়েছিল, তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই। এর স্বপক্ষে আমার বন্বার কিছু নেই শুধু এইটুকু ছাড়া—যেবন হচ্ছে অদূরদর্শী এবং প্রেম হচ্ছে অন্ধ।

... ..

তারপর ছ-বৎসর কেটে গেল। মোহিতের সঙ্গে এর-মধ্যে আমার মাথামাথি এতটা বনিয়ে উঠেছিল যে, তার বাড়ীতে আমার কাছে আর সদর-অন্ধরের ভেদ ছিল না।

কিন্তু স্কুল থেকে মোহিতের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে, তার স্বভাব যে এতখানি বদলে গেছে, তা আমি জানতুম না। স্কুলে মোহিত ছিল ঠিক ভ্যাডার মত শাস্ত্র, আর খব্বাগোসের মত ভীক। পাড়ারগেয়ে ছেলে বলে, আমরা—সহরেরা তার ওপরে মুকব্বিআনাও করতুম বৎপরোনাস্তি। সে মুকব্বিআনার ঠালা অনেকসময়ে বস্ত্রগাদায়ক হয়ে উঠলেও, সে বাড়ি হেঁট করে' মুখটি বুঁজে সব সয়ে থাকত। পরে দেখে-শিখে ক্রমে অনেকটা চালাক-চতুর হ'লেও, আমাদের সঙ্গে সে কোনদিনই সমান-সমান চলতে সাহস করে-নি,—গুফর যতটা প্রাণা, তার কাছ থেকে আমরা সজ্জন পেতুম ঠিক

ততখানি! তারপর সে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল; আমবাও দল-ছাড়া হয়ে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লুম, তা কেউ জানি না।

কলেজে ঢুকে মোহিত যখন দেখলে সেখানে সব চেহারাই তার অচেনা, তখন নিজের মূখ থেকে দীনতার মুখোশ খুলে ফেলতে একটুও দেরি করলে না। সে যে পাড়ারগেয়ে ছেলে, চালচলনে কথায়-বার্তায় কাককেই তা জানতে দিলে না।

পাড়ারগেয়ে ছেলের পক্ষে সহরে আসা, মস্ত এক অগ্নিপরীক্ষা। সহরে ছেলেরা তাদের পাড়ারগেয়ে ভূত বলে ঠাট্টা করে এবং ধর্তবোর মধ্যেই গলা করে না—তাদের পরস্পরের ভিতরে অনেকটা বিজয়ী-বিজিতের সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, লাক্ষিত পল্লী-বালকরা আপনাদের 'পাড়ারগেয়ে' নাম ঘোচাবার জন্তে সহরেদের অতুর্করণ করতে শেখে। কিন্তু অতুর্করণ করতে গিয়ে অনেক সময়েই তারা আসলকে উচিয়ে যায়; এমন-কি, যেখানে সহরে ছেলেরাও ভয় পায়, সেখানেও ভরসা দেখিয়ে তারা প্রতিপন্ন কবে, তারা পাড়ারগেয়ে ভূত নয়! সহরে এসে পাড়ারগেয়ে ছেলেরা প্রায়ই যে চারিধা হারিয়ে ফেলে, তার আসল কারণ এই।

মোহিতেরও সেই দশা হ'ল। কলেজে ঢুকে প্রথমে সে একটু-একটু করে' মদ খেতে শিখিলে। লেখাপড়ায় ভালো হ'লেও অন্তরিকে তার পতনের পথ তৈরি হ'তে লাগল।... .. তারপর সে পুলিশ-কোর্টে ঢুকল। সকলেই জানেন, যাদের চরিত্রের তেমন জোর নেই, পুলিশ-কোর্ট তাদের পক্ষে চুলোর যাবার পথে মস্ত-এক আন্তানা। এই পুলিশ-কোর্টে

এসে মোহিত প্রথমে এক অভিনেত্রীকে মকেল রূপে লাভ করে।... ..তার পরের কথা না বললেও চলে।... ..মোহিতের জীবনে এখন প্রধান উপভোগ্য হচ্ছে, সুরা আর নারা।

সেই পাড়ারগেয়ে মোহিত যে এখন এতটা সহরে আর লায়ক হয়ে উঠেছে, এ খবর আমি ক্রমে-ক্রমে, নানান লোকের মুখ থেকে শুনে জানতে পেরেছি।... ..মোহিত নিজেকে আমার সঙ্গে খোলাখুলি মিশলেও, তার চরিত্রের কালো দিকটা আমার কাছে থেকে চোপে রেখেছিল। কেন? বোধ-হয় সে এখনো আমাকে মনে-মনে ভয় বা মাক্ত করে! এটা খুবই স্বাভাবিক। এক-সময়ে কেউ যদি কাকুর কাছে গোলামী করে' থাকে, তাহলে পরে সে স্বাধীন ও ধনী হ'লেও, পূর্ব-প্রভুর সামনে গেলে, মাথাটা অন্তত একটু নীচু না-করে' থাকতে পারে না। ... ..মোহিতেরও হয়ত তাই হয়েছে। স্কুলের সেই বাল্য-জীবনের কথা সে আজও ভোলে-নি। তাই সে এখনো নিজেকে আমার সমকক্ষ বলে ভাবতে সাহসী নয়।

কিন্তু মোহিতের চরিত্রের কথা যখন জানতে পারলুম, তখন আমার মনটা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল। জগতে আমার সব-চেয়ে বেশি প্রিয়তম, তাকে আমিই মোহিতের হাতে সমর্পণ করেছি, আমার চোখে-চোখে থাকবে বলে। কনকলতার সঙ্গে মোহিত কেমন ব্যবহার করে? তার হাতে পড়ে' সে কি অসুখী হয়েছে?

চেষ্টা করে'ও জানতে পারলুম না। কনকলতার মুখ দেখে কিছুই ধরবার-ছোঁবার

যো নেই। মুখে দৃঃখ-বাতনার কোন চিহ্ন থাকি ত দূরের কথা—তাকে যখন দেখি মনে হয়, তার সর্সাজ দিয়ে যেন হাসির উৎস উথলে উঠছে। তার হাসি-খুসি এখন আগেকার চেয়ে ঢের-বেশী বেড়েছে—এমন কি, অসম্ভব-রকম। কিন্তু এইটাই আমি অস্বাভাবিক মনে করি! কনকলতা আগে ত অমন কারণে-অকারণে, যখন-তখন অত হাসি হাসত না! স্বভাবতই তার স্বভাব ছিল ধীর, স্থির, গম্ভীর। তার ঐ স্থিরতাই আমার বেশী ভালো লাগত। বয়স যত বাড়তে থাকে, মানুষের ধীরতাও তত বেড়ে ওঠে-বাই কথা। কিন্তু তা না হয়ে কনকলতার এমন উন্টো ধরণ কেন? তার সে ধীরতা, সে গাম্ভীৰ্য্য কোথায় গেল? আগে যে মাঝে-মাঝে অল্প অল্প মৃদু-হাসি হাসত, এখন সে এত উচ্চ স্বরে এত-বেশী হাসে কেন?... .. এ প্রশ্নের কোন সম্মত উত্তর আমি খুঁজে পেলুম না। আমার মনটা ভারি দমে গেল। —মানুষের হাসিকে আমি বিশ্বাস করি না! জ্ঞান, সংসারের অনেক অবরুদ্ধ অশ্রু, অনেক গোপন হাহাকার, অনেক নীরব ক্রন্দন, ঐ-এক হাসির ধারার মধ্যেই ছাইচাপা আঙনের মত ঢাকা থাকে! এ হচ্ছে গর্ষিত মানবের স্বভাব। পৃথিবীকে সে আপনার দুর্জয়তা দেখায় 'না।—হ্যাঁ, কনকলতার হাসি দেখে আমার ভয় হয়।

পর্যবেক্ষণের শক্তিটা আমার চিরকালই আছে। লোকের সাজসজ্জা দেখে, তার ভাব-ভাজ নিরীক্ষণ করে', তার মুখের ছ-

চারটে কপ্তাবাজী শুনে প্রায়ই আমি তার স্বভাবের কথাটা বলে দিতে পারি। বন্ধুবান্ধবরা আমার এই শক্তি দেখে অনেক সময়ে আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন। অনেকে বলতেন, ভালো ডিটেকটিভের যে-সব গুণ থাকে উচিত, আমার নাকি প্রচুর পরিমাণে তা আছে! কিন্তু যাক সে কথা।

—কনকলতার হাসি দেখে আর যে-ই ভুলুক, আমি ভুলুম না। আমার মনে একটা বিষম ধোঁকা লেগে গেল! সেই সন্দেহই আমাকে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক করে' রাখলে।

কিছুদিন পরেই আমার সন্দেহ পরিণত হ'ল নিশ্চিত সত্যে।

সেদিন সকালবেলার হাতে কোন কাজ না-থাকতে, মোহিতের বাড়ীতে গেলুম। শুনলুম মোহিত বেরিয়ে গিয়েছে আর কনকলতার নাকি অসুখ করেছে। অসুখটা কি জানবার জ্ঞে বাড়ীর ভিতরে গেলুম। আমার গলা পেয়ে কনকলতা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—“তোমার কি অসুখ করেছে কনক?”

—“অসুখ? এমন বিশেষ-কিছু নয়, মাথাটা বড্ড ধরেচে।”—এই বলে কনকলতা একটুখানি হাসলে—অত্যন্ত স্নান একটু হাসি! মনে হ'ল, সে-যেন অভিনয়-শ্রাস্ত নটের প্রাণপণ-চেষ্টার হাসি!

হঠাৎ কনকলতার কপালের উপরে আমার চোখ পড়ে গেল। তার কপালের এক জায়গা কেটে গিয়ে ফুলে ঢিপি হয়ে উঠেছে!

ধাঁ-করে' আমার মনে একটা সন্দেহ

হেগে উঠল—মুখ দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বোবয়ে গেল—“তোমার কপালে ও কি!”

একটা চাপা কান্নার আবেগে কনকলতার সঙ্গী যেন থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল! কিন্তু তখন সামলে নিয়ে সে আবার একটু হেসে বলে, “ও কিছু নয়—কাল আমার কপালটা জান্নাম হুঁকে গিয়েছিল কিনা—”

—“কনক, তুমি সত্যিকথা বলছ না। তোমার কপাল যেন জান্নাম হুঁকে গিয়েছিল—কিন্তু তোমার গলায়, হাতে অত কাল-শিরের দাগ কেন?”

ককণ নয়নে আমার দিকে একবার তাকিয়েই সে মাথা নীচু করলে।

—“কনক, কে তোমায় মেরেছে, এমন পাষাণ কে আছে?”

কনকলতা মাথা তুলে আবার মূহ-মূহ হাসতে লাগল—কিন্তু সে বোধহয় নিজেই জানতে পারলে না যে, তার চোখ দিয়ে তখন টম্‌টম্‌ করে' জল ঝরুছে।

—“কনক, বুকের হাসি আর ত তোমার চোখের জলকে সামলাতে পারলে না! অনেকদিনই এ সন্দেহ করেছিলুম, আজ এতদিনে আমি বুঝতে পারলুম, আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়!”

—হুহাতে আপনার মুখ ঢেকে দেয়াগুর উপরে হেলে, বোবা পুতুলের মত সে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি অমৃতপ্ত স্বরে বল্লুম, “কে তোমাকে মেরেছে, তুমি না-বলেও আমি বুঝছি।... আর একজনে আমিই দায়ী—তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছি আমিই!”

কনকলতা তখনো নিকরীক।

—“তুমি জ্ঞান-না কনক, তোমার দশা দেখে আমার বুকের ভেতরটা কঁপে কঁপে ! ... কিম্বা মোহিতকে আমি ছাড়ব না—তোমার গায়ে সে হাত তুলেছে।”

—সব্বসঙ্গে সিঁড়িতে পায়েল শব্দ শোনা গেল, কে উপরে উঠছে।

পলক না-পড়তে কনকলতা চোখের জল মুছে ফেললে ! বিদ্যাতের মত আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে চুপিচুপি সে বলে উঠল, “ঐ উনি আসছেন ! দোহাই আপনার—ওঁকে কিছু বললে আমি আর বাঁচব না !”

উপরে উঠে, আমাদের ছজনকে সেখানে একসঙ্গে দেখে, মোহিত ভাবাচ্যাকা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অত্যন্ত সন্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের ছজনকে দিকে বারবার সে তাকাতে লাগল—বোধহয় ভাবছিল, কনকলতার মুখে তার কীর্ষি-কাহিনীর সমস্তটা আমি শুনেছি !

কনকলতা হাসতে-হাসতে সহজ স্বরে বলে, “তোমার কোটের বেলা হ’ল যে ! ষাও, ষাও, তাড়াতাড়ি জ্ঞান করে’ এস !”

কনকলতার হাসিমুখ ও সহজ স্বর মোহিতের সব ধুক্ধুকনি মুচিয়ে দিলে। আশস্তির নিখাস ফেলে, আমার দিকে ফিরে এসে বলে, “কি হে, তুমি কতক্ষণ ?”

—“এই খানিকক্ষণ। এত সকালে বেরিয়েছিলে যে !”

—“একটা বেআক্কেল মকেলের পাল্লায় পড়ে ভোর না হ’তেই আমাকে বেরতে হয়েছিল।”

—“আচ্ছা, তোমার বেলা হচ্ছে, আজ

এখন আসি”—অকে কষ্টে শাঙ্ক স্বাভাবিক স্বরে এই কথা বলে, তাড়াতাড়ি আমি বিনামূল্যে। আর বেশীক্ষণ থাকলে হয়ত আমি মাথা ঠিক রাখতে পারতুম না—কনকলতার মত অভিনয়ে আমার দক্ষতা ছিল না !

... ..  
... ..

বাড়ীতে এলুম পাথরের মতন ভারি মন নিয়ে। স্বার্থপর আমি—নিজের ক্ষুদ্র তৃপ্তির জন্যে একটি সুন্দর জীবনকে অস্বার্থক করে দিলুম !

কিম্বা মোহিতকে আমি একেবারেই চিন্তে পারিনি—এমন অমানুষ সে ! স্থলে সে ভিক্ষে বেড়াল হয়ে আমাদের গোলামের মত থাকত, আমরা তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনতুম না। তারপর সেই লোক যে দিতরে-ভিতরে এ-হেন সময়তান হয়ে দাঁড়াতে পারে—কে একথা ভেবেছিল ? কনকলতার বিবাহের উদ্দেশ্যে ভয় পেয়ে, তাড়াতাড়িতে মোহিতের সঙ্গে আমি তার সম্বন্ধ করেছিলুম, মোহিতের বর্তমান চরিত্র কেমন সে বোঝে কিছুই নেওয়া হয়-নি। নিজের এই সাংঘাতিক ভ্রমের জন্যে অহুতাপে আজ আমার বুক ভেঙে যায়-যায় হ’ল !

সেইদিন সন্ধ্যাতেই আর-এক অভাবিত ব্যাপার ! কনকলতার কাছ থেকে এক পত্র পেলুম !

সে লিখেছে—

“প্রিয় মাষ্টারমশাই,

আজ আপনি স্বচক্ষে যা দেখে গেছেন—তারপরে আর কোন কথা লুকোনো চলে না। কারণ, এখনো লুকোচুরি করতে গেলে,

আপনি ছাত্র এমন একটা-কিছু করে' কেল্‌বেন, যার ফল ভালো হবে না।

আমার জীবন সুখের নয়,—আপনার কাছে এ-কথা আর লুকোনো মিছে। যখন কুমারী ছিলুম তখন বিবাহের যে স্বপ্ন আমার তখনকার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে' রেখেছিল, এখন সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে, একেবারে স্বপ্নের মতন!

সংসারে যে-ছটি দোষকে সকল নারীই সব-চেয়ে-বেশী ভয় করে, আমার স্বামীর—আপনার বন্ধুর ঠিক সেট ছটি দোষই পুরো-মাত্রায় আছে। তিনি মদ খান, আর এমন জারগায় যান, যার নাম না-করলেও আপনি বুঝবেন। শুনেছি 'নারীর প্রাণে সবই ময়'। কিন্তু আজ-পর্যন্ত স্বামীর এ সবাব সর্বসংস্কার নারী হয়েও আমি সঙ্গে উঠতে পারি-নি। তাই হু-চার কথা না-বলে থাকতে পারি না। সেটা যে জীবন কষ্টব্য স্বামী তা বোঝেন না। তাঁর যুক্তি 'পুরুষের কথায় মেয়ের থাকবার দরকার কি?' তিনি আমাকে চুপ্‌ করতে বলেন, চুপ না-করলে আমাকে গালি দেন, আমাকে ধমক দেন, আমাকে—আর যা করেন, তার চিহ্ন আজ সকালে আপনি দেখেছেন।

এমনি ভাবে আমার দিন যাচ্ছে। বাবা মা কিছু জানেন না—তাদের আমি জানতে দিই-নি। আমি তাঁদের একমাত্রী সন্তান, আমার কষ্ট তাঁদের বুকে বাজের মত বাজবে। এ-সব কথা জানলে তারা মেহের বশে যা করবেন, তাতে আমার কষ্ট বাড়বে বৈ কমবে না। সকল দিক বুকে আমি তাই মৌনব্রত নিয়েছি।

বাবা-মা একালের নবাতন্ত্রের লোক—আমিও শিক্ষা পেয়েছি তাঁদের মতন। কিন্তু তাহ'লেও এ-কথা ভোলা শক্ত যে, আমি হিন্দুর মেয়ে। আপনি হয়ত ভাববেন, তবে আমি স্বামী-নিন্দা করছি কেন? ওটা হয়ত একালের শিক্ষার দোষ! স্বামী-নিন্দা করি আর বাই-ই করি, স্বামী-ভ্যাগ ত আর করতে পারব না!—যদিও সেটা পারলে ভবিষ্যতে পরলোকে যত যন্ত্রণাই হোক, আপাতত ইহলোকের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারি—তবু তা যখন সম্ভব নয় তখন মৌনব্রতই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

অতএব আপনিও আমার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমার স্বামী যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পান যে, আপনি সব জেনেছেন। স্বামীকে কিছু বলেও তাঁকে আর বদলানো যাবে না—তাঁর চরিত্র এখন সংশোধনের অতীত। আপনি কিছু বলে হিতে-বিপর্যত হবে।

আর-এক কারণে আপনাকে নির্লিপ্ত থাকতে বলছি। সঙ্কোচে আমার কলম খেঁমে যাচ্ছে, কিন্তু আমার নিজের মঙ্গলের জন্যে না-লিপ্তেও আর অন্য উপায় নেই!

আমার স্বামী আপনাকে সন্দেহ করেন ... ... আমাকে সন্দেহ করেন!

এর কারণ জানি না। শুধু এইটুকু বুঝছি যে, আপনি কিছু বলতে গেলে তাঁর এই অজ্ঞান, কদর্য সন্দেহকে তিনি সত্য বলে মনে করবেন। হাঁত

আপনার ছাত্রী।"



কনকলতার পত্র তাতে করে' আমি  
স্থগিত হয়ে বসে রইলুম।

\* \* \* \* \*

তারপর একসপ্তাহ কেটে গেল। এর-  
মধ্যে আমি কনকলতার আর-কোন খোঁজ-  
খবর নিই-নি, মোহিতের সঙ্গেও দেখা  
করি-নি। কী যন্ত্রণায়, কী দুশ্চিন্তায় এই  
সপ্তাহকাল কাটিয়েছি তা মনে আমি জানি  
আর জানেন আমার ভগবান।

কনকলতার সেই পত্রের অক্ষরগুলো  
ঠিক জ্বলন্ত কয়লার মত আমার সমস্ত  
বুকেরানা যেন দহে চাই করে' দিচ্ছে।  
আমার চোখে এত অশ্রু নেই যে, সে আগুন  
নিবিয়ে ফেলতে পারি।

মোহিত আমাকে আর কনকলতাকে  
সন্দেহ করে।

হ্যাঁ, কনকলতাকে আমি ভালোবাসি  
—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিকের বিনিময়েও  
আমার এ প্রেম আমি ছাড়তে পারব না—  
এ প্রেম আমার জীবন-প্রদীপে উজ্জ্বল শিখার  
মত জ্বলছে, দিবারাত্র জ্বলছে।... কিন্তু,  
ঈশ্বর সাক্ষী, আমার এ প্রেম নিষ্ফল।  
বিবাহের পরে কনকলতার কাছে আমি  
কোনদিন মুহূর্তের জন্তেও, ভাবে-ভঙ্গীতে  
কি ব্যবহারে-ইঙ্গিতে আমার প্রেমকে  
প্রকাশ করি-নি। আর কনকলতা? আজ  
পর্যন্ত জানি, তার মনে আমার প্রেমের  
ঠাইটুকুও নেই। একজন পরিচিত আত্মীয়ের  
মত আমাকে সে গ্রহণ করেছে নাহি।

তবে, মোহিতের এই সন্দেহের কারণ  
কি? অনেক ভাবলুম, কিন্তু কোনই  
কুল-কিনারা পেলুম না। পালি এইটুকু

বুঝলুম, মোহিতের বাড়ীতে আর আমার  
যাওয়া উচিত নয়।

এমনি যখন মনের গতিক, তখন হঠাৎ  
একদিন সন্ধ্যাবেলায় মোহিতের বাড়ী থেকে  
এক দরওয়ান এসে হাজির। মোহিত  
আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে; বিশেষ দরকার,  
এখনি না-গেলে নয়। ব্যাপার কি?

ভাবতে-ভাবতে মোহিতের বাড়ীতে  
গেলুম। শুনলুম, সে তিনতলায় ছাদের  
উপরে আছে।

ছাদে গিয়ে দেখলুম, এককোণে আলসেতে  
থালান দিয়ে মোহিত শীতলপাটির উপরে  
চুপচাপ বসে আছে। তার সামনে একটা  
বিলাতী মদের লেবেল-মারা বোতল, একটা  
কাঁচের গেলাস, আর-একখানা থালায় করে'  
কি-কতকগুলো খাবার।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমার সামনে  
এ-হেন ব্যাপার এই প্রথম। হঠাৎ মোহিত  
এতটা বেহায়া হয়ে উঠল কেন?

তার স্মৃতি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম,  
“মোহিত, তুমি আনায় ডেকেছ?”

মোহিত অত্যন্ত নীরস স্বরে বলে, “হ্যাঁ,  
বোসো ঐখানে।”

আন্তে-আন্তে বসলুম। খানিকক্ষণ কেটে  
গেল। মোহিত আমার দিকে আর চেয়ে  
দেখলে না, কথাও কইলে না—পালি  
নিজের মনে থেকে-থেকে মদের গেলাসে  
টুকটুক করে' চুমুক নাড়তে লাগল।

শেষটা আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, “মোহিত,  
তোমার মদ-খাওয়ার সাক্ষী হ'তে এখানে  
আসি-নি, আমার অল্প কাজ আছে।”

মোহিত অবহেলা-ভরে বলে, “বটে।

অন্ত কাজ আছে? কি কাজ? আমার দ্বারী সঙ্গে দেখা করতে চাও?”

—“ধর, তাই।”

—“তাহলে নিরাশ হবে। সে আজ নৈমন্তিক খেতে গেছে।”

—“তবে তুমি মদ খাও, আমি বাড়ী যাই। অকারণে বসে-বসে মদ-খাওয়া দেখতে আমার একটুও আগ্রহ নেই।”

আমি উঠতে যাচ্ছি, মোহিত সশব্দে গেলান্টি নামিয়ে রেখে কর্কশ স্বরে বলে উঠল, “বোসো বলছি, তোমার সঙ্গে আজ আমার বোঝাপড়া আছে।”

মোহিতের গলা শুনে অবাক হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। চাঁদের আলোয় দেখলুম, তার চোখজুটো হিংস্র পশুর মত জ্বলছে।

—“জ্ঞাপো, তুমি অনেকদিন আমার চোখে ধুলো দিয়ে এসেছ—আর তা হচ্ছে না।”

—“তুমি কি বলছ মোহিত!”

—“ও-সব জ্ঞাপো রাখ, আমি ওকালতি করি—বদমাইন্স ঠেঙিয়ে খাই। বাঙলার এত পাত্র থাকতে যখন তুমি যোগাড়ের করে’ আমার সঙ্গে তোমার ছাত্রীর বিয়ে দাও, তখন থেকেই আমি তোমাকে সন্দেহ করি—বুঝেছ?”

এই আচম্কা আক্রমণের জন্তে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না, হতভম্ব হয়ে বসে রইলুম—কোন কথা কইতে পারলুম না।

—“অন্ত-কোন অচেনা জায়গায় বিয়ে হ’লে পাছে তোমার প্রেমের পাঠশালা বন্ধ

হয়ে যায়, সেই ভয়েই তোমার ছাত্রীটিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ,—হঁঃ, এ আমি বিলম্বণ বুঝেছি।”

ততক্ষণ আপনাকে সামলে নিয়ে জুড়স্বরে আমি বল্লুম, “মোহিত—”

হা হা করে’ হেসে মোহিত বল্লেন, “তুমি চোপ, রাঙাচ্ছ কাকে হে? আমাকে তুমি এখনো সেই পাড়ারগৈয়ে ভূত মনে কর নাকি?”

—“মোহিত, এমন পাপ-মন নিয়ে তবে তুমি আমার কথায় বিষে করলে কেন?”

—“টাকার লোভে আর রূপের মোহে। এ দাঁড়ে জেনে-শুনেও সবাই পা দেয়—”

—“ধামো, ধামো—”

—“আমি যৌশুষ্ট কি বুজদেব নই, সুতরাং সম্মতানের প্রলোভনে সহজেই ভুলেছি।”

—“এ মিথ্যেকথা মোহিত, এ মিথ্যেকথা!”

—“বটে! এ চিঠিখানুও কি মিথ্যা? জ্ঞাপো, চাঁদের আলোয় তোমার জিনিষকে তুমি বোখছয় চিন্তে পারবে!”—এই বলে মোহিত আমার দিকে একখানা কাগজ এগিয়ে ধরলেন।

উজ্জল চন্দ্রালোকে কাগজখানার উপরে চোখ পড়তেই চিন্লুম, সে আমারি চিঠি—বিয়ের আগের দিনে কনকলতাকে যে চিঠি লিখেছিলাম!

বলবার কিছু না-পেয়ে চোরের মত আমি মাথা হেঁট করলুম।

—“কি, চুপ করে’ রইলে যে? এ চিঠিও কি মিথ্যা? বল,—কথা কও, শুদ্ধ?”

কনককে কাতর করে আমি বল্লুম, “হ্যাঁ, এ আমারি চিঠি মোহিত!”

—“এখন পথে এস বাবা, পথে এস!”

—“মোহিত, আমি মানছি, আমারি সব দোষ। কিন্তু কনকলতাকে এর জন্তে তুমি দায়ী কোরো না। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি, সে নির্দোষ।”

—“হ্যাঁ, সে সীতা-সাবিত্রী! তা নইলে পরপুরুষের একখানা প্রেমপত্র নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখে দেয়!... এ-সব কথা বোঝাচ্ছ কাকে? কনক যদি খাটি হ’ত, তাহলে এ চিঠি পেয়েই সে হয় স্বপ্নায় তখনি ছিঁড়ে ফেলে দিত, নয় তার বাপ-মাকে গিয়ে দেখাতো,—তারপর দূর করে’ তোমাকে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু তার কিছুই সে করে-নি, উন্টে চিঠিখানা এতদিন ধরে হীরে-মাণিকের মত বহর করে’ বাক্সে তুলে রেখেছে আর তোমার সঙ্গে সমান হাসিমুখে মেলামেশা করে’ এসেছে! এই চিঠির সঙ্গে তার বাক্সে আর কি পেয়েছি জান? তোমার কটো!”

হায় মাহুষের প্রাণ! এই ভয়ানক সময়েও আমার সকল ভয় লজ্জা অপমান তুলে আনন্দের আবেগে আমি আকুল-ব্যাকুল হয়ে গেলুম! মোহিতের কথায় আজ আমি এই প্রথম জানতে পারলুম, কনক আমায় ভালোবাসে—কনক আমায় ভালোবাসে! বিপদের মধ্য দিয়ে এই অমূল্য বার্তা এসে, স্নেহের আবেশে আমাকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিলে!

কিন্তু সেই অপরূপ স্বপ্নের মধ্য থেকে

মোহিতের ক্রোধকম্পিত স্বর আচম্বিতে আমাকে সচকিত করে’ তুলে,—“চুপ করে’ ভাবছ কি? তোমরা আর আমাকে ভোলাতে পারবে না—বুঝেছ? দৈব আজ আমার চোখ দুটিয়ে দিয়েছে—তা-নইলে কনক নেমস্তম্বে যাবার সময়ে তুলে বাস্কাটা খুলে রেখে যাবে কেন?... হ্যাঁ, তোমাদের স্বপক্ষে-বিপক্ষে যত কথা থাকতে পারে, সব আমি একে-একে ভেবে দেখেছি। ভেবোনা মদ পেয়ে আমি মাতাল হয়েছি—না, আমার মাথা যতদূর ঠাণ্ডা থাকবার তা আছে। নইলে আমার সামনে বসে এতক্ষণ তুমি বেঁচে থাকতে না!”—বলতে বলতে মোহিতের চোখদুটো আবার দপদপ করে’ উঠল!

হঠাৎ নীচের রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হ’ল—শব্দটা মোহিতের বাড়ীর সামনে এসেই থামল।

মোহিতও কাণ পেতে শুন্ছিল। ‘অট্টহাস্ত করে’ সে বলে উঠল, “ঐ তোমার ছাত্রী কিরে এল! এতক্ষণ তারি অপেক্ষার ছিলুম!”

ভয়ে শিউরে উঠে আমি বল্লুম, “মোহিত, মোহিত, তুমি কি করতে চাও?”

উঠে দাঁড়িয়ে জ্রুকুটি করে’ সে বলে, “এখন দেখতেই পাবে!”

—“তুমি—তুমি কনককে কি মারবে?”

—“স্বধু মারব না, আমার বাড়ী থেকে এখন তাকে দূর করে’ তাড়িয়ে দেব—সেইসঙ্গে তোমাকেও!”

—“কথা শোনো মোহিত, কথা শোনো! কনকের সর্বনাশ কোরো না, কোরো না!

মনের স্ফুল্বে যুগ্মে সে জ্ঞাপনি কতবিকৃত  
হয়েছে তবু আমাকে তার মন জানতে দেয়-  
নি—তুমি' না-বলে আমি আজ যা জেনেছি  
কখনোই তা জানতে পারতুম না! তার এ  
আত্মসংবন্ধকে তুমি ব্যর্থ করে' দিও না—  
তাকে মেরে-ধরে' কলঙ্কিনী বলে তাড়িয়ে  
দিয়ে সমাজে তাকে পতিত কোরো না—  
তার—তার—”

—“তোমার সন্নতানী রাখো! এই আমি  
চলুম!”

—“তার চেয়ে আমাকে মারো, আমাকে  
অপমান কর—আমাকে তাড়িয়ে দাও,  
যা-ইচ্ছে কর, আর আমি তোমার পথে এসে  
দাঁড়াব না,—মোহিত, মোহিত!”

কিন্তু নিষ্ঠুর মোহিত আমার কাণ্ডীতে  
কর্ণপাতও করলে না, বিকট স্বরে একটা  
উচ্চ হাস্য করে' তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'ল!

পর-পলকে আমার চোখের সামনে জেগে  
উঠল, রাজপথে কোড়ুহলী জনতার মাঝ-  
খানে,—বিভাদিত, প্রহারে-জর্জরিত পদদালিত  
কনকের রক্তরাঙা, লালিত, আর্জ মুখ!

একলাফে আমি মোহিতের স্রুগ্ধে গিয়ে  
পড়লুম এবং হৃ-হাতে তার হাত চেপে ধরে  
বল্লুম, “খবর্দার! এখান থেকে তুমি এক  
পাও নড়তে পারবে না!”

মোহিত এক-হ্যাঁচকায় আমার হাত  
ছাড়িয়ে পিছু হঠে যেতে গেল—এবং পর-  
সুহৃৎসেই প্রাচীরহীন ছাদের আলসেতে পা-  
লেগে, টাল্ সান্দ্রাতে' না-পেঁরে তার দেহটা  
একেবারে রাস্তার দিকে ঘুরে পড়ল,—কিন্তু  
তাড়াতাড়ি ছাদের কার্ণিশটা ধরে ফেলে সে  
শূন্যে ঝুলতে লাগল।

চোখের নিমেষে এই ঘটনা ঘটে গেল!

মোহিত কাতর স্বরে চেষ্টিয়ে উঠল,  
“ধর—ধর—বাঁচাও, পড়ে গেলুম—গেলুম—”

স্থির-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে, বুকের  
উপরে হৃ-হাত বেঁধে, কঠিন পাষাণের মত  
অটল হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। তাকে  
আমি অন্যায়সেই বাঁচাতে পারতুম—কিন্তু  
সে বাঁচলে আমার কনক  
অনুবে। প্রাণের ভিতরে কাণ পেতে  
আমি বিবেকের আদেশ শুনতে পেলুম—কিন্তু  
আমার দেহ তখন এক অভাগী নারীর মুখ  
চেয়ে তেমনি আড়ষ্ট হয়েই রইল!

মোহিত ছাদে ওঠবার জন্তে প্রাণপণে  
ধনাত্মক ক্রম-কর্তে-কর্তে পাথর-গলানো স্বরে  
বল্লে,—“ফণী, এস ভাই! আমার হাত-  
ছাড়া ধর—”

আমার ভয় হ'তে লাগল, পাছে তার  
করণ মিনতি শুনে আমার প্রাণে শেষটা  
দয়ার সঞ্চার হয়!

মোহিত তার দেহের সমুত্ত শক্তি একত্র  
করে' আর-একবার উপরে ওঠবার চেষ্টা  
করলে—কিন্তু তার দেহের ভার সহিতে না-  
পেরে কার্ণিশের খানিকটা হঠাৎ ছড়মুড়-  
করে' ভেঙে গেল—সঙ্গে-সঙ্গে মোহিতকে  
আর দেখতে পেলুম না,—কেবল শুনলুম  
এক আকাশ-কাটানো শেষ-আর্তনাদ, আঁর  
রাস্তা থেকে অনেক লোকের চীৎকার!

... ... পরলোকে মোহিতের অতৃপ্ত  
প্রতিহিংসা আমার জন্তে অপেক্ষা করে' আছে  
কিনা, জানি-না—কিন্তু ইহলোকে তাকে  
আর-কখনো দেখতে পাই-নি।

কনকলতা এখন কোথায়, তাও জানি-না,

—বিধবার শুভ্রবেশে তাকে দেখবার আগেই আমি দেশত্যাগী হয়েছিলুম।

হাতে নর-রক্ত মেখে সংসার ছেড়ে বেরিয়েছি প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্তে। আমার এ হত্যাকারীর হাত আর কি জীবনে শুভ্র হবে ?”

... ..

সন্ন্যাসী আমার দিকে আরু দৃষ্টিপাত না-করেই চকিতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয়ে, যেখানে ধূ-ধূ ময়দানের প্রদীপ্ত জ্যোৎস্নার উপরে, একটি নিঃসঙ্গ বটের নিম্পন্দ ছায়ায় জমাট অন্ধকার স্তম্ভিত হয়ে ছিল, তারই ভিতরে অলৌকিক ছায়া-মূর্তির মত মিলিয়ে গেলেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

## বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক (১)

জীব যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে, তখন কিছু মূলধন লইয়া আসে। সেই মূলধন তাহার বংশানুক্রমিক গুণ—পিতৃ-পিতামহাদি পরম্পরায় প্রাপ্ত কতকগুলি দৈহিক ও মানসিক গুণ। এই মূলধনের উপর নির্ভর করিয়াই সে জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করে। কিন্তু কেবল মাত্র এই মূলধনই জীবন-যুদ্ধে টুকিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। বেক্রপ অবস্থার মধ্যে সে জীবন যাপন করে, তাহাও তাহার দেহ ও মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এমন কি অনেক দৈহিক ও মানসিক গুণ বাহ্য অবস্থার সংস্পর্শেই তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে।

এই সকল বাহ্য অবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়, পারিপার্শ্বিক। ইহাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে (১) প্রাকৃতিক ও (২) সামাজিক। যে আবহাওয়া প্রভৃতির মধ্যে জীব বর্দ্ধিত হয়

তাহাই হইল তাহার প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক (physical environment)। ইহা যে জীবের দেহ ও মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, তাহাতে সন্দেহ নাই, আর শুধু একটি ব্যক্তিতেই এই প্রভাব আবদ্ধ নহে। জাতির উপরেও এই প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অল্প নয়। এমন কি প্রাচীন সমাজতত্ত্ববিদেরা এইটাকেই জাতির সভ্যতা-গঠনের প্রধান উপাদান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আর একটা পারিপার্শ্বিক হইল, সমাজ। ধরিতে গেলে এটা কেবল মানুষেরই বিশেষত্ব। মানুষই সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করে। আর এই সমাজ যে মানুষের উপর কি প্রবল প্রভাব বিস্তার করে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সমাজ তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, বিধিনিয়ম, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি লইয়া মানুষকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। জন্ম হইতে

মৃত্যু পূর্ব্বে ইহারই সঙ্গে তাহাকে কারবার করিতে হয়; ইহারই নিশ্চিত পথ অনুসারে তাহাকে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। মানুষের পক্ষে এই সমাজই প্রধান পারিপাশ্বিক। আজ আমরা এই প্রবন্ধে যে পারিপাশ্বিকের কথা বলিব, তাহা প্রধানতঃ সমাজকে লক্ষ্য করিয়াই।

বংশানুক্রম ও পারিপাশ্বিক—উহাদের কোনটী মানুষের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে;—মানুষের যে দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী তাহাদের কতটা বংশানুক্রমে প্রাপ্ত আর কতটাই বা পারিপাশ্বিকের প্রভাবে ফুটিয়া উঠে, দেখা যাক। এ বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের অবশ্য বিভিন্ন মত।

কেহ কেহ বলেন, বংশানুক্রমের প্রভাবই মানুষের উপর বেশী কাজ করে; এমন কি পারিপাশ্বিকের তুলনায় সে প্রভাবের মাত্রা প্রায় দশগুণ বেশী। মানুষের যাহা কিছু দৈহিক বা মানসিক গুণ সে সকলই সে এই বংশানুক্রমের ফলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পারিপাশ্বিকের প্রভাব সেই সকল গুণকে ফুটাইয়া তোলে মাত্র। পারিপাশ্বিক নূতন বিশেষ-কিছুই দিতে পারে না। যাহা বংশানুক্রমে মানুষ প্রাপ্ত হয় নাই, এমন কোন আঙ্গুণি গুণ পারিপাশ্বিকের হাজার চেষ্টাতেও তাহার মধ্যে ফুটিতে পারে না। এই জন্য ইহারা বলেন, সমাজ সংস্কার ও জাতি-গঠন করিতে হইলে এই বংশানুক্রমের ধরাকে বিগুহ করা উচিত। ভাল মানুষ তৈয়ার করিতে হইলে সর্বাপ্রায়ে চাই ভাল পিতা-মাতা; নহিলে পারিপাশ্বিকের হাজার সংস্কার করিলেও

বিশেষ ফল লাভ হইবে না! কেবল ভাল না হইলে তাহাতে নানা প্রকার স্মার দিয়াও ভাল শত্রু উৎপন্ন করা যায় না। কিন্তু আধুনিক যুগের সংস্কারকে এই পারিপাশ্বিক লইয়াই বিশেষ বাস্তব। তাহাদের সকল চেষ্টা এই পারিপাশ্বিককেই ভাল করিবার দিকে। শিক্ষা এবং নানারূপ আচার, নিয়ম, প্রথা প্রভৃতির সংস্কার তাহারা যাহা করেন, তাহা এই মতের বশবর্তী হইয়াই; কাজেই এদিকে তাহাদের সকল চেষ্টা পণ্ডিত্য হয় মাত্র। এই চেষ্টার কতকটা ক্ষেত্র-সংস্কারের দিকে লাগাইলে বোধ হয় প্রচুর ফল পাওয়া যাইত।

এহ সব কথা যে অনেক পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এহ মতের বলে পারিপাশ্বিকের প্রভাবকে যত খানি নগণ্য ধর হইয়াছে, অনেক পণ্ডিতের মতে তাহা ততটা নগণ্য নহে। সত্য বটে, নিয়ন্ত্রিত জীবের মধ্যে পারিপাশ্বিকের প্রভাবের বিশেষ কিছু মূল্য নাই; ইহারা বংশানুক্রমে যাহা লাভ করে তাহাই এক প্রকার সার-সর্বস্ব। তাহাকেই আমরা তাহাদের সংস্কার বা সহজ বৃত্তি (Instinct) বলিয়া থাকি। এই সহজ বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই উহাদের জীবন চালিত হইয়া থাকে, প্রকৃতি যেন অমুগ্ধ করিয়াই উহাদের যাহা-যাহা দরকার, সেই সকল বৃত্তিগুলিকে সাজাইয়া শুছাইয়া ঠিক করিয়া দেয়। কিন্তু উহাদের ক্ষমতা এই সকল সহজ বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ। ইহার অতিরিক্ত নূতন কিছুই উহারা করিতে পারে না। উহাদের মেরুদণ্ড ও দায় প্রভৃতিও

ইহার অনুরূপ এই সকল সহজ বৃত্তিকে চালাইবার পক্ষে উপযোগী। কাজেই জীব যত বেশী নিরন্তরের হইবে, এই সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট সহজ বৃত্তির পরিমাণ তাহার মধ্যে ততই বেশী। উচ্চস্তরের জীবের এই সহজ-বৃত্তির ক্রিয়া ক্রমশঃ শিথিলতর হইতে দেখা যায়।

সর্বোচ্চ জীব মানুষের মধ্যে এই সহজ বৃত্তির ক্রিয়া সবচেয়ে কম। কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে এ দিকে বঞ্চিত করিলেও অন্য দিকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়াছেন। নূতন নূতন বিষয় শিখিবার ও নূতন নূতন অবস্থার সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য সাধন করিবার ক্ষমতা তাহার অপরিসীম; তাহার স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কোষগুলির গঠনও সেই রূপ প্রবল পরিবর্তনশীল। কঠোর প্রকৃতি তাহাকে একদিকে যেমন প্রায় সম্পূর্ণ অসহ্য অবস্থার সংসারে পাঠাইয়া দেয়, অন্যদিকে তেমনই জীবন-যুদ্ধে ক্রমশঃ নিজেকে শক্তিশালী করিবার উপায়ও তাহার ঠিক করিয়া দেয়। এই উপায় তাহার শিক্ষাপ্রবণতা।

এই শিক্ষা-প্রবণতার ভিতর দিয়াই সমাজ আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সমাজের প্রচলিত আদর্শ আচার-অনুষ্ঠান বিধি-নিয়ম, প্রথা সংস্কার—এককথায় তাহার বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার—মানব-শিশুকে ক্রমশঃ অধিকার করিয়া লইতে হয়। পিতামাতা, পরিবার-পরিজন, স্কুল-কলেজ, শিক্ষক-অধ্যাপক—সকলেই তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহার বংশানুক্রম তাহাকে যদি এই সকল

বিষয় শিখিবার যোগ্য করিয়া দিয়া থাকে, তবেই সে সমাজের এই সকল শিক্ষাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া, আরও দশ-জনের মত বাড়িয়া উঠিতে সক্ষম হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। আর বংশানুক্রম যদি তাহাকে সমাজের এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না দেয়, তবেই তাহার বিপদ। সমাজ তখন আপনার “অযোগ্য দমন”—(suppression of the unfit)—এই নীতি অবলম্বন করিয়া সেই অসামাজিক জীবকে বিভাড়িত বা ধ্বংস করিবার চেষ্টা পায়। প্রতিনিয়তই সমাজে এই অযোগ্য-দমন-নীতির ক্রিয়া চলিতেছে। জেল, পুলিশ, আদালত, বিচারক প্রভৃতি সকলই এই অযোগ্য-দমন নীতিরই সাজসরঞ্জাম।

এই অযোগ্য-দমন নীতির অনুরূপ কার্য প্রকৃতির মধ্যেও যে না চলিতেছে, এমন নয়। কিন্তু প্রকৃতি অন্য উপায়ে এই কার্য সাধন করে—জীব-বিজ্ঞানে সে উপায়ের নাম, survival of the fittest—যোগ্য-তমের উদ্ভব। প্রকৃতি সেখানে যোগ্য-তমকে আদর করিয়া বাঁচাইয়া রাখে; আর অযোগ্য অবহেলার ফলে নিজের অক্ষমতার ভারে জীবন-যুদ্ধে পিছাইয়া পড়ে। সমাজ সাধারণতঃ যোগ্যতমকে আদর করে না—অযোগ্যকে দমন করিয়াই সে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং বাহ্যতঃ প্রকৃতি ও সমাজের উপায় ভিন্ন রকমের হইলেও উদ্দেশ্য উভয়ের একই—যোগ্যকে রক্ষা এবং অযোগ্যকে দমন।

সুতরাং দেখা গেল, পারিপার্শ্বিকের প্রভাব

বংশানুক্রম অপেক্ষা কম নহে—বরং এক হিসাবে বেশী। বংশানুক্রম মাল-মসলা যোগাটরা থাকে বটে—কিন্তু পারিপার্শ্বিক তাকে ইচ্ছামত বস্তুতে গড়িয়া তুলে। প্রকৃতি কাঠামো খাড়া করে—আর সমাজ তুলি দিয়া রঙ ফলাইয়া তাকে ইচ্ছামত রূপ দান করে। কলতঃ বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক ইহাদের কার্য্য মোটেই বিপরীত-মুখী বা পৃথক নহে। ইহারা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-রূপে সংস্কৃত, ধরিতে গেলে উভয়েই একযোগে মানুষের দেহ ও মনকে অহরহ নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। একদিকে বংশানুক্রম যেমন পারিপার্শ্বিকের ব্রহ্ম উপাদান যোগাইয়া থাকে—অন্যদিকে পারিপার্শ্বিকও তেমনি বংশানুক্রমের সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। সমাজ তাহার বিবাহ-বিধির মধ্য দিয়া কি করিয়া বংশানুক্রমকে নিয়মিত করে, তাহা অনুধাবন করিলেই আমাদের কথার মন্ত্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। হিন্দু সমাজ তাহার বিবাহ-বিধির দ্বারা যেরূপে বংশানুক্রমকে নিয়মিত করে, মুসলমান সমাজ তাহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবাহ-বিধির দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে বংশানুক্রমকে চালিত করিয়া থাকে।

আর এক দিয়া কথাটার আলোচনা করা যাক। এই যে বংশানুক্রমিক গুণাবলী, তাহা কি মানুষের মধ্যে আবহমান কাল একই ভাবে আছে, না ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতেছে? বৈদিক যুগের মানব-শিশু যে সকল বংশানুক্রমিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এখনকার মানবশিশুও কি ঠিক সেই সকল গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, না,

তাহাদের বংশানুক্রমিক গুণাবলীর বৈচিত্র্য ও সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশী? সহজ বুদ্ধির আশ্রয় লইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে আধুনিক শিশুর বংশানুক্রমিক গুণের বৈচিত্র্য, জটিলতা ও সংখ্যা প্রাচীনকালের তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক বেশী এবং বিস্তীর্ণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কিরূপে বংশানুক্রমিক গুণাবলীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাড়িয়া গেল?

বংশানুক্রমিক গুণাবলীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য যে পূর্ব হইতে মানবশিশুর মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে প্রায় কোন পণ্ডিতেরই মত-ভেদ নাই। কিন্তু কিরূপে এই সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাড়িতেছে, ইহা লইয়াই তর্ক। স্পেন্সার ও তাঁহার শিষ্যেরা বলেন যে বংশানুক্রমিক গুণ মোটেই একটা নির্দিষ্ট বস্তু নহে। ইহা ক্রম-বিবর্ধন-শীল, প্রতিপুরুষেই বাড়িয়া চলিয়াছে; আর পারিপার্শ্বিকের প্রভাবই এই বুদ্ধির প্রধান কারণ। মানুষ কতকগুলি গুণবংশানুক্রমের ফলে পিতামাতা ও পূর্বপুরুষ হইতে লাভ করে; আর কতকগুলি সে পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে নিজে হইতে উপার্জন করে। এই উপার্জিত গুণগুলি (acquired characters) আবার জীবদেহে পরিবর্তন ঘটাইয়া বংশানুক্রমিক হইয়া যায়। অর্থাৎ পরবর্তী পুরুষেরা পূর্বপুরুষের সেই স্বেপার্জিত গুণগুলি বংশানুক্রমের ফলে নিজেরা লাভ করে। এইরূপে আজ বাহা স্বেপার্জিত, ভবিষ্যতে তাহাই বংশানুক্রমে গিয়া দাঁড়ায়। উপরি-লিখিত জটিল প্রশ্নালীতে বংশানুক্রমিক গুণের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে



এবং মানুষ বহুগুণপূর্ণ হইয়া দ্রুতগতির সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে।

আধুনিক কালের ভিত্তি, বিসমান প্রকৃতি প্রসিদ্ধ প্রাবর্তনবিদেরা কিন্তু উক্ত মত স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলেন, স্বোপার্জিত গুণ (acquired characters) কখনই ওরূপে বংশানুক্রমিক হইতে পারে না। সমস্ত বংশানুক্রমিক গুণই germplasm বা প্রাণ-বস্তুর মধ্য দিয়া সংক্রামিত হয়। Germinal variation বা প্রাণবস্তুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হইতেই নূতন গুণের সৃষ্টি হয়—আর তাহাষ্ট বংশানুক্রমের ফলে পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। এই germinal variation বা প্রাণবস্তুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধারণতঃ ধীরে ধীরে বহুকাল ধরিয়া হয় না। ধরিতে গেলে হঠাৎ এইরূপ পরিবর্তন (mutation) ঘটয়া থাকে। ভিত্তি নানা পরীক্ষা করিয়া

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

তবে কি ইহাদের মতে স্বোপার্জিত গুণ ও পারিপার্শ্বিকের কোন মূল্য নাই? ইহার উত্তরে এই সব পণ্ডিতেরা বলেন যে স্বোপার্জিতগুণ যদিও বংশানুক্রমিক হইতে পারে না, তবুও মানবশিশুর উপর ইহার প্রভাব অসাধারণ। জীবের চারিদিক যেমন বায়ুমণ্ডল ঘিরিয়া রাখিয়াছে—পারিপার্শ্বিক সমাজ তেমনই এই সকল স্বোপার্জিত গুণাবলী লইয়া মানবশিশুকে চারিদিক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে। মানবশিশু প্রাকৃতিক গঠন-অনুসারে বড়ই পরিবর্তন-প্রবণ (plastic)। আর সেই শক্তিবলে সে চারিপার্শ্বের স্বোপার্জিত গুণগুলি

অন্যায়সেই আশ্রয় করিয়া অল্প এক হিসাবে এই স্বোপার্জিত গুণগুলি সমাজস্থ সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। সকলেরই এইগুলি লাভ করিবার অধিকার ও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এগুলি বংশানুক্রমিক নহে।

আপাত দৃষ্টিতে এই দুই মতে বিরোধ দেখা গেলেও, বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে, উভয়ের মধ্যে ততবেদী প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিছুকাল ধরিয়া এই বিষয়ে নানা পরীক্ষা করিয়া বিসমানের শিষ্যগণ যে সকল স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, সেইগুলি অনুধাবন করিলেই আমাদের কথার যথার্থ্য বুঝা যাইবে।

(১) পারিপার্শ্বিক ও তদনুসঙ্গী কর্মের পরিবর্তন, প্রাণবস্তুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের (germinal variation) উত্তেজক কারণ হইতে পারে।

(২) পারিপার্শ্বিকের সংঘর্ষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সকল পরিবর্তন হয়—তাহা গোণরূপে প্রাণকোষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

(৩) পারিপার্শ্বিকের অবিশ্রাম আঘাতে দেহের যন্ত্র ও কোষগুলির উপর একটা সংস্কারের দাগ পড়ে এবং তাহার ফলে কোন কোন স্বোপার্জিত গুণ অধিকার করা জীবের পক্ষে খুব সহজ ও স্বাভাবিক হইতে পারে।

(৪) 'মাতার সঙ্গে শিশুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; আর সেই কারণে মাতার স্বোপার্জিত গুণ শিশুর উপর অত্যন্ত বেগী মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।

উল্লিখিত কথকণ্ঠ লিখ্যালেচনা বিপরীতমুখী শক্তি নহে; ইহারা পর করিলে বোধ হয় যে পূর্ববর্ণিত দুই মতের ম্পরের উপর কার্য করিয়া থাকে ও এক মধ্যে মূল বিশেষ প্রভেদ নাই। অন্ততঃ যোগে মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার একথা বলিতে বোধ হয় বাধা নাই যে করে। \*

বংশাশ্রুত ও পারিপার্শ্বিক দুইটি পরস্পর

শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার।

## ম্যাজিস্ট্রেট-দম্পতি

( ৯ )

সন্ধ্যাকাল, আকাশ-প্রান্তে ভাসমান, চতুর্থীর চন্দ্রকলা ধলেশ্বরীর স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে, প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্ত্তে তরঙ্গে তরঙ্গে সাঁতার দিয়া চলিয়াছে। মন্দিরে কাসরঘণ্টা বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, তাহার নিরুত্তীর্ণ-অবসরে বসুনচৌকি-ধ্বনিতে সাক্ষা রাগিণী আকাশে বাতাসে মান-মধুর তান তুলিতেছিল;—রাজা এ সময়ে প্রায়ই মুক্তছাদে আসিয়া বসেন, আজ ঘরেব মধ্যে, টেবিলের নিকটে, দীপা-লোকের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি লিখিতেছিলেন;—এই সময় জ্যোতির্দ্বয়ী আসিয়া তাহার স্বকৈ দাত দিয়া দাঁড়াইল। সদ্যোলিখিত ছত্রগুলির দিকে ঈষৎ বুঁকিয়া বলিল—“বাবা কবিতা লিখছ?” রাজা হাতের কলমটা রোপ্য কলমদানীতে রাখিয়া বলিলেন—“বস্ রাগি, —তোরা patient কেমন আছেন?”

জ্যোতির্দ্বয়ী একথানা ছোট চৌকি বাজার চৌকির নিকট টানিয়া পিতার পাশ ঘেসিয়া বসিয়া কহিল, “তিনি ভালই আছেন। ছ-একদিনের মধ্যেই বেশ আরাম হয়ে উঠবেন,—কিন্তু—”

“ঐ কিন্তুটাকে যে ভুলতে চাই রাগি।”

“ছ-একটা কথা আমার কিন্তু বলাব ছিল বাবা। থাক তবে পরেই বলব। কি লিখছ বাবা,—পড়না?”

“শুনবি?—বেশ শোনু,—সে ভাল কথা।”

রাজা সুস্পষ্ট কণ্ঠে আবেগভাবে পড়িতে লাগিলেন;—

বল্ ভাই বল্ কেন পেয়েছিল বল?

দলিতে ছলিতে কবে অভাগা ছর্সল?

হোদেব স্বার্থের মুখে বলিদান যেতে সুখে

নিরীত পরাণগুলি সজ্জিত কি ধরাতল?

ধাতার পসাদ মধু তোমাদেরি তরে শুধু,

তাহাদের ভাগ্যে যত বজ্র আর হলহল?

এই প্রবন্ধ-রচনার প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি:—

( ১ ) Baldwin—Social and Ethical Interpretation.

( ২ ) Thomson—Heredity.

( ৩ ) Karl Pearson—Science of National Eugenics.

তা নয়রে মহাবলি, এ শুধু বিবেকে দলি  
বাড়াইছ আপনার প্রতিশোধ কক্ষফল!  
হরি নন সয়তান, কুপাময় জায়বান,—  
এ শক্তি পেয়েছ দান—বারিতে অন্তায় ছল।  
তাহে যদি কর হেলা, আসিবে তোমারো পালা  
সুখ মোহে দুঃখতাপ বাড়াইছ এ কেবল?  
সাধিতে শক্তির কাজ, আসনা যদি হে আজ  
বিনাশি দুর্দল-দুঃখ আন পুণ্য স্মরণল।

পড়া শেষ হইলে নীরব-জিজ্ঞাসায় রাজা  
কন্ঠার মুখের দিকে চাহিলেন—কিন্তু  
জ্যোতিষ্ময়ী অস্ত্র সময়েই জায় আবেগভরে  
মনোভাব প্রকাশ করিলনা, দুই ফোঁটা  
অশ্রু ধীরে ধীরে তাহার নয়নে সঞ্চিত  
হইয়া উঠিল, আনত দৃষ্টিতে তাহা নেত্রচ্যুত  
করিয়া কহিল—“এখন কিছু বলবনা ভেবে-  
ছিলুম, কিন্তু না বলে থাকতে পারছিনে;  
এখনো কি কাজ করার সময় হয়নি বাবা?  
কবিতাতেই মনের আবুলতা প্রকাশ করে  
কাস্ত থাকবে?”

যে বেদনায় তাহার কবিতার ছত্রগুলি  
রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বেদনার  
জালা স্বরে প্রকাশিত করিয়া অতুলেশ্বর  
কহিলেন—“একান্ত নিরুপায় রাণি, নিতান্ত  
শক্তিহীন! আমাদের এই নিষ্ফল ক্রন্দন  
একদিন কারো মনে, কারো তেজে  
ফুলতা লাভ করবে,—এইরূপ আশা করি;—  
কিন্তু—”

“বাবা,—তুমিও একথা বলছ?”

“সত্য কথা যে রাণি। সবল চিরদিনই  
দুর্দলকে পীড়ন ক’রে আসছে,—করবেও।  
এ শক্তিকে রোধ করা যেরূপ শক্তির কাজ  
সে সামর্থ্য আমার আছে কি রাণি?”

জ্যোতিষ্ময়ী উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—“একথা  
আমি মানিনা। দুর্দল-পীড়ন যে সবলের  
স্বভাব তা কখনই নয়। কারো কারো পক্ষে  
একথা ঠিক হতে পারে। কিন্তু সাধারণ  
নিয়ম বিপরীত বলেই মনে হয়। নইলে  
পৃথিবীতে ত দুর্দল তিষ্ঠোতেই পারত না।  
আর ইংরাজ জাতের পক্ষে যে একথা  
খাটেনা তাদের শাসন-নীতিই তার স্পষ্ট  
প্রমাণ। আমরা যে আজ এ ভাবে ভাবতে  
শিখেছি তাও ত ইংরাজি শিক্ষার ফল।  
আজ ব্রাহ্মণের সহিত ধোবা নাপিতও এক  
বিভাগে এক আসনে বসে শিক্ষালাভ  
করছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে সমভাবে বেদপাঠের  
অধিকারী; কায়স্থ রমেশ দত্ত আজ বেদ  
অম্ববাদ ক’রে ব্রাহ্মণের মুখ হেঁট করেছেন,  
যদিও আমি মনে করি উজ্জল করেছেন।”

“ইংবাজের গুণের পক্ষপাতী তোর চেয়ে  
আমি কম নইরে—তবে—”

—“তবে উদার ইংরাজজাতও সময় সময়  
দুর্দল-পীড়ন করে কেন? এ প্রশ্ন যখন  
আমার মনে উদয় হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার  
উত্তরটাও গুনতে পাই।”

রাজা কোন কথা কহিলেন না, নীরব  
কোতূহল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া  
রহিলেন; বালিকা বলিল—“অবশ্য কোন  
জাতের মধ্যে সকলেই মহৎপ্রাণ হয় না—  
কিন্তু সেই কথা ছেড়ে দিয়ে, এই পীড়নের  
আসল অর্থ হচ্ছে,—যেখানে নিষ্পেষণে  
অপমান বোধ নেই, যেখানে অবমাননাই  
শিরোভূষণ রূপে ধৃত হয়, সেখানে দুর্দল-  
রক্ষার পরিবর্তে দুর্দল-পীড়নেই সবল প্রকৃতি  
ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।”

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন ; কিছু পরে কত্ভা কথা কহিল—“দেখ বাবা সেদিন আমার হারিরাম, কেশব পাড়ের পা খুইয়ে সেই মন্ডলাজল এক চুমুকে পান করে যেন ধস্ত হয়ে গেল, আর পাড়েও তাকে এই পুণ্যদান ক’রে আপনার ব্রাহ্মণত্বের গোবরে গর্বক্ষীত হয়ে উঠলো। দেখে আমার যে কি হুঃখ হোল বলতে পারিনে। কিছুদিন পরে ইংরাজ-হস্তে পীড়নের ফলও এই রকম দাঁড়াবে। আমি—আব দেখতে পারিনে বাবা।”

“কি করব বল ?”

“কিছু ক’রনা তুমি,—তুমি শুধু আমার সহায় হও। বাবা রাজ্যের যত বিদ্যালয় আছে, আমি তাতে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে চাই—অমুমতি দাও তুমি—”

রাজা কত্ভার ভাষায় একটু বিস্মিত হইলেন ; “আমি ব্যবস্থা করতে চাই।” বলিতে ত পারিত—“তুমি ব্যবস্থা কর।”

নিজের মনের অজ্ঞাতসারে—রাজা যোগমায়া দেবীর ছবিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কত্ভার মস্তকে সাদরচুম্বন করিয়া কহিলেন—“রাণীর আজ্ঞা কি অবহেলা করা যায়—হবে হবে”।

জ্যোতিষ্ময়ীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু ছোট মেয়ের মত পিতাকে বাহ-বেষ্টনে বাঁধিয়া বলিল—“না বাবা—‘হবে’ বললে আর চলবে না। ভবিষ্যৎকে এখন বর্তমানে আগিয়ে নিতে হবে। আমি পণ্ডিত মহাশয়কে তোমার নাম করে হুকুম দিয়েছি—আমাদের পিছনের বড় আমবাগানে কাশ

থেকে ছেলেরা যেন প্রত্যহ ব্যায়াম শিখতে আসে। আজ থেকে ছমাসের মধ্যে তুমি তাদের পরীক্ষা নিতে চাও—এইরূপ জানিয়ে দিয়েছি।”

রাজা বলিলেন—“রাণি তুই যে রাজারও রাজা হ’লি ?”

“না বাবা আমি রাজার সেনাপতি ; আমার ইচ্ছা কবে রাণী যোগমায়াব মত আমি দেশ রক্ষা করি।”

এবার উভয়ে নীরব প্রশংসায় যোগমায়াব তৈল চিরের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিলেন।

রাজা মনে মনে জ্যোতিষ্ময়ীর তেজস্বিতায় গর্ব অনুভব করিলেন, কত্ভার ইচ্ছা ও উত্তমের প্রশংসা করিলেন, তাহার প্রস্তাব সর্বহৃদয়ে অনুমোদন করিলেন। তথাপি তাঁহাকে ভাবিতে হইল—এরূপ কার্যে গভর্ণমেন্টের অসন্তোষের কোন কারণ ঘটিতে পারে কি না।

এ দেশের জমিদার ও রাজাদিগের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহাদের কার্যক্ষমতার পরিসর যে কত কম, তাহা তিনি বাল্যকালে প্রতিপদে ঠেকিয়া শিখিয়া ছিলেন ; বিদেশী রাজা যে ভারতবাসীর গুঢ় স্বভাবের এবং অন্তর্নিহিত ভাবের মধ্য গ্রহণ করিতে কত অক্ষম, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলেন। অধিকাংশ স্থলে শূন্তে আকাশ-কুসুম রচনা করিয়া তাহারা বিদ্রোহিতার ভয় পান। একজন স্বল্পবুদ্ধি ভারতবাসীও তাহার হাস্যকরিতা বুঝিতে পারে। কিন্তু ইংরাজের শ্রায় বুদ্ধিমান জাতিও—(সম্ভবত নিজের দেশের তুলনায়) তাহাতে

রিস্রোহের আভাস প্রত্যক্ষ করিয়া এমন ভীত চঞ্চল হইয়া উঠেন যে, তখন রাজ-ভক্তি ও রাজবিদ্বেষের মধ্যে রেখা টানাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে—এবং ইহার অনিবার্য ফলভোগ করিতে হয় বেচারী প্রজাদের। এইরূপ অভিজ্ঞতার ফলে রাজার দেশহিতকর কার্যোত্তম একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল বলিলেও অতুক্তি হয় না। তিনি কন্‌গ্রেসের একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন; কিন্তু ইদানীং তাহাতেও তাঁহার উৎসাহের অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। অর্থ-দান করিতেন বটে, কিন্তু কাখাৎ ইহা হইতেও একরূপ দূরে দূরে থাকিতেন। সংবাদ-পত্রও তিনি ভাল করিয়া পড়িতেন না; বিশেষতঃ দেশের লোকের প্রতি পীড়ন সংবাদ সমস্তই বাদ দিয়া যাইতেন। বাহার প্রতিকার তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে, এইরূপ বিষয়ে আপনাকে নিদ্রিত রাখিবেন—ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু পারিলেন কই? দৈব—কঙ্কাক্রমে তাঁহাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া তুলিল।

তাঁহার মনের এইরূপ নিভৃত আলোড়ন বুঝাস্ত কত্নাকে তিনি কিছুই জানিতে দিলেন না; সমস্ত রাত্রি চিন্তার পর প্রাতঃকালে ম্যাজিস্ট্রেট-ডবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিবার অগ্রে তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট-দম্পতি রাজার, যে কিরূপ অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহা পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু কেবল রাজপরিবার নহে রাজ্যের সকল লোকেই তাঁহাদের গুণে

মুগ্ধ। ক্লাউডেন সাহেবের নামের সহিত ইহারা নানা রকম টাইটেল যোগ করিয়াছিল যেমন দয়াল, ভারতবন্ধু, জ্ঞান-অবতার—ইত্যাদি। কিন্তু ইহার কোন টাতেই যখন তাহাদের মনের আশ মিটল না—তখন ইহার নাম দিল, হিন্দু ক্লাউডেন সাহেব। এ নাম দিবার কারণও ছিল,—কোন পক্ষোপলক্ষে ইহারাও জুতাহীন পদে শ্রামশূন্যের মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া রাজার সহিত একত্রে আরতি দর্শন করিতেন। সকলে যখন প্রণাম করিত, ইহারাও হাঁটু গাড়িয়া নতমুখে বসিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহাদের এই ব্যবহার লোকের চক্ষে এতটী অস্বাভাবিক ও বিস্ময়জনক বোধ হইয়া ছিল যে তাহারা ইহাদের সারল্যে বিশ্বাস করিতে পারিতেন। গভর্নমেন্ট কর্তৃক গোয়েন্দা-নিয়োজিত হইয়া ইহারা রাজার কার্য্য-কলাপ ও মনোভাব বহুতাস্ত্রে অবগত হইয়া পরে অনর্থ উৎপাদন করিবেন—এইরূপই অনেকে সন্দেহ করিত। কিন্তু সত্যের জয় পড়িয়াই আছে! কিছুদিন পরে সকলেই নিজ নিজ অমূলক সন্দেহে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল।

রাজার মুখে পুরোহিতের প্রীতি অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া ম্যাজিস্ট্রেট-দম্পতি স্নাতিশয় লজ্জিত এবং মৰ্ম্মপীড়িত হইলেন।

(১০)

কোন স্বাধীন জাতিভুক্ত মহদন্তঃকরণ ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বল-রক্ষা এমন স্বভাব-সিদ্ধ যে ইহার অন্ত্রাধা দেখিলে আত্মপর নির্ব্বিভেদে তাঁহার হৃদয়ে দাক্ষণ আঘাত লাগে। অধিকন্তু এইরূপ নিষ্ঠুর ঘটনা

কোন আত্মসম্মতি হইলে এই আঘাত বাধার উপর লজ্জার আলা তাঁহাকে দাহন করিতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকের আহত শ্রায়-বুদ্ধিতে প্রতিকার-চেষ্টা একবার জাগিয়া উঠিলে শত নির্যাতন অগ্রাহ্য করিয়া কিরূপ ভীমবলে তাহা কার্য্য করিতে সক্ষম—তাহার দৃষ্টান্ত, হিউম রিপন প্রভৃতি মহা-প্রাণগণ। এমন কাৰ্য্যকরী ত্যাগক্ষমতা দুর্বল পরাধীন জাতির পক্ষে সম্ভবপর নহে।

মিসেস্ ক্লাউডেন বলিলেন “এ রকম এক একটা নিষ্ঠুর ঘটনা দেখে মনে করবেন না যে, আমাদের জাতটাই এত ভীষণ! একটা কথা বলব রাজা, আমাদের স্বভাব বিকৃতির জন্ত আপনারাষ্ট্র কিন্তু অনেক পরিমাণে দায়ী।” রাজা হাসিলেন,—তাঁহার জ্যোতির্ময়ীর কথা মনে পড়িল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—

“আমি যখন সুলতানপুরে ছিলাম তখন রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণে গিয়ে একবার বড় লজ্জায় পড়তে হয়েছিল। ঘরের মধ্যে দুখানি রাজসিংহাসন রাখা হয়েছিল আমাদের তাতে বসতে বলে রাজা রইলেন দাঁড়িয়ে; আমি নিজে না ব’সে তারি এক খানাতে আমার স্ত্রীর পাশে রাজাকে বসিয়ে দিলাম।—”

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী হাসিয়া বলিলেন—  
“বেচারার চেহারাখানা যদি তখন দেখতেন রাজা!—সে চেহারা আমি কখনো ভুলতে পারবনা। আমার স্বামী থাকবেন দাঁড়িয়ে আর তিনি কিনা বসবেন—রাজতক্তে, এমন বে-আদপী তাঁর কাছ থেকে ত প্রত্যাশা করা যায় না; তিনি কাতর ভাবে তখনি উঠে পড়লেন।”

রাজা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—“মাণ করবেন মিসেস ক্লাউডেন, অতিথিকে দাঁড় করিয়ে নিজে বসটা আমরা সত্যই বেআদপী মনে করি।”

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী বলিলেন—“আমরাও অতিথিকে দাঁড় করিয়ে নিজে বসিনে। তবে মর্যাদা-দান-ছলে নিজের অমর্যাদা করে অতিথিকে অবজ্ঞা করে তুলিনে।”

রাজা বলিলেন—“চৌকিতে বসতে আমরা অভ্যস্ত নই মিসেস্ ক্লাউডেন। ও সব ফ্যাসান আধুনিক ইংরাজি অনুকরণ। আমরা গালচের উপবেশ ঘরে সদা সজ্জা বসি। আপনারা আমাদের রীতিনীতি জানেন না বলেই রাজার ব্যবহার অদ্ভুত ভেবেছেন।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—“আপনাদের রীতিনীতি সব বুঝিনে বলে অনেক সময় ভুল ধারণা জন্মায় সন্দেহ নেই; কিন্তু বড় বড় হরফে আঁকা সুস্পষ্ট স্ততিবাদগুলোকেও যদি রীতিনীতির দোহাই দিয়ে ভুল বুঝতে পারতুম—তাহলে খুসাই হতুম রাজা।”

রাজা এবার হাসিয়া বলিলেন—“আপনারা হগেন আমাদের হস্তা কস্তা, একটু আধটু স্ততিবাদ করতে হয় বৈকি। রাজা আছেন আমাদের বিদেশে লুকিয়ে, তাঁর ত দর্শন পাইনে; আপনাদেরই রাজ্যসনে বসিয়ে আমরা ভক্তি প্রকাশ করি। আপনারাও যেমন আমাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না আমরাও তেমনি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে আমাদের কোন ব্যবহারে আপনারা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হবেন; কাজেই কোন কোন সময় অদ্ভুত ব্যাপারও যে একটা না হয়ে পড়ে তা নয়।”

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী বলিলেন - “বেশ, তাহলে অল্প দিকটাও দেখুন। ক্রমাগত দুহাতে সেলাম পাওয়া অভ্যাস হয়ে গেলে একদিন এক হাতের সেলামে কি মন ওঠে? তখন তার অতরূপ অর্থ করাষ্ট আমাদের পক্ষেও স্বাভাবিক নয় কি? প্রথম থেকে উভয় পক্ষ যদি যথার্থ ভাবে চলেত আর কোনরূপ অনর্থের কাবণ ঘটেনা।”

রাজা বলিলেন—“সাহস পাই কই মিসেস ক্লাউডেন? সকলেই ত আর ক্লাউডেন সাহেব বা তাঁর মেম নন; সেলাম না করলে যখন পিঠে লগুড়াঘাত পড়বে জানি তখন পিঠ বাঁচিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হাসিলেন; তাঁহার পত্নী বলিলেন—“আমি হলে কিন্তু এ বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে এমন তেজে চলি যাতে লগুড়াঘাত পিঠে পড়তে অবসর না পায়। জানেন ত রাজা, একটা তেজী বেড়াল কি কুকুর দেখলে সশস্ত্র মানুষও পিছিয়ে দাঁড়ায়।”

“কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্ত—তারপর এই অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি হাতে হাতেই তার লাভ হয়। আপনারা স্বাধীন জীব, আপনাদের মুখে তেজের কথা শোভা পায়—কিন্তু অকারণে যারা নিষ্পেষিত, রাজা মেঘ দেখলেও তাদের মনে আগুনের আশঙ্কা জাগে

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী কহিলেন, “কিন্তু এরূপ স্তরকে বিসর্জন না দিলে ত কোন জাতির মজল নেই।”

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন—“আপনিই তাহলে দেখছি জ্যোতিষ্ময়ীর গুরু। এইরূপ

ভাবের কথা - স্বাক্ষরকাল গ্রন্থ মুখে ত ক্রমাগতই শুনি।”

জ্যোতিষ্ময়ীর নামে ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীর মূপ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; আবেগভরে বলিলেন—“What a darling girl she is!”

রাজা কহিলেন, “Daring too! এর মধ্যে সে এক কাণ্ড করে বসেছে,—প্রসাদ-পুত্রের যত স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষা প্রবর্তনের হুকুম দিয়েছে।” শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি একটু সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন - “ভালই ত করেছে।”

“কিন্তু বহুপূর্বে আমার গাঞ্জহীন অবস্থায় আমিও এই রকম কাজ একবার করতে গিচ্ছিলুম, তাতে কমিশনার সাহেব তখন বাধা দেন।”

মেমসাহেব এই কথা শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—“Nonsense!” সাহেব কিন্তু ধীর ভাবেই বলিলেন—“বোধ হয় কমিশনার সাহেব কোনরূপ ভুল বুঝেছিলেন—তিনি কি স্পষ্ট করে নিষেধ করেছিলেন?”

“জানিনা। তবে ততদূর ত সব সময় আবশ্যক হয় না। অনেক সময় ইঙ্গিতে মন বুঝে আমরা কাজ করতে বাধ্য হই। আমার কাকা মহাশয় অন্ততঃ কমিশনারের সেইরূপ অভিপ্রায় বুঝেছিলেন।”

“কিন্তু ইঙ্গিতে বুঝতে হলে অনেক সময়ই ভুল বোঝার সম্ভাবনা। আপনারাই তাঁকে তাহলে খুব সম্ভব ভুল বুঝে থাকবেন। নইলে ব্যায়াম চর্চায় ত কোনই দোষ নেই। আমার বরঞ্চ মনে হয় জর্জর দেশের যত সকল দেশেই লোক শিক্ষা আর ব্যায়াম চর্চা compulsory হওয়া

উচিত। আমরা এদেশের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত হয়েছি—এতে বাধা দিলে আমরা নরকগামী হব। আমি এই ব্যায়াম সমিতির প্রেসিডেন্ট হতে চাই।”

কৃতজ্ঞতায় রাজার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কিরূপ বাক্যে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না। কিছু পরে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক বলিলেন—“যদি সকলেই আপনাদের মত সদাশয় লোক হতেন ত ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য হয়ে উঠতো। কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই আপনি দেখতে পাবেন যে আপনাদের মধ্যে এমন লোকও অনেক আছেন যারা আমাদের পশুতুল্য ভেবে পশুতুল্যই নিস্তেজ ক’রে রাখতে চান।”

ম্যাজিস্ট্রেট-দম্পতি অধোমুখ হইয়া রহিলেন; সহসা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; রাজা আবার বলিলেন—“আমরা ত অকৃতজ্ঞ জাত নই;—আর সত্যসত্য অসভ্য জাতও নই। এ দেশের ছোটলোক আর আপনাদের দেশের ছোট লোকদের সঙ্গে তুলনা করলে এ কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। অথচ মানুষের কাছে মানুষ যেটুকু ভদ্রতা প্রত্যাশা করতে পারে ততটুকু ভদ্র ব্যবহার আমাদের দিতে তাঁরা সৌজন্তের অপব্যয় জ্ঞান করেন। রেলগাড়ীর এক কম্পার্টমেন্টে কোন ভারতবাসী নিগারকে তাঁরা বরদাস্তাই করতে পারেন না। পশুদের কষ্টনিবারণী আইন কার্যকরী কিন্তু আমাদের দেশের লোক সবল বুটের আঘাতে বখন মরে তখন অপরাধটা তার

প্লীহারই উপর গিয়ে পড়ে। এবং এ সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করে, কি উচ্চ বাচ্য করে, বাজ-আইনে সেই দণ্ডনীয়। অতএব নীরবে সহিতে পার ত মঙ্গল, নইলে উচ্চর য়াও।”

মনের আবেগে রাজা আজ মুক্তকণ্ঠ। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হুঃখিত ভাবে বলিলেন—“সকল জাতের মধ্যেই ভাল মন্দ লোক আছে রাজা।”

“তা ঠিক! আসলে আমাদের হুঃখ সেজ্ঞ নয়—গভর্নমেন্টের আচরণে যে বিমাতার ভাব প্রকাশ পায়—সেইটেই আমাদের প্রকৃত কষ্টের কারণ। দেখুন একজন অধম ফিরিস্তিরও যেসব রাজনৈতিক অধিকার আছে, কি অপরাধে যে আমরা তাতেও বঞ্চিত তা ত বুঝতে পারি। এই অবিচারেই আমরা মর্মান্বিত।”

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—“তবুও নিরাশ হবেন না, কেবল এ দেশে ব’লে নয়—আমাদের দেশেও গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোন অধিকার আদায় করতে অনেক কষ্ট পেতে হয়। এই দেখুন এত চেষ্টাতেও আইরিসরা কি এখনো হোমরুল আদায় করতে পেরেছে? আর সাক্সিবিট দল ত আমাদের দেশেরই মেয়ে, ভোট অধিকার পাবার জন্য তারা কি চেষ্টাই না করছে—তবুও গভর্নমেন্ট অটল। সকলে যেমন কালের মুখ চেয়ে রয়েছে—আপনাদেরও সেইরূপ থাকতে হবে। যদি যোগ্যতা দেখাতে পারেন—একদিন কৃতকার্য হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অসীম অধাবসায় সহকারে প্রস্তুত হতে থাকুন।”

এই সময় চাপরাশি আসিয়া একথানা



কাগজ ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দিল, তিনি রাজার সম্মতি লইয়া লেফাফা ছিঁড়িয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

(১০)

রাজা এই সুযোগে বিদায় গ্রহণের জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু মেম সাহেবের অমুরোধে আবার তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে একাকী রাখিয়া উঠারা দুইজনে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

মেমসাহেব বলিলেন—“আমার একটা কথা অনেকবার মনে হয়েছে—বলব রাজা? কিছু মনে করবেন না। রাজনৈতিক অধিকাৱের জন্ত আপনারা পরমুখপ্রত্যাশী কিন্তু যে সব বিষয়ের উন্নতি আপনাদের নিজের হাতে—হাতে : আপনাদের সমবেত চেষ্টা দেখেন? আপনাদের বরে স্বাধীন যখন শক্তিময়ী হয়ে উঠবে, লোকশিক্ষায় সমাজ যখন প্রবল হয়ে উঠবে তখনই কি আপনাদের জাতীয় যোগ্যতা প্রকৃত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে না?”

রাজা কহিলেন—

“সকল দেশেই রাজনীতির চেয়ে সমাজ নীতির সংস্কার কঠিন তাঁত বোঝেন? বিশেষ আমাদের সমাজ বহুদিনের সভ্যতা এবং আভিজাত্যের ফলক বাইরের লোকে একত্রে পারেন—কিন্তু আমাদের পক্ষে সমাজনীতির কঠিন বেড়া ভাঙ্গা একরূপ :সাধ্য সাধন।”

“তাই ত দেখছি। আপনাদের সমাজের মুখপত্র ব্রাহ্মণসভা ত বিলাত-যাত্রার পর্য্যন্ত বিরোধী! হাস্যকর!”

“এটা হাস্যকর হলেও, সমাজনীতি ভাঙতে

গেলে সঙ্গে সঙ্গে যে অনেক ভুল-জিনিসও হারাতে হয়, এটা ঠিক।”

“উপায় নেই। কাঁটাগাছ বাছতে গেলে অনেক সময় ছুচাৱটা ভাল গাছও নষ্ট করতে হয়।”

“আসল কথা রাজনৈতিক অধিকার অভাবে দেশের লোকে যেক্রপ সমভাবে ক্রেশ অনুভব করে—যখন কোন সমাজ-নীতি সকলের পক্ষে সেইরূপ কষ্টকর হবে, তখনই তাঁর সংস্কারে সমবেত চেষ্টা অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। তাঁহাঁড়া এ দেশে লোক শিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষা যে আদৌ নেই সেটাও নিতান্ত ভুল। এদেশে উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে অর্থের দিক ছাড়া অল্প বিষয়ে খুব যে একটা পার্থক্য আছে তা নয়। বরঞ্চ ধর্ম্মের ভাব চাষাভূষা এবং স্বাধীনতার মনে বত প্রবল উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ততটা নেই। তাঁর কারণ কথকতা পূরণ-পাঠ প্রভৃতি যে সব উপায়ে এ দেশে লোক শিক্ষা হয়—তা এখন সাধারণ গ্রামালোক এবং স্বাধীনতার মধ্যেই আবদ্ধ। ইংরাজি শিক্ষানবীশ পুরুষদের মধ্যে তাঁর চর্চ্চাব অবসর কোথা!”

“সবদেশেই স্ত্রীলোকদের ধর্ম্মের ভাব বেশী—”

ক্লাউডেন সাহেব এই সময় দেখা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—“অর্থাৎ গোঁড়ামি আর সঙ্কীর্ণতা! পাড়ি ও পুরোহিতরা যে একত্রে তোমাদের কাঁছে কৃতজ্ঞ—তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।”

সকলেই হাসিলেন; তিনি রাজার পাশের একখানা আরামচৌকি দখল করিয়া লইয়া

একটা চুরুট রাজার হাতে কাছে ধরিলেন। রাজা ধূমপান দানে তাহা লইতে অসম্মত হইলেন নিজেই তাহা ধরাইয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্লাউডেনের কথার উত্তরে কহিলেন, “এস্থলে আমিও আপনার সহিত একমত। আমাদের মেয়েরা দেশের পুণ্ডিতন আচারগুলি যত্নে রক্ষা করেন ব’লেই এখনো সেগুলি টিকে আছে।”

“আপনি সেটা কি ভাল মনে করেন না?”

“মন্দ মনে করিনে, যদি পুণ্ডিতন মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যেই সে সব অসুষ্ঠি হয়। কিন্তু আচারগুলিকেই ধর্ম বলে গ্রহণ করলে দোষ হয়ে পড়ে বই কি।”

“তবেই ত আপনি স্বীকার করছেন—যে রূপ শিক্ষায় একটা বিচার-ক্ষমতা জন্মে আপনারদের মেয়েদের মধ্যে সেরূপ শিক্ষার প্রচার আবশ্যিক।”

ক্লাউডেন সাহেব এতক্ষণ চুপ করিয়া ধূমপানে মগ্ন ছিলেন, চুরুটটা হাতে লইয়া তাহার ছাঁই ভাঙিতে ভাঙিতে বলিলেন “রাজার মুখ দিয়ে একথা স্বীকার করাবার কি দরকার আছে ডিয়ার?”

মিসেস ক্লাউডেন বলিলেন,—“আমি একথাটা ঠিক রাজাকে বলছি নে, দেশের লোকের উদ্দেশ্যে বলাই আমার অভিপ্রায়।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন—“দেশের লোক এ কথার কি উত্তর দেবে জানিনে,\* তবে—স্বীকৃতির মনের প্রসারতা না বাড়লে দেশের মঙ্গল নেই; এটা আমি মনে করি বই কি। অতীতের তুলনায় আমাদের স্বীকৃতির শিক্ষা দীক্ষা অবস্থা যে হীন হয়ে পড়েছে, চোখ চাইলেই ত তা দেখতে

পাওয়া যায়। তবে স্রীশিক্ষার দিকে লোকের লক্ষ্যও পড়েছে। দেখুন না দেশের কত মেয়ে বি-এ এম্-এ পরীক্ষাও দিচ্ছেন,—আর অনেক সুশিক্ষিতা মহিলা দেশের জন্ত কাজও করছেন।”

“কিন্তু আপনারদের সমাজ প্রকৃতভাবে তাঁদের স্বদলভূক্ত জ্ঞান করে কি? তাঁরা হ'লেন একটা show! দরকার-মত অজ্ঞাতের চোখের সামনে ধরে গর্ভ করার বস্তু। তাই নয় কি? দেখুন, আমি কলকাতায় গিয়ে দুচারটি ধনীঘরের পরদানসীন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেছিলুম। তাঁদের স্বামীরা কনগ্রেসের লোক আর সমাজ সংস্কার সম্বন্ধেও কাগজ-পত্রে তাঁদের বক্তৃতা পড়েছি। কিন্তু মেয়েদের ব্যবহার দেখে আমাকে তারী নিরাশ হতে হয়েছিল।”

রাজা তাঁহার প্রতি উৎসুক দৃষ্টিপাত করিলেন—তিনি কহিলেন—“একটি বাড়ীতে আমি কিরূপ অপ্রস্তুত হয়েছিলুম শুনবেন? তাঁরা থালা পুরে আমাকে নানারূপ মেঠাই খেতে দিয়েছিলেন। আমার কাছেই একটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়েছিল; কি কুবুদ্ধি হোল আমার, প্লেট থেকে তার হাতে একটি মেঠাই দিলুম। অমনি গিন্নি ঠাকরুণ চড়াসুরে বলে উঠলেন, “করলেন কি মেমসাহেব! ও সব ত খায় না!—ফেলেদে ফেলেদে—রাক্ষসী অসুখ করবে; ততক্ষণ মেয়েটি দিবা করে মেঠাইটির অর্ধেক গালে পুরে দিয়েছে। বোঁরা ঘোমটার মধ্যে থেকে চোখ টেপাটেপি করতে লাগলেন, একটা দাসী এসে বকতে বকতে তাকে টেনে নিয়ে গেল; বেচারী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল, আমার আর অপ্রস্তুতের সীমা রইল না।”

রাজা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, “মানুষকে মানুষকে স্পর্শ করলে আচারব্রষ্ট ধর্মব্রষ্ট হয়—আমাদের মনের এই যে সঙ্কীর্ণতা এইটেই সর্কোপেক্ষা আমার শোচনীয় বলে মনে হয়। তাছাড়া মেয়ে-পুরুষের মধ্যে এতে যেকোন বর্ণ-বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে সেটাও বড় অদ্ভুত! কিন্তু আমার বিশ্বাস বেশীদিন এরকম থাকবে না।”

“শিক্ষায় কালে এসব নিশ্চয়ই চলে যাবে। কিন্তু আমি অনেক পুরুষের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি—এখনো শ্রাশিক্ষার আবশ্যকতা তাঁরা ঠিক উপলব্ধি করেন না। অনেকে ভাবেন—শিক্ষায় নারীস্বভাব বিকৃত হয়ে যায়। তাদের প্রাণে আর তেমন স্নেহ-মমতা থাকে না। কেউ কেউ আমার মুখের উপরেই বলেছেন, ভারত-রমণীর মত আমরা ভালবাসতে পারিনে, ত্যাগ স্বীকার করতে জানি নে, ইত্যাদি

ক্লাউডেন সাহেবের চুরুটটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; তিনি সেটা বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন “ঠিকই ত বলেছে। আমি যদি আজ মরি—তুমি কাল নিশ্চয়ই আর একটা বিয়ে করে বসবে।”

পত্নী উত্তর করিলেন “আর তুমি! fair exchange, no robbery.”

“আমি! By Jove! কঙ্কণো না। আমি তোমার ছবির সামনে kneel down করে থাকব, দেখে নিও।”

রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন “দেখুন Mrs. Clowden, আমাদের কোন মেয়ে আপনাদের এইরূপ রসিকতা শুনলে shocked হোত?”

সাহেব বলিলেন, “Good souls!

তোমরা যদি তাদের মত হতে, তাহলে কোন স্বামী মরতে ভয় পেত না!”

মেমসাহেব বলিলেন—“রাজা, ওর কথা শুনবেন না, আমরাও good souls, আচ্ছা ভাবুন দেখি রাজা, সমাজ আইনে ভারতরমণী নিগড়-বাধা; ইচ্ছাতে হোক অনিচ্ছাতে হোক, নিষ্ঠুর পশু স্বামীরও পদসেবা করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। কিন্তু আমরা স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে পারি—আমাদের ডাইভোর্স আছে—একাধিকবার বিবাহ আমাদের মধ্যে দৃষ্য নয়—এ সম্বন্ধে আমাদের মেয়েরা স্বামীর জন্ত কত সহ্য করে? আপনারা উপজ্ঞাসে জীলোকের ত্যাগস্বীকারের বিষয় যা পড়েন তা একটুও বাড়ানো কথা নয়। মহারাজী (আপনার মা) শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে, সব ছেলে-মেয়েগুলিকে বিলাত পাঠিয়ে আমি একলা আছি। কিন্তু তাদের মঙ্গল ভেবেই আমরা সে কষ্ট সহ্য করি। স্ত্রীজাতির মধ্যে কষ্ট-স্বীকার আত্ম-বিসর্জন স্বাভাবিক, নইলে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা হয় না। শিক্ষাতে এ ভাব বাড়ে, কিন্তু কমে না।”

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—“Bravo! কিন্তু কোন পাত্রি থাকলে তোমাকে contradict করতে,—আদমের অধঃপতন হয়েছিল কেন, বল দেখি?”

“এই দেখুন রাজা—সেই আদিকাল থেকেই মেয়েরা সহ্য করে আসছে। নিজের দোষে স্বর্গচ্যুত হলেন আদম—দোষ পড়ল বেচারী ইভের ঘাড়ে।”

রাজা বলিলেন—“আমি ইতি হলে আদম জাতীয় জীবের ত্রিসীমা মাড়াতুম না।”

“তাহা ত আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। দোষের ভাগ নিজে নিয়ে গুণগুলি ফুটিয়ে আপনাদের উজ্জ্বল করে তোলাই ত আমাদের জীবনের কাজ।”

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—“বড় বেশী রকম আত্মপ্রশংসা করছ, challenge করতে হোল দেখছি।”

রাজা বলিলেন—“না Mr. Clowden আত্ম-প্রশংসা এ নয়; মেয়েদের আদর্শ যা হওয়া উচিত তাই ইনি বলছেন; অন্ততঃ আমরা যে রকমটা চাই।”

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—“Very sorry for you রাজা। আমি কিন্তু কিছুতেই মেয়েদের স্টার্ট খরে চলতে রাজি নাই।”

মিসেস্ ক্লাউডেন এ কথার আর কোন কথা না কহিয়া রাজাকে বলিলেন—“দেখুন রাজা, এদেশে এসে আমার সর্বপ্রথমেই কি অভাব মনে জেগেছিল, জানেন?”

“না ঠিক বুঝতে পারছি নে।”

“নারীবর্জিত নিমন্ত্রণ আর নারীবর্জিত সভাসমিতি। কোন দেশমঙ্গল কার্যে মেয়েদের সহযোগিতা না থাকলে সে কাজ কি সফল হতে পারে!” রাজা নীরবে তাঁহার শ্রুগঠিত গুণ্ডয়ুগের অগ্রভাগ-কুঞ্জে -মনোনিবেশ করিলেন। মেমসাহেব বলিলেন “শিক্ষাতে মেয়েদের জন্ম সঙ্কচিত হয় না, তাদের কার্য-পরিসর দৃষ্টি-পরিসর কেবল বাড়ে, তাদের ব্লেহ-মমতা ঘরের সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে ছোটে। তোমার জ্যোতিষ্ময়ী আমার এই কথারই দৃষ্টান্ত।”

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন,—“না dear, তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারচিনে।

জ্যোতিষ্ময়ী কেবল শিক্ষার ফল নয়, অল্প অনেক মেয়েকে তুমি ঐ রকম করে শেখাও, সে ত জ্যোতিষ্ময়ী হতে পারবে না। genius কি সকলেই?”

“কিন্তু শিক্ষাতে geniusও ফুটে ওঠে। রত্নেরও জহরীর হাতে মার্জিত হওয়া দরকার।”

রাজা বলিলেন—“তা ঠিক! এই ভারত-ভূমিই ত সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতীর দেশ। শিক্ষার প্রভাবে একদিন আবার ভারতবর্ষ নারী-গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস আমার মনে প্রবল।”

“আর কে বলতে পারে নারীজাতির ঘারাই ভারতের জ্বত গৌরব পুনরুদ্ধার হবে না?”

এইরূপ কথাবস্তুর পর রাজা হঠাৎ চিন্তে বাড়া ফিরিবারাত্র কথা তাঁহার হাতে তাহার ব্যায়াম-সমিতির একখানি নিয়মাবলী আনিয়া দিল। তাহাতে নিম্নলিখিত নিয়মসমূহ লিখিত ছিল—

- ১। ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে।
- ২। ভারত-সম্রাটের শুভ কামনা করিবে।
- ৩। দেশমঙ্গলে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করিবে।

৪। নারী-সম্মান রক্ষা করিবে; এবং দুর্বলের সহায় হইবে। যদেদ্রী বিদেশী-নির্কিচারে অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করিবে।

৫। শরীর-মনের তেজ-বুদ্ধিকর ব্যায়াম, চর্চা করিবে।

৬। মানক দ্রব্য সেবন করিবে না।

৭। অযথা বল প্রকাশ বা দ্বন্দ্ব করিবে না; কিন্তু অপমানিত হইলে নত মুখে তাহা সহ করিবে না।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

# ভারতের গ্রাম

( ফরাসী হইতে )

দেশের মাটি বড় বড় ভূস্বামীরই হউক, বা কোন বিশেষ-অধিকার-বিশিষ্ট জাতেই হউক, কিংবা নিজেদেরই হউক, চাষা ও কারিগরেরা গ্রামেই দল বাঁধিয়া অবস্থিতি করে এবং সমস্ত ভারতে গ্রামরূপ প্রতিষ্ঠান-গুলি একই রকমের। গ্রামের বাহ্য আকারেও অল্পই বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটা আঁকা-বাঁকা রাস্তা কতকগুলি ছোট রাস্তাকে কাটিয়া চলিয়াছে। চৌকোণা অঙ্গনের মধ্যে একটা এজমালি গৃহ, অনেক সময় মাটির কিংবা কাঠের দ্বারপ্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থলধরণের দেওয়াল। উঠানের মধ্যে খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর; সেইখানে গো-মহিষাদি পশুরা আবদ্ধ থাকে। সমৃদ্ধ পল্লীতে, খাপরার ছাদ, দেয়াল চুপ-কাম-করা : গ্রীষ্মঋতান দেশের প্রথর উত্তাপে, এই শাদা ও লাল বাড়ীগুলো যেন একটা আনন্দের ভাব ধারণ করে।

\* \*

প্রত্যেক গ্রামে, পরিবারগুলি বিভিন্ন জাতে বিভক্ত; প্রত্যেকে নিজের ব্যবসায় চালাইতেছে : কৃষক, পশুপালক, কারিগর, ছোট ব্যবসাদার, নৌচক্ৰে নিযুক্ত লোক। কোন পরিবারের অন্তর্ধানে সমস্ত গ্রামটারই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়।

সকল গ্রামেই এক একজন কুলক্রমা-গত প্রধান থাকে। যে গ্রামে হিন্দু মুসল-মান দুই-ই থাকে, সেখানে ঐ দুই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত দুইজন প্রধান দৃষ্ট হয়। গ্রামস্থ প্রধানের অধীনে, একটা পঞ্চায়ৎ থাকে। পঞ্চায়ৎ নিছক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং অতি পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। (১)

\* \*

পঞ্চায়তের অধীনে ১২ জন কর্মচারী। একজন জরিপ জমাবন্দী করে। আর একজন ধর্মামুষ্ঠানের কার্য নির্বাহ করে, কলিত জ্যোতিষের কলাকল গণনা করে, পঞ্জিকা তৈয়ারী করে, কখন কখন পাঠশালার গুরু-

(১) ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে এই প্রধানদের ভিন্ন ভিন্ন নাম; উত্তরাঞ্চলে, “মুকন্দম” ও “লম্বদার” (এই “লম্বদার” শব্দটার ব্যুৎপত্তি অর্দ্ধ ইংরেজি ও অর্দ্ধ ফার্সি।); উত্তরদেশে, “পাটেল,” “মণ্ডল,” “দেশাই,” “দেশমুখ” ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যে “পাটেল” নামই বিশেষরূপে প্রচলিত। যে গ্রামের স্বত্বাধিকারী কোন বিশেষ জাত, সেখানকার প্রধানকে জাতিদার বলা হয়; লম্বদারও বলা হয়। গ্রামের মুন্সি (secretary) গবর্ণমেন্ট মনোনীত করেন। সেই জমাবন্দী করে:—পাটোয়ারী, মঞ্জুরদার বা তলাটি। ধর্মবাহক:—সংস্কৃতে পুরোহিত, গুজরাতিতে “গোর” অর্থাৎ গুরু। নাপিত:—নাই বা হাজাম (হাজাম শব্দটা আরবী)। কুমোর, ছুতোর, কামার, ধোবা, ভিত্তী বা পখালী। দর্জি, মূচী, চৌকিদার, রাখেরাড বা পাহারী ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দই হিন্দী।

মহাশয়ের কাজ করে।,, আর কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কাজে নিযুক্ত; যথা—নাপিভ, কুমোর, ছুতোয়, কামার, বাসন-মাস্কুনী, ভারী, দ্বিজি, খড়ম-কার, চৌকিদার। তাছাড়া বড় বড় গ্রামে, গুরুমহাশয়, দৈবজ্ঞ, বৈজ্ঞ, তাঁতি, রজক ইত্যাদি। ইহাদের নীচে অশ্পৃশ্য জাত; সমস্ত স্থানিত কাজের ভার উহাদের উপর; চন্দ্রশোধক, ঝুড়ী-কার, মেথর; এই সকল জাতের লোকেরা মাংস খাইতে পারে, এমন কি গোমাংসও খাইতে পারে, সুরাপানও করিতে পারে। ইহাদের অবস্থা অল্প গ্রামালোক হইতে খারাপ নহে। বস্তুত, ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রগ্রন্থেই উহারা নীচ বলিয়া ব্যাভ। উহাদের নিজ জাতের মধ্যে উহারা অল্প হিন্দুদের মতই সগৌরবে অবস্থিতি করে। উহাদের জাত-ব্যবসায় উহাদের একচেটিয়া ও বিলক্ষণ লভ্যজনক।

\* \*

\*

ভারতের কৃষক শাস্তিপ্রিয়, মৃদুস্বভাব, মিতভোজী, দানশীল; যে সকল জাতের লোককে আহ্বান করা নিষিদ্ধ নহে, তাহাদের সম্বন্ধে বেশ আতিথেয়। কিন্তু সে চরিত্রবলহীন, দৈহিক দৌর্য্যল্যবশত কোন বড় কাজে হাত দিতে পারে না। তাহার মনের গতি বাঁধা নিয়মের বশবর্তী; তার বাপ-দাদা যে সব ভুল করিয়াছে, সে ঠিক তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। কাল্পে, কোদাল, লাঙ্গল,—সমস্ত হাতিয়ার এমাই গঠিত হয় এবং সেই সকল হাতিয়ার আদিম-কালের মতো অত্যন্ত সাদাসিধা। গো-মাংসাদির জোয়ালও নিতান্ত সে-কালে

ধরণের। উহারা মাটি বেশী খুঁড়িয়া তোলে না; কেবল জমির উপর আঁচড় কাটিবার মতো লঘুভাবে লাঙ্গল চালায়।

চিরদিন শিশুর মতো অবস্থিত ভারতের চাষা বায়-সংযম করিতে পারে না; তাহার হালকা মন, তাহার ভবিষ্যৎদৃষ্টি নাই। বিবাহে, প্রাক্কে উহারা ব্যয়ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ধন্যোৎসব অসংখ্য। দীনতম কুতীরেও এই সকল উৎসব ব্যয়বাহ্যাসহকারে অহুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রোগে আক্রান্ত হইলে, কিম্বা খারাপ ফসল হইলে অমনি চাষা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। চাষাকে নির্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে হয়। কোথায় টাকা ধার পাইবে? ব্যাক নাই; বড় জমিদার খুবই কম। উহাদের নিকট বাহতে সাহস হয় না; তবে কাহার কাছে টাকা চাহিবে? —এক মহাজন আছে—সুতরাং সুদখোর মহাজন ছাড়া তার গতাগর নাই।

সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলে এক ধাঁচের কুসীদ-জীবী আছে। প্রায়ই তাহাদের বর্ণনা পাঠ করা যায়। তাহারা মারোয়াড়ী (মারোয়াড়ের অধিবাসী)।

বাপমায়ের আদর-আসকারা পাইয়া শৈশবে উহারা খুব দুঃস্থ হইয়া উঠে। আট বৎসর বয়সে কোন নগর বা গ্রামে উহাদিগকে মারোয়াড়ীর ঘরে শিক্ষানবীসী কাজে পাঠান হয়। বর্ণোচিত আহারাভাবে উহাদের শরীর পুষ্ট হয় না; উহাদের প্রতি দুর্ব্যবহারও করা হইয়া থাকে। উহারা প্রথমে কিছুই পায় না, তাহার পর প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু পয়সা পায়। তাহার পর, মাসে মাসে কিছু টাকা পায়। ক্রমে সে তাহার সুখবির

অংশী হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় বড় বড় কেশস্বয়ং হইতে দূরে গিয়া কোন গ্রামে নিজের হিসাবে ব্যবসায় কাঁদিয়া বসে : লবণ, তৈল, শস্ত, খাদ্যসামগ্রী খুজিয়া বিক্রয় করে। সচরে মাগপত্র স্বল্পমূল্যে পাইকেরী হিসাবে খোকে খরিদ করিয়া তাহাই আবার খুজিয়া হিসাবে খারে বিক্রয় করে ; অনেক সময় ওজনেও ঠকায়। গহনা-পত্র ঘরকন্নার সামগ্রী কাপড়-চোপড় বন্ধক রাখিয়া অধিক সুদে টাকা ধার দেয়। তাহার পাতক সর্বস্বাস্ত হইলে, ধারের টাকা তাহার নিকট হইতে আদায় করিবার জন্ত হেন-উপায় নাই, বাহা উহারী অবলম্বন করে না। বাঁধা রাখা জমি, গৃহের আসবাবপত্র বিক্রয় করে, ওয়ারেন্ট জারী করিয়া গ্রেফতার করে, দেনদারের মা, বোন, মেয়েকে দাসী করিয়া রাখে, কারখানায় মজুরনী করিয়া খাটায়, বেস্তাগৃহে পাঠাইয়া দেয়।

অনেক প্রদেশে গবর্ণমেন্ট সুদখোরের হাত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বাস্ত-ভিটা বাহাতে হস্তান্তর না হয়, তাহার জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রক্ষা করা দূরে থাক্ সেই সকল উপায়ে, আমার মনে হয়, তাহাদের অবস্থা আরো খারাপ হইয়াছে। চাষার জমি ছাড়া আর কিছুই নাই ; মহাজন পীড়াপীড়ি করিলে, ঋণযুক্ত হইবার জন্ত সে তাহার সমস্ত জমি কিংবা তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিতে পারে ; কিন্তু এক্ষণে এই ক্ষমতা তাহাকে আর দেওয়া হয় না। কর্তৃকিনে না জানি ভারতের চাষা অনেকে মিলিয়া এক জোটে চাষাবাস করিতে শিখিবে, কৃষি-বেক প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে ! তাহাদের বর্তমান দুর্দশায়, শিক্ষাই একমাত্র উদ্ধারের উপায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## রাজা রামমোহনের স্বরূপ \*

রাজা রামমোহন রায়ের বিরাট মানস-ঈশ্বরের মধ্যে এত বিচিত্র দেশ এবং মহা-দ্রষ্টব্য আছে যে, তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় লইতে গেলে সেই এক-একটা খণ্ড দেশেরই ব্যাপ্তি ও অটলতা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। যেমন, রাজাকে যদি শুধু হিন্দুশাস্ত্রের মীমাংসাকার ও সমন্বয়কার হিসাবেই দেখিতে

যাই, তবে বেদ হইতে তত্ত্ব পর্য্যন্ত হিন্দুর তত্ত্বজ্ঞান ও সাধনার মূলধারা ও উপধারা-গুলির দুর্গম পথ তাঁর সঙ্গে পার হইতে হইবে—লীভিংষ্টোনের নালনদের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কারের চেয়ে সে যে ঢের বিস্ময়কর আবিষ্কার ! এইরূপে হিন্দুধর্ম-সাধনার মান-চিত্রখানি রাজার হাতে যখন প্রস্তুত হইল,

\* রাজা রামমোহন রায়ের বাহ্যিক স্মৃতি-সত্যায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে পণ্ডিত।

তখন সেই সমগ্রের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের চিরন্তন অথচ চিরনবীন কোন্ স্বরূপটিকে তিনি নিজে দর্শন করিয়াছিলেন এবং আমাদের দৃষ্টিগম্য করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি। তাঁর মানস জগতের মধ্যে এই একটা বিরাট মহাদেশ

আবার রাজাকে যদি খৃষ্টান শাস্ত্রের বা মুসলমান শাস্ত্রের মায়াংসাকার রূপে দেখিবার চেষ্টা করি, তবে অপর অপর গহন-জটিল মহাদেশের মধ্যে উপনীত হই।

আবার ধর্মশাস্ত্র ছাড়িয়া যদি বিধিশাস্ত্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও লোকাচারের দিক্ হইতে তাঁর কৌত্তির আলোচনা করি, তবে কি ব্যবহার-বিজ্ঞানবিৎ ( Jurist ) হিসাবে কি সমাজতাত্ত্বিক ( Sociologist ) হিসাবে কি রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞ ( Political thinker ) হিসাবে তাঁর অদ্ভুত মনীষা তাঁর অলোক-সামান্য ভবিষ্যদর্শিতা এক অজ্ঞাত-বিরাট জগতের অরণ্য-পর্বত-নদী-ক্ষেত্রবিচিত্র নব নব দেশের মত আমাদের কাছে কেবল বিশ্বয়ে অভিভূত করিতে থাকে।

আচার্য্য ব্রজেননাথ শীল, এই যুগ-গুরু যিনি যোগ্য শিষ্য, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁর এক রচনায় লিখিয়াছেন :—  
“His name was Legion. Hindoo Pandit, Zabardasht Moulvi, Christian Padre, the Rishi of a new man-wantara or yuga, the Imam or Mahdi of a new tradition, the prophet or Nabi of a Newer Dispensation—by what name shall I call this man ?”

বাস্তবিক এই Legion বা বাহই তাঁর যোগ্য নাম। রাজা রামমোহন রায় এক-মানুষ নন, তিনি বাহ-মানুষ।

যাঁরা ‘আজ’ এই সভার আয়োজন করিয়াছেন তাঁদের ইচ্ছা যে, আজিকার এই জাতীয় উৎসবের দিনে, এই সভাকে যে সকল মনীষী অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁরা শ্রেষ্ঠ-বৃন্দকে এই জাতির এগুণে যিনি উদ্বোধক, প্রবর্তক ও চালক তাঁর বিরাট মানস-জগতের এক একটি মহাদেশে উদ্ভীর্ণ করিয়া দিবেন। আমি সে কাঞ্চে পক্ষে অযোগ্য; আমার উপর সে ভার নাই। আমি শুধু ভাবিতেছি যে, এই যে বিরাট বাহরূপী মানুষ—আচার্য্য ব্রজেননাথ রায় নাম দিয়াছেন Legion—তিনি আমাদের মত অসংখ্য অযোগ্য অকৃতী সাধারণ মানুষদের কি একেবারেই নাগালের বাহিরে ?

গীতায় আছে যে, যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর অনেক বাহুদরবলুনেত্র-শস্ত্রানক নিখরূপ দেখাইলেন, তখন অর্জুন ভীত হইয়া তাঁকে তাঁর পূর্বপরিচিত মানুষরূপেই দেখিবার ইচ্ছা করিলেন এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রসন্ন হইয়া আবার সেই রূপ ধারণ করিলেন তখন অর্জুন সংবৃত্ত, সচেতা ও প্রকৃতিস্থ হইলেন।

আমার মনে হয় যে, রাজা রামমোহন রায়ের ঐ বিরাট নিখরূপ তাঁর মানুষ-রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সাধারণ মানুষ তাঁকে কোন্ দিক্ দিয়া ধরির ভাবিয়া না পাইয়া তাঁর সম্বন্ধে বিশ্বয়ে ও সম্মুখে বতটা অভিভূত হই, ভক্তিতে ও শ্রীতিতে



ততটা উচ্চুসিত হটনা। অথচ জগতে কোন মহাপুরুষই জনগণের শুধু বিশ্বাসের পাত্র নন, প্রীতির আশ্রয় এবং ভক্তির ও পূজার বস্তুও বটে।

রাজা রামমোহন রায়েব বাহ-মানুষটির বাহ ভেদ করিয়া তাঁর নিহৃত মৰ্ম্মস্থানে যদি ঘাটবার চেষ্টা করি, তবে দেখিব সেই বাহের কেন্দ্রে একটি সুধাব উৎস নিয়ত উৎসারিত। সে সুধা কিসের সুধা? বিশ্ব-মানবপ্রীতির অক্ষয় অক্ষরস্থ অপবাজিত সুধা। রাজা রামমোহনের সকল কৰ্ম্ম, সকল ভাব, সকল সন্ধান, সকল শাস্ত্রমীমাংসা ও বিধিমীমাংসার মূলে এই বিশ্বমানব-প্রীতি। এ প্রীতি দেশকালে বদ্ধ নয়, জাতিবিশেষে বদ্ধ নয়, ইহা দেশ-কাল-জাতির সকল সীমা অতিক্রম করিয়া নিখিল বিশ্বমানবে পরিব্যাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

সেই বিশ্বমানব-প্রীতি তাঁর জীবনে অত্যন্ত সত্য বস্তু ছিল বলিয়াই তিনি যে শুধু হিন্দু ধর্ম্মকে নানা প্রকার লোকাচাৰ্যে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দুর মুক্তির রাস্তা খুলিয়া দিলেন তাহা নহে, মুসলমান ধর্ম্মকেও তার সরিষা বাঁ বিধিনিষেধ-কাণ্ড এবং খৃষ্টান ধর্ম্মকেও তার বহুবিধ আচার ও সংস্কারের নিগড় হইতে উদ্ধার করিয়া মুসলমান ও খৃষ্টানকেও তাদের নিজ নিজ ধর্ম্মের পথে মুক্ত করিতে প্রয়াসা হইলেন। হিন্দুর শাস্ত্রালোচনায় যেমন তিনি হিন্দুর সঙ্গে একাত্ম, মুসলমান শাস্ত্রালোচনায় তেমন তিনি মুসলমানের সঙ্গে একাত্ম, এবং খৃষ্টান শাস্ত্রালোচনায় তেমনি আবার খৃষ্টানের সঙ্গেও অভিন্নাত্ম। মানুষকে তার বন্ধন

হইতে মুক্ত করিতে হইবে—এই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র; তা সে মানুষ যে দেশের যে জাতিরই মানুষ হউকনা কেন। তাঁর জীবনচরিতে পাড়িয়াছি যে, বন্ধু অথবা ভক্তিশ্রিয়া কাহাকেও উচ্চুসিত আবেগে যখন তিনি বলিতেন, “Brother, our religion is universal” তখন তাঁর চোখ দিয়া জল পড়িত। এই বিশ্বমানবপ্রীতিতেই সেই মহাজ্ঞানীর ভক্তিসাধনা চরিতার্থ হইত। যেখানে, যেদেশে, যে জাতির মধ্যেই মানুষ ধর্ম্ম বা সমাজে অজ্ঞানে মোহাচ্ছন্ন, সেইখানে সেই মানুষের মোহপাশ ছিন্ন করিতে রাম-মোহন বাঁরের ছায়া অগ্রগামী; যেখানে জ্ঞানলোক নিগৃহীত, সেখানে তার উদ্ধার-সাধনে তাঁর প্রাণপণ প্রযত্ন; যেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রামশীল, সেখানেও তার পরাভবে তিনি স্রিয়মাণ, তার জয়-বার্তায় তিনি আনন্দিত।

কোন সময়ে ভারতবর্ষকে কানাডা প্রভৃতি কলোনির মত self-government বা স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারী হইতেই হইবে, রাজা রামমোহন রায় ইংরাজ শাসনের সেই প্রারম্ভকালেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি যখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন স্প্রিংফোর্ড ও ভারতেশ্বরের নিকট তাঁর আবেদন-পত্র হইতেই দেখি যে, রাষ্ট্রীয় অধিকারে ভারত-বাসীকে পদদলিত ও নিপেষিত, হতমান ও বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে তিনি কি অগ্নিময় বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরকে তিনি লিখিতেছেন, “They appeal to

you ~~have~~ the honour of that great nation which under your royal auspices has obtained the glorious title of Liberator of Europe, not to permit the possibility of millions of your subjects being wantonly trampled on and oppressed." গভর-মেন্টের নিকট হইতে license না পাইলে এদেশে কোন সংবাদপত্রাদি বাহির হইতে পারিবেনা, প্রধানত এই প্রস্তাবের বিকল্পে যদি ঐরূপ উক্তি বাহির হইতে পারে, তবে আজ রাজা রামমোহন জীবিত থাকিলে এখনকার প্রেসঅ্যাক্ট সঙ্ঘর্ষে এবং অত্যাচার বিধান সম্বন্ধে কি বলিতেন এবং কি করিতেন, তাহা আপনারা কল্পনা করিয়া দেখুন!

কিন্তু আশ্চর্য্যঃ বিষয় এষ্ট যে শুধু পঞ্জাতি-প্রীতিতেই সেই মহানু পায়ার প্রীতির পর্য্যবসান নয়, সকল মানবের ভাগ্যহস্তের সঙ্গে তাঁহার চিত্তকে তিনি জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। কোথায় স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হইল, তাতে তাঁর এতই আনন্দ যে তিনি ঘটা করিয়া টাউনহলে এক ভোজ দিয়া বসিলেন। আবার নেপ্লসে স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম চলিতেছে এবং সে সংগ্রামে নেপ্লসের লোকদের পরাভব ঘটয়াছে, এই সংবাদে তিনি এমনি মিশ্রমাণ হইলেন যে সেদিন মিঃ বক্ল্যাণ্ড নামক ইংরাজ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেই যাইতে পারিলেন না। তাঁকে চিঠি লিখিলেন—“এক দুর্ঘটনার সংবাদে আমার মন এমনি বিচলিত হইয়াছে যে, আপনার সহিত আমি

দেখা করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে, সকল ইউরোপীয় ও এশিয়ার জাতিরা স্বাধীন হইল, এ দৃশ্য আমার জীবতকালে আমি দেখিয়া যাইতে পারিব-না।” কিন্তু “Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful” ইংলণ্ড যাইবার পথে নেটালে এক ফরাশী জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে শুনিয়া সেই নিশানকে অভিবাদন করিতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া চিরজীবনের মত তাঁর পা ভাঙিয়াছিল। সে দিকে তাঁর ক্রক্ষেপ নাই; তিনি পুনঃপুনঃ আবেগের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, “Glory, glory, glory to France!” মানুষের স্বাধীনতাব জন্ত এমন passion এমন একান্ত আবেগ কে কবে কোথায় দেখিয়াছে, কে কবে কোথায় শুনিয়াছে!

বঙ্গগণ, রাজা রামমোহন রায়ের সকল পাপাত্য, সকল মনোবা, সকল ~~শান~~ শান, সকল চেষ্টার মূলে—অন্তরংগ প্রদেশে—এই বিশ্ব-মানবপ্রীতি উৎসবরূপ রহিয়াছে। এই তাঁর যোগ, এই তাঁর ভোগ, এই তাঁর পরমদান, এইখানেই তাঁর পরম রসাস্বাদ। আমরা আজকাল নরনারায়ণের পূজার মহিমা কীর্তন কার; সকল নবের মধ্যে সেই বিশ্বনরকে সেই পরম এককে এ যুগে কে এমন স্থানচিত্তরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ করিয়া সেই আনন্দের বেগে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সেই নর ও নারীর সকল মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁর স্বরূপে তাকে উদঘাটিত-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত

সমস্ত জীবন বিসর্জন করিয়াছে? শুধু তপস্বী করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁর পূণ্য-  
 ধ্যেয়ে নয়, শুধু সমাজে নয়,—শিক্ষাদীক্ষা স্মৃতির উদ্দেশে কৃতাজলিপুটে তাঁকে জনয়ের  
 বিধিবিধান এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের ক্ষেত্রেও— ভক্তি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হই।  
 সকল মানুষের মুক্তির জন্য যে মহাপুরুষ শ্রীআজতকুমার চক্রবর্তী।

## জলের আশ্পনা

আঠারো

অগদীশপুরে ট্রেন হইতে নামিয়া জয়ন্ত একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিল। ট্রেন হইতে তাহাদের বাড়ী অনেকখানি দূরে। অল্প-অল্প বারে অন্নপূর্ণা তাহার জন্ত ট্রেনে বাড়ীর পাল্কি পাঠাইয়া দিতেন,—‘গরুর গাড়ী যে বড় শক্ত, জয়ন্তের নরম গায়ে সে বাধা সহিবে না।’—এবারে অন্নপূর্ণা নাই—কে আর পাল্কি পাঠাইবে? দেশে আসিয়া অন্নপূর্ণার অভাব জয়ন্ত এই প্রথম অনুভব করিল।

মেঠো মেটে পথখানি মস্ত-বড় একটা অট্টোমট অঙ্গুরের মত, আঁকিয়া-বাঁকিয়া দূরের সবুজ বনের ভিতরে হারাইয়া গিয়াছে।—দু-ধারে শষ্যভরা ক্ষেত, সর্বাপেক্ষে ফিকে-হলুদী রোদ মাখিয়া বর্ণবৈচিত্রে অপূর্ব লুইয়া উঠিয়াছে। গরুর গাড়ীখানা আস্তে আস্তে চিমাইয়া-চিমাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল; জয়ন্ত গাড়ীর ছইয়ের ভিতরে গিয়া শুইয়া পড়িল, ভজহার পায়ের তলায় বসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।... ..

পশ্চিমের রক্ত-সাগরে শেষ-ডুব দিবার আগে, সূর্য্য যখন ধরণীর স্ত্রীমল মুখের

পানে অস্তিম দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন, গাড়ী তখন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। জয়ন্ত ধীরে-ধীরে ছইয়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ঐ দূরে তাহাদের বাড়ী দেখা যাইতেছে। আগে-পাশে জয়ন্ত যখন দেশে ফিরত, এখন দুঃ হইতে এই বাড়ীখানি প্রথম চোখে পাড়িলে তাহার মনটা উল্লাসে যেন উচ্চাঙ্কিত হইয়া উঠিত! আজ কিন্তু বাড়ী দেখিয়া তাহার প্রাণটা হুহু করিতে লাগিল; তাহার আজন্মের মেহনত এবং শৈশব-স্মৃতির মহাতীর্থ ঐ বাড়ীখানি আগে যেন জীবনে এবং আনন্দে পারিপূর্ণ ছিল—আর আজ সে মৃত্যুর মত শুষ্ক, শূন্যের মত নিরানন্দ।

গাড়ী ক্রমে বাড়ীর কাছে আসিল। হঠাৎ জয়ন্ত দেখিল, বাড়ীর একটা জান্নালয় পটের ছবির মত একটি স্থির মূর্তি দাঁড়াইয়া, তাহাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। জয়ন্ত চিমিল, সে গোরা!

ধীরে-ধীরে তাহার মুখ বৃকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল,—গভীর লজ্জায় তাহার দেহ মন কেমন-যেন এলাইয়া আসিল।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গরুরগাড়ী থামিল।

চোখ তুলিয়া জয়ন্ত দেখিল, জানলা  
হঠাতে গোরী কখন সরিয়া গিয়াছে।

চারিদিক নীরব শোকে ভরা; কোথাও  
দাস-দাসী লোকজনের সাড়াশব্দ নাই,—  
দেউড়ীতে দল পাকাইয়া দরোয়ানেরা বসিয়া  
থাকিত, আজ তাহাদেরও কাচাকেও দেখা  
যাইতেছে না ও বাড়ীর উপরের-নীচের বেশীর  
ভাগ জানলা-দরজাটি খোলা নাই,—বুহুং  
সদর দরজাটাও ভিতর হইতে বন্ধ;—হঠাৎ  
দেখিলে মনে হয়, এ দরজা যেন কতকাল  
ধরিয়া এমনিই বন্ধ আছে।

এই অস্বাভাবিক নিরুজ্জ্বলতার ও জীবন-  
হীনতার মাঝখানে, বাড়িখানাকে দেখাইতেছে  
ঠিক যেন পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ীর মত।

ভজহরি সবিস্ময়ে ফ্যান্‌ফাল্ করিয়া  
চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

জয়ন্ত সদর দরজায় করাঘাত করিল—  
একবার, দুইবার, তিনবার। সে শব্দ  
চারিদিকের একান্ত স্তব্ধতার নিরবচ্ছিন্ন  
স্রব্দ ছিঁড়িয়া দিল,—কিন্তু দরজাও খুলিল  
না, কারুর সাড়াও মিলিল না।

পাশের আম-কাঁঠালের বাগান হইতে,  
একটা ঘুঘু স্তম্ভ শেষ-বেলায় করুণ বিলাপের  
স্বরে দু-একবার ডাকিয়া, আবার যেন কি  
ভয় পাইয়া ধামিয়া পড়িল।

ভজহরি বন্ধ দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ  
করিয়া বলিল, “এ কি ব্যাপার! এরা কেউ  
বাড়ী নেই নাকি?”

—“আমি পথ থেকে দেখেছি ওপরে  
গোরী দাঁড়িয়েছিল।”

—“তবে?”

—“কিছুই ত বুঝি না।”

এমনসময় বাড়ীর ওদিককার বাগানের  
পথে থকথক কাশি ও ঠকঠক লাঠির শব্দ  
উঠিল।

—“এই যে! পেরু নাম হই দেওয়ান-  
মশাই, পেরু নাম হই!”

কালিশঙ্কর ধীরেধীরে আগাইয়া আসিলেন।  
বিশ্রমমুখে ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন,  
“জয়, আব কি দেখতে এলে ভাই, সব শেষ  
হয়ে গেছে।”

জয়ন্ত সজলনয়নে কালিশঙ্করের দিকে  
চাহিল। বুকের মাঝে মা-হারানোর বাণী  
নূতন কাঁপিয়া আবার উথলিয়া উঠিতে-  
ছিল, কোনক্রমে আবেগ সামলাইয়া সে  
বলিল, “কালিদাদা, আমাকে একটা খবরও  
দিতে নেই—যাবার আগে মাকে একবার  
প্রাণ-ভরে শেষ-দেখা দেখে নিতুম!”

—“কি করব ভাই, কে জানে এত-হঠাৎ  
এমন হবে—ভাইব আর কাকে বলে!  
জানই ত, অনেকদিন থেকেই মার বুকের  
ব্যারাম ছিল, সেই অশুভই শেষটা তাঁর কাল  
হ’ল।... আর, খবর দিতে বলছ, কিন্তু—”  
বলিতে-বলিতে কালিশঙ্কর ধামিয়া পড়িয়া,  
অধোবদনে থকথক করিয়া কাশিতে  
লাগিলেন।

—“ধামলে কেন কালি-দাদা, কি  
বলছিলে বল না!”

—“বলব? শুন্লে তুমি কষ্ট পাবে কিন্তু  
না বলেও ত উপায় নেই ভাই।”

কালিশঙ্করের ধরণ-ধারণ দেখিয়া জয়ন্ত  
আশ্চর্য্য হইরা বলিল, “কালি-দাদা, আমার  
কাছে তুমি অত কিন্তু হোচ্ছ কেন?”

—“তোমাকে খবর দিয়ে ডেকে

আনলে মা রাগ করতেন। মন্সবার আগে গৌরী-দিদিকে তিনি হুকুম দিয়ে গেছেন, ‘বার জন্তে আমার সত্যভঙ্গ হয়েছে এ বাড়ীতে সে যেন আর কখনো ঢুকতে না পার’! —লজ্জা-সঙ্কোচে অস্পষ্ট স্বরে, কালিশঙ্কর তাড়াতাড়ি কথাগুলো কোনরকমে বসিয়া ফেলিলেন এবং এই কঠিন ও অপ্রিয় কর্তব্যটা শেষ করিয়া মাটির দিকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জয়ন্তের মুখের উপরে তাহার অন্তর্গত বাখা-বেদনার ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ গুম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খুব নীচু গলায় সে বলিল, “তাই বুঝি মন্সবার বন্ধ?”

কালিশঙ্কর কোন জবাব দিতে পারিলেন না,—শুধু অপ্রতিভ ভাবে থকথক করিয়া কাশিতে লাগিলেন।

—“তাহলে গৌরী আমাকে এ বাড়ীতে আর ঢুকতে দেবে না?”

কালিশঙ্কর হতাশমুখে ঘাড় নাড়িলেন।

ভজহারি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—এতক্ষণে তার মুখে কথা ফুটিল। উত্তেজিত স্বরে সে বলিয়া উঠিল, “কী, আমার খোকন তার নিজের বাড়ীতে ঢুকতে পারে না!”

কালিশঙ্কর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, “এ বাড়ী মা গৌরীদিদিকে দান করে’ গেছেন ভজহারি!”

ভজহারির চোখে একটা ছরগু ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—ঠকুঠকু করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হুকুম দিয়া বলিল, “কী! কি বললেন? তাহলে খোকন তার বিষয় থেকে সত্যিসত্যিই বঞ্চিত হয়েছে?”

তাহার সেই অশ্রুশ্রদ্ধা মুষ্টি দৌঁধিয়া ভয় পাইয়া, দুই পা পিছু হটিয়া কালিশঙ্কর বলিলেন, “না, না, বিষয়ের অর্ধেক অংশ জয়ন্তের।”

“না, কখনি না—মাঠাকরোন ত তেমন লোক ছিলেন না—এ-সব চক্রান্ত, আমার খোকনকে ঠকাবার ফিকির!”

—“জয়কে কে ঠকাচ্ছে ভজহারি? আমি, না, গৌরীদিদি?”—বলিয়া কালিশঙ্কর একটু ম্লান হাস্য করিলেন।

মাথানাড়া দিয়া মাথার ঝাঁকুড়া-ঝাঁকুড়া চুলগুলোকে এদিকে-ওদিকে দোলাইয়া ভজহারি বলিল, “ও-সব কথা আমি জানি না, জানতে চাইও না!”

—“জয়ের ওপরে আমার ক দরদ নেই ভজহারি? আমি যে ওকে কোলে-পটে করেছি!”

—“কে আর দরদ আছে! ব্যাচারা মা হারিয়ে এতখানি পথ না-খেয়ে না-খুমিয়ে ছুটে এল, আর তোমরা কিনা ওকে ধুলো পায়েই ভিথিরীর মত তাড়িয়ে দিতে চাও? দরদ থাকলে এমন কথা মুখে আনতে পারতে!”

—“কি করব ভজহারি, এয়ে ১০ হুকুম!”

—“মরণকালে মাহুষের বিপর্যাত ব্যুৎ হয়—নইলে মাঠাকরোণ কখনো এমন হুকুম দিতে পারতেন না। তাঁকে কি আমি জানি না? খোকন যে তার বুকের নিচে ছিল গো!”

কালিশঙ্কর নিরন্তর হইয়া কাশিতে লাগিলেন।

জগহর কাঁদের গাম্ভীর্যে গোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, “থোকনকে নিয়ে আমি এ বাড়ীতে ঢুকবই,—তোমরা কে আমাকে রুকতে পার, দেখি! ভজা বুড়ো চলেও এখনো লাটি ধরে দাঁড়াতে পারে—আর এই হাতে সে অমন চ-দশ-শো লোকের মাতা পাকা বেলে মত কটাফটু ফাটিয়েচে”— বলিয়া আপনার মাংসপেশী ভরা শ্রুতি স্থানানুসৃষ্টিক্রিয়া সামনের দিকে বাড়াইয়া দিল।

কালিশঙ্কর অসহায়ের মত ভজহরির মুখ থেকে সরিয়া জয়ন্তের পাশ ঘেসিয়া দাঁড়াইলেন—ভজহরির এমন ভয়ানক চেহারা তিনি আর-কখনো দেখেন নাই।

জয়ন্ত এতক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অস্ত্রমান সূর্যোর দিকে অন্ধমুদিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া-ছিল। ভজহরির চাংকায়ে মুখ ফিরাইয়া ব্যাভর্য শাস্ত্র স্বরে বলিল, “ভজা, চল, ফের গাড়ীতে গিয়ে উঠি চল।”

—“সে কি থোকন, তাকি হয়! কিছু ভাবিস-নে, বাড়ীতে আমরা ঢুকবই—কেউ আটকাতে পারবে না!”

—“না রে ভজা, না! মা যে আমার ওপরে অভিমান করে’ হুকুম দিয়ে গেছেন,—তীর এ শেষ হুকুম কি আমি ঠেলতে পারি? নে, চল!”

—“না থোকন!”

কষ্ট তীক্ষ্ণ স্বরে জয়ন্ত বলিল, “ভজা!”

ভজহরি তার থোকনের তীব্র দৃষ্টির সামনে একেবারে জড়োসড়ো হইয়া পড়িল; আর দ্বিতীয় কথাটি না-কহিয়া কেঁচোর মত হুড়ু-হুড়ু করিয়া সে আবার গাড়ীর উপরে গিয়া উঠিয়া বসিল।

জয়ন্ত ফিরিয়া সহজ সরে বলিল, “কালিদাদা, তবে আসি ভাই! গোরাকে বোলা তার ওপরে আমি একটুও রাগ করিন। তোমরা রইলে, দেখো, তার যেন কষ্ট না হয়!”

কালিশঙ্করের ছহচোখ জলে ভরিয়া উঠিল। জয়ন্তের একখানা হাত আপনার বুকের উপরে জানিয়া চাপিয়া ধরিয়া অবরুদ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন, “জয়, জয়, আমাকে যেন দোষী কোরো না ভাই! আমি তোমাদের খেয়েই মানুষ,—কিন্তু আমার অবস্থাটা বুঝ ত?”

—“কালিদাদা, আমাকে কিছু বোঝাতে হবে না, আমি কারও ওপরে রাগ করিন—রাগ করবার অধিকার আমার নেহ—এ আমার কপালের দোষ! তবে, মনে এই বড় বেদ রয়ে গেল যে, মার শেষ কাজটাও আমি নিজের হাতে করতে পারলুম না।”—আক্ষেপভরে এই কথাগুলি বলিয়া জয়ন্ত ধীরেধীরে আবার গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

কালিশঙ্কর লাঠির উপরে তবু দিয়া অভিভূত প্রাণে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গরুর লাজ্জ মলিয়া গাড়োয়ান গাড়ী চালাইয়া দিল। সে নিদাক্ষণ বিদায়-দৃশ্য কালিশঙ্করের আর সহ্য হইল না—তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গলা থকথক ও লাঠি ঠকঠক করিতে-করিতে তিনি আবার বাগানের পথ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। এবং ঘাইতে-ঘাইতে কোঁচার খুঁটে বারংবার আপনার চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া জয়ন্ত তাহার শৈশবের

সোনার স্বপনে জড়ানো, বৃকভরা স্নেহপ্রেমের  
রসে ভীষানো সেট বাস্তবতার দিকে,  
নিম্পলক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া মৌন মূর্তির  
মত বসিয়া রহিল। এ বাড়ীর সঙ্গে তাহার  
সকল সম্বন্ধ আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল,—  
জন্মের মত, জন্মের মত।

গাড়ী যখন খানিক তফাতে গিয়া  
পড়িয়াছে, জয়ন্তের আবার মনে হইল,  
গৌরীর ঘরের জান্নায় যেন একটি শ্বেত-  
বসনা মূর্তি ছবির মত তেজস্বিনী স্থির হইয়া  
দাঁড়াইয়া আছে! সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে  
জয়ন্ত এবার তাহার মুখ দেখিতে পাঠিল  
না,—কিন্তু তাহার বেদনাভরা বর্ণবাসনার  
সজলদৃষ্টি যেন আপনার প্রাণের মাঝখানে  
অস্থল করিল।

তাহার বাড়ীখানি দেখিতে-দেখিতে  
ক্রমশঃ স্পষ্টতর সন্ধ্যার তিমিরাকুলে অস্পষ্ট  
হইয়া আসিল; ঠিক পথের বাঁকের  
উপরে অন্ধকারের নীড়ের মত একটা মস্ত  
বাঁশঝাড়, আলোকহীন নিম্প্রভ আকাশের  
দিকে তাহার শতশত কঙ্কালসার হাতগুলো  
বাড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ী  
মোড় ফিরিতেই জয়ন্তের বসতবাড়ীখানা  
তাহার আড়ালে হারাইয়া গেল।

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভজহার  
দুকালে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

ভজহার ধরা-ধরা গলায় বলিল, “এক  
কন্সলি থোকন! নিজের ভিটে ছেড়ে, নিজের  
দেশ ছেড়ে পরের মত কোতায় চললি?”

জয়ন্ত চোখ মুদ্রিয়া শ্রান্ত স্বরে বলিল,  
“এ মায়ের আদেশ, এর ওপরে আর কথা  
কোন্-নে ভজা।”

চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ যখন মুখ রাঙা  
করিয়া বনের কাণো-কাণো পাতার ফাঁকে  
উকিঝুঁকি মারিতেছে, গাড়ীখানা তখন একটা  
ভেনাখায় আসিয়া পড়িল।

জয়ন্ত ১১৭ উঠিয়া বাসিয়া বলিল, “ভজা,  
এ পথে শ্রমানে যাওয়া যায়, না?”

বসিয়া-বাসিয়া ভজহার দাঁলতোছিল,—  
জয়ন্তের স্বরে সচমকে মুখ তুলিয়া চোখ  
কচলাইয়া বলিল, “হ্যাঁ,—কি বল্চিস?”

—“ঐটে ত শ্রমানের পথ?”

—“হঁ।”

জয়ন্ত গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া পড়িয়া  
বলিল, “ভজা, তোরা এইখানে একটু দাঁড়া  
—আমি এখনি আসছি।”

তুই চক্ষু বিস্তারিত করিয়া ভজহার  
বলিল, “সে কি রে! তুই কোতা যাবি?”

—“শ্রমানে।”

ভজহার আঁকুপাকু করিয়া বলিয়া উঠিল,  
“এই রাস্তারে, এই অন্ধকারে শ্রমানে?  
হ্যাঁ—বলিস্ কিরে, ফেপলি নাকি?”

—“না ভজা, আমি যাবই! এ  
পৃথিবীতে মা যেখানে জন্মের মত শেষ শোয়া  
শুয়েছেন, দেশ থেকে বিদায় হবার আগে  
সে ঠাইটা একবার চোখেও দেখে যাই।”  
—জয়ন্ত হনহন করিয়া শ্রমানের দিকে  
চলিয়া গেল।

ভজহার তাড়াতাড়ি একটা লঠন আলিয়া  
ও একগাছা লাঠি লইয়া জয়ন্তের পিছনে  
পিছনে উঠিতে-পড়িতে ছুটিল।

নদীর ধারে ধমুধমে নিস্তরুতার মধ্যে,  
অশ্রুট চক্সালোকে বড়বড় অশথ-বটের তলায়,  
খানিক কালো খানিক আলো মাখিয়া

উঁচু-নিচু ছিপি-ভরা এল্‌কো-বেব্‌ডো আশান-  
ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মাঝে-মাঝে গাছের  
মাধার-মাধার দাক্ষা মারিয়া, অশরার প্রেতের  
মত অশান্ত বাতাস গৌ-গৌ করিয়া  
উঠিতেছে, আর বটের দীর্ঘ ঝোলা-ঝোলা  
জটুলো যেন কাহাদের শীর্ণ অঙ্গুলির মত  
বাঁকিয়া-বাঁকিয়া যাইতেছে। ঝাঁঝ পোকা-  
গুলো চেরা গলায় অশান্ত স্বরে ডাকিতেছে  
আর ডাকিতেছে,—সে-যেন প্রেতলোকের  
নরক-যন্ত্রণার আর্ন্তনাদ!

ভজহারর সন্ধ্যা কাটা দিয়া উঠিল,  
ভয়ে-ভয়ে সে বলিল, “রাম, রাম, রাম!”

গভীর নিশীথে মড়াদের এই হাড়ের  
বিছানায় হঠাৎ জ্যাস্ত মানুষের পদক্ষেপে  
কাদের যেন ঘুম ভাঙিয়া গেল—কারা যেন  
আশপাশ খানাচ-কানাচ হইতে ছন্দ ছন্দ করিয়া  
তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল—সেই শব্দে ভজ-  
হারি অত্যন্ত আতঙ্কে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

—“ভজা, ও কিছু নয় রে, আমাদের  
দেখে শেয়ালগুলো পাগিয়ে গেল!”

ভজহারির গলায় একটা ঘড়ঘড় শব্দ  
উঠিল মাত্র—সে কোন জবাব দিতে পারিল  
না।

—“ভজা, আলোটা একটু তুলে ধর!”

ভজহারি কাঁপিতে-কাঁপিতে লঠনটা কোন-  
মতে মাথার উপরে তুলিয়া ধরিল।

সেই আলোতে এদিক-ওদিক চাহিয়া  
জয়ন্ত দেখিল, কাছেই একটা সম্ম-জালানো  
ভাস্কর্য চিতা! এইখানেই অল্পপূর্ণার নশ্বর  
দেহ শেষ অগ্নিশযায় গমন করিয়াছিল।

জয়ন্ত আস্তে-আস্তে সেই নির্দোষিত  
চিতার পাশে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া

পড়িল। চিতার ভাস্কর্যের মতো তখনো  
টুকরো-টুকরো কতগুলো হাড় দেখা যাতেছে  
—তাহার সেট মেহমদা করুণাকরিনা  
জননীর কোমল কুলের মত দেহের হাইই  
শেষ চিহ্ন!

জয়ন্ত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল,  
“মাগো, ওমা! ইহলোকে আমার ওপরে  
অভিমান করে’ তুমি চলে গেলে, পরলোকে  
থেকে এখন আমাকে ক্ষমা কর মা, ক্ষমা  
কর!” এই বলিয়া চিতার মধ্যে বিহ্বল  
পাগলের মত উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া  
অজস্র অশ্রুধারা আশানশয়নের আশ্র-ভাস্ক  
সিক্ত করিয়া তুলিল।

ভজহারির চোখ একেবারে কপালে উঠিয়া  
গেল। সমস্ত ভয় ভাবনা তুলিয়া সে ছুটিয়া  
গিয়া জয়ন্তকে চিতা হইতে টানিয়া তুলিয়া  
বলিল, “যাঠ, যাঠ! চিলুতে শুয়ে এমন সোনার  
দেহের অকল্যাণ করা! তুই যদি এমন  
কারিস্ পোকন, আমি তাহলে নাপা খুঁড়ে  
মরব! চল, এই রাত্রেই এখন নদীতে  
লে, আশান জ্বলে নাহতে ধর!”

### উনিশ

কালকাতায় ফিরিয়া জয়ন্ত শুনিল,  
জগৎবাবু ইন্দুকে গইয়া দেওঘরে চালা  
গিয়াছেন।

তাহার মাতৃশোকের উপরে এ আঘাত  
বড় নৈদারুণ বাজিল। জগৎবাবু চলিয়া  
গিয়াছেন! সে তাহার নির্দোষিতা প্রমাণ  
করিতেও পারিল না।

না-বলিয়া মা গেলেন, দৌরাও আশ্রয়  
দিল না, দেশে তাহার ঠাই নাই—এ-হেন



হুঃসময়ে জয়ন্ত যাত্রার কাছ হইতে একটু-খানি শাস্তির প্রত্যাশা করিতেছিল, তাহাকেও দেখিতে না-পাইয়া তাহার উদাসী প্রাণমন একেবারে জ্বালাইয়া পড়িল।

চন্দ্র উপরে তাহার রাগ হইল, রূপা হইল, অভিমান হইল!—যাত্রার জন্তে সে আজ সর্বস্বহারা, সেও তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল না। একদিনের মিথ্যা কলঙ্কে এতদিনের ভালোবাসা যে ভুলিতে পারে, সে নিশ্চয়ই তাহাকে কখনো ভালোবাসে না—ইন্দুর প্রেম কপট প্রেম—এ প্রেমে প্রাণপণে নির্ভর করা তাহার পক্ষে অজ্ঞায় হইয়াছে; পরকে সে আপন করিতে তা পারিলই না—মাক্ষধান থেকে ক্ষুদ্র আপন-জনকেই পর করিল!

আজ কয়দিন ধরিয়া জয়ন্তের হৃদয় এমনি-সব কথা ভাবিয়া রাগে-হুঃখে-অভিমানে তোলপাড় হইয়া উঠিতেছে আর দিনে দশবার সে এই-বলিয়া প্রোক্ত করিতেছে, ইন্দুকে সে ভুলিবে, ভুলিবে—ইন্দুকে সে ভুলিবেই!... .. জয়ন্ত একবারও ভাবিয়া দেখিল না যে, ইন্দু হয়ত এখনো তাহাকে ভালোবাসে, ইন্দু হয়ত তাহার পিতার ইচ্ছাতেই দেশত্যাগে বাধ্য হইয়াছে।

বাস্তবিক, প্রেম এমনি পল্কা, একটুতেই এমনি বাঁকিয়া পড়ে,—প্রেমিকের মনো-জগতে এমনি “কণেকে হাতে দাঁড়, কণেকে চাঁদ!”

আজ সকালে জয়ন্ত যখন অস্থির ওয়াহলেন্দর কাবারসের ভিতরে আপনার বিক্লিপ চিত্তকে নিহিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় নব্বুত ছিল, তখন ভজহারি আসিয়া

দরদ-ভরা কণ্ঠে কলিল, “আহা, ~~প্রেম~~ একটা ভিখিরী পড়ে আছে দেকে এলুম, তার ওপরে ‘মার কুপা’ হয়েছে খোকন!”

বই হইতে চোখ তুলিয়া জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল, “বসন্ত হয়েছে! কোথায়?”

—“এই আমাদের বাসার ছাত্রখানা বাড়ীর পরেই! ব্যাচারী একজনদের রোগাকে উঠে গিয়েছিল, তা তারা তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে! সে এখন পথে পড়ে-পড়ে’ চৌচিয়ে কেঁদে মরছে—দেকে আমার বুক যেন কেটে যেতে লাগল। কিন্তু হুঃখ করে’ কি আর করব বল খোকন—এসবই গ্যালোজন্মের কামফল! কার কপালে কি আছে, কে বলতে পারে হরি হে, তোমার মহিমে বোজা ভার!”

—বলিয়া ভজহারি উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অদৃশ্য হরির উদ্দেশ্যে একটি দৃশ্যমান প্রণাম করিল।

জয়ন্ত বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুতাপায়ে দিতে-দিতে বলিল, “ভজা, আমার সঙ্গে আস!”

—“কোথায় খোকন?”

—“আয়, দুজনে মিলে ধরাধরি করে’ সে বেচারীকে একখানা গাড়ীতে তুলে হাস্পাতালে দিয়ে আসি!”

ভজহারির মুখ শুকাইয়া আমসী হইয়া গেল। হাঁউমাউ করিয়া বলিয়া উঠিল, “তুই তাকে ছুঁবি কিরে!”

—“চোখের সামনে একটা মানুষ পথের ওপরে পড়ে ছটকটিয়ে মরবে, আর আমরা হাত-গুটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তাই দেখব? মানুষ হয়ে মানুষকে সাহায্য করব না!

ছিঃ ভজা! তোর মুখেও এমন কথা শুনে তোলা!”

ভজহরি বোকা বনিয়া লজ্জিত মুখে মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে জয়ন্তের পিছনে-পিছনে চলিল,—সে খোকনকে বুঝাইতে পারিল না—তাহার আসল ভয় ও বাধা কোন্‌খানে!

\* \* \* \* \*

এই ঘটনার দুদিন পরে সন্ধ্যার সময়ে জয়ন্ত বাসায় ফিরিয়া বলিল, “ভজা, আমার জর হয়েছে, গলায় আর কোমরে ভারি ব্যথা!”

সেই রোগী ভিখারীকে ছেঁদা-ঘাঁটার পর হইতেই ভজহরির মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল,—জয়ন্তের জর ও গায়ে ব্যথা হইয়াছে শুনিয়াই তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল!

তাড়াতাড়ি জয়ন্তের কপালে হাত রাখিয়া সে বলিল, “তাইত রে, তোর গা যে আগুণ!”

জয়ন্তকে ধরিয়া তখন সে বিছানায় শুয়াইয়া দিল। ঘরের সমস্ত জান্না বন্ধ করিয়া রোগীর শিয়রে আসিয়া বলিল। কাতর স্বরে বলিল, “খোকন, তখনি মানা করেছিলুম, গোয়ারতুমি করে’ ভিখারীটাকে ক্যানো ছুঁলি বল দেখি!”

জয়ন্ত ঝিন হাসি হাসিয়া বলিল, “এতদিন ধরে নিজের স্বার্থেই প্রাণকে খাটিয়ে দেখলুম ত, কিন্তু কি করতে পারলুম ভজা! আর আজ একদিন পরের উপকারে প্রাণকে খাটাতে গিয়ে যদি নিজের প্রাণের ক্ষয় করি, তবে তেমন দুর্বল প্রাণে দরকার কি বল ত?”

ভজহরি মহা চটিয়া বলিল, “অত আর বকবক করতে হবে না, চুপচাপ শুয়ে থাক! ক্যাতাব পড়ে তোর জ্ঞান হয়েছে না ঘোড়ার ডিম হয়েছে—হয়েচিস্ খালি কতর ভট্টাচ্!”

জয়ন্ত সেই ঘেহের ভৎসনার একটু-খানি হাসিয়া পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদ্রিয়া শুইয়া রহিল।

ভজহরি তাহার কপালে কয়েকটি পরমা ছুঁয়াইয়া দেবতার কাছে মানত করিয়া তুলিয়া রাখিল।

শেষরাত্রে জয়ন্তের জর আরো বাড়িয়া উঠিল—জরের ঘোরে সে যা তা ভুল বকিতে শুরু করিল।

ভয়ে ভাবনায় আকুল হইয়া ভজহরি সারা রাত ঠায় জাগিয়া বসিয়া রহিল এবং দুইহাত ঘোড় করিয়া উর্ধ্বনেত্রে বারংবার বলিতে লাগিল, “ঠাকুর, তুমি প্রাণ চাও ত আমার প্রাণ নাও, আমি মরি তায় ক্ষেতি নেই, খোকন আমার স্নেহে উঠুক!”

### কুড়ি

সকাল বেলায় অবনী চাকর পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়াছে, অমনি বাহির হইতে হেঁড়ে গলায় ডাক আসিল, “অবনী, বাড়ী আছ হে?”

—“কে, স্বর্ণ নাকি? আরে এস, এস, বাড়ীর ভেতরে এস।”

মিনিট-খানিক পরেই স্বর্ণেন্দু কুতো মস্ করিতে-করিতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিল।

অবনী চাকরকে আর-এক পেয়ালা চা

আনিতে হকুম দিয়া স্বর্ণেন্দুকে বলিল, “হাঁহে, এ ক-দিন ভোজবাজির মত হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে বলত? একেবারে এ-মুখে হত-নি বড় যে?”

স্বর্ণেন্দু একসঙ্গে চোখ-মুখ-নাথ কুঁচকাইয়া কহিল, “আরে রাম রাম, সে কথা আর বল কেন? তোমাদের ঐ জয়ন্ত ছোঁড়াটা যে শুকনো বাশের মত এমন নীরস, তা কি ছাই আগে জানুহুম? সে শাসিয়ে এসেছে, আমাকে ধরতে পারলে দেখে নেবে—অর্থাৎ, আমাকে যত-খুসি ঘৃষ-চড় মারতে একটুও কমর করবে না! জানই ত, গায়ের জোরের জন্তে আমি কখনই বিখ্যাত নই—সুতরাং মুষ্টি-বৃষ্টি থেকে আত্ম-রক্ষা করতে হ’লে অদৃশ্য হওয়া ছাড়া আমার পক্ষে গতিরত্থা! তাই এ-পাড়ায় আসি-নে আর! এতদিনে বোধ হয় তার রাগ পড়ে গেছে—কি বল?”

—অবনীর চোখদুটোর ভাব এমনধারা হইয়া গেল, যে, তার সঙ্গে অনায়াসে খুব বড়বড় ছানাবড়ার তুলনা করা যাইতে পারে! আশ্চর্য্য স্বরে সে বলিয়া উঠিল—“জয়ন্ত তোমাকে মারবে বলেছে! কেন হে?”

—“সে কথা পরে হবে-অখন, আগে শুদ্ধিকার, অর্থাৎ জগৎবাবুর খবর কি বল দেখি শুনি! জয়ন্ত এখনো সেখানে ঘাওয়া-আসা করে নাকি?”

—“হঠাৎ তুমি এটা জানতে চাইছ কেন?”

—“কারণ আছে, বল না।”

—“দেখ স্বর্ণ, ব্যাপারটা যে কি, স্পষ্ট সব শুনি-নি—তলিয়েও বুঝি-নি। তবে

জগৎবাবু একদিন ভদ্রানক ফাপা হয়ে একঘর লোকের সম্মুখেই জয়ন্তকে বাচ্ছে-তাই অপমান করে’ একরকম তাড়িয়েই দিয়েছেন। তাঁর কথাবার্তায় বুঝলুম, জয়ন্তের চরিত্র নাকি ভালো নয়।”—এই বলিয়া অবনী সেদিনকার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া, টেবিলের উপরে পা-দুটো তুলিয়া দিয়া স্বর্ণেন্দু দু-পাটি দাঁত বাতির করিয়া হাসিতে-হাসিতে সমস্ত ব্যাপারটা শুনতে লাগিল। তাহার তন্ময় মুখ দেখিয়া বোধ হয়, জয়ন্তের দুর্দশার কাহিনীটা তাহার কাণে যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত মধুবৃষ্টি করিতেছে!

অবনী চায়ের পেয়ালাটি শেষ-চুমুকে নিঃশেষ করিয়া একদিকে সরাইয়া রাখিয়া, ক্রমালে মুখ মুছিতে-মুছিতে বলিল, “সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন জয়ন্তের মুখ দেখে আমার ভাই প্রথমটা একটু হুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তুমি ত জানই, আমি সকলকেই ক্ষমা করতে পারি—কেবল চরিত্রহীনকে নয়। জয়ন্ত যে ভেতরে-ভেতরে এমন ডুবে-ডুবে জল খায় আমি তা কখনো কল্পনাও করি-নি।”

ঠোঁট টিপিয়া একটু রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, “হুর্নীতি হুর্নীতি করে’ আঁৎকে ধোঁয়া, তোমার চিরকেলে পাগলামী। ঐজন্তেই তোমার সঙ্গে আমার সব-জায়গায় বনে না!”

অবনী বিরক্ত স্বরে বলিল, “না-বনে না বনবে! ওটা আমার পাগলামী নয়—ওটা আমার প্রিন্সিপল্‌”

—“বাক, বাজে তক নিয়ে খামকা মাথা গরম করতে চাই না।”

—“হ্যা, তাই ভালো। তোমার মত আমার মত দুটি সরল রেখার মত; যতই টানাটানি করবে ততই বেড়ে যাবে, কিন্তু মিলবে না কিছুতেই।”

—“তাহলে ও অসাধাসাধনের চেষ্টা করে লাভ নেই। আচ্ছা, জয়ন্ত সেদিন নিজের পক্ষ-সমর্থন করে কিছু বলে-নি?”

—“বল্লে, সে নির্দোষ। আরো কি সব বলতে যাচ্ছিল কিন্তু জগৎবাবু তাকে আর-কিছু বলতে অবকাশ দিলেন না।”

—“তবে আর কি, তোমার ইন্দুলেখা-লাভের পথ এবারে নিশ্চয়ক হ'ল।”

অবনী একটুও আনন্দের ভাব না দেখাইয়া, কেমন হতাশ স্বরে বলিল,—  
“কিছুমাত্র হয়-নি! ইন্দুলেখার মন খারাপ বলে জগৎবাবু তাকে নিয়ে দেওঘরে চলে গেছেন। যাবার আগে আমি আর-একবার বিবাহের কথা তুলেছিলুম, কিন্তু জগৎবাবু স্পষ্টই জবাব দিলেন ইন্দুলেখা আমাকে পছন্দ করে না। দেখ দেখি স্বর্ণ, আমাকে ইন্দুর পছন্দ হোলো না—তার পছন্দ হোলো কিনা ঐ দুশ্চরিত্র জয়ন্তকে! জীলোকের মর্শ্ব বোঝা ভার।”

স্বর্ণেন্দু টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলিয়া লইয়া তার পছন্দাদিক দিয়া কাগ খুঁটিতে-খুঁটিতে, পরম্ আরাগে চোখদুটি স্তিমিত করিয়া বলিল, “তাহলে জয়ন্তের সঙ্গে ইন্দুলেখার বিবাহ না হ'লেও তোমার আশা-ভরসা একেবারে ফুরা?”

—“কাজেই। আমি আর ও-কথা নিয়ে

মিছে ভেবে মরতে প্রস্তুত নই। বা অসম্ভব—তা অসম্ভব।”

—“তা যদি হয় তবে আমার আর কোন হাত নেই। জয়ন্ত তোমার পথের কাটা হয়েছিল, আমি অনেক ফন্দি এঁটে তাকে সারিয়ে দিলাম। কিন্তু ফন্দি এঁটে তোমার ইন্দুর মন-ফেরানো ও আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না!—জীলোকের প্রেম হচ্ছে দামোদরের বস্তার মত;—বয়েছ অবনী, সে একবার বীধ ভাঙলে সুপথ-কুপথ কিছুই বাছে না—যেদিকে চলেছে সেদিক থেকে আর কোনমতেই ফেরে না! আমি বেশ বুঝতে পারছি, জগৎবাবুর বাড়ী থেকে জয়ন্তকে আমি বিদায় করেছি বটে, কিন্তু ইন্দুর মন থেকে সে এখনো বিদায় হয়-নি!”

বোকার মত হাঁ-করিয়া স্বর্ণেন্দুর মুখের দিকে চাইিয়া থাকিয়া অবনী বিস্মিত স্বরে বলিল, “কী পাগলের মত বক্ছ!”

—“অথাৎ, আমিই কৌশল করে জগৎবাবুকে চাক্ষুষ প্রমাণ দিমেছি যে, জয়ন্ত লোকটা বাইরে সাধু, কিন্তু ভিতরে ভণ্ড।”

চেয়ারখানা টানিয়া স্বর্ণেন্দুর কাছ-ঘেঁষিয়া বসিয়া অবনী কৌতূহলের সহিত বলিল, “আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি!”

স্বর্ণেন্দু খানিক ইতস্তত করিয়া বলিল, “তুমি যে-রকম নীতিবাগীশ, তাতে সত্য কথা তোমাকে খুলে বলতে আমার ভরসা হচ্ছে না। উণ্টে হয়ত শেষটা আমাকেই ছুবে বসবে।”

অবনী ব্যস্ত, জয়ন্তের বিরুদ্ধে স্বর্ণেন্দু কি-একটা ষড়যন্ত্র করিয়াছে। বিন্দিত কৌতূহলে সে বলিল, “স্বর্ণ, তোমার এ

লুকাচুরি আমার ভালো লাগছে না ভাই।  
স্পষ্ট করে' সব খুঁজে বল।”

বলিবার জন্য স্বর্ণেন্দুরও পেট কাঁপিয়া উঠিতেছিল; আসল কথা ঢাকিয়া রাখিলে সেযে কতবড় একজন সেয়ানা বুদ্ধিমত্তা লোক সেটাও যে ঢাকা থাকিয়া যায়! অতএব সে আর-কোন ইতস্তত না-করিয়া সেদিনকার সমস্ত ঘটনা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল।

অবনীর মুখ শুনিতে-শুনিতে ক্রমেই গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত শুনিয়া সে খানিকক্ষণ মাথা নীচু করিয়া, স্তম্ভিতের মত শুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর অত্যন্ত ঝাঁঝালো স্বরে বলিল, “স্বর্ণ, এ কাজটা গহিত হয়েছে। এতে তোমার বুদ্ধির চেয়ে বোকামির পরিচয়ই বেশী করে’ পাওয়া যাচ্ছে! কেননা, তুমি কি ভাবছ জয়ন্ত এতবড় মিথ্যা অপবাদটা মুখ বুঁজে মাথা পেতে নেবে? সে যখন তোমার নাম করে’ আসল ব্যাপারটা জগৎবাবুর কাছে খুলে বলবে, তখন?”

—“স্পষ্টই বল, আমি এর বিন্দুবিবর্গও জানিনা। এমন-কি হুসনা-বাইকেও যদি আনতে হয়, চাইকি তাও আনব। তাকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি। বাইজী এসে সাক্ষ্য বলবে, জয়ন্ত হামেসাই তার বাড়ীতে গিয়ে মদটুকু খায়, গান-বাজনা শোনে। আরো বলবে, সে আমাকে কখনো চক্ষেও দেখে-নি।”

অবনী একেবারে ধ হইয়া গেল। তারপর চোখ পাকাইয়া বলিল, “উঃ, এমন ভয়ঙ্কর মিথ্যাকথা সাক্ষাতে তোমার বুদ্ধ একটুও কাঁপবে না?”

স্বর্ণেন্দু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “মিথ্যাকে তোমরা বতটা ভয়ানক বলে কল্পনা কর, মিথ্যার আসল রূপ ততটা ভয়ানক নয় হে! সত্য ত পঙ্ক, দুর্বল,—জগতে মিথ্যার মত কার্য্যকর আর কি আছে?”

স্বর্ণেন্দুর একথানা হাত ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিয়া অবনী ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, “খামো, খামো! তোমার এ সম্মতানী দার্শনিকতার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। জয়ন্তকে আমরা ভালো না-বাসলেও ঈর্ষাকরণে তার ওপরে এমন অপবাদ দেওয়াতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। যদি আসল ব্যাপারটা কোনগতিকে জাহির হয়ে যায়, তাহলে তোমার সঙ্গে আমাকেও জড়িয়ে পড়তে হবে। তখন সমাজে আমি যে আর মুখ দেখাতে পারব না!”

স্বর্ণেন্দু ব্যাজার হইয়া মুখ বাকাইয়া বলিল, “এইজন্তেই তোমাকে ত আমি কিছু বলতে চাইছিলুম না। জয়ন্ত আমাদের কি-রকম ঘৃণা আর তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করত, সে-সব এর-মধ্যে ভুলে গেলে নাকি?”

অবনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “জয়ন্ত হয়ত তোমাকেই ঘৃণা করত। আমার সঙ্গে তার মতে মিলত না,—এই পর্য্যন্ত।”

স্বর্ণেন্দু ব্যজের স্বরে বলিল, “খার ইন্দু-লেখাকে বিবাহ করে’ সে তোমার মুখের গ্রাস যে কেড়ে নিতে চেয়েছিল, সেটাও বুঝি কিছু নয়? অবনী, তোমার সেদিনকার রাগ আমি এখনো ভুলি-নি, বুঝলে?”

—“এইটুকুর জন্তে একজন সৎলোককে মিথ্যা কথা করে’ অসৎ বলে প্রতিপন্ন করতে

হবে! ~~তোমার~~ মত আমি এখনো ততটা পাশগু হ'তে পারি-নি।”

—“সং আর অসং একটা কথার কথা! যারা সং, তারা কখনো অসং হবার অবকাশ পায়-নি বলেই সং।”

—“যাহ বল আর যাই কর, এ-ব্যাপারে আমি নেই। পিছল পথে চলে শেষটা যদি আছাড় খাই, তখন আমাকে তুলবে কে? ... উঃ, এ ব্যাপারে আমি নেই!”

—“তা না থাকো, না থাকবে! কিন্তু তোমার মুখটা অস্ত্র বন্ধ রেখ।”

—“যখন সব শুনেছি তখন আমি মুখও বন্ধ রাখতে পারি না। শেষটা তোমার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়ি, আর জয়ন্ত-বেচারার ঘাড়ে যে কলঙ্কের বোঝা চেপেছে সেইটে আমার ঘাড়েই এসে চাপুক আর কি! না স্বর্ণ, সে-সব হচ্ছে না—”

বিষম রাগে স্বর্ণেন্দুর কটা মুখখানা লাল হইয়া উঠিল -চোখছটো তাঁটার মত ঘুরিতে লাগিল। ঠোঁট কামড়াইয়া টোবলের উপরে ধুম-কারিয়া একটা খুঁসি মারিয়া সে চ্যাচাইয়া বলিল, “তুমি এমন কাপুরুষ? থিক্!”

অবনী তাহার রাগ দেখিয়া ক্রক্ষেপও কারল না; দৃঢ়স্বরে বলিল, “হীনীতি আর দুর্নামের সম্মুখে আমি চিরকালই এমনি কাপুরুষ থাকুব! হন্দুলেবার সঙ্গে যাতে আমার বিবাহ হয়, তুমি সেইজন্তে সাহায্য করবে বলে ভরসা দিয়াছিলে! এরই নাম তোমার সাহায্য করা? কা ভয়ানক! তোমার মত বন্ধুর হাত থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন!”

স্বর্ণেন্দু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টিটকারি দিয়া বলিল, “যার জন্তে চুরি কারি সেই বলে চোর।”

—“স্বর্ণ, তুমি যদি চুরি করেই থাক, সে আমার জন্তে কর-নি! তোমাকে আমি বিলক্ষণ জানি, জয়ন্তের ওপরে তোমার রাগ আছে বলেই তুমি এ-কাণ্ড করেছ! যাক্—এইবেলা কিছুদিনের জন্তে কল্‌কাতা থেকে মানে-মানে সরে পড়! আমি সব কথা শীঘ্রই প্রকাশ করে' দেব—নইলে আমাকে গুরুতর পাপে পাপী হ'তে হবে।”

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

## বর্ণ-বিশ্লেষণ বা রাস্মি-বিশ্লেষণ

( Spectroscopy )

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট তারিখে যে সূর্যগ্রহণ হয়, তাহা বিজ্ঞান-জগতে এক নূতন তথ্য প্রচার করে। ঐ দিনে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হয়, এবং শুধু ভারতবর্ষ হইতেই তাহা দেখা গিয়াছিল। এখানে বলিয়া

রাখি যে পৃথিবীর কোন এক স্থান হইতে যদি পূর্ণ গ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে পৃথিবীর সর্বস্থান হইতেই যে পূর্ণগ্রহণ দেখা যাইবে, এমন নয়। সেইজন্য ঘটনা-স্থলটী ( ভারতবর্ষ ) বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

যতদিন বিজ্ঞানের আদর থাকিবে, যতদিন বিজ্ঞান গৌরব থাকিবে, ততদিন উক্ত সূর্য্য-গ্রহণ জগতের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিপিত থাকিবে। এই ঘটনা হইতে বিজ্ঞানের একটা নূতন দিক খুলিয়া গেল। বর্ণ-বিশ্লেষণ (Spectrum analysis) জন্মলাভ করিল। বর্ণ-বিশ্লেষণ হইতে জগতের যে কতখানি লাভ হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিকদের কাহারো অবদিত নহে। আমার মনে হয়, উক্ত সূর্য্যগ্রহণ-দিবসে বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী প্রথম কাজে লাগানো হইল; সেই সঙ্গে কত মৌলিক তথ্যও প্রচারিত হইল। আলোক-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বিজ্ঞানাগারে রশ্মি-নিরীক্ষণ যন্ত্রে (spectroscopy) নেত্র সংলগ্ন রাখিয়া তথ্যাবেষণ করিতে লাগিলেন। ধনীগণ তাঁহাদের সহায়তা করিলে মুক্ত-হস্ত হইলেন। বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানাগারে রশ্মি-নিরীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন; এবং সেই ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে নিত্য-নূতন তথ্যের আবিষ্কারে জগৎ মুগ্ধ হইল, নব-নব সত্য লাভ করিতে লাগিল।

পূর্ণগ্রহণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা নহে। কখনো কোথাও ‘কালে-ভদ্রে’ ঘটে। সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণকালে (total eclipse) রশ্মি-নিরীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে যে সকল মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, কেবলমাত্র দূর-বীক্ষণ সাহায্যে সেগুলির সন্ধান অসম্ভব। পূর্ণগ্রহণকালীন দৃগ্বিসয়গুলির গুণ ও ধর্ম্ম কেবলমাত্র রশ্মিনিরীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেই সম্যক্রূপে আলোচনা করা সম্ভব। ১৮৬৮ সালের পূর্ণগ্রহণ-প্রসূত ফলাফল অতি

চমকপ্রদ। পরবর্ত্তীতে এই অগ্ৰ-তারিখে উক্তর আমেরিকা হইতে আবার সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে আবার বৈজ্ঞানিকগণ রশ্মিনিরীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope) ব্যবহার করেন। এবার-কারি পরীক্ষালব্ধ ফলাফলও বিশেষ চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমেরিকায় লিপিবদ্ধ পরীক্ষা-ফলের সহিত ১৮৬৮ সালের ভারতে লিপিবদ্ধ ফলাফলের কোথাও প্রভেদ নাই। উভয় গ্রহণেরই ফল রশ্মি-নিরীক্ষণ যন্ত্রের উপর একইরূপ। উভয় গ্রহণের ফলাফল ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞান-পরিষদে বিচারার্থে প্রেরিত হয়। বিচারে বর্ণ-বিশ্লেষণের (Spectrum analysis) জয়-জয়কার পড়িয়া যায়। উপাদান-নিরূপণে বর্ণ-বিশ্লেষণ যে একটি সূক্ষ্ম প্রণালী - ইহাতে বৈজ্ঞানিক দিগের আর কোন সন্দেহ নাই। কাজেই উন্নত সমাজে একটা নূতন সাড়া পড়িল। সকলে এই অভিনব বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীতে বস্তুর উপাদান-নিরূপণে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক নূতন তথ্য প্রচারিত হইল। বহু যোজন দূরে অবস্থিত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতির উপাদান নির্ণীত হইতে লাগিল।

এমন চমককার বর্ণ বিশ্লেষণ-প্রণালীর একটা বিস্তারিত বিবরণ বাংলা ভাষায় নাই। একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে (prism) সূর্য্য-রশ্মি লাগিয়া অতি সুন্দর সাতরঙা ছবির সৃষ্টি করে; সেই সাতরঙা ছবির নাম বর্ণ-পুচ্ছ (spectrum)। সূর্য্য বা অন্যান্য জ্যোতিষ্ক-নিঃসৃত আলোক ‘সাদা চোখে’ এক-জাতীয় বলিয়াই মনে হয়।

সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের আলোক ‘আসল আলো’ বলিয়াই বিজ্ঞান-জগতে প্রসিদ্ধ; এবং প্রদীপ, বাতি, বিজলীবাতি (electric light) ইত্যাদি ‘নকল আলো’ বলিয়া পরিচিত। আসল আলো ও নকল আলোর বিভিন্নতা ‘সাদা চোখে’ ধরিতেই পারা যায় না। একটি উজ্জ্বল, অপরটি উজ্জ্বলতর; একটি লাল, অপরটি নীল,— এইরূপে তাহাদের মধ্যে ‘সাদা চোখে’ মাত্রা ও বর্ণবোধ ব্যতীত আর কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু ত্রিশিরা (prism) কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে উক্ত আলোগুলি অশ্রু রূপে দেখা দেয়। সেগুলি অতি সুন্দর রঙিন ছবির আকার ধারণ করে। এই ছবির (বর্ণ-পুচ্ছের) আকার-প্রকার, গঠন উপাদান আলোকপ্রদ দ্রব্য-বিশেষের উপর নির্ভর করে। এক এক রকম পদার্থের এক এক রকম বর্ণ-পুচ্ছ। একের বর্ণ-পুচ্ছ অপরের বর্ণ-পুচ্ছের সহিত মেলে না; একের ছবি অপর ছবির অনুরূপ নয়। তাহা হইলেই দেখ, প্রত্যেক দ্রব্য গ্যাসে পরিণত হইয়া জ্যোতিষ্ক হইলে এবং সেই জ্যোতি ত্রিশিরা কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক দ্রব্যের এক একটি বিশিষ্ট রঙিন ছবি বা বর্ণ-পুচ্ছ (Spectrum) আছে। এই বর্ণ-পুচ্ছ-পর্য্যবেক্ষণে তাহাঙ্গিকে চিনিতে পারা যায়। আশ্চর্য্য ব্যাপার! সাদা আলো ত্রিশিরা কাচের মধ্যে গিয়া মনভুলানো রঙিন ছবিতে পরিণত হইল! যেমন তেমন রঙিন নয়, সে এক বিচিত্র লীলার লীলায়িত অপরূপ রঙিন! এক একটি জিনিষের

এক এক রকম রঙিন ছবি। জিনিষ চিনিবার এ কি কম সুবিধা! এমন চমৎকার উপায় আজ পর্য্যন্ত আর বাহির হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বর্ণ-পুচ্ছ (spectrum) যদি কাগজে চিত্রিত করিয়া রাখা যায় এবং যদি কোন অজ্ঞাত বস্তুর বর্ণ-পুচ্ছের সহিত জ্ঞাত বস্তুর বর্ণ-পুচ্ছের মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, যে ঐ জ্ঞাত বস্তুটি অজ্ঞাত বস্তুর উপাদান-রূপে তাহাতে বর্তমান। হহা কেই বলে, বর্ণ-বিশ্লেষণ প্রণালী। ইহা দ্বারা এইরূপে পদার্থের উপাদান স্থির হয়। রসায়ন-শাস্ত্রবিদগণও পদার্থের উপাদান নির্ণয় করেন বটে, কিন্তু সে অশ্রু উপায়ে—তাহাদের ফ্লাস্ক চাই, বকযন্ত্র (retort) চাই, টেষ্ট টিউব চাই, re-agent চাই, precipitate চাই, তবে তাঁহারা আসরে নামিবেন; জ্ঞানষ-টাকে ভাঙিবেন, চূরিবেন। কত বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের পর তবে সেটার উপাদান নির্ণীত হইবে। আর পদার্থ-বিদগণ অজ্ঞাত বস্তুটিকে জ্যোতিষ্ক করিয়া লহরা সেই জ্যোতি ত্রিশিরা কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া শুধু বর্ণ-পুচ্ছ-দৃষ্টেই তাহার উপাদান সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এখানেই উভয়ের পার্থক্য। তাই বলিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ-প্রণালী উড়াইয়া দিবার বস্তু নয়। যে রাসায়নিক প্রণালী এককাল বস্তুবিশ্লেষণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যে প্রণালী এষাবৎকাল বস্তু-বিশ্লেষণে ও সংশ্লেষণে সকল নিপুণ হস্তে কত কত সুন্দর মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার



করিয়াছে, তাহাকে ঘণার চক্ষে দেখা  
নির্কোষের কাজ। ইহার রাজ্যও বহুদূর-  
ব্যাপী। ইহার শিষ্য-সংখ্যাও অল্প নহে।

বর্ণ-বিশ্লেষণ বস্তুকে বিশ্লেষ করিতে পারে  
না এবং বস্তুদ্বয়-মধ্যে সংশ্লেষণ-সাধনেও  
অক্ষম। ইহা সজ্ঞাত বিরাট বাহ্যে অকৃতো-  
ভয়ে প্রবেশ করিয়া উপাদানের সন্ধান  
আনিয়া দেয় মাত্র। তার পর রসায়ণবিদ  
তাঁহার সৈন্ত-সামন্ত লইয়া নূতন রাজ্য-  
স্থাপনে অগ্রসর হন। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে  
বিরাট রাজ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ঐঙ্গিত  
অমূল্য রত্নগুলি তিনি আচরণ করেন।  
বর্ণ বিশ্লেষণকে কত সতর্কতার সহিত কত  
সূক্ষ্মভাবে কাজ করিতে হইয়াছে, সে বিষয়ে  
চিন্তা করিতে গেলেও শরীর রোমাঞ্চিত  
হয়। যখন রাসায়নিকের নিক্তি, পদার্থ-  
বিদের অনুবীক্ষণ পদার্থের নূতন উপাদান-  
নির্ধারণে অপারগ হইয়া বিমর্ষচিত্তে করতল-  
লগ্ন কপোলে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়ে,  
তখন রঙিনবসনা বর্ণ-বিশ্লেষণ-সুন্দরী স্মিত  
মুখে আসিয়া নব উপাদানের অমোঘ সন্ধান-  
দানে তাহার বিমর্ষচিত্তে হর্ষোৎপাদন করিয়া  
হুর্কল চিত্তকে শত হস্তীর বলে বলী-  
করিয়৷ আবার কক্ষে নিযুক্ত করে।

এক কাক্সা লবণকে ১৬,০০০ সমভাগে  
ভাগ করা যাক; ইহার এক ভাগকে  
মোটামুটি এক মিলিগ্রাম বলিব। রসায়ন-  
বিদ তাঁহার অতি-সূক্ষ্ম নিক্তির সাহায্যে  
অতিকষ্টে এক মিলিগ্রামের ওজন স্থির  
করিতে পারেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা  
ক্ষুদ্র বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞাপনে তিনি অক্ষম।  
সুধু তাহাই নয়। লবণ সোডিয়ম ও

ক্লোরিনে পণ্ডিত স্তম্ভরূপ এক মিলিগ্রাম  
লবণের মধ্যেও সোডিয়ম ও ক্লোরিন আছে।  
এক মিলিগ্রাম লবণের মধ্যে যে সোডিয়ম  
আছে, কোনো রাসায়নিক উপায়ে তাহা  
ধরিবার ক্ষমতা রসায়ন-বিদের নাই। তাঁহার  
বল-বুদ্ধি সব এইখানেই শেষ। এখন দেখা  
যাক, পদার্থবিদ কি করেন। সেই এক  
মিলিগ্রাম লবণকে তিন লক্ষ সমভাগে তিনি  
ভাগ করেন। এক-একভাগে একটি অতি  
সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র কণা পড়িল। এই ক্ষুদ্র  
কণার মধ্যে যে সোডিয়ম আছে, বর্ণ-বিশ্লেষণ-  
সাহায্যে পদার্থবিদ সেই সোডিয়মের অস্তিত্ব  
বাহির করিয়া দিবেন।

পদার্থের উপাদান-নিরূপণে রাসায়নিক  
প্রণালীকে স্থূল ও বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীকে  
সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে। এত সূক্ষ্ম প্রণালীর  
উদ্ভবে বৃথগণের মনে হইয়াছিল বুঝি বা  
নূতন মূল পদার্থের আবিষ্কার হইবে। যে  
সকল মূল পদার্থ জগতে বিরলভাবে ছড়ানো  
আছে, অথবা যে-সকল মূল পদার্থের বস্তুগত  
বিশিষ্টতা ও কোন জাত দ্রব্যের বিশিষ্টতার  
মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য, সে সকল মূল  
পদার্থ রাসায়নিক প্রণালীর স্থূলতা হেতু  
এতদিন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বর্ণ-  
বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা হেতু সেই সকল মূল  
পদার্থের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। ফলে  
তাহাই ঘটিল। অসুমান সত্যে পরিণত হইল।  
নূতন মূল পদার্থের সন্ধান মিলিল।

হিডেলবার্গ কলেজের অধ্যাপকদ্বয় বুনসেন  
ও কিরুফ (Bunsen, Kirchhoff) বর্ণ-  
বিশ্লেষণ-প্রণালীর জন্মদাতা। উক্ত পণ্ডিত-  
দ্বয়ের দ্বারাই ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এতৎ-

প্রচলিত ধারণা হইতে ভিন্ন। তাঁহাদের অভিনব রশ্মি-নিরীক্ষাচক-যন্ত্রের সাহায্যে (Spectroscope) বিজ্ঞানাগারে মনোনিবেশ পূর্বক তাঁহারা বর্ণ-বিশ্লেষণ-কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইল। দুইটি নূতন ধাতুর আবিষ্কার হইল। এই আবিষ্কারে তাঁহারা মরু জগতে অমরত্ব লাভ করিলেন। এই নূতন আবিষ্কৃত ধাতুদ্বয়ের নাম কেসিয়াম ও রুবিডিয়াম (Caesium and Rubidium)। কিছুকাল পরে এই বর্ণ-বিশ্লেষণ-দ্বারা থেলিয়াম ও ইন্ডিয়াম নামক (Thalium and Indium) আর দুইটি ধাতু আবিষ্কৃত হয়।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নক্ষেত্রে বর্ণ-বিশ্লেষণ অদ্বিতীয় লীলা দেখাইয়াছে বটে। কিন্তু জ্যোতিষে ইহার কাণ্ড আরও অদ্বিতীয় চমকপ্রদ। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-বিধিবলে (Newton's Law of gravitation) শূন্যস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলার গতিবিধি, আবর্তন-পথ পরস্পরের দূরত্ব স্থির করিতে পারা যায়; এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক ঘটনা—জোয়ার-ভাটা ও গ্রহণ-কাল—নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। সেই মাধ্যাকর্ষণই আবার মানবকে পৃথিবীর সহিত অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কাজেই পৃথিবী ছাড়িয়া মানুষের শূন্যে উঠিবার শক্তি নাই। তবে কাহার সাহায্যে বহু যোজন অন্তরে অবস্থিত গ্রহ নক্ষত্রের সংবাদ মানুষ সংগ্রহ করিবে? কোন্ এরোপ্লেনে চড়িয়া মানুষ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর খোঁজ-খবর লইবে? আলো এ দোতাকার্য সাধন করে। আলোর পুষ্পক

রথে চড়িয়া মানুষ এ বিশ্বজগতের সংবাদ সংগ্রহ করে। আলোক-পরী উড়িয়া আসিয়া গ্রহ-উপগ্রহের অস্তিত্ব, গঠন-উপাদান ও আকার-প্রকারের পরিচয় দেয়। গ্রহ-উপগ্রহ-নিঃসৃত আলোকের বর্ণ-বিশ্লেষণই শূন্য-যোজনে স্থিত গ্রহ উপগ্রহে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। মানব এই বর্ণ-বিশ্লেষণ-সোপান বহিয়াই তারকাবলীর রাসায়নিক গঠন ও বাহ্যিক আকার-প্রকারের পরিচয় পায়। বর্ণ-বিশ্লেষণ আবিষ্কারের পূর্বে কেবলমাত্র দূরবীক্ষণের সাহায্যেই তারকাবলীর পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা হইত। কিন্তু এই চেষ্টাপ্রসূত ফল আশারূপ হয় নাই। কেবলমাত্র তাহাদের আকার, আকারের পারমাণ ৭ বর্ণনিরূপণ ব্যতীত আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সুতরাং দূরবীক্ষণ-প্রণালী জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর পূর্ণ তথ্য-নিরূপণে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল।

১৮৫২ সালে বর্ণ-বিশ্লেষণকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি-কল্পে আস্থান ~~কল্প~~ হইয়াছে। বাণী-সন্নিবি, রঙিন-বসনা বর্ণবিশ্লেষণ-মুন্দরী সুধীবৃন্দের প্রাণের আহ্বানে প্রীত হইয়া আসরে নামিয়া শ্মিত মুখে জ্যোতিষশাস্ত্রের যে কি মহৎ উন্নতি-সাধনে বৃথবন্দকে অমুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহা শত মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

ত্রিশিখা কচের সাহায্যে (prism) সূর্য-রশ্মির মূল উপাদানগুলি বিশ্লেষ করিতে পারা যায়। পার্শ্বিক জ্যোতির্শ্রম পদার্থের বর্ণ-বিশ্লেষণের \* জায় সূর্যরশ্মিরও বর্ণ-

\* বর্ণ-বিশ্লেষণের পরিবর্তে, জ্যোতি-বিশ্লেষণ বা রশ্মি-বিশ্লেষণ, কোন একটি অধিকতর অর্ণ-বোধক, সুধীবৃন্দের নিকট তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। লেখক

বিশ্লেষণ সম্ভব। সুখ্য সূর্য্যরশ্মি কেন, গ্রহ-উপগ্রহ-নিঃসৃত রশ্মি, অচঞ্চল তারকা-রশ্মি (fixed stars), ধূমকেতু-রশ্মি, নেবুলী হইতে প্রবাহিত রশ্মিরও বর্ণ-বিশ্লেষণ সম্ভব। যাবতীয় পার্থিব মূল পদার্থের বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী-লব্ধ বর্ণ-পুঙ্খ (spectrum) আমাদের বেশ পরিচিত। ধরা যাক্ সূর্য্যরশ্মি-প্রসূত বর্ণ-পুঙ্খ অঙ্কিত করা হইল। ইহার সহিত পার্থিব বস্তুর বর্ণ-পুঙ্খের তুলনায় যদি জানিতে পারা যায় যে কতকগুলি পার্থিব মূল পদার্থের বর্ণ-পুঙ্খের সহিত সূর্য্যরশ্মি-প্রসূত বর্ণ-পুঙ্খের সম্পূর্ণ মিল আছে, তাহা হইলে নিঃসন্দিগ্ধ চিন্তে বলিব যে ঐ-সকল মূল পদার্থ সূর্য্যের মধ্যেও অবস্থিত। এইরূপে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপাদান অভাস্তরূপে স্থির হইয়াছে। বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী সাধারণতঃ কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় ও তাহার উপকারিতা কি—সেটা এখানে মোটামুটি ভাবে বলা হইল। প্রত্যেক পদার্থের

বস্তুগত বর্ণ-পুঙ্খ প্রসূত করাই প্রথম সোপান। এই প্রথম সোপান-নিৰ্ম্মাণের জন্ত পদার্থটিকে আলোকময় করিয়া লইতে হইবে। সুখ্য যেমন-তেমন আলোকময় করিলে চলিবে না—এমন করিয়া আলোকময় করিতে হইবে যেন তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে আলোক নিঃসৃত হইয়া বর্ণ-পুঙ্খ গঠিত সমর্থ হয়। কালো জিনিষ বর্ণ-বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হইতে পারে না। যদি কালো জিনিষকে বর্ণ-বিশ্লেষণে ব্যবহার করিতে হয়, তবে তাহাকে প্রথমে জ্যোতির্শ্ময় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর তাহার জ্যোতি বিশ্লেষণ করিয়া বর্ণ-পুঙ্খ-প্রণয়নে সহজেই সক্ষম হইব। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, বর্ণ-পুঙ্খ-প্রণয়নের বিস্তারিত বিবরণ জানিবার পূর্বে প্রত্যেক বস্তুকে কি প্রকারে আলোকময় করা যাইতে পারে, সে-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। বারাস্তরে তাহার বিস্তারিত আলোচনাব ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

## নেপালের কথা

সমর-ক্ষেত্রে নেপালী বীরের সাহস ও মনোভীকতা জগৎ-বিখ্যাত। নেপালী হিন্দু, আমরাও হিন্দু—কাজেই নেপালীর বীরত্বের গর্ব্ব আমরাও মুখে করিয়া থাকি। ঘরের বড় বেশী দূরে নহে—অথচ নেপালের বৃত্তান্ত

আমরা কগছনে জানি? টডের কল্যাণে রাজপুত্রান্নার অলি-গলির বার্তা আমাদের নেহাৎ অবিদিত নয়। টডের রাজস্থান-অবলম্বনে নট্ট্যকার ৯৭টা-রচনা করিতেছেন, কবি কাব্য লিখিতেছেন, চরিত-কার কীর্ত্তি-

\* নেপালী ছত্রি। শ্রীযুক্ত যুক্তমদেব যুগোপাধ্যায় প্রণীত। চুঁচুড়া যুগোদয় ব্রহ্মে মুদ্রিত ও শ্রীকুমারদেব যুগোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

কাহিনী পি-বদ্ধ করিতেছেন, চিত্রকর ছবি আঁকিতেছেন, কিন্তু নেপালের কথা, কৈ, কাহারো মুখে বড়-একটা ত স্তব্ধ বায় না।

“নেপালী ছত্রি” গ্রন্থকার বহু সন্ধানে নেপালের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে আজ তাহা উপহার দিয়াছেন। তাহার এ উপহার বাঙালী সাদরে গ্রহণ করিবে; তাহার এ উপহারের অল্প বঙ্গসাহিত্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

নেপালের ঐতিহাসিক কেবলমাত্র বাটাকাটি, নারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপ্লবের লোমহর্ষণ কাহিনীতে পরিপূর্ণ নহে। নেপালের

তরাই প্রচুর নব-বস্তু বাড়া, সন্দেহ নাই, তবু তাহারই মধ্য দিয়া এই অসম-সাহসিক নিষ্ঠুর জাতির অপূর্ণ স্বদেশপ্রেম, অসাধারণ রাজভক্তি, অসীম ধর্মনিষ্ঠা ও রাজনৈতিকতা এমনই মহিমায় উজ্জ্বল বর্ণে কুটিয়া আছে যে তাহা দেখিয়া শঙ্কায় শির নত হয়। দেশের দারিদ্র্য বিগ্রহ-বিপ্লবের ফাঁক দিয়া নেপালী জাতির যে সভ্যতাব আদর্শ আমাদের চোখে পড়ে, তাহা দেখিয়া প্রকৃতই বলিতে হয়, There is a civilisation without furniture.

মঙ্গলমান চিত্রের আদিকার কারনে

চিতোর-রাজবংশীয় অগ্ৰ-বাম নগর ত্যাগ করেন; তাহার দুই পুত্র ঝাঙ্গা ও মিকা হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। ঈশ্বরাজী ১৪৯৫ খৃঃাব্দে ভারকোট এলাকায় খিলিম নামক স্থানে জঙ্গল কাটিয়া তাঁহারা আবাদের কাজে প্রবৃত্ত হন; ক্রমে তাহদেরই একজন নয়-কোটের ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করেন। এই বংশেরই দ্রব্যসাহ নামে একজন গোষ্ঠী নগর অধিকার করিয়া গুর্গা রাজ্যের পত্তন করেন (১৫৫৯ খৃঃাব্দ)। ইহারই বংশে অমৃতরামের



পৃথ্বীনারায়ণ

৩৭তম পুরুষ পৃথ্বীনারায়ণের বীরত্বে বর্তমান নেপাল-রাজ্যের একচ্ছত্রীকরণ সম্পন্ন হয়।

১৭৪২ খৃঃাব্দে বারো বৎসর বয়সে পৃথ্বী-নারায়ণ গোখী রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই পৃথ্বীনারায়ণই পরে সমগ্র নেপাল রাজ্য অধিকার করেন। কাঠমান্ডুতে পৃথ্বীনারায়ণের রাজধানী স্থাপিত হয়। (১৭৬৮ খৃঃাব্দ)। নেপালের প্রাচীন রাজ্যগুলি ক্রমে ক্রমে পৃথ্বীনারায়ণের বশতা স্বীকার করে।

‘কাঠমান্ডু’ হইতে কাঠমান্ডুর নাম-করণ হইয়াছে। কাঠমান্ডু, ভাটগাঁও ও কাণ্ডিপুৰ এই তিনটি ছিল নেপালের প্রধান নগর। ইহারই উত্তর-পশ্চিম দিকে পদ্মত-শ্রেণীর অন্তরালে গোরক্ষ-নাথের মন্দির; এবং তাহা হইতেই নগরের নাম হইয়াছে গোখী। এই গোখী নগর হইতেই গুণী নামের উৎপত্তি: “ছত্রি” ব্দ “ক্ষত্রিয়ের” অপভ্রংশ মাত্র।

পৃথ্বীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহপ্রতাপ সা (১৭৭১—১৭৭৫ খৃঃাব্দ) বাকী হন; পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে রণবাহাদুর সা (১৭৭৮—১৮০৪ খৃঃাব্দ) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সিংহাসন-অধিরোহণের সময় রণবাহাদুর নাবালক ছিলেন; তাঁহার পিতৃবা বাহাদুর-সা রাজ্য-পরিচালনা করিতেন। বাহাদুর-সাই নেপালের প্রথম রাজমন্ত্রী। বাহাদুর-সা পৃথ্বীনারায়ণের পুত্র। ইহারই চেষ্টায় কাশ্মীরের প্রাপ্ত হইতে শিকিম পর্য্যন্ত নেপাল রাজ্য বিস্তার লাভ করে।

রণবাহাদুরের মাতা রাজেন্দ্রলক্ষ্মী বাহাদুর-সার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না; বাহাদুর-নার শক্তি ও জনপ্রিয়তায় রাজেন্দ্র-

লক্ষ্মীর মনে সৰ্বদা অশান্তি ছিল। তাঁহারই চক্রান্তে বাহাদুর সা দুইবার নির্যাসিত হন এবং পরে ১৭৯৩ খৃঃাব্দে রণবাহাদুর ছুতা ভুগিলেন, বাহাদুর সা রাজ্যের জরিপ করাইয়া রাজ্যের যে ব্যবস্থা করাইয়াছেন, তাহা লাভ জনক ও সম্ভব হইলেও ভূমি-জরিপের দ্বারা তিনি পরিণাম অপমান করিয়াছেন, অতএব এ মহাপাতকের শাস্তি, প্রাণদণ্ড! কাজেই বাহাদুর সা নিহত হইলেন।

এমন খামখেয়ালী রাজার ভাবিয়া ভাব হইতে পারে না। তাই আমরাও দেখি, রণবাহাদুর সার রাজ্য নানা অত্যাচার ও নিষ্ঠুর অপকর্মে পরিপূর্ণ। তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া দেশের লোক শেষে তাঁহাকে দেশ ত্যাগে বহিস্কৃত করিয়া তাঁহার চারি-বৎসর বয়স্ক পুত্র গির্জানযুদ্ধকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। গির্জান ১৮০৭ খৃঃাব্দে ভীমসেন খাপাকে রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা এবং প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতেই নেপালের রাজ-কার্য্য প্রকৃত পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর হস্তগত হয় এবং এই রাজ মন্ত্রীই ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় পেশওয়ার আয় নেপাল রাজ্যে সৰ্ব্বময় প্রভু হইয়া উঠেন। এই গির্জানযুদ্ধের রাজত্ব-কালেই ইংরাজের সহিত নেপালের যুদ্ধ হয়। দূরদর্শী ভীমসেন খাপা ঐ যুদ্ধের প্রতিকূলেই মত দিয়াছিলেন; কিন্তু সৈন্তগণ এবং সাধারণ প্রজা তখন এমনই বর্ণোন্মত্ত যে ভীমসেনের কথা তাহারা গ্রাহ্যই করিল না। ভীমসেনের কোশলেই যুদ্ধ শেষ ও সিংগৌলিতে ইংরাজের সহিত গুণার সন্ধি স্থাপিত হয়।

গির্জানথের মৃত্যু

পর (১৮১৭ খ্রিঃ-অব্দ)

তাহার পুত্র রাজেন্দ্র  
বিক্রম সা রাজ্যাভিষিক্ত  
হন এবং ভীমসেন খাপা  
ও রাজার বিমাতা মহা-  
বাণী ত্রিপুরাসুন্দরী এক-  
যোগে রাজ্য-পরিচালনা  
করেন। হাজার পুষ্পে  
রাজবাড়ী বড়বনের  
প্রধান আড্ডা ছিল  
বলিলেও অত্যাশ্চর্য নয় না।  
বাণী সপত্নী-পুত্রকে হত্যা  
করাইতেছে, মন্ত্রী সেনা-  
পতিকে হত্যাইতেছে,  
এমন কি বাণী রাজাকে  
সিংহাসন-চ্যুত করিবার  
জন্তও ফন্দি আঁটিতেছে,  
এমনই কদম্বা ব্যাপার;  
মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী ও



ভীমসেন খাপা

ভীমসেনের পরচালনা-কোশলে রাজবাড়ী  
হঠাৎ বড়বনের মূল ছাঁটিয়া দেওয়া হইল; --  
কোথাও এতটুকু গোপন অভিসন্ধি না চলে,  
সে বিষয়ে ভিতরে-বাহিরে তাকদুষ্টি রাখিলেন,  
মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী ও মহা ভীমসেন।  
বিশৃঙ্খল রাজ্যে শৃঙ্খলা আসিল; রাজ্যও  
শাসন-ব্যবস্থায় শ্রীমস্ত হইল। কিন্তু ১৮২  
খৃঃঅব্দে মহারাণীর মৃত্যু হইলে অন্তরে আবার  
সেই পুরাতন অনল জ্বলিয়া উঠিল। ভীমসেনের  
ভ্রাতা রণবীর সিং ভীমসেনের বিরুদ্ধে  
লাগাইয়া-ভাঙ্গাইয়া তরুণ রাজা রাজেন্দ্র  
বিক্রমের কাণভারি করিতে লাগিলেন;

মামুষের মন, কান-ভাঙ্গানিতে কয়দিন ঠিক  
থাকে? তরুণ রাজা শেষে নানাতাবে ভীম-  
সেনকে অপদস্থ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের  
ব্যবস্থাদি উল্টাইয়া দিয়া, তাহার নিযুক্ত  
কন্ঠচারীদিগকে তাড়াইয়াও ক্ষান্ত হইলেন  
না; শেষে মহারাণীর একবৎসর-বয়স্ক একটি  
পুত্র রোগে মারা গেলে রাজা অভিযোগ  
তুলিলেন, ভীমসেন খাপাই শিশুকে বিষ-  
প্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন। যেখানে প্রবল  
বড়বন, সাক্ষ্য প্রমাণের সেখানে অভাব হয়  
না। একেত্রে জুল দলিল-পত্রের সাহায্যে  
সাক্ষ্য-প্রমাণও খাড়া করা হইল এবং বিশ্বাসী

রাজভক্ত বৃদ্ধ মন্ত্রাকে দারুণ ষড়যন্ত্রেব ফলে  
বিশ্বাসঘাতকের কালো কালি গায়ে মাখিয়া  
কারাগারে বন্দী হইতে হইল। ফোভে  
অপমানে ভীমসেন পাশা কারাগারেই আশ্র-  
ণ গ্রহণ করেন। বঙ্গের রাজ্যদেশ তাঁহার  
মৃতদেহকে রাজপথে ফেলিয়া দিল, হিন্দুর শেষ  
সম্মান হইতেও বঞ্চিত করিল; এমন কি,  
সে মৃত-দেহ অবশিষ্ট কাচাকেও দাহ করিতে  
দেওয়া হইল না।

যতই শক্তিদর হোক, একটানা অত্যাচার  
বেশদিন কখনোই সহ্যে মাথা তুলিয়া  
থাকিতে পারে না। ফলে দাঁড়াইল  
এই, রাজ-হস্ত হইতে সকল ক্ষমতা আঁচরে  
মন্ত্রীহস্তে আসিয়া পৌঁছিল। মন্ত্রীর পদ  
লইয়াই এখন বাহা-কিছু মারামারি, কাটাকাটি  
ও ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, মহারাজাধিরাজ  
নিশ্চিণ্ড নির্লিপ্ত মহিমায় মুক্ বিগ্রহমূর্তির  
জায় সিংহাসন অধিকার করিয়া শুধু বসিয়া  
রাহিলেন।

ভীমসেনের মৃত্যুর পর রাজ-নিগ্রহ আবার  
সীমা অতিক্রম করিয়া চলিল। প্রথম  
মহারানীর মৃত্যু ঘটিলে প্রজাবা রব তুলিল,  
নিষ্ঠুর মহারাজই বিষ-প্রয়োগে তাহাকে হত্যা  
করিয়াছে। মহারাজ রেসিডেন্টকে গিয়া  
বলিলেন—এই মিথ্যা রব যে তুলিয়াছে,  
তুমিহাকে ধরিয়া আনা হোক—তাঁহার গায়ের  
চামড়া তুলিয়া তাহাতে লবণ ও তৈল ঘষা  
চাই। এ বঙ্গের প্রস্তাবে কেহ কর্ণপাত  
করে নাই বটে, কিন্তু ফল ফলিল।

উত্কর্ষ প্রজার দল ও সৈন্তগণ তখন  
দরবারে এক দরখাস্ত দাখিল করিল—ইহাই  
নেপালের Petition of Rights ( ৭.১২।

১৮৪২ )। দরবারকে সে দরখাস্ত  
করিতে হইল এবং কনিষ্ঠা মহারানী লক্ষ্মী  
দেবীর হস্তে রাজ্য-চালনার ভার পড়িল।

লক্ষ্মীদেবীর কর্তৃত্বাধীনে ফতেজঙ্গ নামে  
নাগ মন্ত্রী হইলেন; কাজ চালাইতে লাগিল,  
মহারানীর প্রিয়পাত্র প্রধান সেনাপতি গগন  
সিংহ। গগন সিংয়ের সহিত মহারানীর  
ঘনিষ্ঠতা ক্রমে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।  
শেষে এমন হইল যে এই ব্যাপারের  
কদর্যা আলোচনা মহারাজের কাণে আসিয়া  
আঘাত করিল। বৃদ্ধ রাজার আদেশে  
লাল ষা নীমক একব্যক্তি পূজা-রত  
গগন সিংকে জানালায় ঢাক দিয়া গুলি  
করিয়া মারিল (১৮৪২-১৮৪৩)। ওদিকে  
গগন সিংয়ের হত্যার কথা শুনিয়া মহারানী  
লক্ষ্মীদেবী প্রতিহিংসা-গ্রহণে উন্মত্ত হইয়া  
উঠিলেন। তিনি সমস্ত সর্দার ও কাম্যচারী-  
দিগকে ডাকাইয়া আনিলেন; এবং বাহাদের  
তিনি এই হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ  
করিলেন, তাঁহাদের সকলকেই হত্যা করিতে  
চাহিলেন। মন্ত্রী বিনা-বিচারে দণ্ড দিতে  
সম্মত হইলেন না—তখন ক্রোধোন্মত্ত লক্ষ্মী-  
দেবী সম্মুখে-দণ্ডায়মান সেনাপতি বীর-  
কিশোরের বক্ষে মুক্ত তরবারি বসাইয়া  
দিলেন। চকিতে বিষম বিপ্লব বাধিয়া গেল;  
ফতেজঙ্গ নিহত এবং জেনারেল অতিরাম  
আহত হইলেন। মহারানী উপর-তলায় গিয়া  
আদেশ দিলেন, “আমার শত্রুদিগকে নির্মূল  
কর।” তখন ভীষণ হত্যা-ক্রিয়া চলিল,  
চক্ষুর নিমেষে মৃতদেহে স্তূপ জমিয়া উঠিল।  
একত্রিশ জন প্রধান এবং কুড়িজন মধ্যবিদ  
সর্দার এই বিপ্লবে প্রাণ হারাইল।



নেপালের চাকরান বাজেন্দ্র

ফতেজঙ্গ নিহত হইলে অধিতীয় বাজ  
নাতিজ্ঞ জঙ্গ বাহাদুর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত  
হইলেন। তারপর রাজা ও রাণীতে বচসা  
বাধিত। লক্ষ্মীদেবী বলিলেন, “আমাব বড়  
ছেলেকে সিংহাসন দাও, নহিলে আরো ভীষণ  
বস্ত্রারক্তি ঘটবে।” মহারাণীকে অটল  
দেখিয়া মহারাজ বাগ করিয়া বোড়ায়  
চড়িয়া পাটন নগরের দিকে চলিয়া  
গেলেন। মহারাণী তখন জঙ্গবাহাদুরের  
নিকট যুবরাজ সুরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করাষ্টিয়া  
আপনার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব  
করিলেন; কিন্তু জঙ্গবাহাদুর তাহাতে সম্মত

হইলেন না। যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম পুণ্ড্র  
বাণীর আদেশে কারাকুদ্ধ হইয়াছিলেন; জঙ্গ-  
বাহাদুর এখন কারাকুদ্ধ যুবরাজকে গোপন-  
হত্যার হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে  
নিজের দুই ভ্রাতাকে তাঁহার পাহারায়  
নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে প্রত্যক্ষ  
ঠাঁচাদিগকে দেখিতে আসিতেন। মহারাণী  
দেখিলেন, জঙ্গবাহাদুরকে কোশলে তিনি  
বাগাইতে পারিলেন না, তখন অল্প উপায়  
অবলম্বন করিলেন—বীরপুঞ্জ বাশনিয়াং নামক  
এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, যুবরাজকে,  
মহারাজকে, এবং জঙ্গবাহাদুরকে কোশলে



একটু দাঁবে একটু সময়ে কোনমতে আনাটয়া সকলকে চত্যা কর। গগনসিংয়ের পুত্র উজ্জীর সিংহ এবং বিজলীরাজ নামে এক পণ্ডিত এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। নেপালের সৌভাগ্যক্রমে বিজলীরাজের চোখ কটিল। তিনি বুঝিলেন, এত বড় হত্যাকাণ্ডে রাজ্যের সমুদ্র ক্ষতি, অথচ ওদিকে লক্ষ্মীদেবীর পুত্রের রাজ্যলাভে শুধু ব্যক্তিগত লাভ ও সুখ। তখন তিনি জঙ্গবাহাদুরকে রাণীর অভিমান প্রকাশ করিয়া বলিলেন। জঙ্গবাহাদুর সতর্ক হইলেন। বীরধ্বজ রাণীর আদেশ জানাইয়া জঙ্গবাহাদুরকে ডাকিতে আসিলে তিনি বলিলেন, কাণ্ডাতঃ যখন বীরধ্বজই মন্ত্রিত্ব চালাইতেছেন, তখন আর এমন অবস্থায় জঙ্গবাহাদুরের সহিত মহারাণীর কোনো পরামর্শই চলিতে পারে না। জঙ্গবাহাদুরের দেহরায় বীরধ্বজ ভড়কাইয়া যেন পলায়ন গণিয়া দীত হইল। তখন জঙ্গবাহাদুরের ক্রোধে কাণ্ডাতঃ রাণী মার মার হাঠকৈ নিহত করিয়া রাণীকে ব

কুসংস্কারে কপা আঁচবে বলা হইল। অন্তরে জঙ্গবাহাদুরের হাতে রাণী সকল দিক বক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। জঙ্গবাহাদুর জমনি সশস্ত্র সৈন্যদল লইয়া রাজবাটী প্রবেশ করিলেন—চক্রাঙ্গ-কারীরা নিহত হইলে জঙ্গবাহাদুর মহারাণীকে জানাইলেন, যুবরাজের প্রতি হৃদয়ে যখন তিনি বিকল্প ভাব পোষণ করিতেছেন, তখন নেপালে আর তাঁহার থাকা হইতে পারে ন। মহারাণী নিরুপায় চিত্তে তীর্থ-দর্শনের ছুতা ধরিয়া নেপাল পরিত্যাগ করিলেন—যাইবার সময় অব্যবস্থিত-চিত্ত মহারাজকেও সঙ্গে লইতে



জঙ্গবাহাদুর

ছাড়িলেন না। জঙ্গবাহাদুরের একোশনে এক ভাষণ অন্তর্বিপ্লবে হাত হইতে নেপাল বক্ষা পাইল।

জঙ্গবাহাদুর অবশ্য বিতাড়িতা লক্ষ্মীদেবীর ও তাঁহার ছুই পুত্রের ভরণপোষণের জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন।

জঙ্গবাহাদুরের রাজ্য-পরিচালনা-কালে ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ হয়। জঙ্গবাহাদুর ইংরাজের সাহায্যের জন্ত দিল্লির গুর্গাসৈন্য প্রেরণ করেন।

গুর্গাসৈন্য আজিমগড় ও জোনপুর বক্ষার নিযুক্ত হয়। আজিমগড়ের নিকট একদল

বিদ্রোহীকে গুর্খাসৈন্য একদিনে পাঁচ মাইল কুচ করিয়া গিয়া আক্রমণ করে, এবং দশমিনিটের মধ্যে আজিমগড় ও জোনপুর বিদ্রোহ-মুক্ত হয়। তার পুর লক্ষ্মী-রক্ষাও গুর্খা সৈন্তের সাহায্যে সংসাধিত হয়। চান্দা ও সোহানপুরের বিদ্রোহীদলও গুর্খা-সৈন্তের হাতে পরাভব স্বীকার করে। তারপর গুর্খাসৈন্যই গোরখপুর, ফাইজাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দমন করে। গুর্খাসৈন্য এ সকল যুদ্ধেই 'কুকরি'মাত্র ভরসা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল। এই যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন, জঙ্গবাহাদুর ঞয়ং। বিদ্রোহদমনের পর তিনি ইংরাজের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া ১৮৫৭ খ্রীঃাব্দে বহু ভারতীয় তীর্থপর্যটনান্তে দেশে প্রত্যাগমন করেন।

লাহোরের রাণী বন্দিনী চান্দা কুয়র ছদ্মবেশে ইংরাজের কেজা ছাড়িয়া একেবারে নেপালে আসিয়া আশ্রয় লন। জঙ্গবাহাদুর তাঁহার পরিচয় জানিয়াও তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এ-সংবাদ পাইয়া রাণীকে চাহিয়া পাঠাইলেন—জঙ্গবাহাদুর বন্ধুত্বের খাতিরেও আশ্রিতা রমণীকে ইংরাজের হাতে সমর্পণ করিলেন না। জঙ্গবাহাদুর রাণীর বাসের জন্ত নিজেরই একখানি বাগান-বাড়ী ছাড়িয়া দেন এবং ছইজন বিশ্বাসী গুর্খা রমণীকে পাহারায় রাখেন, ব্রিটিশগভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে রাণীর সহিত বাহাতে কাহারো কোনরূপ পত্র-ব্যবহার না চলে, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবার জ্ঞতা। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এ বন্দোবস্তে স্ত্রীত হইলেন। জঙ্গবাহাদুর দরবার হইতে রাণীর জন্ত বরাদ্দ করিলেন, মাসিক

আটশত টাকা ভাতা এবং প্রত্যাহ চাল, ডাল প্রভৃতির সিধা।

জঙ্গবাহাদুর ১৮৫০ খৃঃাব্দে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সঙ্গে গিয়াছিল নয়জন গুর্খা অফিসার, একজন জ্যোতিষী বা কবি, একজন চিকিৎসক, একজন নেওয়ার জাতীয় চিত্রশিল্পী, একজন সুবাদার ও চারিজন হুপকার। জ্ঞাতীচ্যুত হইবার কথা উঠিলে জঙ্গবাহাদুর বলিয়াছিলেন, দোতা-কার্যের জন্ত চীনে ত গুর্খাকে নিতাই বাইতে হয়; সেখান হইতে ফিরিবার সময় গুর্খা কর্মচারীরা চিরদিন যেমন কাশীতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসে, ইংলণ্ডে গেলেও সেই ব্যবস্থা অনুসৃত হইবে।

১৮৫৬ খৃঃাব্দে নানারূপে উতাক্ত হইয়া জঙ্গবাহাদুর সহসা পদত্যাগ করেন। রাজ-গুরু বিজয়গুরু-প্রমুখ সম্ভ্রান্ত নেপালী সন্দেহেরা তাঁহাকে মদ্বিত্ব-গ্রহণের জন্ত বিস্তব অনুরোধ করেন। রাজগুরু রাজমুকুট অবধি তাঁহাকে ধারণ করিতে বলেন, কিন্তু জঙ্গবাহাদুর হাসিমুখে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, ওসব কিছুই তিনি করিবেন না; তবে শরীর সুস্থ হইলে রাজকার্য্য-পরিদর্শন করিবেন।

তাহার পর হইতে জঙ্গবাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত নীতির আদর্শেই নেপালরাজ্য পরিচালিত হইতেছে। তিনি একাধারে অসাধারণ রাজনীতিকুশল ও যোদ্ধা ছিলেন, নেপালের ইতিহাসে জঙ্গবাহাদুরের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার জ্ঞান তীক্ষ্ণবী সর্বকর্মপরায়ণ রাজপুরুষ, শুধু নেপালে কেন, সমগ্র জগতে খুব অল্পই জন্মিয়াছিলেন।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি হইতে নেপাল-ইতিহাসের কঙ্কালমাত্র আশ্রয় সঙ্কলন করিলাম।

এই যুদ্ধ-বিপ্লবের কাহিনীর সহিত নেপালীর বিশেষত্ব, গৌরব, এবং মহত্বের পরিচয়ও এ গ্রন্থে যথেষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। নেপালীর ধর্মপ্রবণতা এবং সরলতার কাহিনীও বিশেষ কোতূহলোদ্দীপক এবং তাহাতে নাটকীয় উপাদানও প্রচুর। এক ভ্রম বাহাদুরের আদর্শ চরিত্র লইয়াই তাহার দয়া-দাক্ষিণ্য, রাজনীতি-কুশলতা লইয়া কত নাটক, কত কাব্য, কত উপজ্ঞাসের সৃষ্টি হইতে পারে। এবং লিখিত হইলে সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহা অমূল্য সামগ্রীই হইবে। এ-দেশের কয়জন খবর রাখেন, হিমালয়েরই এক নিভৃত প্রান্তে এমন অসাধারণ মনুষ্যত্ব, অপূর্ণ ধা, অদম্য শক্তি ও বিরাট মহত্ব অলৌকিক মহিমায় বিকশিত হইয়াছিল!—পাশ্চাত্য জগতেও এমন চরিত্র কয়টা দেখা যায়? অথচ আমাদের অনেকের ধারণা নেপালে শুধু বর্ষের পশুবলে বলীয়ান দুর্ভিক্ষ গোঁয়ার গুণ্ণারই বাস, মনুষ্যত্বের সেখানে একান্ত অভাব।

গ্রন্থকার বিপুল জ্ঞানবসারে বাঙালীর কাছে নেপালের যে অপকল্প বার্তা শুনাইয়াছেন, বাঙালী তাহা শুনিয়া কৃতার্থ হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের রচনা ভালই,—ইতিহাসের কাহিনীটি সুশৃঙ্খল, সুবিস্তৃত—এবং অবাধ গতিতে সুদূর অতীত যুগ হইতে বর্তমানকাল অবধি সে ধারা অপূর্ণ লীলাভঙ্গীতে বহিয়া আসিয়াছে।

গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের দুইটি অনুরোধ আছে,—দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা ও কাগজ যেন চাকুরত করা হয়, কারণ এ গ্রন্থ অবহেলার বস্তু নহে। আমাদের দ্বিতীয় অনুরোধ, নেপালের রাজারাজড়ার কাহিনী ইহাতে পর্যাপ্ত আছে, সেই সঙ্গে প্রজাপুঞ্জের ঘরের কথা, তাহাদের সুখদুঃখের কাহিনী আরো প্রচুরভাবে সংগ্রহ করিয়া দিলে শুধু যে আমাদের কোতূহলই চরিতার্থ হইবে, তাহা নহে, গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

## স্বরলিপি

খানজা---দাদ্রা

বলগো সখি বল আমায়,  
আমি যাব কিনা জলে এ বেলায় ?  
আমি যাব কিনা, আমি যাব কিনা,  
আমি যাব কিনা, যাব এ বেলায় ?  
সে কি এ বিজন পথে একেলা চলে ?  
বাঁশী নিয়ে বসে গিয়ে কদম্ব-তলে ?  
কি হবে তবে কি হবে !  
হেসে যদি মোর পানে চায় ?  
কথা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

কখনো ত চোখে চোখে তারে দেখিনি,  
কখনো ত মুখে মুখে কিছু কাহিনি ;  
কি করে তবে কি ক'রে, কোন্ ছলনায়  
পশিরা জদর পুরে বাঁশীর সুরে,  
আমার গোপন কথা সবারে শুনায় !  
সখি লাজে মরি, আমি লাজে মরি,  
মরি জলি লাজ বেদনারি ॥

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেনলাল গাঙ্গুলী।

II { গা মা পা । ধা ধা বা । পধা -গর্সী -গধা । -পা মগা মা ।  
বল্ গো স থি বল্ আ মায়্ ০০ ০০ ০ আ০ মি

I পা সী গা । ধা পা গমা । -পধা -পমা -গরা । - গা মা ।  
যা ব কি না জ লে০ ০০ ০০ ০০ ০ এ বে

I পা -১ -১ । ( -১ -১ -১ ) } । -১ মগা মা । পা সী না ।  
লায় ০ ০ ( ০ ০ ০ ) } ০ অ'০ মি যা ব কি

I সী -১ সর্সী । গা রা সী । দগসা -গধপা মগমা ।  
না ০ আমি যা ব কি না০০ ০০০ আমি

I পা সী গা । ধা পা গমা । -পধা -পমা -গরা । - গা মা ।  
যী ব কি না যা ব ০ ০০ ০০ ০০ ০ এ বে

I পা -১ -১ । -১ -১ -১ ।  
লায় ০ ০ ০ ০ ০

II { -১ -১ গা । মা ধা ধা । ধা ধগা -সগা । পা ধা -১ ।  
০ ০ সে কি এ বি জ ন০ ০০ প থে ০

I -১ -১ না । সী রা না । সী -১ -১ । -১ -১ -১ । -১ -১ সী ।  
০ ০ এ কে লা ট লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গী গী মী । রা রা সর্না । সী -১ -১ । -১ -১ না  
নৌ নি য়ে ব সে গি০ য়ে ০ ০ ০ ০ ক

I সী নসর্সী সী । ধগা -রর্সী -গধা । -পমা -গমা -১ } I  
দ স্ব০০ ত লে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

I ধা ধা পা । -১ -১ পী । গর্মা -পধা -পমগা । -১ গা মা । পা -১ -১ ।  
কি হ বে ০ ০ ত বে০ ০০ ০০০ ০ কি হ বে ০ ০

I -১ -১ -১ । না না না । না -১ -১ । -সী -১ -১ । সী -১ সী ।  
০ ০ ০ হে সে য দি ০ ০ মোর ০ ০ পা ০ নে

১ নর্সা -রর্সা -গদা । -পা -। -। I গা মা ধা । ধা -। -।  
চায় ০০ ০০ ০ ০ ০ তে সে য দি ০ ০

I ধা -। -। । ধা -। গা I পধা গর্সা গদা : পা মগা মা ।  
মোর ০ ০ পা ০ নে চায় ০০ ০০ ০ আ ০ মি

I পা সা গা । ধা পা -। I গমা -পধা -পমগরা । -। গা মা  
যা ১ কি না জ ০ লে ০ ০ ০০০ ০ এ বে

I পা -। -। । -। -। -। II  
লায় ০ ০ ০ ০ ০

II { মা মা মা । মগা -। -। মা মা পা । পা  
কা খ নো তে ০ ০ ০ চো থে চো থে

I -। -। মগা । মা ধা পধা । ধা -। -। । -। -। গা গা গা । ধা -সগা -।  
০ ০ ত ০ রে দে থি ০০ নি ০ ০ ০ ০ ০ ক খ নো ত ০ ০

I ধা গা ধা । পা -। -। । -। -। গা । মা পা মগা ।  
মু থে মু থে ০ ০ ০ ০ কি ছু ক হি ০

I মা -। -। । -। -। -। } ধা ধা পা । -। -। পা । গমা -পধা -পমগরা ।  
নি ০ ০ ০ ০ ০ } কি ক রে ০ ০ ত বে ০০ ০০০০

I গা মা মা । পা -। -। । -। -। -। মগা -। -মা । পা -। ধা ।  
০ কি কো রে ০ ০ ০ ০ ০ কোন্ ০ ০ ছ ০ ল

I পধা -গর্সা -গদা । পা -। -। । না -। -। । নধা -। না । সর্সা -। -। ।  
নায় ০০ ০০ ০ ০ ০ কোন্ ০ ০, ছ ০ ০ ল নায় ০ ০

I -। -। -। । -। -। গা । মা ধা ধা । ধা ধগা -সর্গধা । পা ধা -। -। -। না ।  
০ ০ ০ ০ ০ প শি যা হু দ য় ০ ০০ পু রে ০ ০ ০ বা

I সা র্সা না । সর্সা -। -। । -। -। -। । -। -। সর্সা । গর্সা গর্সা গর্সা ।  
সী র শু রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র গো

। মা - গর্মপর্মা - গর্মপর্মা । না সা - । - । না । সর্গ - নর্সর্গা সর্মা । দগা - সর্গা - দপা ।  
প ন ০০০ ০০০ ক থা ০ ০ ০ স বা রে ০০ ০০ নায ০০০ ০০

। - । মগা মা । পা সর্মা না । সা সর্মা সর্মা । গা দর্মা সর্মা । দগা - সর্গা - দপা ।  
০ স ০ পি লা জে ম রি আ মি লা জে ম রি ০ ০ ০

। - । - । মগমা : পা সর্মা গা ' পা পা - । গমা - পমা - গরা : - । গা মা ।  
০ ০ ০ - ০ ম রি ক্ত লি লা ০ জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বে দ

পা - । - ।  
নায ০ ০

## মাসকাবারি

### যুদ্ধ শেষ

ইউরোপের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যখন সুর হয়, তখন প্রথম শোনা গিয়াছিল যে এ যুদ্ধ প্যান্-স্লাভিজ্‌মের বিরুদ্ধে জার্মান-অষ্ট্রীয়র আত্মরক্ষার যুদ্ধ। রাশিয়া স্লাভ-শক্তিকে বাহুবদ্ধ করিয়া জার্মান-অষ্ট্রিয়াকে শক্তি করিয়া তুলিয়াছিল—সেই শক্তিকে প্রতিহত করার চেষ্টা ভিন্ন তাদের অগ্র পথা ছিল না।

নির্বন্দ বেলজিয়ামের “নেউট্রালিটি” ভঙ্গ করার অপরাধে ইংরাজ যখন যুদ্ধে যোগ দিলেন, তখন স্লাভের বললাভের চেষ্টা-ব্যাপারটা কোথায় অন্তর্ধান করিল। তখন যুদ্ধের প্রধান পক্ষ হইলেন ইংরাজ ও জার্মান। ইংরাজের রাজ্য-সাম্রাজ্য-বাণিজ্য বিশ্ব জুড়িয়া ব্যাপ্ত; জার্মানি সেই বিশ্বশক্তি লাভের জন্ত

যুদ্ধ—ইংরাজ সে পথের অন্তরায়—অতএব যুদ্ধ।

গত চার বৎসরের ঘটনা সকলেরি জানা। ঘটনার চেয়ে জনরবের ঘটনা মারাত্মক। একদা শোনা গেল—ভারতবর্ষের সীমান্তে জার্মান-তুর্ক হাজির। রাজপুরুষেরা চঞ্চল। আমরা রামে মারিলেও মরি রাবণে মারিলেও মরি—তবু আমাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই খবরটাতে খুঁসি ছিলেন। তুমিরাছি অনেক কেরানী জার্মান ভাষায় বোল হরস্ত করার চেষ্টায় ছিলেন। পরাজিত জাতির পক্ষে প্রজাতন্ত্রের চেয়ে প্রভুতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতই স্বাভাবিক কিনা।

এদিকে ‘মেড্-ইন্-জার্মানি’ ছাপমারা মালের আরগায় বাজারে ‘মেড্-ইন্-জাপান’ ছাপমারা মালের আমদানি হইল। স্বদেশের প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া আমরা কংগ্রেসের

দলাদলির নেশা ও গালাগালির খেউড় জমানো ছাড়া দেশীয় শিল্প চালাইবার কোন চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার বিপ্লব। সেখানকার “বলসেবিক” দল প্রজার বলকেই সম্বল করিয়া জারের প্রভু-তন্ত্র এবং ভবগীলা দপ্তর করিয়া বসিল। জার্মান প্রভুতান্ত্রিকেরা আপাতঃ বলী হইলেও তারা দাস এবং দাসেরা চিরকালই দুঃখল। জার্মান কাইজার, জার্মান রণবাহিনীর দ্বারা অন্ধ্রক ইউরোপ জিতিয়া লইলেও তাঁর রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিত্তিই যে দুর্বল ও শিথিল, সে কথাটা ভুলিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি রাশিয়ার সুভা-শক্তিকেই বিভীষিকা গণ্য করিয়াছিলেন; সুতরাং রাশিয়ার এই বিপ্লবে তিনি খুসিই ছিলেন, কেননা অতবড় শত্রু যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে সরিয়া যাওয়াতে কাইজার আরামের নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন।

তারপর, এই বৎসরের জোড়ায় যখন ফ্রান্স-ইংলণ্ড-সেই সমগ্র জার্মান-বাহিনীর প্রচণ্ড অভিযাতে হঠিতে হঠিতে একেবারে প্যারিসের দরজায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল এবং যুদ্ধ-জয়ের আশা যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, তখন কে জানিত যে সহস্রা কয়েক মাসের মধ্যেই সেই প্রবল জার্মানশক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া প্রতিপক্ষ মিত্র-শক্তির কাছেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে? কাইজার তাঁর সিংহাসন ছাড়িবেন? অস্ত্রীয়া হাঙ্গেরী ভাগ হইয়া যাইবে? জুনিয়ার সব বাদশাসিনি যুচিয়া যাইবে?

রাশিয়ার বল-সেবী মন্ত যে জার্মান-

প্রভুতন্ত্রকে ভিতরী ভিতরে জোঁক করিয়া আনিয়াছিল, সে খবর ত গোড়ায় প্রকাশ পায় নাই।

অবশ্য আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেওয়াতে মিত্রপক্ষ বলশালী হইয়াছিল, এটা সত্য। মার্শাল ফোশের অপূর্ণ রণচাতুর্যে জার্মানি যে প্যারিসের প্রান্ত হইতে ভাড়া খাইয়া ক্রমশ হটিয়া পড়ে, এও সত্য। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় সত্য, জার্মানির মধ্যেই অন্তর্-বিপ্লব চলিতেছিল—নহিলে এত শীঘ্র যুদ্ধের শেষ হইতেই পারিত না।

প্রভুতন্ত্র ইউরোপ হইতে চির-বিদায় লইল। সর্বত্র যথার্থ আত্মজড় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই জঘন্য বৃষ্টি বিধাতা এতবড় একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া ছিলেন! আমরাও ইতিহাস-বিধাতার প্রলয়-লীলার ভিতর দিয়া নূতন সৃষ্টির অপূর্ণ ছবি দেখিবার সুযোগ পাইলাম।

“উঠেচে আদেশ

বন্দরের কাল হ’ল শেষ।”

## ভারতের স্থান

যুদ্ধের পরে ভারতের অবস্থা কি হইবে? রাষ্ট্রপতি উইলসন “League of Nations” জাতি-সংঘের কথা বলিয়াছেন; ইংলণ্ড বলিতেছেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সকলেই স্বাধিকার অধিকারী হইবে। ভারতবর্ষে রিকরম্ কীমের যে, খসড়া পৌছিয়াছে, তাহাতে আমাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে কিনা এবিষয়ে অনেকেই সন্দেহান। তার উপর যদি বা সেটা বর হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে রাউলাট্-কমিটির রিপোর্টে শাপের

বাবস্থাটাও আছে। অতএব লিগ্‌অব্‌নেশন্‌সের মধ্যে ভারতের স্থান হইবে কিনা, ইহা লইয়া এদেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত চিন্তাকুল।

আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষ যদি সত্যি নেশন হইত, তবে এ সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ থাকিতনা। রাষ্ট্রক্ষেত্রে দুটো অধিকার পাইলেই কোন জাতি নেশন-পদ-বাচ্য হয় না। নেশনের একটা আত্মাও থাকা চাই, একটা দেহও থাকা চাই। আমাদের নেশন-সত্তার আত্মা-পদার্থটি যে কি, তাহা এ পর্য্যন্ত অনেক গুণী-জ্ঞানী চিন্তা করিয়া ঠাছর পাইলেন বলিয়া মনে হয় না। শোনা যায়, আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি। যদি তাহা হইতাম, তবে দুটো পার্শ্বিক অধিকার দুটো বিষয়-সম্পৎ পাইবাঃ জন্ত আমাদের এমন একান্ত লোলুপতা কেন? তবে যে পশ্চিমকে আমরা materialist বা বিষয়ী বলিয়া নিন্দা করি, তার সেই বৈষয়িকতা আয়ত্ত করিতে আমাদের এমন প্রাণপণ প্রয়াস কেন?

তারপর, আত্মবস্তুর স্থির হইলে তবে দেহ মেলি। আমাদের আত্মবস্তুই যখন এক নয়, বহু—তখন দেহটাও এক নয়, বহু ধণ্ডেই খণ্ডিত।

ইউরোপের জাতিদের সঙ্গে যখন আমরা আমাদের মনে মনে তুলনা করি, তখন রাষ্ট্রক্ষেত্রের অধিকার-অনধিকারের কথা-টাকেই মনের সামনে রাখি। এটা ভুলি যে ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে "a great subjective life and centuries of dream preceded a great objective manifestation of power and

wealth" (A. E.)—অর্থাৎ ইউরোপের জাতিদের শক্তি ও ধনের যে বাহ্যিককাশ তাহা অনেক দিনকার বৃহৎ আন্তর জীবন, বহু শতাব্দীর বহু যত্নের দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। সেই বৃহৎ আন্তর জীবনের লক্ষণগুলি আমাদের মধ্যে কোথায়? অজ্ঞাত দেশে বড় বড় ভাবুক, দার্শনিক, কবি ও বৈজ্ঞানিকদের যে সব আদর্শ, যে সব ভাবনা-কল্পনা রাষ্ট্রতত্ত্বকে গড়িয়া তোলে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের সব কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে—এদেশে ভাবের সঙ্গে কাজের সে সূত পরিণয় ঘটিয়াছে কি? আমাদের দেশের যদি কোন একটা ইতিহাস থাকে, যদি কোন ঐতিহাসিক সাধনা থাকে তবে তার বিশেষত্ব কি, সেটা আমাদের ঐতিহাসিক—দার্শনিকদের আলোচ্য! কিন্তু সে আলোচনা যদি বা কিছু কিছু ঘটয়া থাকে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে যীরা শফরী-বৃত্তি করিতেছেন, তাঁরা কি তার কিছুমাত্র ধবর রাখেন? "The better minds in every race, eliminating passion and prejudice, by the exercise of the imaginative reason have revealed to their countrymen ideals which they recognised were implicit in national character." (A. E.'র National Being হইতে উদ্ধৃত)। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির মধ্যে যীরা মননশীল, তাঁরা সকল অন্ধ প্রবৃত্তি ও সংস্কারকে দূর করিয়া কল্পনা-প্রদীপ্ত যুক্তির সাহায্যে তাঁদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে যে সকল আদর্শ নিহিত রহিয়াছে, সেইগুলি তাঁদের দেশবাসীদের



গোচর করিয়া থাকেন। আমাদের জাতির মধ্যে রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যারা এই জাতীয় আদর্শের সন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছেন, দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে তাঁদের সে আবিষ্কার এতটুকুও স্পর্শ করে নাই। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীর দল ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইংলণ্ড গড়িবার চেষ্টা করেন—রাষ্ট্রক্ষেত্রে; এবং তাঁরাই আবার ভারতবর্ষকে সমাজের ক্ষেত্রে সংস্কারের হাজার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত রাখিবার জন্য প্রয়াসী হন। এই সকল অংশসারশূন্য

আন্দোলন এদেশকে প্রকৃত নেশন হইয়া উঠিতে দিবে না। দেশের আত্মবোধ হয় নাই; দেশের দেহও তাই গড়িতেছেন। এই আত্মবোধের বোধনের জন্য দেশের এখন সবচেয়ে দরকার অনেকগুলি যথার্থ চিন্তা-শীল, মনোবী ব্যক্তি। তাঁরা দেশের শাস্ত্র, সাহিত্য, সমাজ, অর্থ, সামর্থ্য, ধর্ম, দর্শন—জ্ঞানের সকল বিভাগে—দেশের মনকে জাগাইয়া তুলিবেন। তখন দেশের স্বরূপ-পরিচয় পাইব; তারপর রূপ আপনি গড়িবে—মন্টেগুকে তার জন্য বায়না দিতে হইবে না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী।

## সমালোচনা

স্মৃতির সৌরভ। শ্রীমতী শান্তা দেবী প্রণীত। কলিকাতা, ২১১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ব্রাহ্ম-মিশন প্রেসে মুদ্রিত, প্রবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড়টাকা। এখানি উপন্যাস; প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক লর্ড এলিয়ট প্রণীত Scenes of Clerical Life—উপন্যাসিক বঙ্গানুবাদ। এই উপন্যাসখানি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল; এখন স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এই উপন্যাসের উপাখ্যানে মানুষের সুখ-দুঃখের যে খেলা দেখিতে পাই, তাহা বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখ; তাহা শাস্ত্র সত্য, কাজেই তাহা সকলের উপভোগের সামগ্রী। অনুবাদের ভাষা মন্দ নয়, চলনসই। পাত্রপত্রী বিদেশীয়; কিন্তু তাহাদের সুখ-দুঃখ আমাদের আগে বেশ দাগ টানিয়া যায়। ইহা পাঠ করিয়া বাঙালার অনেক দুঃখের ঔপন্যাসিক যদি সুস্থিবার চেষ্টা করেন, উপন্যাসের স্বরূপ কি, তাহার গ্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় কিসে, তাহা হইলে এ সব অনুবাদেরও একটা সার্থকতা

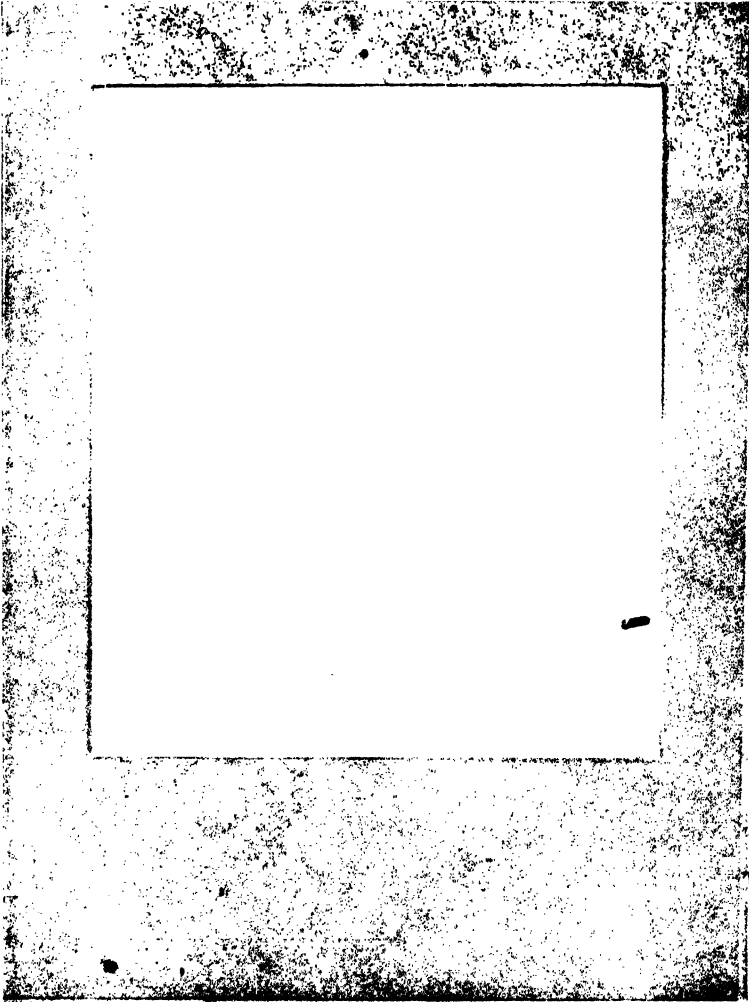
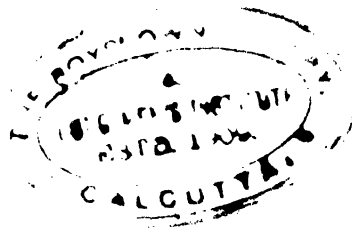
থাকে। বহিধানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

আলেখ্য। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত। ভবানীপুর, ৩৩ নং গিরিশ মুখার্জি রোড হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ভবানীপুর, ইন্দুপ্রভা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি সম্বর্ত-পুস্তক। প্রবন্ধগুলি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের। আলোচনাটুকু কথোপকথনচ্ছলে প্রণীত; তাহাতে আর কিছু হৌক, গ্রন্থখানি একেবারে আড়ষ্ট হয় নাই। লেখক 'জী-বাণীনতা', 'জী-শিক্ষা', 'পূণপ্রথা' 'গৃহবিচ্ছেদ' প্রভৃতি সামাজিক সম্বর্ত এবং 'জ্ঞান ও ধর্ম' 'মানব-জীবনে ভগবানের সাড়া' ও 'মায়'—এই তিনটি, আধ্যাত্মিক আলোচনা সংগৃহীত হইয়াছে। সামাজিক সম্বর্তগুলিতে নূতন কথা বিশেষ-কিছু নাই, সেই পুরাতন মাসুলি কাহিনীই ঘাঁটা হইয়াছে। লেখকের যুক্তিও ভেদন নিপুণ হয়। আধ্যাত্মিক সম্বর্তগুলি কাঁপা উচ্ছ্বাস মাত্র।

শ্রীসত্যব্রত শর্মা।

কলিকাতা—২২, হুকিং স্ট্রীট, কাতিক প্রেসে শ্রীহরিশরণ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, হুকিং স্ট্রীট হইতে

শ্রীকালচাঁদ দাস কর্তৃক প্রকাশিত।

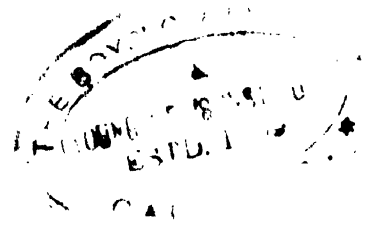


চন্দ্রমুখা

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ।

শ্রী রাধেশ্বর প্রসাদ অধিকারী





# ভারতী

৪২শ বর্ষ ]

পৌষ, ১৩২৫

[ ৯ম সংখ্যা

## জলের-আপ্পনা

একুশ

ঠিক তেলে-বেগুনের মত জলিয়া স্বর্ণেন্দু  
যখন চলিয়া গেল, অবনৌ বসিয়া-বসিয়া  
ভাবিতে লাগিল :—

‘তাইত বলি, জয়ন্তের মত লোক কখনো  
অমন কুস্থানে যেতে পারে ? সে মাঝে-মাঝে  
যে-সব গান গায়, সেগুলোর কোন-কোনটা  
নীতির দিক্ দিগে খুব ভালো হয় না  
বটে, কিন্তু তাতে-এতে যে ঢের তফাৎ !  
... ... সেদিন তার অপমানে আমি যে  
সত্যি-সত্যিই খুব-বেশী দুঃখিত হয়েছিলুম,  
তা নয় ; কিন্তু আস্ত তার, কথা ভেবে  
আমার প্রাণটা কেমন কাতর হয়ে উঠছে ।  
... ... স্বর্ণেন্দু আমারি বন্ধু ; ভয়স্ত হয়ত  
মনে-মনে ঠাউরেছে, জগৎবাবুর বাড়ী থেকে  
তাকে সরাবার ফিকিরে বন্ধুর সাহায্যে

আমিই এই ষড়যন্ত্রটা পাকিয়ে তুলেছি ! সে  
কখনো চুপ করে’ থাকবে না, জগৎবাবুকে  
একদিন-না-একদিন সব কথা খুলে বলবেই !  
জগৎবাবুও নিশ্চয় আমাকেই সন্দেহ করবেন !  
... ... তাইত, আচ্ছা মুন্সিমেই পড়া গেল  
যাহোক,—এখন উপায় ? যদি আমি আগে-  
পাক্তেই জগৎবাবুর কাছে সমস্ত প্রকাশ  
করে’ না দি, তাহলে শেষটা দেখছি  
আমাকেই এই কুৎসিত অপবশের ভাগী  
হ’তে হবে ! ... ...

‘জগৎবাবুর বাড়ীতে জয়ন্তের মান বাড়ুক  
বা কমুক, তাতে আমার সুবিধে-অসুবিধে  
কি ? ইন্দুলেখাকে আমি ত অ্যামনেও পাব  
না, অম্নেও পাব না—সে ত আমাকে  
চায় না ! জানি না, আমার ওপরে ইন্দুর  
এই বিষদৃষ্টি কেন ? ... ... বেশ দেখা  
যাচ্ছে. ছনিয়ার পালকের চেয়ে হালকা হচ্ছে,

খুলো; খুলোর চেয়ে হালকা, বাতাস; বাতাসের চেয়ে হালকা, নারী; আর নারীর চেয়ে হালকা কি?—কিছু না!’

অবনী বসিয়া-বসিয়া এমনি নানান কথা ভাবিতেছে—হঠাৎ বাহির হইতে কে ডাকিল, “বাবু ঘরে আছেন,—বাবু?”

অবনী সাড়া দিতে-না-দিতেই ভজহারি ঝোড়ো কাকের মতন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

অবনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “তুমি জয়ন্তবাবুর চাকর না?”

ভজহারি কানো-কানো মুখে বলিল, “হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ! আমার খোকনকে বাঁচান!”

—“কে?”

—“আমাদের খোকন গো, আমাদের বাবু!”

—“জয়ন্তবাবু? কেন, তাঁর কি হয়েছে?”

—“জয় হয়েছে—কাল শেষ-রাত থেকে ভুল বক্চে!”

—“জয় হয়েছে ত অত ভাবনা কিদের?”

—“কে জানে এ কী জয়! বললুম ভিখারীটাকে ছুঁস্নে—তা সে ত গুলে না!”

—“তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি-নি। ভিখারীর কথা আবার কি বলছ?”

ভজহারি তখন হাঁপাইতে-হাঁপাইতে দেখেনো বুক চাপ্কাইয়া, কখনো কপালে করাঘাত করিয়া কোনরকমে সব কথা খুলিয়া বলিল।

অবনীর তখন মনে পড়িল, সেদিন বাড়ী আসিবার সময়ে সেও জয়ন্তের বাড়ীর কাছে একটা বসন্ত-রোগী ভিখারীকে রাস্তায় পড়িয়া-পড়িয়া কাতর্য্যাইতে দেখিয়াছিল।

কিন্তু আর-পাঁচজনের মত সেও তাঁহাদের কাছের না-বোঁধিয়াই চটপট চলিয়া আসিয়াছিল।... ...জয়ন্ত নিশ্চয় সেই ভিখারীটাকেই পথ চহিতে তুলিয়া হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে! ... এইখানে জয়ন্তের নির্ভীক উদারতার সঙ্গে আপনার ভীক অন্ধমতার কথা ভাবিয়া অবনী মনে-মনে লজ্জিত হইল। জয়ন্তকে ভালোবাসিত না বলিয়া সে তাহার ভিতরকার সাঁচা মনটিকে এতদিন দেখিতে পায় নাই; আজ জয়ন্তের আসল পরিচয় পাইয়া অবনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল—তাহার চোখের উপর হইতে যেন একটা অন্ধকারের ঠুলি আচঘিতে থসিয়া পড়িল।

ভজহারি ব্যাকুলভাবে বলিল, “খোকনের পেচনে শনি লেগেচে গো! আজ ক-দিন হোলো সে তার মাকে হারিয়েচে—”

—“জয়ন্তবাবুর মা মারা গেছেন!”

—“হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! তার ওপরে এই ব্যাপার! তার একন আপন বলতে আর কেউ নেই! তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম—আপনি খোকনের বন্ধু, এ-পাড়ায় আর কার কাছে যাব বলুন বাবু? আমি মুকু-সুকু মানুষ, কোতার ভালো ডাক্তার পাওয়া যায়, কি করতে হয় কিছুই জানি-না যে! আর ঘেরি করবেন না,—তাকে আমি অ্যাক্লা ফেলে এসেছি!”

জয়ন্তের অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়া অবনীর প্রাণটা কেমন আপনা-আপনি ভিঝিয়া আসিল! যদিও জয়ন্ত তাহার বন্ধু নয়, তবু এমন অগম্যে তাহাকে সাহায্য করা যে শত্রু-মিত্র সকলেরই কর্তব্য, এটা বুঝিয়া অবনী বলিল, “আচ্ছা, তুমি তোমার

বাবুর কাছে যাও—আমি একেবারে ডাক্তার নিয়ে পরে যাবি।”

ভজহরি ধড়ে যেন কতকটা প্রাণ পাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ডাক্তার জয়ন্তকে দেখিয়া বলিয়া গেলেন, রোগীর গায়ে বোধহয় বসন্ত ফুটিবে। এত-বেশী জ্বর, ভুল-বকা, গলায় ও কোমরে ব্যথা, এসব বসন্তেরই পূর্ব-লক্ষণ!

ভজহরি তারি ভাবনায় পড়িয়া গেল। যদি জয়ন্তের কিছু হয়, তবে সে দারিদ্র্য কে ষাড়ে করিয়া লইবে?

ভজহরিকে ডাকিয়া সে বলিল, “ভজহরি, তোমার বাবুর বাড়ীতে কি এমন কেউ নেই, যিনি এখানে এসে সেবা-শুশ্রূষা কর্ত্তে পারেন?”

—“হ্যাঁ, গৌরীদিদি আছে।”

—“তিনি তোমার বাবুর কে?”

—“খোকনের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল। গৌরীদিদি খোকনের বাড়ীতেই মানুষ হয়েচে গো বাবু!”

—“জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আর-কাকুর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল বুঝি? কৈ, তা ত জানতুম না!”

ভজহরি খুব সংক্ষেপে জয়ন্তের বাড়ীর কথা বলিল। জয়ন্ত যে দেশে গিয়া পথ হইতেই কিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও গোপন রাখিল না। বাহাকে একবার আপন মনে করিত, তাহার কাছে কিছুই চাকিয়া রাখিতে পারিত না,—এটা ছিল ভজহরির মন্ত হৃদয়লতা! অবনী যে এই অসময়ে তাহার

খোকনকে দেখতেছে-শুনিতেছে, তাইতেই ভজহরি একেবারে গলিয়া গিয়া তাহাকে পরম আপনজন বলিয়া ধরিয়া লইল!

ভিতরে-ভিতরে এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, অবনী তা জানিত না। জয়ন্তের অসহায়তা জাহার চোখে আরো করুণ হইয়া আগিয়া উঠিল। তাবিয়া-চিন্তিয়া শেষটা বলিল, “ভজহরি, তাহলে তোমার দেশে খবর পাঠালে কেউ কি আসবে না?”

ভজহরি হতাশভাবে মাথা নাড়িল।

অবনী বলিল, “আচ্ছা, তবু খবর ত পাঠানো যাক, তারপর যা-হয় দেখা যাবে। তোমাদের বাসার সামনের জগৎবাবুকে জান ত?”

—“জানি বৈকি! এই বিপদের সময়ে তিনিও যদি একানে থাকতেন বাবু, তাহলে অনেকটা সুরাহা হ’ত।”

—“হ্যাঁ। তাঁকেও একটা খবর দি।

তিনি এলেও আসতে পারেন।”

অবনী তখন টেলিগ্রাম করিতে চলিয়া গেল।

### বাইশ

জয়ের মাঝখানে জয়ন্তের হঠাৎ একটু সাড় হইল।

সে তাহার কপালের উপরে কাহান্য দুখানি পদের মতন নরম করপুটের স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিল। এ হাত ত ভজহরির নয়!... জয়ন্ত চোখ মেলিতে গেল, পারিল না। তাহার চোখে তারি বেদনা।

তাহার সারা দেহেও তখন গরম হুঁচের মত কি-বেন পটপট করিয়া বিঁধিতেছে আর

বিঁধিতেছে,—সে বয়সী অসহ! জয়ন্ত কৌণ  
কাতর স্বরে দিখালা করিল, “কে, ইন্দু?”

ভজহরি পাশেই বসিয়াছিল; সে বলিয়া  
উঠিল, “আ আমার গোড়াকপাল! তোমার  
ইন্দু কোতায়—ওষে গৌরীদিদি! অগৎ-  
বাবুকে তার করা হয়েছিল, তা তিনি  
বলে পাঠিয়েচেন, একন আস্তে পারবেন  
না! কিন্তু গৌরীদিদি খপর পেয়েই ছুটে  
এয়েচে! আপন লোক না-হ’লে কি  
দরদ হয়,—কি বলেন দেওয়ান-মশাই!”

জয়ন্তের কানে কালিশব্বরের খঞ্চক  
কাশির আওয়াজ গেল। বিস্মিত অশ্রু  
স্বরে সে বলিল, “গৌরী—গৌরী! গৌরী  
এসেছে—” বলিতে-বলিতে সে আবার নীরব  
হইয়া পড়িল।

গৌরী জয়ন্তের মাথার উপরে ছুখানি  
ধুখুখে হাত রাখিয়া চূপ-করিয়া বসিয়া  
রহিল।

জয়ন্তের সমস্ত দেহে তখন ভীষণ রোগের  
মারাত্মক চিহ্ন দেখা দিয়াছে,—সেইদিকে  
চাহিয়া বিহ্বল স্বরে ভজহরি বলিল,  
“আমার খোকনের যদি কিছু হয়, তাহলে  
আমি আত্মঘাতী হব। হে মা শীতলা—”

গৌরী ছই ভূক কঁচকাইয়া ভজহরিকে  
চূপ করিতে বলিল।

ভজহরি খানিকক্ষণ জয়ন্তের দিকে  
তাকাইয়া কোন-রকমে মুখ বন্ধ করিয়া  
রহিল; তারপর আবার বলিল, “আচ্ছা  
দেওয়ান-মশাই, ডাক্তার-সারের কি সত্যি-  
সত্যিই বলে গেলেন যে, খোকনের চোকের  
ভেতরেও মার অঙ্গুষ্ঠ হইবে? না, এ  
মিচেকতা—না?”

গৌরী তীব্রকণ্ঠে বলিল, “কী সব কথা  
বলছ ভজহরি! যাও, তুমি এখান থেকে  
চলে যাও!”

ভজহরি কাঁচুমাচু মুখে হাত ঘোড় করিয়া  
বলিল, “এবারটা আমার মাপ কর দিদি!”

—“আচ্ছা, ফের কথা কইলে  
এখানে আর থাকতে পাবে না!”

ভজহরি দুইহাঁটুর ভিতরে মুখ গুঁজিয়া,  
লুকাইয়া-লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

সারা দিন গেল। বিছানার উপরে  
কলাপাতে শুইয়া জয়ন্ত সমস্ত ক্ষুণ্ণ-খালি  
ছটিকট-ছটিকট করিয়াছে—এ-পাশ ও-পাশ  
ফিরিয়া, চিং হইয়া, উপড় হইয়া, কোন-  
রকমে কিছুতেই সে একটুও শোয়াতি  
পাইতেছে না—তাহার ক্রমাগত মনে  
হইতেছে সে যেন হালান্ন-হালান্ন ধারালো  
বর্ষার উপরে শুইয়া আছে! ঠোটে ঠোটে  
চাপিয়া সে এই মর্শ্বেভেদী যাতনা চাপিয়া  
রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে  
না—তাহার দেহের শত-শত ক্ষতের মুখ  
দিয়া ভিতরের হাহাকার যেন বাহিরে কাটিয়া  
পড়িতে চাহিতেছে!

বিকৃত মুখে অবসন্ন কণ্ঠে বারংবার সে  
বলিয়া উঠিতেছে, “আর পারি না—আর  
পারি না, মলে যে বাঁচি—এর-চেয়ে মরা  
ভালো গো, মরা ভালো!”

কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ভজহরির চোখ যেন  
কানা হইয়া গেল—বৃদ্ধের অীর্ণ বক্ষের মধ্যে  
এত অশ্রুও ছিল!

গৌরী কিন্তু পাবাণ-প্রতিমার মত অটল  
হইয়াই আছে। তার প্রাণের ভিতরকার  
কথা অন্তর্ধারী জানেন, কিন্তু বাহিরে

তাহার চোখের প্রান্তে এতটুকু অশ্রু, তাহার প্রশান্ত মুখে এতটুকু অশান্তির লক্ষণ পয্যন্ত দেখা যাইতেছে না। রোগীর শুবধ-পথ্য, সেবা-শুশ্রূষা—যখন যেটির দরকার,—কলের কাটার মত গৌরী তা করিয়া যাইতেছে—একটি কথাও না-কহিয়া!

সন্ধ্যার সময় জয়ন্ত কতক-চেতন কতক-অচেতনের মত শুইয়া ছিল; হঠাৎ সে জড়িত স্বরে আশ্তে-আশ্তে যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিল, “ইন্দু,—ইন্দু, তুমি এলে না—তুমি আমাকে এমন করে’ দাগা দিলে!” জয়ন্তের মুদিত চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রোগের এই নরক-যাতনার মধ্যেও ইন্দুর স্মৃতি জয়ন্ত ভুলিতে পারে নাই! গৌরীর প্রশ্নের কোন্ কোণে যে গভীর ব্যথা তুবানলের মত প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, জয়ন্তের এই কথায় তাহা যেন অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল!—পাছে ভজহরি তাহার মুখ দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া বলিল, “আলোটা বড় বাড়িয়ে দিয়েছ ভজহরি, ওটা কমিয়ে দিয়ে আসি!” ... .. কিন্তু আলোর শিখা না-কমাইয়া গৌরী যে আরো-বেশী বাড়াইয়া ফেলিল, দুঃখ-কাতর ভজহরি অতটা খেরাল করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে অবনী আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল। গৌরীকে দেখিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়া গেল—গৌরীও লজ্জিত হইয়া ভিতর হইতে সরিয়া বারান্দার গিয়া দাঁড়াইল।

অবনী জিজ্ঞাসা করিল, “ভজহরি, তোমার বাবু এখন কেমন আছেন?”

তাহার স্বর বোধহয় জয়ন্তের কানে গেল—সে চমকাইয়া উঠিল। সেটা অবনীর চোখ এড়াইল না।

### তেইশ

জগৎবাবু ডাবিয়াছিলেন, দেওঘরে আসিলে ইন্দুলেখা, জয়ন্তের অভাব শীঘ্রই ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছেন, ইন্দুলেখা যেমন ছিল তেমনটি আর হইল না—বরং দিন-কে-দিন যেন আরো-বেশী মন-মরা হইয়া পড়িতেছে।

ইন্দু এখন সকলসময়েই অস্ত্রমনস্ক থাকে, ঘরের ভিতর হইতে সহজে বাহিরে আসিতে চায় না, অকারণে চটিয়া চাকর-বাকরদের ধমক দেয়। আর এই ইন্দুই দুদিন আগে ছিল বিছাতের মত চঞ্চল, তার হাসির কলরোল ছিল বরণার মত অবিরল! এখন তাহার চোখের কোলে কালির দাগ ক্রমেই ঘন হইয়া উঠিতেছে, তাহার কপোলের উপর হইকুট গোলাপী আভাটুকু ক্রমেই মিলাইয়া আসিতেছে, তাহার নখর দেহখানি ক্রমেই শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

কী যে করিবেন, জগৎবাবু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন ইন্দুকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ মা, দিন-কে-দিন তুই এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন বল ত!”

ইন্দু লোক-দেখানো শুকুনো হাসি হাসিয়া বলিল, “বাবা, তুমি কি দেখতে কি দেখেছ, তোমার চর্ম্মার নখর বদলানোর দরকার হয়েছে।”



—“তোমার কি এখানটা ভালো লাগচে না?”

—“খুব ভালো লাগচে।”

—“তবে?”

—“তবে—কি, বাবা?”

—“তবে তুই এমন মন-মরা হয়ে থাকিস কেন?”

—“বাবা, তুমি খালি খালি ভারি এক-কথা কও, যাও,—আর আমি তোমার কথার জবাব দেব না।”

ইন্দুর কপালের উপরকার এলমেল কতকগুলো চুল গোছাইয়া দিতে-দিতে জগৎবাবু বলিলেন, “মা ইন্দু, আমার কাছে লুকো-নে, সত্যি করে’ বল দেখি বাছা, তুই কি এখনো জরন্তকে বিবাহ করতে চাস?”

ইন্দু চলিয়া যাইতে-যাইতে নির্ঝাঁক ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিয়া গেল, না।

তারপরে-নিজের ঘরে ঢুকিয়া, অকারণে অভ্যস্ত জোরে ছন্দ-করিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিল।

এর-মধ্যে জগৎবাবু হঠাৎ একদিন অবনীর কাছ হইতে একখানা টেলিগ্রাম পাইলেন :—“জরন্তের অভ্যস্ত জর; বসন্ত হবার সম্ভাবনা; আপনি কলিকাতায় এলে ভালো হয়; রোগীকে দেখবার লোক নেই।”

টেলিগ্রাম পাইয়া জগৎবাবুর মন প্রথমটা একটু নরম হইয়াছিল—কারণ, জরন্তকে তিনি সত্যসত্যই দেখে করিতেন, ভালো

বাসিতেন। কিন্তু তারপরেই তাঁহার মনে পড়িল জরন্তের চরিত্রের কথা! বুঝিলেন, এখন কলিকাতায় গেলে চলিবে না। জরন্তের সঙ্গে তিনি যখন কিছুতেই ইন্দুর বিবাহ দিতে পারিবেন না, তখন এ-ছাড়া অন্য মতো বাহাতে আর-না দেখাশাফাৎ হয়, এখন তাঁহার তাহাই করা কর্তব্য—তিনি পিত্তা, আগে তাঁহাকে আপন মেয়ের শুভাশুভ দেখিতে হইবে ত!... ..আর, জরন্ত এখনো তাঁহার উপরে নির্ভর করিতেছে কেন? সে ধনী, ছেলে, দেশে তার আত্মীয়-স্বজন সব আছে,—ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরিয়া যাক না! তিনি পর, তাঁহাকে লইয়া এত টানাটানি কেন? সে কি ভাবিয়াছে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? না, অসম্ভব!

সুতরাং উত্তরে তিনি টেলিগ্রাম করিলেন—“জরন্ত দেশে নিজের বাড়ীতে ফিরে যাক; এখন আমার বাওয়া চলবে না।”

অবনীর টেলিগ্রামখানি জগৎবাবু ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; পাছে ইন্দুর মন চঞ্চল হয়, সেই ভয়ে তাহাকেও কিছু বলিলেন না।

জগৎবাবু এত সমস্তপে আট-ঘাট বাঁধিয়া চলিয়াও ইন্দুর মনকে কিছুতেই ভালো করিতে পারিলেন না। অবশেষে, এমন চমৎকার জল-হাওয়াতেও ইন্দুর রোজ ঘুঘু জর হইতে লাগিল। এই-সব দেখিয়া-শুনিয়া জগৎবাবু বিদেশবাসির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় কিরিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইন্দু হঠাৎ গৌ ধরিয়া বাঁকিয়া বসিল, সে কোনমানেই কলিকাতায় বাইবে না!

ইন্দু তাহার মেয়ে, তাহার কোলেই সে মানুষ, তাহার চরিত্রের সমস্তই তিনি বুঝিতেন; তবু আজ তাহার কাছে এই তরুণী মেয়ের মনটি একটা বিষম হেঁয়ালির মত খাপছাড়া ঠেকিল।

আশ্চর্য্য হইয়া তিনি বলিলেন, “কল্কাতার যাবি-নি কি রে?”

ইন্দু দৃঢ়স্বরে বলিল, “না, আমি এখানেই থাকব!”

—“এখানকার জল-হাওয়া তোর যে সহ্য হচ্ছে না!”

—“এখানকার জল-হাওয়া যদি আমার সহ্য না-হয়, তবে কল্কাতার ধুলো আর ধোয়া আরো অসহ্য হবে!”

—“কিস্ত—”

—“যতই ‘কিস্ত’ বল আর যতই ষাড় নাড়ো বাবা, আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়ব না, কিছুতেই না! দেখ দেখি—” এই বলিয়া ইন্দু ঘরের জানালাটা খুলিয়া দিল। তারপর বাহিরের দিকে চাত বাড়াইয়া বলিল, “দেখ দেখি বাবা, এখানে কেমন নীল আকাশ, কেমন ছবির মতন পাহাড়, কেমন খোলা মাঠ, সবুজ বন, চেউ-খেলানো নদী! এ দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়! এ-সব ছেড়ে কল্কাতায় আমি যেতে চাই না। আস্তাবার সময়ে তুমি আমাকে জোর করে’ নিয়ে এসেছ, এখন যাবার সময়ে তুমি যতই জোর কর, আমি এখন যাচ্ছি না বাবা!”—এই বলিয়া ইন্দু খুব হাসিতে লাগিল।

ইন্দুর হাসি দেখিয়া জগৎবাবু অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু জগৎবাবু বেই অদৃশ্য হইলেন, ইন্দুর মুখের ভাব অমনি ধীরে ধীরে বদলাইয়া গেল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া সে উদাস ভাবে বিছানায় গিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে নিপুণ অভিনেত্রীর মত পিতাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু এখন বাহিরের অভিনয়ে আপনার ভিতরের মনকে সে কিছুতেই বোঝ মানাইতে পারিল না।

এইভাবে আরো-কিছুদিন কাটিয়া গেল।

সোদিন দুপুরে কি-একটা কারণে জগৎবাবু যখন প্রিয়ভাষা মণিকচাঁদকে উচ্চৈশ্বরে ধমক দিয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং মণিক যখন সে ধমক একটুও আমোলে না-আনয়া হাতের আড়ালে নীরবে হাস্য করিতেছে, তখন ডাকপিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল।

জগৎবাবু ধমকটা আপাতত বন্ধ রাখিয়া পত্রখানা খুলিলেন। পত্রখানা অবনীরা সে লিখিয়াছে :—

“শ্রদ্ধাম্পদ জগৎবাবু,

জয়ন্তের অন্ত্রের অন্ত্রে এত ব্যস্ত ছিলুম যে, আপনাদের কোন খবর নিতে পারি-নি। সেজন্তে কিছু মনে করবেন না।

আমার টেলিগ্রামের আপনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা-থেকে বুঝেছি এখনো আপনি জয়ন্তের উপরে বিরূপ হয়ে আছেন। কিন্তু আমার এই চিঠিখানি পড়লেই বুঝবেন যে, জয়ন্তের উপরে রাগ করে’ তার প্রতি আপনি কতটা নিষ্ঠুর বিচার করেছেন!

আপনি জামেন না, জয়ন্ত কী হতভাগ্য! আপনি এখান থেকে চলে যাবার পর ক্রমাগত

দুঃখ-শোকের আঘাতে সে একেবারে মুহমান হয়ে পড়েছে। তার মা মারা গেছেন, পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ থেকে,—আপনার কন্ডাকে ভালোবেসে বঞ্চিত হয়েছে, দেশের ভদ্রাসনে তার আর মাথা রাখবার ঠাইটুকু পর্য্যাপ্ত নেই। কিন্তু এত নির্ধ্যাতনের পরেও সে শাস্তি পেলে না—আরো-এক ভীষণ দুঃখ এসে তাকে জীবন্ত করে' দিয়ে গেছে। রাস্তার বসন্তরোগে মৃতপ্রায় একটা ভিখারীকে বাঁচাতে গিয়ে, সে আপনিই ঐ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল—এ-মারায় কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেও এ-জীবনে পৃথিবীকে সে আর দেখতে পাবে না,—তাকে অন্ধ হয়ে থাকতে হবে!”

এই-পর্য্যন্ত পড়িয়াই জগৎবাবু আঁৎকাইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার হাত হইতে খসিয়া চিঠিখানা মাটির উপরে গিয়া পড়িল। আপনা-আপনি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, “কি ভয়ানক—কি ভয়ানক! অন্ধ? ... ... জয়ন্ত অন্ধ?” — তাঁহার বুকটা শিহরিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অন্ত্যস্ত দুঃখিত মুখে তিনি আবার বসিয়া পড়িলেন এবং পত্রখানা মেনে হইতে কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় পড়িতে লাগিলেন:—

“আপনাকে আর-একটি বিশেষ সংবাদ দিচ্ছি। আপনি সেদিন হুস্তরিজ বল জয়ন্তকে যে অপমান করেছিলেন, সেটা আপনার পক্ষে সুবিচার হয়-নি; কারণ, সে নির্দোষ। একজন ভালো গায়কের গান শুনিয়া আনবে, এই অছিলায় ভুলিয়ে জয়ন্তকে, আমাদেরই স্বর্ণেন্দু কুস্থানে নিয়ে

যায়। জয়ন্ত সর্বল মনেই স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে গিয়েছিল,—সে যে কোন গায়িকার বাড়ীতে যাচ্ছে, ঘুণাক্ষরেও এমন সন্দেহ করতে পারেন-নি। তারপর যখন সে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারে তখন সুবিধা পাবা-মাত্রই সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে আসে। জয়ন্তের উপর স্বর্ণেন্দু অত্যন্ত চটা; তাইতেই সে এ-হেন বড়যন্ত্র করে' মনের বাল ঝেড়েছে। আমি আসল সত্যটা জানতে পেরেছি স্বর্ণেন্দুর নিজের মুখ থেকেই; সুতরাং জয়ন্ত যে নিরপরাধ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। অনেকসময়ে চাক্ষুষ প্রমাণও যে যথেষ্ট প্রমাণ নয়, এ-ক্ষেত্রে আপনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাবেন।

“এত দুঃখ-শোক অপমান-নির্ধ্যাতনেও, ভীষণ রোগের বস্ত্রপার মধ্যেও জয়ন্ত আপনার কন্ডাকে ভুলতে পারে-নি—এমন-কি, জয়ের ঘোরে প্রলাপ বকতে-বকতেও সে খালি ‘ইন্দু ইন্দু’ করে’ কাত্রে উঠেছে! তার প্রেম যে এত গভীর, আমি তা জানতুম না। দূর্ভাগাক্রমে, আপনার টেলিগ্রামের উত্তর তার কানে গিয়েছে। বিছানার পড়ে রোগের জ্বালায় চট্‌কট্‌ করতে-করতেও সে বারংবার বলেছে, “আমার এই দূর্ভাগ্যের কথা শুনেও ইন্দু এল না!” আপনার উত্তরটা বোধহয় অসুখের চোরেও নির্দাক্ষণ হয়ে তার প্রাণে গিয়ে বেজেছে।

জগৎবাবু আপনায় বা কর্তব্য আপনি তা বিবেচনা করুন। আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনায়। নমস্কার। ইতি

স্নেহপ্রার্থী

অবনী।”

পত্রপাঠি বধন সাজ হইল, জগৎবাবুর বকের স্পন্দন তখন যেন থামিয়া গেল। পাবাগীভূতের মত নিশ্চল হইয়া বহুক্ষণ তিনি বসিয়া রহিলেন;—তারপর কক্ষ বস্ত্রপার আবেগে দুইহাতে কপালের হৃ-পাশ চাপিয়া ধরিয়া সামনের টেবিলের উপরে মাথা রাখিলেন—তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি এমন ভাবে আর-কখনো আহত হয় নাই! তাঁহার মনে হইতে লাগিল, জরন্তরের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্ত তিনিই দায়ী—একমাত্র তিনিই দায়ী। কোনমতেই আত্মসংবরণ করিতে না-পারিয়া শেষকালে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “জরন্ত, জরন্ত! তুমি আমাকে ক্ষমা কর,—আমি নরোধম—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—সুখ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর!”

পাথের ঘরে জানলার ধারে বসিয়া ইন্দু তখন উদাস চোখে বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। কলিকাতা ছাড়িয়া আসিয়া অবধি, তাহার হৃৎ-দীর্ঘ চিন্তের কাছে এখন সুখ একমাত্র সাহসনা, ধরণীর এই স্তম্ভল মুখ। ... .. খানিক দূরে হৃদয়ের আকের আর অড়ড়ের ক্ষেতের মাঝখানে, শুকুনো নদীর সাদা বালির বীক। রেখাটি যেন নিরুন্ম হৃদয়ের ভরা-রোদে গা-এলাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; মাঝে মাঝে পায়ের তলায় চলন্ত ছায়া কেলিয়া, চাষার মেয়েরা বালি খুঁড়িয়া কলসী ভরিয়া জল লইয়া বাইতেছে; তাঁদের এদিকে-ওদিকে ছোট ছোট দল বাধিয়া কতকগুলো গরু, ঘোষ ও ভেড়া চরিতেছে; কোথাও-বা উচু-নিচু পাথরের চিপির উপরে হু-চায়ে বক বাড় বীকইয়া বসিয়া আছে—যেন ছবিতে আঁকা।

অনেক দূরে আকাশ-পৃথিবীর সীমারেখা আড়াল করিয়া, পাবাগে-পরিণত মন্ত-একটা স্থির-মেঘের মত কালো পাহাড় হুর্দা খাইয়া আছে—তাঁহার সর্বদেহে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে আলোক-ছায়ার বিচিত্র পরিবর্তন। ... .. এমনি-সব নানান দৃষ্টের মাঝে ইন্দুর দৃষ্টি লক্ষ্যহীনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—এমনসময় হঠাৎ তার কাণে পিতার অসুতপ্ত কণ্ঠস্বর আসিয়া চুকিল। সচমকে, বিস্মিত ভাবে সে বলিয়া উঠিল—“বাবা, তুমি কি বলছ?”

যাতনার অস্বাভাবিক কণ্ঠে জগৎবাবু ডাকিলেন, “ইন্দু—ইন্দু!”

ইন্দু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল; কিন্তু পিতার মুখ দেখিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল!

জগৎবাবু টেবিলের উপরে পত্রখানার দিকে অনুলিনির্দেশ করিলেন,—মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না।

পত্র পড়িতে-পড়িতে ইন্দুর মুখের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল—তারপর চিঠি-পড়া শেষ-হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই একটা অসুট চীৎকার করিয়া সে মাটির উপরে মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়িল। ... ..

জগৎবাবু তাহাকে বধন কোলে করিয়া তুলিয়া বিছানার গুয়াইয়া দিলেন, ইন্দু তখন অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছে।

অস্বেজান্তে বিছানা হইতে নামিয়া, সে ক্ষুদ্র—তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, “বাবা!”

জগৎবাবু মুখ তুলিয়া চূপ করিয়া রহিলেন।

—“বাবা, অবনীবাবুর টেলিগ্রামের কথা ত তুমি আমাকে বল-নি!”

জগৎবাবু আজ তাহার নিজের ঘরের  
সুস্থখেই দোবীর মত নাথা হেঁট করিলেন।

—“বুঝেছি বাবা, পাছে আমার ভাবনা  
বাড়ে, সেই ভয়েই টেলিগ্রামখানা তুমি  
আমাকে দেখাও-নি। কিন্তু আজকের চেয়েও  
কি সোদিনকার ভাবনা বেশী গুরুতর হ’ত  
বাধা? এখন যে চিরজীবন ভাবতে হবে!”

জগৎবাবু মিরুস্তর।

—“নাও বাবা, জিনিষগত সব বাধা  
হুকুম দাও,—আমরা আজকেই কলকাতায়  
ফিরিব।”

### চবিশ

—“গৌরী!”

—“বল।”

—“তুমি কি এখনো বসে আছ?”

—“হ্যাঁ।”

—“না, আর তোমাকে জেগে থাকতে  
হবে না গৌরী! আমি ভালো আছি।  
ঘরের সুখ থেকে যে খসে পড়েছি, তার  
কষ্টে আর ভয় কি?”

—“অমন কথা বোলোনা গো, আমার  
বড় কষ্ট হয়।”

—“রারা আমাকে ভালোবাসে তাদের  
কষ্ট দেওয়াই আমার স্বভাব। দেখে-না,  
মাকে এত কষ্ট দিলুম যে, তিনি এ  
পৃথিবীতে কিছুতেই আর টিকতে পারলেন  
না। আজ মাও নেই, খালি তুমি আছ।  
এখন তোমাকে কষ্ট দেব-না ত আর  
কাকে দেব বল?”

—“তুমি বুঝো গো, বুঝো! দেখছ  
না, রাত যে অনেক হ’ল।”

—“রাত হ’ল কি দিন হ’ল সে খোচ  
তারা রাগুক—দিন-রাত বাদেই জন্তে।  
জাননা, অঙ্গের কিরা রাত কিবা দিন!”

—জয়ন্ত পাগলের মত কঠোর হাত  
করিল। সে হাত গৌরীর বুকে  
হাড়গুলোর উপরে ধাক্কা মারিয়া যেন বহুর  
মত ধনিয়া উঠিল। দু-হাতে ভর দিয়া  
আস্তে-আস্তে বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া  
জয়ন্ত উর্দ্ধমুখে বলিল, “গৌরী, পৃথিবীতে  
কি এখনো চাঁদ ওঠে, তারা কোটে, আলো  
জ্বাসে? এখনো কি আকাশ তেমন নীল,  
গাছ তেমন সবুজ, ফুল তেমন রাঙা?  
আমার কাছে কিন্তু সব যুছে গেছে—  
একেবারে, একেবারে! আমার মনের  
ভিতরে যে মস্ত জগৎ ধু-ধু করছে, সেখানে  
আর চাঁদ হাসে না, সূর্য ওঠে না, রং  
ফোটে না—সেখানে এখন শুধু একজন  
বাসিন্দা আছে, দিন-রাত সে শুধু অবিরাম  
শুদ্ধতার ধ্যান করছে—তার নাম, অন্ধকার!  
তাকে তোমরা জান—কিন্তু আমার মত  
স্পষ্ট করে’ তাকে তোমরা কেউ দেখ-নি,  
কেউ দেখ-নি!”—জয়ন্তের স্বরে কী গভীর  
ক্রন্দনের স্বর।

গৌরী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল,  
“ওগো, তোমার পারে পড়ি, তুমি  
খামো!”

জয়ন্ত আবার বিছানায় এলাইয়া পড়িল।  
প্রাণের আবেগে তাহার দেহ ভোঁড়িয়া  
যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল।  
অনেকক্ষণ পরে অহুতপ্ত কণ্ঠে বলিল,  
“গৌরী, মার অতিশায়ে আজ আমি এমন  
হতভাগ্য!”

—“মা তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন! দেব? আমি ত তোমাকে ভালোবাসতে পারব না! তোমাকে স্নেহ করতে পারি

—“দেখছ, আমার কি পাপ মন! নিজের দুর্ভাগ্যের জন্তে আবার মাকে ছাড়ছি! তার অভিশাপকে অভিশাপ মনে করছি! বাইরের চোখের সঙ্গেসঙ্গে আমার মনের চোখও অন্ধ হ'ল নাকি?”

গোঁরী নিসাড় হইয়া রহিল। জয়ন্তও নীরবে মানমনে কি ভাবিতে লাগিল।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, “এ ঘরে এখন আর কেউ আছে?”

—“না।”

—“আচ্ছা, তাহলে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।... ..তুমি কি এখনো আমাকে ভালোবাস?”

গোঁরী স্বক্স।...অন্ধ জয়ন্ত দেখিতে পাইল না গোঁরী কেমন-করিয়া তাহার সুখের পানে নিঃশেষে চাহিয়া আছে,—তাহার দৃষ্টি কা মমতা-ভরা!

—“এই অন্ধ, রোগের ক্ষেতে কুৎসিত, অকৃতজ্ঞ জয়ন্তকে এখন এ-দুনিয়ায় কেউ ভালোবাসবে না গোঁরী, কেউ ভালোবাসবে না। বোধহয়, তুমিও না।”

গোঁরী জোর-করিয়া কথা কহিল। ব্যাভাৱ্য স্বরে বলিল, “অন্ধ বলে, আমি তোমাকে স্নেহা করব? ...আমি?”

জয়ন্তের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। দুই হাতের দুই মূঠোর মধ্যে বিছলনার চাপির চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, “তাহলে তুমি এখনো আমাকে ভালোবাসো! বেস না গোঁরী, আমার ভালো বেসনা! তোমার ভালোবাসা আমি তোমাকে কি করে’ ফিরিয়ে

পারব না! তোমাকে স্নেহ করতে পারি বোনের মত—কিন্তু আমার প্রাণে তুমি আর-কিছু খুঁজে পাবে না। তোমার সঙ্গে আমি কপটতা করতে চাই না। এ মন থাকে সন্যস্ত সমর্পণ করতে চেয়েছিল, অসময়ে সে আমাকে ত্যাগ করেছে। তাকে যেমন ভালোবেসেছিলুম, তেমন ভালোবাসা আর ত আমি তোমাকে দিতে পারব না! গোঁরী, আমার এই নিষ্ঠুর সত্যকথায় তুমি রাগ কোরো না! বল, এ-কথার পরেও তুমি কি আমাকে ত্যাগ করবে না?”

কোনক্রমে কান্না চাপিয়া লজ্জার বাধ ভাঙিয়া গোঁরী বলিল, “তুমি আমাকে স্নেহা কর—কিন্তু আমি শুধু তোমার ঐ পাঁচটি পূজো করতে চাই—সে অল্পগ্রহ থেকে আমাকে আর বঞ্চিত কোরো না!”

জয়ন্তের সামনে গোঁরী কখনো তাহার মনের কথা এমন-করিয়া আর বলে নাই—বলিতে পারে নাই! প্রাণের দ্বিগুণে ভারী নিষ্ঠীক হইয়া উঠে!

জয়ন্ত ধীরে-ধীরে বলিল, “গোঁরী, আমি তোমার সঙ্গে যে নিদ্রা ব্যবহার করছি, সে-সব ভুলে করণাময়ী দেবীর মত তুমি আমার এই রোগশয্যায় শ্রিয়ন্ত বসে এসে আছ

দিন-রাত্রি আহার-নিদ্রা ভুলে। তোমার সেবা-শুশ্রূষা না-পেলে এ-পৃথিবী থেকে নিষ্ঠুর জয়ন্তের নাম এতদিনে মুছে যেত। যে প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ, সে প্রাণের উপরে এখন তোমারি অধিকার। এ অধিকার থেকে তোমাকে আমি বঞ্চিত করতে পারব না। কিন্তু ভেবে দেখ গোঁরী,—আমি অন্ধ, কুৎসিত,

জীবদ্দশা। আমার এ-দেহ এখন পাথরের মত, এতে আর একবিন্দুও প্রেম নেই। হুর্দহ একটা বোঝার মত, তুমি কি সারা-জীবন আমাকে ঝাড়ে করে' বইতে পারবে?" —এই-বলিয়া জয়ন্ত গৌরীর একখানি হাত লইয়া আপনার বুকের কাছে টানিয়া আনিল।

গৌরীর হাত জয়ন্তের মুষ্টির মধ্যে কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা ফুটিল না।

—“গৌরী, তোমার রূপ আছে গুণ আছে অর্থ আছে। ইচ্ছে করলে তুমি রাজার রাণী হ'তে পার। তবে কেন তোমার জীবনকে ব্যর্থ করতে চাও? দেখ, এখনো ভেবে দেখ, যে ভুল তুমি করতে চাইছ—সে ভুল একবার করলে জীবনে আর শোধরাতে পারবে না—”

জয়ন্তের কথার গৌরীর দেহ কেমন-একটা বিহ্বলতার আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; তাহার গোপন প্রাণের মধ্যে যে বহু অকিঞ্চিৎ এতদিন শৈল-কন্দরে বন্দী নির্ঝর-স্রোতের মত আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছিল,—আজ যেন সে বাহিরে আসিবার

রক্ত খুঁজিয়া পাইল। আজ আর সে আপনাকে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিল না,—আঁচাষিতে জয়ন্তের কোলের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বাসকণ্ঠ অশ্রুসিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, “ওগো, থাক—থাক, আর আমাকে স্বপ্ননা দিও না! এই ভুল যেন আমি জন্মে-জন্মে করি—এই ভুল যেন আমি জন্মে-জন্মে করি।”

জয়ন্ত কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত নিমন্ত হইয়া রহিল; তারপর গাঢ়, কোমল স্বরে ধামিমা ধামিমা বলিল, “ভেবেছিলুম আমার এ ব্যর্থ জীবনটা নির্জল, নির্জন, মরুভূমির মত সংসারের বাইরে পড়ে চিরকাল হা-হা করে' মরবে; কিন্তু তার মাঝখানে তুমি যখন নদীর একটি স্নিগ্ধ ধারার মত কোন নিবেশ না-মেনে বয়ে আসতে চাইছ, তখন এস গৌরী, তোমাকে বাধা দেবার শক্তি আর আমার নেই! দেখ, যদি এ মক-প্রাণ তোমার প্রেমের রসে আবার একটু সরস হয়, এর অগস্ত তৃষা তোমার স্পর্শে আবার যদি শান্ত হয়।”

ক্রমশ

ত্ৰিহেমেন্দ্রকুমার রায়।

## হিন্দুদিগের মন্তকাবরণের পুরাতত্ত্ব

হিন্দু বাঙ্গালীর বর্তমানে জাতীয় মন্তকা-বরণের ব্যবহার না দেখিয়া অনেকেরই মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আমাদের জাতীয় কোন মন্তকাবরণ ছিল না। এই ধারণাটা যে ইতিহাসের প্রমাণে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা

আমাদের আলোচনা দ্বারাই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মন্তকাবরণের প্রথম উদ্দেশ্য মন্তককে শীতাতপের প্রভাব হইতে রক্ষা করা। মনুষ্য কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবনের পূর্বে যে, স্বাভাবিক উপায়ে মন্তক-আবরণের চেষ্টা

পাইবে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রথমাবস্থায় মন্তকের কেশচ্ছেদন কখনও সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং তৎকালে মন্তকের কেশ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইয়া যে জটাক্রমে পরিণত হইত, তাগ সহজেই অস্বীকৃত হয়। এই জটিল কেশ মন্তকে বদ্ধ হইয়াই প্রথম নীতাতপ নিবারণ করিত। শিব ও দুর্গা উভয়েরই যে আমরা “জটাকূটের” উল্লেখ প্রাপ্ত হই, তাহাতেই আমরা মানুষের উল্লিখিত আদিম অবস্থা প্রতিকলিত দেখিতে পাই।

ক্রমে কেশের পরিপাটি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে সংযত কেশ সকল মন্তকে সংযত হইয়াই মন্তকাবরণের কার্য্য করিতে লাগিল। এই সংযত কেশের কার্য্য অধিকরূপে সম্পাদন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মন্তকের শোভা সংবর্দ্ধনের জন্যই শিরোভূষণের কল্পনাও রচনা হয়। শিরোভূষণের কয়েকটি নামের আণোচনা হইতেই পুরাতত্ত্বের এই রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। শিরোভূষণের নাম ‘কিরীট’ ও ‘মুকুট’। ‘মৌলি’ শব্দ অমরকোষে এইরূপে ‘কিরীট’ ও ‘সংযত কেশ’ উভয়ার্থ-বাচী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে :—“চূড়া কিরীটঃ কেশাশ্চ সংযতা মৌলয়স্তরঃ ॥” ‘মুকুট’ শব্দও মৌলি বা সংযত কেশের অর্থই প্রকাশ করে। ‘চূড়া’ শব্দ মুকুটাদির অগ্রভাগ যেমন বুঝায়, তেমনই শিখা বা কেশগুচ্ছকেও বুঝায় যথা :—“শিখাচূড়া কেশপাশী” ইত্যমরঃ।

ইহা হইতে মন্তকের উপর শিখাকারে বদ্ধ কেশরাশির অঙ্গকরণেই যে মুকুট বা কিরীটের কল্পনা হইয়াছে, তাহাই অস্বীকৃত হয়।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক বোধ হয় যে, ‘চূড়া’ শব্দের রূপান্তরেই সাধারণ প্রচলিত ‘চুল’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। চুলশব্দ কেশের বাচক হইলেও কেশ যে আদিকালে চূড়াকারে বদ্ধ হইত, তাহাই ইহার মূল চূড়া শব্দের সহিত যোগ হইতে বুঝিতে পারা যায়।

‘কিরীট’ ও ‘মুকুট’ বিশেষ শিরোভূষণ রূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই বোধ হয়। সচরাচর যে মন্তকাবরণের ব্যবহার হইত, তাহা অস্ত্র প্রকারের ছিল। ইহার নাম ছিল “উক্ষাষ”। ইহার পর্য্যায় শব্দ সকল অভিধানে এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ‘বেষ্টন, বেষ্টক, শিরোবেষ্ট, চেলেণ্ডুক’। শব্দকল্পদ্রুমে “পাগড়ী” ইতিভাষ বলিয়া ইহার স্বরূপ নির্দেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ‘শিরোবেষ্ট’ শব্দের দ্বারা পাকে পাকে মন্তক বেষ্টন করিয়া যে বস্ত্র বদ্ধ হইত তাহাই যে ‘উক্ষাষ’ বলিয়া কথিত হইত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। উক্ষাষ যে কিরীট হইতে পৃথকরূপ মন্তকাবরণ, অমরকোষে ইহার ‘যে নানা অর্থ’ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতেই জানিতে পারা যায়, যথা :—

“উক্ষাষঃ শিরোবেষ্ট কিরীটয়োঃ ॥” “উক্ষাষ” শব্দের শিরোবেষ্ট ও কিরীট এই দুই অর্থ।

উক্ষাষ শব্দ কিরীটেরও বাচক হওয়াতে উক্ষাষ বা পাগড়ীই যে প্রচলিত মন্তকাবরণ ছিল এবং কিরীট উহারই অঙ্গরূপে বিশেষ শিরোভূষণরূপে কল্পিত হইয়াছিল, এই তথ্যই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

উক্ষাষ যে বৈদিক কালের ঋষিদিগেরই মন্তকাবরণ ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায়। “লোহিতোক্ষাষা ঋতিশ্চন্দ্রবতি”



অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি অতীব সুপরিজাত দৃষ্টান্ত। ইহাতে লোহিতোক্ষৌষ ধারণ পূর্বক আত্মিক যে যজ্ঞ-ক্রিয়ায় প্রবর্তমান হইত, তাহাই জানিতে পারা যাইতেছে। বর্তমান বৈদিক কার্যে সেই পূর্বানিয়মের অনুবর্তনেই উক্ষৌষের জন্ত রক্তবর্ণ বস্ত্রের ব্যবস্থা দেখা যায়। যথানিয়মে উক্ষৌষ রচনা না হইলেও পুরোহিত সেই রক্তবস্ত্র দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়াই ক্রিয়া করিয়া থাকেন। এইরূপে বিদ্যুৎ প্রকার নিদর্শন আমাদের দেবকার্য্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উক্ষৌষ ধারণ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বৈদিক প্রমাণ ব্যতীত পৌরাণিক বহুল প্রমাণই পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য সমাপনাতে গৃহস্থাস্রম প্রবেশেই আমরা উক্ষৌষ-ধারণের উল্লেখ প্রাপ্ত হই, যথা :—

“দীর্ঘব্রতোহথ যজ্ঞান্না সপ্তঃ স্নাতুমহতি ।

বৈবৰীং ধারয়েৎ বষ্টমঙ্করাসপ্তখোত্তরম্ ॥

যজ্ঞোপবীত মিতরং সোদকলু করণকম্ ॥

হজকোক্ষৌষময়লম্ পাছুকেচাপ্যপানহৌ ।

রৌজোচকুণ্ডলে ধার্য্যে ব্যুত্তকেশনথঃ শুচিঃ ॥”

কুর্শ্বপুরাণে উপরিভাগে ১৫শ অধ্যায়ঃ ।

“আচরিতব্রত, বিদ্যুৎচেতাঃ, শক্তিমান্ ব্যক্তিই সমাবর্তন দ্বানের অধিকারী। স্নাতক, বংশধতি, অন্তর্কাস, উত্তরীয়-বস্ত্র, যজ্ঞোপবীতঘর ও অলসহিত কমণ্ডলু, এই সকল ধারণ করিবে। নথ কেশ কৰ্ত্তন করিয়া, শুচি হইয়া ছত্র, নির্মল উক্ষৌষ, চন্দ্র-পাছুকা, কাঠ-পাছুকা স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ করিবে।”

এস্থলে সমাবর্তনের পর উক্ষৌষ ধারণের উল্লেখ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থার উক্ষৌষ ধারণ

করা হইত না ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সমুদে ব্রহ্মচারীর ছত্রাদি বর্জনের বিধি দেখা যায়, যথা :—

“অভ্যাজমঙ্গনকাক্ষৌকপাণচ্ছত্র ধারণম্ ॥”

“গাত্রে তৈলমর্দন, চক্ষুতে অঙ্গন প্রদান, ছত্র ও পাছুকা ধারণ ব্রহ্মচারী পরিত্যাগ করিবে।” ছত্রাদির সঙ্গে সঙ্গে উক্ষৌষও বর্জিত হইত বলিয়াই বোধ হয়, তাহাতেই সমাবর্তনের পর ছত্রাদির সহিতই উক্ষৌষ-ধারণও উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরে পুরাণের সমাবর্তন বর্ণনায় কেশ কৰ্ত্তনের উল্লেখ দ্বারা ব্রহ্মচারী যে দীর্ঘ কেশ ধারণ করিত তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই দীর্ঘ কেশের দ্বারাই উক্ষৌষের কার্য্য হইত বলিয়াই তখন উক্ষৌষের কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়া বোধ হয়।

গৃহিণীজের নিত্য-কর্তব্যের মধ্যে এই প্রকারে উক্ষৌষ ধারণের বিধান দৃষ্ট হয় :—

যজ্ঞোপবীত মিতরং সোদরীয়ক ধারয়েৎ ।

স্বর্ণকুণ্ডলে কৈব ধৌতবস্ত্রধর্য্যতথা ॥

অনুলেপন লিপ্তাদঃ কণ্ডকেশনথঃ শুচিঃ ।

ধারয়েৎধেগবং দণ্ডং সোদকক কমণ্ডলুম্ ॥

উক্ষৌষমলচ্ছত্রং পাছুকে চাপ্যপানহৌ ।

ধারয়েৎ পুষ্পমাণ্যেচ স্নগন্ধে শ্রিয়দর্শনঃ ॥

নিত্যমধ্যায়শীলক যথাচারঃ সমাচরয়েৎ ॥”

বৃহদ্রারদীয় পুরাণ ২৪শ অধ্যায় ।

“দ্বিজগণ, উত্তরীয়সহ যজ্ঞোপবীতঘর, স্বর্ণময় কুণ্ডল-মুগল, বৈবর্ণদণ্ড, সজল কমণ্ডলু, উক্ষৌষ, নির্মল ছত্র, পাছুকাযুগল ও উপানয়-যুগল এবং স্নগন্ধ পুষ্পমালা ধারণ করিবে। সতত পবিত্র থাকিবে, কেশ ও নথ ছেদন করিবে, নিত্য অধ্যয়নশীল হইবে, গাত্রে

চন্দ্রসীমাদি লেপন এবং যথাবিহিত কার্যের  
অনুষ্ঠান করিবে।”

“যথেষ্ট শিরাত্ত্বস্তে যদুত্তে দক্ষিণাযুগঃ।

সোপানংকচ্চ যদুত্তে তথৈবদ্যাসিভুজতে ॥”

গৃহীর সাধারণ জীবন-ব্যাপারের মধ্যে  
উফীষ-ধারণ এই প্রকারে অন্তর্ভুক্ত  
হইয়াছে :—

৩য় অধ্যায়।

“ধারেরদৈগ্ধবীং যষ্টিমন্তুকীসন্তোত্তরম্।

যজ্ঞোপবীতাবতরং সোদকক কমণ্ডলুয়।

ছত্রকোক্ষমলং পাদুক বাপ্যুপানবো।

রোম্মেচ কুণ্ডলে নিত্যং কৃত্তকেশনথঃ শুচিঃ ॥

“শুক্লাধরধরো নিত্যং সুগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ।

নজীর্মলবদ্যাসা ভবেদৈ বিত্তবে সতি ॥”

সৌরপুরাণ ১৭শ অধ্যায়।

“গৃহী বেণুযষ্টি, অন্তর্বাস, বস্ত্র, উত্তরীয়,  
যজ্ঞোপবীত দ্বিতীয়, জলপূর্ণ কমণ্ডলু, ছত্র,  
নির্মল উফীষ এবং পাদুকাযুগল অথবা উপানৎ  
যুগল আর সুবর্ণকুণ্ডলবয় নিত্য ধারণ করিবে।  
ছিন্নকেশ, ছিন্ন নথ, শুচি, গুরুবস্ত্রধারী,  
সুগন্ধ ও প্রিয়দর্শন হইবে। বিভব থাকিলে,  
জীর্ণ বা মলিনবস্ত্র পরিবে ন।”

আহাবের সময় শিরোবেটন ও উপানৎ  
পরিত্যাগের বিষয় পুরাণে এইরূপ লিখিত  
হইয়াছে :—

“যদুত্তে বেষ্টিত শিরা যচ্চ ভুত্তে বিদিশুখঃ।

সোপানংকচ্চ বোভুত্তে সর্গাযিচ্ছান্তহাস্তরম্ ॥”

কুর্শপুরাণে উপরিভাগে ২১শ অধ্যায়ঃ।

“বেষ্টিতশির হইয়া, বিদিশুখ হইয়া  
(অগ্ন্যাদিকোণে মুখ ফিরাইয়া) কিংবা চন্দ্র-  
পাদুকা পরিধান করিয়া ভোজন করিলে  
সেই ভোজন অশুভের তৃপ্তিকর হয় জানিবে।”

এ-সম্বন্ধে মহাসংহিতায়ও তুল্যরূপ ব্যবস্থাই  
দেখা যায় :—

ইহা হইতে ভোজনকালে বাতীত অল্প  
সময়ে যে উফীষ-ধারণের নিয়ম ছিল তাহা  
স্বতঃই উপপন্ন হয়।

উফীষ ব্যতীত অল্প প্রকারের মন্তকা-  
বরণের প্রমাণও আমরা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত  
হই। এহঁ আবরণের নাম “শিরস্ত্রাণ”।

উফীষ যেমন পাগড়ার তায় আবরণ,  
ইহা তেমনই টুপির তায় আবরণ। শিরস্ত্রাণ  
বিশেষরূপে যুদ্ধাস্ত্ররূপেই আমাদের নিকট  
পরিচিত। ইহার নাম হইতেই শিরঃ বা  
মস্তকের রক্ষাহঁ যে ইহার কার্য্য, তাহা  
অন্যাসেই উপলব্ধি করা যায়। অমরকোষ  
অভিধানে শিরস্ত্র শব্দ যুদ্ধোপকরণবাচী শব্দ  
সকলের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যথা :—

“অথ শীর্ষকম্।

শীর্ষণ্যক শিরস্ত্রে ॥”

“শীর্ষণ্য” শব্দ যেমন শিরস্ত্রাণের বাচক,  
তেমনই ইহা নির্মল কেশেরও বাচক,  
যথা :—

“শীর্ষণ্য শিরসৌ বিশদেকচে ॥” ইত্যমরঃ।

এই প্রকারে “শিরস্ত্র” বা টুপিরূপ  
মন্তকাবরণের সহিতও মূলে চুলেরই যোগ  
দেখা যাইতেছে।

একই ‘শীর্ষণ্য’ শব্দ নির্মল চুল ও টুপির  
বাচক হওয়ায় টুপি যে বিলাসোপকরণরূপেই  
নির্মল চুলের উপর ব্যবহৃত হইত, তাহারই  
যেন আভাস পাওয়া যায়।

বৈদিক ও পৌরাণিককালে যেমন উফীষ

ধারণের সাধারণ রীতি দেখা যায়, তাত্ত্বিক-কালে তেমনই শিখাধারণের সাধারণ রীতি দেখা যায়। তাহাতেই তাত্ত্বিক ক্রিয়াকাণ্ডে বৈদিক ক্রিয়ার দ্বারা উকীলের কোন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না; তাহাতে তৎপরিবর্তে শিখা বন্ধনেরই বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয়। তাত্ত্বিক দীক্ষার শিখাধারণ বিশেষরূপে বিহিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে তত্ত্বের বিশেষ প্রভাবের

সঙ্গে সঙ্গে শিখাধারণ যে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। শিখাধারণ উকীল এই প্রকারে স্থানচ্যুত হইয়াই ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দু যদি কোন মন্তকাবরণ নিজের জাতীয় মন্তকাবরণ বলিয়া দাবী করিতে চায়, তবে প্রাচীন উকীলকেই নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী।

## চোখের দেখা

ঘাটের পথে বটের ছায়া তলে  
একটু দাঁড়ায় অল্প মনের ছলে,  
একটু আঁধার একটু আলোর মেলা—

যুঁইটি কোটার বেলা,  
ভুকর কোণা স্নক কোণায় নজর নাহি চলে,  
হয় না ঠাহর চুলের ছায়া তলে।

ঠোঁটের রাজা—চোখের হাসি কালো—  
নিশীথ-সাগর-সাঁতার-দেওয়া

বাঁকা চাঁদের আলো—

চাই না আমার চাই না অধিক আর,  
ওই টুকুতেও নেই যে অধিকার।

ভেঁকা বলে' যেটুকু পাই ভালো—  
ঠোঁটের জীব্য রাজা হাসি, চোখের হাসি কালো।

গাঁয়ের পথে কিরব যখন সঁকে  
প্রাণের ভিতর সোণার সারং বাজে।

পিছন হাতে কেমন জানি কেন  
যবের ক্ষেতে বাতাস বারেক নিঃশ্বাসিল যেন,

ফুলল হবে আকাশ তবু অন্তর্মহের তাঁলে,  
গাঁয়ের পথে কিরব যখন সঁকে।

একলা কাটে জ্যোৎস্না আমার শূন্য আঙিনাতে,  
ঝাঁঝ করে বিজন রাতি ঝাঁঝি যখন মাতে।  
যতেক স্বপন বকের পাখার মত  
চোখের আগে ভিড় করে সব কত,—  
টাটকা-টানা একটি ছবি ফুটেবে সবার সাথে,  
ফুটুকুটে মোর জ্যোৎস্না-আঙিনাতে!

এমনি করে' মনটি চুরি কোরো,  
বেখান-লেখান ঘুরে বেড়ায়—

কাঁচপোকাটি ধোরো;  
মেরে রেখো কোটোর তুলে,  
গোলাপ যখন পড়বে চুলে  
টিপ্ করে' সেই কপালটিতে পোরো;  
এমনি করে' মনটি চুরি কোরো।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

## প্রতিভার লক্ষণ

প্রতিভা জিনিষটা নাকি অনেক বোগের মতই বংশগত,—গ্যাল্টন, রিবট প্রভৃতি পণ্ডিতরা এই মত-বাদী। কিন্তু এই নিয়ে বিশ্বের মতভেদ দেখা যায়। ছুই পক্ষেরই যুক্তি এবং প্রমাণ দেখলে কোন-একটা স্থিতি-সিদ্ধান্তে পৌঁছানো মুশ্কিল,—মনে হয় যেন ছুই দলই ঠিক কথা বলছেন।

বিশেষ অমুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, সঙ্গীত-প্রতিভা প্রায়ই বংশানুক্রমিক। প্যাগেনসট্রীনা, বেন্দা, ভুসেক, হিলার, একহরন,—এঁরা সকলেই নামজাদা গাইয়ে-বাজিয়ের ছেলে ছিলেন; বিখ্যাতেনের বাপ ও ঠাকুরদাদা দুজনেই সঙ্গীতবিদ ছিলেন; এই প্রসঙ্গে প্রশ্রয়ার বিখ্যাত Bach পরিবারেরও নাম করা যেতে পারে। এই পরিবারে যথাক্রমে আটপুরুষ ধরে সঙ্গীত-প্রতিভা বিকাশ লাভ করেছিল; Viet Bach নামে একজন কটিওলা এই পরিবারের আদিপুরুষ, সে কটি সেক্ট আর সময় পেলে মাঝে মাঝে বেহালা বাজাত। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এই পরিবার থেকে যে কত গাইয়ে-বাজিয়ে লোক বেরিয়েছিলেন, তার হিসাব করা যায় না। কবিদের ভিতরও আমরা দেখতে পাই, ম্যানজোনি, লুকান, ট্যাসো, এরিষ্টো, ক্রুসিন্সা, র্যাফাইন, সোফোক্লিস, কোলরিজ, ডুম, ও দোদে প্রভৃতির প্রতিভা উদ্ধৃত পুরুষ থেকে নেমেছিল। প্রাকৃত বিজ্ঞানে,—পলিনিস, ডারউইন, ডি ক্যানডোল, হকার, হর্শেল,

জুস্তো, Sassure, জিওক্কে, সেন্ট হিলেরার প্রভৃতি, দর্শনশাস্ত্রে স্ক্যালিজার্স, Voissus, ফিচার, হুমবোর্ট, স্টেলজেল, গ্রাম প্রভৃতির এবং রাজনীতিতে—পিটস্, ফক্স, ক্যানিং, ওয়ালপোল, পিল, ডিসরেলী প্রভৃতি সকলেরই প্রতিভা বংশগত।

সিসেগো, কনডরসেট, কুভিয়ার, বাফোঁন, গেটে, সিডনি-শ্মিথ, কাউপার, নেপোলিয়ান, ক্রমরেল, চ্যাটারব্রিগাও, স্কট, বায়রণ, লামারটিন, সেন্ট অগষ্টিন, গ্রে, স্নইক্ট, ফন্টেনেল, ম্যানজোনি, ক্যান্ট, ওয়েলিংটন ও ফস্কলো প্রভৃতির প্রতিভা তাঁদের মায়ের দিক থেকে এসেছিল; আর বেকন, র্যাফেল, ওয়েবার, সিলার, মিলটন, এলবার্টি, ট্যাসো প্রভৃতি, আপন আপন পিতৃ-প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। এই-সব প্রমাণ দেখলেও, একটা কথা মনে রাখতে হবে, কেবল জনকয়েক প্রতিভাবানের পিতৃ-মাতৃ কুলের কেউ কেউ ছাড়া—ধরতে গেলে আর সকলে এমন-কিছু বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি।

আর এক দিক দিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, প্রতিভাবানদের মধ্যে, অনেকেই বিবাহ করেন নি; আবার যারা বিবাহ করেছেন তাঁরাও নিঃসন্তান অবস্থায়ই মারা গিয়েছেন। বেকন একজায়গায় হুঁখ করেছেন “The noblest works and foundations have proceeded from childless men” ইংলণ্ডের বেশীভাগ

কবিরই বংশলোপ হয়ে গিয়েছে,—সেখানকার  
সেকস্পীয়ার, বেন-জনসন, মিলটন, অটওয়ে,  
ডাইডেন, রো, এডিসন, পোপ, সুইফট,  
গে, জনসন, গোল্ডস্মিথ, কাউপার, হব্‌স,  
ক্যামডেন প্রভৃতির বংশের কেহই আর  
বর্তমান নাই।

মাইকেল এঞ্জেলো, কাণ্ট, নিউটন,  
পিট, ফক্স, ফনটেনেল, বিথোভেন,  
গ্যাসেণ্ডি, গ্যালিলিও, লক, গ্রে, হিউম,  
গিবন, মেকলে, ল্যাঘ, লেনার্ডা ডা ভিন্সি,  
কোপারনিকাস, ভলটেরার, ফ্রুবেয়ার,  
কস্কোলো, ও ম্যাজিনি প্রভৃতি এবং  
জীলোকদের মধ্যেও অনেকেই বিবাহই  
করেন নি!

অনেক সময়ে আবার দেখা গিয়েছে  
যে, এঁদের বিবাহিত জীবন মোটেই সুখকর  
হয়নি। সেকস্পীয়ার, দান্তে, মারজোলো,  
বাররণ, কোলরিজ, এডিসন, ল্যাণ্ডর,  
কারলাইল, কমটে, হেডন, মিলটন, ডিকেন্স  
প্রভৃতির দীর্ঘায়ু জীবন অত্যন্ত কষ্টে  
অতিবাহিত হয়েছিল।

প্রতিভাশালী লোকদের মধ্যে একটা  
জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, এঁরা  
যেমন বাপ-মার প্রতিভা নিজেদের মধ্যে পেয়ে  
থাকেন, তেমনি অনেক স্থলে তাঁরা নিজেরাই  
স্বাভাবিক পাগল, অথবা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য সন্তানের  
জন্মদাতা হন। অনেকে বলেন যে, প্রতিভা  
জিনিষটি বংশের ভিতর দিয়ে নামতে নামতে  
ক্রমেই ক্ষীণবল হয়ে পড়ে, শেষে একটা  
কর্মসূচী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন প্রতিভাবানের  
সন্তানদের চরিত্র আলোচনা করে দেখা

যাক্ :—সিপিও \*আফ্রিকেনাসে~~সে~~ ছেলে  
একেবারে নিরেট মূর্তি ছিল; সিসেরোর  
ছেলে ভয়ানক মাতাল ছিল; লুথারের  
ছেলে অতিশয় অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিল;  
উলিয়ান পেন, থেমিষ্টক্ল, এরিষ্টাইড,  
পেরিক্লস্, থুসিডাইড প্রভৃতি আপন  
আপন সম্বানের জন্ত অত্যন্ত অসুখা  
ছিলেন। কারডানের দুই ছেলে, কিন্তু  
দুটিই ছিল অবতার-বিশেষ; একটি বিষ  
খাটয়ে লোক-মারার দণ্ড ফাঁসিকাঠে প্রাণ  
দিয়েছিল, আর-একটি চুরি-জুড়ুরি প্রভৃতি  
নানা গুণের জন্তে বার ছয়েক শ্রীঘর-বাসের  
পরও সায়েস্তা হয়নি। প্রেত্রাকের ছেলে  
ছিল অত্যন্ত অলস ও ভয়ানক বদমাইস।  
বেমত্রাও তাঁর ছেলে টিটাসকে অন্ধন-বি  
শেখাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিশেষ  
কিছু সুবিধা করে উঠতে পারেন-নি।

ওয়ালটার স্কটের পুত্র, পিতার সাহিত্য-  
সেবার জন্তে মনে মনে বিশেষ লজ্জিত  
ছিলেন। তিনি প্রায়ই গর্ক করে বলতেন,  
“সোভাগ্যের বিষয় আমি বাবার একখানি  
বইও পড়িনি।” মোজার্টের ছেলেও  
কোন সভায় একদিন জিজ্ঞাসা করা  
হয়েছিল “সঙ্গীতে আপনার কেমন অগ্রগতি?”  
এই কথা শুনে সে পকেট থেকে একমুঠো  
টাকা বার করে টেবিলের উপর রাখা  
করে ফেলে দিয়ে বলে, “হুনিয়ার এই  
আওয়াজ ছাড়া আর কোন যন্ত্রের বাজনা  
আমার কাছে বিষ ঢেলে দেয়।”

বংশগত প্রতিভার বিরুদ্ধমতবাদীরা  
বলেন, প্রতিভাশালীরা একদিকে যেমন  
প্রায়ই পাগল, রুগ্ন কিংবা বদমাইস সন্তানের

জন্ম দিয়ে থাকেন, তেমনি তাঁরা নিজেবাই আবার অনেক সময় ঐ সব গুণ-বিশিষ্ট বাপ-মায়ের সম্ভান হন। এঁই সমস্ত্রায় পড়েই বোধ হয় La Bruyère বলেছেন “These men have neither ancestors nor descendants they themselves form their entire posterity.” সোফোক্লিসের-পিতা একটি হ্রস্ব মাতাল ছিলেন। পিটার দি গ্রেটের বাবাও অত্যন্ত বাতিকগ্রস্ত এবং হ্রস্ব মাতাল ছিলেন। প্রতিভাবানদের জন্মদাতাদের সম্বন্ধে এরকম আরো অনেক প্রমাণ খাড়া করা যেতে পারে।

ডি কাণ্ডল এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, জারজ সম্ভানদের মধ্যেও অনেক প্রতিভাবান পুরুষ দেখা গিয়েছে। ইরেজমাস গর্ক করে বলতেন, “I am not the fruit of a conjugal duty.” আইজাক ডিসরেলী তাঁর Memoirs of Toland নামক পুস্তকে এক জায়গায় বলেছেন, জারজদের বুদ্ধি প্রায়ই সাধারণ শ্রেণীর চেয়ে একটু বেশী সাক্ষর থাকে, —থেমিষ্টকেলস, চার্লস মারটেল, উইলিয়াম দি কঙ্কারার, ডিউক অব বারউইক, লেনার্ডা ডা ভিল্লি, বোকাঁসিও, এ, ডুমা, কারডান, ডা’লেমবার্ট, স্যাভেন্স, প্রায়ার, ভি থিয়্যারডিন, লা হার্প, আলেকজান্দ্র, ফানে’ প্রভৃতি ব্যক্তিই তাঁর জলন্ত প্রমাণ। \*

প্রতিভা যেমন সব সময়ে বংশাধিকৃতিক হয় না, তেমনি পাগলামী রোগটাও যে সব সময়ে বংশাধিকৃতিক হয় সে কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তবে গড়পড়তা

হিসাব করতে গেলে প্রতিভার চেয়ে পাগলামীর হিসাবটাট বেশী দাঁড়িয়ে যায়। পাগলামীর মতন বদমাঈসী এবং মদের উপর অত্যন্ত ঝোঁক প্রায়ই বংশের ভিতর দিয়ে নেমে থাকে। এক্ষেত্রে বিলাতের বিখ্যাত জুক্স-পরিবারের নাম করা যেতে পারে। ম্যাক্স জুক্স নামে একজন মাতাল থেকে এদের বংশের উৎপত্তি হয়, পাঁচতর বংশের ধবে এই পরিবার ২০০ চোর ও খুনে, ২৮০ জন রুগ (অন্ধ, বুদ্ধিহীন, যক্ষারোগী), এবং ৯০টি বেজা সরবরাহ করে এসেছে। এদের সায়ন্তা করবার জন্য সরকারকে প্রায় তিনকোটি টাকার উপর খরচা করতে হয়েছিল।

আগের প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রতিভাবানদের মধ্যে অনেকের খুব ছেলে-বেলাতেই প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। দাস্তে নয় বছর বয়স থেকে বিয়াজ্রিচের উপর প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। ট্যাসো দর্শন বছর বয়সে প্রথম কবিতা লেখেন। প্যাস্ক্যাল, কম্‌টে, ফারনিয়ার, জোনাথান, এডওয়ার্ডস, Niebuhr, মাইকেল এক্সিলো, গ্যাসেমি, Boussuet, ভলটেয়ার প্রভৃতির প্রতিভা সাত থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যেই বিকশিত হয়েছিল। পিকো ডিগা, মিরাগোলা ছেলে-বয়সে ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, চালডিয়ান ও আরব্য ভাষা শিখেছিলেন। গেটের বখন দশ বছর বয়স তখন তিনি একটা ছোট গল্প লিখে সাতটা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তর্জমা করে দেখিয়েছিলেন। Wieland সাত বছর বয়সে ল্যাটিন বেশ

ভাগরকম দখলে এনেছিলেন। Kotzebue সাত বছর বয়সে গ্রহসন রচনা করতে চেষ্টা করেন এবং আঠার বছর বয়সের সময় তাঁর প্রথম বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়। সিগারের যুগান্তকারী *Räuber* যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ। পোপের বিখ্যাত কবিতা *Ode to Solitude* বার বছর বয়সের সময় রচিত হয় এবং ষোল বছর বয়সের সময় তিনি *Pastoral* নামক কবিতাটি রচনা করেন। মেয়ারবীঘর পাঁচ বছর থেকেই পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করেন। ক্লড বোসেফ ভানে' চার বছর বয়স থেকেই ছবি আঁকতে শুরু করেন এবং কুড়ি বছর বয়স হবার আগেই তিনি একজন বিখ্যাত চিত্রকর হয়ে উঠেছিলেন। ওয়েটনের যখন পাঁচ বছর মাত্র বয়স, তখনই তিনি লাতিন, গ্রীক, এবং হিব্রু ভাষায় লিখতে পারতেন, দশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি চালডিয়ান, সীরিয়ক এবং আরব্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। র্যাকেল চোদ বছর বয়সেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন, *Restif de la Bretonna* এগার বছর বয়স থেকেই মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে শিখেছিলেন এবং চোদ বছর বয়সের সময় তিনি একটি কবিতা লিখে তাঁর প্রথম বার জন উপপত্নীর নামে উৎসর্গ করেন।

পাগলা-গারদের অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, খুব ছেলে-বেলাতে যাদের প্রতিভা স্মৃতিত হয় একটু রয়স হলেই তাদের মাথা-খারাপের লক্ষণ

দেখা দিতে থাকে, আর পাগলদের ছেলে-পিলেদের ভিতরও এ-রকম অকালপক্কতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

প্রতিভাবানদের মধ্যে ভবঘুরে হয়ে বেড়ানোর একটা বিশেষ বাতিক লক্ষ্য করা যায়;—বিনা কাজে, বিনা উদ্দেশ্যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে অনেকে কত সময়ে কত যে বিপদে পড়েন, তার ঠিক নেই। কেন এবং কিসের ঝোঁকে যে তাঁদের এমন বাতিকে ধরে, তার কোন বিশেষ কারণ তাঁরা নিজেরাই জানেন না! চিকিৎসকেরা বলেন, মাথা-খারাপের এও একটা বিশেষ লক্ষণ। হাইন, আলফোর, বায়রণ, গিয়োওডনো ক্রুনো, লিওপার্ডি, ট্যাসো, গোল্ডস্মিথ, ষ্টার্ন, গটিয়ার, মুসে, লেনো প্রভৃতি সকলেরই এইরকম খামকা ঘুরে বেড়ানোর বদ-অভ্যাস ছিল।

হোল্ডারিন প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে এমনি লক্ষ্মীছাড়ার মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, প্রেত্রার্ক, প্যাইসিল্যো, Lovoisier, সেলিনি, Cervantes,—এঁরা এই বদ-অভ্যাসের দরুণ কত সময় কত যে ফাঁসাদে পড়েছিলেন, তবুও তাঁদের খেয়াল ছোটো-নি। মেয়ারবীঘর প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে লক্ষ্মীহীনের মত ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। বেশ-ভ্রমণের সময় তিনি রেলগাড়ীতে বসে বসে গীতি-নাট্য লিখতেন। ওল্গানের রীগা থেকে হেঁটে প্যারিতে গিয়েছিলেন।

প্রতিভার দরবারে জীলোকের আসন খুবই অল্প,—একেবারে নেই বললেও অতুষ্টি হয় না। অবশ্য, আজকাল জোর করে

এই সত্য প্রচার করার বিশেষ ভয় আছে। তবে একমাত্র ভরসা যে কথটা আমাদের নিজেদের বানানো নয়। একটা বাপার বহুকাল থেকে লক্ষ্য করে আসা হচ্ছে, যে সব দেশে হাজার হাজার মেয়ে গান শেখে অথবা গান-বাঁজনার বিশেষ চর্চা করে থাকে, তাদের মধ্যে একজনও ভাল গান রচনা করতে পারেন না। আমেরিকায়, যেখানকার মেয়েরা বিশেষ রকম উন্নীতশীল বলে জগতের মধ্যে পরিচিত, সেখানকার ছয়শত স্ত্রী-চিকিৎসকের মধ্যে একজনও তেমন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। শুধু আমেরিকায় কেন, কৃষিগার কয়েকজন মাত্র স্ত্রী-চিকিৎসক ছাড়া পৃথিবীর আর কোন জায়গার কোন স্ত্রীলোকই এই বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। অবশ্য মেয়েদের মধ্যে মেরি সোমারভিল, জর্জ ইলিয়ট, জর্জ স্যাণ্ড, ড্যানিয়েল ষ্টার্ন, মেরিনি, স্যাফো, মিসেস ব্রাউনিং প্রভৃতি কয়েকজনকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এঁদের সকলের প্রতিভা একত্র করলেও এক মাইকেল এঞ্জিলো, এক নিউটন অথবা এক বালজাকের প্রতিভার সম্মুখে হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। মিলের মতন লোক, যিনি স্ত্রীলোকদের দিকে অতিরিক্ত স্পর্শপাতী না হয়ে কখনো কোন বিচার করতে পারেন-নি, তিনিও বলেছেন—“স্ত্রীলোকদের মধ্যে মৌলিকতার অত্যন্ত অভাব; আসল কথা তাঁরা বড় বেশী-রকমের রক্ষণশীল।”

প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

তাপমান যন্ত্রের মতন, পাগলাদের খেয়ালও বাড়ি কমে। অল্পসকানে দেখা গিয়েছে, প্রতিভাধরদের জীবনের উশ্বরেও স্বাভাবিক পরিবর্তনের প্রভাব বিশেষ রকমে আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। বিখ্যাত অধ্যাপক মাইন ডি বিরান একজায়গায় বলেছেন—“গুন্সোট পড়লেই আমার মন একেবারে দমে যায়, বুদ্ধিভ্রম যেন উবে যেতে থাকে, অনেক চেষ্টা করেও মনটাকে কোন কাজে লাগাতে পারিনা; এমন কি, কর্তব্য কাজগুলোতে পর্যাপ্ত যেন বিরক্তি ধরে, কিন্তু আকাশ আবার পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের কুর্তি ফের ফিরে আসে, কাজে মন লাগে।” দেখা গিয়েছে যে, প্রতিভাবানদের অনেকে শীতকে ভাবি ডরাতেন। নেপোলিয়ানের মত অমন যে দিগ্বিজয়ী বীর, যিনি বড় বড় লড়াই হেসে-খেলে ফেটে করে এসেছিলেন, তিনিও জুলাই মাস পর্যাপ্ত ঘরে দিনরাত আগুন জালিয়ে রাখতেন। ভলটেরার ও বার্কো বছরের কোন সময়েই ঘরের আগুন নিবিয়ে শুতে পারতেন না। বায়রণ বলতেন ঠাণ্ডাকে আমি ঘরের মত ভয় করি। স্প্যালাজোনি, লিওপার্ডি, গুইল্টি, Paisiello, Varillas, Mèny, আরনড্ প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত শীতভীত ছিলেন।

গিয়োরডিনি রোদে না বসলে লিখতেই পারতেন না। যখন রোদ না থাকত তখন ঘরে দশ-বারটা লঠন জ্বলে, আর-একটা বড়গোছের আগুন করে তার সামনে বসে তবে লিখতেন। নভেম্বর মাসে ফস্কলো এক জায়গায় লিখেছেন—“এখন



আমি সর্বদাই আগুনের সামনে বসে থাকি, বন্ধুশত্রুবেরা ঠাট্টা করে—কিন্তু কি কর্ণ, আগুন ছেড়ে আমি উঠতে পারিনা, যদিও আগুনের সামনে বসে বসে আমার চোখ ছোটো ফুলে উঠেছে।” মিলটন তাঁর কয়েকটি লাতিন কবিতায় স্বীকার করেছেন যে, শীতকালে তিনি নিখতে পারতেন না, বসন্ত কিংবা শরৎকাল ছাড়া অল্প সময় বাগদেবী যে তাঁর কাছ থেকে কোথায় সরে পড়তেন, তার খোঁজ পাওয়া মুকিল হয়ে উঠত।

১৬৭৮ খৃঃ অব্দের শীতকালে একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, “এ-রকম শীত যদি আর বেশী দিন থাকে তাহলে আমার কল্পনার অবাধ গতি হ্রত চিরদিনের জন্ত থেমে যাবে।”

পুস্কিনের মাথা শরৎকালে সব-চেয়ে সাক্ষ থাকত। আবার বসন্তের সময় তাঁর মন এমন অবসাদে ভরে আসত যে, সে সময় তাঁর দ্বারা আর কোন কাজ হওয়া সম্ভব ছিল না। সিলারের কতকগুলো চিঠিতে বুঝতে পারা যায়, শীতের সময় তিনিও বড় কাতর হয়ে পড়তেন, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক জারগায় তিনি লিখেছেন, “এমন সময় কোন কাজ করা দূরে থাক, কৈনিকরকমে বেঁচে থাকাই আমার পক্ষে হ্রস্ব হয়ে উঠেছে। আকাশের ও প্রকৃতির অবস্থা যতই দেখছি আমি যেন ততই দমে যাচ্ছি।” রুসো বলেছেন, “গরমের সময় তাঁর রচনা-শক্তি যেমন খুলত, তেমন আর অল্প কোন সময় না।” দান্তে তাঁর প্রথম সনেট ১২৮২ খৃঃ অব্দের ১৫ই জুন

তারিখে লেখেন, ১৩০০ খৃঃ অব্দের বসন্তে তিনি বিখ্যাত Vita Nuova শেষ করেন। ডারউইন, প্রেজার্ক, মাইকেল এঞ্জিলো, ম্যানজোনি, মিলটন, বালজাক, গিয়োরডনো ব্রুনো, ব্রান্সন, ভলটেরার ও গেটে প্রভৃতির অধিকাংশ উৎকৃষ্ট রচনার একটিও শীতের সময় রচিত হয়-নি। পৃথিবীর বড় বড় প্রতিভাবান লোকে কোন্ সময় কি কি কাজ করেছিলেন, লম্বাজো এক জারগায় তার একটা সুন্দর তালিকা দিয়ে দেখিয়েছেন। জ্যোতির্বেত্তারা—এমন-কি, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত যা-কিছু বড় কাজ করেছেন, তার বেশীর ভাগই গ্রীষ্মকালে করা হয়েছে। শীতের সময় কারো কারো প্রতিভা খুলত বটে, কিন্তু প্রতিভাবানদের মধ্যে সেটা স্বাভাবিক নয়, আর এ-রকম দৃষ্টান্তও খুব বিরল।

এই-সব প্রতিভাবানের সকলেরই যে ঠিক গ্রীষ্মকালেই প্রতিভা স্ফুরিত হ’ত এমন কথাও নিশ্চিত রূপে বলা যেতে পারে না। তবে মোট কথা এই, শীতের সময় এঁরা এতটা কাবু হয়ে পড়তেন যে, (দুই-একজন বাদে) সে সময় কোন কাজে হাত দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠত না। কখন, কায় প্রতিভার বিকাশ হ’ত তার একটা ছোটখাটো তালিকা দেওয়া গেল—স্প্যালান-জোনির বসন্ত কালে, গুইল্টি ও আরক্যান-জেলিওর মার্চ মাসে, লামারটিনের আগস্টে, কারক্যানো, ব্রান্সন ও এলফেরির সেপ্টেম্বরে, ম্যালপিগি ও সিলারের জুন এবং জুলাই মাসে, ভিক্টর হিউগোর মে মাসে, বেরানজারের জাহুয়ারিতে, বেলির নভেম্বরে, মেলির

এপ্রিল মাসে, ডিসেম্বর নভেম্বর ও ডিসেম্বরে, গ্যালভিনির এপ্রিলে, গ্যাঘাটের জুলাই মাসে, পার্টার আগষ্টে এবং লুথারের মার্চ ও এপ্রিল মাসে।

বাক্লি তাঁর History of Civilization গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, “যেখানে আগ্নেয় পর্বতের আধিক্য সেট প্রদেশই হচ্ছে প্রতিভা-বিকাশের পক্ষে উপযোগী স্থান।” জ্যাকবি বলেন, “বড় ব্যবসাক্ষেত্র ও বড় বড় সহরেই বেশীভাগ প্রতিভাশালী লোক আবির্ভূত হয়ে থাকেন। কিন্তু তা ছাড়া প্রাকৃতিক অবস্থা আর জল-হাওয়ার উপরও এ বিষয় অনেকটা নির্ভর করে।

প্রতিভা-বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। কিন্তু তা বলে আফ্রিকার মতন গরম দেশ হলেও চলবে না—তাত্ত-করে’ প্রতিভা শুকিয়ে

আমসি হয়ে যেতে পারে। গরম দেশের পরেই, প্রতিভা-বিকাশের পক্ষে উপযোগী স্থান হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ ও পাহাড় জায়গা। অবশ্য, এই-সব জায়গার সঙ্গে বাইরের দেশগুলির ভাবের আদান-প্রদান থাকাও বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং এইটা নাই বলেই সুইজারল্যান্ডের মত অমন সুন্দর দেশেও প্রতিভাবান লোকের আবির্ভাব এত কম। ইউরোপের মধ্যে ইটালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে যত প্রতিভাশালী লোক জন্মেছেন, সেখানকার আর কোন দেশে তত হয়নি। খোঁজ করলে আরো দেখা যাবে যে, ঐ সকল দেশের মধ্যেও, অধিক-উষ্ণ এবং পর্বতীয় স্থানগুলিতেই প্রতিভাধরের আবির্ভাব হয়েছে বেশী।

শ্রী প্রমোদকুমার আতর্ষী।

## কে ?

( ১ )

“সখিরে তু বোলো

• • • • •

কি আছে সো আঁখিয়াতে মই পরাণ চারালো”

সতাই কি আমি সেই আঁখি দুটি দেখিবামাত্র ‘পরাণ’ চুরাইয়াছিলাম?

তাকে প্রথম দেখি, একটা মেলায় জনতার মধ্যে। ভিড় ঠেলিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ একজনের সম্মুখে পড়িয়া গেলাম, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি এক তরুণী।

তিনিও একবার আমার দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়াই চক্ষু নত করিলেন; কিন্তু সেই যে চারিচক্ষুর মিলন, আমি অনেকদিন পর্যন্ত তা ভুলিতে পারি নাই।

( ২ )

তাহার পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আমি এখানে ডাক্তারি পাশ করিবার পরে অল্পদিন বিলাতে ছিলাম। সেপান হঠতে বিলাতি হরকের তক্কা আদায় করিয়া লইয়া দেশে ফিরিয়া প্রায়কটিন্স আরম্ভ করিয়াছি। মা মাঝে মাঝে বিবাহের

জ্ঞান আমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরেন। হচ্চে, হবে বলিয়া আমি কথাটা চাপা দিই এবং কোন “সম্বন্ধের” কথা উল্লেখ করিলেই একেবারে ক্ষেপিয়া উঠি,—পোত্রমুখদর্শন-লোলুপ মা আমার, ছেলের রকম সকম দেখিয়া অবাক হইয়া যান, বোধ হয় ভাবেন সমুদ্রের পারে হৃদয়খানা হারাইয়া আসিয়াছি—বুঝিবা। আমি মনে মনে হাসি। তখন কোন বিদেশিনীর নহে, সেই অপরিচিতা বিদেশিনীর চোখ দুটি মনে জাগিয়া ওঠে। কিন্তু সেই জ্ঞানই কি বিবাহে ইচ্ছা নাই? হস্তকর! তাও নাকি হয়! তবে যে কারণেই হউক আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই এইটে ঠিক। পাঠক ইচ্ছামত একটি কারণ নির্ণয় করিয়া লইলে আমার আপত্তি নাই।

( ৩ )

আমাদের বাড়ীর পাশের খালি বাড়ীতে নূতন ভাড়াটিয়ারা আসিলেন। ইহারাত্রা, ইংরেজী কক্ষমতেই চলেন। কর্তার বড় ছেলে সুবোধবাবু সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন; তাঁহার প্র্যাকটিসের সুবিধার জ্ঞানই সকলে দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়াছেন।

এখানে আসিয়া বসিতে না বসিতে কেহ কেহ নবজরে আক্রান্ত হইলেন। আমি পাশেই থাকি, আমার ডাক পড়িল। তাঁহাদের আরোগ্য করিয়া অশ্বশ ও লাভ করিলাম। ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে ভাবটা এতই জমিয়া উঠিল যে অবসর পাইলেই সন্ধ্যাবেলাটা সেখানে কাটাই।

তাঁহার ভগিনী উর্মিলা দেবী চমৎকার

গায়িতে পারেন, সুস্থ হৃদয়ে তাঁহার গান শুনিয়া ভাবি, ঠনি কি স্বর্গের দেবী?

এতদিনের পর আমার ধর্মুর্ভঙ্গ পণ ভাঙিল, হায়রে!

( ৪ )

কিরূপে বিবাহের প্রস্তাব করিব মনে মনে এতবারই তাহা আবৃত্তি করিয়াছি, যে এখনো সে কথা আমার মুখহ। অথচ কোনমতেই সে কথা উর্মিলাকে বলিতে না পারিয়া অবশেষে সুবোধের কাছেই কথাটা পাড়িলাম।

আমি যে ‘এজ্ঞ জ্ঞান হইতেও প্রস্তুত অস্বাচিত ভাবে একথাও জানাইয়া দিলাম। মনে জানি মা তাহাতে আপত্তি করিবেন; হইলে কি হয়, সে আপত্তি অগ্রাহ্য বা শুনন করিতে যদি না পারি, তবে আর ভাল-বাসিলাম কি?

কিন্তু হায়! সব আশা, সব কল্পনা আমার আকাশ-কুসুমের পরিণত হইল, সুবোধের নিকট শুনিলাম উর্মিলা engaged.

( ৫ )

বাড়ী ফিরিবামাত্র মা বলিলেন, “বাছা সুবোধ, কনকলতার গায়েহলুদ হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, তুই যদি বিয়ে করিস তবেই আমার সুইদের জাত-ধর্ম রক্ষা হয়। আর মেয়েটা সত্যিই সোণার টুকরো, এমন মেয়ে আর কোথাও পাবিনে।”

আমি আপত্তি করিলাম না। একজন কর্তব্যনিষ্ঠ তৃতীয় ব্যক্তির ভায় বিনা ঔৎসুক্যে, বিনা আগ্রহে, পরদিন সন্ধ্যাবেলা বিবাহ-বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

শ্রীমহাশয়ের নিকট হইতে বরণ গ্রহণ  
করিয়া অন্তঃপুরে ক্রীড়াচার স্থলে নীত  
হইলাম। শঙ্খধ্বনি, হলুধ্বনির মধ্যে  
অবগুণ্ঠনমুক্ত। কস্তার দিকে চাহিলাম,  
নয়নে নয়নে মিলিত হইল; চমকিয়া  
উঠিলাম।

এ ঘেন ঠিক সেই ছুটি আখিরই দৃষ্টি,  
যে দৃষ্টি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।

সত্যি কি আজিকার এই নববধু সেই  
আমার বহুপূর্বের পরিচিতা ... ..!

না, এ মোহ, চোখের ভুল! কে জানে?  
বাসর-গৃহে সকলের অহরোধ এড়াইতে  
না পারিয়া গারিলাম—  
“হায় মিলন হোলো।

যখন নিবিল চাঁদ, বসন্ত গেলো।”

শ্রী ... .. দেবী।

## বান্ধালী পল্টনের যুদ্ধযাত্রা সঙ্গীত

রাগিণী মিশ্র—তাল কাওয়ালী।

ঐ আহ্বান-গীতি বাজে,  
জয় জয় জয় জয় প্রণমি রাজরাজে,  
সবে জাগি, এস লাগি জয়ভূমির কাজে।

হের দূরিত তিমির রাত্রি,  
মোরা দীপ্ত প্রভাতের যাত্রী,  
চলি উৎসাহে কোটি ভ্রাতৃ

বীর সৈন্তের সাজে ;

যাপি বৃথা আলস্য ঘুমে,  
আর লুপ্তিত না রব ভুমে,  
সম-আসন লব করমে

জগত-জাতির মাঝে।

( কোরাস ) ঐ আহ্বান-গীতি বাজে; ইত্যাদি।

মোরা নহি ত দীন-দীন-নহি ত, তুচ্ছ,

সাহসে গর্বে শির সমুচ্চ,

শোভে অঙ্গে শাণিত অস্ত্রগুচ্ছ,

অনল-উজ্জ্বল তেজে ;

কথা—শ্রীমতী বর্ণকুমারী দেবী।

মোদের হৃদয়ে মঙ্গল-প্রীতি,

নির্দোষ অড়তা-ভীতি,

বারিতে পীড়ন-নীতি

আজি মৃত্যু ডরিব না যে।

( কোরাস ) ঐ আহ্বান-গীতি বাজে ; ইত্যাদি।

মোরা শৌর্য্যে বীর্য্যে হইব প্রধান,

নির্ভয়ে বক্ষে ধরিব কামান,

উজ্জলি উঠিবে জননী-প্রাণ,

আর না দহিবে ক্ষোভে লাজে।

সবে স্ত্রায়ের দণ্ড বহিয়া

ধর্ম্মের জয়-গান গাহিয়া,

অসাধ্য সাধন যত সাধিয়া

শিরোপা বাধিব তাজে।

( কোরাস ) ঐ আহ্বান গীতি বাজে ; ইত্যাদি।

স্বর ও বরলিপি—শ্রীব্রজেনলাল গাঙ্গুলী।

## স্বরলিপি

(কোরাস) —

I মা -১ II মা -পা ধা ধা। ধা -১ -১ গা।  
ঐ ০ আ ০ ইয়া ন গী ০ ০ তি

I পধা -গা গা -১। -১ -১ II -১ -১। মী মী গী গী।  
বা ০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ ০ জ য জ য

১  
। রী রী সী সী I গা গা গা ধা। -১ গা পধা গা  
জ য জ য প্র ন মি রা ০ জ রা ০

১  
। গা -১ ধা গা। সী -১ সী -১ I -১ -১ গা সী  
জে ০ স বে জা ০ গি ০ ০ ০ এ স

০  
। রী -১ রী -১। গা -রী সী গা। ধা পা মগা -পা  
লা ০ গি ০ জ ০ ন্য ভূ মি র কা ০ ০

১  
I মা -১ -১ -১। -১ -১ “মা -১” II  
জে ০ ০ ০ ০ ০ ঐ ০

II ধা গা। { সী -১ সী সী। সী সী -গধা গা।  
হে র { দু ০ রি ত তি মি ০০ র

১  
। রী -১ রী -১। -১ -১ রী রী। মী -১ জী রী।  
রা ০ ত্রি ০ ০ ০ মো রা দী ০ শু প্র

। সী -১ গা ধা I পধা গা গা -১। -১ -১ ধা গা }  
জা ০ তে র বা ০ ০ ত্রী ০ (০ ০ হে র)

। -। -। সী রী । গী -। গী -।। গী -মী রী গী ।  
 ০ ০ চ লি উৎ ০ সা ০ হে ০ কো টী

I মী । মী -। -। -। -। -।। গী -। -রী সী ।  
 ভ্রা ০ তৃ ০ ০ ০ ০ ০ বী ০ র সৈ

। -না -না ধা -না । সী -। -। -। -। -। -। মা পা ।  
 শ্বে র সা জে ০ ০ ০ ০ ০ যা পি

। ধা ধা -। ধা । ধা -। ধা -গা I পধা -গা গা -।  
 বৃ থা ০ আ ল ০ শ্র ০ ঘূ ০ মে ০

। -। -। ধা -গা । সী -। সী সী । সী -। ধা গা ।  
 ০ ০ দ্বীর্ ০ লু ০ ঠি ত না ০ র ব

I জ্ঞী -। রী -। -। -। -। -।। মী মী -। মী ।  
 ভূ ০ মে ০ ০ ০ ০ ০ স মা ০ ন

। -। -। জ্ঞী জ্ঞী I রী রী -। রী । সী -। সী সী ।  
 আ ০ স ন ক রি ০ ব ঐ ০ হ গ

। গা রী সী গা । ধা পা মগা -পা I মা -। -। -।  
 জ গ ত জা তি র মা ০ ০ ঝে ০ ০ ০

। -। -। “মা ঙা” II,  
 ০ ০ ঐ ০ ০

II ধা গা । { সী সী -। সী । সী সী গধা গা ।  
 মো রা { ন হি ০ ত দী ন হী ০ ন

I ରା ରା -। ଝାଁ। ରା -। ରା -। ମା -। ଝାଁ ଝାଁ  
ନ ହି ଠ ତୁ ଠ ଛ ଠ ମା ଠ ହ ସେ

। ରା -। ମା -। I ଗା -ଧା ପା ନା। ( ପଧା -ଗା ଗା -। )  
ଗ ଠ କେ ଶି ର ସ ( ଠ ଛ ଠ )

। ଗା ଗା ମା ରା। ଗା -। ଗା -। ଗା -ମା ରା ଗା।  
ମୁ ଛ ଶୋ ଡେ ଅ ଠ ଝେ ଠ ଶା ଠ ଗି ତ

I ମା -। ମା -। ମା -। ମା -। ଗା ଗା ରା ରା।  
ଅ ଠ ଝା ଠ ଗୁ ଠ ଛ ଠ ଅ ନ ଲ ଉ

। ମା ନା ଧା -ନା I ମା -। -। -। -। -। -। ମା ପା।  
ଝା ଲ ଡେ ଠ ଝେ ଠ ଠ ଠ ଠ ଠ ମୋ ଦେର

। ଧା ଧା -। ଧା। ଧା -। ଧା ଗା। ପଧା -ଗା ଗା -।  
ହ ଦ ଠ ଯେ ମ ଠ ଝ ଲ ଶ୍ରୀ ଠ ଠ ଡି ଠ

। -। -। -। -। ମା ମା -। ମା। ମା ମା ଗଧା -ଗା।  
ନି କା ଠ ଗ ଜ ଡ ତା ଠ

I ଝାଁ -। ରା -। -। -। -। -। ମା -। ଝାଁ ଝାଁ। ରା -। ମା ମା  
ଡି ଠ ଡି ଠ ଠ ଠ ଠ ବା ଠ ରି ତେ ମା ଠ ଡ ନ

I ଗଧା -ମା ଗା -। -। -। ଗା ଗା। ଗା -ମା ମା ମା।  
ନି ଠ ଡି ଠ ଠ ଠ ଆ, ଜି ମ ଠ ତୁ ଡ

। ଧା ମା ମଗା -ମା I ମା -। -। -। -। -। -। "ମା -।" II  
ରି ବ ନା ଠ ସେ ଠ ଠ ଠ ଠ ଠ ଠ ଠ

II ଧା ଗା। ମା -। -। ମା। ମା -। ଗଧା ଗା।  
ମୋ ରା ଶୋ ଠ ଠ ସେ ବା ଠ ଠ ସେ

I রাঁ রাঁ রাঁ জ্ঞাঁ । রাঁ -১ -১ -১ -১ । মাঁ -১ জ্ঞাঁ জ্ঞাঁ ।  
হ ই ব প্র ধা ন ০ ০ ০ নি ০ ঙ্গে

১ রাঁ -১ সাঁ -১ । ১ গাঁ ধা পা ধা । ১ গাঁ -১ -১ -১ ।  
ব ০ ক্ষে ০ ধ রি ব কা মান্ ০ ০

সাঁ রাঁ গাঁ -১ I গাঁ গাঁ গাঁ মাঁ I ১ রাঁ গাঁ র্গমা -১ ।  
উ ছ লি ০ উ ঠি বে ০ জ ন নী ০ ০

I মাঁ -১ -১ -১ । গাঁ -১ রাঁ রাঁ । সাঁ না ধা না ।  
প্রাণ ০ ০ ০ আর ০ না দ হি বে ক্ষে ভে

I সাঁ -১ সাঁ -১ মা পা । ধা ধা -১ ধা ।  
লা ০ জে ০ স বে ঞ্চা য়ে ০ র

I ধা -১ -১ গাঁ I ১ পা মগা গাঁ । -১ -১ -১ ।  
দ ০ ০ গু ব হি ০ য়া ০ ০ ০

I সাঁ -১ সাঁ সাঁ । ১ সাঁ সাঁ গধা গাঁ I ১ জ্ঞাঁ জ্ঞাঁ রাঁ -১ ।  
ধ ০ ঞ্চে র জ য় গা ০ ন গাঁ হি য়া ০

I -১ -১ -১ -১ । ১ মাঁ মাঁ -১ মাঁ । ১ জ্ঞাঁ -১ রাঁ রাঁ ।  
০ ০ ০ ০ অ সা ০ ধা সা ০ ধ ন

I সাঁ সাঁ গধা সাঁ । গাঁ -১ -১ -১ গাঁ রাঁ সাঁ গাঁ ।  
ষ ত সা ০ ধি য়া ০ ০ ০ শি রো পা বাঁ

I ১ পা মগা -পা I ১ মা -১ -১ -১ । -১ -১ "মা -১" II  
ধি ব ভা ০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ ঐ ০



## বাংলার ব্রত

( ৩ )

লক্ষ্মী-ব্রতটি মেয়েদের একটি খুব বড় ব্রত। আশ্বিন-পূর্ণিমায় যখন হৈমন্তিক শস্য ঘরে আসবে, তখনকার ব্রত এটি। সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীপূজা। সকাল থেকে মেয়েরা ঘর-গুলি আল্পনায় বিচিত্র পদ্ম, লতা-পাতা এঁকে সাজিয়ে তোলে। লক্ষ্মীর পাঁড়া বা পদচিহ্ন,— লক্ষ্মী-পেঁচা এবং ধান ছড়া হল এই আল্পনার প্রধান অঙ্গ। বড় ঘর—যেখানে ধান-চাল, জিনিষপত্র রাখা হয়—সেই ঘরের মাকের খুঁটির—মধুম খামের গোড়ায় নানা-আল্পনা-দেওয়া লক্ষ্মীর চৌকি পাতা হয়। আল্পনায় নানা অলঙ্কার, এবং চৌকিতে, লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ-মূর্তি না লিখে, কেবল মুকুট আর হুথানি পা কিম্বা পদ্মের উপরে পা কিম্বা অস্ত্র নানা-রকম চিত্র লিখে দেওয়া হয়। খুঁটির গায়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ আর লক্ষ্মীপেঁচা বা অস্ত্র চিত্র আঁকা থাকে। চৌকির উপরে ডোল ও বেড়—ডালা ও বিঁড়ে। বেড়ের মধ্যে শুয়োরের দাঁত ও সিন্দুরের কোটা এবং তার উপরে নানারকম ফল ইত্যাদিতে পূর্ণ রচনার পাতিল বা ভাঁড় রাখা হয়। রচনার পাতিল (হাঁড়ি) খানির গায়ে লক্ষ্মীর পাঁড়া বা পদচিহ্ন ও ধান-ছড়া; রচনার পাতিলটির উপরে লক্ষ্মীর সরা; সরার পিঠে লাল নীল সবুজ হলুদে কালো এই কয় রঙে লক্ষ্মী-নারায়ণ, লক্ষ্মীপেঁচা ইত্যাদির আল্পনা। লক্ষ্মীর কাপড়ে সবুজ রং, গায়ে হলুদবর্ণ, কালীর পরিরেখ, এবং

অধর ও পায়ের এবং করতলের অস্ত্র লাল; নীল-বর্ণ পট-ভূমিকার কারুকারণো দেওয়া হয়। লক্ষ্মী-সরার উর্দ্ধে আধখানা নারিকেলের মালাই;—মেয়েরা এই মালাইকে কুবেরের মাথা বা মাথার পুণি বলে। যশোর-অঞ্চলে সরার পশ্চাতে একটি শীঘ্র সমেত আস্ত্র ডাব, —সেটিকে ঘোমটা দিয়ে, গহনা ইত্যাদি দিয়ে অনেকটা একটি ছোট মেয়ের মতো করে সাজানো হয়। কলার খালুই দিয়ে ধানের গোলার অনুরূপ কতকগুলি ডোলা, তাগতে নানাবিধ শস্ত পূর্ণ করে আর-একটি কাঠের খেলার নৌকার প্রত্যেক গলুয়ে নানা-বিধ শস্ত—ধান, তিল, মুগ, মুরি, মটর ইত্যাদি দিয়ে লক্ষ্মীর চৌকির সম্মুখে রাখার প্রথাও আছে। পূজা শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্রতীর উপবাস। দেশভেদে কোনো গ্রামে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও কুবের—এই তিনটিকে তিন রঙের পিটুলীর পুতুলের আকারে গড়ে দেওয়া হয়। এমনি নানা গ্রামে অমুষ্ঠানের একটু অদল-বদল আছে।

ঘোঁটামুটি হিসেবে দেখা যায়, এই কোজাগর পূর্ণিমার ব্রতটির মধ্যে অনেক-খানি অনাৰ্য্য অংশ রয়েছে। শুয়োরের দাঁত, —যার উপরে ফলমূল মিষ্টানের রচনার পাতিল; কুবেরের মাথা—যেটা সব-উপরে রয়েছে দেখি; কিম্বা সরার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঘোমটা-দেওয়া মেয়ের মতো ডাব—হলুদ-সিন্দুর মাখানো; আর পেঁচা ও ধানছড়া,—এক লক্ষ্মীর বাহন, আর-

এক লক্ষ্মীর শস্ত-মূর্তি—এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য বা অস্ত্র-ব্রতদের! আমার এই কথার সমর্থন করার জন্যে হিন্দুস্থানেই যদি প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয় তবে একটু মজিলা কেন না, শুয়োরের দাঁত—স বরাহ-অবতারের যুগে বেদ-উদ্ধার করে পবিত্র হয়ে গেছে; মড়ার মাথা—সেও তন্ত্রের মধ্যে দিয়ে মহাদেবের হাতে উঠেছে; বাকি থাকেন পেঁচা ও ধান-ছড়া; হয়তো গরুড়ের বংশাবলীতে পেঁচাকেও পাব; এবং ধানই যে লক্ষ্মী, সেটা ত লক্ষ্মীর স্বাধীপিতে লুকোনো আছে। কিন্তু ভারত-সমুদ্র ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রশান্ত-মহাসাগরের পারেও যখন দেখি ধানছড়া মূর্তিতে পূজা পাচ্ছেন—ঠিক এমনি আর-এক মা-লক্ষ্মী বা ‘ছড়া-মা’—মেক্সিকো পেরু প্রভৃতি দেশের অনার্যদের মধ্যে, তখন কি বলা যাবে?

আমাদের দেশে যেমন ধান, ও-সব দেশে তেমনি জোয়ার, জনার বা ভূট্টা হচ্ছে প্রধান শস্ত। এহ-সব শস্তের রক্ষা যে দেবতারা করেন তাঁদের বলা হয় ‘মাম্মা’। আলুকে বলে এরা ‘আক্সু’ এবং আলু-দেবীকে বলাবে এরা ‘আক্সুমাম্মা’। জনারকে বলে এরা ‘সর’ বা ছড়; তার দেবীকে বলে এরা ‘সরমাম্মা’;—ঠিক উচ্চারণটা হয়তো ‘সরামাম্মা’ ‘ছড়ামাম্মা’। কিন্তু যা বলেছ ডাকা হোক, এই পেরু-দেশের মা-লক্ষ্মীর মূর্তিটি হচ্ছে ভূট্টার ছড়—যেমন আমাদের ধানছড়া। শস্ত-সংগ্রহের কালে সেখানে লোকেরা ভূট্টার ছড়গুলি দিয়ে তাদের মা-লক্ষ্মীর মূর্তিটি গড়ে। পূজার পূর্বে তিন রাত্রি আগরণ করে ছড়ামাম্মা বা সরমাম্মাকে নজরে-

নজরে রাখা নিয়ম। একে পূর্ণমা-আগরণ বা কোজাগর বলা যেতে পারে। পূজার দিন এরা ভূট্টাছড় বা এদের লক্ষ্মীমূর্তির সামনে রচনার পাতিলে নানারকম খাবার সাজিয়ে একটি সিদ্ধ করা ব্যাং সকলের উপরে রাখে; এবং সেই ব্যাঙের পিঠে একটি জনারের শেষের মধ্যে নানা শস্ত—ভূট্টা, মুগ, মুসুরা ইত্যাদি চূর্ণ করে ভরে ভাজে দেওয়া হয়। এই ব্যাং হলেন জলদেবতার স্ত্রী (বেদেও মধুককে জল ও ধন দান করেন বলা হয়েছে)। পূজার রাতে নাচ গান এবং নানা অমুষ্ঠানের মধ্যে মেয়েরা এলোচুলে নৃত্য করতে-করতে একটি কুমারীকে হনুদে-সিঁড়রে অলকা-তিলকা দিয়ে মুখটি সাজিয়ে—কতকটা আমাদের লক্ষ্মী-পূজার ডাবটির মতো—এবং নানা অলকার ভালো কাপড় পরিয়ে পূজারীর সামনে উপস্থিত করে। পূজারী কুমারীকে পূজা দেন; ও সকলের একসঙ্গে নৃত্য নাচ শুরু হয়। তার পরে সেই কুমারীকে বলি দিয়ে তার সন্তানির রক্তমাথা অংশাণ্ডটি রচনার পাতিলে রেখে পুরোহিত ছড়াম্মাকে প্রশ্ন করেন—মা তুমি তুত হয়ে বইলেতো? যদি পুরোহিতের প্রতি আদেশ হয়—রইলুম, তবে জনারের ছড় তারা পূজার ঘরে তুলে রাখে; আর যদি আদেশ হয়—রইবোনা, তবে জনারের ছড় পুড়িয়ে নতুন ছড়ামাম্মা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়।

“Sometimes an image of Saramama was carved in stone in the shape of an ear of maize. The Saramama was also worshipped in the form of a doll or huantay-sara, made out of stalks of maize renewed at each harvest much

as the great Corn-Mother of Mexico (Chicomecohuatl) ... after having been made, the image was watched over for three nights (কোজাগর) and then sacrifice was done to it. The priest or medicine-man of the tribe would then inquire of it whether or not it was capable of existing until that time in the next year. If its spirit replied in the affirmative it was permitted to remain where it was until the following harvest. If not, it was removed, burnt and another figure took its place..." (Page 295.—Myths of Mexico and Peru, duise Spence.)

এইবার Chicomecohuatl—মেক্সিকোর great Corn-Mother বা মালিন্মো, তাঁর পূজার অনুষ্ঠান দেখি—  
“A more important festival of Chicomecohuatl however, was the Xalaquia which lasted from June 28 to July 14, commencing when the maize-plant had attained its full growth. The women of the village wore their hair unbound, and shook and tossed it, so that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long. Chian-pinolli was consumed in immense quantities, and maize-porridge was eaten. Hilarious dances were nightly performed in the teopan (temple), the central figure in which was the Xalaquia, a female captive or slave, with face painted red and yellow to represent the

colours of the maize-plant.... Throughout the duration of the festival she danced and on its expiring night she was accompanied in the dance by the women of the community, who circled round her ....when daybreak appeared.....the entire community then approached the Teo Calli (pyramid of sacrifice) and its summit reached the victim was stripped to a nude condition, the priest plunged a knife of flint into her bosom, and, tearing the still palpitating heart offered it up to Chicomecohuatl. In this manner the venerable goddess weary with the labours of inducing growth in the maize-plant was supposed to be revived and refreshed. ( Page 86-89 Myths of Mexico and Peru. )

এখন, দক্ষিণ-আমেরিকার জল-দেবী ব্যাং এবং শস্ত নষ্ট করবার একটি ওস্তাদ যে ইন্দুর, তার যম লক্ষ্মী-পেঁচা; সেখানকার নর-বলির জ্বংগিও এবং এখানকার নারিকেল-মালই, বা কুবেরের মাথা বা ঘোষেরের সেই তেল-হলুদ-সিঁহুরে সাজানো ঘোষটা-দেওয়া গয়না-পরানো ডাবটি এবং মেক্সিকোর হলুদে সিঁহুরে অলকা-তিলকা দিয়ে ভূষিতা ব্রত-দাসীটির সঙ্গে বস্ত্রত যোগাযোগ চোখে না দেখলেও, দুই দেশের লক্ষ্মী-ব্রতের মধ্যে একটা সাদৃশ্য অমূল্যব নাড়করে থাকে যায় না।

লক্ষ্মী-পূজার এদেশে আর-একটা অনুষ্ঠান রয়েছে;—যেটা নজর করে দেখলে, শাস্ত্রীয় লক্ষ্মীপূজা-পদ্ধতি যে, অনার্য্য এবং প্রাচীন লৌকিক একটি ব্রতের স্থান, পরে

অধিকার করেছে তা বেশ বোঝা যায়। গৃহস্থের বড়-ঘরের লক্ষ্মীপূজার পূর্বে, ঘরের বাহিরে একটি পূজা চলে; তাকে বলা হয় ‘অলক্ষ্মী-বিদায়’। এটি শাস্ত্রোক্ত দীপাবিতা। লক্ষ্মীপূজার একটি অঙ্গুষ্ঠান, যথা—“প্রদোষ সময়ে বিহির্দ্বারে গোময়নির্মিত অলক্ষ্মীকে বামহস্ত দ্বারা পূজা করিবে। আচমনান্তে সামান্যার্থা ও আসন-ভুক্তি করিয়া অলক্ষ্মীর ধ্যান যথা, ঐ অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং কৃষ্ণবস্ত্র-পরিধানাং কৃষ্ণগন্ধাল্পনাং তৈলাভ্যক্ত-পরারাম মুক্তকেশাং দ্বিভুজাং বামহস্তে গুহা ত ভ্রুনাং দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনাং, গন্ধভাকৃতাং লোহাভরণভূষিতাং বিকৃতদংষ্ট্রাং কণ্ঠ-প্রিয়াম্—এই বলিয়া ধ্যান করিয়া আবাচন পূর্বক অলক্ষ্মীকে পূজা; পূজান্তে পাঠা মন্ত্র যথা, ঐ অলক্ষ্মীং কুরুপাং কুংসিতস্থান-বাসিনী সুখরাত্নৌ ময়া দত্তাং গৃহ পূজাক-শাস্যতাম। পরে গৃহমধ্যে গিয়া লক্ষ্মীপূজা যথাবিধি আরম্ভ—গারবর্ণাং সুকৃষ্ণাং সর্বা-লঙ্কারভূষিতাম্” ইত্যাদি।

পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা অলক্ষ্মী-বিদায় নিজেরা করেনা; পূজারাকে দিয়ে এ কাজ সারা হয়। এই অলক্ষ্মীই হলেন অন্নব্রতদের লক্ষ্মী বা শস্য-দেবতা। শাস্ত্র নিজেদের মা-লক্ষ্মীকে এই প্রাচীনা লক্ষ্মীর স্থানে বসিয়ে আলক্ষ্মী নাম দিয়ে কুরুপা-কুংসিতা বলে একে ছেঁড়া চুল ও ঘরের অবজ্ঞার সঙ্গে বিদায় দিতে চাইলেন। মেয়েরাও ব্রহ্মকোপের ভয়ে অলক্ষ্মীর পূজার জায়গা বাহরেই করলেন; এবং যথাবিধি পূজা করা না-করার দায়-দোষ সমস্তই ভয়ে পূজারীরই হাতে হল এবং এখনকার হিন্দু-পরিবারে ব্রাহ্মধর্মের শালগ্রাম-

ফেলার মতো তখনো একটু যে গোঁলোযোগ না হল তা নয়। মেয়েরা পূজারীর কথা শুনে প্রাচীনা লক্ষ্মীকে বেশি-রকম অপমান করতে ইতস্ততঃ কল্লেন। এখন অলক্ষ্মীই বলি আর যাই বলি, একসময়ে তিনি তো লক্ষ্মী বলেই চলাছিলেন, কাজেই তাঁর কতকটা সম্মান ধুঁপ পূজারী বজায় রেখে মেয়েদের মন রাখলেন;—নিজেরও মনে অলক্ষ্মীর কোপের ভয় না-হাচ্ছিল তা নয়; ঘরের বাইরে হলেও, মা-লক্ষ্মীর আগে আলক্ষ্মীর পূজা হবে, স্থির হল।

লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে কলার পেটোর উপরে তিনটি পিড়লীর পুতুল সবুজ হলুদ লাল, তিন রঙে প্রস্তুত কবে, রাখা হয়। এত পুতুলগুলিও অনায়াস-লক্ষ্মীপূজার নিদর্শন। এহা তিন পুতুলকে বলা হয়—লক্ষ্মী, নারায়ণ আর কুবের। কিন্তু এরা আসলে যে কি তা আমরা দেখব। সবুজ হলুদ লাল পুতুল, আর অলক্ষ্মী-বিদায়ের ছেঁড়া খানিক মাথার চুল—এগুলির কোনো অর্থ অন্ন-দেশের প্রাচীন দম্মান্ত্রাণে পাই কিনা দেখি। পূর্বেই দেখেছি, মোল্লিকোতে কোজাগর লক্ষ্মীপূজায় মেয়েরা এলোকেশী হয়,—শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছা-গোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায়।—“the women of the village wore their hair unbound, and shook and tossed it, so that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long”

মোল্লিকোর পুরাণে আরো দেখা যাচ্ছে শস্ত্রের রক্ষয়ত্রী তিন-বর্ণের তিন-দেবতা। একজন অপরক চরিত্র-শস্যের সবুজ; এক

কলস্ত স্বর্ণশস্যের হলুদ এবং আর-এক  
আতপতপ্ত সুপক্ক শস্যের সিন্দুরবর্ণ।

মেক্সিকোতেও শস্যের নানী অবস্থায় এক-  
এক দেবী রক্ষা করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে  
'Centeotl' এবং তাঁদের একজন Xilonen  
সবুজ, অপক্ক-শস্যের অধিষ্ঠাত্রী।

"A special group of deities  
called Centeotl presided over the  
agriculture of Mexico, each of  
whom personified one or other of  
the various aspects of the Maize-  
plant"....."Xilonen -- she typified  
the xilote or green ear of the  
Maize. (Page 85, Myths of Mexico  
and Peru.)

আমাদের দেশে মেয়েরা প্রধানত  
তিনটি বড় লক্ষ্মীভ্রত করে থাকেন। প্রথম  
ফাল্গুনমাসে বীজ-বপনের পূর্বে। কৃষীরাই  
বেশী এতৃত করে—রাবি আর বৃহস্পতিবারে।  
এঁকে বলা যেতে পারে হরিতা-দেবী—  
সবুজবর্ণ। এই পূজা করে' তবে ঘর থেকে  
বপনের বীজ বার করা হয়। দ্বিতীয়  
লক্ষ্মীভ্রত হচ্ছে আশ্বিনে কোজাগর-পুণিমায়—  
যখন সোনার ফসল দেখা দিয়েছে। ইনি  
হলেন স্বর্ণলক্ষ্মী,—হলুদবর্ণ। তৃতীয় লক্ষ্মীভ্রত  
হল অশ্বাঘ্নে, যখন পাকা ধান ঘরে এসেছে ;  
—ইনি অরুণা লক্ষ্মী। মেয়েরা বছরে  
আরো-কয়েকবার লক্ষ্মীভ্রত করেন,—যেমন  
ভাদ্রে, কার্তিকে ও চৈত্রে। কিন্তু সেগুলি  
ঐ তিন লক্ষ্মীভ্রতেরই ছাঁচে ঢালা।  
দেখা গেল, প্রাচীন লক্ষ্মীভ্রতের অনার্য্য কতক  
অনুষ্ঠান গেল ঘরের বাইরে—যেমন অলক্ষ্মী ;  
কতক রইল ঘরের মধ্যে—যেমন কুবেরের  
মাথা ও তিন পুতুল ইত্যাদি। সব-চেয়ে

বড় লক্ষ্মীপূজা কোজাগর-পুণিমায়। তাঁর  
ব্রতকথা থেকে বেশ বোঝা যায়, অলক্ষ্মী  
আর লক্ষ্মী দুই দেবতার পূজা নিয়ে দেশের  
মধ্যে একসময় বেশ-একটু গোলযোগ  
চলছে। কথাটি এই—

এক দেশের রাজার নিয়ম ছিল, হাটে  
কেউ কিছু যদি বিক্রি করে উঠতে না  
পারতো, তবে তিনি রাজ-ভাণ্ডার থেকে  
হাট শেষ হলে হতালকে সাহসনা দেবার  
জন্তে ঋড়তি-পড়তি সবই নিজের জন্তে কিনে  
রাখতেন। এমনি একদিন এক লোহার  
দেবীমূর্তি এক কামারের কাছ থেকে হাট-  
শেষে রাজা কিনলেন—কামার যখন রাজ-  
বাড়ার সামনে দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল। রাজা  
সত্যপালনের জন্তে সেহ লোহার দেবী  
কিনলেন এবং ঘরে আনলেন। লোহার  
মূর্তি ছিল অলক্ষ্মীর। লক্ষ্মী অমনি সেহ  
রাত্রেই বিদায় হয়ে যান ; রাজা বলেন আমি  
সত্যপালন করছি এতে দোষ কি ? লক্ষ্মী  
রাজাকে বর দিলেন তিন পুণ্ড-পক্ষীর কথা  
একবেল কিছু লক্ষ্মী আর রাজ্যে রইলেন  
না। এমনি-এমনি প্রথমে রাজলক্ষ্মী তার  
পর ভাগালক্ষ্মী যশলক্ষ্মী সবাই একে-একে  
গেলেন ; তার পর ধর্ম আর কুললক্ষ্মী চলেন।  
রাজা ধর্মকে বলেন—কুললক্ষ্মী যেতে চান  
তো যান, কিন্তু ধর্ম, আপনি তো যেতে  
পারেন না, কেননা আমি সত্যধর্ম পালন  
করতেই এ কাজ করছি। ধর্ম রাজ-  
বাড়ীতেই রইলেন।

এর পরের কথাটুকুর মর্মঃ—রাণী দেখেন  
রাজা পি'পড়ের দিকে চেয়ে একদিন  
ভোজনের সময় হেসে উঠলেন। পি'পড়-

জুলো রাজার পাতে খাবার সময় ঘা না দেখে রাজাতি যে গরীব এই বলাবলি কাছল। রাজা চঠাং হাসলেন কেন, এত কথা রাণী জানতে চাইলে, অনেক পেড়াপিড়িতে রাজা সম্মত হয়ে—কথাটি প্রকাশ করে তাঁর মৃত্যু জেনেও—গঙ্গা তীরে রাণীকে নিয়ে গিয়ে একটা ছাগল আর ছাগলার ঝগড়া শুনলেনঃ—নদীর মধ্যে একবোকা ঘাস দেখে ছাগলী সেটা চাচ্ছে আর ছাগল তাকে বলছে, আমি কি রাজার মতো বোকা যে তোব কথায় প্রাণ হারাতে যাবো। রাজা তখন রাণীকে তাড়িয়ে দিলেন। তার পর রাণী অনেক কষ্টে লক্ষ্মীপূজা করে তবে রাজা রাজ্য সব ফিরিয়ে আনলেন।

ছই ধর্ম, ছই দেবী, তইবল নাগুয়ে যে ছই পূজো নিয়ে একটা বেশ গোলোযোগ চলেছিল এবং শেষে নতুন লক্ষ্মাই যে দেশের প্রাচীন লক্ষ্মার পূজা দখল করেছিলেন এবং হাতে যে পূস্কালে প্রাচীনা লক্ষ্মামূর্তি বিক্রি হতে আসতো এবং সেটি রাজা কিনে ধর্মলোপের ভয় করেন নি, তা বেশ বোকা যাচ্ছে।

মেয়েরা যে-যে-মাসে লক্ষ্মীব্রত করছে এবং অল্প দেশের লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে আমাদের পূজাটি মিলিয়ে দেখলে দেখি যে, লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে দেশের তিন প্রধান শস্য উৎসব। কিন্তু পূজারীরা লক্ষ্মীব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণন করে যে প্লোকটি মেয়েদের গুনিয়ে দেন, সেটা থেকে কিছুতে বোকা যাবেনা যে এই ব্রত অকলস্ত, ফলস্ত এবং সুপক্ক শস্যের উৎসব-অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় প্লোক বলছে—

“লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত সফলত সার,  
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার।  
বক্ষানারী পুত্র পায় ষাষ সর্ব হুণ,  
নির্দনের ধন হয় নিতা বাড়ি সুখ॥”

ধানের কি কোনো শস্যের নাম-গন্ধ এতে পাওয়া গেল না। প্রাচীনকালের প্রধান উৎসব এবং শস্য দেবতার খুবই প্রসিদ্ধ বলে এত ব্রতে চিহ্নানার চেতারা দেবার অস্ত্র এর উপর এত জোড়াভাড়ার কাজ চলেছে যে আসল-ব্রতটি কেমন ছিল তা আর এখন কতকটা কল্পনা করে দেখা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যে ব্রতগুলি ছোট এবং অপ্রধান বলে শাস্ত্রের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অনেকটা অটুট অবস্থায় রয়ে গিয়েছে তার থেকে ব্রতের খাটি ও নিখুঁত চেহারাটি পাওয়া সহজ। যেমন এই ‘তোষ্ণা’ ব্রতটি। কোলাও একে বলে “তুষ্ণা”। পূর্ব-বঙ্গে পাশ্চিম-বঙ্গে ছ-জায়গায়ই এই ব্রতের চলন আছে। প্রতিদিন পোষ মাসের সপ্তম মেয়েরা এই ব্রতটি করে। ব্রতের বিধি এইঃ—অম্বানের সংক্রান্তি থেকে পোষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি-সকালে স্নান করে গোবরের ছ’বুড়ি ছ’গুণ্ডা বা ১৪৪টি গুলি পার্কিয়ে, কালো দাগ-শুণ্ড নতুন সরাতে বেগুন-পাতা বিছিয়ে তার উপরে গুলি ক’টি রাখতে হয়। প্রত্যেক গুলিতে একটি করে সিঁহরের ফোঁটা এবং পাঁচগাছি করে দুপ্পা-ঘাস গুঁজে দিতে হয়। তার উপর নতুন আগোচালের তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সন্ধ্যে সিম মূলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোকা যাচ্ছে, এটি সার-মাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বর করে তোলবার

ব্রত। ব্রতের ছড়াগুলি পূর্ববঙ্গে এক, পশ্চিম-বঙ্গে আর-এক ভলগে ছড়াগুলি পড়তে-পড়তে পল্লীগ্রামের সহজ জীবন-যাত্রার এমন-একটি পরিষ্কার ছবি মনে জাগিয়ে তোলে, যেটি কোনো শাস্ত্রীয় ব্রতে আমরা পাই না। পৌষমাসে এদেশে বেশ একটু শীত, এবং সকালবেলায় ব্রত এটি, কাজেই আমরা অনায়াসে কল্পনা করতে পারি বহুযুগ-আগেকার বাংলাদেশের এক-খানি গ্রামের উপর রাত্রির যবনিকা আস্তে সরে গেল; সঙ্গে-সঙ্গে আমরা দেখছি শীতের হাওয়া বইছে,—গ্রামের উপরে বড় গাছের আগায় এখনো কুয়াশা পাতলা চাদরের মতো লেগে রয়েছে; শিশিরে সকালটি একটু ভিজ-ভিজ; বেড়ার ধারে-ধারে আর চালে-চালে সিমপাতার সবুজ; ক্ষেতে-ক্ষেতে ম্লোর ফুল, সন্ধ্যের ফুল—ওধ আর হলুদের ফেনার মতো দেখা যাচ্ছে; নতুন সরাসরি বেগুন-পাতা চাপা দিয়ে, সার-মাটি নিয়ে মেয়েরা দলে-দলে তোষালা ব্রত করতে ক্ষেতের দিকে চলো এবং সেখানে ম্লোর ফুল, সিমের ফুল, সন্ধ্যের ফুল দিয়ে ব্রত আরম্ভ হল—

প্রথম, তোষালা স্তুতি—

“তুঁষ-তুঁষালি, তুমি কে!  
তোমার পূজা করে যে,—  
ধনে ধানে বাড়ন্ত,  
সুখে থাকে আদি অন্ত ॥  
তোষালা লো তুঁষকুস্তি!  
ধনে ধানে গায়ে স্তুতি,  
ঘরে ঘরে গাই বিউস্তি ॥”

তারপর অহুষ্ঠান-উপকরণের বর্ণনা, যেমন—

“গাইয়ের গোবর, সন্ধ্যের ফুল,  
আসনপিঁড়ি, এলোচুল,—  
গেয়ের গোবর সন্ধ্যের ফুল,  
ঐ কোরে পূজি আমরা মা-বাপের কুল।”  
‘আসনপিঁড়ি এলোচুল’। এখানে আমরা সেই মেক্সিকোর মেয়েদের এলোচুলে ব্রত করার প্রতিচ্ছবিটি পাচ্ছি। এর পরে মেয়েরা তোষালা-ব্রতের কামনা জানাচ্ছে—

“কোদাল-কাটা ধন পাব,  
গোহাল-আলো গরু পাব,  
দরবার-আলো বেটা পাব,  
সভা-আলো জামাই পাব,  
সেঁজ-আলো কি পাব,  
খাড়ি-মাপা সিঁহুর পাব।

ঘর করবো নগরে,  
মরবো গিয়ে সাগরে,  
জন্মাব উত্তম কুলে,  
তোমার কাছে মাগি এই বর—

স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।”

তারপর, পৌষের সংক্রান্তির দিনে মেয়েরা সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রত সাক্ষ করে একটি সরায় ঘোঁষের প্রদীপ জেলে সেগুলি মাথায় নিয়ে সারি-বৈধে নদীতে স্নান করে তোষালা ভাসাতে চলেছে। পায়ের তক্তায় মাটি ঠাণ্ডা; হিম বাতাস, নদীর শীতল জলের পরশ পেয়ে, কনকনে বইছে। এই শীতের জল-স্থল-আকাশের প্রতিধ্বনি দিচ্ছে মেয়েরা নদীতে বাবার পথে—

“কুলকুলনি এয়ো রাণী,  
মাসে মাসে শীতল পানি,  
শীতল শীতল খাইলো,  
বড় গঙ্গা নাইলো।”

এর পর, নিপল শীতের মধ্যে সূর্যের ও  
পৃথিবীর মিলনের একটু আশা-আকাজ্জা  
জাগলো—

“শীতল শীতল জাগে,  
রাই বিয়ে মাগে ”

এর পর, গঙ্গাতীরে জলের কলধ্বনি,  
পাখীদের কাকলীর সঙ্গে সূর্যের বরষাত্রার  
বাদ্য বাজছে—

“আমাদের রায়ের বিয়ে  
ঝাম্-কুর্-কুর্ দিয়ে ।”

তখনো রায়ের শিশির-ভেজা শাক-  
শবজীর পাতাগুলি ঘুমিয়ে রয়েছে ; সেই  
সময় বরবেশে সূর্য আসছেন ; তারি সূচনা  
একটু ঝিকমিকে সোনার আলো ।

“বেগুন-পাতা ঢোলা-ঢোলা

রায়ের কানে সোনার তোলা ।”

এইখানে নদীতে তোষ্লার সরা  
ভাসিয়ে তোষ্লার সার-নাটি আর সূর্য্য—  
চাষের দুই প্রধান সহায়কে কৃতজ্ঞতা  
জানিয়ে মেয়েদের জলে আপাঝাপ বালি-  
খেলা—

“তোষ্ লা গো রাঙ্গি, তোমার দৌলতে  
আমরা ছ-বুড়ি পিঠে বাই,  
ছ-বুড়ি ন-বুড়ি গাওঁ-সিনানে বাই,  
গাওঁের বালিগুলি ওহাতে মোড়াই,  
গাওঁের ভিতর লাড়, কলা ডব্‌ডবাত খাই।  
তুষ্ লী গো রাঙ্গি, তুষ্ লী গো ভাই,  
তোমার ব্রতে কিবা পাউ ?  
ছ-বুড়ি ছ-গাওঁা গুলি বাই,  
তোমাকে নিয়ে জলে বাই,  
তুষ্-তুষ্ লী গেল ভেসে—  
বাপ-মার ধন এল হেসে,

তুষ্-তুষ্ লী গেল ভেসে—

‘আমার সোয়ামির ধন এল হেসে ।’

এর পর, সূর্যের উদয় দর্শন করে মান  
করে ব্রতশেষে নদীতীরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয়  
বর্ণন করে ছড়া—

“রায় উঠছেন রায় উঠছেন বড়-গঙ্গার ঘাটে ।  
কার হাতের তেল-গানছা ?

দাওগো রেয়ের হাতে ।

রায় উঠছেন রায় উঠছেন মেজো-গঙ্গার ঘাটে ।  
কার হাতের পাখা সিঁদুর ?

দাওগো রেয়ের হাতে ।

রায় উঠছেন রায় উঠছেন ছোট গঙ্গার ঘাটে ।  
রায় উঠছেন অগ্রে, তামার হাঁড়ির বর্ণে,  
তামার হাঁড়ি, তামার বোড়ি—”

এর শেষটুকুতে হিঁড়য়ানী আপনার নাম  
দস্তখত করে এক আঁচড় দিয়েছে—“উঠ  
উঠ মা-গৌরা সিবেদন কারি’। ওঠা মা-  
গৌরা এসে কেন যে বোড়ি ধরেন তা  
বোঝা গেল না। ঝকঝকে জায়নার উপরে  
পেরেকের আঁচড়ের মতো এত শেষ লাইনটা ;  
বা যেন মিশানার-স্কুলেপড়া মেয়ের মুখে—  
‘বড় মেম নমস্কার’—খাপছাড়া, ক্রিতিকটু,  
অর্থহীন। এর পর মেয়েরা ঘরে এসে  
পোষমাসের পিঠে খাবার আয়োজন করে  
যে ছড়া বলছে—সেটাও এ-লাইনটার চেয়ে  
সহজ আর শুন্দর—

“আখা জলান্তি, পাখা চলান্তি,  
চন্দন-কাঠে রন্ধন ঘরে,  
জীরার আগে তুষ পোড়ে,  
খড়িকার আগে ভোজন করে,  
প্রাণ স্বচ্ছন্দে নতুন বসতে  
কাল কাটাবো মোরা জন্মায়ন্তে ।”



তোষা-ব্রতের অন্ত্যস্তান—এই ঋতের প্রভাতের দৃশ্য-পটভূমি আর সম্ভবতঃ মেঘের মুখে সিন্দূর এবং মার্জিত তামার বর্ণ রক্তবাস হৃৎগোর উজ্জল বর্ণনা আমাদের সম্বন্ধে সের-কালের মধ্যে নিয়ে যায় যেখানে দেখি মানুষ আর বিশ্ব-চরাচরের মধ্যে সরস একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে;—গড়াপেটা শাস্ত্রীয় ব্রতের এবং হিন্দুস্তানীর আচার-অনুষ্ঠানের চাপনে মানুষের মন যেখানে সবদিক দিয়ে অন্তর, নিরানন্দ এবং প্রাণতান হয়ে পড়ে। এই তোষা ব্রতের জীবন্ত দৃশ্যকাব্যটির সঙ্গে ছোট-একটি শাস্ত্রীয় ব্রত মিলিয়ে ছয়ের মধ্যে কি নিয়ে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট ধরা পড়বে। হরিচরণ ব্রত। বছরের প্রথম মাসে, খুব ছোটো মেয়েরা এই ব্রত করছে—চন্দন দিয়ে তামার টাটে হরিপাদপদ্ম লিখে। কিন্তু এই ব্রতে ছোটো মেয়ের মুখের কথা বা প্রাণের আনন্দ এমন-কি ছোটোখাটো আশাটুকু পর্যন্ত নেই। পাকা-পাকা কথা এবং জাঠামিতে ভরা এই শাস্ত্রীয় ব্রতটি অত্যন্ত নীরস। হরির পাদপদ্মে পূজা দিয়ে পাঁচ-ছয়-বছরের ছোট মেয়েগুলি বর চাইছে—গিরিরাজ বাপ, মেনকার মতো মা, রাজা সোয়ামি, সুতা-উজ্জল জামাই, গুণবতী বৌ, রূপবতী ঝি, লক্ষ্মণ দেবর, তর্গার আদর—“দাস চান, দাসী চান, রূপার খাটে পা মেলতে চান, সিন্ধুর সিঁদুর, মুখে পান, বছর-বছর পুত্র চান,” আর চান—“পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে একগলা গঙ্গাজলে মরণ এবং উষোতে পারলে ইন্দ্রের শচীপনা, না পালে কৃষ্ণের দাসীগিরি!”

হরিচরণ-ব্রত করছে এই বে মেয়েগুলি

বৈশাখের সকালবেলায়, আর শীতের সকালে শীর্ণদারা নদীতীরে, তোষা ব্রতের দিনে, সরসে সিম এমনি নানা ফুলে সাজানো সরস ভাসিয়ে, স্রোতের ভলে নেমে, হৃৎগোর উদয়কে এবং শস্যের উদগমকে কামনা করছে যে মেয়েগুলি,—এই ছোট দলে কি বিষম পার্থক্য, ছোট অন্ত্যস্তানেই বা কি-না তফাৎ! একদল একগলা গঙ্গাজলে আত্মহতায় উত্তম; অন্যদল বিগ্ধচরাচরের সঙ্গে হৃৎগোর আলোতে হলুদ, সাদা ফুলে-ফুলে-ভরা ক্ষেতের মতো জেগে-ঠেবার জন্তে আনন্দে উদ্গীৰ্ণ!

প্রত্যেক ঋতুর ফুলপাতা, আকাশ-বাতাসের সঙ্গে এই সব অশাস্ত্রীয় অথচ প্রচণ্ড-বীর্যে খাটি ও আশ্চর্য-রকম সৌন্দর্য্যে রসে ও শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালীর সম্পূর্ণ নিছকের বতর্ভালির যে গভীর যোগ দেবা যাচ্ছে, তাতে করে এগুলিকে ধন্যমান বলব কি বড়লোকের এক-একটি উৎসব বোলব ঠিক করা শক্ত। চৈত্রের এই অশথ-পাতার ব্রত—যার সমস্ত অন্ত্যস্তানের অর্থ হচ্ছে, কিশলয় থেকে বয়ে-পড়া পর্যন্ত কচি, কাঁচা, পাকা এবং শুকনো পাতার একটুখানি ইতিহাস; তাকে কি বলব?

বসন্তের বাতাস লেগে গত শীতের শুকনো পাতা গাছের তলায় বয়ে পড়েছে; নদীর ধারে অশথ, কুঞ্জলতা, চাঁপাহুন্দরী আর শ্রাম পণ্ডিতের ঝি—কেউ পাকা-পাতার তামাতে লাগ, কেউ কাঁচা-পাতার সম্বন্ধ সোনারি সবুজ, কেউ কচিপাতার কোমল শ্রাম, কেউ শুকনো-পাতার তপ্ত সোনা, কেউ বা ঝরাপাতার পাণুর রঙে সেজেছে। ‘অশথ-পাতা,’ কুঞ্জলতা, চম্পাহুন্দরী; আর

এই তিন বনমুন্দরীর সঙ্গে সেজেগুজে ব্রত করতে বেরিয়েছেন গ্রাম পণ্ডিতের ঝি। গ্রাম পণ্ডিতের সাত-সাত বো, জোয়ান সাত বেটা, পণ্ডিতের গিন্নি, আর বুড়ো পণ্ডিত নিজে,—ছোট, বড়, আরো-বড়, একেবারে বুড়ো,—কাচ মেয়েটি, কাঁচা বয়সের বো-বেটা, পাকাগিন্নি আর বিষম শুকনো কত্তা।

“অশখপাতা কুঞ্জলতা চমুকাহুন্দরী!

গঙ্গাস্নান করতে গেলেন গ্রাম-পণ্ডিতের ঝি;—

সাত বো যায় সাত দোলায়,

সাত বেটা যায় সাত ঘোড়ায়,

কত্তা যান গজহস্তীতে,

গিন্নি যান রত্ন-সিংহাসনে,

ঠাকুর ঠাকুরণ দোলনে যান।

এই ছড়াটি পরিষ্কার বোঝাচ্ছে, বসন্তের দিনে নদীর ধারে টাপা কুঞ্জলতা অশখ এদের একটা উৎসব চলেছে—সবুজে পাড়ালে নতুন-দুটে-ভটা থেকে আস্তে বেরে-পড়ায় দলে-দলবু বুড়ো-বুড়ো ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী এই উৎসব দেখতে আসছে—কেউ চলেতে ছলেতে, কেউ নাচতে নাচতে, কেউবা গজেকুগমনে! এর পবেই ঠাকুর ঠাকুরণ। এঁরা যে কোন্ দেবতা তা বলা যায় না। শিব-দুর্গা হতে পারেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারেন, পিতৃ-পুত্রদেরও কেউ হতে পারেন। এঁদের ছতনে কথা হচ্ছে—

ঠাকুর জিজ্ঞাসেন—ঠাকুরণ! নরলোকে গঙ্গার ঘাটে কি ব্রত করে?

উত্তর—অশখপাতার ব্রত করে!

প্রশ্ন—এ ব্রত করলে কি হয়?

উত্তর—সুখ হয়, সত্য হয়, সোয়াস্তি হয়।

এর পর ঠাকুর দেখলেন ছেলে বুড়ো

সবাই মিলে একটি কবে পাতা মাথায় রাখছে আর ভুলে ডুব দিচ্ছে আর পাতা-গুলি জলের স্রোতে ভেসে চলেছে। ঠাকুর ভেবে পান না মানুষরা সব করে কি? এই বসন্ত-কালে, লোকে এ কি পাগলামি করতে লাগল! তখন ঠাকুরণ তাঁর কোতূহল চরিতার্থ করে বলছেন, এরা গাছে আর মানুষে মিলে এক-এক পাতার কামনা জানিয়ে ব্রত করছে।

এরা—“পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে—

পাকাচুলে সিঁদুর পরে।

কাঁচা পাতাটি মাথায় দিয়ে—

কাঁচা সোনার বণ হয়।

শুকনো পাতাটি মাথায় দিয়ে—

সুখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।

ঝরা পাতাটি মাথায় দিয়ে—

নাশ-মুক্তির ঝুর পরে।

কাঁচ পাতাটি মাথায় দিয়ে

কোলে কমল পুত্র ধরো।”

এত ব্রতটিকে বসন্তদিনে মানুষে আর গাছ-পানায় মিলিয়ে একটুখানি রূপক—ছোট-একটু নাটকের মতো করে গাঁথা হয়েছে ছাড়া আর কি বলা বাবে? এঁহঁতো একটুখানি ব্রত, কিন্তু তবু এর মধ্যে বসন্তের দিনে নতুন এবং পুরোনোর, মানুষের এবং বনের নিখাসটুকু যখন এক-তালে উঠছে পড়ছে দেখি তখন এটুকু ছোটো বসন্তে হজ্জা হয় না; এঁহঁতুকের মধ্যে কতখানির হাঁসিত, কতখানির রস না পাচ্ছি!

মেয়েলা-ব্রতে দেব-দেবীকে দেখি, একে-বারে নির্মল,—তরল যতটা হতে হয়। “ভাদ্রে ভাতলা—নদী বৃষ্টির জল” বোদ আর

বৃষ্টি—হুয়ের মাঝে তিনি জোড়া-ছত্র মাথায় বসে। এবং শরতের আশা আশীর্বাদে ভরা ছই ঋতুর দিন-রাত্রির চাই নৌকায় পা রেখে আসছেন।

সেঁজোতি হলেন—

“সাঁজ পুজন সেঁজোতি

বারোঘরে তেরো বাতি।”

সন্ধ্যা, সাঁজের বাতি, জাঁতি ফুল, সন্ধ্যার একটুখানি ঝিক্‌ঝিক্—এই সব মিলিয়ে জ্যোতিরূপিনী সেঁজুতী। এঁদের সন্ধান কোন্ শাস্ত্র দেবে?

খাটি মেয়েলা-ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পূজো নয়। এর মধ্যে ধর্ম্মাচরণ কতক; কতক উৎসব; কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটু-খানি। কামনার প্রতীচ্ছবি, কামনার প্রতি-ধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া, মানুষের হৃদয়কে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমন নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্ম্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেষ্টারা। অতীতঃ এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে দেখতে পাই।

‘আদর-সিংহাসন’ ব্রতে মানুষ আদর চেয়ে—মিষ্টি কথা পাবার কামনা করে তো শাস্ত্রীয় হরিচরণ-ব্রতের মতো আমার টাটে দেবতার-পাদপদ্ম লিখে পূজা করে বৃন্দপ্রার্থনা করছে না! সে যেমন-আদরটি কামনা কচ্ছে সেটি একটি জীবন্ত প্রাণের মধ্যে ধরে দেখবার আয়োজন করছে। সত্যি এক স্বামিসোহাগিনীকে সামনে বাসিয়ে বসনে-ভূষণে সাজিয়ে যেমন আদর সে

সুদৃশ্যতা কামনাকে অর্পণ করছে এবং জানছে যে এতটাই তার আদর-পাওয়ার কামনা চরিতার্থ হবে নিশ্চয়। এইখানে ব্রত আর পূজোতে তফাৎ।

মেয়েলা-ব্রতগুলির সব-কটি খাটি অবস্থায় পাওয়া যায় না। কালে কালে তাদের এত ভাঙচুর অদলবদল উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে যে কোন্‌টা পূজো কোন্‌টা ব্রত ধরতে হলে আদর্শ ব্রতের লক্ষণগুলির সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে গোলে পড়তে হয়। খাটি ব্রতের লক্ষণ মোটামুটি এই বলে নির্দেশ করা যেতে পারে:—খাটি ব্রতে ব্রতীর কামনার সঙ্গে ব্রতের সমস্তটার পরিষ্কার সাদৃশ্য থাকা চাই,—জল চেয়ে পাদপদ্ম লিখে তাতে ফুল দিলে চলবেনা;—জলকে প্রত্যক্ষ করতে হবে বৃষ্টির অনুকরণে ঝারা দিয়ে কিম্বা বৃষ্টির ছাঁব লিখে বা বৃষ্টির বর্ণনা করে ছড়া বেঁধে অথবা এই তিন ক্রয়ারই একত্রে অনুষ্ঠান করে। ইচ্ছা, বাইরের কোনো ঘটনা-থেকে—যেমন আকাশের দিনে শস্তের কামনা—কিম্বা নিজের অন্তর-থেকে অকারণে উঠে মনকে দোলা দিচ্ছে এবং সেই দোলা মানুষের নানা চেষ্টায় প্রতিকালিত হয়ে একটা চারতর্থতা পাচ্ছে, ধরতে গেলে, এই হল ব্রত। কিন্তু এর মধ্যে একটু কথা রয়েছে। ক্রিয়া যখন একের মধ্যেই ধরা রহিল তখনতো সেটিকে ব্রত-অনুষ্ঠান বলা চলে না; ব্রতে দোখ, দশে একই প্রেবণার বশে, একই ক্রিয়া করে চলেছে। তবেই বলতে হবে ব্রত হতে হলে একের কামনা অথবা একের মনের দোলা দশকে ছাঁলে একটা ব্যাপার হয়ে নাচে গানে ভোজে হত্যাাদিতে অনুষ্ঠিত

হওয়া দরকার। আমাদের নিত্যভোজন ও পরিপাক—আমাদের ইচ্ছা এবং শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া; কিন্তু সেটাকে তো ব্রত-অমুষ্ঠান বলব না; কিন্তু পাকস্পর্শ কিংবা পিঠে-পার্কিন এর এক-একটা অমুষ্ঠান। যখন একজন মুসলমান নমাজ করছে প্রতিদিন, তখন সে ধর্ম করছে বলতে হবে, কিন্তু সে ব্রত-অমুষ্ঠান করছে তখন, যখন সে আর দশহাজার মুসলমানের সঙ্গে একত্র হয়ে হৈমের পূর্বদিনে এক ভঙ্গীতে নতি-প্রণতি দিচ্ছে দেখি। আবার হাজার লোক যখন কোথো উন্মত্ত হয়ে মার-মার করে ছুটেছে তখন সেটিকে কোনো অমুষ্ঠান বলবনা, কিন্তু হাজার সেপাই যুদ্ধে যাবার পূর্বে প্রতিদিন মাঠে কুচ্ করছে দেখি তখন একটা অমুষ্ঠান চলেছে বলব।

কামনা এবং তার চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া যখন একেরই মধ্যে কিংবা অসংহত ভাবে দশের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অবস্থার রইলো তখন সেই একেরই সঙ্গে বা একে-একে দশের সঙ্গে তার লোপ হয়ে গেল। কিন্তু এক ভাব, এক ক্রিয়া যখন সমস্ত জাতিকে প্রেরণা দিলে তখন সেটি ব্রত হল, এবং বেঁচেও রইল দেখি।

আমাদের একটা ভুল ধারণা ব্রত সম্বন্ধে আছে। আমরা মনে করি যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্ম ও নীতি শেখাতে মেরেদের জন্তে আধুনিক কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত-অমুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার করে গেছেন। শাস্ত্রীয় ব্রত-গুলি কতকটা তাই বটে, কিন্তু আসল মেরেলী ব্রত মোটেই তা নয়। এগুলি

আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বের পুরুষের; —তখনকার—যখন শাস্ত্র হয়নি, হিন্দুধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকেদের মধ্যে কতকগুলি অমুষ্ঠান যে-গুলির নাম ব্রত।

• এই-সব ব্রতের মূলে কিসের প্রেরণা রয়েছে বলা শক্ত। মানুষের ধর্ম-প্রবৃত্তি, না মানুষের শির-সৃষ্টির বেদনা থেকে জন্মাভ করেছে এই ব্রতগুলি সেটা পরিষ্কার করে দেখার পূর্বে ব্রতগুলির সঙ্গে পরিচয় আরো-একটু বিনিষ্ট করে নেওয়া দরকার। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস; খাঁটি ব্রতের লক্ষ্য ও লক্ষণ দুইই তাতে নেই; স্মরণ্য সেগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল খাঁটি মেরেলী ব্রত কি-ভাবে আপনাদের প্রকাশ করছে তাই দেখি।

প্রথমে দেখি, কতকগুলি ব্রত—যাতে কামনা এবং আল্পনা ও ছড়া একটি অন্তর্ভুক্ত অমুকরণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন, কামনা হল সোনার চিকনি, সোনার কোঁটা, আরনা, পাল্কি। সেখানে পিটুলীর আল্পনা দিয়ে একটা চিকনি একটা কোঁটা, পাল্কি একটা, আরনা একটা আঁকা হল এবং তাতে ফুল ধরে ধরে বলা হল—

“আমরা পূজা করি পিঠালীর চিকনি,  
আমাপো হয় যেন সোনার চিকনি।  
আমরা পূজা করি পিঠালীর কুটুই,  
আমাপো হয় যেন সোনার কুটুই।  
আমরা পূজা করি সোনার পাল্কি,  
আমাপো হয় যেন সোনার পাল্কি।”

এখানে, চিকনি-দেবতা, কোঁটা-দেবতা, পাল্কি-দেবতা ইত্যাদিকে পূজা করে বর

চাওয়া। একেবারে কাজের কথা, এবং বতটুকু কাজের কেবল ততটুকু, একটু কাজে কিছু নেই। বা চাই তার অরূপ অধিষ্ঠাত্ত্ব দেবতাকে কল্পনা করে বর প্রার্থনা।

আর-এক রকম, তাতে কামনার অরূপ ছড়া কিন্তু আল্পনাটি ভিন্নরূপ। মাদার গাছ একে বলা হচ্ছে,—

“আমরা পূজা করি চিত্তের মান্দার,  
আমাগো হয় যেন ধান চাউলের ভাণ্ডার।”  
“আমরা পূজা করি পিঠালীর মান্দার,  
সোনার রূপায় আমাগো ঘর আন্ধার।”

মাদার-গাছের সঙ্গে ধান-চাল, সোনা-রূপের পরিষ্কার যোগ নেই অথচ তাতে ফুল দিয়ে বর চাওয়া হল এবং এখানেও কাজের জন্ত বতটুকু, ততটুকু হল—আল্পনা, এবং ততটুকু হল ছড়া! গল্প সাহিত্য আধুনিক, স্মরণ্য কথায় এখন যা বলি,

পূর্বে যখন পঞ্চদশ সাহিত্যের ~~কামা~~ তখন ছড়াগুলি পড়েই বলা হত। কিন্তু এই ধরনের ছড়াকে কবিতা কিম্বা গান, কি নাটক কিছুই বলা যায় না। এরা কেবল পদ্যে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করছে—এই মাত্র। ‘জল দে বাবা’ না বলে বলাচ্ছি ‘দে জল, দে জল বাবা!’ এতে জল আছে স্পষ্ট বোঝালো কিন্তু কাবারস তো নেই! এই ধরনের ছড়া কিম্বা এই ছাঁচের ব্রতগুলিতে পণ্ড, আল্পনা ও নানা-চলাবলা থাকলেও, এগুলিকে কোনো দিন চিত্তকলা কি কাব্য বা নাট্য-কলা বলে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু পরে যে দু-একটি ব্রতের ছড়া প্রকাশ করছি সেগুলির গঠনের এবং বীধুনীর প্রণালী দেখলেই বোঝা যাবে তার মধ্যে নাট্যকলার লক্ষণ কেমন পরিস্ফুট।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## শিক্ষা ও সাধনা

ভাবুক এড্‌মণ্ড হোম্‌স্‌ আমাদের দেশে অপরিচিত নন। Creed of Buddha (বুদ্ধের ধর্ম) নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের সাধনা সম্বন্ধে ইহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; সম্প্রতি শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে ইহার মতামতের একটু পরিচয় দিব।

হোম্‌স্‌ খুব বড় করিয়াই শিক্ষা জিনিসটিকে দেখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা শিক্ষা বলিতে কতকগুলি খবরের সমষ্টিমাত্র বুঝি, বা ছেলেদের যেন-

তেন-প্রকারে গলাধঃকরণ করাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ইনি শিক্ষাকে মানুষের জীবনের সাধনারই প্রথম সোপানরূপে দেখিয়াছেন।

হোম্‌স্‌ মানুষের সাধনাকে প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, বীজ যেমন বাহিরের আবহুন্ধ্যো অন্তর্নিহিত প্রকৃতির প্রেরণায় যতদিন তার বৃক্ষ-জীবন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, কেবলি বাড়িতে থাকে, মানুষের আত্মাও তেমনি পরিপূর্ণতার দিকে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠে। কি করিলে তার অন্তর্নিহিত

শক্তি গোড়া হইতেই অব্যাহত হয়  
সেইটিই শিক্ষকের ভাবিব্যার বিষয়।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে তাহার বুদ্ধির  
সহায়তার জন্য প্রকৃতি কতকগুলি প্রবৃত্তি  
(instincts) দিয়াছেন, যেমন খাইবার এবং  
হাত-পা নাড়ার প্রবৃত্তি; এই ভাবে অজ্ঞাত-  
সারে শিশুর শরীর পুষ্টলাভ করিতে থাকে;  
তেমনি তার আত্মার বুদ্ধির জন্তও ব্যবস্থা  
আছে। যে কেহ শিশুকে লক্ষ্য করিবেন,  
তিনিই দেখিবেন যে সে নিম্নলিখিত কাজগুলি  
করিতে ভালবাসে—

- (১) কথা বলা এবং শোনা
- (২) অভিমান করা
- (৩) আঁকা
- (৪) নাচা এবং গান করা
- (৫) প্রশ্ন করা
- (৬) জিনিষ তৈরি করা

এই সমস্ত প্রবৃত্তির কি উদ্দেশ্য, তাহা  
একটু তলাইয়া দেখা যাক।

(১) কথাবার্তা বলা ও শোনাই পরে  
লেখা ও পড়ার মধ্যে প্রসারতা লাভ করে।  
এই প্রবৃত্তির দ্বারা শিশু অজ্ঞাত জীবনের সঙ্গে  
তার যোগ স্থাপনা করে।

(২) শিশু যখন সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা  
করে, তখন প্রায়ই দেখা যায়, তাহার  
নিজেদের অস্ত-কিছু কল্পনা করিয়া লইয়া—  
অর্থাৎ প্রবীণ বা আর-কিছু সাজিয়া অভিনয়  
করে। এই উভয় প্রবৃত্তিতেই দেখা যায় যে  
শিশুরা কল্পনা ও সহায়ত্বের সাহায্যে  
বাহিরের প্রাণীদের মধ্যে আপনাদিগকে  
প্রসারিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে।

(৩) শৈশব হইতেই ছেলেরা ছবি ভাল-

বাসে, পরে নিজেরা আঁকিতে চায়। পেন্সিল  
ও কাগজ, খড়ি, কয়লা, রংএর বাস্তু প্রভৃতি  
দিয়েই শিশু কিছু-না-কিছু আঁকিতে বসিয়া  
যায়; এই প্রবৃত্তির দ্বারা শিশু নিজের  
অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আপনার  
অনন্দ প্রকাশ করে।

(৪) নাচে এবং গানে শিশুর স্বাভাবিক  
অনন্দ, সকলেরই এটি জানা কথা। এই দুইটি  
প্রবৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী শক্তিতে  
শিশুর জীবন বিকশিত হইয়া উঠিতে থাকে।

(৫) শিশুর প্রশ্ন করার অধ্যাসও  
সুবিদিত।

(৬) শিশুকে এক বাস্তব খেলা ইট  
দিলে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাড়ী, মন্দির  
প্রভৃতি তৈরির কাজে কাটাইয়া দিবে।  
আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের ঘরকন্নার  
খেলা সকলেরই জানা আছে। এই প্রবৃত্তি  
দুটির সাহায্যে শিশু প্রকৃতির কলকারখানার  
মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা পায়।  
প্রকৃতির এই ছাত্রটি জ্ঞানের জীবির দ্বারা  
খোলা যায়।

প্রথম দুটি বৃত্তির সাহায্যে শিশুর আত্মা  
প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়—দ্বিতীয় দুটির  
সাহায্যে সৌন্দর্য্যের দিকে এবং শেষের দুটির  
সাহায্যে সত্যের দিকে। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের  
দিকে প্রকৃতি নিজেই অহরহ শিশুর আত্মাকে  
টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

হোমস্ বলেন শিক্ষকের কাজ শিশুর  
এই স্বভাব-দত্ত বৃত্তিগুলির বিকাশের সাহায্য  
করা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই  
বিকাশের নাট্যলীলায় শিশুকেই প্রধান  
অভিনেতা করিতে হইবে। শিশু আপনার

আনন্দে আপনাকে বড় করিয়া তুলিব—  
শিক্ষক বাগানের সুন্দর মালীর কাজ  
করিবেন মাত্র।

প্রকৃতির ইংলণ্ডে একটি বিদ্যালয়ের  
বর্ণনা করিয়াছেন,—যেখানে এই প্রণালী-  
অনুসারে কাজ হয়। ইহাতে তোমাদের  
কণার মূল্য আরো বাড়িয়া গেছে, কারণ  
কল্পনার সঙ্গে তথ্যের মণি-কাঞ্চন যোগ  
হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়টির বিস্তারিত বর্ণনা  
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব, তবে একটু উল্লেখ  
করিতে পারি।

(১) এখানে ক্লাসে ছেলেদের কথাবার্তা  
বলায় কোন বাধা নাই। পাঠের সময়  
তাদের প্রশ্ন করিতে এবং অবাধে মতামত  
ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত করা হয়। এ  
ছাড়া খেলা, অভিনয় প্রভৃতি কাজ তাৎ  
নিজেরাই আলোচনার দ্বারা ঠিক করে।

(২) অভিনয়ত ইঙ্কলের একটি প্রধান  
অঙ্গ। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনা  
অভিনয়ের জুড়ি তারা নিজেরাই দস্তরমত  
নাটক তৈরি করে এবং ঐতিহাসিক উপভাস  
বা বড় কোন ইতিহাস হইতে সেই সময়-  
কার প্রচলিত সাজসজ্জা ঠিক করিয়া লয়।  
সেক্সপীয়রের নাটক বা কোন ভাল  
উপভাসের অংশবিশেষও তারা অভিনয় করে।  
এইরূপে অল্পমাত্রায় স্থলে নিজেরই অধিষ্ঠিত  
করিতে করিতে তারা ক্রমে উদারতা, দয়া,  
প্রীতি ও সহায়ত্বের পথে অগ্রসর হইতে  
থাকে।

(৩) আঁকা-শেখানোর সম্বন্ধে সেখান-  
কার শিক্ষক বলিতেছেন, “আমি প্রত্যেক  
শিশুকে একটি করিয়া আইভি-পাতা দিলাম ;

এবং লগ্নটির দিগন্ত চাহিয়া চাহিয়া তাহার  
বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। পবে  
আমি বলিলাম, এইবার তোমরা মাকে মাঝে  
পাতাটির দিকে দেখিয়া পাতাটি আঁকো দেখি।”  
অনেকেই আঁকায় অবশ্য ভুল হইল, কিন্তু  
আমি বোর্ডে শুদ্ধ করিয়া আঁকিয়া দিই নাই।  
আমি তাদের বলিলাম, ‘এই এই ভায়গায়  
কি পাতাটির সঙ্গে তোমার ছবির মিল  
আছে ? কি তফাৎ ? কি রকম করিলে ইহা  
বদলানো যায় ? ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি  
শিশুদের দিয়াই তাদের ভুল বলাইয়া লই।  
বোর্ডে ছবি আঁকিয়া দিই না।’ এই স্কুলে  
ছবি দেখিয়া ছবি আঁকার নিয়ম নাই।

(৪) এই বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডের লোক-গাথা  
(folk-song) এবং মরিস্ নৃত্য শেখানো  
হয়। আর একটি উপায়ে ইহাদের পাঠের  
মধ্যেই সুরের জাল বোনা হয়। ইহারা যখন  
সেলাই, বুনন বা অল্প কোন কাজ স্থিরভাবে  
করিতে থাকে, তখন শিক্ষক কোন উচ্চ  
অঙ্গের সুর বাজাইতে থাকেন, সেটা তাদের  
কাজ ও চিন্তের গভীর তলদেশে সুর সঞ্চারিত  
করিতে থাকে।

(৫) প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের (Nature-  
study) ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাস্য বৃত্তি খোরাক  
পায়। যখন ফুল, পাতা বা অল্প কোনো  
প্রাকৃতিক জিনিস সম্বন্ধে ক্লাসে আলোচনা  
হয়, প্রত্যেক শিশুর হাতে তখন একটি করিয়া  
সেই জিনিস ও একখানি আঁতস কাচ (lens)  
দিয়া জিনিসটিকে খুব তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো  
হয়, যখন কোন বিশেষত্ব ধরা পড়ে, তৎক্ষণাৎ  
শিশুরা তার কারণ বাহির করিতে চেষ্টা  
পায় ; এই চেষ্টাতে তারা খুব বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ

করে ~~করে~~ শিক্ষকের সঙ্গীতায় ইহার সত্য কারণ ও সেই বিশেষত্বের সঙ্গে সমস্ত জিনিষটির সম্বন্ধ আবিষ্কার করে। এইরূপে কেবল যে তাদের প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের শক্তি বাড়ে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কন-বৃত্তিরও উন্নতি হইতে থাকে।

(৬) পাখীরা যেমন বসন্তকালে বাসা বাঁধে, এখানকার শিশুরাও তেমনি হাতের কাজ করিতে ভালবাসে। এ কথা সত্য যে সাধারণ স্কুলের মত বাগান-করা বা রক্ষনবিজ্ঞা সম্বন্ধে প্রণালী-বদ্ধ কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু সখের বাগান করা, রক্ষন করা, কাঠের কাজ করা ইত্যাদির একটি প্রধান অঙ্গ, গড়িবার এই বৃত্তিটিকে এইটুকু কাজের মধ্যেই থামিতে দেওয়া হয় না। শিক্ষক সমস্ত বিদ্যালয়টি গড়িয়া তুলিবার ভার শিশুদের হাতে দিয়াছেন, যাহাতে ক্রমে ক্রমে ইহা স্বায়ত্তশাসনকারী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়।

এই ত গেল বাহিরের প্রণালীর কথা ; কিন্তু ইহার ভিতরে শিক্ষার যে গভীর তত্ত্বটি আছে সেটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে হোম্‌সের বইখানি পড়া দরকার। তিনি বলেন, মানুষের আত্মা যদি আপন প্রকৃতির প্রেরণায় এইরূপে নানাদিকে প্রসারিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তার ছোট-আমির নাগপাশ-বন্ধন আপনা হইতেই খুলিয়া পড়িবে। পৃথিবীর বায়ী আনা পানের মূল হইতেছে, অহঙ্কারে ছোট-আমিকে সত্য-আমি বলিয়া মনে করায়। মানুষের বড়-আমি যদি একবার খোরাক পাইয়া সত্য ও সত্যের ইচ্ছা ওঠে, তাহা হইলে ছোট-আমি আপনাই কোথায় মিলাইয়া

যাইবে এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি পাপ তাহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। শিশুর প্রসারণী বৃত্তিগুলি এই বড়-আমির প্রকৃতি-দত্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অতএব ইহাদের খোরাক যোগানোই শিক্ষা ও সাধনার একমাত্র কাজ।

সব দেশেই নীতি ও ধর্মশিক্ষাকে ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের মত এক একটা “বিষয়” করিয়া তোলার চেষ্টা দেখা যায় ; হোম্‌সের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে তাহার কোন স্থান নাই। হোম্‌স্ বারবার এই কথাই বলিয়াছেন, বাতির হইতে যা দি, তার দ্বারা আমরা আত্মাকে আঘাত করি ; ভিতর হইতে শিশু আপনি যা লয়, তার দ্বারাই তার আত্মা পুষ্টি লাভ করে। হোম্‌সের শিক্ষার আদর্শ যে কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য একটি জায়গা উদ্ধৃত করি—

“Far from wishing to secularise education, I hold that it cannot be too religious. And, far from wishing to limit its religious activities to the first forty minutes of the morning sessions, I hold that it should be actively religious through every minute of every school session, that whatever it does it should do to the glory of God.”

তাৎপর্য—“শিক্ষাকে পার্থিব ব্যাপার করিয়া তোলা দূরে থাক, আমার মতে ইহা একান্ত ধর্মনিষ্ঠ হওয়া উচিত। এবং ধর্মশিক্ষাকে প্রথম-চল্লিশ মিনিটে আবদ্ধ না রাখিয়া আবার মতে ইস্কুলের প্রত্যেক মুহূর্তকে ইহার



অধিকার করা উচিত, যাচাতে ইঙ্গুলের সমস্ত কাজ ভগবানের মহিমা প্রচার করে।”

যাঁহারা Creed of Buddha সাধন-তত্ত্ব সহিত পরিচিত, তাঁহারা এই পুস্তকে আত্মোপলব্ধির পথের প্রথম অংশটি দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইবেন, সেই পথে কি করিয়া

মানুষের আত্মা একেবারে শিক্ষণীয় হইতে যাত্রা আরম্ভ করিতে পারে, প্রতি পূর্ণায় গ্রন্থকারের এই আগ্রহ চিত্তকে মুগ্ধ করে। তাই মনে হয় ভাবুক সাধকেরাই যেন মানুষের শিক্ষার ভার নেন,—পণ্ডিতদের সংসদ নয়।  
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

## মাল্যদান

( ১২ )

আমাদের দেশেই বিশেষতঃ বৃষ্টি সকল মঙ্গল-কার্যের মূল্যেই মতানৈক্য সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। জ্যোতির্শাস্ত্রীর ব্যায়াম-সমিতিও যে তাহার অঙ্গুগ্রহে বঞ্চিত হইবে একরূপ আশা করা যায় না।

প্রথমতঃ—অতুলেশ্বরের মাসহারাভোগী প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ বেকার আত্মীয় অনাত্মীয়-দল বাঁহারা কর্ণধ্বজের মোসাহেবি করিয়া দিনপাত কীরতেন তাঁহারা এই অবসরে পুরাতন স্মৃতি উদ্ঘাটিত করিয়া পুরাতন রাজার স্ততিবাদ ছলে বর্তমান রাজার মতি-গতির নিন্দা আরম্ভ করিলেন। স্বপ্নের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই এমন একটি আলোচনা আছে, যাচাতে আমাদের দেশেও মতের কড়া দেখা যায়। সকলেই তাঁহারা এক বাক্যে চুপ করিতে লাগিলেন যে, প্রসাদপুর আর পুরুষের রাজ্য নহে, তাঁহারা বাস করিতেছেন এখন নারীরাজ্যে! আচ্ছা সে কি স্বপ্নের দিনই গিয়াছে! রাজার পশ্চাতে মদের বোতল লইয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন রাজারসে আকর্ষিত তাঁহাদের ভরিয়া উঠিত।

আর এখন তামাকটা আফিংটাও কষ্টে জোটে! হায়রে!

যুবকেরা গনগন করিতে লাগিল, অল্প-কারণে। রাজকুমারী পণ্ডিত মহাশয়কে সমিতির সেক্রেটারী করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্তৃত্ব তাহাদের অসহ্য বোঝ হইল। যদিও ইহারা সকলেই প্রায় প্রসাদপুরের স্কুলে পড়ে, অতএব পণ্ডিত-মহাশয়ের ছাত্র,—হইলে কি হয় সংস্কৃত শেখান এক কথা, আর ব্যায়াম-বিজ্ঞার অধ্যাক্ষতা করা অসম্ভব। হাজার হোক তাহারা রাজার আত্মীয় কুটুম্ব, তাহাদের মধ্যে এ পদের উপযুক্ত লোক কি কেহ ছিল না! প্রকান্তে কিন্তু জ্যোতির্শাস্ত্রীর নিকট এ আপত্তি তুলিতে তাহারা সাহসী হইল না। তবু ভাবে-গতিকে এই অসম্ভব বৃষ্টিয়া লইয়া, তর্ক-যুক্তিতে মিষ্টবাক্যে বালিকা তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, পণ্ডিত মহাশয় সেক্রেটারী হইয়াছেন বলিয়া, ইহাতে তাহাদের অপমান নাই। চিরদিনই এদেশে ব্রাহ্মণেই অন্নবিজ্ঞারও গুরু হইয়া আসিয়াছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি, অমরগুরু গুরু, এবং কুরু পাণ্ডব-গুরু দ্রোণাচার্য্য সকলেই ব্রাহ্মণ।

অতএব—ক্ষেত্রে পণ্ডিত মহাশয়ের নিরস্ত্র কর্তৃত্বে তাহাদের ক্ষুদ্র হইবার কোনই কারণ বা নজীর নাই।

এইরূপ নানা বাধা বিয় খণ্ডন করিয়া তেজস্বিনী নারী অবশেষে জয় লাভ করিল। অন্নদিনের মধ্যেই তাহার সমিতি বড় ছোট ছেলের দলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজবংশীয় এবং প্রজাবংশীয় যুবকদিগের সম্মিলনে রীতিমত ব্যায়াম কার্য চলিতে লাগিল। লাঠিখেলার সঙ্গার হইল হরিয়াস, তাহার সহকারী স্বরূপ আরও কয়েকজন পাইক নিযুক্ত হইল। তাহারা ছোট খাঁড়া চালাইতেও শিখাইত। ইহাছাড়া কুস্তি, দৌড়ধাপ, হাড়ুড়ু, ব্যাটবল প্রভৃতি নানারূপ ব্যায়াম ক্রীড়া চলিত। প্রত্যেক খেলার জন্ত সপ্তাহে দুই এক দিন করিয়া সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে জ্যোতিষ্ময়ী ছোট লাঠি লইয়া অন্তঃপুরেও একটি ক্লাশ গুলিয়া দিল। ফুটবল ক্রিকেট খেলা হইত একটু দূরের মাঠে, কিন্তু লাঠি খেলা ইত্যাদির জন্ত ছেলের দল সপ্তাহে তিনদিন রাজবাড়ীর পশ্চাতের আম-বাগানে আসিয়া জড় হইত। রাজা খেলার সময় সবদিন উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকিলেও অধিনায়কতা করিত তাঁহার কন্তা। ছেলেরা সকলেই বয়সে তাহার বড়—বালিকার পিতার বয়সী ছচারজন লোকও ইহার মধ্যে ছিলেন—যেমন পণ্ডিত মহাশয়! কিন্তু সকলকেই জ্যোতিষ্ময়ী সেনাপতির জ্ঞায় পরিচালনা করিত। কোন ছেলের পদাঙ্গুলিটুকুও সীমানা রেখার বাহিরে পড়িয়া গেলে জ্যোতিষ্ময়ীর ইঙ্গিতে সে তটস্থ

হইয়া বখাস্থানে দাড়াইত। লাঠিখানা কেহ ভ্রম্য অথবা ভাবে ধরিলে জ্যোতিষ্ময়ী নিজ লাঠি বাগাইয়া ধরিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিত। কোন দলে কোন ছেলে বন্দ্যুক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে তাহাও ঠিক করিয়া দিত জ্যোতিষ্ময়ী। কেবল হার-জিতের মীমাংসা করিতেন স্বয়ং রাজা। জ্যোতিষ্ময়ীর পরিচালনায় পণ্ডিত-মহাশয়ের জ্ঞায় অক্ষমারী ব্যক্তিও যেন লাটিমের জ্ঞায় ঘুরিতেন। তাহার উৎসাহ-কটাক্ষে শ্রান্ত খেলোয়ারগণও নব বল যেন বলীয়ান হইয়া উঠিত। সমিতির অভিধান হইতে শ্রান্তি ক্লান্তি কথা দুইটা একেবারেই যেন উঠিয়া গিয়াছিল। এইরূপে নামে মাত্র পণ্ডিত-মহাশয় রহিলেন কর্তা কিন্তু আসলে কর্তৃত্ব করিত তাঁহার ছাত্রী। ইহাতে রাজ-আশ্রয়গণের মনের মেঘও ক্রমশঃ কাটিয়া গেল। রাজা এই ক্ষণজন্মা নারীর কাব্য-কলাপ মুগ্ধ নেত্রে দেখিয়া ভাবিতেন,—নাজানি কোন মহাকাব্য সাধন-উদ্দেশ্যে ইহার জন্ম?—অথবা এই অসাধারণ রমণী জীবনের পরিণতি অবশেষে সাধারণ ভাবেই সম্পন্ন হইবে? মনোদেবতার নিকট হইতে রাজা এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাইতেন না।

বাধার আর শেষ নাই। ব্যায়াম পরীক্ষার দিন সন্নিহত, রাজা সহসা বোড়া হইতে পড়িয়া জখম হইলেন। তিনি অপরাহ্নে অস্বাভাব্যে বাইতেছিলেন জীবন-পুরের সীমানা পরিদর্শনে, ইহার প্রাস্তে তাহার এক সরিকের জমীদারী। সরিক অপর কেহ নহেন, বিজনকুমারের পিতা। ইহার পূর্বে পুরুষ শব্দর রায় বোগমায়া দেবীর দূরসম্পর্কীয় খুল্লতাত ছিলেন। রাজা কন্তাকে রাজ্যা-

ধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার ব্রাতৃবংশকে বিবাদপুর জমীদারী দিয়া যান। কিন্তু এই দানে সন্তুষ্ট বা কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, শঙ্কর রায়ের সন্তানসন্ততিগণ বংশপরম্পরায় চিরদিনই যোগমায়া দেবীর বংশের প্রতি একটা বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কতকালে আবার কোন্ রাজা বিষয়বিভব প্রদান করে? রাণীর নামে রাজসিংহাসনে বসার? প্রধান বংশের কাহাকেও তিনি পোষাপুত্র লইতে পারিতেন না কি? তাহা না করিয়া জ্ঞাতঃ প্রসাদপুর-বংশকেই তিনি তর্কাকি দিলেন।

যাঁহার বিষয় ছিল তিনি বে ইচ্ছা করিলে এক কানাকড়িও তাহাদের নাও দিতে পারিতেন, এ কথা মনে করিয়া কেহ এ বংশের প্রতি কখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই। বরঞ্চ অবকাশ পাইলেই প্রসাদপুরের রাজাকে তাহারা ক্রেশ দিয়াই আনন্দ অনুভব করে। উভয় পক্ষীয় প্রজার মধ্যে দাঙ্গাহাদাঙ্গা ত একজন্ত প্রবল গাগিয়াই আছে। অথচ প্রকাশ্যে ইহাদের মধ্যে ভদ্ৰতা-সৌজন্তের ক্রটি নাই। কোন ক্রিয়া-কর্মে উভয় দলেই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাইয়া থাকেন। এবং দেখা হইলেই উভয় পক্ষ—বিশেষতঃ বিবাদপুর-পক্ষ মিষ্ট সম্ভাষণে আত্মীয়তার উৎস ছুটাইয়া দেন।

আপাততঃ বিজয়কুমারের পিতা স্ত্রীজন রায় বিবাদপুরে আসিয়াছিলেন—অতুলেশ্বরের প্রজাগণ তাঁহার আগমনে অতিরিক্ত উৎপাত সম্ভাবনার উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে স্ত্রীজন রায়ের মস্তিষ্ক এত উত্তর যে তাঁহার কার্যপ্রণালী আগে হইতে বুঝিয়া সাবধানতা অবলম্বন করাও সহজ

নহে। বাহা হউক,° রাজা উভয়-দীমানার মধ্যে লোকজন বথেষ্ট রাখিয়া দিয়াছিলেন। এবং প্রায়ই প্রতিদিন নিজে একবার এদিকে আসিয়া খোঁজ খবর লইয়া যাইতেন।—

আজ পরিদর্শনের পর গৃহে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—জীবনপুরের পুল পার হইয়া বস্ত্র রাস্তার পড়িবামাত্র ষোড়শ থমকিয়া দাঁড়াইল। তেজস্বী আরব প্রেতুর একান্ত বাধ্য, কিন্তু আজ রাজার ইজিতে সে চলিল না, কাণ ষাড়া করিয়া দাঁড়াইল।—রাজা এদিক ওদিক চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, রাত্রি হইয়া পড়িলে বিপদ ঘটতে পারে—তিনি ষোড়শকে কশাঘাত করিলেন—অগত্যা ষোড়শ ছুটিল, কিন্তু দশপদ জমি অগ্রসর হইতে না হইতে হঠাৎ গাছ হইতে একটা বিকটাকার জন্তু রাজার মাথার উপরে লাফাইয়া পড়িল—এই অসতর্কিত অবস্থায় ষোড়শ ও অস্বারোহী দুজনই পড়িয়া গেলেন।

জন্তুটাও সঙ্গে সঙ্গে নীচে পড়িয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইল—রাজাকে আক্রমণ করিবে বা ষোড়শকে—সে যেন ভাবিবার জন্ত মুহূর্ত কাল সময় গ্রহণ করিল। এই অবসরে ভূপতিত অবস্থাতেই বকের পিস্তল ডান হস্তে বাহির করিয়া লইয়া রাজা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। কুইকুই শব্দে কাতরোক্তি করিয়া জন্তুটা শুইয়া পড়িল। রাজা তখন দেখিলেন, সে একটা বনমামুষ! সেই সময় রাজার পশ্চাৎবর্তী ষোড়শওয়ার ছুইজন রক্ষস্থলে আসিয়া পড়িয়া ষড়ার উপর ষাড়ার বা চালাইতে বিলম্ব করিল না।

রাজা পড়িয়া জাহ্নুদেশে বিশেষ আঘাত পাঠাইছিলেন। সওয়ারদের সাহায্যে কষ্টে পুনরায় ঘোড়ায় উপর বসিয়া কোনরূপে বাড়ী আসিয়া পড়িলেন,— তাঁহার মৃত শীকারও তাঁহার সঙ্গে অনীত হইল।

প্রসাদপুত্রের টেলিগ্রাম আফিস ২টার পর বন্ধ হইয়া যায় স্মরণ্য সে রাত্রে আর কলিকাতায় তার পৌছিল না। পরদিন সংবাদ পাঠিয়া জামাচরণ ভট্টাচার্য্য যথাসময়ে ডাক্তারাদি সহ যে প্রসাদপুত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাতা পাঠক ইতিপূর্বেই অবগত আছেন

রাজবাড়ীর সকলেই বুঝিল—এই নূতন রকম উৎপাত স্বজন রায়েরই সৃষ্টি। তাঁহার পিতা মাতা কেন যে পুত্রের দুর্জ্ঞান নাম না দিয়া অনর্থক এই সাধু নামটির পর্যাস্ত অবমাননা করিয়াছেন, এই পুরাতন আক্ষেপোক্তি আবার অনেকেরই মুখে নূন স্বরে ফলিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজবাড়ীর মনের কথা বাহিরে প্রকাশ হইতে না হইতে স্বজন রায় নিজেই রাজাকে নিরতিশয় ভাষে প্রকাশ পূর্বক লিখিলেন যে “তাঁহার পলাতক পোষ্য নরবানর কর্তৃক রাজা গৃহীত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার ভ্রূপের শেষ নাই। বহু চেষ্টাতেও তাঁহার লোকজন এ কয়দিন উহাকে ধন্ডিতে পুারে নাই, রাজা উহাকে মারিয়া ভালই করিয়াছেন।” পত্রে এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না, একদিন রাজাকে দেখিতেও আসিলেন। তখন জ্যোতিষ্মতী

পিতার নিকটে ছিল, তাহাব মহিমময়ী সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। জীবনে এ প্রথমবার মনে একটা অমৃতাপও জাগিল—সে ইহাদের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ, অত্যাচার তাঁহার কর্তব্য হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে সংকল্প জাগিল যে এষ্ট কল্পার সহিত নিজের কুমারকে বিবাহহুত্রে গাথিয়া উত্তর রায়-বংশকে এক করিবেন। এতাত রাজকল্পা এবং রাজস্বের অধিকারী হইবেন তাঁহারা—এবং পরস্পরের মনোমালিন্য ও চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইবে।

এ সম্বন্ধ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় তিনি বিলম্ব করিলেন না, রাজাকে দেখিবার পর মহারাণীর চরণধূলি গ্রহণ বাসনায় অন্তঃপুরে গমন করিলেন। এবং রীতিমত ভাবে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। মহারাণী ইহাতে মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, মেয়ের ত বিবাহ দিতেই হইবে, মেন অনুমোদনত স্বরূপ আর মিলবে কোথা! তবে নিজের ছেলের উপর তাঁর বিশ্বাস নাই,—রাজা যে এ প্রস্তাবটা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন—তাহা ত বলা যায় না!

মহারাণী তাই আফ্লাদ প্রকাশের মধ্যেও একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন “আমার ত বাবা খুবই ইচ্ছে দুহাত বাপা পড়ে, দুই পরিবার এক হয়ে যায়। কিন্তু আজ কাল সেদিন নেই তাও ত দেখছ বাবা! মেয়েকে যে রকম স্বাধীন করে তুলেছে বাপ, কোন দিন সে কারো গলায় নিজে মালা তুলে না দিলে বাঁচি।”

সুজন রায় হাসিয়া বলিলেন—“তা স্বয়ংস্বর সভায় আমার ছেলে যদি বসে, তার গলাতেই মালা উঠবে—কাকিনা; সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।”

মহারাজীও হাসিলেন,—বলিলেন “তা বেশ! বিজনকুমার কি এখানে এসেছে? তাকে তবে পাঠিয়ে টাটগে দিও। মেয়ে ছেলে দুজনের পরিচয় আগে হোক। আজকাল ত আমাদের ঠেচ্ছাতেই শুধু কাজ হবে না।”

রায়মহাশয় বলিলেন—“বিজন কলকাতা-তেই আছে। আমি যত শীঘ্র পারি বাড়ী গিয়ে তাকেই জমিদারী দেখতে এখানে পাঠাব।”

মহারাজী রাজার কাছে, সুযোগমত একদিন এ কথা পাড়িলেন,—রাজা কিন্তু এ প্রস্তাব একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া বসিলেন,—বলিলেন, “বাপকে! বেটা ত? অমন কুচক্রী বাপের ছেলের সঙ্গে সখ্য ক’রে কখনই আমি বিয়ে দেব না। তবে মেয়ে যদি কোন দিন আপনা থেকে ওকে বিয়ে করতে যায় ত স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তারও কোনই সম্ভাবনা নেই।”

মহারাজী মনে মনে ভারী রাগিয়া গেলেন,—রাজার যে কি রকম মতিগতি হইয়াছে,—জালকথা যা বলা যায় তাই মন্দ হইয়া ওঠে! তবুও হাল ছাড়িলেন না—ভাবিলেন, “বেশ, তবে তাই হবে,—মেয়ে নিজেরই যাতে পছন্দ করে বিয়ে করতে চায়—সেই চেষ্টাই দেখা যাবে।”

( \* ১৩ )

ঘোড়া হইতে পড়িয়া রাজার যেরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, আসলে সেরূপ কোন ক্ষতি হয় নাই। জামুর অস্থি সরিয়া পড়িলেও ভাঙ্গিয়া যায় নাই। সেটী জন্ত যথাস্থি তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে নিরাপদ দেখিয়া দু-এক দিনের মধ্যেই চলিয়া গেলেন। কাজকর্ম ফেলিয়া শ্রামাচরণ ভট্টাচার্য্যও অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতার দলের মধ্যে শরৎকুমার একাকাঁ মাত্র রাজ-চিকিৎসকরূপে তাঁহার সেবার জন্ত এখানে রহিয়া গেলেন।

রাজা পড়িয়া গিয়া পর্য্যন্ত জ্যোতির্ময়ী পুন্দের ছায় নিয়মিতরূপে ছেলেদের ব্যায়াম খেলার সময় উপস্থিত থাকিতে পারে না। ছেলেরা আপনারা খেলে, বগড়া করে, সর্দারদের উপর সর্দারি করিয়া শিক্ষার বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। পণ্ডিত-মহাশয়ের সাধ্য কি তাহাদের রাশ টানিয়া সোজা রাখেন! অথচ শরৎকুমার যখন মাঝে মাঝে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়ান—তাঁহাকে সর্দাররূপে মানিতে তাহারা অপমান বোধ করে না। কেন না প্রতিপদেই তাঁহার নায়ক যোগ্য ভাব তাহারা অনুভব করিয়া স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাকৃত হইয়া উঠে

জ্যোতির্ময়ী বিকাল বেলা পিতার নিকট থাকিয়া প্রায়ই শরৎকুমারকে এ-সময়টা খেলবার ছুটি দেন। শরৎ কোনদিন বা ফুটবল কোনদিন বা ক্রিকেট খেলায় যোগদান করেন,—আর কোনদিন বা লাঠি খেলার স্থলে উপস্থিত থাকিয়া কাহারও ভুল চুক দেখিলে সংশোধন করিয়া

দেন। ~~শরৎকুমার~~ ইচ্ছার মধ্যে সম্প্রতি দুইটি অভিনব খেলার প্রবর্তন করিয়াছেন।

গংকা, এবং ইংরাজি প্রথায় দস্তানা ধারণে ঘুমা-বুসি খেলা।

এইখানে গংকা খেলার একটু ব্যাখ্যা করিলে বাহারা এ খেলা দেখেন নাই তাহাদের বুঝিতে সুবিধা হইবে।

গংকা চামড়া মোড়া একরূপ ছোট লাঠি, ইহা থাকে খেলকের ডান হাতে, আর বামহাতে থাকে একটা হরিণ শৃঙ্গ, ইক্ষুপ দ্বারা আঁটা দুইটা ছোট হরিণ শৃঙ্গ দ্বারা ইহা প্রস্তুত। ইহা ঢাল স্বরূপ ব্যবসৃত হয়। প্রয়োজন স্থলে ইচ্ছা দ্বারা বিপক্ষের প্রহার হইতে সাধারণতঃ আত্মরক্ষা করা হয় এবং সুবিধামত বিপক্ষকে ইহা দ্বারা খোঁচা দেওয়াও চলে। এই খেলায় ডান পা সম্মুখে রাখিয়া সামনের দিকে কুঁকিয়া পড়িয়া অঙ্কুশ প্রাণে দাঁড়াইতে হয়।

রাজা বেশ ভাল হইয়া উঠিলেন। জন্মাষ্টমীর উৎসব দিনে বালিকা পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিবে, সেইদিন তাহার ব্যায়াম-সমিতির পরীক্ষা উৎসব। কিছুদিন হইতে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ভাদ্রমাস, কি জানি যদি বৃষ্টি আসিয়া পড়ে, মাঠের স্থানে স্থানে ছোট তাম্বু পড়িল। কুটবল প্রভৃতি দৌড়াপ খেলার যুক্তমাঠ এক পাশে রাখিয়া অন্ত্রপাশে একটা বড় চালা বাধা হইল, চালার মধ্যে প্রেসিডেন্টের মঞ্চের চারিদিকে দর্শকদিগের স্তরনির্মিত আসন, এবং মধ্যস্থলে ঘুমাঘুঁ ও লাঠি খেলা প্রভৃতির স্থান নির্দিষ্ট হইল।

শরৎকুমার কলিকাতার অভিজ্ঞ লোক ;

তাহার উপবেশ প্রধানতঃ এই আয়োজনের নেতৃত্ব লাগ পড়িয়াছে, তিনিও এসময়টিতে এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা কত্কার সহিত মাঝে মাঝে এখানে তত্ত্বাবধান করিতে আসেন ; শরৎের কার্যোত্তম, ক্ষিপকাকারিতা এবং দূরদর্শিতা দেখিয়া পিতা কত্যা উভয়েই মুগ্ধ হইয়া যান। শরৎ যেন চলিয়া কাজ করিতে জানে না, সে কাজ করে ছুটিয়া।— অধিকন্তু রাজা এ সম্বন্ধে এমন কোন উপদেশও হস্তিতও করিতে পারেননা— যাহা ইতিপূর্বে শরৎ ভাবিয়া ঠিক করিয়া না লইয়াছে।

ছেলেব দলের আনন্দ উৎসাহের সীমা নাই। জর্জীপুঞ্জার প্রতিমা গঠনের সময় যেকণ আনন্দোৎসাহে বালকেরা মুগ্ধি গঠন নিবোধন করে—সেইরূপ আনন্দে তাহারা মত্ত। প্রভেদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাহারা দর্শক নহে, সকলেই এক একজন গঠন-তৎপর পটুয়া। পণ্ডিত-মহাশয়ের হাতে-কলমে কিছুই বড় একটা কারিতে হয় না। বিনা শ্রান্তিতেও তাপাইয়া উঠিয়া তিনি কেবলমাঝে মাঝে বন্দেমাতরং বলিয়া ডাক ছাড়েন,— ছেলেবাও কাজ করিতে করিতে পণ্ডিত-মহাশয়ের সহিত সমস্বরে বন্দেমাতরং শব্দে গগন ফাটাইয়া তোলে। ছেলের দল এত এক বিষয়ে নির্ধীরোদে তাঁহাকে মানিয়া চলে।

এইরূপ আনন্দমত্ততার মধ্যে যথাসময়ে উৎসব আয়োজন সম্পন্ন হইল। মাঠ, চালা, তাম্বু, রঙ্গিন বস্ত্রে, নিশানে, ফুলে ফুলে সজ্জিত হইয়া উঠিল।

প্রেসিডেন্টের নামে প্রসাদপুরের সকল

ইংরাজই নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজার নামে ধনী দরিদ্র সকল প্রজাতি আহৃত হইল। আশে-পাশের জমীদার এবং কন্ঠচারীগণও নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন। তাঁহারা পত্র পান নাই— তাঁহারাও ভিক্ষা করিয়া নিমন্ত্রণ লইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য বিনকুমার কিছু পূৰ্ণ হইতেই প্রসাদপুরে আসিয়াছেন—এবং তাঁহারও নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

আজ জ্যোতিষ্ময়ীর মহানন্দের দিন। কিন্তু সে আনন্দে তাহার অধীরতা প্রকাশ পায় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সজীক গাড়ী হইতে নামিবামাত্র ছেলেরা বন্দেমাতরং ধ্বনিতে তাঁহাদের সমাদৃত করিয়া মধ্যে আনিয়া বসাইল। রাজা কতাকে লইয়া প্রেসিডেন্টের পাশেই বসিলেন, বিনকুমার তাঁহাদের পার্শ্বেই স্থান গ্রহণ করিলেন। অত্যান্ত ইংরাজ ও জমীদারগণও বসিলেন এইস্থানে।

সভাপতি এবং তৎপক্ষীকে ফুলগুচ্ছ এবং ফুলমালা উপহারে জ্যোতিষ্ময়ী অভিনন্দিত করিবার পর কতকগুলি গেক্সমাংসপরিহিত ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ বেশী বালক গান আরম্ভ করিল—

ভিক্ষাং দেহি জননি গো ভরিয়ে দে এ তুলি;  
আর কিছু চাহি না ত শুধু পদতুলি।  
শুধু মাগো চাই বর, এই আশীর্বাদ কর,  
তোমার সেবার প্রাণ পুণ্য করে তুলি।  
মনে রাখি যেন তোরে সকল কাজে,  
তোমার হঃখ নিশিদিন প্রাণে যেন বাজে।  
তব মুখ সব আগে যেন নিত্য মনে জাগে  
তোমার চিন্তাতে যেন সব চিন্তা ভুলি।

গানের পর প্রেসিডেন্ট অভিভাষণ পাঠ করিলেন, তাহার পর খেলা আরম্ভ হইল। ফুটবল প্রভৃতি খেলা কাল হইবে, চালার

ভিতরে যে সব খেলা হইতে পারে—তাহারই দিন আজ। প্রথমে আরম্ভ হইল কুস্তি। তাঁহার মামাংসা হইয়া গেলে—১৫ নিমিট কাল অবসর দেওয়া হইল। ইহার পর লাঠালাঠি প্রভৃতি খেলা আরম্ভ হইবে।

( ১৪ )

সকলে খেলা দেখিতে মত্ত, কিন্তু বিজনেও সাদিকে মন ছিল না; সে মাঝে মাঝে জ্যোতিষ্ময়ীর দিকে আড়নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিম্নলিখিত কবিতার লাইনটি মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিল।

“Tain would I climb,  
but that I fear to fall—”

যদি জ্যোতিষ্ময়ী তাহার মনের কথা জানিতে পারিতেন তাহাহইলে কি রাজ্যী এলিজাবেথের মতন বলিতেন—

“If thy mind fail thee,  
do not climb at all”

বিজনের বাড়ীর মেয়েরা নিমন্ত্রণে যাইবার সময় কত জরাজড়ীও কিংবাপ বস্ত্রে, কত রাশি রাশি রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ওঠেন, আজ জ্যোতিষ্ময়ীর সাজসজ্জার অনাড়ম্বর বিজনের চক্ষে ভারী নূতন বলিয়া ঠেকিল। বালিকা পরিয়াছে একখানি জরী-কিনার নীলাধরী বারাণসী সাড়ি, তরুণযোগী একটি জ্যাকেট ও ওড়না। অলঙ্কার হুচারিখানি বাহা পরিয়াছে বসনের মধ্যে সেগুলি একরূপ ঢাকাই পড়িয়া গিয়াছে। দেখা বাইতেছে কেবল তাহার শিরোভূষণ—ওড়নার উপরিস্থিত হীরক টায়েরা—রাজা আজ তাহার জন্মদিনে এই উপহারটি প্রদান করিয়াছেন। এই মুকুটচুটায় তাহাকে চিত্রাঙ্কিত দেবী মূর্তির ভায়ই জ্যোতিষ্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিল।

ভা—কথা এত সুন্দর! ইংরেজগণ  
মুখ্যনেই দেখিয়া বঙ্গাশ্বপুত্রের মহিমা  
করনা করিতেছিলেন। আর বিজনকুমার?  
এই জ্যোতির নিকট কিরূপে পৌছিবে,  
কখনও পৌছিতে পারিবে কি না তাহাই  
ভাবিয়া একান্ত মগ্নমান হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্যায়ান-ক্রীড়ার ১৫ মিনিট কাল বিরাম  
অবসরে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন তাসুতে  
আহারে আহৃত হইলেন।

দেশী বিলাতি কোনরূপ ভোজ্যোজনেরই  
ক্রটি ছিলনা। রাজা ম্যাজিষ্ট্রেটপত্রাকে  
করদান পূর্বক লঞ্চগ্রহে লইয়া গেলেন।  
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব করপ্রসারণ পূর্বক জ্যোতি-  
শ্রমকে বলিলেন—“May I have the  
pleasure of” তাহার কথা শেষ হইবার  
পূর্বেই জ্যোতিশ্রমী তাহাকে আন্তে আন্তে  
কি বলিল—তিনি হাসিয়া বলিলেন—  
“Very well, let thy Will be done,  
my queen” বলিয়া আর একজন ইংরাজ-  
পত্নীকে হস্তদান পূর্বক লঞ্চ লইয়া  
গেলেন।

ইংরাজরা সকলেই এবং অনেক বাঙ্গালীও  
ইহাদের অনুসরণ করিলেন। বাকী সকলকে  
ছেলেরা দেশী ভোজের বরে লইয়া গেল।  
দেখিতে দেখিতে স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া  
পড়িল, কিন্তু বিজনকুমার উঠিল না।—  
জ্যোতিশ্রমী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—  
“ভাসুতে গিয়ে খেতে কি আপনার আপত্তি  
আছে?” বিজন কি উত্তর দিবে যেন ভাবিয়া  
পাইল না। জ্যোতিশ্রমী তাহার সঙ্কোচ  
দেখিয়া বলিলেন—“বেশ, আপনি তবে এই  
খানেই কিছু খান—”

একজন যুবক ভার্গাটয়ার মঞ্চের  
নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বলিলেন,  
“সন্তোষ, কিছু খাবার এখানে আনতে বলবে  
তুমি?”

তাহার মুখের কথা শেষ না হইতে  
হইতে শরৎকুমার পুরোবর্তী হইয়া আর  
একটি ছেলের সহিত মিষ্টানের থালা  
লইয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকা হাসিয়া  
বলিল—“ডাক্তার দা নিজেই যে খাবার নিয়ে  
হাজির!”

শরৎ হাতের থালা টোঁবেলে রাখিয়া  
কহিল “আশা করি অন্ডায় কাজ করি  
নি?” বালিকা কহিল “অন্ডায়! খুবই জায়  
কাজ করেছেন। মহলে আমার অতিথি  
অভুক্ত থাকতেন, সে পাপ লাগত  
আমাকে।”

“বেশ আপনারা খান। চল কাপ্তি,  
আমরা লেমনেড আর আইস ক্রিম নিয়ে  
আসি।”

এই বলিয়া শরৎকুমার চুপিয়া গেলেন,  
বিজন থালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া  
দেখিল,—কত রকমের খাদ্য! শাক্ত-  
উইচ, প্যাটি, নানাবিধ কেক; নানা  
রকম মিষ্টান্ন। অল্প সময় হইলে এ সকলের  
গোভ সম্বরণ তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া  
উঠিত। কিন্তু আজ আতিথ্যকারিণী স্বয়ং  
লক্ষ্মীদেবী! তাহার দিকে চাহিয়া তাহার  
কেমন যে বিদ্রম উপস্থিত হইল—সঙ্ক ভাবে  
সে কোন পাণ্ডাই উঠাইয়া লইতে পারিল না।  
জ্যোতিশ্রমী আবার বলিল—“খান না বিজন  
বাবু! এখনি ত আবার সভা পূর্ণ হয়ে  
উঠবে।”



শরৎ সম্ভাষিত হয়—দ্বাদশরূপে—আর  
বিজ্ঞান যে ব্যক্তি স্বার্থটি রাজকুমারীর  
একজন আত্মীয়, সে হইল বাবু পদবাচ্য—  
হায়রে !

কিন্তু আর খাইতে দেবী করাটা সত্যই  
ভাল দেখায় না ; মনের জ্বালা মনে চাপিয়া  
বিজ্ঞানকুমার একটা ‘ম্যারাং’ হাতে তুলিয়া  
লইল। মুখে তুলিতে গিয়া তাহার মনে চটল  
—আদব-কায়দার ক্রটি চটতেছে না ত ?  
রাজকুমারীকে তাহার কি খাইতে অমরোপ  
করা উচিত ছিল না ? সে সহজ ভাবে  
বলিতে চেষ্টা করিল—“আপনি খাবেন না ?”  
বলিয়া হাতটা তাহার দিকে বাড়াইয়া মাত্র  
‘ম্যারাং’টা হস্তচ্যুত হইয়া জ্যোতিষ্ময়ীর পদ  
বস্ত্রের উপর পড়িয়া ফাটিয়া গেল ; মধ্যস্থিত  
ক্রমে তাহার নীলাকল শাদা হইয়া উঠিল।  
এমনি বিজ্ঞানের দুর্ভাগ্য,—ঠিক এই সময় কি  
শরৎকুমার আসিয়া পড়িলেন ! তাহার সহচর  
ভলেটিয়ার এই ঘটনায় কষ্টে হাস্য সম্বরণ  
করিয়া লইল; শরৎকুমার নিঃশব্দে হাতের  
ট্রে-খানা টেবিলে রাখিয়া, তাড়াতাড়ি পকেট  
হইতে রুমাল একখানা বাহির করিয়া লইয়া  
বেশ সচ্ছন্দ স্বাভাবিক ভাবে বালিকার  
কাপড়ের ক্ষীরটা মুছিয়া তুলিয়া দিল।  
বিজ্ঞানকে অপ্রস্তুত দেখিয়া তাহার লজ্জা দূর  
করিবার অভিপ্রায়ে জ্যোতিষ্ময়ী মধুর হাস্তে  
তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন “কিছু মনে  
করবেন না—বিজ্ঞানবাবু, সেদিন আমিও এক-  
জন মেমের কাপড়ে কাফি কেলে দিয়ে  
ছিলুম।—তাড়াতাড়িতে অনেক সময় এমন-  
তর হয়েই থাকে।” কিন্তু বিজ্ঞানকুমারের  
মন এ বাক্যে প্রবোধ মানিল না। লজ্জায়

তাহার শিরা উৎশিরা কাঁপিয়া উঠিল।  
আর শরৎকুমারের সহজ নিঃসঙ্কোচ ভাবে  
ঈর্ষান্বিত হইয়া মনে মনে তাহাকে শত সহস্র  
অভিশাপ দিতে লাগিল। বিজ্ঞান যদি জানিত,  
কিছুদিন পূর্বে হাসিকে একটি ফুল দিতে গিয়া  
শরৎকুমারের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা  
হইলে বোধ হয়—তাহার মনের জ্বালার একটু  
নিবৃত্তি হইতে পারিত।

শরৎ পুনরায় কাজে চলিয়া গেলেন।  
বিজ্ঞানের আহ্বাস্তে পার্শ্ববর্তী ভলেটিয়ার-  
গণ ট্রে-গুলি লইয়া গেল। মধ্যে আর  
জনপ্রাণী নাই, জ্যোতিষ্ময়ী ও বিজ্ঞানকুমার।  
বিজ্ঞান ভাবিতে লাগিল, এমন অবসর কি  
সে বুধা যাইতে দিবে ? সে কি পুরুষ  
নহে ?—একজন নারীকে প্রসন্ন করিবার  
মত একটি কথাও কি সে কহিতে জানে  
না ? তাহার ব্যায়াম-দক্ষতার পরিচয়  
পাইলে রাজকুমারী যে সমুদ্র হইবেন—ইহা  
সে বুঝিল। কিন্তু কি করিয়া একথা  
পাড়িবে, কি করিয়া জানাইবে, যে  
সে ফুটবলে, ক্রিকেটে, লাঠি-খেলায়  
দক্ষ।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল ; খেলার স্থানে  
লোকজন আসিতে আরম্ভ করিল ; দ্বিতীয়  
ঘণ্টা পড়িলেই মঞ্চ পূর্ণ হইয়া উঠিল।  
বিলম্বের সময় নাই, ভাবিবার অবসর  
নাই ; ‘বিজ্ঞানকুমার সহসা জ্যোতিষ্ময়ীকে  
জিজ্ঞাসা করিল—“রাজকুমারি, বাহিরের  
লোক কি কেহ এ খেলার যোগ দিতে  
পারে ?” জ্যোতিষ্ময়ী কিছু না ভাবিয়া  
আনমনেই একরকম বলিল, “পারবে না  
কেন ?”

“আমি কি লাঠিখেঁচীর যোগ দিতে পারি?”

জ্যোতিষ্ময়ী তখন সজাগ হইয়া কহিল—  
“কিন্তু আজকে পরীক্ষার দিন; আমার নতুন খেলোয়ারদের সঙ্গে আপনার মত দক্ষ লোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ঠিক হবে?”

“না আমি কোন সন্ধারের সঙ্গেই খেলতে চাই।”

শরৎকুমার ঠিক এক মিনিট আগে এখানে আসিয়া পরিত্যক্ত চৌকি গুলি সাজাইয়া রাখিতেছিলেন,—নিকটে আসিয়া বলিলেন—  
“আমি বিজনবাবুর সহিত খেলিতে প্রস্তুত আছি।”

শরৎ যে একজন নিপুণ খেলোয়ার তাহা জ্যোতিষ্ময়ী জানিত না—তবু তাহার মান রক্ষা হইল ভাষিয়া সে আনন্দবোধ করিল। অবশ্য খেলাতে ত হারজিত আছেই,—শরৎ না হয় হারিয়াই যাইবে।

পরতের এই প্রস্তাবে বিজনও অসন্তুষ্ট হইল না—শরৎকে হারাটয়া আপনার পৌরুষ গৌরবে সে যে রাজকুমারীকে নিকট সম্মান লাভ করিবে সে বিষয়ে সে খুবই আশ্বস্ত বোধ করিল।

বালক একদলের পেলা হইয়া গেলে—  
প্রেসিডেন্টের আদেশমত শরৎ ও বিজন-কুমার রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। গৎকা খেলায় তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন, ইহাই স্থির হইয়াছিল।

উভয়েরই ইংরাজি সাজ, উপরের কোটটা মাত্র খুলিয়া রাখিয়া, তাঁহারা হাতের আস্তিন গুটাইয়া লইয়া গৎকা ও শূঙ্গ হস্তে খেলার স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে

দাঁড়াইলেন। দুজনেই দেখিতে ভাল, শরৎ একটু দীর্ঘকায় এবং দৃঢ়পেশী,—বিজনকুমার ধনীপুত্র, তাহার ক্ষীর-নবনী-গঠিত দেহ অপেক্ষাকৃত কোমল সূকুমার ও লাবণ্যপূর্ণ। বিবাহ সভায় সৌকুমার্যে বিজনকুমার নারী-সমাজে যে একচেটিয়া প্রশংসালভ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্যোতিষ্ময়ীর রূচি একটু অদ্ভুত বলিতে হইবে। শরতের মাংসপেশীবহুল দেহগঠনে একটা পৌরুষিক ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার নারাবক্ষ্য সহসা একটা অস্বাভাবীয় অতৃপ্তপূর্ণ মোহময় স্বপ্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—  
তাহার সম্মুখে সত্যই কি একটা জীবনোপভাস অভিনীত হইতেছে! এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বেন কোন অনামিকার তুষ্টিসাধন উদ্দেশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। মনের অজ্ঞাতসারে তাহার মন উপলব্ধি করিল, সেই অনামিকা সে নিজে। একটা মোহময়, সুখময় চাঞ্চল্য-আবেগে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

উভয়ের যুদ্ধ চলিল—পবনস্বরে আত্মবক্ষা করিয়া পরস্পরকে পরাজয় করিবার ক্ষমতা—কত ছলে কত কোশলে তাহাদের লাঠি ও শূঙ্গ পরিচালিত হইতে লাগিল। যুদ্ধ দৃষ্টিতে জ্যোতিষ্ময়ী তাহা দেখিতে লাগিল।

একবার শরৎকুমার সহসা ওষ্ঠে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শোণিতাক্ত হইয়া উঠিলেন। সে আঘাত-ব্যথা নিজের বক্ষে জ্যোতিষ্ময়ী অনুভব করিয়াও, তাহাতে কাতর হইল না,—বরঞ্চ এই শোণিতপাতেও সে একটা সুখ অনুভব করিল। এমন কি তাহাকে মুমূর্ষু দেখিতেও সে প্রস্তুত—কিন্তু পরাজিত দেখিতে চাহে না।

দর্শকগণের দারুণ ঔৎসুক্য-আবেগের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইল। শরৎকুমার বিজনের চস্তের লাঠি—বিনা-আঘাতে হস্তগত করিয়া লইলেন, বিজনের সহিত যে সকল দলবল আসিয়াছিল তাহারা নতমুখ হইয়া রহিল;—আর এ পক্ষে বন্দেমাতংগ শব্দে সভা ফাটিয়া উঠিল—ইংরাজগণও সেই সঙ্গে ছুরের বলিয়া রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন।

জ্যোতিষ্ময়ীর মোহ তখনও ভাঙ্গে নাই, শরৎকুমার বিজিত-গংকা মঞ্চে আনিয়া তাহাদের পদতলে রাখিয়া উন্নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। ইহাদের জন্ত আগে হইতে পুরস্কার ঠিক ছিল না, রাজা নিজের অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরী খুলিয়া তাহার হস্তে পরাইয়া দিলেন,—আর জ্যোতিষ্ময়ী টেবিলে রক্ষিত একগাছি ফুলমালা লইয়া সহাস্ত বদনে তাহার কণ্ঠে অর্পণ করিল।

ইহার পর বালকদিগের পুরস্কার বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

\* \* \* \* \*

মহারানী পরদার মধ্য হইতে সব দেখিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন—

বিজনের গলায় এই মালা পড়িবোঁ তাহা চটপটে তিনি প্রকৃত ভাবে শ্রবী হইতেন,—কিন্তু তাহা হইল না,—তবুও নিতাস্তই যে অসন্তুষ্ট হইলেন, তাহাও নহে। জহরীর নিকট জহরের অনাদর হয় না। শরৎকুমারের বীরত্বে মনে মনে তিনি তাহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

নাতনীকে পরে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—  
“স্বয়ম্বরা হলি নাকি রে? সন্ন্যাসী বই আর কি কোন বর মিলল না—আমার নাতনীটির?”

জ্যোতিষ্ময়ীর মুখ লজ্জায় লাল না হইয়া মলিন হইয়া গেল। এই মালাদানের অর্থ কি লোকে এইরূপ করিবে নাকি! ইহা ত তাহার স্বপ্নেরও অগোচর! আর শরৎকুমার? তিনি কি ভাবিয়াছেন? অস্ত্রে যে যাহাই ভাবুক শরৎকুমার কখনই এরূপ ভাবিবেন না!

তথাপি জ্যোতিষ্ময়ী মনে মনে ভারী একটা অস্বস্তিকর লজ্জা বেদনা অনুভব করিল।

শ্রীশ্বর্ণকুমারী দেবী।

## ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভূ-প্রকৃতি ও চাষবাস।

৫

( ফরাসী হইতে )

এক্ষণে ভারতের প্রধান প্রধান চাষ কি তাহার আলোচনার প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

এক পক্ষে, অধিবাসীদের খাদ্যের জন্ত যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যথা :—চাউল, জোয়ার তৈলজ শস্য, ইক্ষু। কেবলমাত্র

নদ-নদীর ব-দ্বীপ-প্রদেশে কিংবা নদীর তীরে ধাত্র উৎপন্ন হয়—এবং ( ব্রহ্ম দেশ গণনার মধ্যে না-আনিয়াও ) এই ধাত্রোৎপন্ন চাউল ৬ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসীর প্রধান খাদ্য। যে সকল প্রদেশ তত সমৃদ্ধ

নহে, সেই সব প্রদেশের লোক জোরারা, খাজুরা ও শাকসবজি খাইয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ড হইতে প্রতি বৎসর ২০।০ লক্ষ টন অশোধিত চিনি উৎপন্ন হয় এবং তামাকের চাষও খুব পরিব্যাপ্ত। সাধারণত 'ছোট' চাষ—খুব 'ছোট' চাষেরই প্রাধান্য।

পক্ষান্তরে, রপ্তানির উৎপন্ন দ্রব্য :—  
তুলা, পাট, নীল, আফিম, রেশম, চা, সিন্‌কোনা, কাকি, এবং সেই সব শস্য যাহা পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের বাহিরে দেশীয় লোকের ব্যবহারে আসে না।

প্রায় সর্বত্রই বৎসরে দুইবার ফসল হয়।

\*  
\*

উপরে চাষের কথা সাধারণভাবে বলিয়াছি, এক্ষণে বিভিন্ন প্রদেশের চাষের বিশেষ বিবরণ বলিব।

### বঙ্গদেশ

সমুদ্রের কূল। সেই সব জলাভূমি যেখানে খাগড়া জন্মায়, সেই সব অনুপ দেশ যেখানে শীর্ণ, তাপদগ্ন বায়ুদলিত হুল্লভ গুল্ম সকল দেখিতে পাওয়া যায়; সেই সব দীর্ঘ বিল যেখানে বকেরা ডুব দিতেছে, যেখানে হাজার হাজার বক এক পায়ের উপর ভর দিয়া ঘুমাইতেছে, কিংবা ডানা ঝাপটাইয়া পল্লবের সহিত লড়াই করিতেছে, আর একদিকে শুকনো চৌঁট দিয়া পালক খুঁটিতেছে, কিংবা তাহাদের লম্বা নির্গোম গলা বাড়াইয়া রহিয়াছে।

সমুদ্র হইতে দূরে, নারিকেল, তাল,

সুপারী, খেজুর, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি। খাল নদীর উপর দিয়া বড় বড় নৌকা মাল লইয়া সারি সারি চলিয়াছে। কতকগুলি নৌকা বাষ্পাশ্রিত বৃহৎ পাল তুলিয়া তরতর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর ধারে গ্রাম। গ্রামের ধূসরবর্ণ কুটীরগুলি কলাগাছের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। জলের ভিতর পাট ও ধান; মাঠে মসুর গাছ, আফিম ও নীলের চারা। আকাশ কখন কখন ঘন নীল, অনেক সময়ই বাষ্পপূরিত। সারাহে চমৎকার শোভা।

প্রথমে অগ্নিশিখার আকারে সূর্য্য অন্তরিত হয়; তাহার পর সমস্ত আকাশ রক্তিমাত হুল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সূর্য্য কোথায় অন্ত যাইতেছে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হঠাৎ আকাশের মুক্ত বায়ু মেঘগুলিকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। গভীর নীলিমা; নক্ষত্র সকল ঔক্ষ্মিক করিতে থাকে; এবং চলমা ধীরে ধীরে উদ্ভে উঠিয়া, খাল, বিল, ~~জল~~নের ক্ষেত কনক-কিরণে প্রাবিত করে।

আরও আগে অভ্যন্তর প্রদেশে ময়ূরগাভি নদীর ধারে, মধুর তরঙ্গ-লীলা। লাল-খাপ্রায়-ছাওয়া মাটির কুটীরসম্বিত গ্রাম-গুলি সুন্দর গাছের ছায়ার অববহিত। আম, বট, পিঙ্গল, তেঁতুল, তাল, কার্পাস—এই সমস্ত গাছের কুঞ্জবন। মাঠে আফিম, নীল, তুঁতের চারা। বন্যাবর জলের ধারে ধারে বিভিন্ন জাতীয় ধান।

অশ্রুতপূর্ব উর্বরা ভূমির উপর অধিষ্ঠিত, আইলের দ্বারা সুরক্ষিত বাঙ্গলার চাষা সুখস্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করে।

খুবই বিরল; এক শতাব্দী যাবৎ কেহই  
 প্রতিফের কবলে পতিত হয় নাই।

কি দেশীর কি যুরোপীয় সকল  
 জমিদারেরই সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি। বিস্তারে  
 লক্ষ পর্য্যন্ত বিঘা ভূমি হইতে পারে।

একজন উপভাস-লেখক, এক ধনী  
 জমিদারের বাসস্থানের এইরূপ বর্ণনা  
 করিয়াছেন :—

(নগেশ্বরের বাড়ীর) বাহিরে তিন মহল।  
 এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎপুরী।  
 প্রথমে, যে সদর মহল, তাহাতে এক  
 ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার  
 চতুর্পার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেটেল।  
 ফটক দিয়া তৃণশূন্ত, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ  
 স্তূনির্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই  
 পার্শ্বে, গো-গণের মনোরঞ্জন, কোমল  
 নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে  
 মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত স্কুসুম  
 পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা  
 পাইতেছে। সম্মুখে বড় উচ্চ দেড়তালা  
 বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপান  
 আরোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়।  
 তাহার বারান্দায় বড় বড় মোটা ফুটেড  
 থাম; হর্ষাতল মর্ম্মর-প্রস্তরাবৃত। অতিশয়  
 উপরে, মধ্যস্থলে এক যুগ্ময় বিশাল সিংহ  
 জটা লম্বিত করিয়া লোল জিহ্বা বাহির  
 করিয়াছে। এইটি নগেশ্বরের বৈঠকখানা।  
 তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ড দ্বয়ের দুই পার্শ্বে অর্থাৎ  
 বামে ও দক্ষিণে দুই সারি একতালা  
 কোঠা। এক সারিতে দক্ষতরখানা ও  
 কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা  
 এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান, ফটকের দুই

পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদ্বিগের থাকিবার ঘর।  
 এই প্রথম মহলের নাম “কাছারী বাড়ী।”  
 উহার পার্শ্বে “পূজার বাড়ী”। পূজার  
 বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান,  
 আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতারা চক বা  
 চকর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ  
 বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময় বড়  
 ধুমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির  
 পাশ দিয়া বাস গজাইতেছে। দালান  
 দরদালান পায়রায় ভরিয়া গিয়াছে, কুঠারী  
 সকল আস্বাবে ভরা—চাবিবন্ধ।

তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে  
 বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট  
 নাটমন্দির। তিন পাশে দেবতাদের পাক-  
 শালা পূজারিদিগের থাকিবার ঘর এবং  
 অতিথিশালা। সে স্থলে লোকের অভাব  
 নাই। গলায় মালা চন্দন তিলকবিশিষ্ট  
 পূজারির দল, পাচকের দল; কেহ ফুলের  
 সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান  
 করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ  
 বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে,  
 কেহ পাক করিতেছে; চাকর দাসীরা কেহ  
 জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে,  
 কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণ-  
 দের সহিত কথাই কহিতেছে, অতিথি-  
 শালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসীঠাকুর  
 জটা এলাইয়া চীৎ হইয়া শুইয়া আছেন।  
 কোথাও উর্দ্ধবাহ একহাত উচ্চ করিয়া  
 দত্তবাড়ীর দাসীমহলে ঔষধ বিতরণ  
 করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্রবণবিশিষ্ট  
 গৌরিক বসনধারী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মাঙ্কমালা  
 ঘোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা

ভাগবদগীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও কোন উদরপরায়ণ “সাধু” বি-মরমার পরিমাণ লইয়া গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুদ্ধ কর্ত্তে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে। মায়ায় আকর্ষণ নাড়িতেছে এবং নাসিকা দোলাটিয়া..... কৌর্জন করিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীরা বৈরাগীরঞ্জন রসকলি কাটিয়া খঞ্জনের তালে .....গীত গাইতেছে। কোথাও কিশোর-বয়স্ক নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্দ্ধবয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে।.....

এই তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্তর। কাছারী বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্তর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ বাবহার্য্য; তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভাৰ্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। .....এই মহল নূতন নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত; এবং তাহার নির্মাণ অতি পরিপাটি।

তাহার পাশে পূজাবাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্তর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত, ঘর সকল অসুচ্ছ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কৃত। এই পুরী আত্মীয় কুটুম্ব কত্কা মাসী মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেরী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীর ভাইয়ের মেয়ে ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ভায় রাজি দিবা কলকল করিত এবং অসুস্থ নানাপ্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক,

গল্প, পরনিন্দা, বাগকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন .....ইত্যাদি শব্দে সংস্কৃত সাগরবৎ শব্দিত হইত।

তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাতে রন্ধনশালা। সেখানে আরও জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে আল দিয়া পা গোট করিয়া প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটায় গল্প করিতেছেন, কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রু-লোচনা চইয়া বাড়ীর সমস্ত পরনিন্দা করিতেছে.....কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া দশনাবলী বিকট করিয়া মৃগভক্ষা করিয়া আছেন..... কোথাও বা বড় বটী পাতিয়া বামো ক্ষেমী .....লাউ কুমড়া বাস্তাকু পটোল শাক কুটিতেছে.....এই তিন মহলের পর পুষ্পোত্তান। পুষ্পোত্তান-পথে নীলমেষভূলা প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীর বেষ্টিত.....”

• •

আসাম।

ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহে, বর্ষার জলে আসামের ভূমি উর্ব্বরা হইলেও উহার আদ্রতা দেশের পক্ষে হানিজনক, এমন-কি যাহাদের পূর্ব-পুরুষ সহস্র বৎসর যাবৎ ঐ দেশে বাস করিয়াছিল সেহ মোগলদের পক্ষেও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন, এই উপত্যকার উত্তর প্রদেশটি প্রায় অনালোড়িত অপরাঙ্কিত; দক্ষিণ

আসামে চাউল, আঁকি, তামাক, রাই-সর্ষে বিশেষত চা উৎপন্ন হয়। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আসামের চা আজকাল চীন ও সিংহলের চায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে।

### হিমালয়।

বিশাল বিস্তৃত সমভূমি হইতে পর্বত সকল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ স্থানে শীত-দেশের উদ্ভিদ, মাঝামাঝি জায়গায় নাতিশীতোষ্ণ দেশের ফুল উদ্ভিদ, তাহার পর উষ্ণদেশের উদ্ভিদ বাহা রুষ্টির প্রাচুর্য্য-বশতঃ খুব সতেজে বাড়িয়া উঠে। কোথাও বা শ্রোতের তোড়ে ঢালুস্থানসকল ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, কোথাও বা উর্বরা উপত্যকা প্রসারিত। বেগুনী রঙের ফুল-বিশিষ্ট রডোডেনড্রন, দেবদারু, কোমল হারিবর্ণের বাঁশ, “সিডার,” কৃষ্ণপ্রায় হরিদ্রবর্ণের পাইন-গাছ, বাদাম-গাছ, মেপ্ল গাছ, চেস্ট-নট গাছ, এবং শৈবাল, ও পরগাছা,—বাহা উর্জ্জ্বলিত বাষ্পের দ্বারা, ও পর্বতগাত্রে লম্বমান মেঘের দ্বারা সর্বদাই আর্দ্র। বসন্তকালে ‘ক্রেমাটিস্’-লতা, মেড্‌লার-গাছের সাদা ফুল; শরৎকালে, বেগুনী ও ধূমল বর্ণের ভার্জিনিয়া-লতা। বর্ষাকালে ছোলায় ফসলী ক্ষেত, বাজ্রার লাল রঙের ক্ষেত, দার্জিলিংয়ের কাছাকাছি চায়ের বাগান। প্রান্তরের উপর শ্রোতাবিনী গর্জন করিতেছে, তাহাদের উচ্ছ্বসিত শব্দ কেনে শতবর্ণের অরণ্য-ভূমিকে ধবলিত

করিতেছে, বড় বড় কর্ণের মধ্যে গাছের মধ্যে রডোডেনড্রন বন আধিপত্য করিতেছে—এই সমস্তের উপরিভাগে সৰু সৰু সূঁড়ি পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে; বোজকা-বুজকির বোকাই লইয়া অস্থলিত-পদ টাট্টাঘোড়া, গরু ও ভেড়া উপরে উঠিতেছে। তাহাদের পিছনে মোগলজাতীয় চালক দীর্ঘকাষ, বলিষ্ঠ, চাপ্টা-মুখ, বাকা-চোখ। গ্রীষ্মকালে উহার নগ্নপ্রায়, শীতকালে দীর্ঘ পরিচ্ছদ ও চর্ম্মাদি পরিধান করে। পুরুষের জায় দ্বীলোক ও দীর্ঘকাষ ও বলিষ্ঠ। একই প্রকার পরিচ্ছদ, কিন্তু তীব্র শীতেও বুকের কাছে কাঁচুলী গোল করিয়া কাটা ও খোলা। তাহার মধ্য হইতে কঠিন ও ঈষৎ নীলাভ বক্ষদেশে দেখা যাইতেছে। সূঁড়ি পথের বাক, সূঁড়ি জলদ-জাল বিদ্ধ করিয়া, কোনও এক শৈলের কঠিন গাত্র প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে,—উহার উপরিভাগ বরফ-নদীর বর্ষলে মস্তূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এরই মধ্যে সূঁড়ি মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে; আরও ঘন হইয়া কুরাসা নীচে নামিতেছে, পথিককে আচ্ছন্ন করিতেছে। এখন ঘোড়ার চালক-দ্বিগকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ঘোড়াদ্বিগকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেবলই উপরে উঠিতে হইতেছে, ক্রমাগতই উপরে উঠিতে হইতেছে। একটা দম্কা ‘বাতাস আসিলে তাহার বেগে নাচে পাড়িয়া যাই আর কি! এইবার পর্বতের গ্রীবাদেশ! এইখানে রুদ্ধনিঃশ্বাস হইয়া থামিতে হয়.....বৃক্ষশাখা হইতে লতা ঝুলিতেছে, কুরাসা ক্রমশ পিছে হটিয়া যাইতেছে—বৃক্ষশাখার নীচে, একটা কায়দা

যেন ~~হইয়া~~ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ১০টা, ২০টা, ১০০টা খুব উজ্জল পাথরের চাকলা। কটিকার দ্বারা তাড়িত হইয়া, মেঘগুলি ছুটিয়া চলিয়াছে। দূর-আকাশে একটা প্রজ্জ্বলিত রেখা। উহা কি মেঘ? না, পর্ত-গাজের একটা বিশেষ অংশ চইতে আলোক হঠাৎ প্রাতিফলিত হইয়াছে। ওগুলো কি শৈলমালা? অত উচ্চ, অসম্ভব! চারিদিকে পর্তত। বাতাসের জোর দ্বিগুণ বাড়িল, মেঘগুলি আরও দ্রুত ছুটিতেছে। দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। কুয়াসার মধ্যে কতকগুলি ছিদ্র। কোথাও অরণ্য; কোথাও ভূগুদেশের পশ্চাদ্বাগে উপত্যকা; উপত্যকার উপর দিয়া কতকগুলি শ্রোতস্বিনী বহিয়া চলিয়াছে; কোথাও কতকগুলি শৈলপিণ্ড একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা ভীষণ বরফ-নদী। একটা বৃহৎ ফাটল। সমস্ত শৈলমালা—শত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। সর্বোচ্চ শিখর উচ্চতায় ৯০০০ metre; যে চূড়া সবচেয়ে নীচু তাহারও মাথা Mont Blancকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, গৌরীশঙ্করের তিনটা শিখর এবং ঐ দেখ কাঞ্চনজঙ্ঘার মহাবল প্রস্তরখিলান। অস্তুমান সূর্য্য এই বরফ-সমুদ্রকে অগ্নি-সমুদ্রে পরিণত করিয়াছে। মনে হয় যেন রক্তবর্ণ তরঙ্গরাজি টগ-বগ-করিয়া ফুটিতেছে, ফুলিয়া উঠিতেছে। ধীরে ধীরে দীপ্তি কমিয়া আসিতেছে: বরফ-নদীগুলো প্রথমে লীল, তাহার পর বেগুনী, তাহার পর ধূমল-বর্ণ হইয়া উঠিতেছে,— অবশেষে একেবারে অদৃশ্য হইতেছে। মেঘেরা তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু

বৃষ্টি, কুয়াসা; আর কিছুই দেখা যায় না; যে গাছে ঠেসান দিয়া আছি, সেই গাছটি পর্য্যন্ত আর দেখা যায় না।

### হিন্দুস্থান

বৃহৎ উষ্ণতা সমভূমি; গঙ্গা ও তাহার শাখানদী সকল উহার উপর দিয়া প্রবাহিত। ধাতু, ইক্ষু, আফিম, নীল, তৈলাক্ত শস্য; ছোলা, ভুট্টা, সধপ, বাজরা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গম। উচ্চ ভূগুণ্ডার মধ্যে, বহুসংখ্যক গরুর পাল। কালো কালো মহিষ, মনে হয় যেন ঘাড়-গর্দানে এক—এবং ছুচাল ককুদ-বিশিষ্ট ছোট ছোট গরু চাঁদোয়া-দেওয়া গাড়ী অথবা লাঙ্গল টানিতেছে—লাঙ্গলের ফলা কাঠের, ফলার মুখ লোহার। সর্বত্র, সমভূমি হইতে উচ্চ বাধের দ্বারা খালসকল সংরক্ষিত; কূপ; গরুরা কাঁচ-কাঁচে জল তোলা যন্ত্রগুলোকে লইয়া ঘুরপাক দিতেছে; লোকগুলো নগ্নপ্রায়, —সাদা ধূত কাপোরে গায়ে জড়ানো—বড় বড় মসকে জল বহিয়া লইয়া যাইতেছে। ছোট ছোট পাহাড়ের উপর হইতে, শরৎ কালে, হিমালয়ের গুহ্র শৈলমালা দৃষ্টি-গোচর হয়—ঐ সকল পাহাড়ের উপর জমিদারদিগের বাসস্থান: হিন্দুধর্মের মণ্ডু-গৃহ, ইংরাজ গথিক-ধরনের দুর্গপ্রাসাদ; উদ্ভান উপবনে, বংশ, বট তালদি বৃক্ষ রোপিত। বানর, পেঁচা কাক ও টিয়া পাখিতে উদ্ভান উপবন পরিপূর্ণ।



**পঞ্চাব**

পঞ্জাব একটা বৃহৎ একঘেয়ে সমভূমি ; চেউ-খেলানো ভাব জমিতে আদৌ নাই। কেবল নদী-সমূহের বৃহৎ গতি-পথ-সকল ঐ সমভূমি কাটিয়া চলিয়াছে। নদীগুলির তেমন গভীরতা নাই ; এমন-কি বসন্তকালে একেবারেই শুকাইয়া যায়। মাটি ষড়িময় বা বালুকাময়। শুষ্ক আব-হাওয়া, শীতকালে কনকনে ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মকালে জ্বলন্ত উত্তাপ। যে উত্তরাংশ, হিমালয়ের শেষ সম্বলস্বরূপ ক্ষুদ্র পাহাড়-অঞ্চলের সহিত সংস্পৃষ্ট, সেই উত্তরাংশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়। মাটি তেজালো ; সর্বত্রই বৃক্ষ, পুষ্প, মাঠ বেশ কথিত ; গ্রামগুলি লোকাকীর্ণ। যে সময় আফগান ও মারাঠার আক্রমণ-ভয়ে গৃহ দুর্গীকারে নিশ্চিত হইত, এখনকার গৃহগুলি সেই সময়কার মতো। গম, জোয়ারা, তৈলজ শস্য, নীল ; কোন কোন স্থানে ধাতু ; তা ছাড়া খেজুর, আম, কমলানেবু, কলমী নেবু, ডুমুর ; শীতকালে, নদীর খোলে তমুজ। পাহাড় হইতে বতাই দূরে সরিয়া যাওয়া যায়, ততই সেখানকার বর্ষা কম চইয়া পড়ে। বন ও গ্রাম অতি বিরল। দক্ষিণ ভাগে কেবল নদীর উপত্যকাগুলিই উর্বরা। এই সকল উপত্যকার অন্তর্বর্তী স্থানে জলাভূমি—এই ভূমিতে বৃক্ষাদি ধ্বংসকৃতি,—এইখানে অসংখ্য গরু, মহিষ, উট, ভেড়া, ছাগল চরিয়া বেড়ায়। তাহার পর রাজস্থানের মরুভূমির আরম্ভ ; স্বর্ষ্যদগ্ধ ধূলারাশির মধ্যে এইখানে প্রবেশ করিতে হয়—

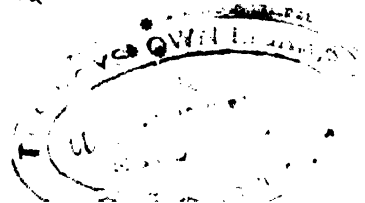
বাবুর বৃষিপাক ৩৫ই ধূলারাশি ~~মানো~~ ৩  
হয় ।

## कश्मीर

অদ্বুত আকৃতির কতকগুলি হাটায়  
শিখরের নীচে, বরক-নদী সমূহ, দেবদারু  
সমাজের পর্বত, বিহাট বা ঝিলমের প্রসিদ্ধ  
উপত্যকা। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ।  
নদী, খাল; খালের ধারে ধারে পপ্লার-বাউ,  
'এলম' ও 'প্লে' গাছ; ফলের বাগান, ধান  
যবাদি রোপিত-ক্ষেত্রভূমি; বাদাম গাছের  
নীচে গ্রামসমূহ; কাঠের ঘর; এই সকল  
ঘরে বলিষ্ঠ, ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘকায় পুরুষ এবং  
ফর্সা-রঙ, মহৎভাববাজক ও সুপরিমাণ  
মুখ্যবিশিষ্ট রমণীরা বাস করে।

सिन्धुदेश

পশ্চিমে পৰ্বত, দক্ষিণে জলাভূমি (সিদ্ধনদীর ব-দ্বীপ), পূর্বদিকে বালুময় মরুভূমি। ইংরেজ-অধিকারের পূর্বে, বেলুচি সর্দারদিগের জন্ত মৃগয়ার উপবন; উদাসীন ও অলস-প্রকৃতি সিন্ধুয়া পূর্বে এখানে তাহাদের গো-মহিষাদি রাখিত। ইংরাজেরা বড় বড় পুর্তকাযোর অস্থানা করিয়া জলাভূমি সকল, এমন-কি মরুভূমিরও কিয়দংশ উর্বরা ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। এই সকল ভূমি হইতে গম, ছোলা, বাজরা, তৈলজ শস্য, শগ, সূক্ষ্ম ও তামাক উৎপন্ন হয়, শরৎকালে চাউল, মকা, তুলা, নীল ও ইক্ষু।



## গুজরাট

## করমগুল উপকূল

নরসদা ও তাপ্তীর সমৃদ্ধ উপত্যকা। হংলণ্ডের অম্লরূপ ভূদৃশ্য; বেশ জল-সেচিত বিস্তৃত প্রান্তরে সুল্লর বৃক্ষাদি; কিন্তু তা ছাড়া আবার নীল সমুদ্র, উপকূলে গভীর ঢালু খাত, বড় বড় তালজাতীয় বৃক্ষ এবং প্রাচ্যদেশের স্থা। ঝোপঝাড় ও গুল্ম-বেড়ার মধ্যে গৃহগুলি অবস্থিত; গৃহের ছাদ লাল খাপ্রার; বটের, কাঁদাখোঁচা, বুনো হাঁস, কাঠবিড়ালী, হাজার হাজার টিয়া পাখী, - সকাল-সন্ধ্যার উহাদের চৌংকারে কাণ ঝালাপালা; লালমাথাবিশিষ্ট সারস পক্ষী এবং শামলা ও সাদাটে রঙের অসংখ্য বানর। কার্পাস, রেশম, নীল, ফলের গাছ, ধান এবং সবাদি অত্যন্ত শস্য।

\* \*

## মধ্য-ভারত

পূর্বদিকে, সাতপুরার বৃহৎ মালভূমি; পর্বতের উপত্যকা; পর্বতগুলা খাড়া উঠিয়াছে এবং নিম্ন-সমভূমির দিকে নামিয়া গিয়াছে; গৌড়জাতীয় লোক এবং দ্রাবিড়ীয় ও আৰ্য্যদিগের কর্তৃক বিভাজিত অত্যন্ত জাতির আশ্রয়স্থান।

পশ্চিম দিকে, নরসদা, তাপ্তী এবং গোদাবরীর শাখাসমূহে সমৃদ্ধ উপত্যকা-সমূহ; গম, তুলা, রেশম, তৈলজ শস্য, আফিম।

প্রথমে, দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক অম্লক্সরা ভূমি, দুইটি উর্বরা ভূখণ্ডকে বিভক্ত করিয়াছে; কৃষ্ণা ও গোদাবরীপ্রসিক্ত প্রদেশ; উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যে জল-সেকের বৃহৎ বৃহৎ পুষ্ঠকার্য্যের অমুষ্ঠানের দ্বারা ঐ-সকল প্রদেশ বিলক্ষণ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; সেখানে খেজুর, তামাক, তুলা ও ধান উৎপন্ন হয়।

আরও দক্ষিণে একটা বিস্তৃত সমভূমি; ঐখানে গ্রীষ্মমণ্ডলস্থলভ বৃক্ষাদি জন্মে; ত্রিচনপলির শৈলদৃশ্য; নিম্নসমভূমি উজ্জানের জায় প্রতীয়মান হয়; কাবেরীর ব-দ্বীপ; ব-দ্বীপ-খণ্ডে অসংখ্য খাল, ফলের বাগিচা, তামাক, ধানের ক্ষেত, এবং উচ্চ তালজাতীয় বৃক্ষসকল শুভ্র আকাশের গায়ে যেন ছবি-আঁকা।

\* \*

## মালাবার উপকূল

‘মাট’ নামক দীর্ঘ গিরমালা; তাহার শৈল-দুর্গপ্রাসাদ, অলিন্দ, বনসকুল ঢালু স্থান সকল নালসমুদ্রের উপর সগর্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। উত্তরদিকে আরও রুঢ় ধরণের উদ্ভিদ; কুর্গ-প্রদেশে গ্রীষ্মমণ্ডলস্থলভ, অরণ্য, বটবৃক্ষের গায়ে লতা জড়াইয়া আছে; ৩০, ৪০, গজ উচ্চ বাঁশের ঝাড়; তাল বৃক্ষাদিকে ছাড়াইয়া বিবিধ রঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাথা তুলিয়া আছে। হাতী, বাঘ, বুনো মহিষ, হরিণ, চিতা, —লতার জড়ানো বৃক্ষাদির মধ্যে অবস্থিত।

ঘাট এ সমুদ্রের মাঝে, একটা বিস্তৃত  
উর্বরা ভূমি; সেখানে খুব গরম দেশের  
সমস্ত ফসল সংগৃহীত হয়—এমন-কি  
দক্ষিণ অঞ্চলে কফিও জন্মে।

\*

\* \*

### কানারী দেশ

কানারীর অভ্যন্তর প্রদেশের মাটি  
কালো; ক্ষুদ্র ভূমাধিকারীরা এট ক্রমি চাষ  
করে; উহাতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।  
আরও দক্ষিণে, ঘাট ও তিলেভেলীর সুন্দর  
মাঠ-ময়দানের মাঝে একটা বিস্তৃত শুষ্ক  
সমভূমি।

\*

\* \*

### ব্রহ্মদেশ

বৃষ্টি-বহুল ব্রহ্মদেশের চারটি পৃথক  
অঞ্চল। ইরাবতীর উপত্যকা; ইরাবতীর  
তীরবর্তী ক্ষুদ্রতমসমূহ; উত্তরদিকে শাণ্  
দেশের পাহাড়। পশ্চিমে বোমাগিরি;  
বোমা-গিরি ও সমুদ্রের মাঝে একখণ্ড বিস্তীর্ণ  
সমভূমি—অ্যারাকান্, শাল্ পাহাড় ও  
সমুদ্রের মাঝে আর-একটা সমভূমিখণ্ড—  
তেনাসেরিম। পূর্বের উপর গ্রীষ্মমণ্ডল-  
সুন্দর অরণ্য; সেগুনগাছ, বাঁশ, তালজাতীয়  
বৃক্ষ, গরম-ভিজা জায়গায় পাতা-বাহার,  
শৈবাল, পরগাছা। ইরাবতীর উপত্যকা,  
অ্যারাকান্ ও তেনাসেরিম সমস্ত মিলিয়া

একখণ্ড বিস্তীর্ণ ধানির ক্ষেত; কোমি কোন  
স্থানে তামাক, গরমমশলা, তৈলজ শস্য।

\*

\* \*

অতএব, ভারত-সাম্রাজ্যের মধ্যে সকল  
প্রকার ভূমি, সকল প্রকার আব-হাওয়া,  
অতি বিচিত্র প্রকারের উৎপন্ন দ্রব্য দেখিতে  
পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের সমৃদ্ধিসম্বন্ধে যে  
এত গদগদ করা হয় তাহা নিতান্তই ভুল। কত  
শুষ্ক অঞ্চল! মধ্যদেশের পর্বত, দাক্ষিণাত্যের  
উত্তরাঞ্চল, সিন্ধুদেশ, রাজস্থান ও রেজুন  
ও বেলুচিস্থানের অরুভূমি। এমন কত অঞ্চল  
আছে যাহা অর্ধশতাব্দী এমন-কি এক  
শতাব্দী ধরিয়া খাটিলেও আবাদ করিতে  
পারা যাইবে না! আসামের উত্তরাঞ্চল,  
যে অংশ ব্রহ্মদেশ হইতে আসামকে পৃথক  
করিয়াছে,—সেই সমস্ত প্রদেশ, ও মধ্য-প্রদেশ  
সমূহের বনজঙ্গল। এবং ভারতের যে  
সকল প্রদেশ খুব উর্বর সেখানেও শুষ্কতার  
আশঙ্কা। একবার যদি যথোচিত বৃষ্টি না  
হয়, তাহা হইলেই যোজন-যোজন ভূমি ফসল-  
শূন্য হইয়া পড়ে: জলসেকের পূর্ত্তকার্য্য  
প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতকে দুর্ভিক্ষ হইতে  
রক্ষা করিতে এখনো শত শত বৎসর  
লাগিবে ও ক্রোড় ক্রোড় টাকা ব্যয় করিতে  
হইবে। ইংলণ্ড এই উদ্দেশ্যে প্রভূত পূর্ত্ত-  
কার্য্যের অমুষ্ঠান করিয়াছেন বটে, কিন্তু  
সম্পূর্ণ হওয়া দূরে থাক্, মনে হয় যেন  
উহা ঐ কাজের একটা আদ্রা মাত্র।

ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## কবির তিরোধান

( স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেহান্তে )

ফুল নীরবে যেমন করে তেমনি ক'রে ম'রে গেল কবি,  
চলে গেল মানস-যাত্রী প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে ;  
হাওয়া শুধু করলে হাহা ; আনমনে হায় ; সেই সমাচার লভি'  
দূরের বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠল নিমেষ তরে ।

এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,  
কুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার মালা গলে ;  
পাতায় চাপা গন্ধটুকু পূবে হাওয়ায় বেরুল নৌড় তোড়ে,  
পাখর চাপা রইল কপাল, বাদলা ক'রে রইল চোখের জলে ।

ধনজনের ধারুত না ধার, চিন্ত তারে গ্লান কটি লোকে,  
নয় দারোগা নয় খেতাবা,—খাতির দাবা করবে সে কোন্ মুখে ;  
মরনা কেউ বাস্ত ভালো, কল্পনা তার দেখে ত স্রীতির চোখে,  
গান গেয়ে সে গেছে চলে,—রেশ রয়েছে সারা দেশের বুকে ।

বাদলা রাতির সাথী সে যে শরৎ-প্রাতের আলোয় গেছে ক'রে,  
মরেনি সে জুড়িয়ে গেছে, বকনা-লাঞ্ছনার বজ্রা স'রে ;  
সরস্বতীর পাখের ছায়ে যে পদ্মটি কুটছে ত্রিকাল ধরে,—  
কবি জানে,—পরম সূত্রে সে আছে আজ তারি পরাগ হ'য়ে ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

## সোনার কাঠি

( গল্প )

বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে আমি ।  
বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর বিয়ে হল । স্বামী  
দেখতে যেমন, গুণও তাঁর তেমনি ! পরস-  
কড়ি বেশ আছে, তবে তিনি একা ; সংসারে  
আত্মীয়-স্বজন তেমন-কেউ নেই ।

ফুলশয্যার রাত্রে আমার ব্যবহারটা তাঁ  
অত্যন্ত রুচ ঠেকেছিল, সেটা বেশ বুঝতে  
পেরেছিলুম । তিনি যখন আদর করে  
আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “কনক,  
এই শূন্য সংসারটিকে সব দিক দিয়ে তুমি পূর্ণ

করে তোলো—”তখন সে কথা শুনে কোনমতে আমি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখতে পারলুম না। আমার সমস্ত অতীতটা বুকের উপর এমনি পাষণ-ভার চেপে ধরলে যে, সহস্র চেষ্টাতেও আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল না। ছুনিয়াটাকে তখন এমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছিলুম যে, আমার স্বামী, আমার দেবতা,—ঠাঁর এই মধুর আদর-টুকুকে বুকের মধ্যে হেঁটেমজের মত গ্রহণ করতে পারলুম না—এমনি অভাগী আমি! স্বামী আমায় বললেন, “কনক, আমি অত্যন্ত লক্ষ্মীছাড়া, যখন খুব ছোট, তখন মা-বাপ দুই হারিয়েছি। আরাম পাব বলে সংসার পেতে বসব, এ কথা কোনদিন আমার মনে হয় নি। লোকের কথায় একটা অত্যন্ত হাস্যকর তথ্য নিয়েই তোমায় দেখতে গেছিলুম। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম, তাই স্বাধীন আমি তোমায় এই আশানে এনে প্রতিষ্ঠা করেছি। লক্ষ্মী ভূমি, তোমার রূপ আলাবণ্যের জ্যোৎস্নায় এ আশানে আলো জ্বাগিয়ে তোলো, তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ কোমল সৌরভে চারিদার ভরপুর করে দাও, আমি মুগ্ধ হয়ে তাই দেখি।”

রূপ আর লাবণ্য! পুরুষ কি এই দুটোকেই চিনেছে শুধু রে! নারীর এই যে মন—ওগো, সেই মনটাকে কেন তোমরা অবহেলা কর? কি তুচ্ছ রূপ আর লাবণ্যের কথা তোলো,—শুনে আমাদের লজ্জা হয়! সে ত দেহের উপর একটা পালিশ মাত্র, রোগে তা ঝরে যায়, একটু তাপেই সে স্নান হয়ে পড়ে—কিন্তু এই মন,—এ যে

রাজার ঐশ্বর্যের চেয়েও ঢের বেশী, ঢের বেশী যে তার শোভা!

স্বামিকে মুগ্ধ করবার মত রূপ আর লাবণ্য আমার অঙ্গে প্রচুর ছিল, আমি তা জানতুম,—তাই তার উল্লেখে একটুও গলে গেলুম না! স্বামী মুগ্ধ চিত্তে মুখে চুষন করলেন; আমি পাথরে-গড়া মূর্তির মতই অচঞ্চল বসে রইলুম। স্বামী যেন একটু ব্যস্ত হলেন, বললুম,—একটা নিশ্বাস চেপে তিন বললেন, “শুয়ে পড়।”

... ..

আমায় বুঝে রাখবার জন্য স্বামীর সে কি চেষ্টা পড়ে গেল! দাসী-চাকরের উপর ঘন-ঘন নিয়ম-জারী হতে লাগল,—নিষ্কে ও তিনি তদ্বিরের ঘটা বাধিয়ে দিলেন। তার উপর দামী গহনায় আমার সর্বাঙ্গ তিনি মুড়ে ফেললেন,—হারে-পান্না-চুনি মজোর ভারে আমি বুঝে পড়লুম! পাথরের মেজের চলে বেড়ালে পাছে পায়ে ব্যথা লাগে, তাই অর্ডার দিয়ে ‘পায়ের জুতা-মোজা’ আনিয়ে দিলেন,—কোন্ কাপড়টি, কোন্ জামাটি কখন পরলে আমাকে ভালো মানায়, হরেক রকম কাপড়-জামা আনিয়ে আমায় তা পরিবে ঠাউরে দেখে-দেখে কাপড়-ব্লাউসে তোরঙ্গ আমার ঠেসে ফেললেন। একটু যদি চুপ করে আকাশের পানে কখনো চেয়ে বসে থাকতুম ত তিনি অমনি বাস্তব হয়ে উঠতেন, বলতেন, “তোমার মনটা একটু খারাপ দেখছি,—যাও, ছুদিন তোমার বাবার ওখানে বেড়িয়ে এসোগে!” সত্যি, এত আদর আমি কখনো পাইনি! আমার লজ্জা হত! আমি

কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়তুম। কৃতজ্ঞতার  
বুক আমার ভরে উঠত, তবু একটু মুখের  
গাসি দিচ্ছি ও তাঁর কাছে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে  
পারতুম না, এ কি কম আপশোষ! অত  
আদরে প্রাণে আমার বেদনা বাজত! কিন্তু  
উপায় ছিল না, উপায় ছিল না! আমার  
বুকের মধ্যে কি কাঁটা যে দিবারাত্রি খচ-খচ  
করছিল! আমি শুধু মর্মে মর্মে তাঁর সে  
ভালবাসা অনুভব করতুম! আমার সমস্ত  
অতীত তখন নির্দূর ব্যাধের মত আমার বুকে  
অসহ্য শর নিক্ষেপ করত। তাই যখন স্বামীর  
সে আদরের আতিশয্যে আনন্দের উত্তেজনায়  
আমার অভিভূত মুচ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়বার  
কথা, তখন সেই ব্যাধের তীক্ষ্ণ শরের বিধে  
ভিতরটা আমার অঙ্গে থাকে হয়ে উঠত! আমি  
চুপ করে পড়ে থাকতুম! নিখাস  
যেন বন্ধ হয়ে আসত,—চোখের সামনে  
থেকে সমস্ত পৃথিবীটা তার রূপ-রস-গন্ধ-  
স্পর্শের সব অনুভূতি নিয়ে কোথায় মিলিয়ে  
যেত!

\* \* \*  
\* \* \*

এমনি করেই দিন কাটাচ্ছিল। সেদিন  
বিজয়া-দশমী। সন্ধ্যার সময় আমি একখানা  
শাদা কাপড় পরে ঘরের কোণে কি-একটা  
বই নিয়ে বসে ছিলাম। স্বামী ঘরে এলেন,  
পিছনে চাকর; চাকরের ঘাড়ে প্রকাণ্ড  
এক পাংলা টিনের বাক্স সেটা ঘরে রেখে  
চাকর চলে গেলে স্বামী বাক্সটা খুলতে  
খুলতে বললেন, “এতে তোমার কাপড়  
আছে, বোঝাই থেকে আনিয়েছি, আর  
এই নাও, এক ছড়া হার।” স্নানর একছড়া

মুক্তোর মালা। মালাটা নিজের হাতে আমার  
গলায় পরিয়ে দিয়ে স্বামী বললেন, “তোমার  
পছন্দ হয়েছে?”

হাঁ-কি না, কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরুল  
না। আমি শুধু একবার তাঁর পানে চোপ  
তুলে চেয়ে দেখলুম—আতা, তাঁর চোখে-মুখে  
কি সে আগ্রহ! কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁর পানে  
চেয়ে থাকতে ও পারলুম না—কে যেন মাথাটা  
আমার জোর করে ধরে মুইয়ে দিলে। তিনি  
কি বুঝলেন, জানি না,—শুধু ভারী রকমের  
একটা নিখাস ফেলে চলে গেলেন। আমার  
সর্বশরীরে কে যেন কাঁটার চাবুক মারতে  
লাগল। ভিতরটা আমার হাহাকার করে উঠল।  
আমি তখন সেই হারটিকে বুকের উপর মুঠি  
ভরে চেপে ধরে মেজের লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে  
লাগলুম, ওগো দেবতা আমার, স্বামী আমার,  
এসো, এসো, তুমি ফিরে এসো। আমি  
তোমার এত আদর সহ্য করতে পারছি না।  
কেন তুমি এ অভাগীকে এমন করে  
আদর কর গো? তুমি জানে, আমি  
যে মহাপাতকিনী, আমার পাপের সীমা  
নেই! আমি এখানে তোমার এই ঘরে  
বসে আছি, এতে আমার নিখাসের হাওয়ায়  
তোমার ঘর বিষিয়ে উঠছে, পবিত্র মন্দির  
কলুষিত হচ্ছে! তোমায় যে এই ফিরিয়ে  
দিচ্ছি, ওগো, সে অহঙ্কারের জন্ত নয়,  
তেজের জন্ত নয়,—আমার আবার কিসের  
তেজ, কিসের অহঙ্কার! তা নয় গো,  
তা নয়!

ভাবলুম, না, সব কথাই বলব! কিসের  
ভয়! অনর্থক আর এ কৃতজ্ঞতার ভার বাড়িয়ে  
তুলবো না! আমার যদি ভিখারিণী হয়ে পথে

দাঁড়াতে হয়, তাতেও ক্ষোভ নেই, কিন্তু তাঁর কোমল চিন্তে আর এমন আঘাত দেব না, কখনো না !

উঠে ভাল করে চুল বাঁধলুম, সাবান মেখে গা ধুয়ে এলুম, স্বামীর-দেওয়া নতুন কাপড়খানি বায় থেকে বার করে পরলুম, বাছা-বাছা গহনার গা সাজালুম, তারপর সুইচ-টেনে দশ-বাতির ঝাড়টা জ্বলে দিলুম। দিগে আরনার সামনে একবার এসে দাঁড়ালুম—হাঁ, ঠিক ! আজ বিদ্যায়ের পূর্বে দেহের রূপকে বোল কলার ফুটিয়ে তুলে স্বামীর পায়ে পাপের ভার নামিয়ে দেব। তারপর তাঁর পায়ের ধূলা সর্কান্বে মেখে যেদিকে ছুঁচোখ যায়, চলে যাব। গঙ্গায় অতল জল আছে, আশ্রয়ের অভাব কি !

রাত্রি তখন ন'টা। দাসী এসে বললে, বাবু আজ গাড়ী করে তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন না ? তা সোফার ছ'ঘণ্টা হল, গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই বাবু বলে দিলেন, তোর মাঠাকরুণকে জিজ্ঞেস করে আর, গাড়ী চলে যাবে, না, তিনি বাগবাজারে বেড়িয়ে আসবেন ?

বাগবাজারে আমার বাপের বাড়ী।

আমি বললুম, তোর বাবু কোথায় রে ?

দাসী বললে, দোতালার বৈঠকখানায়।

—কি করছেন ?

—কেদারায় শুয়ে কি বই পড়ছেন।

আমি বললুম, কাছে আর-কেউ আছে ?

—না।

আমি বললুম, তোর বাবুকে একবার ডেকে দিতে পারিস্ ?

দাসী চলে গেল।

আমি মনটাকে 'বৈধে' নিলুম। সব কথা খুলে বলব বলেই স্থির করেছিলুম—কিন্তু তবু সেই-সময়টা যখন একেবারে এত-নিকট হয়ে এল, তখন বুকখানা কেঁপে উঠল—তাইত ! এখনি যদি তিনি ডাড়িয়ে দেন ? এত আদর, এত ভালবাসা, এ যে জন্ম-জন্ম সাধনা করুলেও কোনো নারীর ভাগ্যে মেলে না ! এই সব কেলে—মনকে চোখ রাঙিয়ে উঠলুম, খবরদার—তোর এতে কিসের অধিকার রে ! জানিস্ না, রাক্ষসী তুই, রাণীর সাজ পরে কত-বড় হৃদয়-রাজ্য গ্রাস করছিস্ ! লজ্জা করে না তোর ?

স্বামী এলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমায় ডেকেছ ? কি শাস্ত মিষ্ট সে স্বর ! তাঁর পানে চেয়ে দেখলুম, মুখে সেই মুহূর্ত্ত হাসির রেখাটি তেমনি সুন্দর ফুটে আছে ! মনে একটু দুর্ব্বলতা এল—বললুম, এ সাজ পছন্দ হয়েছে তোমার ?

তিনি বললেন, বেড়াতে যাবে ?

আমি বললুম, গেলে তুমি সুখী হও ?

তিনি বললেন, মানে, সকলেই যাচ্ছে। আজ বিজয়ার রাত্রি ! তা তুমি যদি বাগ-বাজারে যেতে চাও—

মন আরো নুয়ে পড়ছিল ; জোর করে তাকে খাড়া করলুম। মুখ নীচু করে বললুম, সেখানে যাব না। যেতেও চাইনা কোনদিন।

বলেই তাঁর পায়ের প্রণাম করলুম, একেবারে ছুটি পা আঁকড়ে ধরে মুখ ঝুঁজে সেই পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লুম। চোখ দিয়ে হ-হ করে জল ঝরে পড়ল।

তিনি বললেন, ও কিস্তি করছ কনক ?

আমি কোন কথা না বলে সেই দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম। তিনি আমার হুঁহাত ধরে আমায় টেনে তুললেন।

বললেন, হঠাৎ আজ এমন করছ কেন ?

—আমার বুক কেমন করছে।

—বাগবাজারে যাবে ?

—না, না।

—তবে কি চাও, বল ?

—আমি বড় পানী গো, আমি মহাপাত-কিনী—আমি যে কত-বড় বিশ্বাসঘাতক—

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, পাগলের মত এ কি বকছ ?

—না। আমি পাগল নই, পাগলের মত কিছুই বকি-নি। আজ আমি সব কথা খুলে-বলব, তুমি শোনো। শুনে আমায় তাড়িয়ে দাও, এই রাতে লাধি মেয়ে তাড়িয়ে দাও, তাতেও আমি এতটুকু হুঁশিত হব না। তুমি জানো না, এতদিন তোমার অসীম অগাধ ভালবাসার কি ভয়ঙ্কর অমর্যাদা আমি করে এসেছি। তুমি যখন অত আদর করেছ, তখন আমি পাষণের মত শক্ত হয়েছি, তা গ্রহণ করতে পারিনি। সে আদর আমার প্রাণে কি আগুন জেলে দিয়েছে, তা তুমি জানোনা। কেন দিয়েছে, তা তুমি শোনো। শুনে বিচার কর, দণ্ড দাও। যত কঠিন দণ্ডই সে হোক, আমি তা অম্লান বদনে মাথা পেতে নেব।

স্বামী কি বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিয়ে বললুম, তুমি আমার অতীত জানো না ; আমি আজ সব কথা খুলে বলব, তুমি শোনো—

তুমি জানো, বাবার সখ ছিল, আমায় খুব ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন। বাড়ীতে মাষ্টার-পাণ্ডিত রেবেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিজেও তুবেলা আমার লেখাপড়ার তদ্বির করতেন। অর্থাৎ সে দিকটায় তিনি এমনি ঝোঁক দিয়ে ফেলেছিলেন যে আমার বরস পনেরো পার হতে চললেও আমার বিয়ে দেবার কথাটা তাঁর খেয়ালেই আসেনি। ভাগ্যে সমাজ-দেবতা তাঁর বিরটি লগুড় ঘাড়ে নিয়ে ধন্বরক্ষা করছিলেন। তাহ তাঁর দূতদলের অস্ত্ররালের কাণাঘুষোন্তুলো একদিন যখন প্রচণ্ড রূপ ধরে প্রকাশ্য আসরে অবতীর্ণ হল, তখন বাবা একটু চঞ্চল হলেন। সেদিন বাবা খেতে বসে আমার পানে বারবার চেয়ে-চেয়ে দেখে মাকে বললেন, তাইত, কনকটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেছে, ওর আর বাবে না দিলে চলছে না। কি বল ?

না পাখা নিয়ে কাছে বসে বাতাস করছিলেন ; পাখাটা রেখে হুঁধের বাটিটা বাবার পাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তোমায় ত বলে-বলে পারলুম না। মেয়ে নিয়ে পাড়ায় কারো বাড়ী পা দেবার জো নেই আমার।

বাবা বললেন, কিস্তি এইটে আমি বুঝতে পারিনে, মেয়ে আমার—তার বিয়ে কবে দি না দি, তাতে পাড়ার পাঁচজনের এত মাথা-বাধা কেন !

মা হুঁধের বাটিতে চিনি ঢালতে ঢালতে বললেন, কথার ঠ্রী দেখ ! সমাজ বলে একটা জিনিষ আছে ত—সে চূপ করে থাকবে কেন ?



বা বা গম্ভীর স্বরে বললেন, তা ঠিক !

সম্পর্ক কত জন্ম-জন্মান্তরের কঠিন বন্ধনে  
বাধা !

তখন স্রবোগ পেয়ে বিস্তর ঘটক-  
ঘটকী এসে বাবাকে একেবারে ছেঁকে ধরলে।  
ফলে আমার শাস্তি শুরু হল ! সময় নেই,  
অসময় নেই, যখন-তখন ছুট বসন্তে  
মাথায় ভিজে গামছা চেপে পাতা কেটে  
চুল বেঁধে, নানা ধাঁচে সেজে-গুজে আড়ষ্ট  
কাঠের পুতুলটির মত আমার বৈঠক-  
খানায় গিয়ে বসতে হত, বিচিত্র পাত্রের  
দল আর তাদের অভিভাবকদের মন  
ভোলাবার জন্ত। সেখানে হত সেই মামুলি  
বাপারের চর্চিত-চর্কণ,—আমার রূপের  
তারিক, নাম-জিজ্ঞাসা, গৃহীপনায় কতটা  
মুজিয়ানা জন্মেছে, তারি পরিচয় নেওয়া,—  
বাস্ ! ছাড় আমার জলে উঠত। আমি  
কি কচি খুকী যে আমাকে এই সব উদ্ভট  
প্রশ্ন ! মাহুষের মধ্যে যে-জিনিসটা আসল,  
যেটা আছে বলেই মাহুষ মাহুষ, সেই  
জিনিস, এই মনটার সম্বন্ধে, এত লোক আসে  
যায়, কৈ, কোন রকম খবরা-খবর ত কেউ  
চায় না—সেটাতে কারো নজরই নেই !  
হায়রে, এরা চায় শুধু নারীর এই দেহখানা—!  
কেউ দেখবে, কতখানি রূপ আছে ! বিলাসের  
বিচিত্র উপকরণ, রঙিন খেলনা,—সেটি নিয়ে  
অঙ্গমারিতে সাজিয়ে রাখবে, ইচ্ছা হলে  
পেড়ে নানা ভাবে সেটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখে  
অলস উদ্বেগহীন সখ মেটাবে ! নয় কেউ  
চাইবে, সুস্থ, সবল পেশী,—যার জোরে  
সংসারের জাঁতা কলটাকে আচ্ছা করে  
খুরিয়ে নেওয়াবে ! ছিঃ এই পুরুষ !  
এইই সঙ্গে নারীর জীবন-মরণের সকল

আমার যুগা ধরে যাচ্ছিল। এ ত বিয়ে  
নয়, এ যেন এক লটারির খেলা চলেছে !  
নেব-নেব করে বিস্তর লোক এসে নাকটা  
কানটা মাপছিল আর হাত বাড়চ্ছিল, আবার  
ফিরছিল,—ভাবছিল, তাইত যদি ঠকে  
বাই ! এর চেয়ে আরো-ভালো ত মিলতে  
পারে ! সকলেরই মনের ভাব, লাভটা  
ঘোল গণ্ডায় পতিয়ে নেওয়া চাই ! জানিনা,  
আমার মধ্যে কোন্ পদার্থটির অভাব তারা  
লক্ষ্য করছিল ; কিন্তু তাদের এই কুপ্রতি  
ভাব দেখে বাবা সাহস পাচ্ছিলেন না—  
কাজেই এইভাবে ঢেউ খেতে খেতে আমার  
নাকে-মুখে জল ঢুকে দম আটকে গেলেও  
এই স্রোতেই গা ভাসিয়ে আমি চলেছিলুম।

সেদিন পাত্রের দল দেখা দেখনি,—  
সন্ধ্যার একটু আগে আমি রাস্তার দিকের বড়  
ঘরের ৭৬খড়িটার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলুম,  
রাস্তা দিয়ে খুব ঘটা করে এক বর যাচ্ছিল।  
দাঁড়িয়ে তাই দেখছিলুম, পাশে ছিল কিরণ-  
দিদি। আমার এক পিসিমা আছেন, কিরণ  
দিদি, তাঁরই মেয়ে। সে তার স্বস্তরবাড়ী  
থেকে বাপের বাড়ী যাবে পুরীতে, তাই  
সেদিনটা আমাদের ওখানেই এসে উঠেছিল।  
পরের দিন তার পুরী যাবার কথা।

আমরা দুজনে বরের সাজসজ্জার  
সমালোচনা করছিলাম। বরটি দেখতে  
কালো, মোটা-সোটা, সাটিনের জামার উপর  
গোড়ে মালা আর গার্ড-চেন ঝুলিয়ে গম্ভীর  
হয়ে গাড়ীতে বসে আছে,—পাশে কনে,  
তারও রঙটা মরলা, বেঁটে মোটা চেহারা।

কিরণদি বললে, কি বেঁছাড়া বর, মাগো,—  
লজ্জা করলে না ওর,—খেড়ে মিলে—এমনি  
সেজে-গুজে পোকার মত বাজনা-বাদ্য  
করে যেতে!

আমি বললুম, এ তোমার অজ্ঞায়।  
ওর যদি ঐ রকম সম্বন্ধ হয়!

কিরণদি বললে, এ যে সৃষ্টিছাড়া সব,  
ভাই!

এমন সময় হঠাৎ আমার নজর পড়ল  
ও-ধারকার ফুটপাথের উপর। ফুটপাথে  
দাঁড়িয়ে একটি ছেলে,—পাঁচশ-ছাব্বিশ বছর  
বয়স হবে, রঙ খুব ফরসা, চোখে সোনার  
চশমা, মুখে একটু হুটু, হাসি মিটমিট  
করছে। একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে সে বর-কনে  
দেখছিল। আমি কোন কথা লুকোব না;  
সেই ছেলেটির চেহারাখানি আমার দেখতে  
খুব ভাল লাগছিল, চকিতে কেমন নেশা  
গেয়ে গেল। আমি তাকে একদৃষ্টে তাকিয়ে  
দেখাছিলুম, এমন সময় কিরণদি বললে,  
দেখ ভাই, কি সুন্দর ছেলেটি।

আমি বললুম, কে—? খেন দেখিনি  
এমনি ভাবেই কথাটা বললুম। ওকেই  
যে আমি দেখাছিলুম সে কথাটা প্রকাশ  
করতে আমার কেমন লজ্জা হল!

কিরণদি বললে, ঐ যে লো—ঐ সামনেই,  
ও ফুটপাথে।

আমি বললুম—হ্যাঁ, মন্দ নয়।

কিরণদি বললে, ঐ ছেলেরই বর সেজে  
বসলে মানায়, তা না, মাগো, এই খেড়ে-  
কেটে বর! সত্যি ভাই, তোর অমনি বরটি হয়!

আমি তাকে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে  
বললুম, যাঃ!

কিরণদি বললে, মাছা, ওরই সঙ্গে যদি  
তোর বিয়ে হয়!

আমি রাগের ভাগ করে তার পিঠে  
ছোট্ট একটা কিল বাসিয়ে বললুম, দেখ,  
ভাল হবেনা বলাছি। ও সব কি কথা!

আমার চোখ ছলছলিয়ে এল। কিরণদি  
বললে, ও বাবা, এ ঠাট্টাটুকু গায়ে সইল না!  
অমনি আমার অভিমানিনার চোখে জল  
এল!

তারপর কিরণদি বললে, সরে আয়লো,  
ছেলেটা আমাদের দেখছে। ঐ দ্যাখ্‌না!

আমি চেয়ে দেখলুম, ছেলেটি একদৃষ্টে  
আমাদের জানলার পানে তাকিয়ে আছে!

আমাদের সরে আসতে হল। কিন্তু  
মনটা পারাপ হয়ে গেল—কে বলই ওকে  
দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল। কেন, তার কোন  
কারণ আচ্ছা পর্যাপ্তও বুঝতে পারিনা।

পরের দিনও তার চেহারাটা মনের মধ্যে  
উঁকি দিচ্ছিল,—এমন সময় গুণ্ডামনে সেই  
খড়খড়ির ধারে এসে দাঁড়ালুম।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওদিককার ফুটপাথে।  
দেখি, সেহ ছেলেটি; একগোছা বই নিয়ে  
ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বাড়ীর সামনে  
এসে তার গতি একটু মন্থর হয়ে গেল।  
তার উৎসুক এক ব্যাকুল সন্ধানে  
আমাদের খড়খড়ির উপর ছুটে এসে পড়ল।  
তাকে দেখব, এক বল্লাও আমার ছিল না।  
দেখে মনটা কি যে হল! প্রাণের মধ্যে একটা  
মিষ্টি হাওয়া বয়ে গেল। আমি শাসির  
পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখাছিলুম। কে বলই  
মনে জাগছিল, কিরণদির কথাটা। ঠিক,  
চমৎকার চেহারাই বটে! হঠাৎ কিরণদি

পিছন থেকে বলে উঠল, কিগো, কি দেখা হচ্ছে অত-গোপনে ?

আমি রেগে বলে উঠলুম, যাও কিরণদি, আবার ঐ রকম ঠাট্টা ? রাগের আমার কোন কারণ ছিল না, কথাটা বলেই তা বুঝতে পরলুম ; এবং লজ্জিত হলুম যখন কিরণদি বললে, সত্যি ভাই আমি ত কিছু লক্ষ্য করে তোকে ও কথা বলিনি। তুই কি দেখছিস্ তা জানি-ও না। ও কে রে ? সেট ছেলেটি না ?

কথাটা বলেই কিরণদি এসে শাশির ধারে দাঁড়াল। সেট ছেলেটিরও তখন, জানিনা কি কারণে, জুতোর ফিতে হঠাৎ আলগা হয়ে গেল, সে দিবি জুতোর ফিতে বাঁধতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার গাটা শিরু-শিরু করে উঠল। কিরণদি হেসে বললে, ওঃ !

আমি বললুম, ওঃ কি ! না, ও সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগেনা, বলছি !

কিরণদি বললে, কিলো,—ধরা পড়ে গেলি নাকি—সেই যে বলে,—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,

কে কোথায় ধরে পড়ে, কে জানে !

আমি বেশ তীব্র স্বরেই বললুম, কিরণদি—

—না হলে তোর এত দরদ কেন ভাই ? বুলে, ঠাকুরঘরে কে, না কলা খাইনি ! আচ্ছা, বল না, খুলে। মামাকে তাহলে বলে খবরটা নি। আমার কেমন মনে হচ্ছে,—দেখাছিস্ না, ওরও ঠিক এইখানটিতে এসে জুতোর ফিতে খুলে গেল—ঐ তোর বর, নিশ্চয় !

‘যাওঃ’ বলে আমি সেখান থেকে

সটান্ একেবারে ছাঁদে উঠে চিলের ছাদের পাশে এসে বসলুম। আলসের ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। চেয়ে দেখলুম, সে চলেছে, কেমন আপনা-ভোলা-ভাবে ! তার পাঞ্জাবির পকেটে রুমালের মুখটুকু শুধু দেখা যাচ্ছিল ! আর পারের রঙটুকু সকালের সেই রৌদ্রের আলোয় যেন চাঁপা ফুলের মত দেখাচ্ছিল। আমি গোপন করছিলাম—আমার তখন সত্যিই মনে জাগছিল, কিরণদির কথা—‘ঐ তোর বর’—ঠিক ! তাই, নিশ্চয় তাই ! নাহলে তুচ্ছ আর এমন করে দেখা হবে কেন ? কাল হঠাৎ চোখে পড়ল—আজও সকালে দেখতে পাব, সে আশা ত একবারও মনে হয়নি,—তবু এমন মেঘ না চাইতে জল এল ! এমন ত কতদিন সকালে সন্ধ্যার খড়খড়ির ধারে দাঁড়াই, কৈ কোন দিন ত চোখে পড়েনি ঐ মূর্তি, ঐ রূপ ! মনে মনে তখন রাজ্য গড়তে লাগলুম। বাড়ীতে যেন খুব ধুম বেধে গেছে, আমার বিয়ে ! ভারী ষটা করে বর এল—শুভদৃষ্টির সময় চোখ তুলে চেয়ে দেখি, এ, সেই !

আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, স্বামী, ঐ আমার স্বামী ! নাহলে আবার এমনভাবে দেখা হবে কেন ?

এ কল্পনা আমার একেবারে দেখতে দেখতে কেমন নাচিয়ে তুললে—সমস্ত শরীরে মনে আগুন ধরে গেল। আমার আর বসে-দাঁড়িয়ে চলে-কিরে সোয়ান্তি রইল না ! হুপুর-বেলার খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই শাশির আড়ালে একখানা বই নিয়ে একটা ইন্ডিয়েয়ার টেনে তার উপর বসে পড়লুম !



## ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ

ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନ ପ୍ରେସ, ଏଲୋହୀବାଦ ।

ଶ୍ରୀବତ୍ସ ରାଧେଶ୍ଵର ପ୍ରସାଦ ଅଙ୍କିତ ।



খড়খড়ি সাশি খোলা<sup>৩</sup> রইল। কাকেও আশঙ্কা করবার কিছু ছিল না, কারণ এমন আমি হামেশাই বসে থাকি। বসে বই খুলে কেবলই ভাবছিলুম, কিরণদির কথা! তার চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত! সে সন্দেহ করে ফেলেছে! প্রথমটার রাগ দেখিয়ে ছিলুম, কিন্তু এখন কিরণদির সে ঠাট্টাটুকুও ভারী আরামের বোধ হচ্ছিল। ভাবছিলুম, কিরণদিকে কেন বকলুম? কেবলি মনে হচ্ছিল, কিরণদি কখন আসবে! এখানে এসে আমার এ অবস্থায় দেখলে ঠাট্টা যে করবে নিশ্চয়, তা বুঝছিলুম—তবু মনে হচ্ছিল, করুক ঠাট্টা, সে বেশ লাগবে! সে যে সন্দেহ করেছে,—গাত্রেও আমার আরাম বোধ হচ্ছিল। বসে বসে আরো ভাবছিলুম, বই নিয়ে সে যাচ্ছিল—নিশ্চয় স্থলে কি কলেজে,—নাহলে এ-বেলায় বই নিয়ে ও-বয়সের মানুষ আর কোথায় যাবে? যখন গিয়েছে, তখন ফিরবেও ঠিক! কিন্তু কখন, কখন সে ফিরবে? আবার মনে হচ্ছিল, তাই বা ভাবি কেন! এমন ত হতে পারে, কোন বন্ধুর বাড়ী থেকে হয়ত বই নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে, তাহলে আজ বিকেলে এখানে আসবার সম্ভাবনা কোথায়? দেখাই বা আবার হবে কি করে?

বই খুলে এমনি সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় কিরণদি এল, এসে বললে, কি বই পড়ছিস্ রে?

হাতে বই একথানা ছিল বাটে, কি বই তাও কি দেখেছিলুম? না। মলাটটা দেখে আমি বললুম, ভূধর চক্রবর্তীর ‘মনোরমা’।

—কেমন বই?

—আনিলা, তবে মন্দ লাগছে না।

—ভূধর চক্রবর্তী লেখে ভাল। ও কোন বইটা রে? সেই নরেন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর থেকে সাগরে ঝাঁপ খাচ্ছে গোড়াতেই?

—হ্যাঁ।

—দেখি, ও বইটা সত্যি আমার ভারী ভাল লেগেছিল। পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে যায়; না? গারে কাঁটা দিয়ে ওঠে! দেখি—বলে বইটা হাতে তুলে নিলে। হুঁচর পাতা উল্টে-পাল্টে বললে, দূর, সেটা ত ‘প্রণয় না হলানল’ উপস্থাসে আছে। এটাতে ত সেই যমপুরী থেকে পালানোর ব্যাপারটা! তুই ত তবে খুব পড়ছিস্ লো?

আমি একটা নিশ্বাস ফেললুম। কিরণদি আমার কপালের উপর নিজের মাথাটা রেখে বললে—তাই কনক, আমার আজ সারাদিন, জানি না কেন, কেবলই মনে হচ্ছে, ঐ ছেলেটির সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে। তাহলে হয়ও বেশ। চমৎকার দেখতে কিন্তু তাই! আমি তাই এ-ঘরে এলুম, আজ সকালে সে বই নিয়ে যাচ্ছিল, আমি ছাদে চুল শুকোতে শুকোতে দেখেছিলুম। ও নিশ্চয় কলেজে যাচ্ছিল।—আমি মামীমাকে বলে এলুম, এ ঘরে আসতে। বলেছি—তোমার মেয়ের বিয়ের ঘটকালী করব; পাত্র চাও? আজই পাত্র দেখাব। মামীমা বললে, পাত্রটা খেঁয় আমি যাচ্ছি।

আমি বললুম, ছি তাই কিরণদি, এ কি করছ তুমি?

কিরণদি বললে, কি আর করেছি—মাহুষটা যাবে, মামীমাকে দেখাব।

—যাবে যে ঠিকই, তা তুমি জানলে কি করে?

—আমার মন বলছে, সে যাবেই এ পথে। তুই ত ওবেলা ঘর ছেড়ে চলে গেলি, আমি ওকে লক্ষ্য করছিলুম—ও ছুঁপা করে যায়, আর নানা ছলে এঁট খড়খড়িটির পানে ফিরে-ফিরে চায়—।

ঘটানানেক পরেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সেই ফুটপাথে তারই দর্শন মিলল। বেশ জোরে জোরে সে আসছিল, কিন্তু এবারও দেখলুম, আমাদের বাড়ীর কাছ-বরাবর গতি আবার মন্থর হল। মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কাজেই আমি খড়খড়ির পাখির ফাঁক দিয়েই দেখাছিলুম, মা না টের পায়! মা বললে, বেশ ছেলেটি! আহা, জামাই করে বুকে তুলে নিতে সাধ হয় বটে!

ছেলেটি লক্ষ্য করলে, যে আমাদের খড়খড়ির পাশ থেকে তাকে দেখা হচ্ছে—তার মুখখানা সন্মিত হয়ে উঠল। সে চলে গেল। মাও অজ্ঞ ঘরে গেল।

কিরণদি বললে, কনক, আয় দেখি, ছাদে বাই—ও কোন্ দিকে যায়, দেখব।

আমি বললুম, তুমি ক্ষেপেছ!

—হ্যাঁ ক্ষেপেছি। বেশ, তুই না বাস, আমিই দেখিগে—

কিরণদি ছাদে দৌড়ুল, আমিও বসে থাকতে পারলুম না—ছাদে গেলুম। আলসের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলুম, বাঃ, এ ত বেশী দূর নয়—ওদিককার ফুটপাথ বেখানটার বেকেছে, ঠিক সেই মোড়টার উপর তেতলা বাড়ীখানার মধ্যে সে ঢুকল।

কিরণদি মহানন্দে আমার জড়িয়ে ধরে

বললে, রোস, সজ্জা নিচ্ছি। ~~তুমি~~ দৌড়ে নীচে ছুটে গেল।

অর্থাৎ কিরণদি কেমন করে জোগাড়-জোগাড় করে সরকার মশাইকে সেট বাড়ীর দিকে রওনা করিয়ে দিলে; আশ ঘট। পরে সরকার মশাই ফিরে এসে বললে—একটি বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে বেড়াতে বেরুচ্ছিল—তারই কাছে সন্ধান জানা গেল, ওরা আমাদেরই পাণ্টা ঘর; ওরা চাটুষো।

কিরণদি বললে, মামৌমাকে বলে যাচ্ছি ঘটক পাঠাতে—মানা বোরিয়েছেন, ফিরে আসবেন কাল; আমার সঙ্গে ত আর দেখা হবে না!—আমাকে যে চলে যেতে হচ্ছে, না হলে মামাকে একেবারে পাকা কথা ঠিক করতে পাঠিয়ে দিতুম

... ...

কিরণদি ত চলে গেল; তারপরই বাড়ীতে নক্ষুর গুব অস্থখ হল,—কাজেই ঘটক পাঠানো ঘটে উঠল না। কিন্তু প্রতাহই আমাদের দুজনের সেই চোখের বেলা চলতে লাগল। সকালে, বেলা ঠিক দশটার সময় বইয়ের গোছা নিয়ে তাকে কলেজে যেতে দেখতুম,—এবং বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আবার এই পথেই সে ফিরত! সে বেশ বুঝে নিলে, এখানে তাকে দেখবার জন্ত আমি উদ্গ্রীব হয়ে থাকি! আমিও বুঝলুম, আমাকে দেখবার জন্ত তার উৎসুক্যও বড় কম নয়!

একদিন মক্কা দেখব বলে ঐ সময়টিতে দোতালার খড়খড়ির খার ছেড়ে ছাদে আলসের আড়ালে এসে লুকিয়ে রইলুম—মনে ডাবলুম,



আমি তাঁকে ঠিক দেখব; কিন্তু ও ত আর দেখতে পাবে না, তাতে দেখা যাক্, এর মনের ভাবখানা কেমন হয়! ও কি করে!

সেদিনও ঠিক সেই নিদ্রিষ্ট সমাটতে বইয়ের গোছা নিয়ে সে দেখা দিলে—আমাদের পড়ুখড়ির পানে উৎসুক দৃষ্টি নিতাকার মতই তেমনি অগীর আগ্রহে আমার আশায় ছুটে এল; —কিন্তু দেখা মিলল না! তার চোখটু তখন একেবারে স্নান হয়ে গেল। অত্যন্ত মলিন হতাশ মুখখানি নিয়ে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে পড়ল—আমার ভারী আমোদ হল! তারপর সে কি করে, তা দেখবার জন্য আমি আলসের আর একটা ফাঁকে চোখ দিয়ে দেখতে লগলুম। দেখি, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল—তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে যেন কি-একটা মস্ত-প্রয়োজনীয় জিনিস বাড়ীতে ফেলে এসেছে, পাচ্ছে না, এমনি ভঙ্গী করে আবার সে ফিরল। আমি একেবারে মাথা তুলে ছাদে দাঁড়িয়ে উঠলুম, সে ততক্ষণে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছে,—দৃষ্টি তার সেই পড়ুখড়ির পানেই। আমার হৃৎক হল; তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব বলে আঁচলটা একটু আকাশের দিকে আমি উড়িয়ে দিলুম—এবং তখনি রাস্তার পানে ফিরে তাকালুম। আমার তখন দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল—তারপর সে কি হাসি, কি প্রসন্নতা, সার্থকতার কি সে আনন্দ, যে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল! আমি তা স্পষ্ট দেখলুম। বেচারী ফ্যাসাদে পড়ে গেল আর কি! এখন করে কি? আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েই আবার পকেটে হাত পুরে দিলে,

তারপর চকিতে মাথাটা নেড়ে সে তার গন্তব্য পথের দিকে ফিরে দাঁড়াল—অর্থাৎ ভাবটা এমনি দেখালে, যেন যার জন্য আমি ফিরেছিলুম, তা পেরেছি গো, পেরেছি!

এমনি করেই আমার চিন্তে তীব্র নেশা গীতের হয়ে উঠছিল। একদিন হল কি,—সন্ধ্যার সময় এক মাসীর বাড়ীর নিমন্ত্রণ গেছলুম—পরদিন ভোরেই ফেরবার কথা; কিন্তু মাসীর অত্যন্ত জেদে মা বললেন, তা'হলে সন্ধ্যার সময়ই বাড়ী ফিরব।

শুনে আমি জলে উঠলুম! কি! সারাদিন তাকে দেখতে পাব না আজ, সে বেচারীও হতাশ মলিন মুখে ফিরে যাবে! নিজে দেখতে পাব না সে হৃৎক ত ছিলই,—কিন্তু সে আমার দেখতে পাবে না, এইটেই বেশী বাজছিল!

না, কখনো তা হবে না। গৌ ধরে মাকে বললুম, আমি এখনি বাড়ী যাব—

—সে কি হয় কখনো? —

—কেন হবে না? সেখানে বাবার কষ্ট হবে, তা ভাবছ?

—একবেলার জন্তে আর কষ্ট কি! লোকজন ত আছে সব—

—না মা, তবু বাবার কষ্ট হবে। বাবাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আশ্রয় করতে পারব না, আমি। তোমার সাধ হয়, থাকো।

—তোমার গিন্নিপনা রাখ্ দেখি।

আমি কেঁদে কেটে অনর্থ বাধিয়ে তুললুম। মাসী এবং বাড়ীর সকলেই বললেন, বাপের উপর বড্ড মার, বুঝি!

অর্থাৎ আমার কেউ রাখতে পারলে না।



আমি একা ফিরলুম,—বাড়ী পৌঁছলুম, বেলা তখন প্রায় দশটা। মনটা খড়কড় করছিল! গাড়ীটার উপর রাগ ধরাছিল, ভারী আশ্তে চলেছে! সব বুঝা হল বুঝি! গাড়ী থেকে নামছি, এমন সময়ে পিছনে কার কাশির শব্দ পেলুম, ফিরে দেখি, সে। এক ছুটে উপরের ঘরে গিয়ে সার্শির ধারে এসে দাঁড়ালুম—দেখি, সেই সত্যিকার আঁখির দৃষ্টি ব্যগ্র কৌতূহল নিয়ে খড়খড়ির উপর ছুটে এসে পড়েছে। চোখোচোখি হয়ে গেল। হৃৎকেন্দ্র হৃৎকেন্দ্রের পানে চেয়ে তেঁসে কেঁললুম। হেসেই আমি ভাবলুম, ছি ছি, এ কি করলুম! লজ্জায় তখনি সরে এলুম।

... ..

না, আর বাড়াবো না, খুব সংক্ষেপেই সেগে নিচ্ছি।

বাড়ীতে নতুন অশ্রুত সারতেই পশ্চিমে যাবার কথা উঠল। আমি ভয়ানক দুর্ভাবনায় পড়লুম। সকলেই যাবে; সেখানে গেলে তাকে ত —দেখতে পাবো না—অথচ কি করেই বা বলি, আমি যাব না? আমার এখানে একলা রেখে ত আর যাবে না কেউ।

যাবার দিন ক্রমে ঘনিয়ে এল—কি করি, কি করি! মহা দুর্ভাবনায় পড়লুম। মার উপর রাগ ধরাছিল,—কৈ, মা ত বাবাকে বলে 'একদিনও ষটক পাঠাবার ব্যবস্থা করলে না। কিরণদিই বা কি-রকম লোক! একটা কথা দিয়ে সে সঘন্কে একেবারেই চূপচাপ! বাঃ ছুনিয়ার উপর রাগ ধরে গেল—বার্খপন্ন, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর ছুনিয়া!

যে দিন আমাদের পশ্চিম যাবার কথা

তার আগের দিনের কথা বলছি। আমি বাইরের ঘরে বাবার কতকগুলো কাগজ-পত্র দেখে শুনে শুছিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে গুরে রাখা ছলুম—হঠাৎ খড়খড়িতে একটা ঠক করে শব্দ হল। এগিয়ে গেলুম—দেখি, সে একেবারে একুটপাখে, ঠিক আমাদের খড়খড়ির নীচের এসে দাঁড়িয়েছে।

আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। গা ছমছম করতে লাগল। মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ ছলাৎ করে যেন ঢেউ তুলে নাচতে লাগল। এগুব কি পেছুব, ঠিক করতে পারলুম না।

সে-ও একবার আমার পানে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। আমার চোখে জল এসেছিল। সেও অপ্রতিভ হয়ে পড়ল,—তার চোখে সে ভাব পষ্ট আমি লক্ষ্য করেছিলুম। কোন মতে সে বলে উঠল,—গলাটা কাঁপছিল,—সে বললে, মাপ করবেন, বড় হঃসাহসের কাজ করেছি আমি। কিন্তু শুনলুম, আপনারা পশ্চিম যাচ্ছেন! আপনি পশ্চিমে যাবেন না—আপনাকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাব।—শেষের দিকটায় তার গলার স্বর এমনি করুণ হয়ে এল যে আমার প্রাণটা বেদনায় ঝরে পড়বার মত হল।

কথাটা শুনে আনন্দ যেমন হল,—তেমনি ক্ষোভও 'হল। ছি—এমন করে কথা বলাটা কি ঠিক হয়েছে! আমি একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে, বয়সও খুব কম নয়—আর গুর সঙ্কে পথের আলাপ বৈত না—কোনো পরিচয় নেই—কেউ কারো সঘন্কে কিছুই জানি না, হঠাৎ এতটা ঘনিষ্ঠতা

আমি, মনের কোন্‌স্থানে একটা ঘা নাগল। মনের মধ্যে যে রঙিন কাগুসটা জ্বলছিল, যা খেয়ে সেটা ছিঁড়ে পুড়ে গেল— আর তখনি একটা কি-রকম বিস্ত্রী কালো কালির দাগ চোখের সামনে ফুটে উঠল।

তবু সরে আসতেও পারলুম না। পা যেন কে এঁটে ধরে রেখেছিল।

সে বললে, যদি যান, তাহলে জেনে রাখবেন, ১২নম্বর বাড়ীর চুন চাটুঘোকে আর জীবনে দেখতে পাবেন না।

আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না—ছি!

চোখের দৃষ্টিতে মুহূর্ত্ত স্নান হেনে আমি সরে এলুম—সে ঘরে আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়ালুম না। একেবারে ছুটে গেলো আর ছোট ঠাকুর-ঘরের দরজার কাছে এসে বসে পড়লুম। ভয়ঙ্কর কান্না পাচ্ছিল। তীব্র অনুশোচনার মন ভরে গেল। বড় সাধের কল্পনা হঠাৎ দম্‌কা বায়ে ছিঁড়ে গেলে মনের যেমন ভাব হয়, তেমনই ভাব হল। পরক্ষণেই কিন্তু মমতায় প্রাণ আবার স্তরে উঠল! আহা, কি কৰুণ ঐ নিবেদন! ঠাকুর-ঘরের দরজার মাথা রেপে বললুম, হে ঠাকুর, আমাদের পশ্চিম বাওয়া বন্ধ করে দাও।

আশ্চর্য্য! সেই রাত্রে বাবার নামে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। টেলিগ্রাম পড়ে বাবা বললেন, না, কাল মধুপুর যাওয়া আর হল না। আমায় ভোরেই মফঃস্বল খেতে হবে। প্রজারা কাছারি লুঠ করেছে।

শুনে আমার সে-যে কি আনন্দ হল!

এ ঘটনার তার উপর আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল। তবে এ-ই আমার স্বামী, এ-ই সে নিশ্চয়! না হলে ঠাকুর কথা রাখবেন

কেন! তখন পরদিন সকালেই তাকে এ খবরটুকু জানাবার বড় ইচ্ছা চল। খুসী হবে! একটা কাগজে মোটা অক্ষরে লিখলুম— “মধুপুরে যাওয়া চল না।” ভাবলুম, সে যখন যাবে,—এই পথেই ত যাবে, তখন কাগজখানা রাস্তায় ফেলে দেব'খন।

আবার মনে হল, না—ছি! মনকে শক্ত করে বললুম, না—না।

ঘড়িতে দশটা বাজল, আর অমনি আমাকে জোর করে যেন কে খড়খড়ির ধারে টেনে এনে বসিয়ে দিলে! পথে নানা সাজের লোক চলেছে ফিরিওলা হেঁকে যাচ্ছে, গরিব-দুঃখী লোক তাদের দুঃখের ভারে গুয়ে পথে চলেছে, ৭-বাড়ীর উড়ে বাসনটাও রাস্তাঘরের জঞ্জাল ধুয়ে মুছে তালি-দেওয়া একটা আল্পাকার কোট গায়ে এঁটে তার উপর গরদের চাদর বেঁধে বিড়ি টানতে টানতে চলেছে! সবই দেখছিলাম, মনটাকে অল্প দিকে ফেরাব ভাবছিলাম। কিন্তু সে কেবলি বেকের দাঁড়াচ্ছিল, আর হৃৎকি দিয়ে বলছিল, —কেন 'না'! কিসের 'না'! ও যে তোর স্বামীরে, ও ত পরনয়, পথের লোক নয়, স্বামী, স্বামী! ওর কাছে তোর কিসের লজ্জা! আমি মনকে কেবলি চেপে ধরে বলছিলাম, না, না, না। এমনি সময়ে ওদিকে সেই মূর্ত্তি আবার বধাসময়ে ফুটে উঠল, তার সকল আকর্ষণ নিয়ে। আনন্দে আমার চিত্তও নেচে উঠল!

সে কাছে এল, একেবারে সামনে, ওধারের ফুটপাথে। আমি অমনি কাগজখানা খড়খড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলাম। কাগজটা উড়তে উড়তে পথের উপর পড়ল।

চম্কে উঠলুম, যদি কেউ দেখে! সরে এলুম। আড়াল থেকে দেখতে লাগলুম, দেখি, কি করে! সে একেবারে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে আবার ফিরে এল—পথে নেমে তার জুতো ফিঁতের হাত রেখে ঝুঁকে কাগজখানা কুড়িয়ে নিলে, নিয়ে পড়লো। পড়ে একবার উপর-পানে প্রসন্ন হাসি-ভরা দৃষ্টি হেনে চলে গেল।

আমার মনে হল, ছি, ছি, এ কি করলুম! ক্ষণিক হুর্ললভ্য আমার মনের নিভৃত মন্দির থেকে ইষ্টদেবতাকে টেনে এনে একেবারে পথের মধ্যে এমনভাবে আজ বসিয়ে দিলুম—প্রাণের নীরব পূজাকে আজ কাঁশর বন্টার হট্টরোলে মিশিয়ে দিলুম।

তার উপরও রাগ ধরল! কেন ও কাগজটাকে সে কুড়িয়ে নিয়ে গেল! কেন, —কেন? খবরটুকু জানা হলে কাগজখানা কেন সে ছিঁড়ে ফেললে না? কেন ছিড়লে না? এ অন্ডায়, ভারী অন্ডায়! ঠিক করলুম—বেশ, কলেজ থেকে ফেরবার সময় কখনো আজ দেখা দেব না ত, কখনো না—খুব শান্তি হবে তখন।

... ...

কিন্তু ছটোর সময় আড়ালে বসে থাকতে পারলুম না ত। কে আবার চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে সেই খড়খড়ির ধারেই আমার বসিয়ে দিলে। পথের পানে তাকাতেই দেখি, সে আসছে—একটু দূরে সে ছিল, কিন্তু ও কারা! সঙ্গে দু'জন সঙ্গী যে! হাতে, ও? যেখেই বললুম, আমারই হাতের লেখা সেই কাগজখানা। সে-কাগজখানা সে খুলে দেখাচ্ছিল, আর সঙ্গী দুজন অমনি হেসে

লুটিয়ে কৃতার্থ বন্ধুর সার্থকতার তাঁর পিঠ চাপড়াচ্ছিল! দূর থেকে আমাদের খড়-খড়িটার পানে আঙুল নেড়ে সে কি ইসারা করলে। তারাও অমনি চেয়ে দেখলে।

রাগে আমার সর্বান্ন জলে উঠল! কি! এই প্রেম, এই খেলা—এ তোমার কৌতূকের উৎস খুলে দিয়েছে! হতভাগা, কাপুরুষ! ইচ্ছে হল, বাঘের মত ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ হাসিগুচ্ছ মুণ্ডগুলো ঘাড় থেকে উপড়ে তুলে নি! অভদ্র, ইতর!

তিনবন্ধুতে এগিয়ে আমাদের বাড়ীর সামনে এল। আমি সজোরে সাশিটা বন্ধ করে দিলুম। চোখে এমন কঠিন দৃষ্টি হেনেছিলুম যে যদি তারা মানুষ হত ত তখনি আহত মুচ্ছিত হয়ে সেইখানে লুটিয়ে পড়ত! কিন্তু তা হল না। কাজেই আমাদের নিজের মনকে আমি রাগের আগুনে পোড়াতে লাগলুম!

মনে করলুম, ছাদ থেকে এখনি লাফিয়ে পড়ি, হাড়গুলো গুঁড়ো হয়ে যাক; আর এই লক্ষ্মীছাড়া দেহখানা, যার রূপের গর্বে অন্ধ হয়ে আছি, সেই দেহটা কদর্যা মাংসপিণ্ড হয়ে পথে লোকের পায়ের তলায় পড়ে পিষে কাদা হয়ে যাক! দারুণ খিকারে, ভীষণ অন্তর্দাহে আমার লোকালয় ছেড়ে কোথাও পালিয়ে বুবার সাধ হতে লাগল। আমি কেঁদে ফেললুম!

তবু মরতে পটুললুম না! কোথাও পালানোও হল না—কে যেন মনকে চড় মেরে বললে, কি! তোমার একটা খেলার খেলা ভেঙে গেছে বলে এই মা, এই বাপ, তাদের মুখে চুপকালি দিয়ে আত্মহত্যা করবি, আর



কদর্যা ~~কুসুম~~ তাদের জঙ্গ ছেয়ে যাবে! তাই আমি মরতে পারিনি গো, তাই পারিনি! না হলে সেই নীচ পণ্ডটা মানুষের উপর যে ধূলা জন্মে দিয়েছিল,—

তারপর যেদিন তোমায় দেখলুম, সেদিন ঐ চোখে কি আশ্বাস, নির্ভরভার কি সে আভাষ পেয়েছি, তা আমিই জানি। তুমি দিনে-দিনে যত আদর, যত সোহাগ, যত ভালবাসা দিয়েছ, ততই আমার প্রাণ জলে জলে উঠেছে! কেবলি মনে হয়েছে, এ কি, এ কি পাষণে তুমি কুলের আশা করছ! তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে মন আমার মাথা মুইয়ে লুকোবার পথ খুঁজে পায় ন',— তাই যখন তুমি ভালবেসেছ, আদর করেছ, তখন আমি কুণ্ঠিত হয়েছি! মুখের

হাসিটুকু দিয়েও আমার প্রাণের অসীম সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারিনি—

আজ জানাচ্ছি,—ওগো—পাষাণী অহল্যার মত এ পাষাণীকেও কি পরশ দিয়েছ তুমি—আজ আর কোন ভয় নেই আমার,—এখন শান্তি দাও, মাথা পেতে নেব, হাসিমুখে নেব আমি—

শান্তি চাইছ?

আমার সমস্ত বুক কেঁপে উঠল। আমি চোখ বুজলুম।

স্বামী আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, মুখে চুমু দিয়ে বললেন, এই নাও শান্তি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

## মাসকাবারি

### বাংলার মাসিকপত্র

বাংলায় মাসিক পত্র বিস্তর জন্মিয়া উঠিয়াছে। সেগুলি নাড়াচাড়া করিতে বসিলে বাংলা সাহিত্যের ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে আমার মনে একটু সংশয়ের উদয় হয়। দেখি, হয় প্রভুতত্ত্ব—তবুটুকু বাদ দিয়া; নয় পদ্বীতত্ত্ব, অর্থাৎ বাজে গল্প ও উপজ্ঞাস—হয় গণেশের ভাস্কর্য্যশাসন, নয় অত্যন্ত সাধারণ নায়ক-নায়িকার হী-হুতাশ, নন্দবন্দনা, হৃদয়-বিদারক ঘটনা। এই সব একাদশ শ্রেণীর নায়ক<sup>ক</sup> নায়িকার তথাকথিত প্রণয় অথবা বস্তুত nervous titillation, স্নায়বিক উত্তেজনার কাহিনীটা এমনি রোচক নয় যে, তার অসংখ্য পুনরা-

বৃত্তি সহ্য হয়। “কমলিনী একটি সুন্দরী তরুণী, নায়ক ললিত তাকে ~~দেখিয়া~~ মুগ্ধ কিস্ত বিবাহ হইতে পারেনা বলিয়া নায়ক কিসা নায়িকা কিসা উভয়েই মনঃক্ষুণ্ণ।— অথবা অনেক গোলমালের পর কমলিনী তার নায়ককে লাভ করিয়া তাকে ভাল করিয়া রাখিয়া খাওয়াইত ও রাতে গা টিপিয়া দিত।” ‘বর্ণলতা’র আমল হইতে এই ত বাংলার গার্হস্থ উপজ্ঞাসের নমুনা। খুব হালে দেখিতেছি যে, প্রণয়ে বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্ত নায়ক-নায়িকার মধ্যে একটা তৃতীয় পক্ষের অবতারণা করিয়া নববলকে জমাইয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। সেদিন একজন বলিতেছিলেন যে, আধুনিক বাংলা সব

গল্প-উপন্যাসেই মিথুন-সমস্যা (sex-problem) দেখা দিয়াছে। অবশ্য ঐ তৃতীয় পঙ্কের অবতারণাটাই যদি সমস্যা হয়, তবে তাঁর কথা শিরোধার্য। কিন্তু এপর্যন্ত বাংলায় একটি মাত্র ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস বাদে নিতান্ত ছায়াভাসের মতনও, মিথুন-সমস্যা আর কোন উপন্যাসেই দেখা দেয় না।

—\*—

এদিকে “মহান্ মানব মানস”-লোকে যে সৃজন-প্রলয়-লীলা চলিয়াছে, বাংলা মাসিক সাহিত্যে তার অভিঘাত নাই। মাহুষের রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্যও বটে, নব নব পরীক্ষার পথে ধাবমান—পুরাতনের তীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে ব্যস্ত; কিন্তু মাহুষের যে প্রচণ্ড চিন্তা-বেগে এই সকল রূপ-ফুলঙ্গ উৎকৃষ্ট আক্ষিপ্ত হইতেছে, আমাদের দেশের লেখকদের তা কি কোথাও নাড়া মাত্র দিল না? আমাদের সমাজের বিশেষ সমস্যা কি এবং তার মামাংসা কি, বিশ্ব-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমাদের দেশেরই বা কি চিন্তা করিবার আছে, বিশ্ব-সভ্যতার সঙ্গে আমাদের দেশের সভ্যতার আদান প্রদানের কোন্ কোন্ রাজপথ উন্মুক্ত হওয়া দরকার—এসম্বন্ধে কোন আলোচনা, কোন ভাবনা আমাদের দেশের মধ্যে আছে বলিয়াই ত মনে হয় না। অথচ আমরা সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থতত্ত্ব বিশ্ববিজ্ঞানে পড়িয়া ডিগ্রি লই; আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারার সঙ্গেও যে আমাদের সকলের অপরিচয় একথাও বলা চলে না। গকির উপন্যাস বাঙালী পাঠক সাধারণের প্রিয়; কিন্তু গকি তাঁর নবেলের ভিতর দিয়া যে বিরাট গণ-ধর্মের অভ্যুদয় কল্পনা করেন, সে কল্পনা আমাদের মনকে তো চেতায় না।

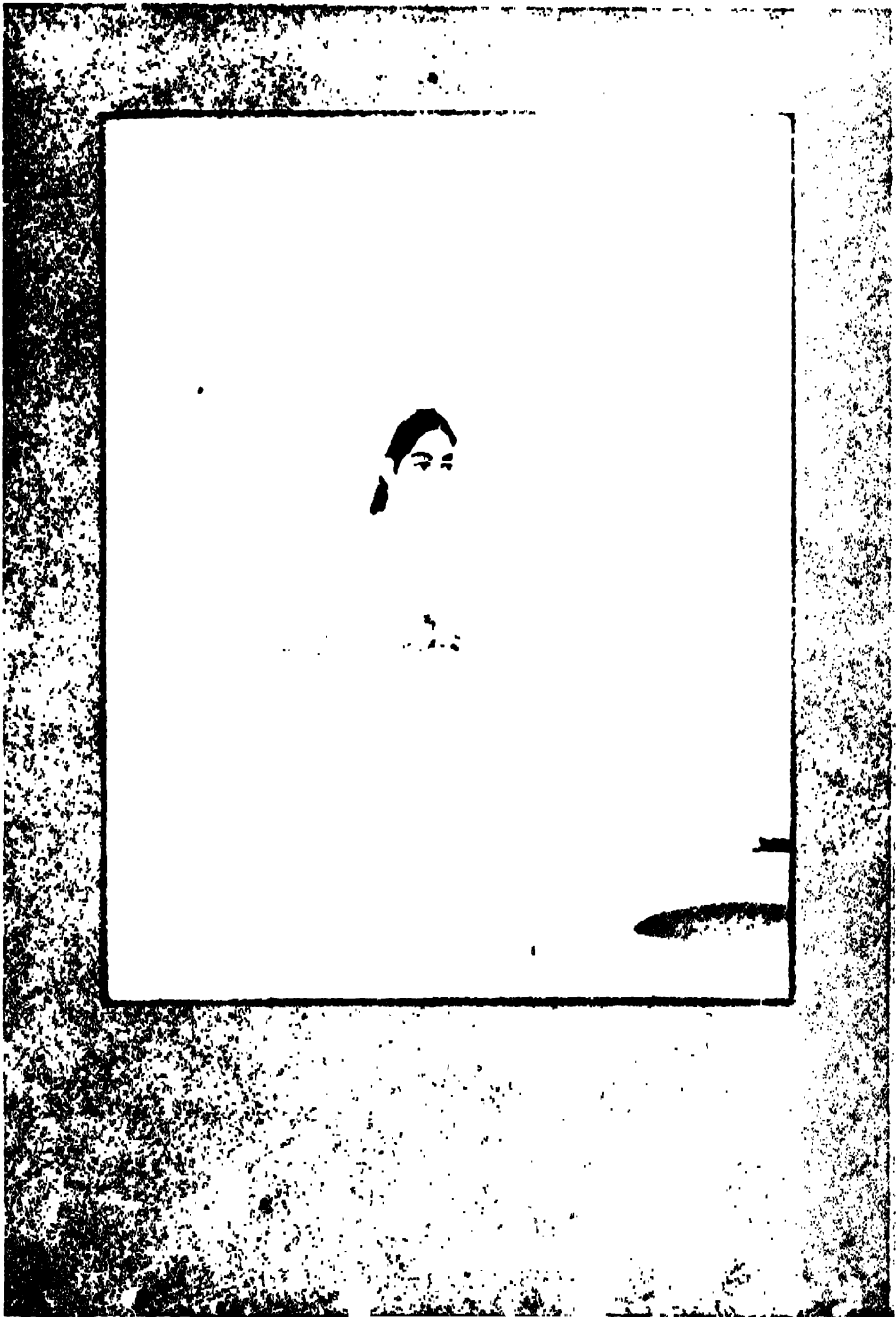
গকির “Confessions”কে নবেল বালিতে পারি, ভাবী মানব-সভ্যতার থলুও বালিতে পারি—অথচ তাতে নবেলের যে প্রধান ঔৎসুক্য গল্পের ঔৎসুক্য—তাহা বিন্দু পরিমাণেও থলু হয় নাই। রোম্যা রোলান্ John Christopher আমরা অনেকেই পড়িয়াছি ও পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। একদিকে এক আর্টিষ্টের ব্যক্তিগত জীবনের, অত্রদিকে ফরাসী-জার্মান সভ্যতা প্রবাহের সম্মিলিত সেই বিরাট এপিঙ্ক কাহিনী পড়িয়া কল্পনায় ও ললিতের গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী আমাদের কুচি-রোচন হয় কেমন করিয়া, সেই কথাই আমি ভাবি। যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি, যে পরিবর্তন-তরঙ্গ-মালার নিয়ন্ত উদ্ভান-পতন আমাদের চোখের সামনে ঘটিতেছে, তাতে এর চেয়েও বৃহত্তর উপন্যাস, বিচিত্রতর গল্পের সম্ভাবনা জাগিতেছে। এই বিপুল বিশ্ব-শ্রোত, এই সমস্যার তরঙ্গ-লীলা; তারি মাঝখানে আজ মানব ও মানবী তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত।

আমি গল্প উপন্যাসের অভক্ত নাই এবং “সারবান্ সাহিত্যের” অস্ত্র কিছুমাত্র ব্যস্তও নহি। আমি শুধু বলি যে প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, উপন্যাস এই পাঁচ মিশালো গিচুড়ি-ভোগ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে অর্থাৎ মাসিক পত্রে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পরিবেষণ করিলেই ভাল হয়। অবশ্য তখন দর্শন বা প্রত্নতত্ত্ব কেহ পড়িবেনা। মাসিক পত্রে দিলেই কি কেহ পড়ে? তার ফল হইবে এই যে, বিলাতী মাগাজিনের মত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা গল্প-মাসিকে বাড়িয়া গিয়া জঞ্জাল স্বত জমিতে থাকিবে, বিস্তৃত সাহিত্যের দরও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে।

ঐজিতকুমার চক্রবর্তী।

কলিকাতা—২২, হকিরা স্ট্রিট, কান্তিক প্রেসে ঐহরিচরণ মাস্তা কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, হকিরা স্ট্রিট হইতে

শিকাগো চার্টার্ড প্রকাশিত।



অণুকে

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ।

শ্রী বামেন্দ্র প্রসাদ



# ভারতী

৪২শ বর্ষ ]

মাঘ, ১৩২৫

[ ১০ম সংখ্যা

## বাইম্পত্য-সূত্রম্

শুক্লাচার্য্য যেমন অম্বরগণের গুরু, বৃহস্পতি তেমনি দেবগণের গুরু বলিয়া পৌরাণিক প্রবাদে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। লোকায়ত বা চার্ব্বাক-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এক বৃহস্পতির উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। অর্থ ও রাজনীতির প্রণেতা আর-এক বৃহস্পতির পরিচয় কোটিল্যের গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ চার্ব্বাক-দর্শনের প্রণেতা ও রাজনৈতিক বৃহস্পতি একই ব্যক্তি। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্থানে স্থানে বৃহস্পতির মতের উল্লেখ আছে। সুতরাং, কোটিল্যের পূর্বে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, বৃহস্পতি যে আপনার মত সুপ্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কোটিল্য, বাইম্পত্য পদ্ধতির মত উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহা সমগ্রমাণ করিয়াছেন। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কোটিল্যের পূর্বে, বৃহস্পতির যে একাধিপত্য ছিল এ কথা বলা যায় না। কারণ, কোটিল্য

যেখানেই বৃহস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আরও দুইটি নীতি-বেস্তার মত উল্লেখ করিয়াছেন;—তঁাহাদের নাম মনু ও উশনস। অর্থশাস্ত্রে পরাশরের মত স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাভারতের শাস্তিপর্কে যে কয়জন রাজনীতি-প্রণেতার নাম পাওয়া যায়, তঁাহাদের মধ্যে বৃহস্পতির মত সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক না হউক, অতি প্রসিদ্ধ, ও প্রাচীন কালের শেষ-যুগের প্রচলিত মত বলিয়া বোধ হয়।

“বিশালাক্ষশ্চ ভগবান্ কাব্যশ্চৈব মহাতপাঃ।

সহস্রাক্ষো মহেন্দ্রশ্চ তথা প্রাচেতসো মনুঃ ॥২

“ভরদ্বাজশ্চ ভগবাংস্তথা গৌরশিরা বৃনিঃ।

রাজশাস্ত্রপ্রণেতারো ব্রহ্মণ্য ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৩

“ততস্তাং ভগবান্ নীতিম্ পূর্ক্সং জগাহ শকরঃ।

সন্ধিক্ষেপ ততঃ শাস্ত্রং মহাস্ত্রং ব্রহ্মণ্য কৃতম্ ॥৮১



“বৈশালাক্ষমিতি প্রোক্তং তদিত্তঃ প্রত্যাপন্য ত ।  
 দশাধ্যয় সহস্রাণি সূত্রকর্ণো মহাতপাঃ ॥৮২  
 ভগবানপি তচ্ছাস্ত্রং সন্ধিক্ষেপ পুরন্দরঃ ।  
 সহস্রৈঃ পৰ্জাভিন্দ্যত যত্নকং বাহুদন্তকম্ ॥৮৩  
 “অধ্যায়ানাং সহসৈস্তু ত্রিভিরেব বৃহস্পতিঃ ।  
 সন্ধিক্ষেপেণরো বৃদ্ধা বার্ষস্পত্যং তদুচ্যতে ॥৮৪

মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ৫৯ অধ্যায় ।

কোটীলা গুরু ও বৃহস্পতিকে নমস্কার  
 করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন । তিনি প্রথমেই  
 স্বীকার করিয়াছেন যে পূৰ্ব্বেগামী আচার্য্যা-  
 গণের প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রাদি সংহরণ করিয়া  
 অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ।

“পৃথিব্যা লাভে পালনে চ বাবাস্তু

অর্থশাস্ত্রাণ পূৰ্ব্বাচার্যোঃ

প্রস্থাপিতানি প্রায়শস্তানি সংহৃত্য

একমিদমর্থশাস্ত্রং কৃতম্ ॥”

কোটীলা তাঁহার পূৰ্ব্বেগামী যে সকল  
 রাজশাস্ত্রবিদগণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন,  
 —তাঁহাদের নাম—ভরথাক, বিশালাক্ষ,  
 পিশুন, কোনপদন্ত, বাতব্যাধি, বহুদন্তী-  
 পুত্র (বাহুদন্ত), উশনস, বৃহস্পতি এবং  
 পরাশর । ইহাদের মধ্যে চারিজন শাস্ত্রকার  
 মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছেন । সম্ভবতঃ,  
 পিশুন, কোনপদন্ত, ও বাতব্যাধি,—বৃহস্পতি  
 ও কোটীল্যের মধ্যযুগের শাস্ত্রকার ছিলেন ।  
 অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে এখনও পাশ্চাত্য  
 পণ্ডিতগণের ঐকমত্য নাই । তথাপি,  
 কোটীলা, চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত, ইত্যাদি নাম-  
 ধারী রাজনৈতিক যে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক  
 একথা অনেকেই স্বীকার করেন । তাহা  
 হইলে দেখা যাইতেছে যে খৃষ্টের ভগ্নের অন্ততঃ  
 তিনশত বৎসর পূর্বে রাজ্যনীতিশাস্ত্র ভারতের

একাধিক পণ্ডিতগণের আলোচ্য হইয়াছিল। এবং কোটীল্যের সময়ে, এই  
 শাস্ত্রের নানা প্রচলিত মতের সমন্বয় ও  
 পরিপূষ্টিসাধন হইয়াছিল । কোটীল্যের মত  
 পরবর্তী যুগে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি  
 স্থাপন করিয়াছিল । এবং তাহারই গ্রন্থাদি  
 অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় তৃতীয়  
 শতাব্দীতে কামদকায় নীতি রচিত হইয়াছিল।  
 ভারতের বাহিরে, এই নীতিবাদের আদর্শ,  
 তিব্বত, চীন, জাপান, যব ও বলিঙ্গীপ প্রভৃতি  
 নানাদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল ।

কোটীল্যের পূৰ্ব্বেগামী আচার্য্যাগণের মধ্যে  
 একজনের নাম-সংযুক্ত একখানি সূত্রগ্রন্থ  
 সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে, সেটি “বার্ষস্পত্য  
 সূত্রম্” । এই প্রবন্ধে আমরা সূত্রটির কিঞ্চিৎ  
 পরিচয় লইব ।

এই গ্রন্থটি কোটীল্যের উল্লিখিত বৃহস্পতির  
 রচিত কি না বলা বড় কঠিন । কারণ,  
 কোটীলা অর্থশাস্ত্রে যে যে বিষয়ের উপলক্ষে,  
 বৃহস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমাদের  
 আলোচ্য সূত্রটিতে সে সকল বিষয়ের  
 অবতারণা নাই । সম্ভবতঃ বৃহস্পতির রচিত  
 একাধিক গ্রন্থ ছিল, এবং বোধ হয় যে  
 বার্ষস্পত্যসূত্র কোটীল্যের সম্মুখে ছিল—  
 অধুনা আবিষ্কৃত পৃথিব্যানি ঠিক সেটি নহে ।  
 তথাপি সূত্রটি যে অতি প্রাচীন এ কথা  
 অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা যায় । চাণক্যের  
 নামে পরিচিত এইরূপ একটা সূত্রগ্রন্থ  
 ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । সূত্র-  
 সাহিত্যের পরিণতিকাল খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে  
 ২০০ বর্ষ ধরিলে, এবং অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল  
 খৃঃ পূঃ ৩০০ বর্ষ ধরিলে, বার্ষস্পত্যসূত্র

মোটামুঠি পৃঃ ৫০০ বঙ্গিরের রচনা বলিয়া অনুমান করা বাহিতে পারে। আমাদের আলোচ্য পুঁথিখানি ঠিক এই কালের রচনা না হউক, অন্ততঃ ঐ সময়ের রচিত ও পূর্বে প্রচলিত কোনও আদর্শ গ্রন্থের প্রবাদ বা চার্মা অবলম্বনে রচিত বলিয়া গ্রহণ করিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হইবে না। দিন যেমন রাত্রিকে অনুসরণ করে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, তেমনই ভাষা ও টীকাগ্রন্থ, সূত্র-গ্রন্থকে চিরকাল অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। বার্হম্পত্যসূত্র সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। “বার্হম্পত্য-সূত্র-টীকা” নামে একটি পুঁথি Oppert সাহেব তাহার তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন (Vol I, No. 6061)। কিন্তু হর্ভাগ্যবশতঃ এই পুঁথিটির এখন আর - প্রকান পাওয়া যায় না। বার্হম্পত্যসূত্রের দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; একখানি বিলাতের Royal Asiatic Societyর সংগ্রহে আছে (Winternitz : Catalogue, No. 160 (3) p 219); দ্বিতীয়খানি মাদ্রাজে Government Oriental Libraryতে আছে। আমার প্রক্বেয় বন্ধু ত্রিবন্ধু কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক রাও বাহাদুর রজস্বামী আরঙ্গর মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি এই পুঁথিটির একখানি নকল পাইয়াছি। Royal Asiatic Societyর পুঁথিটিতে দেবগিরির বাদব-রাজগণের উল্লেখ আছে। এবং এই প্রমাণের বলে Thomas সাহেব পুঁথিটিকে দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা বলিতে চাহেন। কিন্তু সাহেব এ কথাও বলিয়াছেন যে এই অংশ এবং শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণবগণের তীর্থক্ষেত্রাদির বিবরণের অংশ প্রাক্তপ

ধরিলে, পুঁথিটি যে বহুপ্রাচীন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই মতের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, কামন্দকীয় নীতি ও শুক্রনীতির বহুল প্রচারের পর এই সূত্র-গ্রন্থটি এই আকারে সঙ্কলিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বলা বাহুল্য যে কোটিল্য, কামন্দক বা শুক্রাচার্যের নাম উল্লেখ এই পুঁথিটিতে পাওয়া যায় না। এই সূত্রটির প্রধান বিষয়বস্তু ও অভিনবস্তু এই যে কোটিল্যের পূর্বগামী কোনও আচার্যের নামযুক্ত সূত্র আকারের রাজনীতিগ্রন্থের এই প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র কিঞ্চিৎ সূত্রাকারে এবং অধিকাংশে ভাষ্যরীতিতে রচিত। “দৃষ্ট্য বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেণ ভাষ্যকারাণাম্। স্বরমেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রঞ্চ ভাষ্যঞ্চ॥” সূত্রাং কেবল সূত্ররীতিতে রচিত রাজনীতিশাস্ত্রের গ্রন্থের এই প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল। ভারতের রাজনীতি যে বিশেষভাবে মৌলিক ও পুরাতন বিজ্ঞান তাহা এই সূত্রগ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতেছে। রাজনীতিশাস্ত্রে বৃহস্পতির প্রতিপত্তি প্রাগৈতিহাসিক প্রবাদে সূত্রপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। জ্যোতিষগ্রন্থের নানা বচনে তাহার ছায়াচিহ্ন আছে :—

“নৃপেন্দ্র-মস্ত্রী নৃপলক্ষ্যকামো

বিজ্ঞাবিনোদী চতুরঃ প্রগলভঃ। ৩

আচারপূজ্যো মধুরস্বভাবো

বারে ভবেন্দব গুরোর্মহ্মাঃ॥”

(কোঞ্জীপ্রদীপ)

আমাদের পুঁথিটি ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ১১০টি সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে

৭০টি, তৃতীয়ে ১৪৭, চতুর্থে ৫০টি, পঞ্চমে ৩০টি এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৪টি সূত্র আছে।  
 সূত্রগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে সংযোগ ও সঙ্গতি আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, পরস্পরের মধ্যে সূত্রগুলির কোনও বিশেষ যোগ বা সম্বন্ধ নাই। এক একটা সূত্রে এক এক নূতন কথাই সমাবেশ আছে—অনেক স্থলে একটির সহিত অন্যটির কোনও সম্পর্ক নাই। বিষয়-অনুসারে কোনও শ্রেণীবিভাগ করিয়া, কিম্বা অন্য কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হয় নাই। বাৎসর্যগের কামসূত্রে আমরা বিষয়-বস্তুর যে শ্রেণীবিভাগ ও সরিবেশ-পদ্ধতির পরিচয় পাই, আমাদের আলোচ্য সূত্রটিতে তাহার একান্ত অভাব। তৃতীয় অধ্যায়ের স্থানে স্থানে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বিষয়-বস্তুর কিঞ্চিৎ ধারাবাহিকতা আছে। সূত্রটির দুই-এক স্থানে বৌদ্ধগণের নাম উল্লেখ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতবর্ষের বিস্তৃত ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই অংশকে প্রাক্কিন্তু বলা হইতে পারে। প্রত্যেক অধ্যায় হইতে কয়েকটি সূত্র আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

### প্রথমোহাধ্যায়ঃ ।

“বৃহস্পতিরখাচার্য্য ইজ্জার

নীতিসর্বস্বমুপদিশতি ॥

১। আত্মবান্ রাজা ॥

২। আত্মবস্তং মন্ত্রিণমাপাদয়েৎ ॥

৩। ধর্মমপি লোকবিকুণ্ঠং ন কুর্যাৎ ॥

× × ×

৫। স্ত্রীবাণবৃক্কেঃ সহ ন বিবজ্জন্ম

ধর্মনীতিকৃত্যানি ।

৬। ঐজ্জজালকং ন কুর্যাৎ ॥

× × ×

৩০। মলবেষং ন কুর্যাৎ ॥

৩১। মৃগয়াতিসঙ্গং চ নাচরয়েৎ ॥

৩২। স্ত্রীষতিসান্নাদমশো বদ্ধতে ॥

৩৩। আয়ুশ্চ ক্ষীয়তে ॥

× × ×

৩৭। বৃথা ধর্মধ্বজিনং ন বিখসেৎ ॥

৩৮। নিম্বেয় চ ॥

× × ×

৪২। অপ্ৰিয়মপি বচনং শৃণুয়াৎ ॥

× × ×

৫৬। সন্ন্যাসিনুপবেশ্যামন্ত্রবাদোপজীবেষু

চিরং ন সেবেতঃ ।

× × ×

৮৫। ধর্মগুপ্তিঃ শুভযাত্রাগুপ্তিঃ,

কার্যগুপ্তিঃ বৈরগুপ্তিঃ,

যশোভঙ্গে সত্যমপি নেতি বদেৎ ॥

× × ×

৯০। আত্মানমনুজী কুর্যাৎ ॥

× × ×

৯২। নিত্যকর্ম ন ত্যজেৎ ॥

৯৩। জনবোধে সতি ক্ষুদ্রকর্ম ন কুর্যাৎ ॥

৯৪। নষ্টে ন স্থাতব্যম্ ॥

৯৫। দূর পরিহরণীয়ং গুরুতরমপি

তদ্রাজ্যকার্যম্ ।

× × ×

৯৭। অন্নহানিঃ সোচব্যা ॥

× × ×

১০৯। জ্ঞাতিষু যত্র বৈজ্ঞান্যং তৎকুলধরমামূলং

নশ্রুতি ॥

৪১। নীতে: ফলং ধর্মার্থকামাপ্তিঃ ॥

৪২। ধর্মেণ কামার্থে পরীক্ষ্যে ॥

১১০। যঃ শাস্ত্রং দত্তনীতিঃ

পরিভ্রজ্যতানর্থকো

× × ×

৫১। সবাণি রত্নানাপি দীপ্তাং-

শলভ ইব বহিঃ প্রবিষ্ট্যজ্ঞানং ॥

স্বকাষজ্যোষশোরক্ষণে ॥

ইতাহ ভগবান্‌চাৰ্য্যঃ সুরেন্দ্রগুরুঃ ॥

৫২। মন্ত্রকালে ন কোপয়েৎ ॥

ইতি বাহিন্দ্যাসূত্রে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

৫৩। ধর্মপ্রধানং পুরুষার্থম্ ॥

× × ×

অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

৫৪। অপথ্যভোজনো মৃত্যুপ্ৰীতিকরইব

১। গুণবতো রাজ্যম্ ॥

সত্যব্রতঃ

২। বিত্তা গুণোহর্থগুণঃ সত্যগুণশ্চ ॥

শাস্ত্রেণ নিষ্টিতঃ পুরুষঃ সাগরমপি শোষণয়েৎ ॥

৩। স্বকুলরঞ্জনং চ চরিত্রলক্ষণম্ ॥

× × ×

৪। কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যানি ॥

৫৮। সজ্জনো ন ভয়াৎ ব্যতিবস্ততে ॥

৫। সর্বথা লোকায়তিকমেব

× × ×

শাস্ত্রমর্থসাধনকালে ॥

৬১। অজিতাশ্বানং শাসিতুং নোৎসহেৎ ॥

৬। কাপালিকমেব কামসাধনে ॥

× × ×

৭। অর্হতং ধর্মে ॥

৬৩। দুর্জনমধো সূর্য্যবৎ প্রকাশতে সূজনঃ ॥

৮। লোকায়তিকমসেনার্থং ক্রিপ্রং

৬৪। অধর্ম্যব্যবস্থিতান্ ত্রায়বৃন্তেন বারয়েৎ ॥

নশ্রুতি তৎ ॥

৬৫। অকৌস্তিঃ নার্জয়েৎ ॥

৯। কাপালিকার্হিত বৌদ্ধাশ্চ ॥

× × ×

১০। এতেষু তিষ্ঠন্ শলভবহিঃ ॥

৬৮। বালো নিবার্য্যমধর্ম'পাঠাচ্চুশেন গজইব ।

× × ×

৬৯। গুরুবচনমলজ্ঞানীম্ নয়ান্নুগতং চেৎ ॥

১৪। যদা বেদোক্তকর্মজ্ঞানং শিবং বিষ্ণুং

৭০। গুরুমপি নীতিবিযুক্তং নিরাসয়েৎ ॥

শ্রিয়মপি পরিত্যজ্য সর্বং শৃন্তুমিতি

ইতি বাহিন্দ্যাসূত্রে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বদন্তি তদা বৌদ্ধাভিধান পাষণ্ডা ॥

× × ×

অথ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

২২। পরাপবাদার্থং বেদশাস্ত্রধর্মাদীন পঠতি ॥

১। জিত ক্লেশস্য পৌরুষম্ ॥

২৩। সর্বান্ নিন্দতি ॥

২। দেশান্তরবাসেন জিতক্লেশো ভবতি ॥

২৪। মহেশ্বর বিষ্ণুদীনামপি ॥

৩। সর্ব-বল-কাল-দেশ-সাম-প্রকৃতিসহায়া-

২৫। সোহপ্যাশনার্থং ধর্মং বদতি ॥

মবয়সাংজ্ঞানং কার্যম্ ॥

২৬। বদনার্থং পরান্ স্তোতি সঃ বৌদ্ধঃ ॥

৪। উপবাসাদিসহিষ্ণুত্বং চ ॥

× × ×

৫। স্নগন্ধবাসান্ কেশান্ কুর্যাৎ ॥

- ৬। বহুবাদং মধুরমেব কুৰ্ঘ্যাৎ ॥
- ১০। মোক্ষপূর্বান্ ধারংত্রয়ম্ ॥
- ১১। শাক্তাঃ বৈষ্ণবাঃ শৈবাঃ ॥
- X X X
- ১৩। মহাপথবৎ বৈষ্ণবম্ ॥
- ১৪। কেবলপ্রধানিকমন্ত্ররথযানবৎ ॥
- ১৫। লৌকারভিক ক্ষপণক বৌদ্ধাদি-বহু-  
শাদূর্ল-দৃষ্ট-মুগ-কৌণ-শূভ্রাটবৌদ্ধহামার্গবৎ ॥
- ১৬। এতন্নিক্রপামেকমাশ্রয়েৎ ॥
- ১৭। জ্যোতির্নাথস্থিতং সদা নিক্রপয়েৎ ॥
- ১৮। চাতুর্ভ্যাং রক্ষেচ্চ ॥
- X X X
- ২১। দানমানালঙ্কারবিভ্যভিঃ সিদ্ধিংলভেত ॥
- ২২। অষ্টাদশতীর্থানি নিক্রপয়েৎ ॥
- X X X
- ২৭। শূভ্রারবেষং কুৰ্ঘ্যাৎ ॥
- X X X
- ৩০। ইতিহাসপুরাণানি মানয়েৎ ॥
- X X X
- ৩৬। ব্রাহ্মণ্যং ন হস্তাৎ দোষদৃষ্টমপি ॥
- X X X
- ৪২। ভোজনাজ্জানাদিভিঃ শরণাগতং  
সর্বপাতকযুক্তমপি রক্ষেৎ ॥
- ৫০। দৃষ্টনিগ্রহং কুৰ্ঘ্যাৎ ॥
- ৫১। শিষ্টপরিপালনং চ ॥
- X X X
- ৫৫। আসবানি সেবয়েৎ ॥
- ৫৬। অতি ন ॥
- ৫৭। মাংসানি চ ॥
- ৫৮। স্থণা কার্ঘ্যা ॥
- ৫৯। বৌদ্ধাদয়ো ন ॥
- ৬২। পকাশং কোটিবোজনো পৃথিক্ ॥
- ৬৩। সপ্তদ্বাপবতী চ ॥
- ৬৪। সপ্তসমুদ্রাবৃত্তা চ ॥
- ৬৫। কর্মভোগাতিভোগদ্বিব্যশূদ্ধারসিদ্ধ  
কৈবল্যা ইতি দ্বীপাভিধানাঃ ॥
- ৬৬। মধ্য কর্মভূমিঃ ॥
- ৬৭। তন্মধ্যে মে রোরাস্তুঃ ॥
- ৬৮। তত্রোত্তরে হিমবান ॥
- ৬। তস্য দক্ষিণে নবসাহস্রী ভূঃ ॥
- ৭০। তত্র দক্ষিণাত্য ভারতঃ ঞ্চঃ ॥
- ৭১। তত্র সাক্ষাৎ ধর্মধর্মকলাঃ সিধ্যান্ত ॥
- ৭২। তত্র দণ্ডনীতিঃ ॥
- X X X
- ৮০। গঙ্গাসরস্বতীকালিন্দী গোদাবরীকাবেরী-  
তাম্রপর্ণী-স্বতমালা কুলনদ্যাশ্চ ॥
- ৮১। অষ্টাদশ বিবরাশ্চ ॥
- ৮২। অষ্টাদশসাগরা নৃপাঃ ॥
- X X X
- ১১২। অথ বৈষ্ণবক্ষেত্রাঃ ॥
- ১২০। বদরিকাশালগ্রামপুরুষোত্তম-দ্বারকা-  
বিষাচলানন্তসিংহ ত্রিঙ্গাঃ ॥
- ১৪০। কুতে জ্ঞানিনঃ ॥
- X X X
- ১৪২। ত্রেতারায় কর্মিণঃ নীতিবিশারদাঃ ॥
- ১৪৫। তিষ্যে পাদেহজ্ঞানকর্ম্য ঘনা  
দণ্ডনীতিকোবিদা নরাঃ ॥
- ১৪৬। তদুত্তরং বিরুদ্ধধর্ম-বর্ণ-বেদা  
দণ্ডনীতিবজ্জিতাঃ ॥
- ১৪৭। পশুস্তি প্রজা অমৃতবাদতৎপরাস্তেত্যাহ  
আচাৰ্য্যঃ ॥
- ইতি বার্ষস্পত্যসূত্রে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥



## — অথ চতুর্থোহিধ্যায়ঃ ॥

- ১। ব্রাহ্মো মুহূর্তে উখানম্ ॥  
 ২। ধর্মমর্থং চ চিস্তয়েৎ ॥  
 ৩। কুকুটশব্দং শুভং ॥  
 ৫। গজাদির্দর্শনং চ ॥  
 ৫। গজশব্দ মঙ্গলস্বৃতি বেদপাঠনং চ ॥  
 ৬। দেবতাপূজাকথা চ ॥  
 ৭। রাজগ্যাস্তরণং চ ॥  
 ৮। নেত্রাজ্ঞনং চ ॥  
 ৯। আদর্শদর্শনং চ ॥  
 ১০। অলঙ্কারয়েৎ ॥  
 ১১। তাম্বুলচবণং চ ॥  
 X X X  
 ১৪। তুর্য্যধোষাশ্চ ॥  
 ১৫। দিব্যপ্রমদাদর্শনং চ ॥  
 X X X  
 ২৬। অবজ্ঞানিরূপনীয়ানোতানি কৰ্মাণি ॥  
 ২৭। মন্বমূল্যে বিজয়ঃ ॥  
 X X X  
 ৩০। বক্রতিঃ বাক্তবৈচিত্রৈঃ বহুশ্রুতৈঃ  
 ধীরৈঃ সহ  
 যৎ কৰ্ম্মারভতে তদন্তমম্ ॥  
 X X X

- ৪৭। কানাদান্ যে জয়ন্তিতে সর্বানরীন্  
 জয়ন্তি ॥

- ৪৮। পূর্বমুপকারং ন কারয়েৎ ॥  
 ৪৯। উপকারং নিয়ন্তি কুর্ধ্যাচ্চ ॥  
 ৫০। নাভাবিব্যাসনং পূর্বংজ্ঞাত্বা ব্যাসন  
 প্রতীকারং কার্যমিতি গুরুব্রাহ্ম ॥

ইতি বাইস্পত্যসূত্রে চতুর্থোহিধ্যায়ঃ ।

## অথ পঞ্চমোহিধ্যায়ঃ ।

- ১। চম্বার উপায়াঃ ॥  
 ২। ত্রয়শ্চ ॥  
 ৩। মারোপেক্ষাবধশ্চ ॥  
 ৪। স্থিরযু সাম ॥  
 ৫। শঙ্কিতেষু সামভেদো ॥  
 ৬। লুকেষু সামদানভেদাঃ ॥  
 ৭। কষ্টেষু সামভেদদানমারোপেক্ষাবধাঃ ॥  
 ৮। সামং পূর্বং প্রযোক্তব্যম্ ॥  
 X X X  
 ১২। সর্বভয়েষু জ্ঞাতিভয়ং ঘোরম্ ॥  
 ১৩। গোযু পয়ঃ ব্রাহ্মণে কোপশ্চ ॥  
 X X X  
 ১৭। লোকাবরুদ্ধং নাচরয়েৎ ॥  
 X X X  
 ২০। শত্রুপক্ষাদাগতং ন বিশ্বসেৎ ॥  
 ২১। গুণতঃ সংগ্রহীয়াৎ ॥  
 ২২। ভাবৈঃ পরীক্ষয়েৎ ॥  
 X X X  
 ২৮। হৃদয়ে যথাবৎ শুভাশুভং পূর্বমুদেতি  
 ন দুষ্টাচারঃ সর্বত্র কারয়েৎ ॥  
 ২৯। চপলা ন বহুমাভাঃ ॥  
 ইত্যাহ আচার্য্যো বৃহস্পতিঃ ॥  
 ইতি বাইস্পত্যসূত্রে পঞ্চমোহিধ্যায়ঃ ।

## অথ ষষ্ঠোহিধ্যায়ঃ ।

- ১। দেশকালবোধ্যং কৰ্ম নয়ানরো  
 চ বেদযেৎ ॥  
 ২। বিপরীতং ন বেদবীৰ্য্যদর্পণ ॥  
 ৩। চিত্তানি নিরূপয়েৎ ॥  
 ৪। নরো মাত্রাভিনিরূপ্য কার্য্যতে ॥

- ৬। অহিতং বিকারং যস্য প্রতিভাতি ১১। সর্বাণি তত্র সন্তি, নির্ধনো মৃতশ্চণ্ডালশ্চ।  
সমস্বযোগাঃ ॥
- ৭। অর্থমার্জয়েৎ ॥ ১২। এবং ধর্মমূলং চ বিত্তমার্জয়েৎ ॥
- ৮। বস্যার্থরাশিরাস্তি তস্য মিত্রাণি ধন্যশ্চ ১৩। বিত্তমূলং জগৎ ॥
- বিত্তা চ গুণবিক্রমো চ বৃদ্ধিশ্চ ॥ ১৪। বিত্তা পুনঃ সর্দমিত্যাহ গুরুঃ ॥
- ৯। অধেননার্থমার্জয়িতুং ন শক্যতে ১৫। ততি বাইস্পত্যাস্ত্রে ষষ্ঠোহশায়ঃ  
গভং গভেনৈব ॥ সমাপ্তোহয়ম্ গ্রন্থঃ
- ১০। ধনমূলং জগৎ ॥ ১৬। শ্রীঅন্ধ্রকুমার গঙ্গোপাধায় ।

## নাদিরশাহের জাগরণ

[ স্থান—পারস্তের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত । কাল—নিশাবসান । ]

নাদির! নাদির!—

কার আছান আকাশে বাতাসে আজ!—

মেঘে-চাপা বাজ! আওয়াজ তবু সে মিঠা যেন এতাজ!  
 চাঁদ ডোবে যেথা পাহাড়ের চূড়ে—বিরটি প্রেতের কায়!  
 আক্রোশে যেন ডাক দিয়ে ফেরে ইরাণ-বীরের ছায়া!  
 কতকাল ধরি' বালুকার তালু 'আমু-শির'-দরিয়ার  
 পায় নি পরশ তুরাণী টুটির রক্তের ফোয়ারার!  
 পিভা হ'তে সিস্তান—  
 সারা মুলুক জুড়ে' বসে' আছে ইল্লত্ আফ্গান!

নাদির! নাদির!—

ওই ডাকে শোন', মাথায় আগুন জলে!

পির হ'য়ে যায় চোখের পলক অন্ধকারের তলে!  
 মনুচেহরের সেনাপতি ওই অঞ্জলি ভরি' আনে  
 'হেল্মদ'-বারি, পান করি' তাই কি আশা জাগিছে প্রাণে।  
 রোস্তমের সে বিশাল মুষ্টি দেখা'ল কৃপাণ-ধরা  
 বক্ষে বাজতে এক উল্লাস বিজয়-অশনি-ভরা!  
 দিকে দিকে জয়রব—  
 হাচাকার করে ফেরুপাল যত, নরবলি উৎসব!



নাথির ! নাথির !—

ভনিয়াছি আমি, উঠিয়াছি তাই আগি,  
ইম্পাহানের শলাব-বাগান—কে ছোটো তাহার লাগি' ।  
সিরাজী-সিরাপ-প্রাকার চুনি করে নাই চোখ রাঙা,  
শাহজাহানী-প্রাসাদের ভিত—হেরি নাই সে কি ভাঙা !  
উত্তর হ'তে হুহু হুহু হাওয়া ছুটে আসে দিশাহারা,  
লাকাইয়া ছোটো স্বর্ণার বল খেতচমরীর পারা,  
তুহিন, তুষাররাশি,  
বাক-বিহ্বাৎ,—তারি মাঝে প্রাণ উঠিয়াছে উল্লাসি' ।

নাথির ! নাথির !—

• আর কাজ নাই, বুঝিয়াছি কারে বলে  
মাটিতে এ মাথা রাখিবার আগে দলে' নেওরা পা'র তলে ।  
পশু-মেঘ যেই পালন করেছে—মাহুব-মেঘের দল  
তারি দুর্কীর তরবারে যাবে একেবারে রসাতল ।  
ধরণী হইতে মুছিয়া কেলিব দুর্কলতার গ্রানি,  
লুটাইক পার হীরার মুকুট, রাজ্য আর রাজধানী,  
—কাবুল কান্দাহার  
দিল্লী হিরাট মেশেদ্ গজ্জনী নিশাপুর পেশাবার ।

ইম্পাহানের ইম্পাত হ'তে রক্তের ধোঁরা-ধার  
নিবিবেনা কভু, প্রাণের মমতা বুচাইব সবাকার ।  
কোহি-রহমতে 'চেহেল-মিনার' গড়েছিল অন্তর্জান—  
আমিও গড়িব কাঁচামাথা দিগে, দেহ করি' খান্ খান্ ।  
লক্ষপ্রাণীর গল-শৃঙ্খল বাজিবে সমুখে পিছে,  
তথ্ভের 'পরে চড়িয়া শুনিব বান্দারা গার নীচে—  
'বস্ত্র নাথির শাহ !

মারিবে, তবুও একবার দেখি, অভাগারে কিরে' চাহ ।'

'নাথির ! নাথির ! নারীর অঠরে জন্ম কি তোর নয় !'—  
পাপ-সরতান কুহরিছে কাণে কাপুরুষ-সংশয় !  
খোদার বান্দা এন্সান্ যেই নাই তার নিস্তার,—



চিবাইয়া থাকে আপন কলেজা, যদি সে ফেরেস্তার  
 'আখেরি-জমানা'-দিনের নিশানা তুলিবারে চায় ধরি',  
 মরণের পরে 'দোজ্বাকেকে' নামিবে হু'বার করিয়া মরি' !

—হাহা, হের হাসি পায় !

মমতার চেয়ে আর কিছু পাপ আছে নাকি ছুনিয়ায় !

বুলবুল আর সিরাজের গুল্ নয় শুধু আল্লার,  
 বজ্র-বাজনা মক্ক-মরীচিকা আরো যে চমৎকার !  
 শুধু মিটমিটে তারার লাগিয়া আকাশের শামিয়ানা !  
 ধূমকেতু আর উল্কার দলে পাতে !ন সেথায় থানা ?  
 শিশুর অধরে মার পয়োধরে মিলায় খেলার ছলে,  
 তেমনি খেলার খেলালে ছড়ায় মারাবিষ থলে জলে—  
 বাহবা কি বাহবা রে !  
 আল্লার মত দিলাবর যেই—এ খেলা পেলিতে পারে ।

বাম হাতখানি তুলিয়াছে উষা 'পামীর'-পাহাড়-চূড়ে,  
 আঙনের বাণ অরুণের ওই উড়িল কুম্বাসা হুঁড়ে';  
 আলোকের বিষ-বল্লম ছুঁড়ি' রাত্রির কালো বুকে  
 পুবের শিকারী নীলবালুচরে দাঁড়াইল রাঙা মুখে !  
 উহারি মতন উজ্জ্বল উঠিবে এই প্রাণ-বাজপাখী,  
 'হিন্দু-তাতার-তুরাগী-শোণিত !' চাঁৎকার করে' ডাকি' ।  
 —ইরাণ ! গানের রাণি !

রক্তপাগল নাদির তুহার পীড়ন করিবে পাণি ।

গানের মহিমা কিছু নাই নাই, তাই তোর অপমান !  
 মূর্থ সে কবি গানেরই নেশায় বিকাইত ধোয়াসান !  
 গজ্জীর রাজা দিয়েছিল দাম ? মনে নাই তার বাথা ?  
 তারি শোকে কবি তোয়াগিল প্রাণ, হাসি পায় শুনি' কথা !  
 সাকী ও পেয়লা, শ্লোক দুই-চারি,—জীবনের দান এই !  
 নাইশাপুরের ধূলিতলে তাই অস্থিখানাও নেই ।

দাস বারা গান গায়,

ভীকু হৃদয়ের ভিখারী পিপাসা গানেই মিটাতে চায় !

দূরত্বের দাও গোলাপের মালা, পেয়ালা ভাঙ্গিয়া দাও !

‘নাদির ! নাদির !’—শুধু ওচ সুরের পার ত’ আবার গাও ।

কত বড় আমি একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাহ,

অধীর হয়েছি বঁক-কারায় শুধু সেই কামনাচ ।

বর্ষাকলকে ঝলসি’ উঠেছে মধুর রক্তরেখা,

ছায়াখানি মোর পড়িয়াছে পিছে, যতদূর যায় দেখা !

—কাবুল কান্দাহার

গঙ্গানী হিরটি দিল্লীতে ওই ওঠে বুঝি হাহাকার ।

শ্রীমোহিতলাল মুজুমদার ।

## বাংলার ব্রত

( ৪ )

আল্পনার অংশটাকে দৃষ্টপটের হিসাবে  
নিষে, ছড়া ও ক্রিয়া থেকে ভাঙ্গলীরতের  
অহুতানের যে মৃতিটি পাওয়া যায় তা এই :—

ক্রিয়া আরম্ভ হল ;—ভাদ্রমাসের ভরা  
নদী, কলসী-কাঁকে জল তুলতে চলেছে একটি  
ছোটো মেয়ে এবং তার চেয়ে একটুও-বড়-নয়  
এমন-একটি ঘোমটা-দেওয়া নতুন বো এবং  
সঙ্গিনীগণ ।

( জল-তোলার গান বা ছড়া )

এ-নদী সে-নদী একখানে মুখ,

ভাঙ্গলীঠাকুরাণী ঘুচাবেন হুপ ।

এ-নদী সে-নদী একখানে মুখ,

দিবেন ভাঙ্গলী তিনকুলে সুখ ।

একে একে নদীর জলে ফুল দিয়া—

( ছোটো মেয়ে )—

নদী, নদী, কোথায় যাও ?

বাপ-ভায়ের বার্তা দাও ।

( ছোটো বো )—

নদী, নদী, কোথায় যাও ?

সোয়ামি-মন্ত্রের বার্তা দাও ।

হিতমধ্যে একপসলা বৃষ্টি এল ; সকলে  
জলে-স্থলে ফুল ছিটাইয়া—

নদীর জল, বৃষ্টির জল, যে জল চও,

আমার বাপ-ভায়ের সখাদ কও ।

বৃষ্টির শেষে, মেঘ-কালো আকাশ দিয়ে  
একঝাঁক সাদা বক উড়তে-উড়তে চলে  
গেল ; একদল কাক কাঁকা করতে করতে  
বড়-একটা বকুল-গাছ ছেড়ে গ্রামের দিকে  
উড়ে পালালো ; আকাশ একটু পরিষ্কার  
হচ্ছে ।

( মেয়ে )—

কাগারে ! বগারে ! কার কপালে যাও ?

আমার বাপ-ভাই গেছেন বাণিজ্যে

কোথায় দেখলে না’ও ?”

মেঘ-কাটা-রৌজ ভরা-নদীর বৃকে বালু-

চরের একটু মরীচিকার মতো ঝিক্‌মিক্‌  
করেই মিলিয়ে গেল।

(মেয়ে) —

চড়া! চড়া! চেয়ে থেকে,  
আমার বাপ-ভাইকে দেখে হেসো।

কোন্ গ্রামের একটা দাঁড়ি-ছেঁড়া ভেলা  
শ্রোতের টানে ছুঁ করে বেরিয়ে গেল।

(মেয়ে) —

ভেলা! ভেলা! সমুদ্রে থেকে,  
আমার বাপ-ভাইকে মেনে রেখো!

### দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রত-ক্রিয়ার দ্বিতীয় পালা বা দ্বিতীয় দৃশ্য  
আরম্ভ হল;—বনজঙ্গলে ঘেরা কাঁটা-পর্বত,  
অন্ধকার রাত্রি, দূরে নানা জন্তু ও সমুদ্রের  
গর্জন শোনা যাচ্ছে।

(মেয়ে সভয়ে) —

বনের বাঘ! বনের মোষ!  
তোমরা নিওনা আমার বাপ-ভায়ের দোষ।

(সুক্লপে কাঁদিতে কাঁদিতে) —

বাপ-ভাই গেছেন কোন্‌ ব্রজে?  
সোয়ামি-স্বপ্তর গেছেন কোন্‌ ব্রজে?

(বনদেবী আশ্বাস দিয়া) —

তারা গেছেন একপথে,  
ফিরে আসবেন আর-পথে।

উদয়-গিরিশিখরে সূর্য্যোদয়ের আভা  
‘লাগলো; উদয়-গিরিকে ফুল-দিয়ে পূজো  
কোরে

(সকলে) —

কাঁটার পর্বত! সোনার চূড়া! উদয়গিরি!  
তোমাতে যে পূজ্যাম স্তম্ভলে,  
আস্থন তাঁরা আপন বাড়ি।

(বনদেবী প্রসন্ন সাক্ষে) —

তোমার হোক সোনার পিড়ি।

সূর্য্যোদয়ের আলোর মধ্যে জোড়া-ছত্র  
মাথায় দ্বৈনরাত্রি শরৎ-বর্ষার দুই নোকোয় পা  
রেখে সমুদ্রের উপরে ভাঙলীর আবির্ভাব।

(সাগরের গান)

সাত-সমুদ্রে বাতাস খেলে,  
কোন্‌ সমুদ্রে ঢেউ তুলে!

(বনদেবী সাগরের প্রতি) —

সাগর! সাগর! বন্দি।

(মেয়ে) —

তোমার সঙ্গে সাক্ষি।

(সাগরকে ঘিরিয়া সকলে) —

ভাই গেছেন বাণিজ্যে,  
বাপ গেছেন বাণিজ্যে,  
সোয়ামি গেছেন বাণিজ্যে।

(আকাশ-বাণী)

ফিরে আসবেন আজ,  
ফিরে আসবেন আজ,  
ফিরে আসবেন আজ।

(সকলে মিলিয়া নমস্কার) —

জোড়-জোড়-জোড় সোনার ছত্র  
জোড়নোকায় পা।

আসতে-যেতে কুশল করবেন

ভাঙলী-মা।

### তৃতীয় দৃশ্য

গ্রামের মধ্যে ভাঙলী-অস্থানীয়ের তৃতীয় দৃশ্য  
বা পালা আরম্ভ হল;—ভাদ্রের শেষদিন, মতুন  
শরতের সকাল ঘুমন্ত-গ্রামখানির উপরে এসে  
পড়েছে, মেয়েদের খিড়কির পুকুর কানায়-  
কানায় পরিপূর্ণ, তারি উপরে সোনার রোদ

‘কৃষ্ণমকু’ হইছে, পুকুরের পাড়ে জোড়া তাল-  
গাছ। তাতে বাবুই-পাখীর বাসা।

( বাবুই-পাখী গাহছে )—

পুঁটি! পুঁটি! উঠে চা’।

ভাঙলা মায়ে বর দিল

ঘাটে এল সপ্ত না’।

কুটীরের কাঁপ থলে, নৌকো-ঘরণের ডালা  
হাতে সব মেয়ে-বৌ একে-একে বাহির হইছে।

( বাড়ি পড়্‌সা )—

পড়্‌সা লো পড়্‌সা!

তাল-তাল পরমায়ু, তালের আগে চৌখ!

ঘাটে এসে ডঙ্কা দেয় কোন্ বাড়ার নৌক?

( মেয়েরা, বোঁরা )—

আমার বাড়ির নৌক, আমার বাড়ির নৌক!

দূরে ডঙ্কা পড়্‌লে একদল বাবুই কিচমিচ্  
করে বাসা ছেড়ে উড়লো।

( মেয়েরা সকলে )—

বাবুই বাসা দল দল!

নৌকা ব’রতে ঘাটে চল, ঘাটে চল!

[ প্রস্থান ]

চতুর্থ দৃশ্য

সকালবেলার নদীতীরে ভাঙলীর পালা  
শাঙ্গ হইছে;—গঙ্গার অনেক-দূরে-দূরে ঘর-  
মুখো নৌকো, সাদা-সাদা পালঙালি দেখা  
দিয়েছে। কতকগুলি নৌকো পরের পর  
এসে ঘাটে লাগল, ষাট্রী ওঠা-নাবার, নৌকো  
ভেড়াবার কোলাহল; প্রবাসীরা সব পৌটীলা-  
পুটীলী নিয়ে ডাঙায় নাম্‌ছে।

( মেয়েরা নৌকাবরণ কোরে )—

এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে চন্দন দিলাম,

বাপ পেলাম, বাপের নন্দন পেলাম!

এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে সিন্দূর দিলাম,

বাপ-ভাইয়ের দশন পেলাম।

( বোঁরা স্নেহে কল্যাবৌ ও কুল হত্যাাদ  
ভাসাইয়া )—

কলার কাঁদ! কলার কাঁদ!

তোমাকে দিলাম গঙ্গায়,

আমরা গিয়া রাদি।

( ষাট্রী ও নাবিকদের গান )

একুল ওকুল উজান ভাটি,

নামলাম এসে আপন মাটি।

এক নৌকা চড়ায় লাগালাম,

এক নৌকা ছাড়লাম।

ব্রজে যাই, বাণিজ্যে যাই,

সকল নৌকা পেলাম।

( হুতো দারিয়া সকলকে ধারিয়া মেয়েরা )—

দিক্ দিক্ সকল দিক্

সকল দিকেই বাসুন।

ব্রজে হোক বাণিজ্যে হোক্

দেবতায় বেধে রাখুন।

[ গায়ে নামাবলী কোলাকুলি হাতে

গ্রামের আচাংগ্যর প্রবেশ ]

( আচাংগ্য )—

নম নম ভাঙলীদেবী হস্তের খাড়াড়ি

বছর বছর রক্ষা কোরো এতীর পুরী।

[ যবনিকা ]

যার যে-কথাটি এবং ফ্রিয়াটি কেবল  
সেইটুকু নির্দিষ্ট করা এবং প্রত্যেক দৃশ্যের  
গোড়ায় ষা-যা আল্পনা দেওয়া হয় সেইগুলি  
একটু বর্ণনা করে দেওয়া ছাড়া, ছড়াগুলির  
সংস্থানে আমি কিছুমাত্র উল্টোপাল্টা করিনি;  
অথচ কেমন সহজে আপনি এর নাট্য-অংশটা

বেরিয়ে এল! এই ব্রতের প্রত্যেক ছড়া, ঘটনা-স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে আপনিষ্ট এক-এক অঙ্গে ভাগ হয়ে রয়েছে দেখি। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘরের লোকেরা সন্ধান করছে, যারা বাহরে গেছে তাদের নিরাপদে দেশে আসার প্রতীক্ষা করছে, কামনা করছে। এটি প্রতীক্ষা ও বিরহের অঙ্গ। তৃতীয়, চতুর্থ দৃশ্য হল মিশনের;—নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ছে, পণে-ঘাটে আনন্দ। এটাকে একটা মহানটক বলা চলে না কিং নাট্যকলার অঙ্গুর যে এখানে দেখছি সেটা নিশ্চয়।

ছেলে-ভুলোনো ছড়া একটিনা ভাব, দৃশ্য বা ঘটনা নিয়ে যেমন কোরে সেটাকে বর্ণন করে, ভাঙলী-ব্রতের ছড়াগুলি তো জিনিষটাকে আমাদের সামনে তেমন কোরে উপস্থিত করছেন! ছেলেভুলোনো ছড়া, যেমন—

ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুমের বাড়ী এস,  
সেজ নেই, মাহুর নেই, পুঁটুর চোখে বস।  
ডিবে ভরে পান দেব গাল ভরে খেও,  
ঝড়কি-হুয়ার খুলে দেব ফুড়ং করে যেও।

কিথা যেমন—

আঁটুল-বাঁটুল-গ্রামলা-সাঁটুল  
গ্রামলা গেছে হাটে,  
গ্রামলাদের মেয়েগুলি  
পথে বসে কাঁদে!

আবার যেমন—

ইক্‌ড়িম্‌ক্‌ড়ি চাম্‌চিক্‌ড়ি  
চাম্‌কাটা মজুমদার  
খেয়ে এলো দামুদার  
দামুদার ছুতোরের পো  
হিঙল গাছে বেঁধে থো।

এবং—

ভাতে পড়ল মাটি

কোদাল দিয়ে চাঁচি হত্যা।

এগুলোর মধ্যে ওঠা-বসা, চলা ফেরা, মাসি, পিসি, মজুমদার, দামুদার, ছুতোরের পো—এমনি নানা ঘটনা, নানা পাত্রপাত্রা যথেষ্ট রয়েছে; কিন্তু এদের নিয়ে অভিনয় বা নাটক করা চলে না। কিন্তু ভাঙলীর অল্পটান গাছ-পালার মধ্যে, নহতো ঠেঙে সিন্‌ খাটিয়ে একদিন লোককে দেখিয়ে দেওয়া চলে।

ভাঙলী-ব্রতের মতো আরো ব্রত রয়েছে যার ছড়াগুলি আলাদা-আলাদা টুকরো-টুকরো জিনিস নয় কিন্তু একটি সমগ্র পদার্থ, পুরো একটি নাটক!—যদিও খুব ছোটো!—ছবি ও ছড়া আঁকায় ও অভিনয়ে একটুখান। এই সব ছড়ায় নানা রসের সমাবেশ দেখা যায়,—শুধু কামনাটুকু জানানো এই-সব ছড়ার উদ্দেশ্যও নয়। দুই রকমের দুটি ব্রত পাশাপাশি রাখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। একশ্রেণীর ছড়া কামনাকে স্বর দিচ্ছে—স্বর দিচ্ছে না; কিং মনের আবেগের অনুরণনও তার মধ্যে নেই। এই ভাবের ছড়া দিয়ে মেয়েদের এই সঁজুতী ব্রতটি গাঁথা হয়েছে। সঁজুতী খুব একটি বড় ব্রত। “সকল ব্রত কল্লেন ধনি, বাকি রইল সঁজ-সুঁজনী।” এই ব্রতটিতে প্রায় চল্লিশ রকমের জিনিষ আল্পনা দিয়ে লিখতে হয় এবং তার প্রত্যেকটিতে ফুল ধরে এক-একটি ছড়া বলতে হয়। কিন্তু ছড়াগুলি সব টুকরো-টুকরো। কেবল কামনা জানানো ছাড়া আর কিছু পাইনে, যেমন—

সাঁওতাল সৈজুতি ৯৯

ঘোল ঘরে ঘোল ব্রতী ;  
তার একঘরে আমি ব্রতী ।  
ব্রতী হয়ে মাগলাম বর—  
ধনে পুত্রে পুরুষ বাপ-মার ঘর ।

( দোলায় ফুল ধরে )—

বাপের বাড়ির দোলাখান  
শুভর বাড়ি যায় ।  
আসতে-যেতে হই জনে  
দ্বত মধু খায় ।

( বেগুনপাতার ফুল ধরে )—

বেগুনপাতা ঢোলা-ঢোলা  
মার কোলে সোনার তোলা ।

( এমনি প্রত্যেক জিনিষে ফুল ধরে )—

মাকড়সা, মাকড়সা, চিত্রের কোঁটা ।  
মা যেন বিষয় চাঁদপানা বেটা ।  
গুরো গাছ ! কাঁকুনী গাছ !  
বুঠে ধরি মাজা ।  
বাপ হয়েছেন রাজ্যেশ্বর,  
ভাই হয়েছেন রাজা ।  
শর, শর, শর !  
আমার ভাই গায়ের বর ।  
বেণা, বেণা, বেণা !  
আমার ভাই চাঁদের কোণা ।  
আম-কাঁটালের পিঁড়িখানি  
তেল কুচ্ কুচ্ করে ।  
আমার ভাই অমুক যে  
সেই বসতে পারে ।  
বাঁশের কোঁড়া ! শালের চোঁড়া ।  
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘা,  
আমি যেন হই রাজার ঝি ।  
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘো,

আমি যেন হই রাজার বো ।  
কোঁড়ার মাথায় ঢালি পানি,  
আমি যেন হই রাজার রাণী ।  
কুলগাছ, কুলগাছ, কোঁড়া !  
সতীন বেটি মেকুড়ি ।  
ময়না, ময়না, ময়না !  
সতীন যেন ময়না ।  
হাতা, হাতা, হাতা !  
পা সতানের মাথা ।  
বোড়, বোড়, বোড়ি !  
সতীন মাগি টেরী ।  
পাপা, পাপা, পাপা !  
সতীন মাগা মরতে যাচ্ছে  
ছাদে উঠে দোঁপ ।  
বাঁট, বাঁট, বাঁটি !  
সতানের শ্রাজ্জে কুটনো কুটি ।  
অসৎ কেটে বসৎ কারি,  
সতীন কেটে আলতা পারি ।  
চড়ারে, চড়ারে, এবার বড় বান,  
উচু করে বাপবো মাচা,  
বসে দেখবো দান ।  
ওই আসছে টাকার ছালা,  
গাই গুলতে গেল বেলা ।  
ওই আসছে দানের ছালা,  
তাই মাপতে গেল বেলা ।  
কেন্দ্রে নাতি এত রাতি ?  
কাদায় পড়িল ছাতা,  
তাই তুলতে এত রাতি ?  
এস নাতি, বস খাটে,  
পা ধোওগে গড়ের মাঠে ।  
সোনার ভেঁটা দেব হাতে,  
খেল সবে পথে পথে ।

গঙ্গা-বনুনা জুড়ি হয়ে,  
সাত-ভেয়ের বোন হয়ে,  
সাবিহা সমান হয়ে,  
গঙ্গাবনুনা পূজান,  
সোনার থালে ভুজান।  
চন্দ্রহর্যা পূজান,  
সোনার থালে ভুজান।  
সোনার থালে ক্ষিরের লাড়,  
শঙ্খের উপর স্বর্ণের লাড়,  
অরুণঠাকুর বরণে,  
ফুল দুটেছে চরণে।  
যখন ঠাকুর বর দেন,  
আপনাব ফুল কাড়িয়ে নেন।

ইত্যাদি—

এইবার মাঘ-মণ্ডল ত্রতটি কেমন তা  
দেখি। পৌষের সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ হয়ে  
মাঘের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ত্রত চলে। এই  
ত্রতের ছড়া দেখি তিন-অঙ্কে ভাগ করা  
রয়েছে। প্রথম, শীতের কুয়াশা ভেঙে  
সূর্যের উদয় বা শীতের পরাক্ষয় ও সূর্যের  
অস্ত্যাদয়। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে মধুমাসের  
চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিয়ে, শেষ অংশে  
বসন্তের জন্ম ও মাটির সঙ্গে ঠার পরিণয়।  
প্রথম দৃশ্যপট উঠলো—

প্রথম দৃশ্য

শীতের শেষ রাত্রি, কুয়াশা তখনো ঘন  
হয়ে চারিদিক ঢেকে রয়েছে, রাত্রে ফুল-  
ছুটি শিশিরের ভায়ে একেবারে জলের  
ধারে ঝুঁকে পড়েছে, একটুখানি বাতাসে  
ঘাসের শীষগুলি ঢলে-ঢলে সেই ফুলছুটির  
সঙ্গে দিঘির জল থেকে-থেকে স্পর্শ করতে

লেগেছে। মালিনীর বাগানে ছোটো-ছোটো  
ফুলবালারা আর গ্রামের ত্রতীরা পুকুরের  
পাড়ে সব পা-মেলে ফুলের আগায় পুকুরের  
জল নিশ্চে খেলা করতে লেগেছে।

( ফুলবালারা )—

চোখে-মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে ?

( ফুলেরা )—

ইতল বেতল সুরুয়া সুরুয়া ছুটি ফুল লাগে !

দিঘির ওপার থেকে নাগেশ্বরের মন্দিরের  
মালী প্রশ্ন করছে—“ওপার থেকে জিজ্ঞাসেন  
মালী”—

( মালী )—

বলি, কি কি ফুলে মুখ পাখালি ?

( ফুলেরা )—

ইতল বেতল দুই ফুলে !

সুরুয়া মুরুয়া দুই ফুলে !

( মালী )—

সেই ফুলে খান কি ?

( ফুল )—

নল ভেঙে জল খান ?

(ফুলবালারা, ফুলেরা, ঘাসেরা এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে)—

যে জল ছোঁয়নালো কাকে বগে,

সে জল ছুঁই মোরা দুর্ব্বার আগে !

ত্রতীরা, ফুলবালারা, ফুলেরা সকলে  
আছোঁয়া পুকুরের পরিষ্কার জল মুখে-চোখে  
দিচ্ছে ; সাক্ষি-হাতে মালিনীর প্রবেশ এবং  
এই কাণ্ড দেখে মালিনীর রক্তভঙ্গ ও উচ্চ  
হাস্ত।

ফুলের গন্ধজল পুকুরেতে ভাসে,

তাই দেখে মেলেনীটা ষটখটাটয়া হাসে।

হেসে যে মালিনী কি বলছে তা পরের  
উত্তর-প্রত্যুত্তর থেকে বেশ এঁচে নেওয়া যায়।

মালিনী বলল—যেন—একি কী একি ? আজ  
বড় “ফুলের গন্ধজল পুকুরেতে ভাসে।”  
মো এই শীতের রাত না পোতাতে গেবন্তর  
মেয়ে তোমরা এই আঘাটায় কেন গো ?

( মেয়েরা )—

হাসিস্নানালো, পুসিস্নানালো,  
ভূঁই তো আমার সহ !

মাঘ-মণ্ডলের বর্ষ করুন্ম,  
ঘাট পায় কৈ ?

( মালিনী )—

আছে আছেলো ঘাট, বামুনবাড়ির ঘাট !

( মেয়েরা )—

এত পোচালে বামুনগো পৈতে-ধোওনের ঠাট।

সেখানে আমরা যাবনা মালিনী, জল  
পালো নয়—“পৈতা-কচলানো জল পুকুরেতে  
ভাসে।”

( মালিনী )—

আছে আছেলো ঘাট, গোয়ালবাড়ির ঘাট !

( মেয়েরা )

গয়লাগো দই-কিরের হাঁড়-ধোওনের ঠাট।

( মালিনী )—

নাপিতবাড়ির ঘাট ?

( মেয়েরা )—

নাপিতগো খুর-ধোওনের ঠাট।

( মালিনী )—

ধোপাবাড়ির ঘাট ?

( মেয়েরা )—

ধোবাগো কাপড়-ধোওনের ঠাট !

( মালিনী )—

ভূঁইমাটির ঘাট।

( মেয়েরা )—

ভূঁইমাটিগো কোদাল-ধোওনের ঠাট !

( মালিনী হাসিয়া )—

মেলেনী-বুড়ির ঘাট ?

( মেয়েরা )—

মেলেনী-বুড়ির ফল ধোওনের ঠাট !

( গান )

মালী— আদা-পাঙ্গ কড়িবিষ্টি,  
আদা-পাঙ্গ মালী,

মদা-পাঙ্গ পড়ে রয়েছে

কৈত-ফুলের ডাল।

মেয়েরা—কৈ যাসলো মালিনী

ফুলের সাজ লৈয়া ?

মালিনী—ফুল কুটেছে নানা রকম

ডাল পড়েছে সুইয়া।

সকলে—আগের ফুল কলিস্নানালো

কলি-কলি !

গোড়ের ফুল কলিস্নানালো

বালি-বালি !

মালিনী—মধোর ফুল কুচলা আনিস

নাগেশ্বরের মালী।

নাগেশ্বরের মালীকে !

কোন্ কোন্ ডালে রাঁধিলি বাড়িলি ?

কোন্ কোন্ ডালে খাইলি-লইলি ?

কোন্ কোন্ ডালে নিশিপোতাছিলি ?

মালী—কইতের ডালে রাঁধিলাম-বাড়িলাম,

অতসার ডালে খাইলাম-লইলাম,

গাঁদার ডালে নিশিপোতালাম !

সকলে—কইত-পাঙ্গকে ডাল নামাইয়া দে,

সুখি-ঠাকুর চাইছেন ফল

সাজাইয়া দে।

এইখানে ফুল-তোলায় পালা সাজ হয়ে

দ্বিতীয় পালা আরম্ভ হল—কুয়াশার মধ্যে

একটি ফলগাছের সামনে।



## দ্বিতীয় দৃশ্য

( মেয়েরা বেতলতা হাতে )

কুয়া ভাঙ্গু, কুয়া ভাঙ্গু, বেতলতার আগে ।  
সকল কুয়া গেল ওই বরই গাছটির আগে ।  
ওরে রে বরই গাছ, কুলন দে !  
দে দে বরইরে, কুলন দে !

বেতলতার আগে জল ছিটাইয়া কুয়াশা  
ভাঙার অভিনয়। সকলে মিলিয়া তার পরে  
সূর্যের স্তব ।

( মেয়েরা )—

উঠ উঠ সূর্যঠাকুর ঝিকঝিক দিয়া !

( সূর্য )—

না উঠিতে পারি আমি ইয়লের\* লাগিয়া ।

( মেয়েরা পরস্পরে )—

ইয়লের পঞ্চকেটি শিরে থুইয়া

উঠিবেন সূর্য কোন্থান দিয়া ?

( মালিনী )—

উঠিবেন সূর্য বাসুন-বাড়ির ঘাটখান দিয়া !

( মেয়েরা )—

উঠ উঠ সূর্যঠাকুর ঝিকঝিক দিয়া ।

( সূর্য )—

না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া ।

( মেয়েরা )—

উঠিবেন সূর্য কোন্থান দিয়া ?

( মালিনী )—

গোয়াল-বাড়ির ঘাটখান দিয়া ।

এমনি কত ঘাটেরই নাম হল কিন্তু  
কোনো ঘাটেই সূর্য উদয় হলেন না । শেষে  
বুড়ি মালিনীর ঘাট, যেখানে ফুলের গন্ধ-  
জল পুকুরেতে ভাসছে সেইখানে সূর্যোদয়

\* শিল্পের

হল—কুয়াসা কেটে । এইবারে মধুমাসের  
চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিয়ের পালা আরম্ভ  
হল ।

প্রথম দৃশ্য

বাসর-ঘরে চন্দ্রকলা ও সূর্য্য। কুণ্ডের নদে  
সকাল হুচে ।

( চন্দ্রকলা সনিখাসে )—

কাউয়্য করে কল্মল ! কোকিলে করে ধ্বনি  
তোমার দেশে যাব সূর্য্য, মা বলিব কারে ?

( সূর্য্য )—

আমার মা তোমার স্বাভা, মা বলিও তারে ।

( চন্দ্রকলা )—

তোমার দেশে যাব সূর্য্য, বাপ বলিব কারে ?

( সূর্য্য )—

আমার বাপ তোমার শশুর, বাপ বলিও তারে ।

( চন্দ্রকলা )

তোমার দেশে যাব সূর্য্য, বইন বলিব কারে ?

( সূর্য্য )—

আমার বোন তোমার ননদ, বইন বলিও তারে ।

( চন্দ্রকলা )—

তোমার দেশে যাব সূর্য্য, ভাই বলিব কারে ?

( সূর্য্য )—

আমায় ভাই তোমার দেওর, ভাই বলিও তারে ।

( চন্দ্রকলা সনিখাসে )—

কাউয়্য করে কল্মল ! কোকিলে করে ধ্বনি ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

( সূর্য্যের বাড়ির সম্মুখ, বৈতালিকের গান )

চন্দ্রকলা মাধবের কন্ঠা মেলিয়া দিছেন কেশ,

তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর ফিরেন নানা দেশ ।

চন্দ্রকলা মাধবের কন্ঠা মেলিয়া দিছেন সাড়ি,

তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর ফিরেন বাড়ি-বাড়ি ।

চন্দ্রকলা মাদবের কণ্ঠা গেল খড়্‌য়া পায়,  
তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর বিয়া করতে চায়।

( পড়সা )—

বিয়া করলেন সূর্য্য ঠাকুর  
দানে পাইলেন কি ?

( বৈতালিক )—

হাতিও পাইলেন, ঘোড়াও পাইলেন  
আর মাধবের ঝি।

খাট পাইলেন, জাজিম পাইলেন  
আর মাধবের ঝি।

লেপ পাইলেন, তোমক পাইলেন,  
ঘটি পাইলেন, বাটি পাইলেন,  
খালা পাইলেন, খোরা পাইলেন,  
আর মাধবের ঝি।

( পড়সা )—

মাগের জন্তু আনছেন কি ?

( বৈতালিক )—

শাঁখা সিঁহর !

( পড়সী )—

বাপের জন্তু আনছেন কি ?

( বৈতালিক )—

হাতি ঘোড়া !

( পড়সী )—

বৈনের জন্তু আনছেন কি ?

( বৈতালিক )—

খেলানের সাজি।

( গোরী বা সন্ধ্যা—সূর্য্যের আশের স্ত্রীকে  
দেখিয়া চুপি চুপি )

( পড়সা )—

সতের জন্তু আনছেন কি ?

( বৈতালিক )

কুইয়া পুটি !

( গোরী )—

খামুনা গো খামুনা গো, শিয়রে খুম।

রাওখান পেহাফলে কাউয়ারে দিমু।

( শাঁখ বাজাইয়া, উলু দিয়া, কনে-বরণের  
ডালা হত্যাদি লহয়া একদল মেয়ের প্রবেশ। )

( মেয়েরা )—

উরু উরু দেখা যায় বড়-বড় বাড়ি।

ঐয়ে দেখা যায় সূর্য্যের মার বাড়ি।

( সূর্য্যের মার বাড়ির দরজায় গিয়া )—

সূর্য্যের মা\* লো কি কর হুয়ারে বসিয়া ?

তোমার সূর্য্য আসতেছেন জোড় বোড়ায় চাপিয়া

( সূর্য্যের মা )—

আসবেন সূর্য্য এসবেন খাটে,

নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে,

গা হেলাবেন সোনার খাটে,

পা মেলাবেন রূপার পাটে,

ভাত খাইবেন সোনার থালে,

বেগুন খাইবেন রূপার বাটতে,

আঁচাইবেন ডাবর ভরা,

পান খাইবেন বিড়া বিড়া,

সুপারী খাইবেন ছড়া ছড়া,

খয়ের খাইবেন ঢাকা ঢাকা,

চুন খাইবেন পুটুরা ভরা,

পিক্‌ কেলাইবেন লাদা লাদা !

বরবেশে সূর্য্য চন্দ্রকলা-বধুকে লহয়া

জাঁকজমকে আপনার পুরীতে প্রবেশ  
করেন।

( নট-নটীর নৃত্যগীত )

নট—সোনার বাটি কুমুর-কুমুর

মিষ্টি বাটির তৈল ।

তাৎ লহয়' সূর্য্যঠাকুর

নাহতে গেলেন কৈলো ।

নাহয়-বুহুয়া বাটি খুইলেন কৈলো ॥

নটী—বাটি বাটি কুমার খাটি,

সকল পুড়িয়া গেল ।

লক্ষটাকার বাটি আমার

হারাইয়া গে-

নট—গেছে গেছে হই বাটি

আপদ-পাগাই নিয়া ।

আরেক বাটি গড়াম-নে

চাকা সোনা দিয়' ।

উভয়ে—সোনার বাটি কুমুরকুমুর

মিষ্টি বাটির তৈল ।

তৃতীয় দৃশ্য

সূর্য্যের অন্তঃপুর । সূর্য্যের বাপ-মা এবং  
ভাই-ভগিনী খুড়ো-খুড়ি ও ভাগ্যরী সিক্‌দার  
যে যার-সাজে । কেউ শুয়ে, কেউ বসে ।  
এদিকে, ওদিকে বিয়ের দান-সামগ্রী  
ছড়ানো । চন্দ্রকলার দেশ থেকে সবার জন্ত  
উপহার এসেছে, কেবল সূর্য্যের বড়-স্ত্রী গোরী  
বা সন্ধ্যা কিছু না পেয়ে চোখ মুছতে-  
মুছতে সূর্য্যের ধাইমার কাছে গিয়ে বাপের  
বাড়ি যাবার জন্ত বলছেন ।

( গোরী )—

‘আগা’টনৌ পানবাটনৌ ধাই-স্বাশুড়ি গো ।

আমারে নি নাইয়র দিবা ? \*

আমারে নি নাইয়র দিবা ?

নাইয়র দেওয়া=বাপের বাড়ী পাঠানো ।

( ধাই )—

কি জানি, কি জানি বউ গো,

জানি গিয়া তোমার স্বস্তরের ঠাই ।

( গোরী )—

বাড়ির কস্তী স্বস্তর-ঠাকুর গো !

আমারে নি নাইয়র দিবা ?

আমারে নি নাইয়র দিবা ?

( স্বস্তর )—

কি জানি, কি জানি বউ গো,

জানি গিয়া তোমার স্বাশুড়ীর ঠাই ।

( গোরী )—

বাড়ির গিন্নি স্বাশুড়ী ঠাকুরাণী গো,

আমারে নি নাইয়র দিবা ?

( স্বাশুড়ী )—

কি জানি, জানি নন্যশের ঠাই ।

( গোরী )—

আনাঙ্গ-তরকারি-কুটনৌ নন্যশ-ঠাকুরাণী গো—

( নন্যশ )

জি জানি, জানি দেওয়ার ঠাই ।

( গোরী )

লেখইয়া পড়ইয়া দেওয়ার গো—

( দেওয়ার )—

জানি সিক্‌দারের ঠাই ।

( গোরী )

আড়লের ভাঁড়লের কস্তী সিক্‌দার হে—

( সিক্‌দার টাকে হাত বুলাইয়া )—

জানি তোমার সোয়ামীর ঠাই ।

( গোরী সূর্য্যের কাছে গিয়া )—

ঘরগৃহস্থী সোয়ামী হে !

আমারে নি নাইয়র দিবা ?

আমারে নি নাইয়র দিবা ?

( সূর্য্য ঝুগিয়া )—

খানব চিকন্ চাউমেব চড়া \*

ভাউব গোড়া নাইয়ের ঘড়া।

এইখানে সূর্য্যের পুত্র লাউলের পাশা  
আশ্রয় হল—“রাওল বা সূর্য্য-পুত্র ঋতুরাজের  
বিদেহ”। রাতুল থেকে ও লাউল কলাটি আসা  
সম্ভব।

প্রথম দৃশ্য—ঋতুরাজ রাওলের সঙ্গে  
মাটির কলা হালানালার বিয়ের আয়োজন  
চলছে। সকলে নানা আয়োজনে বাস্তব;  
সূর্য্যের বাপ হুকো-হাতে ঢালা বাধাতে বাস্তব।  
বাঁশ দড়ি বড় ইত্যাদি চারিদিকে ছড়ানো।  
লোকজন, বরানামা কাকের একটু অবসরে  
হাঁড়ি বাজিয়ে গান ধরেছে—

( গান )

কাউয়া বলে কা,

রাত পোহাইয়া বা !

হাড়ি পাতিলা চুকুর-চুকুর কলসার কাঁদা,

আজ লাউলের বড় বাড়ি বাধা।

হাড়ি পাতিলা চুকুর-চুকুর কলসার কাঁদা,

আজ লাউলের কলাবাগান বাঁধা।

হাড়ি পাতিলা চুকুর-চুকুর কলসার কাঁদা,

বড় বাড়ি বাধা।

কলাবাগান বাঁধা।

কাউয়া বলে কা,

রাত পোহাইয়া বা !

( কাদা-মাটির ঝড়ি মাথায় একদল মালি-

মালিনীর প্রবেশ ) • • •

• কাদা মাটির তলেলা কাদামাটি,

তাতে ফেলাইলাম কাঁঠালপানি,

কাঁঠালের আগে গোড়া লাগানি,

তাতে বসাইলাম বামুনগাতি।

• দরক-ব্রাহ্মণের প্রবেশ •

( ব্রাহ্মণকে হুকো দিয়া সূর্য্যের বাপ )—

বামুন ভাইয়া, বামুন ভাইয়া,

ভাউনা তামুক খাইও।

আমার লাউয়ের বিহার সময়,

ফুল ময় পাড়িও।

( হাড়ি পাতিলা লইয়া কুমোদের প্রবেশ )

( সূর্য্যের বাপ )—

কুমার ভাইয়া, কুমার ভাইয়া,

ভাউনা তামুক খাইও।

আমার লাউয়ের বিহার সময়

হাড়ি পাতিলা দাও।

( দোপা, নাপিত, গোয়াল প্রভৃতির প্রবেশ। )

( সূর্য্যের বাপ )—

ভাউনা তামুক খাইও,

ভাউনা তামুক খাইও !

দ্বিতীয় দৃশ্য—লাউলের বিয়ের ভোজ।  
অন্দর-বাড়িতে রন্ধনশালায় সূর্য্য পুরে-পুরে  
উদারক কচ্ছেন—গামছা মাথায়। জেলে  
সঙ্গে সিদ্ধারের প্রবেশ।

( সিদ্ধার )—

সূর্য্যগো, পুকুরে ফেলাইলাম জাল,

তাতে উত্তিলনা কিছু নাছ।

( জেলেনীদের মাছ লইয়া প্রবেশ )

জেলেনীরা—উঠলো গো, উঠলো মাছ।

সিদ্ধার—নিবে কে ?

ଦେଖେନୀ—ଓହଁ ଆସଛି ବାସୁନ-ମେରେ  
ପାଳୁଡ଼ ହାତେ କରେ ।

( ମେରେରା ପାଳୁଡ଼ ଭାରିଆ ମାତ ଖୁଇଁଲ,  
ସିକଦାର—ନିଲାମ ଲୋ, ନିଲାମ ଲୋ !  
ମାଛ କୋଟେ କେ ?

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ—ଓହଁ ଆସଛି ମାଛକୁଟୁନୀ  
ବଢ଼ି ହାତେ କରେ ।

( ମାଛକୁଟୁନୀ ମାଛ କୁଟିତେ ବାସିଆ ଗେଲ )  
ସିକଦାର—କୁଟଲାମ ଲୋ କୁଟଲାମ !  
ମାଛ ଦୋସ କେ ?

ମାଛକୁଟୁନୀ—ଓହଁ ସେ ଆସେ ଦୋସନୀ  
ଦାଢ଼ି ହାତେ କରେ ।

( ଦୋସନୀ ମାଛ ଖୁଇଁତେ ଲାଗିଲ )  
ସିକଦାର—ଫୁଲାମ ଲୋ ଫୁଲାମ !  
ମାଛ ରାବେ କେ ?

ମାଛାଦୋସନୀ—ଓହଁ ସେ ଆସେ ରାଧୁନୀ  
ଆଘୁନ ହାତେ କରେ ।

( ରାଧୁନୀର ରାଧା ଆରମ୍ଭ )

ସିକଦାର ରାସ୍ତାର ଘୋରାତେ ଚୋଷ ଖୁଞ୍ଚିଆ, ନାକ ଟିକାହିଁଆ  
—ଝାଡ଼ିବେ କେ ?

ରାଧୁନୀ—ଓହଁ ଆସଛି ଝାଉନୀ  
ଘାଲା ହାତେ କରେ !

( ସକଳେ ଝାଡ଼ିତେ ବାସିଆ ଗେଲ )

ସିକଦାର (ସନିଆସେ)—ଏଁଟୋ ନେବେ କେ ?  
ଝାଉନୀ—ଓହଁ ଆସଛି ଏଁଟୋ-ନେଓନୀ  
ଗୋବର ହାତେ କରେ !

ସିକଦାର ଚଢ଼ିଆ ସକଳକେ ଧାକ୍କା-ଧୋକା ଦିଆ—  
ସା ନେଓନି, ମାଛକୁଟୁନି, ଆଶାଦୋସନୀ,  
ମାଛରାଧୁନୀ, ଭାତଧାଓନୀ, ପାତକୁଢ଼ୋନି ସା ।

( ସିକଦାରୀ )—

ଆମରା ନିମୋ, ଧୁମୋ, ରାଧାମୋ,  
କୁଟମୋ,ବାମୋ, କେଲ୍‌ମୋ, ସେମନ-ତେମନ କୈରା !

ବାସୁ ଚନ୍ଦ୍ରା ଧୂସର ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ।

( ବାସ )—

ପାନ ଦିବେ କେ ?  
ସିକଦାର—ଓହଁ ଆସଛି ପାନ-ଧାନ୍ୟନୀ  
ଢିବା ହାତେ କରେ ।

ବାସ— ବିଛାନା ପାତିବେ କେ ?  
ସିକଦାର—ଓହଁ ଆସଛି ବିଛାନା-ପାତୁନି  
ତୋଷକ ହାତେ କରେ ।

ସିକଦାରୀ—ହୁଏବେ କେ ?  
—ଓହଁ ଆସଛି ଶୁଶ୍ରୂଣୀ ବାସିସ  
ହାତେ କରେ ।

ସିକଦାର—ରାତ-ପୋହାରିବେ କେ ?  
—ଓହଁ ଆସଛି ରାତ-ପୋହାନୀ  
କାଉଁରା ହାତେ !

( ଗାନ )

କାଉଁରା ବଲେ କା !  
ରାତ ପୋଷାହିଁଆ ସା !

ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ—ହାଲା-ମାଲାର ବାଢ଼ି, ଛାଦନା-  
ତଲାସ୍ ଏକଦଳ ଜୀ ଓ ପୁରୁଷ ବରବେଣୀ ଲାଉଲକେ  
ଆର ହାଲା-ମାଲାକେ ଲୁହାଁ । ସକଳେ ଦୁଃଖ  
ଛିଟାହିତେ ଛିଟାହିତେ—

ଏପାରେ ଲାଉଲ, ଓପାରେ ଲାଉଲ,  
କିସେର ବାସ୍ତ ବାଞ୍ଜେ ?

ରାଜାର ବେଟା ସଓଦାଗର  
ବିସ୍ତେ କରେଟେ ମାଞ୍ଜେ ।

ମାଞ୍ଜୋ ମାଞ୍ଜସ୍ତି ଲାଉଲ  
ମାଥାସ୍ ଧୁକୁଟ ଦିଆ ।

ଧରେ ଆଛି ରାଜାର କନ୍ତା  
ତୁହିଲା ଦିବ ବିନ୍ଦା ।

ମାଞ୍ଜ ମାଞ୍ଜସ୍ତି ଲାଉଲ  
ପାସେ ନେପୁର ଦିଆ ।

যবে আছে সুন্দরী কন্যা

তুইলা দিব বিয়া ।

( কুল ছিটাইয়া গান )

আমের বইল আসে লো লোলা লোচা ।

আমের বইল আসে গো বারি বারি ।

( মাল-মালিনীর গান )

কুল কহলাম গাঁয় গাঁয়,

সে কুল গেল দখিন গাঁয় ।

মালিনী—দখিন গাইয়া মালারে !

মালা— কুলের ডালা লবিরে ?

মালিনী— হাতে কলসা, কাখে পোলা

কেনে লব কুলের ডালা রে ।

এইখানে মাটির সঙ্গে রায় বা সূর্য্যের  
ছেলে রাবলের ( লাউলের ) বিবাহের ও  
মিলনের পালা শেষ হল । এব পরে ক্ষতরাভ  
পূর্ণবীকে কলে-কলে উদ্ধার করে বিদায়  
হচ্ছেন । মেয়েদের লাউলকে ববে রাখবার  
চেষ্টা ।—

কৈ যাওরে লাউল গামছা মুড়ি দিয়া ?

তোমার ঘরে ছেইলা হুইছে

বাজনা জানাও গিয়া ।

দোপা জানাও গিয়া,

নাপিত জানাও গিয়া,

পরুইত জানাও গিয়া ।

কিন্তু ক্ষতরাভের তো থাকবার ছো নেই,  
তাকে একলা যেতেই হবে । আবার শীতের  
মধ্যে দিয়ে তিন ফিরবেন—জুই আশ্বাস  
দিলেন এবং মেয়েরা বিদায়-ভাজের আয়োজন  
করে লাউলের ছোটো ভাই শিবাইকে পাও  
কেটে আনতে বলে চাল বুতে বসলো ।

চাউল ধুম, চাউল ধুম.

চাউলের মালো পানি

চাউল ধুইতে পড়লো চাউল,

পাটি বিছাইয়া দলো চাউল

যত বাস্তব্বে আন ।

তারপর আলোচনা তবের জলে লাউলের মালি ।

আলোচানে কাটা ছপে লাউল ছান করে

শস্তর-বাড়া বড় খুইয়া লাউল ভাতে মরে ।

( এদিকে শিবাই কলাপাতা কাটছেন )

মালা— লাউলের বাগানে

কেরে কাটে পাও ?

শিবাই—লাউলের ছোট ভাই

শিবাই কাটে পাও ।

মালা— শিবাই রে, শিবাই রেঃ

না কাটিও পাও

শিবাই—বাচু বাচু কাটুনেন

সবার কলাপ পাও ।

মালা— সবার কলার পাতে নাক

লাউলে খায় পাও ?

বাচু বাচু কাট গিয়া

চানচান কলার পাও !

এদিকে লাউলের বো ডেলেকে ধুম

পাড়িতে বসেছেন—

১

লাউলের ঘরে তেইলা কাচে

কি কি নাম থুম ?

রাম দিয়া তাতে রাম নাম থুম ।

বরহ দিয়া তাতে বলাহ নাম থুম ।

কমলা দিয়া কমলা নাম থুম ।

জল দিয়া জল নাম থুম ।

রাজার বেটা রাজার ছেইলা

রাজা নাম থুম ।

লাউলের ঘরে ছেইলারে

কি কি গয়না দিম ?

হাত জোপা বলয়া দিমু,  
পলা জোপা হার দিমু,  
বুকজোপা পাতি দিমু  
কোমর জোপা সোঁড়া দিমু,  
পাঁপজোপা গুজরা দিমু,  
ভুত চরণ নেপথ্য দিমু,  
লাউলের ছেঁচলা নাচবে,  
গজার রাজা হাসবে।

২

লাউলের ঘরে ছেঁচলালো  
ভদ্র বাহবে কিসে ?  
রাজার বেটা পাশা খেঁচলা  
বাটি জিনিস নিয়ে।  
পাশা খেলিয়া জিনিসাম কড়ি,  
বিনে আনলাম সাপলেশ্বরী,  
কপিলেশ্বরী কিবা খায় ?  
পুকুর-পাড়ে ভুগা খায়।  
ভুগা খাইয়া লো মই শুকাইল ভদ্র,  
কি দিদা পাগুবো মোরা লাউলের ঘরে পুত ?  
লাউলের ঘরে পুত নাগো শক্ত বেড়ার মাটি,  
বহি গো ভাং খেন লোহার কাটি।

লাউলের ছেলেকে ধুম-পাড়িয়ে হালামালা  
একশত বান সঙ্গ জলে নাইতে চলেন।

আসলো শত বহন জলেরে মাই;

জলেরে যাওয়া লো ঝাঞ্জাটি খেলাই।

হাতের শাঁখা, ঢাবা-কড়ি, পায়ের সুপু  
এমনি সব নানা জিনিস জলে ফেনে-ফেনে  
কড়িয়ে খেলা।

খেলতে খেলতে নাগো ভুগুর বেলা।

যখন জল থেকে উঠে এসে লাউলকে  
তার ডাকছে তখন মধুমাস শেষ; ঋতুরাজের  
যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে; তিনি

চলেছেন। বৈশাখের মেঘ দেখা দেয়।  
কড়-বাগাসে লাউলকে আসন দেখান মেয়েরা  
দেখতে দেখতে লোকে ভরা ভরতের একটি  
ডাল ভেঙে পড়েছে।

ভরতের মটকা ডাল লাইয়া পড়লো ঘরে,  
লাউলের ভদ্র ভাঙ ছিঁচি ছিঁচি পড়ে।

তখন মেয়েরা লাউলকে একটু অপেক্ষা  
করে কিছু দিয়ে যেতে বিনতি করছে—

খাও খাও লাউল, গোটা চারি ভাত;

আমর শত বহনে ফেলান-নে পাত।

বৈশাখের মেঘ গর্জন করে উঠলো,  
কড় ভুত বহলো, উৎসবের সাজ সরঞ্জাম লগ্ন  
ভগ্ন করে গরম বাগাসে বুঝে উড়লো, মলিন-  
মুখ মেয়েরা ঋতুরাজকে বিদায় দিলে;—

আজ যাও লাউল,

কাল আসো।

মিতা মিতা দেখা দিও।

বড়ব বড়ব দেখা দিও॥

[ পালা সঙ্গ ]

এই মাঘমাসের রত্নের প্রথম অংশে  
দেখা যাচ্ছে যে 'সূর্য্য য', 'সীকে' সেই-রূপেই  
মানুষে দেখছে এবং বিশ্বাস করছে যে,  
জলের ছিটায় কুয়াসা ভেঙে দিলে সূর্য্য-  
উদয়ের সাহায্য করা হবে। এখানে কামনা  
হল সূর্য্যের অভ্যাস। ক্রিড়াটিও হল কুয়াসা  
ভেঙে দেওয়া ও সূর্য্যকে আহ্বান। দ্বিতীয়  
অংশে সূর্য্যকে দর্শকশ গোলা-খাড়া-  
পায়ে একটি মেয়ে এবং সূর্য্যকে রাজ্য-বর  
এবং সেই সঙ্গে সূর্য্যের মা ও চন্দ্রকলার  
বাপ কলনা করে মানুষের নিজের মনের মধ্যে  
স্বত্ত্ববাড়ি বাপেরবাড়ির যে সব ছবি আছে,  
সূর্য্যের রূপকের ছলে সেইগুলোকে মূর্তি দিয়ে

দেবছে। তৃতীয় অংশে সূর্য্য-পুত্র বা রায়ের পুত্র রাউল বা লাউল, এক-কথায় বসন্তদেব ; চৌপরের আকারে এঁর একটি মূর্ত্তি, মাহুঘে গড়েছে, এবং সেটিকে ফুলে সাজিয়ে মাটির পুতুল হালামালার সঙ্গে বিয়ের খেলা খেলছে। এখানে কল্পনার রাজ্য থেকে একেবারে বাস্তবের রাজ্যে বসন্তকে টেনে এনে, মাটির সঙ্গে এবং ঘরের নিত্যকাজের এবং খুটিনাটির মধ্যে ধরে রাখা হল ; তাকে জামায়ের আদরে খাওয়ানো-দাওয়ানো হলো ; তার ছেলেকে ঘুম-পাড়ানো, দুধ খাওয়ানো, মাহুঘ করে তোলার নানা কাজ। এই পুতুল-খেলা আর-একটু অগ্রসর হলেই মা-যশোদার নীলমণিকে ফোর সর ননী খাওয়ানো ;—“খাওয়ানো সর, মাখানো ননী।” এবং জগন্নাথকে পিচুড়ি-ভোগ রাজভোগ দিয়ে, তাঁর রাজবেশ হস্তীবেশ এমনি নানাবেশ এবং কল্পিতচরণ চন্দনযাত্রা এমনি তাঁর নানা লীলা গড়ে নিয়ে মূর্ত্তি-পূজার পুরো অনুষ্ঠানে দাঁড়ায়।

ভাঙ্গলী-ব্রতটি আমরা দেখলেম বর্ষা—দেখলে ভাসিয়ে দিয়ে বিদায় হচ্ছে, আর শরৎ আসছে—এর একটা উৎসব। মাঘ-মঙাল ব্রতে নীতের কুয়াসা কেটে সূর্য্যের আলোতে ঝলমল বসন্ত দিনগুলি আসছে তারি উৎসব। ড-জামগায়েই মাহুঘের মনের কামনা নাট্য-ক্রিয়ায় আপনাকে ব্যক্ত করলে। এমনি শম্পাতার ব্রত। সেখানে আমরা দেখি মাহুঘ প্রচুর শস্ত্রের কামনা করছে ; কিন্তু সেই কামনা সকল কঁরবার ক্ষেত্রে সে যে নিশ্চেষ্টভাবে কোনো দেবতার কাছে জোড়-হাতে দাও দাও করছে তাও নয় ; সে যে ক্রিয়াটা করছে তাতে সত্যিই ফল ফলিয়ে

যাচ্ছে এবং ফল-ফলার যে আনন্দ সেটা নাচ গান এমনি নানা ক্রিয়ার প্রকাশ কচ্ছে। বক্তমান-অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শম্পাতার ব্রত বা ভাঁজো, ভাদ্রমাসের মছন বগী থেকে আরম্ভ হয়ে পরবর্ত্তী শুক্লা দ্বাদশীতে শেষ হয়। মছন-বগীর পূজাদিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্ত্র—মটর, মুগ, অরহর, কলাই, ছোলা—একটা পাখে ভিজিয়ে রাখা হয় ; পরদিন বগীপূজার এই শুভা নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সরষে এবং হাঁড়-মাটির সঙ্গে মেখে একটি নতুন সরাতে রাখা হয় ; দ্বাদশী পর্য্যন্ত মেয়েরা রান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে ; চার-পাঁচদিন পরে যখন শস্য সব অক্ষুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ বৎসর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য-উৎসবের আয়োজন করে। ইঙ্গ-দ্বাদশীতে এই উৎসব ; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এত অনুষ্ঠান ! নিকোনো বেদীর উপর ইঞ্জের বজ্রি-দেওয়া-আল্পনা ; কোথাও মাটির ইঙ্গ-মূর্ত্তিও থাকে। এই বেদীর চারিদিকে, পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন-আপন শম্পাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয়, তার পর সাত-আট থেকে কুড়ি-পাঁচশ বছরের মেয়েরা হাত-ধরাধরি-করে বেদীর চারিদিক ঘিরে নাচ গান শুরু করে। উঠানের এক অংশে পর্দার আড়ালে বাদ্যকর তাল দিতে থাকে ;—

ভাঁজো লো কল্কলানী, মাটির লো সরা,  
ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চফুলের মালা।  
এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী ঘাঁ।

বছরান্তে একবার ভাঁজো, নাচবো না তো কি ?



এর পর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে-মুখে  
ছড়া-কাটাকাটি করে—

পূর্ণিমার চাঁদ ছেয়ে তেঁতুল হলেন বন্ধ।

গড়ের গুগলী বলে—আমি হব শম্ভ।

ওগো ভাঁজো তুমি কিসের গরব কর ?

আইবুড়ো বেটাছেলের বিয়ে দিতে নার।

সমস্ত রাত্রি দুই দলের নাচ-গান, ছড়া-  
কাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার  
ঝিক্‌মিক্—এই ছবির একটি সুন্দর বর্ণনা  
পদ্মবদনের তারাব্রতে একটি ছড়ায় আমরা  
পাই—

ষোল ষোল বর্তির হাতে ষোল সরা দিয়া,

মোরো যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।

এর পরে রাত্রি শেষ ; মেয়েরা আপন-  
আপন শশপাতার সরা মাথায় নিয়ে পুকুরে  
কিছা নদীতে বিসর্জন দিয়ে ঘরে আসে।  
এখানে শস্যের উৎসবের কামনা সরাতে  
শসা-বপন-ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হল এবং  
অগুষ্ঠান শেষ হল উৎসবের নৃত্যগীতে। কিন্তু  
দুঃখের দিন এ বছরের মধ্যে আসে—যখন  
পাতা ঝরে যায়, মাটি তেতে ওঠে, জল  
ফুরিয়ে যায়। সেই সব দিনে মনের নিসঙ্গতার  
ছবিও ব্রতে ফুটেছে দেখি। সেদিনের বসুধারা  
ব্রতের ছড়ায় কেবল জল আর জল।

কাল বৈশাখী আগুন ঝরে।

কাল বৈশাখী স্নোদে পোড়ে।

গঙ্গা শুকু-শুকু আকাশে ছাই।

উৎসাহ নাই, ক্ষুষ্টি নাই,—কেবল দীর্ঘ-  
নিশ্বাসের মতো ছড়াটুকু হতাশ জানাচ্ছে।  
অনাবৃষ্টির আশঙ্কা আমাদের যদিই-বা এখন  
কোনোদিন চঞ্চল করে তবে হয়তো ‘হারিহে  
রক্ষা কর’ বলি মাত্র; কিন্তু ঋতু-বিপর্যয়ের

মানে যাদের কলঙ্ক ছিল ~~প্রাণ~~-সংশয়,  
সেই তখনকার মানুষরা কোনো অনিশ্চিত  
দেবতাকে প্রার্থনা কেবল মুখে জানিয়ে  
ভূপ্ত হতে বা নিশ্চিন্ত হতে পারতো না ;  
সে বৃষ্টি দাও বলে ক্লান্ত হচ্ছে না ;  
সে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে, ফসল ফলিয়ে  
দেখতে চলেছে। এবং সে নিশ্চয় জানে  
বৃষ্টির কামনা করে দল-বৈধে তারা মাটির  
ঘটকে মেঘরূপে কল্পনা করে শিকের খোঁচায়  
ছুটো কল্লি বট, পাকুড় ইত্যাদি গাছের  
মাথায় জলধারা দিয়ে যে বসুধারা-ব্রতটি  
করছে, তাতে করে বৃষ্টির দাতা যে দেবতা  
তিনি ভুট্ট হচ্ছেন এবং এই প্রক্রিয়ার বলে  
মেঘও জল দিতে বাধ্য। এখনকার মানুষ  
এ-রকম বিশ্বাস করে না, ব্রতও করে না।  
কিন্তু তখনকার লোকে যে-বিশ্বাসে ব্রত  
করতো তার মূলে যে কামনা, এখনো  
পূজায় বা প্রার্থনাতে সেই কামনা, কেবল  
অগুষ্ঠানটা ভিন্ন রকমের ; ব্রতে কামনার সঙ্গে  
অগুষ্ঠানের স্পষ্ট সম্পর্ক দেখি, যেমন—

বট আছেন, পাকুড় আছেন,

তুলসী আছেন পাটে।

বসুধারা ব্রত করলাম

তিন বৃক্ষের মাঝে।

মায়ের কুলে ফুল, বাপের কুলে ফল,

খণ্ডরের কুলে তারা।

তিন কুলে পড়বে জল-গঙ্গার ধারা।

পূর্ণিমা জলে ভাসবে,

অষ্টাদিকে ঝাঁপুই খেলবে।

ব্রত হল মনস্বামিনার স্বরূপটি! আল্পনায়  
তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার  
প্রতিধ্বনি ; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাটে।

মতো ;—এক-কথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত-কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন কামনা !

বেশির ভাগ ব্রতে ছড়া হয় গীত কিংবা নাট্য আকারে, আল্পনা হয় প্রতিকল্পিত নয় মণ্ডনরূপে থাকেই থাকে—কামনাকে সুব্যক্ত সুশোভন রূপে ব্যাখ্যা করতে । নাট্য, নাচ, গান এবং ছবি-আঁকা বলতে মানুষের স্বাধীন চেষ্টা বলে' আমরা এখন বুঝি, তখন কিন্তু সেগুলো ব্রতের অঙ্গ বলেই ধরা হতো । ব্রতের ছড়াগুলি যেখানে ছোটো-ছোটো ব্যক্তির পালার মতো গাঁথা হয়েছে সেখানে নাট্য নৃত্য ও গীতকলার যথেষ্ট অবসর রয়েছে দেখি ।

আমের বইল আসে লো লোচা লোচা,

আমের বইল আসে লো বাড়ি বাড়ি ।

আবার যেমন—

ফুল কইলাম গাঁয় গাঁয়,

সে ফুল গেল দখিন গাঁয় ।

দখিন-গাঁইয়া মালিরে !

ফুলের ডালা লবি রে ?

কাঁখে কলসী, হাতে পোলা,

কেমনে লব ফুলের ডালা রে !

এই-সব ছড়াকে গান ছাড়া কি বলব ? ছড়াগুলির বাঁধুনী আর কথা-সাজানোর ভঙ্গী এমন তালে-তালে যে এগুলিতে সুর এবং নাচ ছয়েরই টান স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে । এমনি নবমণ্ডল ব্রতে কুয়াশা ভেঙে সূর্য্য-ওঠবার ছড়া এবং ভাদ্রলী ব্রতের ছড়া-গুলিতেও গীত, নাট্য দুইই রয়েছে । দুই ব্রতেই পাত্র-পাত্রী স্থান-কাল ভেদে ছড়াগুলি নাট্যকাারে গাঁথা । এ-থেকে

স্পষ্ট বোঝা যায় একসময়ে এগুলি মন্ত্রের মতো করে বলা হতোনা,—অভিনীত হতো !

ব্রতের অমুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে, এখন যাকে বলি আমরা অমুষ্ঠান, তা নয় ; এখন যাকে বলি আমরা কলাকৌশল, তাও নয় ! ধর্ম এবং শিল্প দুইই এখানে স্বাধীন ভাবে আপনাদের ছোটো দিক অবলম্বন করে চলছেন । ব্রতের মূলে কতখানি ধর্ম-প্রেরণা, কতখানি-বা শিল্পকলার সৃষ্টির বেড়া রয়েছে তা বোঝা শক্ত ।

এখনো পাড়াগাঁয়ে রাখালেরা 'কুলাহ-ঠাকুরের' ব্রত বলে একটা অমুষ্ঠান করে । সেটি থেকে ধর্ম আর শিল্প ক্রমে কেমন করে স্বয়ংপ্রদান হয়ে উঠছে তার একটু আভাস পাব । পৌষ-সংক্রান্তির একপক্ষ পূর্ব থেকে রাখালেরা একজনকে বাঘ সাজিয়ে গৃহস্থের বাড়ি-বাড়ি সন্ধ্যার সময় এই গানটি গেয়ে পূজার চাল ভিক্ষে করে বেড়ায়—

সকলে—ঠাকুর কুলাই ভেঁ

হাটা চল রে ॥ ৬ ॥

হাটা চল পাঁচিল পার ।

বাঘ— ঝপৎ গিরিরে ॥ ৭ ॥

ঝপৎ গিরি সজাগ হয় ।

সজাগ হয় না করে রব ॥

সকলে—সুন্দর বনেরে ॥ ৮ ॥

বাঘ— সুন্দর বনে বাঘের ছাও ।

হাঘুর হাঘুর করে রব ।

ম্যাক্ বাঘ রে ॥ ৯ ॥

সকলে—ঠাকুর কুলাই ভেঁ ইত্যাদি—

এই ছড়া তো শুধু আউড়ে যাবার নয় ; এতে বাঘ হতে হবে, জোরে-জোরে হাঁটা,

ঝাপাৎ-করে পড়া, সজাগ হয়ে এদিক-ওদিক দেখা এবং হামুর হামুর গর্জন! নাট্যকলার অনেকখানিই পাওয়া গেল। গানে কোরাস্ পর্য্যন্ত। এর সঙ্গে পাড়া-গায়ের রাত্রি, অঙ্ককার গাছপালা, মশাল জ্বলে রাখা-ছেলেরা এবং ছেলে মেয়ে-বুড়ো নানা দর্শকের নানা ভাব-ভঙ্গী, খড়ের ঘর, প্রদীপের আলো ইত্যাদি জুড়ু দেখলে একপক্ষব্যাপী যাত্রার অনেকখানিই আমরা পাবো। বাঘের ভয় থেকে গরুবাছুর যাতে রক্ষা পায় সেই কামনা করে রাখালেরা বাঘ সাজিয়ে এই বাঘের ছড়া প'ড়ে ব্রত করবে এইটেই আশা করা যায়। কিন্তু এখানে দেখছি চাল প্রার্থনা করে রাখালেরা এই বাঘের গান গেয়ে-গেয়ে রোজগার করছে। এখানে দেখছি অমুঠানের গীত-কণার অংশ ব্রতের বাকিটুকু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মানুষ স্বাধীনভাবে গান নাচ ছইই যচ্ছা করছে; এবং ব্রতের দিন কেবল বাঘের মূর্তিকে পূজো দিয়েই কাজ সারছে! এইখানে ধর্ম্মাচরণ আর শিল্পকলা দুটির ছাড়াছাড়ি হল। ব্রতের ধর্ম্মাচরণের অংশ মূর্তি-পূজার দিকে এগিয়ে গেল এবং শিল্প-অংশ ক্রমে বহুরুপীর বাঘের অনুরূপ হতে আরম্ভ হয়ে শিল্পের উচ্চতর একটি স্থানে পৌছতে চলো। পূজার দিকে পড়লো পূজ্য মূর্তি আর পূজক; আর শিল্পের দিকে এল দর্শক আর প্রদর্শক; এবং ব্রতকথা স্বাধীনভাবে কবিতা, গাইতে লাগল—যেমন চণ্ডীর গান, শীতলার গান। এর থেকে রাম-যাত্রা, কৃষ্ণ-যাত্রা, পাঁচালী,

কাবি। এমনি পরে পরে ব্রতের সম্পর্ক থেকে দূরে যেতে-যেতে নিচুক যাত্রা, নাটক, থিয়েটারে এসে দাঁড়ালো—সেইসব শিল্পকলা যার গোড়া-পত্তন হয়েছিল ব্রতীর কামনাকে ব্যক্ত করবার চেষ্টায়। খাঁটি অবস্থায় দোখ ব্রতে দর্শক-প্রদর্শক নেই, যে নট সেই ব্রতী বা সেই চিত্রকর এবং গায়ক; কিন্তু ব্রত থেকে যখন শিল্প বিচ্ছিন্ন তখন যে আল্পনা দিচ্ছে, চিত্র করছে, অভিনয় করছে বা ছড়া বলছে কিংবা বাঘ সেজে কি আর-কিছু, সেজে নৃত্য করছে সে যে ব্রতী হয়ে ধর্ম্ম-কামনায় সেটা করছে এ হতেও পারে, নাও হতে পারে; বাধাবাদি কিছু নেই। ব্রতের বাঘ বহুরুপীর বাঘে যেমন দাঁড়ালো, অমনি সেখান থেকে লাট-সাহেবের ফটকের উপরের বাঘ পর্য্যন্ত হতে তার আর কোনো বাধা রইলো না। মাঘ মণ্ডলের সূর্য্যদেব যেদিন কুলের টোপর রাখায় রায়ল বা লাউল মূর্তিতে ধরা পড়লেন, সেইদিন থেকে গ্রীক আপোলো থেকে কৃষ্ণনগরের পুতুল, পুরীর জগন্নাথ পর্য্যন্ত সব রাস্তা খোলসা হয়ে গেল। কল্পব্রত ও পুনিপুকুরের বেলের ডাল পাথরে গড়া হয়ে বৃদ্ধ-যুগের কল্পদ্রুম এবং আজ-কালের অস্কার কোম্পানীর ইলেক্ট্রিক বাতির খোড় হয়ে দাঁড়াতে চলো—প্রাতি পদক্ষেপে ব্রতের ধর্ম্মাহুতান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে-হতে। ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই একানবর্তী পরিবারের অন্তর্গত রয়েছে এবং তারাই বড় হয়ে ক্রমে স্বতন্ত্র প্রধান স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে,—ধর্ম্ম ও শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসের মূলে এই কথা রয়েছে দেখি।

এই স্বতন্ত্রতা শিল্প-সাহিত্য এবং ধর্মের ইত্যাদি জড়িয়ে ছিল; এখন তারা সে-সম্পর্ক প্রচারের পক্ষে দরকার কিনা এবং এই সে-গলাগলি-ভাব ছেড়েছে; ধর্ম মান্দ্রে, পার্থক্য থাক। ভালো কি মন্দ সেটা বিচার নাটকের রঙ্গমঞ্চে ও শিল্প প্রদর্শনীতে স্থানদ্বিষ্ট করতে বসা কেবল তর্ক করা মাত্র। ভাগ হয়ে গিয়েছে। এখন আর থিয়েটারে এইটে ঘটেছে। একসময়ে দেব-মন্দিরের সঙ্গে কি গানের মজলিসে কিংবা চিত্র-প্রদর্শনীতে নাট্যমন্দির এবং পূজাপার্বণের সঙ্গে দেবতার দিয়ে বলা চলেনা যে আমরা রতী, ব্রত চরিত বর্ণন করে চন্দন-ষাত্রা রাস-ষাত্রা কস্মতে বসেছি! কল্পিত-হরণ এমন নানা অভিনয় ও চিত্র-কার্য

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## স্বাধীন-রমণী

নাটিকা

[ রোমক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ]

প্রথম অঙ্ক

[ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী যুক্তকেশী স্বাধীন-রমণীদিগকে টানিতে টানিতে অস্ত্রধারী রোমানরা পর্বত হইতে বাহির হইল; রমণীরা সকলেই আঁচড়াইয়া ও চাঁৎকার করিয়া বাধা দিতেছে, কেবল একজন একেবারে শান্ত নিরস্ত্রপ্রায়। রোমানরা নাকের বায়ে অস্থির ও কাতর হইয়া রমণীদিগকে একজায়গায় জড়ো করিল এবং একটু সরিয়া গিয়া নিজেদের বিস্তৃত বেশ-ভূষা ঠিক করিয়া লইল—সকলেই হাঁপাইতে ছিল। ক্রমে কোলাহল থামিল—রমণীরা রোমানদের গতিবিধি দেখিয়া অস্থির হইল; পরে আন্তে আন্তে কথাবার্তা শুরু হইল ]

প্রথম রোমান। সত্যি, আমি একেবারে তাজব বনে গেছি—দিব্য করে' বলতে

পারি আমার যিনি, ওজনে তিনি হুশো মণের কম নন.....

দ্বিতীয়। সব-চেয়ে যেটি বড় আর মোটা, সেইটিকে বেছে নেবার কি আশঙ্কা ছিল? আমি বেশ দেখে-জেনে ছোট্ট রোগাটিকে নিয়েছি—

প্রথম। ও কি হে? তোমার নাকে কি হল! সেই রোগা ছোট-খাটোটির এত দাপট...

দ্বিতীয়। আর তাই, বল কেন! একেবারে বেরালের মত আঁকড়ে ধরে' ছিল...

প্রথম। যা বলেছ! এরা বেরালের জাত, বেরালের মতই আঁচড়ায়। আমি কত যুদ্ধে গিয়েছি, কত তলোয়ারের চোট খেয়েছি, কত লাঠির ঝা, মুড়ি-পাথর

হজম করেছি—কত ঘর-বাড়ী পর্য্যন্ত আমার ঘাড়ে পড়েছে, কিন্তু এমন দশা আর-কখনো হয়নি...হায়, হায়, আমার এমন সাধের নাকটি একেবারে গেছে!

তৃতীয়। ভাগ্যে আমাদের গৌফ-দাড়ি ভাল করে কামানো ছিল, তাই রক্ত—নষ্টলে বোধ হয় গৌফদাড়ির একগাছি চুলও থাকত না—দেখেছ ত, তাদের আঙুলগুলো কেমন সুরু সুরু, সুন্দর, কিন্তু ঐ নখগুলো,—আঃ, কি বিস্তী ধারালো! বলছি কেন? আচ্ছা, বেরালই বা বলি কেন? বেরাল তো তাদের নাম নয়। আমার-যিনি, তিনি সারা পথ কোন কথা বলেন নি বটে, কিন্তু মাথার চুল আমার একগাছিও আর মাথায় রাখেননি!

চতুর্থ। (দোঁখতে খুব মোটা এবং লম্বা; একটু চড়া সুরে) আমি তার হাতছটো বগলে চেপে ধরে আনছিলুম—কিন্তু সে আমাকে এমনি কাতুকুতু দিয়েছে যে, হেসে খুন হবার লগাড়া!

[ রমণীগণের অবজার মুহূ হাসি শুনা গেল ]

প্রথম। ওহে, ওরা শুনে পাচ্ছে...

দ্বিতীয়। ওহে, সব এসো, কান্না থামাও, শুধিয়ে ফিটফাট হও। প্রথম দিন থেকেই এঁরা আমাদের তাক্কল্য করলে আমাদের আর হুঃখের সীমা থাকবে না। দেখছো, পলাস কি রকম! ও-ই ঠিক মান রাখতে পারবে—

পঞ্চম। সত্যি, গায়ে একটা দাগও লাগেনি যে হে পলাস! তোমারটিকে কি করে নিয়ে এলে?

পলাস। (বিনয়ের ভাণ করিয়া) ভা

ভাই জানি না। 'গোড়া থেকেই' সে আমায় এমনি জড়িয়ে ধরলে, যেন আমি তার চিরকালের সন্নিবিষ্ট—কিন্তু তোমরা আমায় অবাক করলে! কেন, এরা তো বেশ শাস্ত, নিরীহ। যেই আমি তাকে তুলে নিলুম, অমনি সে হ'হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরলে—ভয় হচ্ছিলো, বেশী জড়িয়ে ধরে' শেষে চেপে না মেরে ফেলে! হাতগুলো তার রোগা বটে, কিন্তু ভারী শক্ত...

প্রথম। পলাস, তোমার খুব জোর বরাত, যাহোক—

পলাস। 'বলছি ত শাস্ত, নিরীহ। সে মনে-মনে বুঝতে পারলে, তাকে আমি ভালবাসব, খুব খাতির করব। অর্ধেক পথ ত সে ঘুমন্ত ছোট্ট ছেলেটির মতই এলো...ও-সব বলছি বটে, কিন্তু তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস করছ না...

হুলকার ভদ্রলোক। মশাইরা—থাক, ও-সব কথা এখন রাখুন। কোনটি কার, এখন বেছে নেওয়া যায় কেমন করে? অঙ্ককার রাত্রি খাঁচার মধ্যে থেকে মুগী চুরি করার মত তাদের নিয়ে এসে...

রমণীগণ। (কুদ্ধসুরে)। দেখেচ মিসের উপহার ভঙ্গী!

প্রথম। ওহে, ওরা যে আমাদের কথা সব শুনে পাচ্ছে।

হুলকার ভদ্রলোক। (মোটা গলায়) আচ্ছা, ওদের এখন বেছে নেওয়া যায় কি করে? আমারটি কিন্তু ভারি আমুদে, সেটি আমি কাউকে নিতে দিচ্ছি না—আমার উপর যে কেউ চাল চালবে, সে হচ্ছে না।

দ্বিতীয়। গোবর-গণেশ।

তৃতীয়। আমারটিকে তাঁর গলার  
খাজাজ শুনেই চিনতে পারব—তাঁর সে  
দব আমি ভুলব না, মরে' গেলেও না।

পঞ্চম। আমারটির হাতের নখ দেখেই  
চেনা যাবে।

সিপিও। আমারটিকে তার চুলের মিষ্টি  
গোন্ধ থেকে চিনতে পারবো।

পলাস। মনের সৌন্দর্য আর বিনয়েই  
আমারটিকে চেনা যাবে। ওহে শোন,  
আজ থেকে আমাদের জীবন-ধারণ কিছ  
পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা আজ গার্হস্থ্য  
জীবনের দ্বারা এসে দাঁড়িয়েছি—একা  
ধাকার কষ্ট আজ থেকে আর ভোগ করতে  
হবে না।

চতুর্থ। ঠিক বলেছে হে, আজ থেকেই  
আমরা সংসারে প্রবেশ করতে চলেছি।

রমণীগণ। (বাস্তবের সুরে) তা বই কি।  
একবার চেষ্টা করে দেখুন না—আমুন না  
সব এগিয়ে।

প্রথম। ওহে, তোমরা কি করছো?  
ওরা যে সব শুনেতে পাচ্ছে।

দ্বিতীয়। আর দেরী নয়, এবার সময়  
হচ্ছে—

তৃতীয়। কিন্তু আগে যাচ্ছে কে?

[সকলে নির্ভীক ও স্থির হঠাৎ দাঁড়াইয়া  
বহিল; রমণীগণ বিক্রপের হাসি হাসিল]

চতুর্থ। আমি আগে বাছি না—যত  
কাতুকুতু খাবার, তা খেয়েছি—আর-কেউ  
চেষ্টা করগে, তবে আমার উপর যে কেউ চাল  
চালবে, সেটি হবে না। আচ্ছা পলাস, তুমিই  
আগে যাও না।

পলাস। ঝুথু, দেখছো না, আমার

প্রেমসী এখনও ঘুন্ছেন! পাথরের কাছে  
কালো ঝোপের মত যে জায়গাটা, ঐ যে ঐ  
নিকে চেয়ে দেখ না, ঐ যে গাটা। কি  
শাস্ত, নিরীহ!

সিপিও। তোমরা গোল চোকাতে  
যে গোলমাল বাধাচ্ছ, তাতে মনে হচ্ছে, ঐ  
নিষ্ঠুর জীবগুলির কাছে এগুতে তোমাদের  
কারও সাহস নেই। আমি একটা ব্যবস্থা  
কিন্তু ঠিক করেছি—

চতুর্থ। বেশ বেশ, বগত ভাই।

সিপিও। আচ্ছা, আমার পরামর্শটা  
শোনো। খুব ধীরে-স্থির, চল, সবাই একসঙ্গে  
এগিয়ে যাই—সবাই সবাইয়ের পেছনে  
লুকিয়ে লুকিয়ে চলুন—ওদের স্বামীদের ভয়  
করলুম না, আর ওদের—

মূলকায় ভজলোক। ওদের স্বামী! ছি,  
ছি, কি বলছো তুমি!

[রমণীদের গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল  
—ক্রন্দনের লক্ষণও প্রকাশ পাইল]

প্রথম। ওহে, ওরা যে সব শুনেতে  
পাচ্ছে।

সিপিও। আবার মুখ খুলছো! লক্ষ্মী-  
ছাড়া স্বামীগুলোর কথা কেউ তুলো না।  
বোঝ না, ঐ কথাটায় সুন্দরী অবলাদের মনে  
ভারী ব্যথা! আচ্ছা, আমার ব্যবস্থায় কারও  
অমত নেই ত?

সকলে। কোন আপত্তি নেই, কোনো  
আপত্তি না—সবাই মত দিচ্ছি।

সিপিও। আচ্ছা, তাহলে সকলে—

[সৈনিকেরা আক্রমণে ও রমণীরা আত্ম-  
রক্ষায় প্রস্তুত হইল। রমণীদের ধারালো  
নখ উদাত্ত দেখা গেল—আঁচড়াইতে আর চুল

ছিঁড়িতে তাহারা প্রস্তুত। সাপের হিস্ হিস্ শব্দে নঃ একটা শব্দ শুনা গেল। সৈনিকেরা অগত্যা হঠাতে লাগিল অর্থাৎ পরস্পরের পিছনে লুকাইতে গিয়া সকলে ক্রমে আরও পিছাইয়া আসিল। রমণীরা হাসিয়া উঠিল—সৈনিকেরা হতভম্ব হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।]

প্রথম। সিপিও, আমার মনে হয়, তোমার এ ব্যবস্থায় কিছু খুঁৎ ছিল—সক্রেটিস থাকলে বলতেন, আমরা পিছন দিকে এগুলাম।

শূলকায় ভদ্রলোক। আরে এর মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝলুম না যে!

পলাস। ওহে বীরত্ব দেখাও, ভয় পেয়ো না—ক'টা নখের আঁচড়ে কি আসে যায়? একবার শেষ পর্য্যন্ত লড়তে পারলে তারপর কত সুখ, কত মজা! চলো, সব এগিয়ে চলো।

[সৈনিকেরা সকলে গোলযোগ করিয়া রমণীদের আক্রমণ করিল, কেবল পলাস স্থিরভাবে স্থিতিপ্রাপ্তির ভ্রায় আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলে কিছুক্ষণ আক্রমণের পর দ্রুত পশ্চাৎপদ হইল। পরে সব চুপচাপ—সৈনিকেরা নিজের নিজের নাকে হাত বুলাইতে লাগিল]

সিপিও। (নাকি স্নেহে) সবাই বোধ হয় লক্ষ্য করেছে, ওরা এবার মোটেই চীৎকার করেনি! ভারী ধারাপ লক্ষণ, টেচানো যে ছিল ভাল—

প্রথম। কিন্তু এখন করা যায় কি?

দ্বিতীয়। গার্হস্থ্য জীবন উপভোগের জন্তে আমার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে উঠছে—

তৃতীয়। আচ্ছা, রাজ্য ত বসানো গেল, আর কেন? ঢের হয়েছে—এবার বিশ্রাম না নিলে আমার আর চলছে না।

শূলকায় ভদ্রলোক। মশাইরা, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, রা-জ্যতির মনস্তত্ত্ব ভাল করে জানে, এমন কেউ আমাদের মধ্যে নেই। 'বুদ্ধ করে' রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, আমরা একেবারে অসত্য, বৈরসিক বনে গেছি—রমণী কি বস্তু, তা পর্য্যন্ত একবারে ভুলে গেছি!

পলাস। (সবিনয়ে) না, সকলে তা বলে' ভোলে নি।

সিপিও। এরা যে এক-সময়ে স্বামীর ধর করেছে, সেই সব স্বামী, যাদের আমরা যুদ্ধে হারিয়েছি—এই থেকে আমি সিদ্ধান্ত করছি, অপরিচিত জীলোককে হাত করবার কোন উপায়—কোন গুঢ় উপায় নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু সে উপায়টা যে কি, তা বার করা যাচ্ছেনা।

চতুর্থ। আচ্ছা, ওদেরই যদি উপায়টা জিজ্ঞাসা করা যায়?

প্রথম। বলবে না, বলবে না।

(রমণীরা অবজ্ঞাভরে হাসিয়া উঠিল)

দ্বিতীয়। ওহে, করছো কি! সব যে শুনতে পাচ্ছে।

সিপিও। আমি একটা ব্যবস্থা ঠিক করেছি—

চতুর্থ। তুমিই বুদ্ধিমান বটে, বিচক্ষণ—

সিপিও। এ-সব সুন্দরী বন্দিনীদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আমরা ওদের ধরা দূরে থাক, ওরাই আমাদের বন্দী করেছে। মুখ আঁচড়তে, চুল ছিঁড়তে আর বগলে

কাতুরূপে এসে এলো বাস্তব থাকে যে, আমাদের কথাই শুনতে পায় না! আর শুনতে পায় না বলেই আমাদের কথায় ভোলে না, আর সেইজন্তেই ত উদের মনে বিশ্বাস জন্মে দিতে পারছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

[ রোমানরা সবাই “ব্যাপারটা এই” বলিয়া গম্ভীরভাবে ভাবিতে বসিল এবং বর্মণারা তাহাদের কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ষ হইয়া রহিল ]

সিপিও। তবে শোন, সাময়িক ব্যবস্থাতে আমাদের দল থেকে একজনকে দূত করা যাক, আর আমাদের সুলভী বিপক্ষদেরও তাই করতে থালা হোক—তখন উপেক্ষার দূতেরা সাদা নিশেনের তলায় দাঁড়িয়ে একটা ব্যবস্থা—

[ সৈনিকেরা বক্রতায় বাধা দিয়া মানকে চাঁৎকার কবিতা উঠিল। সিপিও সকলের মতে দূত নির্বাচিত হইয়া শ্বেতপতাকা হাতে লইয়া বর্মণদিগের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সম্মুখদিকে বলিতে লাগিল—“ওহে, আমরা একলা ফেলে তোমরা পালিয়ে না যেন” ]

সিপিও। ( প্রার্থনার স্বরে ) সুলভীগণ, আপনারা যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকুন। দেখতেই পাচ্ছেনত, আমার হাতে সাদা নিশেন রয়েছে—সাদা নিশেন অতি পবিত্র বস্তু এবং আমার দেহ এখন যদি আপনারা স্পর্শ করেন, তাহলে সেটা নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ হবে, জানবেন। অতএব বর্মণীগণ, শুধুন, সর্বমাত্র কাল আমরা আপনাদের ধবেছি। ধবে আমরা আনন্দ

বোধ লাভ কবেছি, তা কিন্তু প্রবোমানীয় নয়। কারণ, এর মধ্যে পরস্পরের অনোমালিয়া, বিবাদ-বিসম্বাদ—

কিওপেট্রা। কি আপদ! একটা ছড়ির ডগায় এক টুকরো সাদা ন্যাকড়া বেঁধে ভাবছে, এই-সব কথা বলে অপমান কববে!

সিপিও। (সামুখ্যে) আজ্ঞে, ক্ষমা করুন। এসব অপমানের কথা নয়—ভুল ব্যবহৃত আপনাবা। সত্যি, দিয়া করে বলছি, আনবা আপনাদের প্রেমে পড়েছি—আমাদের প্রতি আপনাদের মহামুগ্ধতা দেখে একটা প্রার্থনা জানাতে সাহস হচ্ছে। দয়া কবে আমাদের মত আপনাদের ভিতর থেকেও একজনকে দূত ঠিক করুন—

কিওপেট্রা। হ্যাঁ, আমরা জানি, সব জনেছি, তোমায় আর-কিছু বলতে হবে না—

সিপিও। সে কি! কি করে শুনলেন? আমরা তো খুব চুপিচুপি সব বলাবলি কর-ছিলুম

বর্মণীগণ। হয়েছে, হয়েছে, ও সব কথাই আমরা শুনেছি -

কিওপেট্রা। তোমার ও ন্যাকড়া নিয়ে যেখানে থেকে এসেছো, সেইখানে ফিরে যাও। যাও, বলছি। আমরা গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি—না, আরও দূরে চলে যাও। আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনতে হবে না। ঐ ওখানেই কবে রয়েছে, ওটা কে? [ পলাসবে দেখাইয়া ] ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও...

রোমানরা। ( আন্তে আন্তে ) এহবারেই ঠিক কাজ আরম্ভ হলো—

[ রোমানরা আন্তে আন্তে সরিয়া গেল এবং কেহ কেহ বর্মণীদের মনে বিশ্বাস



উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কানে হাত চাপা দিল।

প্রথম বমণী। কি অপমান, কি ভীষণ অত্যাচার! আমাদের উপর করছে! আহা, বেচারী স্বামীরা—

দ্বিতীয় বমণী। বেচারী স্বামীদের কাছে এক মুহূর্তের জন্তেও অবিখ্যাসিনী হবার আগে শপথ করে বদাঙ্গি, হাজার বোমানের চোপ কানি কবে দেবো। প্রিয়তম আমার, থুমাও, থুমাও—এ দেখে বতঙ্গণ প্রাণ আছে, বতঙ্গণ তোমার মান ঠিক বজায় রাখব—

তৃতীয়া বমণী। আমিও তাই দাঁড়া করছি—

চতুর্থ বমণী। আমিও—

ক্রিওপেট্রা। শপথ গো তোমরা সবাই করলে, কিন্তু তাতে হবে কি? এই বর্ষের অশিক্ষিত লোকেরা কি ও-শপথের মান রাখতে জানে? ধর না কেন, যে আমায় ধবে এনেছে—বদিও তার নাক আমি কানড়ে নিয়েছি—

প্রথম বমণী। এখনও তোর তাকে মনে আছে?

ক্রিওপেট্রা। (অবজ্ঞাভরে) মরবার সময় পর্যন্ত তাকে মনে থাকবে—বর্ষ তলোয়ার আর সৈনিকদের গায়ে কি সব থাকে, সে সবের সেই বদ গন্ধ, উঃ, কি নির্দয়ভাবেই আমায় পৌড়ন করেছে! হায় প্রিয়তম, কোথায়, তুমি কোথায়!

প্রথম বমণী। ওদের সবাইয়ের গায়েই, তাই, বিশ্রী গন্ধ—

দ্বিতীয় বমণী। ভাল্লকের মত চেপে ধরা

ওদের সবাইয়েরই খিঁচাব। বোকা, এটা একটা সামরিক নিয়ম—

প্রথম বমণী। ছেলে-বেলায়, আমার মনে আছে, একজন ছোকরা সৈনিক একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল—বলছিলাম, সে অনেক দূর থেকে এসেছে, আর সেখানে—

ক্রিওপেট্রা। ওলো, এটা আশ্চর্য ছেলেবেলাকার গল্প বলবার জায়গা নয়

তৃতীয় বমণী। হ্যাঁ, সেই ছোকরার কথা বলছিলুম—

ক্রিওপেট্রা। আচ্ছা জুনে, যখন প্রত্যেকেরই বাড়ি একটা করে সৈনিক আপাতত বয়েছে, তখন তোমার সেই ছোকরার কথা শুনে আমাদের আর কি হবে? এখন কি কথা বায়, তাই ভাবো। একটা মতলব আমি ত ঠিক করেছি—

ভেরোনিকা। (ঘুম হঠাতে উঠিয়া আসিল—চেহারা খুব রোগা এবং আশ্চর্য্যকরম লম্বা—চোখটি এখনও অন্ধমুদ্রিত—অলসভাবে ক্রিওপেট্রার কথায় বাধা দিয়া সে কথা কহিল) কৈ, তারা কৈ? ও কি, অতদূরে! কাছে আসছে না কেন? ওরা কাছে না থাকলে আমার ভারী লজ্জা করবে—এতক্ষণ ঘুমের ধোঁবে ছিলুম। আমায় যে ছোকরাটি এনেছে, তাকে তো কৈ দেখতে পাচ্ছি না—তার গায়ে বেশ একটা গন্ধ—

ক্রিওপেট্রা। খুবই দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছো না? ঐ যে, মুখ হাঁ করে—

ভেরোনিকা। আমি ওর কাছে যাবো—

ক্রিওপেট্রা। ওলো, সবাই ওকে ধরে বাধ—আচ্ছা, ভেরোনিকা, এর মধ্যে কি

৫২

তোমার প্রিয়তম স্বামীকে একেবারে ভুলে  
যেলে?

ভেবোনিকা। ওগো না, সত্যি বলছি,  
শাকে কখনো ভুলবো না। কিন্তু ওদের  
কাছে তোমরা যাচ্ছো না কেন? বোধ হয়,  
নিজেদের ভেতর কিছু ঠিক কবেছো—যাই  
থোক না, সব করতেই আমি প্রস্তুত আছি।  
—কাবো সঙ্গে বাগারাগির পরট ভাবটা  
বড় বেড়ে যায় কি না!

ক্রিওপেট্রা। শোন ভাই সকলে, আমাদের  
প্রথম কষ্টটা আমাদের বেচারী স্বামীদের  
বিশ্বাস ভঙ্গ করবো না। এইটে সকলে  
শপথ কর—ওরা যেমন ব্যবহারই করুক,  
আমরা পাহাড়ের মত অটল থাকবো। যখনই  
মনে হচ্ছে, বেচারী স্বামী আমার একলা  
রয়েছে—শূণ্য শয্যায় পড়ে বৃথাই ডাকছে  
—ক্রিওপেট্রা, ক্রিওপেট্রা, তুমি কোথায়?  
যখনই তার প্রেমের কথা মনে পড়ছে—

(রমণীরা কাদিতে লাগিল) এসো, শপথ  
করো—ভাবছো কি? স্বামীরা আমাদের  
অপেক্ষায় বসে আছে—

রমণীবা। শপথ করছি, এরা আমাদের  
নগ্নে যেমন ব্যবহারই করুক, আমরা স্বামীদের  
বিশ্বাস ভঙ্গ করবো না।

ক্রিওপেট্রা। এই ঠিক,—তাদের কথা  
মনে হলেই আমার একটু শান্তি আসে—  
প্রিয়তম, ঘুমাও, শান্তিতে ঘুমাও। আমাদের  
তারপর একটা কাজ আছে—রোমানদের  
মত একজনকে দূত<sup>১</sup> ঠিক করা, আর  
তাকে—

প্রথম রমণী। তাকে বলে দেওয়া, ওদের  
ঐ ছোটো চোখ কটা গেলে দেওয়া—

দ্বিতীয় রমণী। না, না, তা নয়, ওরা  
ভদ্র আমাদের নদের পরিচয় নিয়েই যাবে?  
আমাদের মনেব কথা কি, তাও জেনে যাক।

ভেবোনিকা। যখন ওদের হাতেই রয়েছে,  
তখন এসব কথা আর কেন?

ক্রিওপেট্রা। চূপ করো, ভেবোনিকা, —  
রোমান আইনে যাই-ই থাক না কেন, জীব  
যাব মরুক তার নয়। আমাকে তোমরা দূত  
ঠিক করো, আমি বুঝিয়ে দিয়ে আনবো যে  
আমাদের এখানে আটকে রাখবার ওদের  
কোন অধিকার নেই—আমাদের ছেড়ে  
দিতে ওরা বাধ্য। ওরা যে আইনেবহু নোহাফ  
পড়ুক, আর মার্ত বলুক না কেন,—এটা  
সত্যি যে ওরা একেবারে নিষেট বংশের মত  
কাজ কবেছে—

রমণীগণ। বাও, বাও, ক্রিওপেট্রা, তুমিই  
যাও—

প্রথম রমণী। ভেবোনিকা, তোমায়  
কিছু বলতে হবে না, চূপ করো—

ক্রিওপেট্রা। মশাই, ও সাদা পতাকা-দাবা  
দূত-মশাই, এখানে এগিয়ে আসুন—আমি  
একটু কথা কইতে চাই—

সিপিও। আমার অঙ্গশস্ত্র কি সারিয়ে  
ফেলবো?

ক্রিওপেট্রা। না, তার দরকার নেই—তা  
করতে হবে না। ভেবো না যে, তোমার ঐ সব  
অস্ত্র দেখে আমরা ভয় পাচ্ছি। চলে এসো,  
ভয়ের কিছু নেই—তোমায় আমি কামড়াবো  
না। সেদিন রাত্রে যখন সেই নিস্তরূ রাত্রে  
বাড়ীতে ঢুকে বেচারী স্বামীর হাতের ভিতর  
থেকে আমাকে বর্ষার ডাকাতের মত জোর  
কবে কেড়ে নিয়ে এলে, তখনতো এত ভীত

ছিলে না! আচ্ছা, থাক—যদি আসবার ইচ্ছে থাকে, তা হলে এগিয়ে এসো—

সিপিও। ভদ্রে, আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি—

ক্লিওপেট্রা। মুগ্ধ হয়ে গেছি! রাহাজান, চোব, পাগল কোথাকার—খুনে, পাঞ্জি, বাঙ্গস, হতভাগা—কাজ যা করেছ, সে কি বিশ্রী, জঘন্য—

সিপিও। ভদ্রে—

ক্লিওপেট্রা। কি ভীষণ আমায় পীড়ন কবেছো ভাবো! তোমায় দেখে আমার সর্বাস্ব অলে যাচ্ছে—আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে!—গায়ে তোমার সৈনিকের গন্ধ, নাকে আঁচড়ানোর দাগ, ও-সব যদি না থাকতো, তা হলে—

সিপিও। ক্ষমা করবেন—এ সব আপনাবাই করেছেন—

ক্লিওপেট্রা। আমি? ও, তুমিই যেই লোকটা? (দৃশ্যভরে দেখিল) আচ্ছা, কিছু মনে করো না—আমি চিনতে পারি নি।

সিপিও। (সানন্দে) কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি—আপনার চুলে সেই ভারবেনার গন্ধ ছিল না? এখনো আছে?

ক্লিওপেট্রা। যে গন্ধই থাক, তোমার তাতে কি দরকার?—ভারবেনার গন্ধ কি সব-চেয়ে ভাল নয়?

সিপিও। ঠিক। আমিও তাই বলতে

[সিপিও অতি সন্তুর্ণণে অগ্রসর হইল—  
মঞ্চের দক্ষিণে রোমানরা এবং বামে রমণীরা—  
উভয় পক্ষই ঠিক একভাবে দাঁড়াইয়া সন্ধি-  
প্রার্থনা শুনিতে লাগিল]

ক্লিওপেট্রা। কিছু বলো বা নাট বলো—  
সে আমি গ্রাহ্য করি না। তোমার গন্ধ  
সম্বন্ধে আমিতো কিছু বলিনি—আচ্ছা, যে  
সম্বন্ধে মুগ্ধার মত বকবক করবার কি  
দরকার? থাক, তের হয়েছে—তত্নলোকের  
মত মশাট, এখন এগিয়ে এসো আমাদের  
নিয়ে কি করতে চাও, বল—

[সিপিও সবিনয়ে মাথা নীচু করিল এবং  
কিছুগণ চূপ করিয়া থাকার পর মুখে হাত  
দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিল—রোমানরা  
সবাই খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল  
এবং রমণীরা গভীর অবজ্ঞাভরে দাঁড়াইয়া  
রহিল]

ক্লিওপেট্রা। (বজ্রায় রক্তিম হইয়া)  
খিলখিল করে হাসলে কথার উত্তর হবে না।  
তোমরা কি ভয়ঙ্কর—আচ্ছা, বলছো না  
কেন—আমাদের নিয়ে কি করতে চাও—  
তোমরা কি করতে চাও? তোমরা সবাই  
বোধ হয় জানো—আমাদের সকলেরই বিবাহ  
হয়েছে এবং আমাদের স্বামী আছেন!

সিপিও। ভদ্রে, যদি অভয় পাই ত বাঁচ,  
তোমাদের হাতে আমরা প্রাণ-মন দেবার  
জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি—

ক্লিওপেট্রা। সত্যি! তোমরা সব তাই  
ভাবছো? তোমরা পাগল!

সিপিও। আমাদের দিকে একবার ভাল  
করে চেয়ে দেখ—আমরা সব ফুলবাবুর মত  
বেড়াচ্ছি না—আমাদের কাজকে চিরস্মরণীয়  
করে রাখতেও ব্যস্ত নই। আমাদের কথা  
একবার ভেবে দেখ। একটু দয়া কর,—  
যদি সকালে তোমাদের বামীরা উঠে দেখে,  
তোমরা কাছে নেই—তাহলে মনে মনে কিন্তু

১২

তার জন্তে একটু হুঃপ হুঃপে, জানি? কিন্তু  
খ, আমরা সব একলা রয়েছি—

হলকায় ভদ্রলোকটি। সত্যি, বড় একলা—  
ভেবোনিকা। (চোখ মুছিতে মুছিতে)  
ওদের জন্তে আমার ভারি হুঃপ হচ্ছে—

সিপিও। যে শুভ মুহূর্ত্ত হারিয়েছি—হে  
ভদ্রে, যাক্, ক্ষমা কর—আমরা সর্বাস্তঃকরণে  
তোমাদের স্বামীদের হুঃপে সমবেদনা প্রকাশ  
করছি—

ক্রিওপেট্রা। [সময়মে] তোমার মুখে এ  
কথা শুনে খুসী হয়েছি—

সিপিও। কিন্তু সে মুখগুলো—তারা  
তোমাদের ছেড়ে দিলে কেন?

[রোমানরা আনন্দে চীৎকার করিয়া  
উঠিল—“ঠিক বলছো, সিপিও, ঠিক বলছো”  
—কিন্তু রমণীরা ক্রোধভরে—“কি নীচ,—  
আমাদের স্বামীদের অপমান করছো—  
মিথ্যাবাদী বদমায়েসের দল”]

ক্রিওপেট্রা। (কর্কশ স্বরে) যদি এভাবে  
সন্ধি প্রসঙ্গ করো, তা হলে প্রার্থনা করছি—  
আমাদের স্বামীদের বিষয় বলবার সময় একটু  
সম্মান রেখে কথা কয়ো।

সিপিও। নিশ্চয়। খুব সম্মানের সঙ্গেই  
বলবো—কিন্তু দেখ, যতই আমরা সম্মান করি  
না কেন, তারা তোমাদের অযোগ্য, একথা  
স্বীকার করতেই হবে। ঠিক এ সময়, যখন  
তোমাদের অমানুষিক যাতনা আমাদের  
হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত করছে—পাহাড়ের  
ঝরণার মত স্বামী-বিরহী-বেদনী-জনিত উচ্চ  
অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে—এমন কি, এই  
পাথরগুলো তোমাদের হুঃপে নড়েচড়ে হুঃপ  
আর বিরক্তি জানাচ্ছে—

ক্রিওপেট্রা। থাক্, আর বেশী আড়ম্বর  
করে বলতে হবে না—

সিপিও। যখন সমস্ত প্রকৃতি,—বৈশ্ব  
থাক্—আচ্ছা, তোমাদের স্বামীরা কোথায়?  
তাদের কেন দেখছি না? তারা তো এলোই  
না—নিশ্চয় তারা তোমাদের ত্যাগ করেছে  
—যদিও তোমাদের বাগ হবে শুনে, তবুও  
বলছি—তারা অতি নীচের মত তোমাদের  
ত্যাগ করেছে—

[কোমরে হাত রাখিয়া রোমানরা  
এক ফুগাংরা দাঁড়াইল—রমণীরা উত্তেজিত  
হইয়া কাঁদিতে লাগিল—প্রসারপিলা মৃত্যুর  
বলিল, “ঠিক কথা, সত্যি তারা তো এখানে  
নেই—এই সময়েই তো তাদের এখানে আসা  
উচিত ছিল”]

ক্রিওপেট্রা। বাঃ, চমৎকার! সত্যি,  
তোমাদের দাড়ানোর ভঙ্গী ভারি সুন্দর—  
কিন্তু ভাবছো কি যে রাতে ডাকাত পড়ে  
আমাদের চুরি করে’ নিয়ে আসে—

সিপিও। সে কি, আমরা যে সারারাত  
গ্রহবীদের সঙ্গে—

ক্রিওপেট্রা। আর যদি দিনের বেলায়—  
সিপিও। না, না, না, দিনের বেলায়  
চুরির কথা ভেবো না—

[ভেবোনিকা অলসভাবে বলিল—“কি  
বিশী! অতদূরে এরা রয়েছে কেন? দূরে  
থাকলে যে আমার ভারী লজ্জা হবে”]  
আরও কাছে আসছে না কেন?

ভীলোকেরা। (মৃদু স্বরে) ওকে থামাও,  
চুপ করাও—

ক্রিওপেট্রা। আচ্ছা, তোমাদের সব  
দোষ সঙ্গেও তোমাদের জন্তে আমরা হুঃপিত,

কারণ যৌবনের স্রোতে তোমরা বিপথগামী হয়েছো। আর তোমাদের কঠোর জন্তেও আমরা সহায়ত্ব করছি। যাক্,—এবার কিন্তু এমন কথা বলবো, যাতে তোমাদের সব আশা গুচে যাবে, তোমরা লজ্জিত হও। আচ্ছা, মশাইরা, আমাদের ছেলেদের অবস্থা কি হবে, ভেবেছেন?

সিপিও। হাঁ, ঠিক বলেছ, সত্যি সে একটা গুরুতর সমস্যা। আচ্ছা, অধুমতি দাও, দলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কয়ে আসি—

[ পরস্পর পরস্পরের দলে ফিরিয়া গেল এবং আস্তে আস্তে কথাবাত্তা আরম্ভ করিল। ]

সিপিও। ভদ্রে—

ক্রিওপেট্রা। হ্যাঁ, বল, কি হলো?

সিপিও। বিস্তর বাক্বিতওয়ার পর আমার বন্ধুরা অর্থাৎ প্রধান রোমানরা তোমাদের বলতে বলেন—যে তোমরা আবার শীঘ্রই নতুন সন্তান লাভ করবে—

ক্রিওপেট্রা। [ চমকিয়া ] কি! তোমরা এত বর্ধর!

সিপিও। শপথ করছি, মশাইরা সব শপথ করুন—

[ রোমানরা গোলমাল করিয়া শপথ করিল ]

ক্রিওপেট্রা। কিন্তু চারদিকের দৃশ্য তত মনোরম নয়—

সিপিও। (রাগতভাবে) চারদিকের দৃশ্য!

ক্রিওপেট্রা। হ্যাঁ, এ বড় ভয়ানক জায়গা—চারদিকে পাহাড় আর চূড়ো—একেবারেই বিজী। এখানে এ পাথরটা রয়েছে কেন? সরিয়ে ফেল—

সিপিও। আচ্ছা, সরিয়ে ফেলছি—

[ পাথরটি সরাইল ]

ক্রিওপেট্রা। আর এ রকম গাছপালা—আমার এখানে দম আটকে যাচ্ছে—এ একটা বিজী গাছ এখানে, তোমরা বড় ক্লান্ত, নয়? আচ্ছা—আমি যাচ্ছি, এখন এসে উত্তর দেবো—

সিপিও। উত্তর, কিসের উত্তর?...

ক্রিওপেট্রা। কেন, আমার যে একটা প্রশ্ন করলে?

সিপিও। আমি, কমা করো—আমি কি বোকা হয়ে যাচ্ছি? তোমার আবার কিসের বিষয় প্রশ্ন করবো—

ক্রিওপেট্রা। আমার অপমান করবে, ভাবছো!

সিপিও। অপমান করব? আমি?

ক্রিওপেট্রা। হ্যাঁ, তুমি এখনি বলে না, যে বোকা না কি হয়ে যাচ্ছে—

ক্রিওপেট্রা। হ্যাঁ তুমিই—ওসব কথা আমি কিছু বলিনি—নিজে বলে আবার ভুলে যাচ্ছো—

সিপিও। কে? আমি?

ক্রিওপেট্রা। আচ্ছা, আমি চন্দ্রম—কথা কইতে দেবী হলে কিছু মনে করো না, ততক্ষণ একটু নিজেকে সাফ বুঝে দেখো। তোমার চেহারাখানি দেখবার জিনিষ। আচ্ছা, তোমার কি একখানা ক্রমালও নেই? মুখটা মুছে ফেল, ঘামে একেবারে ভিজে গেছে যে, যেন কত পাথর বয়ে এসেছে! [ সরিয়া যাইবার ভাণ করিল ]

সিপিও। কিছু মনে করো না—আমার বিশ্বাস, তাই করে এলুম—কিন্তু তোমাদের জন্তেই করতে হলো—

ক্রিওপেট্রা। আমার জন্তে ? কৈ, আমি তো ওসব কিছু বলিনি—

সিপিও। আচ্ছা, ক্ষমা কর। যাক—কি বলছিলাম ?

ক্রিওপেট্রা। আমি তা কি করে জানবো ?

সিপিও। ও বুঝেছি, আমায় নিয়ে ঠাট্টা কবছো—

ক্রিওপেট্রা। তুমি সেটা লক্ষ্য করেছো, দেখচি।

সিপিও। আমায় নিয়ে ঠাট্টা! আর

ক্রিওপেট্রা। কি করে আটকাবে ?

সিপিও। আমি এখনও অবিরাহিত—  
ভগবানকে ধন্যবাদ—

ক্রিওপেট্রা। আ মরি, আবার ভগবানকে ধন্যবাদও আছে! বা, বেশ বলেছো—  
তোমাদের শপথে বিশ্বাস করলে কি বিপদে পড়তুম—(সঙ্গদের ওলো, শুনেছি, এদের যে দী নেই, এর মধ্যেই এরা কৃতজ্ঞ—

সিপিও। কি সর্বনাশ! হয় আমাকে নিয়ে ঠাট্টা থামাও, নয়—

ক্রিওপেট্রা। নয় ত কি ?

সিপিও। নয়ত বাড়ী চলে যাও—হ্যাঁ, আমি বলছি, তোমরা বাড়ী ফিরে যাও—  
ঢের হয়েছে। আর কেন ? এই শেষ সত্যি, রাজ্য তো বসালুম, কিন্তু সে কি এই সব অসঙ্গত তর্ক-বিতর্ক শোনবার জন্তে ?

ক্রিওপেট্রা। অসঙ্গত ?

সিপিও। তা না ত কি !

ক্রিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমায় অপমান কবছো...

সিপিও। বা, কাঁদতে আরম্ভ করলে—

কি চাও, বলতো ?—আমায় বাব বাব দোষ দিচ্ছ কেন ? প্রবান হতে চলুম, কিন্তু তুমি দেখছি, আমায় গাফল করে দেবে! ঢের হয়েছে, কাগা থামাও গো, বালি কি ব্যাপার, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না যে! ক'পিয়ে ক'পিয়ে কাদছে—ব্যাপারখানা কি ?  
ক্রিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে)

আমাদের যেতে দেবে ?

সিপিও। নিশ্চয়। রোমানগণ, তোমাদের সবাইয়ের মত আছে ? আমি তো হাল ছেড়েছি—

হলকায় ভদ্রলোকটি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা সব চলে যাক—ইটুবিদ্ধা থেকে এবার কতকগুলো দীলোক ধরে আনা যাবে—

সিপিও। আচ্ছা, বেশ। তাই ভালো—এ জীবগুলো দীলোকটই নয়—এরা একেবারে—

ক্রিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) সত্যি বগছো !

সিপিও। সত্যি আবার কি ?

ক্রিওপেট্রা। আমাদের যেতে দেবে! হয় তো ফন্দা কবছো, যেই যাবে, আমি গিয়ে ধরে আনবে—

সিপিও। না, না, দৌড়ে পালাও—এখানে কি আঠা দিয়ে আমরা জুড়ে রেখেছি ?

ক্রিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমাদের বেখে আসবে ?

সিপিও। কি সর্বনাশ! তাবপর—

ক্রিওপেট্রা। তোমরা তো জানোই, এখন এখানে এনেছো, এখন আমাদের বেখে আসতে ভদ্রতাব পাতিবে তোমরা বাধ্য—  
পথটাও বড় সহজ নয়—

[ রমণীরা বিদেহভরে হাসিল—রাগে ক্রুদ্ধ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া সিঁপিও কিছু বলবার জ্ঞান বুঝা চেষ্টা করিল এবং মাটিতে পা ঠুকিয়া দলের কাছে ফিরিয়া গেল—বোমানরা সবাই রমণীগণের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া রহিল—রমণীরা আন্তে আন্তে পরামর্শ আরম্ভ করিল ]

ক্লিওপেট্রা। তোমরা সবাই শুনেছো—  
আমাদের এরা যেতে দেবে—

ভেরোনিকা। কি ভয়ানক !

দ্বিতীয় রমণী। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে—এ একেবারে অসহ্য ! নিরীচ ভাগ মানুষ আমরা, আমাদের ধরে নিয়ে এসে—রাত-দুপুরে বাড়ীতুল্ল জাগিয়ে তুলে জিনিষ-পত্র সব ভেঙ্গে-চুরে তচ্-নচ্ করে—ছেলেগুলোর ঘুম ভাঙিয়ে, আর তারপর কিনা এখন এখানে টেনে এনে বলে, -তোমাদের চাই না !

প্রথম রমণী। বেচারী স্বামীরা আমাদের বুথাই বসে ক্রুদ্ধ করছে—

দ্বিতীয় রমণী। ব্যাপারটা সব ভাবো দিকি। সেই রাতদুপুরে একেবারে মরার মত সবাই যখন ঘুমুচ্ছে—

তৃতীয় রমণী। আচ্ছা, তোমাদের কারো ফিরে যাবার পথ জানা আছে ?

চতুর্থ রমণী। কি আশ্চর্য্য ! তুমি কি ভাবো যে সারা পথ লক্ষ্য করতে করতে এসেছ—তাতো করিনি, আর করাও যায় না—তবে বেশ মনে আছে, পথটা অনেক—

তৃতীয় রমণী। এটা ঠিক, এরা আমাদের ফিরিয়ে রেখে আসবে না—

[ রমণীগণের চাপা হাসি বাক্য ]

ভেরোনিকা। \* (হৃৎস্পন্দিত হইয়া) দেবেছো, আমার সেই লোকটিকে ওরা পিছন কবে বসিয়েছে ? আচ্ছা, যাচ্ছি আমি—

প্রথম রমণী। ভেরোনিকা, থামো,—  
তোমায় ছেড়ে সে যাবে না—আমাদের ব্যবস্থাটা আগে শেষ হয়ে যাক—

প্রসারপিলা। আচ্ছা, আমাদের তো স্বামী নিয়ে কথা—এরা বা তারা, তা নিয়ে ঐক আসে যায় ! তারা বেশ, অথচ এরাও বন্দ নয়—স্বামী নিয়ে গোলযোগ করার দরকার নেই। বাড়ী গেলেই সে স্বামীটি আগেই খাবার করে' দিতে বলে, বরং এ নতুনটিকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাবে—সে স্বামীটি তো আমার হাতের তৈরি খাবার খেয়ে বিরক্ত হয়ে গেছে, বোজ বকাবকি করে। কিন্তু এ আহাম্মকটা আমার রান্না পেলে খুব আমোদ করে খাবে—

ক্লিওপেট্রা। ছি ছি প্রসারপিলা, কি বলছো—ইতিহাসে আমাদের হুর্নাম থেকে যাবে যে !

প্রসারপিলা। কত ইতিহাস আমাদের ব্যাপার জানতে পারবে ? আর এখানে রোমেতে এটা মোটেই খারাপ নয়।

ক্লিওপেট্রা। প্রসারপিলা, কি বিস্তীর্ণ কথা তুমি বলছ ! ভাবছো কি, ওরা ঐ সব কথা শুনেছে ? কিন্তু শোন—আর একটা মতলব ঠিক করছি—যদিও সেই প্রিয়তমদের কাছে ফিরে যাবো, তবু কথুটা হচ্ছে, পণ্ড অনেক, নিজেরাও ভারী ক্লান্ত—

প্রথম রমণী। আমার শরীর তো অবশ্য হয়ে একবারে মুখে পড়ছে তাই।

দ্বিতীয় রমণী। হাজারট বলো এ সহ্য

করা যাবে না—হঠাৎ, একাধাও কিছু নেই, রাহুপুরে ডাকাতের মত কাঁপিয়ে পড়ে বাড়ী-শুদ্ধ জাগিয়ে তুলে—

ক্লিওপেট্রা। সেই জন্তেই তো বলছি, এখানে দুদিন থেকে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক—তা হলে এরাও সম্ভব হবে, আমাদেরও কিছু করবে না। যখন দেখবে, আমরা বেশ শান্ত, প্রকৃত—আমাদের মঙ্গল তখন এরা ছেড়ে দেবে। সত্যি আমার সেই রোমানটির জন্তে দুঃখ হচ্ছে...তার নাকটি সত্যিই একেবারে দেখবার জিনিষ দাঁড়িয়ে গেছে...

তৃতীয় রমণী। কিন্তু দুদিনের বেশী এখানে থাকছি না...

চতুর্থ রমণী। একদিনই আমার যথেষ্ট... আচ্ছা একটু বেড়ালে হয় না?

ক্লিওপেট্রা। ওঠো, ওঠো, ওরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে...

ক্লিওপেট্রা। (সিপিওকে) বলি, মশাই, ও মশাই—

সিপিও। (না ফিরিয়া)। কি চাও, বল—

ক্লিওপেট্রা। দয়া করে একবার এদিকে আসবে?

সিপিও। বল না, আমি ঠিক আছি...

ক্লিওপেট্রা। ঠিক করেছে, তোমাদের হুকুম-মত এখন বাড়ী ফিরে যাবো...এতে বাগ হবে না তো?

সিপিও। না, মোটেই না—

ক্লিওপেট্রা। কিন্তু কথা হচ্ছে...ঠিক করেছে, আমরা একটু বিশ্রাম করবো—বিশ্রামের জন্তে এখানে একদিন থাকতে

দেবে? এ জায়গাটি আমাদের সবাব বড় ভাল লেগেছে...

[ বোমানগণ একসঙ্গে ফিরিয়া লাফাইয়া উঠিল ]

সিপিও। (সহর্ষে) জায়গার কথা কি বলছো...যেখানে যত দেবতা আছে, সবার নামে শপথ করে বলছি—

হেমহিলা। ওগো প্রাচীন রোমানবৃন্দ... না, ওর নাম কি—ওহে...সব ওঠো—জাহাজ ঠিক করো—চ—চলো।

ক্লিওপেট্রা। আমরা সবাই একটু বেড়ালে চাই—

সিপিও। আঃ—বোমানগণ—ওঠো না, দাঁড়িয়ে ওঠো—সেজে নাও—ডান, বা—ডান, বা—সারের-সারে হুকুম করে—

[ সিপিও ক্লিওপেট্রার হাত ধরিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল এবং তাহার আদেশ-মত সব রোমানই এক-একটি রমণীকে লইয়া তাহার পিছন-পিছন সার-বন্দী হইয়া সগর্বে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল ] ডান, বা—ডান, বা—এক, দুই—এক, দুই—

পলাস। (মন্দের উপর একা শুইয়া যন্ত্র দেখিতেছিল—হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এদিক ওদিক চাহিয়া) সে কৈ? কৈ সে? ওহে, সব দাঁড়াও—তাকে হারিয়ে ফেলেছি যে, কৈ, সে গেল কোথায়?

[ ভেরোনিকা নববধূর মত দাঁড়াইয়া ছিল—সুখ মাটির দিকে নত ]

পলাস। (অন্ধের মত তাহার দিকে দৌড়িয়া গিয়া) ক্ষমা করুন,—ভদ্রে—তাকে আপনি দেখেছেন?



ভেরোনিকা। তুমি মুখ্য, আহাম্মক—  
পলাস। কাকে ? আমাকে বলছেন ?  
ভেরোনিকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—মুখ্য—  
পলাস। ও কি, আমার ধমকাচ্ছে কেন ?  
আমি কি করলুম ?

ভেরোনিকা। তোমাকেই ধমকাচ্ছি।  
মুখ্য কোথাকার—দেখতে পাচ্ছে না ?  
প্রিয়তম, ত্রিশ বছর যে তোমার জন্তে আমি  
বসে আছি। ওঃ! চলো—চলো—আজ  
হাত ধরে আমার সঙ্গে নাও—

পলাস। কাকে নেবো ?—  
ভেরোনিকা। আমাকে ! আবার কাকে ?  
—দেখতে পাচ্ছে না, আমিই সে—আঃ—  
কি মুখ্য, আহাম্মক—

পলাস। তুমি ? না, না, তুমি তো সে  
নও—  
ভেরোনিকা। হাঁ, আমি বলছি—আমিই  
সেই—

পলাস। না, না, তুমি সে নও—  
বসিয়া কাঁদিতে লাগিল )

ভেরোনিকা। দেখছে, আমি একা পড়ে  
আছি—আমার লজ্জা করছে—ওঠো, চলো—  
পলাস। ( কাঁদিতে কাঁদিতে ) না, না,  
তুমি সে নও—আর-কেউ—

ভেরোনিকা। কিন্তু আমি বলছি, না—  
আমিই সেই। আঃ—বিরক্ত করে তুলে  
দেখছি—আমার মত আবার কাকে দেখলে ?  
—আমার সে স্বামীটি ত্রিশ বছর ধরে বলে  
আসছে—তুমি সে নও, আর-কেউ—আর  
এখন ছেলেমানুষ তুমিও সেই কথা বলছো !  
দাও, তোমার হাত দাও—

পলাস। ( ভয়ে উঠিয়া পড়িয়া ) তুমি  
সে নওগো, আর-কেউ। হায়, হায় ওগো,  
আমায় রক্ষা করো, সকলে রক্ষা করো—  
আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে !

ক্রমশঃ

ত্রিহুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

## ভারতের নগর

( ফরাসী হইতে )

ভারতের নগরে যাহা প্রথমেই চখে পড়ে,  
এবং যাহা হইতে ভারতের সামাজিক ও  
রাষ্ট্রিক অবস্থা বুঝিতে পারা যায় তাহা  
কি ?—না, যুরোপীয় ও দেশীয় লোকদের  
মধ্যে একটা পার্থক্য। অবশ্য, দেশীয়  
লোকদের মধ্যে অনেকে ইংরেজী নগরে  
বাস করে; আবার কাহারও কাহারও

আকিস্ ও দোকান আছে। কিন্তু দুই  
পৃথক্ সহর; চিনীয় সহর ও চীনের নিদিষ্ট  
যুরোপীয় বাসস্থান স্বরূপ পৃথক্—এ সেইরূপ  
পৃথক্।

বোম্বায়ে, কলিকাতায়, মাদ্রাজে, ইংরেজী-  
টোলা যুরোপকে স্মরণ করাইয়া দেয়; বড়  
বড় অট্টালিকা, হোটেল, ব্যাঙ্কের বড় বড়

হমায়ে, বাবসায় তেজাবতি ও সওদাগরীর কুটী, ইংরেজী কারখানায় তৈয়ারী জিনিসের বহু খরিকার-সম্বিত বড় বড় দোকান।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুরোপে যেক্রপ ছিল, কলিকাতায় সেইরূপ ক্লাসিক ধরণের অট্টালিকা; বোম্বায়ে, ভিনিস্ লম্বার্ড্ ও রোমের গগিক ধরণের ইমারৎ,—যে ধরণটা আমরা লণ্ডনের ইমানিস্তন অট্টালিকা-সমূহে দেখিতে পাই।

বাসগৃহ সকল ইংরেজী আদর্শের—ছোট কিন্তু সুখ-সুবিধাসম্বিত, সিঁড়ি আছে, বারান্দা আছে; অধিকাংশ বাড়ীই উত্তানের মধ্যে অবস্থিত; উপকণ্ঠস্থ বাগান-বাড়ীর উত্তান-উপবনে ফলের গাছ, তালজাতীয় গাছ ও বাঁশ-ঝাড় রোপিত হইয়া থাকে। চক্, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসর-ভূমি, প্রবাবস্থিত ও গ্যাস-আলোকে আলোকিত বড় বড় রাস্তা। গাড়া, অম্মনিবাস, ট্রামওয়ে। বোম্বায়ে একজন বড় বিশপ থাকেন। অনেক যুরোপীয় বাসিন্দা। দেশীয় লোকের মধ্যে অনেকের যুরোপীয় ধরণের পোষাক, আবার অনেকের দেশী পরিচ্ছদ; পাগড়ী ও জুতা। দেশীয় মহিলা অল্পই দেখা যায়,—কেবলই দাসী চাকরানী।

যে সকল নগরে ইংরেজ বাসিন্দার সংখ্যা তত বেশী নয়, সেখানে ছাউনী—(যেখানে সৈন্তরা থাকে তাহাই প্রকৃতরূপে ছাউনী নামের যোগ্য—কিন্তু ইংরেজটোলা মাত্রকেই ছাউনী বা হইয়া থাকে)—সরকারী ইমারৎ, প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের বাসগৃহ, সেনানিবাস, হাসপাতাল, কালেক্টর, অ্যাংলিক্যান ও প্রেসবিটেরীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের গির্জা। বড়

বড় গাছের ছায়া-সম্বিত রাস্তা। যুরোপ ও এশিয়ার বৃক্ষ-ভূষিত উত্তান, রমণীয় বাগান-বাড়ী;—অনেকগুলি তাগার বারগুা; সেই সব বারগুা আতপ-তাপ হইতে সুরক্ষিত। সানাসিধা ভাব, ইংরেজি সুখ-সুবিধা, একটু প্রাচ্যধরণের জাঁকজমক; সহজ-সাপা জীবন; অনেক ভ্রতা,—দাস্যবৎ পদনত ও আজ্ঞাবহ।

• •

দেশী সহর। বড় বড় রাস্তা;—ট্রামওয়ের দ্বারা কব্জিত,—এই ট্রামওয়ে, খোলা-ময়দানে অবস্থিত যুরোপীয় সহরের সহিত দেশী সহরকে সংযুক্ত করিয়া দেয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপথ; রং-করা কাঠের বাড়ী অথবা চুন-কাম করা মাটির বাড়ী,—তার নীচু চাল বা ছাদ; অন্তঃপুরের জানালা-বারগুা ও গরাদে-দেওয়া জানালা। যুরোপীয় ধরণে শিক্ষিত ধনী লোকদিগের সুরমা গৃহ :—কলিকাতায় বাঙ্গালী জমিদার, বোম্বায়ে গুজরাটী ও পার্সী কুঠীওয়ালার ও বণিকবৃন্দ। চারিদিকেই বড় রাস্তার ভিতর সর্ব সর্ব অপরিচ্ছন্ন আঁকা-বাঁকা জটিল গলিঘূর্ণি, ইটের ছাদ-ওয়ালার মাটির ঘর, চুন-কাম করা দরমার বেড়া। বেড়ার ভিতরে কলাগাছ, বাবলা-গাছ, ডুমুর-গাছ। রাস্তার উপর জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্ত সজ্জিত রহিয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নিজ গৃহের দরজার সম্মুখে অথবা কীর উন্মুক্তদ্বার কুটারের ভিতর কাজ করিতেছে। দাড়ি-কামানো হিন্দু ও লম্বা-দাড়ী মুসলমান; রঙ্গীন শাড়ী-পরা রমণীগণ—তাহাদের জন্ম ও জাহ্নু অনাবৃত, একটা শালা শাড়ী গায়ে জড়ানো ও তাহা কাঁধের উপর দিয়া গিয়াছে;

নগ্নশিশু ; কোথাও কোন শিশু চিকনের কাজ করিতেছে, কোথাও কুস্তকার, কোথাও বা কাঠের খোদাইকার আপন আপন কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। কেহ বা চাউল কুটিতেছে, কেহ বা ময়না পিষিতেছে।

বাজারের চতুর্দিকে রাস্তার ভীড়। সকল ছাঁচের সকল জাতীয় লোক, সর্বপ্রকার পরিচ্ছদ। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, গো মহিষের পাল। অনেক নগরেই প্রাচ্যদেশ-স্থলভ প্রকৃত বাজার। বোম্বায়ে, কলিকাতায়, আবৃত হাট-বাজার ; ভারতের সমস্ত ফল ; জাহাজে আনীত সিংহল ও শিঙ্গাপুরের ফল ; সমুদ্রের মৎস্ত, গুগলী ও কচ্ছপ ; মাংস, শিকার-পাখী, শাকসব্জি ; গরম-মসলা, আকিম।

বোম্বাই ও কলিকাতায় বন্দর—বড় বড় বাষ্পপোতের চারিপাশে দেশী নৌকার ভাড় ; জাহাজ-ঘাটের উপর লোকের ঠেলাঠেলি ; এদিকে এক প্রাচীরের আড়ালে, কোন ফেরীওয়াল দোকানদার তাহার জিনিসের খলিয়া খলিয়া বসিয়াছে ; কোথাও এক মেয়ে-গণৎকার ভাগ্য গণনা করিতেছে ; কোথাও সাপুড়িয়া তুবড়ী বাজাইতে বাজাইতে সাপের উপর একটা বেজি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে ; স্তম্ভের পোখের সাপ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, তার লেজ কুণ্ডলী-পাকানো ; গ্রীবাদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে—চ্যাপটা হইয়া গিয়াছে ; তাহা হইতে একটু ছোট মাথা বাহির হইয়াছে—দৃষ্টি স্থির।

ক্রিয়োতিরঞ্জননাথ ঠাকুর।

## জলের-আম্পনা

### পঁচিশ

পরের দিন সকালে জয়ন্ত বৃকের উপরে ছুইহাত রাখিয়া বিছানায় শুইয়া আছে—স্বপ্নের আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে ;—সে স্তব্ধ হইয়া সেই আলোকের তাপ আপন হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেছিল।

এমনসময় ভজহারি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “খোকন, ও-বাড়ীর জগৎবাবু তোমার সঙ্গে ঋণা কব্বতে চাইচেন।”

জয়ন্ত খড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, “জগৎবাবু !”

—“হ্যাঁ, তিনি আর সেই মেরেটি।”

জয়ন্তের মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

ক্র-সঙ্কোচ করিয়া বলিল, “ইন্দু ?”

“হঁ। গাড়ী থেকে দেকলুম জিনিষ-পত্র সব নামানো হচ্ছে—বোধহয় ওরা সবাই একুনি বিদেশ থেকে এল।”

চিস্তিত মুখে নীরস স্বরে জয়ন্ত বলিল, “ওঁদের ওপরে নিয়ে এস।”

একটু পরেই জগৎবাবুর পিছনে-পিছনে ইন্দু আসিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। জগৎবাবুর মুখ বিষম, চোখ ছলছলে, ভাব-ভঙ্গি অপরাধীর মত সঙ্কুচিত। ইন্দুও অত্যন্ত জড়সড়—তাহার মাথাটি বৃকের উপরে হেঁট হইয়া পড়িয়াছে।

জয়ন্ত—জয়ন্তার দিকে অন্ধ চোপ তুলিয়া বলিল, “জগৎবাবু, নমস্কার!”

জয়ন্তের দিকে তাকাইয়াই জগৎবাবু খমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন—এই সেই জয়ন্ত, সেই হস্তপ্রফুল্ল, গৌরকান্তি, পরমহৃন্দর জয়ন্ত! মানুষের দেহ এত-শাল্য এমন বদলাইতে পারে? জগৎবাবুর পা-থেকে-মাথা-পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল—তাহার মুখ একেবারে বোবা হইয়া গেল।

ইন্দুও বিবশ হইয়া গৃহতলে বসিয়া পড়িল—একবার দেখিয়াই ভয়ে শিহরিয়া, জয়ন্তের দিকে আর সে ভয়সা করিয়া মুখ তুলিতে পারিল না!

জয়ন্ত শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, “চুপ করে’ কি দেখছেন জগৎবাবু? এই জ্যাস্ত মড়াটাকে দেখে কি আপনাদের ভয় হচ্ছে?”

জগৎবাবুর চমক ভাঙিল। পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া, জয়ন্তকে একেবারে আপনার বুকের ভিতরে হুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া, হাট্কা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, “জয়ন্ত, জয়ন্ত, এ কী দেখতে এলুম জয়ন্ত, এ কী দেখতে এলুম!”

জগৎবাবুর সেই নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে জয়ন্ত চুপ-করিয়া পড়িয়া রহিল।—

অনেকক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া লইয়া জয়ন্ত একটু সরিয়া বসিল।

জগৎবাবু কাতর স্বরে বলিলেন, “জয়ন্ত, আমার ওপরে রাগ কোরো না বাবা, আমি এই জোড়াহাতে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি! তোমার নির্মল চরিত্রে আমি সন্দেহ করেছিলুম—তোমাকে অপমান করে’ আমি

তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—এ মহাপাপ আজ আমাকে দণ্ডে-দণ্ডে মারতে, আমার দিন-রাতকে বিষময় করে’ তুলেছে—আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর! ইন্দু, উঠে আয় মা, উঠে আয়—জয়ন্তের পায়ে ধরে বল্ হেঁদর বুড়ো বাপকে ক্ষমা কর্তে!”

কিন্তু ইন্দুর তখন সাড় ছিল না—মৃত দেহের মত স্থির হইয়া, নিম্পলক নেত্রে মাটির দিকে চাহিয়া সে তেমনি ঠায় বসিয়াই রহিল।

মনের আবেগে জয়ন্ত ইন্দুর কথা তুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জগৎবাবুর মুখে ইন্দুর নাম শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল! আপনার অন্ধ চক্ষুকে বরের চারিদিকে বুলাইয়া, অত্যন্ত অভিমানে কুলিয়া-কুলিয়া বলিল, “না, না, ইন্দুকে আর আসতে হবে না! আপনার ভ্রম ভেঙেছে আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট! তবে, আজ না এসে আর কিছুদিন আগে যদি আসতেন, তাহলে রোগের যাতনার ভেতরেও হয়ত আমি শান্তি পেতুম।”

এই সময়ে অবনী ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত নেত্রে সকলকার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, “এই যে, আপনারা এসেছেন! আমি জানি, আপনারা আসবেন!”

জগৎবাবু অবনীর হুইহাত ধরিয়া বলিলেন, “অবনীবাবু, আপনার কাছে আমি চিরদিন কেনা হয়ে রইলুম। আপনি যদি চিঠি লিখে সমস্ত না প্রকাশ করে’ দিতেন, তাহলে আমার বুক থেকে এক মহাপাপের বোঝা কোনদিনই হয়ত নামত না—” ধামিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন,

“কিন্তু আর দু-দিন আগে যদি এ খবরটা পেতুম!”

অবনী বলিল, “তাহলে সত্যিই ভালো হ’ত জগৎবাবু!”

জয়ন্ত বিধাতের জিজ্ঞাসা করিল, “অবনী-বাবু আপনাকে কি খবর দিয়েছেন জগৎবাবু?”

—“অবনীবাবুর পত্রেই ত কাল আমরা জানতে পারি, তুমি নিরপরাধ! স্বর্ণেন্দুর চক্রান্তের কথা তিনি সব প্রকাশ করে’ দিয়েছেন। সেই পত্র পেয়েই আমরা কলকাতার ছুটে আসছি।”

জয়ন্ত একেবারে অবাক হইয়া গেল। পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পর্য্যন্ত এই অবনীকে সে প্রত্যহ তাহার কাছে-কাছে ছায়ার মত লাগিয়া থাকিতে দেখিয়াছে এবং ভজহরির মুখে এও শুনিয়াছে যে, অবনী নিজেই ভালো-ভালো ডাক্তার আনাইয়া, তাহার দেশে খবর দিয়া বাহাতে চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষার কোন ক্রটি না-হয় সে-সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছে। অবনী তাহার প্রতিবেশী হইলেও এর-আগে তাহার বাসায় বড়-একটা আসিত না; তাহাদের মধ্যে সন্তাব বলিয়া কোন-কিছু ছিল না। বরং সে তাহার এক রকম শত্রু ছিল বলিলেই হয়। স্বর্ণেন্দুর সেই কুৎসিত ষড়যন্ত্রের ভিতরে অবনীরও যে যোগ ছিল, জয়ন্তের এ বিশ্বাস আজ-পর্য্যন্ত অটল আছে। সুতরাং, অবনী যে কেন তাহার সঙ্গে হঠাৎ এতটা আশ্বীয়তা করিতেছে, যাচিয়া উপকার করিতেছে, এর কোন হৃদিস্ না-পাইয়া জয়ন্ত মনে-মনে ভাবিত, সে বোধ হয় তাহাকে জয় করিবার ফিকিরে নূতন

কোন চাল চালিতে চায়! তবে এ সন্দেহ সে বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিত না— কারণ অবনীর চালচলনে পরের বিপদে সাহায্য করিবার ইচ্ছা ছাড়া আর কোন মন্দ অভিপ্রায় জয়ন্ত এখন-পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

কিন্তু আজ জগৎবাবুর কথা শুনিয়া জয়ন্তের সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। এহ অবনীকে সে বিশ্বাস না-করিয়া তাহার উপকারকে অপকার বলিয়া ভাবিয়াছে বলিয়া জয়ন্ত মনে-মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কৃতজ্ঞ স্বরে সে বলিল, “অবনীবাবু, আপনি জগৎবাবুকে চিঠি লিখে আমার যে উপকারটা করলেন, তার জন্তে—”

বাধা দিয়া অবনী বলিল, “তার জন্তে কি ভাষায় আমাকে ধন্যবাদ দেবেন, সেটা নিয়ে আপনাকে একটুও মাথা বামাতে হবে না জয়ন্তবাবু! আমি যা করেছি নিজের মাথা বাচাবার জন্তেই করেছি। সত্যি কথা বলতে দোষ নেই যে, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিছুদিন আগে বিশেষ মধুর ছিল না। এমন অবস্থায় স্বর্ণেন্দুর দোষের জন্তে আমাকে দায়ী হ’তে হয়—কারণ, সে আমার অন্তরঙ্গ না-হ’লেও বাল্যবন্ধু, আমার সঙ্গেই সে ঘোরে-ফেরে, জগৎবাবুর বাড়ীতে যায়। আর, ঠিক বলতে পারি না, তবে জয়ন্ত বাবুর দুখ দেখে আমার সন্দেহ হ’ত— তিনি যেন আমাকেই সন্দেহ করতেন।”

জয়ন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয়। কিন্তু সে-সব কথা আজ ভুলে যান—অসময়ে থাকে পাওয়া যায় তাঁর চেয়ে বড় বন্ধু এ পৃথিবীতে আর-কোথায় পাব?”

আনন্দ—আম্নত হইয়া জয়ন্তের দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া অবনী বলিয়া উঠিল, “তোমার ওপরে অনেক অবিচার করেছি জয়ন্ত, তার বদলে তুমি আমাকে’ যে বন্ধুত্ব আজ দান করলে, সে দান আমি প্রকার যশে মাথা পেতে নিলুম!”

এমনসময় ভজ্জহরি বাজার-মুখে ঘরে ফুকিয়া বলিল, “আপনার আমার খোকনকে একটু গুরুতে দিন,—ওর দেহের দশা দেখেচেন না!”

জয়ন্ত বলিল, “ভজ্জা, তোর কি এখনো বুদ্ধি হ’ল না! ভদ্রলোকদের—”

ভজ্জহরি মুখভার করিয়া বলিল, “তুই থাম খোকন! ভজ্জা বয়েসে তোর চেয়ে তিনগুণ বড়, আঁতুড়ঘরে তুই যখন ট্যা করিস্-নি, ভজ্জার বুদ্ধি আর মাতার চুল তকুনি পেকে উটেচে! ভজ্জার বুদ্ধিতে চললে আজ তোর এ হাল হ’ত না। তোর অম্মক বাড়ীতে ভুগতে হবোঁ ত আমাকেই!”—

অবনী হাসিয়া বলিল, “ভজ্জহরি, তোমার কথাই ঠিক, জয়ন্তবাবুকে এখনি এত বিরক্ত করা আমাদের উচিত নয়।”

ভজ্জহরি যো পাইয়া বলিল, “বলুন ত বাবু, বলুন ত! শুন্নি খোকন? না, অ্যাখনো বল্গি ভজ্জার মত অবনীবাবুরও বুদ্ধিহুদি কিছু নেই?”

জগৎবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ ভজ্জহরি, জয়ন্তকে আজ আমণা আর বিরক্ত করব না। ইন্দু, এস!”

ইন্দু এতক্ষণ তেমনি নীরবে বসিয়াছিল। পিতার আছবানে যেন হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্নের মাঝখানে জাগিয়া, ধীরে-ধীরে সে উঠিয়া

দাঁড়াইল এবং করুণ নয়নে একবার জয়ন্তের দিকে চাহিয়া নিদ্রোহা পা-ছুটোকে টানিয়া টানিয়া—যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত—ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

### ছানিবশ

সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের চোখের আড়ালে, ইন্দু আপন ঘরে একলাটি বাসমা-বসিমা কতকি যে ভাবিতেছিল!

আজ সকালে যে দৃশ্য সে দেখিয়া আসিয়াছে, সারাদিন আর তা ভুলিতে পারে নাই; জয়ন্তের সেই দুটি দৃষ্টিশূল কাতর অন্ধ চক্ষু, হু-হুটো বিষধরের মত রহিয়া-রহিয়া তাহার মস্তকের মাঝে দংশন করিতেছে,— আর কদম যাতনায় তাহার প্রাণ যেন বুকের মধ্যে ছটফট করিয়া মরিতেছে!..... ইন্দু ভাবিতেছিল, এর আগে সেও যদি অন্ধ হইয়া বাইত, তবে এমন নিদারুণ দৃশ্য আর ত তাহাকে দেখিতে হইত না!

আগে চের কথা ইন্দুর মনের তটে স্রোতের মত আসিয়া আঘাত করিতেছিল। সকালে জয়ন্তবাবুর বাসায় সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়ে একটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হইয়াছিল। ঘরের ভিতর হইতে সে মেয়েটিও মুখ বাড়াইয়া অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিল—তাহার গোখে যেন পলক পড়িতেছিল না। ইন্দু তাকে চেনে না—কখনো দেখেও নাই; কিন্তু সে যে কে, তা সে তখনি বুঝিতে পারিয়াছিল। জয়ন্ত বাবুর মুখে সে অনেকবার যার কথা শুনিয়াছে, এ নিশ্চয়ই সেই গৌরী!

তাহার ঘরের সামনেই রাস্তার ও-ধারে

জয়ন্তের বাসা। তাহার ঘর হইতে জয়ন্তের ঘরের ছোটখাট জিনিষটি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। জানলার পাশা ভেঙাইয়া, খড়্‌খড়ির ফাঁকে চোখ রাখিয়া আজ সারাদিন সে বসিয়া আছে। সমস্ত দিন গৌরী জয়ন্তের শিয়রে বসিয়া জয়ন্তকে পাখার চটুওয়া করিয়াছে, তাহার যখন যেটির দরকার, তখন সেটি হাতের কাছে যোগাইয়া দিয়াছে।

ইন্দুর চোখের স্রুপে, তাহারি কর্তব্য যেন গৌরী জোর-করিয়া কাড়িয়া লইতেছে! এ দৃশ্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠিলেও সে চোখ ফিরাইয়া মনকে ব্যাটাইতে পারে নাই! .....জয়ন্তের উপরে তাহার রাগ হইয়াছে, গৌরীর উপরে তাহার হিংসা হইয়াছে!

তারপরেই আবার বারবার মনে পড়িয়াছে, কাহারও উপরে রাগ, অভিমান, হিংসা করিবার তাহার আর কোন অধিকারই নাই! জয়ন্তের মনে আর কি তার একটু-খানিও ঠাই আছে? যে লোক সব ছাড়িয়া একদিন অধু তাকেই আপন করিতে চাহিয়াছিল, জীবন-মৃত্যু যখন যুঝাযুঝি করিতেছে—সেই অসময়ে সে যে তার দিকে একবারও ফিরাইয়া তাকায় নাই! এ নিষ্ঠুরতার কি ক্ষমা আছে?... ..

শেষ-ফাল্গুনের উদাসী বাতাস একটা গানের খানিকটা তাহার ঘরের ভিতরে বহিয়া আনিল।

সেই চির-চেনা স্বর ইন্দুর ভাবনা-বিতোর চিত্তকে আচর্ষিতে সচেতন করিয়া তুলিল---

"... ..গোধেছ যে রাগিনী

একাকিনী দিনে দিনে,

আজি ● যায় বোপে  
কৈঁপে কৈঁপে তুণে তুণে,  
গাঁথিতে যে আঁচলে  
• ছায়াতলে ফুলমালা,  
তাহারি পরশন  
হরষণ সুধাঢালা,  
ফাগুন আজো যেরে  
খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে,  
আজিকে সব ফাঁকি  
সে কথা কি গেছ ভুলে?

একদা তুমি প্রিয়ে,  
আম্মারি এ তরুণলে  
বসেছ ফুলসাজে  
সে কথা যে গেছ ভুলে!  
একদা তুমি প্রিয়ে ....."

ইন্দুর সমস্ত দেহ যেন শ্রবণময় হইয়া উঠিল, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আবেগভাবে ছট্‌চফু মৃদিয়া সে শুনিতে লাগিল,

"একদা তুমি প্রিয়ে—"

কে এ প্রিয়া?... ..এ কি, সে? তাকে কি এখনো তার মনে আছে—এ প্রিয়া কি বিস্মৃত প্রিয়া নয়?

ইন্দুর মুখের উপরে জাগ্রত ফাল্গুনের নন্দিত বাতাস উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া গেল, আর সেই স্মৃতি-জাগানো বাতাসের মোহন ছন্দের সঙ্গেই যেন তাল রাখিয়া অন্ধ জয়ন্ত গায়িতে লাগিল,

"ফাগুন আজো যেরে  
খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে,  
আজিকে সব ফাঁকি  
সে কথা কি গেছ ভুলে?"

এ হিমমতিমানীর কণ্ঠের জিজ্ঞাসা, না, বার্থ প্রেমের হতাশ ভিরকার ?.....ইন্দু ত ভুলে নাই—ভুলিতে পারে না! স্মৃতির যে মালা সে গাঁথিয়াছে, সে যে প্রশংসা যত্নে তাকে মর্মের ভিতরে চাপিয়া আছে! পাছে শুকাইয়া যায় সেই ভয়ে ইন্দু যে অশ্রুধারায় সে স্মৃতিমালাকে স্নিগ্ধসজল করিয়া রাখিয়াছে!

ইন্দু কঁাদিতে-কঁাদিতে ব্যথিত চোখজুট মেলিয়া দেখিল, জয়ন্ত তার ঘরের সামনের বারান্দায়, একলাটি চাঁদের আলোতে বসিয়া আপনমনে গান গায়িতেছে।

উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখিল, গৌরী তখন সেখানে নাই।

### সাতাশ

সেদিন বসন্তের হাওয়ায় জয়ন্তের মন হঠাৎ-কেমন উতল হইয়া উঠিল।

গৌরী যখন তাকে বারান্দায় বসাইয়া গৃহস্থালীর কাজে চলিয়া গেল, তখন চাঁদের আলো আসিয়া তাহার মুখ-চোখের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই আলোক-দূতের স্নিগ্ধ স্পর্শ পাইয়া, অভ্যাসমত সে আকাশের দিকে মুখ তুলিল—কিন্তু দেখিল অধু নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার! তখন মনে পড়িল তাহার এই জীবনব্যাপী নিবিড় তিমিরে চাঁদেব ছবি আর-কখনো জাগিবে না! ... ভবিষ্যতের যে আশার সাম্রাজ্য এতদিন সে মনে-মনে গড়িয়া তুলিয়াছিল—নির্যাতন একটি আঘাতে আজ তাহা ভাঙিয়া চূরনার হইয়া গিয়াছে,—কল্পনার সেই বিশাল ধ্বংসস্থাপে আজ তাহার জীবনমূর্ত্ত হৃদয় অধু দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল আর হাহাকার সম্বল করিয়া পড়িয়া আছে!... ..

তাহার স্মৃতির প্রশ্নে আজ সমস্ত অতীত পুড়িয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া বাইতেছে!

জয়ন্ত সকাঁতবে বলিয়া উঠিল, “ভগবান, চোখ কেড়ে নিলে, কিন্তু এ পোড়া চোখের জল ত তবু শুকল না—তোমার এ কি অরিচার!”

জয়ন্ত অনেকক্ষণ আপনাতে আপনি বিলীন হইয়া বসিয়া রহিল। কী যে ভাবিতেছিল, সেট-ই জানে!

ইন্দুদের বাগান হইতে কোকিল-পাখিয়ার মিলিত কণ্ঠে বাসন্ত-জ্যোৎস্নার বন্দনাগান কুটিয়া উঠিল। মাঝে মাঝে বাতাস জাগিয়া তাহার কাণেকাণে যেন নিষ্ঠুর কোড়াকে গারংবার বলিয়া যাইতে লাগিল, তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ!

... .. জয়ন্তের ক্ষুধিত অন্তরের ভিতর হইতে তাহার প্রেম-বেদনার ভাষা ধীরে-ধীরে প্রাণের আবেগে, গানের কণায় কুটিয়া উঠিল,—

“একদা তুমি প্রিয়ে,—”

তাহার তৃষাতাপিত চিত্তের সমস্ত অতৃপ্তি আজ যেন এই বাগিনীকে গুরুর একটা হাহাকারের মত কল্পণ করিয়া তুলিল!

একবার, দুইবার, তিনবার গায়িয়া জয়ন্ত আবার নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ; হঠাৎ জয়ন্তের মনে হইল তাহার পাশেই যেন কাঁটার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে!

হাত বাড়াইতেই আর-একজনের নরম হাত তাহার হাতে ঠেকিল। জয়ন্ত বুঝিল এ গৌরী, তাহার গান শুনিয়া এখানে আদিয়াছে।



সে একটু লজ্জিত হইল। মনের আবেগে সে এ-বাড়ীতে গোরীর অন্তিস্থের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল—নহিলে এ গানটা গোরীর সামনে কখনোই গায়িত না। সঙ্গীতে তাহার হৃদয়ের যে প্রতিধ্বনি ছিল, তাহা শুনিয়া গোরী নিশ্চয় কাতর হইয়াছে।

গোরীর হাতখানি ধরিয়া জয়ন্ত অমৃতাপ-ভরে মুহূর্ত্তের ডাকিল, “গোরী!”

সাদা মিলিল না—তাহার হাতের ভিতরের হাতখানি যেন অসহায়-ভাবে আরো এলাইয়া পড়িল।

—“গোরী, তোমার কাজ এরি-মধ্যে সারা হয়ে গেল?”

—“জয়ন্তবাবু, আমি গোরী নই!”

—“ইন্দু! তুমি!”—সাবিত্রীয়ে এই কথা বলিয়া জয়ন্ত ইন্দুর হাত ছাড়িয়া দিল।

কোন কথা না বলিয়া জয়ন্তের পায়ের কাছে ইন্দু বসিয়া পড়িল।

বিশ্বয়ের প্রথম বেগটা যখন কাটিয়া গেল, জয়ন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, “ইন্দু, তুমি কখন এখানে এলে?”

ইন্দু আস্তে-আস্তে বলিল, “আপনার গান শুনে বাড়ীতে আর পাক্তে পারলুম না।”

“আমার গান এখনো কি তোমার ভালো লাগে ইন্দু?”

—“জয়ন্তবাবু, আপনার গান আমার ভালো লাগে না। আপনি এমন কথা কি-করে’ বললেন!”

জয়ন্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “এ জীবন যখন শেষ হয়ে যাচ্ছিল ইন্দু, কৈ, তখনো ত তুমি একটি ছত্র লিখে আমার খবরটা নেওয়াও

দরকার মনে কর-নি! তাই ~~ভেবে~~ছিলুম, আমার কথা তুমি ভুলে গেছ।”

জয়ন্তের কথাগুলো শাণিত অন্তরের মত ইন্দুর প্রাণকে যেন ছিঁড়িয়া খান্ খান্ করিয়া দিল;—সে আঘাত কোনরকমে সহিয়া আহত কণ্ঠে ইন্দু বলিল, “জয়ন্তবাবু, আপনার অসুখে খবর আমি পাঠ-নি। বাবা জানতেন, কিন্তু আমার কষ্ট হবে ভেবে আপনার কথা আমাকে তিনি বলেন-নি!”

জয়ন্ত চুপ করিয়া র’ল। তারপর হঠাৎ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এখানে এসেছ আর কেউ কি দেখেছে?”—

—“আপনার চাকর দেখেছে।”

—“তবে আর কেউ দেখবার আগেই তুমি বাড়ী যাও। ভেবনা, আমি রাগ করে’ একথা বলছি। তোমাকে এখানে আর কেউ দেখতে পায়, এ আমার ইচ্ছা নয়!”

—“আর কেউটা কে জয়ন্তবাবু? আপনার গোরী? কেন, তাঁকে আমার ভয় কি?”

জয়ন্ত বাধো-বাধো গলায় বলিল, “ভয়ের কথা বলছ না। কিন্তু—”

—“ধামলেন কেন? বলুন!”

—“নিতান্তই শুনবে ইন্দু? তোমাকে এখানে দেখলে গোরী কিছু মনে করতে পারে!”

—“তিনি আর বেশী কি মনে করবেন? আপনার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তিনি কি তা জানেন না?”

জয়ন্তের মাথা-হইতে-পা-পর্যন্ত চমকিয়া উঠিল। বিস্মিত স্বরে বলিল, “ইন্দু, এ কী বলছ!”

জয়ন্তের চমকিত ভিত্তিত মুখের দিকে দৃকপাত-মাত্র না করিয়া, ইন্দু প্রশান্তভাবে অনিচল স্ববে বলিল, “আমি আপনাকে ছেড়ে যাব কেন? দাঁকে স্বামী বলে—”

বিবর্ণমুখে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া জয়ন্ত বলিল, “তুমি এখনো আমাকে বিবাহ করতে চাও!”

—“কেন চাইব-না জয়ন্তবাবু! আপনাকে ছাড়লে আমি দাঁড়াব কোথায়?”

—“ইন্দু, ইন্দু, তুমি কি ভুলে গেছ আমি অন্ধ, রোগে ক্ষতবিক্ষত—কুৎসিত?”

নারীর স্বাভাবিক লজ্জা আসিয়া ইন্দুর মুখবন্ধ করিয়া দিতে চাছিল। কিন্তু সে বয়িল, আজ যদি সে নীরব হইয়া থাকে, তবে সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহাকে এই নীরবতার শান্তি ভোগ করিতে হইবে। অতএব মনকে শক্ত করিয়া সে বলিল, “জয়ন্তবাবু, আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হবার পর আপনি যদি এমন হ’তেন, তাহলে আমি কি আপনাকে ত্যাগ করতে পারতুম?”

জয়ন্ত বলিল, “কিন্তু আমাদের বিবাহ ত হয়-নি! তখন তুমি বাধা হয়ে যা করতে—”

জয়ন্তকে মুখের কথা শেষ না-করিতে দিয়াই ইন্দু বলিল, “এখন স্বৈচ্ছায় তাই করব! দুটো মন্ত্র পড়া হয়-নি বলেই যে আমাদের বিবাহ হয়-নি, কেন আপনি তা ভাবছেন? আমাদের সাক্ষী যে অন্তর্যামী!”

—“তাই যদি হবে ইন্দু, তাহলে একটা তুচ্ছ অপবাদ শুনেই তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে কেন? অপবাদে লোকে কি স্বামীকে ত্যাগ করে?”

ইন্দু বেদনাবদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “বারবার আপনি খালি ঐ কথাই ভাবছেন! কিন্তু আমি যে স্বাধীন নই, আমার মাথার ওপরে যে বাবা আছেন, সেটা ত একবারও মনে করতেন না!”

—“কিন্তু তোমার বাবা যে অন্ধের হাতে তোমাকে দেবেন না, তুমিও ত সেটা ভাবছ না!”

—“অন্ধ! কী হয়েছে তাতে জয়ন্তবাবু? অন্ধ বলে বাবা আপনাকে ত্যাগ করবেন?—আমি কি বাবাকে চিনি না? এমন মানুষ তিনি নন!”

—“তুমি তোমার মনের কথা বলছ ইন্দু, —কিন্তু অন্ধের হাতে কন্যা-সম্প্রদান করতে যে কোন পিতাই সম্মত হবেন না!”

—“জয়ন্তবাবু, বিশ্বাস করুন, আপনি অন্ধ হয়েছেন বলে বাবার মত বদলায়-নি। আমি তা জানি।”

পৃথিবীতে দুটি জিনিষকে ভোলা যায় না—প্রেম ও মৃত্যু! ইন্দুর কথায় তাই জয়ন্তের মনের বাধ-একটু-একটু করিয়া ক্রমেই আলগা হইয়া আসিতেছিল—ইন্দুকে সে যে এখনো ভালোবাসে! কিন্তু যে গৌরী তাহার অসহায় রোগশয্যার পাশে বসিয়া দিবারাত্র অনাহারে-অনিদ্রায় কাটাইয়াছে, প্রাণপণে যে তাহাকে সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছে, তাহাকে আর ত সে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না! এ যে তাহার মহা কর্তব্য! গৌরীর মুখ ভাবিয়া জয়ন্ত ইন্দুর আশায় একেবারে জ্বালাজ্বলি দিল। ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট স্বরে বলিল, “ইন্দু, কেন তুমি আর-দুদিন আগে আস-নি! মায়ের প্রাণে

বাথা দিয়ে তাঁর মৃত্যুর হেতু হয়েছি, এখন  
যার দ্বায় প্রাণে বেঁচে আছি, সেই গোরীকে  
তাগ কর' আমি ত মনুষ্য হারাতে  
পারব না! সে মহাপাপ করলে আমার  
ইহকাল-পরকাল দুই যাবে। ইন্দু, তোমাকে  
আমি ভালোবাসি—চিরকাল ভালোবাসব—  
সেই ভালোবাসা সঞ্চল করে'ই আমাকে জীবন  
কাটাতে হবে—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার  
মিলন অসম্ভব!”

শুনতে-শুনতে যাতনায় ইন্দুর কাণ যেন  
ধ্বনয় হইয়া গেল;—মনের ব্যথা মনে  
চাপিয়া রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও  
পারিল না—আপনার অজ্ঞাতসারেই সে  
হঠাৎ হৃদয় খাইয়া পড়িয়া জয়ন্তের দুই-পা  
দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া বিহ্বলভাবে বলিল,  
“ওগো, আমাকে তুমি তাগ কোরো না,  
আমাকে তুমি তাগ কোরো না!”

প্রেম হচ্ছে বাতির শিখার মত; তখন  
সে বেশী-করিয়া জলিয়া উঠে, শেষমুহূর্ত যখন  
কাছে ঘনাইয়া আসে।

ইন্দুর সেই ব্যাকুল আত্মনিবেদনে  
জয়ন্তের শিরায়-শিরায় তপ্ত রক্তপ্রবাহ  
উথলিয়া উঠিল,—তাহার সমস্ত চিত্ত একেবারে  
ইন্দুর বুকের উপরে গিয়া আছড়াইয়া পড়িবার  
জন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল!... ..কিন্তু জয়ন্ত  
প্রাণপণে আপনাকে আবার সামলাইয়া লইয়া,  
অতি কষ্টে অশ্রুট বিদীর্ণ করে বলিল, “ইন্দু,  
তুমি বাড়ী যাও!”

ঝর-ঝর-ঝর অশ্রুজলে, জয়ন্তের দুই পা  
ইন্দু ভাসাইয়া দিল।... ..

জয়ন্ত ভবু পাথরের দেবমূর্তির মত অচল-  
অটল হইয়া বসিয়া রহিল—বসিয়াই রহিল!

## আটাশ

বামুন লুচি বেলেতেছিল এবং গোরী  
নিজের হাতে একে-একে সেগুলি ভাজিয়া  
তুলিতেছিল। বামুনের হাতে জয়ন্তকে  
খাওয়াইয়া গোরীর মনের সাধ মিটিত না—  
রান্নাবান্নার ভার তাই সে আপন হাতে  
গ্রহণ করিয়াছিল।

ভজহরি আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।  
গোরীর দিকে হাতের কলিকাটা আগাইয়া  
দিয়া বলিল, “দিদি গো, একটু তামুক খেতে  
বাসনা হয়েছে, ধাঁ-করে’ একটুকরো আশু  
দাও-দিকি!”

আশু দিয়া গোরী বলিল, “ভজহরি,  
তুমি ওপরে বাবুর কাছে যাও, তিনি একলা  
আছেন।”

ভজহরি কলিকাতে ফুঁ দিতে-দিতে বলিল,  
“অ্যাকলা থাকবেন ক্যানো, ও-বাড়ীর সেই  
ঠাকুরোণটি যে এয়েচেন।”

চকিতে মুখ ফিরাইয়া গোরী বলিল,  
ও-বাড়ীর ঠাকুরোণটি আবার কে?”

—“ঐ যে গো, ইন্দু না বিন্দু—আমার  
বাছা অত নাম-টাম্ মুকুত টুকুত থাকে না!  
ঐযে থোকন যাকে বৌ করবে বলে  
ফেপেচিল—বুকেচ? তা দ্যাকো দিদিমণি,  
থোকনের তাকে পছন্দ হ'লে হ'বে কি,  
মেয়েটা বাপু হন্দবেহায়া! এই দ্যাকনা,  
মাক-রাস্তা দিয়ে পায়ে জুতো পরে মদের মত  
গটমট করছে-করছে অ্যাকলা আমাদের বাসায়  
এসে চুকল—বেন ভয়-ডর লজ্জা-সরম কাকে  
বলে জানে না। ও খেটানি, বুকেচ দিদিমণি,  
নিশ্চয় বীত ভজ! ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লো না,

তাই রক্ষে—নৈলে ও পোকনের জাত না-  
মেরে ছাড়ত না।”—আপনমনে ইন্দুর সবকে  
তাহার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে-  
করিতে এবং কলিকায় কুঁদিতো-দিতো  
ভজহারি চলিয়া গেল।

গৌরী চিত্রাপিতের মত বসিয়া রহিল  
—শুভ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাখিয়া।  
ভজহারির শেষ-কথাগুলোর একটাও তাহার  
কাণে চুকে নাই।

বামুনঠাকুর বলিল, “মা-ঠাকুরোণ, কড়া  
য়ে জলে যাচ্ছে!”

তখন গৌরীর হাঁস হইল। তাড়াতাড়ি  
যেমন তেমন করিয়া বাকি লুচিগুলো ভাঙিয়া  
তুলিয়া সে বাগল, “ঠাকুর, লুচিগুলো চাপা  
দিয়ে তুমি একটু বোসো, আমি একুনি  
আসছি।”

গৌরীর মনে হঠাৎ একটা কোতুল  
জাগিয়া উঠিল—উপরের ঘরটা একবার উকি-  
মারিয়া দেখিয়া আসিবার জন্ত।

উপরে উঠিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া সে  
জয়ন্তের ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।  
সেইখানে হইতে দেখিতে পাইল, জয়ন্তকে  
সে যেখানে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল ঠিক  
সেই জায়গাতেই সে বসিয়া আছে। তাহার  
পায়ের কাছে একটি রমণী-মুষ্টি—মুখখানি  
ভাং হেঁট-করা। চাঁদের আলায় তাহার  
মুখ স্পষ্ট দেখা যাউতেছিল না—কিন্তু  
গৌরীর বৃত্তিতে বিলম্ব হইল না,—কে সে!

গৌরী শুনিতে পাইল ইন্দু বলিতেছে—  
“ছোটো মন্ত্র-পড়া হয়-নি বলেই যে আমাদের  
বিবাহ হয়-নি, কেন আপনি তা ভাবছেন?  
আমাদের সাক্ষী যে অগুণীমী!”

—শুনিয়াই গৌরীর জ্বালাপাতা বৃদ্ধি  
মাঝে দোল খাইয়া ছপছপ করিয়া  
উঠিল!... ..

তারপরেই জয়ন্ত কথা কহিল। জয়ন্তের  
কথা শুনিয়া গৌরীর আবার আশা হইল,—  
কৃতান্ত আগ্রহভরে সেইখানে দাঁড়াইয়া কাণ  
পাতিয়া সে জয়ন্তের কথা শুনিতে লাগিল।

কিন্তু, ইন্দুর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলেও,  
জয়ন্ত কাতর স্বরে যে কথাগুলি বলিল,  
তাহা শুনিয়া গৌরীর মনে হইল, কে-যেন  
তাহার কাণের ভিতরে হুড়হুড় করিয়া  
দ্রবীভূত অগ্নির ধারা ঢালিয়া দিল।  
আদালতে দাঁড়াইয়া আসামী যখন বিচারকের  
মুখ হইতে ফাঁসীর ছকুন শোনে,—গৌরীর  
অবস্থা তখন ঠিক সেইরকম!

এক-মুহূর্তের মধ্যে গৌরী বৃত্তিতে পারিল,  
জয়ন্ত তাহাকে গ্রহণ করিবে অথু কর্তব্যের  
দায়ে বাধ্য হইয়া,—জয়ন্তের প্রাণ তাহার  
প্রতি একান্ত বিমুখ!... ..সে যদি জয়ন্তকে  
বিবাহ করে, তাহাহইলে অক জয়ন্তের  
নিরানন্দ জীবন চিরদিন ব্যর্থপ্রেমের হতাশ  
হাহাকারে ভরিয়া থাকিবে—তাহার বাহিরের  
দেহ এবং ভিতরের মন দুইই একসঙ্গে সমান-  
অসার্থক হইয়া যাইবে!... ..

গৌরী দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া অপার ভাবনা  
ভাবিতে লাগিল।

ওদিকে জয়ন্তের পায়ে পড়িয়া অত্যন্ত  
ইন্দু অনেকক্ষণ নীরবে চোখের জল ফেলিল,  
কিন্তু জয়ন্তের কঠোর মৌনব্রত কিছুতেই  
আর ভঙ্গ করিতে পারিল না; দুইহাতে  
মুখ ঢাকিয়া অভিজ্ঞতের মত বসিয়া, জয়ন্ত  
আপনার বুকের তুফান বুকের ভিতরেই

চাপিয়া বাধিল। ইন্দুর চোখের প্রতি অশ্রুবিন্দু তাহার পায়ের উপরে পড়িতেছে, আর জয়ন্তের মনে হইতেছে, তাহার কঙ্কাল হইতে যেন এক-একখানা হাড় খসিয়া-খসিয়া সেই অশ্রুসাগরে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে।

অবশেষে ইন্দু, বারান্দার রেলিং ধরিয়া, আপনাব্যবস্থা দেখটাকে কোনমতে টানিয়া দাঁড় করাইল। তারপর আস্তে-আস্তে ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া বলিল, “জয়ন্তবাবু, আপনি নির্যাতনের চেয়েও নিষ্ঠুর! আপনি ভালো থাকুন স্বখে থাকুন—এই আমার শেষ-কামনা।”

জয়ন্ত তেমনি মুক হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

নয়নাগ্রে সমস্ত প্রাণ একাগ্র করিয়া, জয়ন্তের দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ইন্দু ধীরে-ধীরে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহাকে দেখাইতেছিল ঠিক যেন একখানি জীবন্ত বিষাদ-প্রতিমার মত।

তাহার পদশব্দে জয়ন্ত চমকিয়া মুখ তুলিল—পাগলের মত সামনে হইহাত বাড়াইয়া, ক্রন্দনভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ইন্দু, ইন্দু!”

ইন্দু ধমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

—“তোমার চোখের জল আমার পা থেকে ইহজীবনে আর শুকবে না—ইন্দু, এ অভাগাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো!”

ইন্দু কলের পুতুলের মত দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

জয়ন্ত আবার বলিয়া উঠিল, “যেওনা ইন্দু, যেওনা—যেওনা!”

ইন্দু আবার ঠাড়াইয়া বলিল, “কি বলছেন জয়ন্তবাবু!”

—“না, না, কিছু বলছি না,—তুমি যাও, তুমি যাও”—বলিতে-বলিতে জয়ন্ত মুচ্ছিতের মত টলিয়া মাটির উপরে হেলিয়া পড়িল।

সে পতনশব্দ শুনিয়া ইন্দু ও তাহার পিছনে-পিছনে গৌরী তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া আসিল।

গৌরীকে দেখিয়াই ইন্দুর মুখ শুকাইয়া পাড়াপ হইয়া গেল—খতমত খাইয়া পায়ের পা বাধিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

গৌরী কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না—একেবারে জয়ন্তের পাশে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

কিন্তু গৌরী কোন সাহায্য করিবার আগেই জয়ন্ত হুইহাতে তর্ দিয়া আবার উঠিয়া বসিল।

গৌরী তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কোথায় লেগেছে?”

জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “গৌরী! তুমি কোথেকে এলে?”

গৌরীর মুখে মিথ্যা কথা বাধিয়া গেল। ইতস্তত করিয়া বলিল, “আমি এইখানেই ছিলাম।”

—“এইখানে ছিলে! কতক্ষণ?”

—“এই ধানিকক্ষণ।”

—“ইন্দু—ইন্দুকে—”

—“হ্যাঁ, তাঁকে আমি দেখেছি!—”

ফিরিয়া ইন্দুর ষির্ষণ মুখের দিকে তাকাইয়া গৌরী আবার বলিল, “এই যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন!”

—“ইন্দু! ইন্দু এখানে আছে!”

—“তোমার কোথায় লেগেছে বল-না?”

—“কোথাও লাগে-নি, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে বাওয়াতে পড়ে গিয়েছিলুম।...অনেক রাত হ’ল ইন্দু, এবার তুমি বাড়ী যাও!”

ইন্দু দরজার দিকে ফিরিতে-না-ফিরিতে গৌরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল। কোমল স্বরে বলিল, “তুমি কোথা যাও বোন!”

ইন্দু অবাক হইয়া গৌরীর মুখের পানে ফ্যান্‌ফ্যান্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

গৌরী একটুখানি স্নান হাসি হাসিয়া বলিল, “উনি যেতে বল্‌ছেন বলেই জম্মি তুমি চলণে দিদি? এত সহজে কি নিজের পাওনা ছাড়তে আছে ভাই! যা আদায় করতে এসেছ জোর কবে’ তা আদায় কবে’ নিয়ে যাও।”

আরো-বেশী ব্যস্ত হইয়া জয়ন্ত বলিল, “ইন্দুকে যেতে দাও গৌরী, রাত হয়ে যাচ্ছে যে!”

সে কথায় কাণ না-দিয়া ইন্দুকে জোর-করিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া গৌরী বলিল, “যে সংসারে আর দুদিন পরে তুমি ঘরের লক্ষ্মী হয়ে বসবে, এরি-মধ্যে সেখান থেকে পালাই-পালাই করলে চলবে কেন?”

ইন্দু হতভম্ব হইয়া মাথা তুলিল, এ নির্দয়া কি তাহার দুঃখে বিজ্ঞপ করিতেছে?

জয়ন্ত বুঝিল, গৌরী সব দেখিয়াছে, সব শুনিয়াছে! মনে-মনে প্রমাদ গণিয়া সে বলিল, “গৌরী, যা তা কী বলছ?”

গৌরী ধীর শাস্ত স্বরে বলিল, “যা তা কিছুই বলছি না।”

—“গৌরী!”

—“না, তুমি আমাকে বাধা দিও না। তোমাকে এঁর হাতে সপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরে যাব!”

—“দেশে ফিরে যাবে?”

। —“হ্যাঁ, দেশে।”

—“আমি ত সে কথা বলছি না গৌরী! তুমি দেশে ফিরে যাবে কেন?”

এ প্রশ্ন শুনিয়া গৌরীর কান্না আসিতে-ছিল,—কোনক্রমে অশ্রুর বেগ্‌ সাম্পাংিয়া সে বলিল, “আমার ত আর-কোথাও ঠাঁই নেই।”

—“গৌরী, তুমি কি আমাকে কষ্ট দিতে চাও?”

—“না, তোমার কষ্ট হবার ভয়েই আমি দেশে ফিরে যাব! ...চোখ হারিয়ে তুমি যে-যত্না দিন-রাত ভোগ করছ, তার ওপরে যদি আবার মনের সুখও হারাও, তবে তুমি বাঁচবে কেমন করে?” বলিতে-বলিতে দুঃখের আবেগে গৌরীর গলা দুঃখিয়া আসিল; একটু থামিয়া সে আবার বলিল, “তোমার চেয়ে আপনজন আমার কেউ নেই গো, কেউ নেই! কিন্তু নিজের সুখের জন্তে আমি যদি তোমার দরদ না-বুঝি তাহলে আমিও মরব, তোমাকেও মরব! আমার কাছে তুমি কিছু লুকিও না—আমি তোমার মন জানি! তুমি ত আমাকে ত্যাগ করছ নী—আমিই তোমাকে ছেড়ে যাব্বি, এতে তোমার আর দোষ কি বল? আমি যখন মন স্থির করেছি, তখন তোমার কোন বাধাই আর মানব না!—”

গৌরী হঠাৎ থামিয়া, জয়ন্তের একখানি

হাত ধরিয়া, ইন্দুর দিকে ফিরিয়া বলিল,  
“দিদি, তোমার হাতখানি দাও ত।”

ইন্দু আচ্ছন্নের মত আন্তে-আন্তে একখানি  
হাত বাড়াইয়া দিল।

ইন্দুর হাতে জয়ন্তের হাত রাখিয়া, গৌরী  
অনিমেষ নয়নে বাহিরের আকাশ-ভরা চাঁদের  
আলোর দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রান্তের মত দেয়ালের উপরে ছেলিয়া  
পড়িয়া, কেমন ধুঁকিতে-ধুঁকিতে জয়ন্ত বলিল,  
“আমার জন্তে তোমারও চোখে জল পড়বে ?  
এমনি পাখণ্ড আমি,—যাব কাছে যাব তাকেই  
কাদাব।”

জয়ন্তের নিস্ত্রস্ত মুখের উপরে প্রশান্ত  
দৃষ্টি রাখিয়া পরিষ্কার স্বরে গৌরী বলিল,  
“কৈ, আমার চোখে জল কৈ ? চোখের জল  
ফেলে আমি তোমার অকল্যাণ করব ? এমন

কথা মনের কোণেও ঠাই দিও না—বতদিন  
বাঁচব দেবতার কাছে প্রার্থনা করব,  
তোমাদের বাতে মঙ্গল হয়।”—একটি করুণ  
অখণ্ড সুন্দর শুভ হাসির সঙ্গে মনের সমস্ত  
মালিন্য বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া গৌরী উঠিয়া  
দাঁড়াইল।

ইন্দুর দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে গৌরী  
বলিল, “একটু বোসো ভাই, অনেক  
কথা আছে ! গুঁর খাবার ঠাণ্ডা হয়ে  
যাচ্ছে, একবেলা নিয়ে আসি।”—... এই-  
বলিয়া, চোখছটি নামাইয়া, ক্ষণকাল আনমনে  
দাঁড়াইয়া রহিল—ঠিক যেন সন্ধ্যা-বেলার  
ঝরাফুলের একটি এলানো পাপড়ির মত ;—  
তারপরেই সে চকিতে ঘর হইতে বাহির  
হইয়া গেল।

ইতি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বায়

## স্বরলিপি

মন্ত্র-বাহার—কান্ধারী খেমটা।

আমার গীতি-কুসুম, প্রীতি-পবনে, গন্ধে-বরণে ছুটেছে জ্বর-মাঝ।

এসহে মম বসন্ত-কুঞ্জে, গুহে রাজরাজ।

আমি ছন্দে গাঁথিয়া বাণীর মালা,

সাজায়ে রেখেছি ডালা, পরাব তোমার গলে হে ;—

আমার ছুটেছে সব সঙ্কোচ-মোহ ছুটেছে সরম লাজ।

আমি নব নব সুরে রচিয়া গান

বীণায় তুলেছি তান, তোমায়ে শুনার বলে হে ;—

তুমি হইবে তাহে সঙ্গসঙ্গ, যশঃ-গৌরবে মানিব ধন,

চরম আশা হইবে পূর্ণ, পরমানন্দ পূণ্য, বহিবে মরম-তলে হে,—

এসহে এস মনের দেবতা, নিরাশ কোরোনা আজ ॥

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেনলাল গাঙ্গুলী

না <sup>১</sup>না II { <sup>১</sup>সাঁ -। না। <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>সাঁ। <sup>১</sup>গা -ধণা পা।  
আ মার { <sup>১</sup>গী <sup>১</sup>তি <sup>১</sup>কু <sup>১</sup>সু <sup>১</sup>মঃ ০০ <sup>১</sup>তি .

<sup>১</sup>পা <sup>১</sup>পা <sup>১</sup>পা I <sup>১</sup>মপা <sup>১</sup>-ধা <sup>১</sup>পা। <sup>১</sup>মা <sup>১</sup>পা <sup>১</sup>মস্তা I <sup>১</sup>মা <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>ধা।  
<sup>১</sup>প <sup>১</sup>ব <sup>১</sup>নে <sup>১</sup>গঃ ০ <sup>১</sup>ক্ষে <sup>১</sup>ব <sup>১</sup>র <sup>১</sup>গেঃ <sup>১</sup>ফু <sup>১</sup>টে <sup>১</sup>ছে

। <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>না I { <sup>১</sup>নর্সা -<sup>১</sup>রর্সা -<sup>১</sup>নর্সা। -। <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>না } I <sup>১</sup>নর্সা -<sup>১</sup>রর্সা -<sup>১</sup>নর্সা। II  
<sup>১</sup>হু <sup>১</sup>দ <sup>১</sup>য় { <sup>১</sup>মাঝ্ ০০ ০০ ০ আ মার } <sup>১</sup>মাঝ্ ০০ ০০

। -<sup>১</sup>গা -<sup>১</sup>ধা -। I <sup>১</sup>গা <sup>১</sup>ধণা <sup>১</sup>পা। <sup>১</sup>মা <sup>১</sup>মা <sup>১</sup>পা I <sup>১</sup>মস্তা -<sup>১</sup>রস্তা <sup>১</sup>মা।  
০ ০ ০ এ <sup>১</sup>সঃ <sup>১</sup>হে <sup>১</sup>ম <sup>১</sup>ম <sup>১</sup>ব <sup>১</sup>সঃ ০০ <sup>১</sup>সু

। <sup>১</sup>রা -। <sup>১</sup>সা। <sup>১</sup>সা <sup>১</sup>সা -<sup>১</sup>মা। <sup>১</sup>মা -। <sup>১</sup>জা I <sup>১</sup>মরা -। -<sup>১</sup>সা। -। "না না" II  
<sup>১</sup>কু ০ <sup>১</sup>জে <sup>১</sup>ও <sup>১</sup>হে ০ <sup>১</sup>রা ০ <sup>১</sup>জ <sup>১</sup>রাজ্ ০ ০ ০ আ মার

II -। <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>ধা I { <sup>১</sup>না -। <sup>১</sup>সাঁ। <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>সাঁ I  
০ <sup>১</sup>আ <sup>১</sup>মি { <sup>১</sup>ছ ০ <sup>১</sup>ন্দে <sup>১</sup>গাঁ <sup>১</sup>পি <sup>১</sup>য়া

I <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>না। <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>। <sup>১</sup>সাঁ I <sup>১</sup>না <sup>১</sup>রা <sup>১</sup>সাঁ। <sup>১</sup>রা <sup>১</sup>রা <sup>১</sup>সাঁ।  
<sup>১</sup>বা <sup>১</sup>গী <sup>১</sup>ব <sup>১</sup>মা ০ <sup>১</sup>লা <sup>১</sup>সা <sup>১</sup>জা <sup>১</sup>য়ে <sup>১</sup>রে <sup>১</sup>থে <sup>১</sup>ছি

I <sup>১</sup>নর্সা -<sup>১</sup>রা -<sup>১</sup>সাঁ। <sup>১</sup>সাঁ -<sup>১</sup>গা -<sup>১</sup>ধা } । <sup>১</sup>গা <sup>১</sup>ধণা <sup>১</sup>পা। <sup>১</sup>মা <sup>১</sup>গা <sup>১</sup>মা I  
<sup>১</sup>ডাঃ ০ ০ ০ <sup>১</sup>লা ০ ০ } <sup>১</sup>প <sup>১</sup>রাঃ <sup>১</sup>ব <sup>১</sup>তো <sup>১</sup>মা <sup>১</sup>র

I <sup>১</sup>পা <sup>১</sup>না <sup>১</sup>সাঁ। -<sup>১</sup>রর্সা <sup>১</sup>ধা <sup>১</sup>গা I <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>মস্তা <sup>১</sup>জা। -। <sup>১</sup>জা <sup>১</sup>জা।  
<sup>১</sup>গ <sup>১</sup>লে <sup>১</sup>হে ০০ <sup>১</sup>আঃ <sup>১</sup>মার <sup>১</sup>ছু <sup>১</sup>টেঃ <sup>১</sup>ছে ০ <sup>১</sup>স <sup>১</sup>ব

I <sup>১</sup>সাঁ -। <sup>১</sup>জর্সা। <sup>১</sup>রা <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>সাঁ I <sup>১</sup>না <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>সাঁ।  
<sup>১</sup>সং <sup>১</sup>কোঃ ০ <sup>১</sup>চ <sup>১</sup>মো <sup>১</sup>টু <sup>১</sup>টে <sup>১</sup>ছে

I <sup>১</sup>সাঁ <sup>১</sup>রা <sup>১</sup>সাঁ I <sup>১</sup>নর্সা -<sup>১</sup>রর্সা -<sup>১</sup>গর্সা। -<sup>১</sup>গা "না না" II  
<sup>১</sup>স <sup>১</sup>ব <sup>১</sup>ম <sup>১</sup>লাজ্ ০০ ০০ ০০ <sup>১</sup>আ <sup>১</sup>মার



II -। সা সা I { সা মা মা । মা মা মা I মা পা মা ।  
 ০ আ মি { ন ব ন ব সু রে র চি য়া

। পমা -জ্ঞা -। I মা মধা -। ধা ধা গা I পর্সা -নর্সা -গধা ।  
 গান্ ০ ০ বী গায়্ ০ তু লে ছি তান ০০ ০০

। ধা গা পা I মা জ্ঞা মা । রা -। জ্ঞা I সা সা সা } ।  
 তো মা রে শু না ব ব ০ লে ( হে আ মি )

I সা -। -। -। ধা না I { না সী না । সী -। সী ।  
 হে ০ ০ ০ তু মি { হ ই বে তা ০ হে

I সী -। না । সী -। সী I না র্সী রী ।  
 সু ০ প্র স ০ ম য শঃ গো

। -জ্ঞা রী সী I না সর্সা সী । গা -। ধা } ।  
 ০ র বে মা নি ০ ব ষ ০ ন্য

I সী সী সী । গা ধা গা I সী মী জ্ঞা । রা -। সী ।  
 চ র ম আ ০ শা হ ই বে পৃ ০ ন

I মা মা মা । পা -। পা I সী গা -। সী -। -। ।  
 প -র মা ন ০ ন পু ০ ০ গ্য ০ ০

I সী রী সী । গা ধা গা I পা সনা সী । -গা -ধা -। ।  
 ব হি বে ম র ম ত লে হে ০ ০ ০

I সী সী গা । -ধা ধা গা I সী মজ্ঞা রজ্ঞা । রজ্ঞা রজ্ঞা গা ।  
 এ স হে ০ এ স ম নে র দে ব তা

I রী রী জ্ঞা । রী সী সী I পার্সা -র্সী -নার্সা  
 নি রা শ কো বো না আজ্জ ০০ ০০

। -গধা "ধা গা" II II  
 ০০ আ মার্

## উন্মেষণা

( ১৫ )

প্রসাদপুরের ব্যায়াম-উৎসব দর্শন শচীশ্বের ভাগ্যেও ঘটয়া গেল। জন্মাষ্টমীর ছুটি উপলক্ষে বিজ্ঞানকুমারের অতিথিরূপে সে সময়ে সে বিমাদপুরেই বাস করিতেছিল। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হাসি ধরিয়া পড়িল “দাদা, কি দেখে এলে গল্প কর না? কাগজে ত পড়লুম খুব সেখানে ঘটা হয়ে গেছে।”

হাসি অপেক্ষা শচীন বয়সে বৎসর দুই মাত্র বড়। ছেলেবেলা ৬৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একত্র খেলাধুলা করিয়াছে এক পণ্ডিতের কাছে পড়িয়াছে; কিন্তু যখন হইতে রীতিমত ভাবে শচীনের পাঠ্য জীবন আরম্ভ হইয়াছে, স্কুলের ছেলেদের সহিত ভাবটা জমিয়া উঠিয়াছে, তখন হইতে হাসিকে সে বেশ-একটু খাট নজরে দেখে, মত্ত মুকব্বিয়ানা চালে চলিয়া—দরকারে অ-দরকারে পদে পদে জানান দেয় যে, সে তাহার প্রজ্ঞা-ভাজন দাদা—বয়স্ক বন্ধু নহে। হাসি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই—বিশেষত যদি সে কথা তাহার স্কুল বা বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হয়—তাহা হইলেই ধমক দিয়া বলিয়া উঠে, —“তোমার সে খবরে কাজ কি?” হাসির এমন রাগ ধরে! সেদিন পর্য্যন্ত দুজনে মায়ের কোল অধিকার করিবার জন্য ঝগড়া করিয়াছে, রূপকথা শুনিবার জন্য দিদিমাকে বাতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, বাবার দুই হাত দুজনে অধিকার করিয়া লইয়া দুপাশে চলিতে

চলিতে নিজের গল্পের স্রোতে অশ্রুর মুখ বন্ধের চেষ্টা করিয়াছে। বাগানে ফুল তুলিয়াছে, তাহা গণিয়াছে, পরস্পরকে হারাইবার অভিপ্রায়ে কবিতা মুখস্থ করিয়াছে। আর আজ হঠাৎ দাদা যে কি করিয়া এতটা বাড়িয়া উঠিল—সে তাহা বুঝিতেই পারে না। দেহায়তনে শচীন চিরদিনই শ্রেষ্ঠ, স্মরণ্য দাদার শরীরের বাড়টা হাসির নজরে পড়ে না,—মুগের নবীন গোপ-দাড়ির রেখাকেই সে ইহার মূলভূত কারণ বলিয়া মনে ঠাওরাইয়া লইয়া রাগ করিতে করিতেও হাসিয়া বলে—“ইস্, ভারী যে মুকব্বি-আনা,—তবু ত এখনো শর-দার মত্ত গোপ দাড়ি হয়নি!” শর-দা এ সম্বন্ধে বুঝি তাহার আদর্শ পুরুষ! একদিন দেখা গেল,—এই সামান্য অশ্রুরেখাও শচীনের বালক-বদন হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে,—সম্ভবতঃ হাসির—হাসির জ্বালাতেই ইহার উপর সে বীতপ্রজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তবুও ত তাহার হাসি শচীন খামাইতে পারিল না। দাদার অশ্রুহীন চেহারা দেখিয়া আরো বেশী করিয়া হাসিয়া হাসি বলিল—“বেশ হয়েছে দাদা! দেখ ভাই একবার আরম্ভ দিয়ে নিজের মুখখানা। ঠিক আমার মতই তোমার মেরেলি চেহারা হয়েছে! বিজ্ঞানদাও এইরূপ কামায়—না?”

শচীনের অসহ্য হইল, সে রাগিয়া মুখ গোমসা করিয়া চলিয়া গেল।

আজ মা গিয়াছেন নিমন্ত্রণে, দাদার সাক্ষ্য ভোজনের সময় পরিবেশন করিতেছিল হাসি। সে যে চূপ করিয়া বসিয়া তাহাকে খাওয়াইবে—এমন প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে—আজ হাসির প্রাণে শতীন ধমক দিয়া উঠিয়া তাহাকে নিকন্তর করিল না—। প্রসাদপুরের উৎসব-দৃশ্যের তরঙ্গিত স্মৃতি, তাহার মুকুটবানার বাধ ঠেলিয়া আজ উপরে উঠিতে চাহে, সে তাহা রোধ করিতে অসমর্থ। তাই প্রসন্ন-ভাবেই কহিল—

“শুধু একটি জিনিষ দেখলুম।”

“কি জিনিষ?”

“প্রসাদপুরের রাজকুমারীকে!”

হাসি আগ্রহে বলিয়া উঠিল—“দেখেছ তাঁকে? আমার বড় দেখতে ইচ্ছা করে। শুনেছি খুব সুন্দরী তিনি?”

“সুন্দরী অতুলনীয় তিনি। শুধু রূপে না গুণেও। আমাদের দেশে এমন মেয়ে আছে তা ~~কিন্তু~~ মনেই করা যায় না।” •

হাসি হাসিতে লাগিল। কথায় কথায় এরূপ অকারণ হাসি শতীনের কখনই ভাল লাগে না। সে রাগ করিয়া বলিল—“তুই কেবল হাসতেই জানিস! তাঁর গুণের যদি একটি কাণাকড়াও পেতিস! জানিস তোর চেয়েও বয়সে রাজকুমারী ছোট কিন্তু অত-বড় একটা ব্যায়াম-সমিতি তিনিই গড়ে তুলেছেন। আর ছেলেরা সৈনিকের মত উৎসাহে তাঁর ইঙ্গিতে অস্ত্র-চালনা করছে!”

বিস্ময়ে হাসির হাসি ধামিয়া গেল;—বিস্মারিত নেত্রে কহিল, “সত্যি নাকি?”

“সত্যি না তা কি মিথ্যা বলছি? প্রসাদপুর

যেন একটা সেনানিবাস, আর সেই ছোট বালিকা জ্যোতিষ্মতী সেখানে সেনাপতি!”

হাসি বলিল—“শর-দাও ত সেখানে আছেন? তিনিও বোধ হয় একজন সেনা হয়েছেন? দেখা হোল তাঁর সঙ্গে?”

“হ্যাঁ আমি দেখেছি তাঁকে,—কিন্তু তিনি আমাদের দেখেননি!”

“তোমাকে দেখেননি?”

“কি করে দেখবেন? তিনি যে আজ কাল মস্ত লোক? আমার মত লোক তাঁর নজরে পড়ে কি এখন?”

শরৎ শতীনের দেখেন নাই সত্য—কিন্তু অপরাধটা তাঁর নহে শতীনেরই। শরদার ঋণটা যে এখনো শোধ দেওয়া হয় নাই, একথা শতীন ভোলে নাই। এই লজ্জায় সে নিজেই শরৎকে এড়াইয়া চলিয়াছিল, এমন কি সেই জন্ত সে বিজনের পাশে মঞ্চেও বসে নাই।

দাদার কথার উত্তরে হাসি যেন তাহার প্রতিধ্বনির মতই বলিল—“মস্ত লোক!”

“হ্যাগো হ্যাঁ। রাজকুমারী যে তাঁর গলায় মালা দিয়েছেন!”

“রাজকুমারী তাঁকে মালা দিয়েছেন? তিনি কি স্বয়ম্বর হলেন নাকি? সেইজন্তেই কি প্রসাদপুরের এ উৎসব?”

শতীন অধীর চিত্তে কহিল “খাম্বি একটু! এইজন্তেই ত তোকে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না। একটা কথা শুনেতে শুনেতে দশটা কথা তোর মুখ দিয়ে ছোটো! জানিস ওটা ভারী বদ-এটিকেট।”

“আচ্ছা আচ্ছা, বল বল, আমি আর কথা কব না।”

“বিজ্ঞানদাত শরদাতে গৎকা খেলা হোল, শরদা জিতলেন, তাই রাজকুমারী তাঁকে নালোপহার দিচ্ছেন।” হাসি আফ্লাদে করতালি দিয়া উঠিল “শরদা জিতেছেন!”

“অত আফ্লাদের আমিত কোন কারণ দেখিনে। বিজ্ঞানদাই আসলে best player, কিন্তু এর মধ্যে শরদা একটু কারচুপি খেলে-ছিলেন। ধারাল শিংটা নিজে বেছে নিয়ে ভোঁতা শিংখানা বিজ্ঞানদাদাকে দিয়েছিলেন।”

বলা বাহুল্য বিজ্ঞানের দল এইরূপ রটনা করিয়াছিল। হাসি রাগিয়া গেল, বলিল “কক্ষণো না। শরদা কখনোই এমন অশ্রায় করবেন না, আমি তাঁকে বেশ জানি।”

“তুই ত সব জানিস!”

“নিশ্চয় জানি!”

“বেশ, জানিস্ ত জানিস্, শরদা এখন আর আমাদের বন্ধু নেই এটাও জেনে রাখ। শুন্লি ত রাজকুমারী তাঁর গলায় মালা দিয়েছেন।”

শচীন ভগিনীর মুখ বন্ধ করবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে এইরূপ খোঁচা দিল। হাসি নীরব হইয়া গেল, শচীন তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া, চটিজুতার ভিতরে আধখানা, বাহিরে আধখানা : রাখিয়া জুতাজোড়ার সহিত পাজোড়া টানিতে টানিতে হাত ধুইবার অভিপ্রায়ে বারান্দায় আসিয়া দাড়াইল। দাদা ঘটি-গাঁষছা লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল; তাহার হাত হইতে ঘটিটা কাড়িয়া লইয়া হুই-একটা কুলকুচা করিয়াই চটপট গৃহ হইতে নিজাস্ত হইল।

রাজকুমারীর গুণের কথা শুনিয়া হাসির হৃদয় প্রকাতজ্বলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল;

যেরে আসিয়া হৃদয়ের উত্থলিত সেই প্রজ্জ্বলিত পূর্ণ করিয়া তাহাকে একখান চিঠি লিখিল। চিঠিখান খামে বন্ধ করিয়া গ্রাহার মনে হইল, রাজকুমারীর ঠিকানা ত তাহার জানা নাহ! শুধু প্রসাদপুর ঠিকানায় পাঠাইলেই কি তাঁহার হাতে পৌছবে? না দাদার নিকট ঠিকানাটা ভাল করিয়া জানিয়া বহুতে হইবে? কিন্তু তাহা হইলেই ত দাদা কারণটা ধরিয়া ফেলিবে? তাহাকে কথাটা জানাইতেও ত ইচ্ছা করে না! সমস্তায় পড়িয়া ভাবিতে ভাবিতে সে গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাড়াইল। শচীনের বিদায়-দিনের কথা মনে পড়িল। আজ কৃষ্ণচতুর্দশী। সোদনের মত জ্যোৎস্নাধারায় চারিদিক হাত্তোজ্বল নহে। অবসর পাইয়া আজ আকাশের স্থানে স্থানে তারকাবাণি শুছে শুছে দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল,—কোন কোন শুষ্কস্থিত এক-একটি অত্যাশ্চর্য নক্ষত্র দীপ্ত মহিমায় অস্ত্র সকলকে হীন-প্রভ করিয়া চক্রেব গুল আজ অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

পশ্চিম দিকে জলিতেছিল শুক্রতারা; মাথার উপর জলিতেছেন, বৃহস্পতি; কিন্তু হাসি উত্তরমুখে দাড়াইয়া খুঁজিতেছিল সম্ভবিকৈ। কিন্তু এই সাতটি তারা যে এলোমেলো ভাবে কোথায় এখন হারাইয়া পড়িয়াছে হাসি তাহাদের সন্ধিতে ঐ-তারাটির নির্দেশ পাইল না। আকাশ হইতে বাগানের দিকে তখন সে দৃষ্টিপাত করিল,—গাছপালার মধ্যে শতসংখ্য জোনাকি পোকা একইসঙ্গে তাহার নয়নে অলিঙ্গা উঠিয়া আবার মুহূর্তে নিভিয়া গেল। —হাসুহানার গন্ধরাশি—তাহার নাসিকার

উপর প্রবল তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেদিনও এই গন্ধে দিক ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার সহিত যে সম্বন্ধ-ধারা উথলিয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা নীরব। সেইসের বোন—জ্যোত্স্নানীর অনেক দিন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আর শরদা? তিনি এখন কোথায়? সম্ভবতঃ রাজকুমারীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—প্রেম-সম্ভাষণ করিতেছেন। দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়নে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়া ক্রমশঃ কপোল বাহিয়া নীচে পড়িল।—কেন? হাসি ত তাঁহাকে ভালবাসে না, তাহার প্রেম ত সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—তবে?

ভালবাসে না—ইহাই কি ঠিক? না—সে ভালবাসে,—কিন্তু সে ভালবাসা ত তার প্রেম নয়, তাহা সখ্যতা, তাহা শ্রদ্ধা, তাহা মহৎ হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ। যদি সে মাতার মনের ভাব না জামিত, সম্ভবতঃ এই সখ্যতা এই শ্রদ্ধা কোন দিন প্রেমে পরিণত হইতে পারিত, কিন্তু মাতৃ-ইচ্ছার মধ্যে সে আত্মবিলুপ্ত বরিয়া দিয়া চিরদিনই শরৎকুমার হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছে, এবং চিরদিনই রাখিবে—তবে? তবুও অধিকার বলিয়া একটা জিনিস আছে! চিরদিন বাহাকে আপনার বলিয়া জানে—সে আজ পরের হইয়া গেল—একবিন্দু অশ্রুও কি সেজন্ত পড়িবে না!

দাদার নিকট আর তাহার রাজকুমারীর ঠিকানা জানিয়া লইতে হইল না।

মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কুন্দবালা প্রসাদপুরের ব্যায়াম-উৎসবের পূর্বেই কলিকাতায় আসিয়াছিল। মাতা স্বস্থ হইয়া উঠিয়াছেন এখন সে প্রসাদপুরে ফিরিয়া

যাইবে। বাইবার আগে সে হাসি দেখিবে আসিলা। হাসি ও কুন্দ দুজনেই বেধুন স্কুলের ছাত্রী। ছোট্ট মেয়েটি হাসি প্রথম যেদিন হাশ্বপ্রফুল্ল মুখে স্কুলে দৈনিক ছাত্রীরূপে ভর্তি হইয়াছিল সেইদিন হইতে সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর বোর্ডার—বালিকা কুন্দের হৃদয় অনেকখানি সে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। যতদিন হাসি স্কুলে ছিল কুন্দ বালিকাকে তাহার মেহাঞ্চল ছায়াতলে রক্ষা করিত। স্কুল ছাড়িবার পরেও উভয়ের মধ্যে এই ভালবাসার বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। কুন্দ প্রসাদপুরে কাজ গইয়া পর্যন্ত তাহার একটু দূরে পড়িয়াছে সত্য, দেখা শুনাও নাই, চিঠিপত্র লেখাও একরকম বন্ধ; তথাপি কলিকাতা আসিলেই কুন্দ একবার হাসিকে দেখিতে আসিতে ভোলে না। দৈনবশত ঠিক পরদিনই কুন্দ হাসিকে দেখিতে আসিল। রাজকুমারীকে দিবার জন্ত তাহার চিঠিখানি হাসি কুন্দকে দিল।

( ১৬ )

রাজা ভাল হইয়াছেন; ব্যায়াম-উৎসবও শেষ হইয়া গিয়াছে। শরৎকুমারের আর কলিকাতায় বাইবার বাধা নাই, তিনি আজ বিকালে বাহিরে না গিয়া জিনিস-পত্র প্যাক করিতেছিলেন। অভিপ্রায়, আজ সন্ধ্যাবেলা রাজাকে 'এ কথা জানাইয়া পরদিনই বাটা যাত্রা করিবেন।

মেজের উপর ট্রাক দুইটা খোলা, কাগড় চোপড় তাহার মধ্যে সাজান হইয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর যে হৃৎকথানা বই ও ছোট-খাট দুই-একটা জিনিস পড়িয়াছিল—তাহা

পোর্টম্যান্টো উঠাইয়া লইয়া তিনি দেয়ালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দেয়ালের গার রাজকুমারীর দন্ত মালাগাছি চান্দান ছিল, কুন্দফুলের গড়েমালা, মাঝে মাঝে চাঁপা ও গন্ধরাজের মিলান। মালাগাছি হৃদনের বাসমালা—পাছে স্পর্শে একটি ফুলও খরিয়া পড়ে—হাত দিতে শরতের সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। নিকটে আসিয়া আশ্রয় লইবামাত্র একটি মনোহর সুগন্ধে তাহার নাসিকা যেন ভরিয়া উঠিল,—শরতের মনে হইল—এ বুঝি স্বর্গেরই পারিজাত মালা। যাহার হস্তস্পর্শে ইহা এত পূণ্যময় গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে স্মরণ করিয়া শরৎ শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে মস্তক অবনত করিলেন।

আর যেই যাহা বুঝুক শরৎ রাজকুমারীকে ভুল বুঝেন নাই! এ মালা যে রাজকুমারীর বরমালা নহে, জয়মালোপহার তাহা তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। ভুল বুঝিবার ভয় যেক্রপ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আত্মস্তম্ভতার প্রয়োজন—শরতের স্বভাবে সেক্রপ হস্তকর গর্ভভাবের বিশেষ অভাব। জ্যোতিষ্ময়ী রাজকুমারী,—জ্যোতিষ্ময়ীর আকাজ্ঞা বাসনাও অসাধারণ; মহৎকার্য্যেই তাহার সমস্ত মনোপ্রাণ উৎসর্গীকৃত; শরতের মত একজন নগণ্য সাধারণ লোকের প্রতি তাহার যে প্রেমোদ্বেগ হইতে পারে—ইহা তাহার কল্পনারও অগোচর। ইহার উপর তাহার নিজের হৃদয়েও এক্ষেত্রে প্রেমের চাকলা নাই। অতএব রাজকুমারীর প্রতি তাহার ব্যবহার একদিকে শ্রদ্ধা-সম্মানপূর্ণ অন্তরিক্ত বেশ নিঃসঙ্কোচ,—স্বাভাবিক। এই শক্তিময়ী

বরমালা সান্নিধ্য, তাহার সখ্যতা, তাহার প্রশংসা শরতের ক্ষত হৃদয়ে যে মহৌষধ-সুখ ঢালিয়াছিল—সেজন্য রাজকুমারীর প্রতি তিনি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

হাসিকে কি শরৎ ভুলিয়াছেন? এত শীঘ্র কি ভোলা যায়? কিন্তু তাহার উপেক্ষিত হৃদয় বিম্বিতদেবের নিকট যে কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিল তাহা একেবারে অগ্রাহ্য হয় নাই। রাজকুমারীর সখ্যত্বের আশ্রয়ে তিনি বল পাইয়াছেন, ভুলিবার নূতন পথ চিনিয়াছেন। উপেক্ষিত প্রেমিকেরও জীবন বৃথা যায় না, কর্ম্মের পথে তাহা সার্থক হইয়া উঠে;—রাজকুমারী তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন—‘তিনি তাহার নমস্যা দেবী।’

বিদায়ের দিনে হাসি যে বনফুলটি শরৎকে পরাইয়া দিয়াছিল সেটি শরতের বুকের পকেটেই থাকিত,—তাহা বাহির করিয়া লইয়া তিনি দেখিলেন—বুকের চাপে ফুলটি পোষিত হইয়া গিয়াছে—তবু যেন ঠিক তেমনিটাই আছে, একটিও দণ্ড ইহার খসে নাই। রাজকুমারী-দন্ত ফুলমালার দোলন-গুচ্ছের সহিত সেই ফুলটি তিনি সযত্নে বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর মালাগাছি—আত সাবধানে দেয়ালের হুক হইতে খুলিয়া একটি শূন্য কাগজের বাগ্লে পুরিলেন। বাগ্লে যখন নিরাপদে টাঙা উঠিল তখন তাহার প্যাকিংও শেষ হইল,—তিনি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজার গৃহপার্শ্বেই শরতের ঘর;—রাজকুমারী থাকেন অন্তঃপুরে—তাহার চূড়ামাত্র এগান হইতে নজরে পড়ে; সেই চূড়ার দিকে চাহিয়া, নন্দিব মধ্যে বিরাজিত

দেবীমূর্তির মহিমা তিনি কল্পনা করিলেন। তখন কি আর কাহাকেও তাঁহার মনে পড়িয়াছিল? যেখানে পাখা—সেইখানেই প্রথমে হাত পড়া স্বাভাবিক—কিন্তু তবুও হৃদয় সাবধানতা অবলম্বন করিতে চায়।

রাজকুমারী কিন্তু তখন অন্তঃপুরে ছিলেন না। তিনি শরতের ঘরের পাশেই—রাজার নিযুক্ত উপবেশন-কক্ষে জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। রাজা মধ্যাহ্নের পর যেখানেই গমন করুন, যে কাজেই ব্যস্ত থাকুন—এই সময় প্রায়ই ফিরিয়া আসিয়া কছাকে লইয়া মোটারে বেড়াইতে যান। আজ তিনি এখনো ফেরেন নাই—রাজকুমারী একটু উৎকণ্ঠিতচিত্তে পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সেদিনকার সেই আকস্মিক বিপদের পর হইতে—রাজার আসিতে বিলম্ব দেখিলেই জ্যোতির্শ্রীর মনে একটু ভাবনা জন্মে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অপরাহ্ন কাল প্রভাতের মতই অরুণ রাগে সুরঞ্জিত করিয়া সূর্যগোলক সিঁহপালার মধ্য দিয়া পশ্চিম প্রান্তে চলিয়া পড়িতেছে। ভাদ্রের ভরা নদীর বক্ষে—লাল আলোর বিজ্যৎ লহরী চমকিয়া বাইতেছে। মধ্যাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—গাছপালা মাঠ এখনো আর্দ্র; মাঠের ধারে, গাছের শাখায়, আটচালার গায়ে সজ্জিত উৎসবের শুক ফুলমালা সহসা বেন নবীন হইয়া झলিয়া উঠিয়াছে। মাঠে আজ খেলা চলিতেছে না, ব্যারাম-উৎসবের পর দুইদিন ছেলেরা ছুটি পাইয়াছে। তবুও মাঠ শূন্য নহে, ছেলের দল—মাঠ, ভাণ্ড, আটচালা অধিকার করিয়া

ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হাঃহোঃনিঃশব্দে সঙ্গে হঠাৎ সেই গানটি আটচালার ভিত হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

ভিকাং দেহি জননী গো ভরিয়ে দে বুলি।

বোধ হয় সৈনিকের মত তাহার আবার অভিনয় আরম্ভ করিল। গানটি শুনিতে শুনিতে রাজকুমারী ক্ষণকালের জন্য অস্ত চিত্ত ভুলিয়া গেলেন। সার্থকতার আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু মাঠে সাজা শুক ফুলগুলির মত সে আনন্দ পরমুহুর্তেই ম্লান হইয়া পড়িল। জ্যোতির্শ্রীর বাসন পূর্ণ হইয়াছে সত্য,—তাঁহার ব্যারাম-সমিতিতে আজ কত লোক, কত যুবক, কত যুনিপুণ,—খেলোয়াড়। কিন্তু তথাপি কয়জন ইহার।—দেশের পক্ষে কয়জন? বঙ্গদেশের সর্বত্র যখন এইরূপ আয়োজন হইবে—তখনই ন একদিন তাহার মনোগত আশা-অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে।

ভারতের সর্বদেশের লোক বীর বলির পরিচিত,—সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত, কেবল বঙ্গবাসী এই অধিকার-বিচ্যুত। একটা জনরব—বান্দালী তীর, বান্দালী কাপুরুষ—এই অখ্যাতি অপবাদ কেমন করিয়া রটিল—কে রটাইল? যেদিন বান্দালীর এই মিথ্যা কলঙ্ক অপনীত হইবে—সব রাজা ইহাদিগে বীরত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া ইহাঙ্গিগণে সেনার স্বধিকার দান করিবেন—সেইদিন—সেইদিন জ্যোতির্শ্রীর অন্তরতম আশা পূর্ণ হইবে,—তাঁহার আশা প্রসন্ন হইয়া উঠিবে।

কিন্তু জ্যোতির্শ্রী কি একলাই এরা করিয়া ভাবিতেছে? নহে নহে তাহা নহে বান্দালার দিন আসিয়াছে—সম্ভবতঃ দেশে

অনেকে তাহার মত করিয়া ভাবিতেছেন, এই অভিপ্রায়ে কাজ করিতেছেন—তাহার চিন্তা—তাহার চেষ্টা—তাহার কার্য সেই শত সহস্রের মধ্যে একটি কণা। “তাহাই হউক—তাহাই হউক—হে ভগবান তাহাই হউক।—তুমি দেশের সকল লোকের মনের আকাঙ্ক্ষা-বাসনার সহিত আমার এই শক্তিকণাকে মিলিত সংযোজিত করিয়া টেহাকে মহান করিয়া, বিরাট করিয়া তোলা।”

অন্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া সে সর্কাস্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিল। সূর্য্যদেব তাঁহার রক্তিম করমালা জ্যোতির্ময়ীর মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিয়া যখন তাহাকে আশীর্বাদ পূর্ব্বক নদীর পরপারে অন্তর্হিত হইলেন, তখন বালিকা গৃহ নিজাস্ত হইয়া সম্মুখের বারান্দার আসিয়া দাঁড়াইল। এত স্তব্ধত বারান্দারই একধারে শরৎ দাঁড়াইয়া ছিলেন, রাজকুমারীকে দেখিয়া তিনি নিকটে আগমন করিলেন।

জ্যোতির্ময়ী বলিলেন—“ডাক্তার-দা! আপনিও বৃষ্টি বাবার জন্য অপেক্ষা করছেন? বেড়াতে যাননি যে কোথাও?”

“কাল বাড়ী যাব মনে করে, জিনিষ-পত্র প্যাক করছিলাম।”

“বাড়ী যাবেন? এত শীঘ্র?”

“শীঘ্র আর কই—প্রায় ৬-মাস ত আপনাদের অতিথি হয়ে আছি—”

“এমন শীঘ্র শীঘ্র সময় চলে যায়! মনেই হয় না যে আপনি এতদিন এসেছেন! আপনার বোধ হয় অনেক কাজের ক্ষতি হচ্ছে?”

“কাজের ক্ষতি!—না তা ঠিক বলতে পারিনে—”

শরৎ একটু থামিয়া থামিয়া কথাগুলো বলিলেন—রাজকুমারী হাসিয়া কহিলেন,

“আপনি দেখছি আদর্শ বিনয়ী,—”

• দূরে অশ্বের পদশব্দ হইল—উভয়েই সেই দিকে মনোনিবেশ করিলেন,—কিন্তু ক্রমশঃ সে শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল। রাজকুমারী বলিলেন—“ডাক্তার দা—বাবা এখনো এলেন না—আমার একটু ভাবনা হচ্ছে।”

“ভাবনার কি কারণ? তিনি যে অবস্থাতেই পড়ুন আশ্বরক্ষা করতে পারবেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!”

• “তা ঠিক। আচ্ছা বাঙ্গালীদের ভীক বলে একটা অপবাদ আছে—না?”

শরৎ হাসিলেন—বলিলেন,—“মেকলে এইরূপ বলে গিয়েছেন—”

“কিন্তু এমন মিথ্যা কথাটা আপনারাও ত অগ্নানবদনে মেনে নিচ্ছেন? বাঙ্গালী যদি ভীক জাত হোত তাহলে তাদের জমীদারী থাকত না। প্রত্যেক জমীদারীতে ত সারা-দিন লাঠালাঠী চলছে—আর লাঠিঘালেরা ত অকাতরে প্রভুর জন্য প্রাণ দিচ্ছে। এরা যদিও সামান্য লোক তবু বীরত্বে কি এরা কোন শিক্ষিত রাজসৈন্তের চেয়ে কম?”

“গভর্ণমেন্ট তা বোঝেন কই?”

“আপনারাও ত বোঝাবার চেষ্টা করছেন বলে মনে হয় না। আমি কলকাতায় গিয়ে স্বদেশী চিত্র-মেলায় একখানা ছবি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ছবিখানি বৃদ্ধ লক্ষণসেনের; তিনি প্রাণতরে স্বস্তঃপুরের রাস্তা দিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছেন! ভীকতার



বীভৎস প্রতিমূর্তি! আর এই চিত্রকরনার  
অস্ত্র নবীন চিত্রকর নাকি দেশের নামজাদা  
চিত্রকরদের কাছে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন!  
হুঃখে আমার চোখ দিয়ে জল এসেছিল;  
ইচ্ছা হচ্ছিল ছবিখানা টেনে নিয়ে ছিঁড়ে  
কুটি কুটি করে ফেলি।”

ক্রোধের আবেগে জ্যোতিষ্মার মুখ  
আরক্তিম হইয়া উঠিল। শরৎকুমার নীরব  
হইয়া রহিলেন। বালিকা পুনরায় উত্তেজিত  
ভাবে কহিল “মিথ্যা কথা! মিথ্যা কলঙ্ক!  
কক্ষণে লক্ষণসেন প্রাণভয়ে অমন করে  
চোরের মতন পালান নি।”

“অসম্ভব বলেই ত মনে হয়। কিন্তু  
মুসলমান ঐতিহাসিকেরা নাকি ঐ রকম  
বলেছেন?”

“আর সেই মিথ্যা ইতিহাসকে আমরা  
অমর অক্ষরে ধরে রেখে নিজেদের ভীকৃতার  
প্রচারে প্রশংসা আদায় করে গর্ক অহুভব  
করছি। উঃ, আমার সমস্ত রক্ত আগুণ  
হয়ে ওঠে! আচ্ছা—গণেশদেব, প্রতাপাদিত্য,  
সীতারাম প্রভৃতি বীরগণের চিত্র আমাদের  
চিত্রশালায় নেই কেন? চিত্রকরের কলনা-  
ভুলিতে কেবল পলাতক লক্ষণসেনই চিত্রিত  
হলেন?”

শরৎকুমার লজ্জিত ভাবে মুখ নত  
করিলেন। বালিকা কহিল “আসবেন  
ডুক-দা একবার ঘরের ভিতর—” বালিকার  
অহুভব হইয়া শরৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে,  
যোগমায়া দেবীর চিত্রের প্রতি অহুর্লি  
নির্দেশ করিয়া রাজকুমারী কহিলেন;—  
“ইনি বাবার প্রমাতামহী; বর্গির উপদ্রবের  
সময় ইনি যুদ্ধের অস্ত্র প্রস্তুত হয়েছিলেন।

দেখুন কেবল রাজপুত্রনার নয় বাহ্যিকশেও  
বীরাজনা আছে। আর আমি বেশ বলতে  
পারি দরকার হলে এখনো অনেক  
মেয়ে দেশের অস্ত্রে প্রাণ দেবে। আমাকে  
ভারী গম্ভীর বলে মনে করছেন—বোধ  
হয়?”

“মোটট না। আপনি যথার্থই  
বীরাজনা।”

এই প্রশংসালোভে একটা নূতন রকম  
আনন্দে জ্যোতিষ্মার হৃদয় পাণ যেন  
ভরিয়া উঠিল। একটা বিদ্যাপ্রবাহের চমক  
তাহার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়া গেল।  
পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ত কত প্রশংসা  
করেন—ম্যাজিষ্ট্রেট দম্পতি ত আদর করিয়া  
কত কথা বলেন,—পিতার চক্ষেও ত  
জ্যোতিষ্মার সর্কদা সূখ্যাতির আবেগ দেখিতে  
পায়, কিন্তু কাহারও প্রশংসায় এমনতর  
একটা আত্মপ্রসাদে তাহার হৃদয় ত ইতিপূর্বে  
কোনদিন পূর্ণ হইয়া উঠে নাই!

মনের অজ্ঞাতসাথে তাহার মন যেন  
একটু লজ্জিত হইল। কথাটা চাপা দিবার  
অভিপ্রায়ে সে সলজ্জভাবে কহিল—  
“আচ্ছা—ডাক্তার-দা—আপনার ত একটা  
ambition আছে?”

শরৎ কোন উত্তর না দিয়া হাসিলেন,  
বালিকা বলিল—

“আপনার ambition যে কি, তা  
কিন্তু আমি বলতে পারি; ভাল ডাক্তার  
হওয়া—না?”

“নিশ্চয়ই।”

“আমার কি ambition তখনবেন?  
আমাদের জাতকে সৈনিকপদে প্রতিষ্ঠিত

দেখা—আচ্ছা, আমায়ের দেশের মুখপাত্র যারা—তারা কেন এজন্তে চেষ্টা করেন না?”

“করেন বই কি? কত লেখালেখি করেন।”

“কাগজে ও-রকম ক’বে এক কলাম মাঝে মাঝে লিখলে কি কাজ হয়? দেশের সর্বসাধারণের মনে এ-ভাবে আগিগে তোলা চাই; সে রকম চেষ্টা কি করছেন তাঁরা?”

“তা ঠিক জানিনা। এইটুকু জানি, যে আপাততঃ দেশের মুকব্বরা বঙ্গবিভাগ আইন যাতে না হয় তার চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন।”

“হলোই বা বঙ্গবিভাগ,—তা নিয়ে এত গোলযোগ কেন? ক্ষতি কি তাতে?”

“একেই আমাদের মধ্যে একতা নেই; তাতে আমরা আরও তফাৎ হয়ে পড়ব,—সকলে এই আশঙ্কা করেন।

“বৃথা আশঙ্কা। ভিতরে একতা থাকলে বাইরের লোকে কি তা ভাঙ্গতে পারে?—যদি দেশের লোকে বঙ্গবিভাগ না চায় তা হলে গভর্নমেন্টের এ কাজে একতা বাড়বে তবু কমবে না।”

“আপনার বাণীই সফল হোক!”

ইহার পর হঠাৎ পুনরায় বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সহসা হারমোনিয়মের সঙ্গে ধ্বনিত গান বন্দেমাতরম শব্দে ডুবিয়া গেল। জ্যোতিষ্ময়ী হাসিয়া বলিলেন—“পণ্ডিত মশায় দেখছি ছেলের দলে চুকলেন।”

“উনি ত আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র?”

“উনি আমার গুরুদেব। গুরু মধ্যে যে খাঁটি জিনিষ আছে তা সংসারে বড় হ্রস্ব।

কুন্দ যখন ঠুকে নিয়ে হাসি বিজুপ করে, আমার এমন রাগ ধরে।”

পরং হাসিলেন—হাসিয়া বলিলেন—“জানেন ত খাঁটি জিনিষ মাত্রেরই ভার বেশী; হাল্কা জিনিষের পক্ষে সেটা স’য়ে নেওয়া ত সর্বসম্মত সহজ নয়। বিশেষ যখন আধার বস্তু balast হারিয়ে নিজেই টলমল করতে করতে চারদিকে একটা laughing গ্যাসের সৃষ্টি করেন—তখন দর্শক বেচারাদের অবস্থা কি দাঁড়ায় একবার ভেবে দেখুন দেখি? আমাকেও এই অবস্থায় কোন কোন সময় পড়তে হয়েছে! জানেন ত মানুষ স্বভাবতঃই পাপী; আদমের পাপ বংশাঙ্কুরে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে আসছে। আমার ঐচ্ছিক অজানকৃত পাপের জন্তে আশা করি মার্জনা পাব?”

বলিতে বলিতে শরতের মনে পড়িল, হাসিকে। পণ্ডিত মহাশয়ের ধরণ ধারণ কথাবার্তার হাসি যে কিরূপ হাসিত—তাহা তিনি কল্পনার চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। আর—জ্যোতিষ্ময়ীর মনের সর্বাপেক্ষা নিকট স্তরে যে কথা আগিতেছিল—তাহার মনে পড়িল সেই কথা। শরতের কথায় রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন,—“আচ্ছা ডাক্তার-দা, ভেবে দেখুন দেখি পণ্ডিত-মহাশয়ের সেদিন কি আত্মলাদ হবে—?”

“কোনদিন?”

“যেদিন তিনি বাঙ্গালীদের নৈনিকবেশ দেখবেন—অবশ্য যদি এমন দিন কখনো আসে! আচ্ছা, আমরা যে পথ ধরেছি—এটা কি ঠিক পথ ডাক্তার-দা? ব্যায়াম-শিক্ষাতে ছেলেদের মনের তেজও কি

বাড়বে? আর গভর্ণমেন্টের চোখে—  
একদিন সেটা স্বর্ষাচক্সের মতই এমন প্রত্যক্ষ  
হয়ে উঠবে যে তখন আর এদের বীরত্ব  
অগ্রাহ্য করতে পারবেন না?”

“গভর্ণমেন্ট কি বুঝবেন না বুঝবেন  
বলতে পারিনে,—তবে ছেলেরা এতে ‘যে  
তেজস্বী হয়ে উঠবে,—তাতে সন্দেহ নেই।’”

“কেজ্ঞানে এক এক সময় আমার মনের  
মধ্যে এমন একটা নৈরাশ্র জঘাট বাঁধে—  
মনে হয় এ যেন আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে  
সাগর বাঁধার প্রয়াস হচ্ছে!”

“না রাজকুমারি, আপনি ক্ষুদ্র শক্তি নন,  
শক্তিতে আপনি মহীয়সী। আপনার কাণ্ডের  
ফল যে একদিন খুব বড় হয়ে উঠবে তাতে  
সন্দেহ করবেন না।”

অতিরিক্ত উৎসাহের সাহিত্যই শরৎকুমার  
একথা বলিলেন; তাঁহার বাক্যে সত্যের  
একটি মূর্তি প্রতিভাত হইল। আবার পূর্বের  
জ্ঞান একটা আনন্দ-প্রবাহ রাজকুমারীর  
হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল। জ্যোতিষ্ময়ী সেই  
শ্রোতাবেগে চালিত হইয়া কহিলেন—  
“আপনি জানেন না—ডাক্তার-দা—আমি  
কতটা দুর্বল! এক এক সময় কাজ করবার  
কোন শক্তিই থাকে না আমার। আচ্ছা  
ডাক্তার-দা—আপনি আমার সহায় হবেন?”

“বহি অধিকার দেন,—সর্বপ্রাণে”।

এই উত্তরে সহসা যেন জ্যোতিষ্ময়ী

সচেতন হইয়া উঠিল। ঠাকুরমার ~~চোখ~~ মনে  
পড়িয়া গেল। শরৎকুমার তাহাকে ভূণ  
বুঝিলেন না ত?—

অকারণে সহসা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া  
উঠিয়া বালিকা বলিল—

“মাপ করবেন—শরৎবাবু কি বাঁধে  
বকছি!—আমার সহায় বন্ধু আর কেউ হতে  
পারবে না—আমি নিজেই—”

পিতার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ  
করিল—রাজা সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে  
ডাকিলেন—“রাণী!” জ্যোতিষ্ময়ী চমকিয়া  
উঠিল—উভয়ে কথা-বার্তায় এত তন্ময় হইয়া  
পড়িয়াছিল—যে কখন যে রাজা ধোড়া  
হইতে নামিয়া উপরে উঠিয়াছেন—তাঁহা  
কেহই জানিতে পারে নাই। সুখের কথা  
অসমাপ্ত রাখিয়া জ্যোতিষ্ময়ী বলিয়া উঠিল—  
“বাবা এসেছেন!” বলিয়া তাঁহাকে স্বাগত  
করিয়া লইবার জন্ত সিঁড়ির নিকট আসিয়া  
দাঁড়াইল। শরৎ অপরাধীর মত বারান্দাতেই  
দাঁড়াইয়া রহিলেন;—হঠাৎ কি কথায়  
কি ব্যবহারে রাজকুমারীকে তিনি অপ্রসন্ন  
হইবার কারণ দিলেন—তাঁহা তিনি বুঝিয়া  
উঠিতে পারিলেন না।

রাজকুমারীও বোঝেন নাই কোন্ ভাবের  
এ উদ্বেগণা! কেন তিনি বিরক্ত হইলেন?  
কাহার প্রতিই বা বিরক্ত হইলেন? নিজের  
প্রতি নী শরতের প্রতি?

শ্রীশ্রীকুমারী দেবী।

## ঈশ্বরী অজিতকুমার চক্রবর্তী

একালের বাংলা-সাহিত্যে অল্প যে-কয়েকজন লেখক সাহিত্য-চর্চায় বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে প্রধান একজন। সমালোচন-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাড়াইবার ক্ষমতা রাখেন, নবীন সাহিত্য-সেবাদের মধ্যে এমন লোক প্রায় দেখাই যায় না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত এবং এই কঠিন কার্যে তাঁহার যে অদম্য উৎসাহ, প্রাণপ্রণ আগ্রহ এবং অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া থাকিতে পারি নাহ। এদিকে তিনি ছিলেন একাকী; এবং সহস্র বিরুদ্ধ মতের মধ্যে এমনি একাকী দাড়াইয়াই তিনি সমান অটলতা ও সফলতার সঙ্গে আপনায় কৰ্ত্তব্য কার্য্য করিয়া চলিতেছিলেন। আজ তাঁহার অভাবে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা পূর্ণ করিতে পারেন, এমন লোক ত চোখে পাড়িতেছে না। সুধুরসিক সমালোচক বলিয়া নয়—জীবনচরিত রচনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত তাঁহার অমর কীৰ্ত্তি। ইদানীং কিছুকাল ধরিয়া তিনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাহার যে সামান্য কিছুশক্তি নমুনা সাময়িক-পত্রাদিতে বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, অজিতকুমারের রামমোহনচরিত সমাপ্ত হইলে, বাংলা ভাষায় একখানি সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত-রূপে সমাদর লাভ করিত। শুধু এদেশের সাহিত্য

নয়, বিদেশের সাহিত্য লহরীও অজিতকুমার অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যেতিনি সামান্য পাঠকের চোখের সামনে সাহিত্যের খাঁটি রূপটি ফুটাইয়া দেখাইতে পারিতেন এবং ছন্দয়ের মধ্যে সাহিত্য-রস-প্রাণিতার একটা অমুভূতি জাগাইয়া তুলিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মন্দের সাহিত্য বাঙালী পাঠক-সাধারণের পরিচয়-সাধন করিয়া দিবার জন্য তিনি যে-সকল স্থলিপিত প্রবন্ধ মাসিক-পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার রসপ্রাণিতা, বিচারক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তি এই অল্পবয়সেই পরিপক্বতা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার উপার্জিত জ্ঞানকে তিনি অকেজো রাখিয়া যান নাই।

কেবল একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক রূপে নয়—সংগীতজ্ঞ, সমালোচী, সুরাসিক বহুরূপেও আজ আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি। স্বাভাবিক সুকণ্ঠের গুণও তিনি সকলের নিকট আদর পাইতেন;—যে-কোন বন্ধু-সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহার মধুর স্বরলহরীতে, গানের পর গানে সে-সভার সকলকে তিনি মত্তমুগ্ধের মত ভুলাইয়া রাখিতেন। অজিতকুমার আজ নাই, বন্ধুদের সভাও আশ্রয় নীরব;—তেমন-করিয়া অপ্রাস্তভাবে রবীন্দ্রনাথের গানও আর-কেউ বোধ হয় শুনাইতে পারিবে না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনৃত-রসধারার হৃদয়-মন অভিযুক্ত করিয়া তিনি আমাদের সকলকে ধৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য



### বঙ্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী

তাঁহার দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধারণে অনেকটা প্রসার লাভ করিয়াছে।

মৃত্যুকালে অজিতকুমারের বয়স হইয়াছিল চৌত্রিশবৎসর মাত্র। নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহার সাহিত্য-সাধনাকে পরিপূর্ণতা লাভের অবকাশ দিল না। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের

যে যথেষ্ট ক্ষতি হইল তাহা বলা বাহুল্য এবং ভারতীর যে কি ক্ষতি হইয়াছে তা শুধু আমরাই জানি। তাঁহার অভাবে আমাদের অনেক সংকল্প আজ নিভিয়া আসিতেছে। ভগবান তাঁহার শোক-সম্পন্ন পরিবারবর্গকে সাহসনা দান করুন।

## সমালোচনা

হেরফের। প্রিয় চাকর বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ৫এ রামকৃষ্ণ বাগটা লেন, কলিকাতা, কাঞ্চিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাত টাকা। এখানি উপন্যাস। উপাখ্যান মোটামুটি এই,—রজত ও শিশির এক-কলেজে বি-এ পড়িত। রজত বড়-লোকের এক-ছেলে, তার কবি, প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র ‘সংগ্রহে’ তার লেখার ভারী আদর; ঘরে তাহার বিধবা মা হনমনী, আর তরুণী স্ত্রী সন্ধ্যা এবং অগাধ মূৰ্খবর্ধ্য। শিশির গরিবের ছেলে, মল্লার-শিপ-হোল্ডার—কলিকাতার এক মেশে নৌচের তলায় সঁায়াতানে ঘরে থাকে। দৈবাৎ একদিন কলেজে শিশিরের সঙ্গে রজত সখ্য স্থাপন করিল এবং একেবারে তাহাকে নিজের গৃহে আনিয়া মা ও স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। সন্ধ্যা স্বামীর সাহিত্য-যশের গর্বে গরিবিনী। শিশিরকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই রজত তাহাকে সন্ধ্যার শিক্ষক নিযুক্ত করিল। তখন তিনজনে বসিয়া নানারূপ সাহিত্য্যালোচনা চলিত। রজত শিশিরকে সাহিত্য-রচনার উৎসাহিত করিল—কিন্তু যখন দেখিল, শিশিরের লেখার আদর তাহাকে ছাপাইয়া উঠিল, এমন কি রজতের বন্ধু সংগ্রহ-সম্পাদকও তাহার লেখা ফেলিয়া শিশিরের লেখার আদর করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে হিংসা জ্বলিল। প্রসাদলোভী বন্ধুদের উত্তেজনায় রজত শেষে সাহিত্য-ক্ষেত্রে শিশিরের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং স্বনামে-বেনামে শিশিরের রচনার নিন্দা করিয়া কাগজে সমালোচনা বাহির করিতে লাগিল। সেই হুজুে শিশিরকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করিয়া সে গৃহে মাতা ও স্ত্রীর কাছে নিজেকে অভ্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিল। শিশির, কিন্তু, রজতের এই শত্রুতা গারে মগ্নিত না। সন্ধ্যার কাছে বিদ্যা নামে একটি তরুণী প্রায়ই বেড়াইতে আসিত—সে বোটারী এক রূপজীবিনীর কন্যা। বিদ্যা মার সহিত একসঙ্গে বাস করিত না—বোড়িংরে সে মানুষ হইয়াছিল। সে মার

ছড়াগোর কথা কিছুই জানিত না—মাও তাহার কাছে সে পরিচয় গোপন রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার গৃহে শিশির ও বিদ্যা দুইজনের মনে অনুরাগ সঞ্চার হয়। তারপর হঠাৎ বিদ্যা একদিন মাকে “সমাজগতীর বাহিরে” পল্লীর এক গৃহে একদল স্ত্রীক বাবুর সম্মুখে হাবভাবময় নৃত্যে নিযুক্ত দেখিল; দেখিয়া খুণায় ক্ষোভে সে সে-স্থান ত্যাগ করিল। মাও মেয়েকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জায় বরিয়া গেল। মা আর বাঁচিল না। মরিবার সময় শিশিরকে ডাকিয়া মেয়ের সচ্চরিত্রতার বিবরণ বলিল, এবং তাহার হাতে মেয়ের তার সঁপিয়া মরিল। উক্ত ঘটনার পর বিদ্যা কলিকাতা ছাড়িয়া বিদেশে চাকরি করিতে গেল এবং শিশিরও সেখানে গিয়া তাহাকে বিবাহ করিল। ঘটনা মোটামুটি এই। লেখক এই গ্রন্থে আরম্ভ হইতেই এমন বিচিত্র কোতুলল জাপাইয়া তুলিয়াছেন যে পাত্র-পাত্রীর কার্য-কলাপ কোন হুজু খরিয়া কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা জানিবার ইচ্ছা অভ্যন্ত এবল হয় এবং বহিখানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাঠকের আর শান্তি পাকে না। ইহার চরিত্রগুলি সবই রক্ত-মাংসের জীব এবং যে-সকল নরনারী আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথে সর্বদা চলিতে-ফিরিতে দেখি, ঠিক তাহাদেরই মত এই গ্রন্থের পাত্রপাত্রী নিজের নিজের ক্ষুদ্রতা ও মহত্ব, হাসি ও অশ্রু জইয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করে। ইহাদের গারে কোথাও একটা পুঁথির ছাপ মারা নাই, বা কাহাকেও পরম গভীরভাবে আদর্শ শিখাইবার জন্য অস্বাভাবিক মুর্ত্তিতেও আবিস্কৃত বলিয়া মনে হয় না—পাত্র-পাত্রীর মনের ছোট ভাবটুকু হইতে বাহিরের বিরাট কার্য-কলাপ অবাধ দৃষ্টমত সম্ভাবনার গভীর মধ্যেই আবদ্ধ; সর্বত্রই সম্ভাবনার লক্ষণ একান্ত পরিষ্কৃত। অনেক স্থলিখিত উপন্যাসে দেখা যায়, লেখকের শক্তি ও সতর্কতার ফাঁকে ঘটনা প্রভৃতির একটু-আধটু অস্বাভাবিকতা উঁকি দেয়—মৌভাপ্যের বিষয়, এ বহিখানিতে সে ত্রুটি কোথাও

চোখে পড়ে না। সবচেয়ে উপভোগ্য হইয়াছে, ইহার ভাব। খুব সহজ স্বচ্ছ ভাব। এমন কৌশলে রচনাটি ঢালা হইয়াছে যে মানুষগুলা একেবারে হুলস্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং প্লটেও কোথাও ঘোর-প্যাচ বা হেঁয়ালির চিহ্ন নাই—তবে ক্রটিও যে দুই-একটা চোখে না ঠেকিয়াছে, এমন নয়। রক্তত বেচারাকে কণশ্রুতার মজলিসে না বসাইলে কোন ক্ষতি ছিল না; বরং ঐ ব্যাপারে রসটা একটু পাচ বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সন্ধ্যা ও বিহ্বালের চরিত্র আমাদের চমৎকার লাগিয়াছে। আমরা চাই সমাজে এমন সন্ধ্যার মত স্ত্রী—যে স্বামীর নীচতা বা অভ্যস্ত নিলজ্জা ক্ষুণ্ণতার সাথ দিয়া “লক্ষ্মী বোটি” হইয়া ঘরের কোণে চূপ করিয়া মুখ শুষ্কিয়া পড়িয়া থাকিবে না। দুগুণেই স্বামীর নীচতা ও ক্ষুণ্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্বামীর ক্রটি দেখাইয়া দিবে, এবং সন্ধ্যার মতই স্বামীর সেই সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এতোক আদর্শ স্ত্রীর তাহা কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। নহিলে হুম্মির স্বামীর হুম্মিরিত্যের সুদৃষ্টান্তে অনুযোগ তুলিয়া স্বামী-দেবতার পদাঘাতে ভুলুষ্ঠিত হইয়া স্ত্রী যে স্বামীর পদযুগল বুকে ধরিয়া বলিবে, “লাখি মেরেছ, বেশ করেছ অভু, দেবতা আমার, দুঃখ নাই, তবে তোমার পায়ে যে বড় বেদনা বেজেছে, দেবতা।” এবং শেষে স্বামীর আঁচরণে তেল মাশিষ করিতে বসিয়া থাকিবে, তেমন স্ত্রী কোনকালেই ‘সহধর্মিণী’ পদবাচ্য হইতে পারেন না। তেমন স্ত্রী সংসারে ভাল-ভাত রাঁধিতে পারে, তবে সে মাটির পুতুল লইয়া জীবন-বাঁজা নির্বাহ করা চলে না। দিন কয়েক পূর্বে এমনি আদর্শে বাঙালী কেভাবে স্ত্রী চালাই চলিতেছিল—আমাদের সৌভাগ্য, সাহিত্যের সে শ্রোত কিরিয়াছে।

আমরা এখন বাঙালীর ঘরে ঘরে দেখিতে চাই, হুম্মরনীর মত বলিষ্ঠ-চিন্তা মা, সন্ধ্যার মত কোমল-কঠিনে গঠিতা

প্রেমময়ী কর্তব্য-পরায়ণ। স্ত্রী বিদ্যাভ্যাসে মত্ত স্বাধীন-চিন্তা নারী এবং শিশিরের মত আদর্শ আত্মনির্ভরশীল যুবা। এ উপভাসধানিতে বাঙালীর ভবিষ্যৎ-আশার বার্তা আমরা পাইয়াছি। গ্রন্থখানি বাঙালীর উপভাসের রাজ্যে বেশ একটা দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। উপভাসপ্রিয় এতোক বাঙালীকে এই নির্মল অনাবিল সমাজ-চিত্রখানি একবার চোখের সম্মুখে ধরিতে বলি। বইখানির ছাপা-কাগজ প্রভৃতি হুম্মর হইয়াছে।

নিয়তি। সামাজিক নাটক। জীবন্ত নিয়ন্ত্রণ রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। কলিকাতা ফাইন আর্টস কলেজে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র। এই নাটকখানির কলেবর ক্ষুদ্র নহে—অনুহৎ। গ্রন্থে লেখক সমাজের নানা সমস্যার কথা তুলিয়াছেন। পরিব চাবাভূয়ার ছেলেদের মধ্যে শিক্ষা-বিপ্লবের আভাষও দুই-একটি দৃষ্টে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে; তন্ত্রিস মদ খাওয়ার পরিণাম, চরিত্র-হীনের প্রায়শ্চিত্ত, অর্থ-লোভীর দুর্দশা—নানা বিষয়ই অবতারণিত হইয়াছে এবং এই ব্যাপারগুলি ফুটাইবার জন্য ডাকাতের দল, বারান্দা, পুলিশ, মদ্যবিক্রতা, ইয়ারগণ—এমনি নানা প্রাণিকে লেখক নাটকে টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু একই নাটকে এতগুলি ব্যাপার ঠাসিতে হইয়াছে বলিয়া লেখক কাহারো প্রতি তেমন হুঁচকার করিতে পারেন নাই—কেবল এক জমিদার-পরিবার ও তৎসংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি জীববিশেষকে লইয়া এক বিশেষত্বহীন ঘটনার কাঠামো মাত্র খাড়া করা হইয়াছে—নাটকে প্রাণ-বস্তুর একান্ত অভাব। নাট্য-রচনায় যে কৌশলের প্রয়োজন এ গ্রন্থে তাহার ইঙ্গিত কোথাও দেখিলাম না।

শ্রীমতীস্বত শর্মা।

কলিকাতা—২২, হুকিরা স্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে প্রিণ্টিংয়ের মান্না কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, হুকিরা স্ট্রীট হইতে

শ্রীকালীচাঁদ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত।



ବାମନଙ୍କୁ ଅବଦାନ ।

ହିନ୍ଦୁସାନ ପ୍ରେସ—କୋଲକାତା ।

[ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ]





# ভারতী

৪২শ বর্ষ ]

ফাল্গুন, ১৩২৫

[ ১১শ সংখ্যা ]

## পাটেল-বিল\*

অসবর্ণ বিয়ের কথা মহাত্মা পাটেল যেমনি উত্থাপন করেছেন, অমনি দেখা গেল, বুড়ো-বাংলা বাইরে থেকে ধার-করে-আনা টোপর মাথায় দিয়ে গড়ের মাঠের সমাধি-স্তম্ভটির সামনে দাঁড়িয়ে কেবলি ষাড় নাড়তে লাগলো—না-না-না! এরা মৃত্যুকেই চায়! পাটকে অনেকখানি মিথ্যে এবং অনেকগুলো শূন্তের উপরে খাড়া কোরে কবর ও হাড়কাঠ—ছুটোই সাক্ষী রেখে পাড়া-পড়ুসির সেদিনের রামলীলার সমস্ত বাংলা ষোগ দিয়েছে, কাগজের ঢাক-পিটিয়ে এই যে মিথ্যে কথাটা জগতে প্রচার করবার চেষ্টা হচ্ছে, সেটাকে অপ্রমাণ করা চাই। বুড়োর দলকে বাংলার মাথায় এই উপহাস কিছুতেই চাপাতে দেওয়া নয়। বুড়োলাই তো বাংলার সবখানি নয়! সবদিক দিয়েই নতুন বাংলা আপনায় কথা, আপনায় আশা-ভরসা নিয়ে

জগতের সামনে এসেছে। তাকে উড়িয়ে দেওয়া কোনো সম্ভাব্য বা কোনো সনাতন মোড়লের সাধ্য নেই। আমরা জানি মাঠের গোরটার কাছ থেকে এবং শ্মশানের মশানের কাছ থেকে যে অসম্মতির চীৎকার শোনা যাচ্ছে, সেটা অসবর্ণ বিয়েতে সারা বাংলার মানুষদের অসম্মতি বোলে ক্লেথাও গ্রাহ্য হবে না। অসবর্ণ বিয়ে করবে দেশের সাহসী যুবক-দল। বিয়ে দেবে তার চেয়েও অসম-সাহসী মেয়ের বাপ-মা। আইন হচ্ছে তাদের নিরাপদে থাকার জন্ত। পাড়ার বুড়ো এবং পড়ুসা মোড়লদের এতে ঘৃণের ব্যাঘাত কেন হবে? এবং এ-নিয়ে তারা চোঁচামেচি করবেইবা কেন?

বাঙালীর সমাজের সম্মতি-অসম্মতি জানাবার জন্তে বেহার থেকে সম্ভাবিত ধরে আনার, এদের সম্ভার অসম্মতি খুব যে

\* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পাটেল-বিলের সমর্থন-সভার সম্ভাবিত বক্তৃতা।

পাকা-রকমের, তার পরিচয় তো পাওয়া যায় না।

স্বপ্নের বিষয়, সারা বাংলার নামে বুড়োর দলের সেদিনকার সভায় বাইশখানা বক্তার আসনের মধ্যে একুশখানাই খালি পড়েছিল—সন্ধ্যা ছ’টা পর্যন্ত দেখেছি। শুনেছি তারপরে অন্ধকারে পঞ্চাশ-হাজার সেখানে কীৰ্ত্তন ও আইনের কর্তন করবার জন্তে জুটেছিল এবং সহরের রাস্তায় কোনো গোলযোগ না ঘটিয়ে সাফে-ছ’টার ট্রাম ধর্মতলায় লাগবামাত্র তাতে চড়ে ঘরে গিয়েছিল—এত চটপট যে কেউ তাদের দেখেনি। বারম্বারের চেয়েও সচল অথচ মোটেই সজীব নয় এমন ছবির মতো এই একটা মহাসভার জনতা যা এল এবং গেল, ওনছি, তাকে সত্যিকার বলে সহজেই বিশ্বাস হয়তো খবরের কাগজ পড়ে অনেকেরই করছেন। কিন্তু দেশের গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এই অসবর্ণ বিয়ের আইন খাঁর করতে চলেছেন, ধর্মতলার এ কার-সাজিটা তাঁদের চোখে ধুলো দিতে পারবেনা, আশা করা যায়।

এই আইন পাশ হবার পূর্বে যে-দলের যা বলবার, সেটা ব্যস্ত করবার স্বাধীনতা সবারই আছে। সেদিনের লোকেরা সেদিনের ও সেদিকের কথা বোলে প্রেতাত্মাদের নিশ্চিন্ত করে ছেড়েছেন; এখন এদিনের লোক ইহকালের ব্যবস্থাটা কোরে না-নিয়ে, অচল হয়ে বসে থাকবে, কেবলই ভূত-পূর্বদের ভাবনা ভেবে, এটাই বা কেমন করে আশা করা যায়?—বিশেষত যখন বিয়ে নিয়ে কথা উঠেছে।

একদিকে পাহারা দিচ্ছে টোলার সশিষ্য

পণ্ডিত, আর-একদিকে ততোধিক পণ্ডিত মোড়ল-মহাশয়েরা, মধ্যে রয়েছে হিন্দু-মুসলিম। এইটেই কি ঠিক? না, এটাও ঠিক যে দুই-দুই জমাদানের সব ধর্মকানি, সব চাপন সময়-সময়ে অগ্রাহ্য কোরে ঠেলে কেলো সমাজের বন্দী অথচ স্বাধীন-চেতা তাঁরা রাজ্যকে চিতার আশুন এবং আত্মীবন চিতার চেয়েও ভয়ঙ্কর জালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার উপায় নিজের শক্তিতে কোরে দিয়ে তবে কান্ত হয়েছেন। সমাজের জমাদানের সঙ্গে, যাদের নিয়ে সমাজ ও যাদের নিয়ে জাত, তাদের লড়াই ইতিপূর্বে হয়ে গেছে এবং হবেও—জাতির কল্যাণের জন্ত, মজলের জন্ত। বিদ্রোহের আশুন সমাজের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে জ্বলে তা নিবারণের উপায় মজুতসংহিতার পুঁথি গুড়িয়ে ছাই-চাপা দেওয়া নয়,—বাতে জালা নিবারণ হয়, তাই করা।

জালা উপর জালা দেবার জন্তে যখন দরওয়ান রয়েছে, এবং যন্ত্রণা সরেও দরওয়ানদের আশীর্বাদ করবার লোকও রয়েছে যখন যথেষ্ট, তখন যে-আইন প্রস্তুত, সেটাকে তিরস্কার বোলে কতক লোকে নেবে, তার আর আশ্চর্য্য কি। সরকারি আইনের সাহায্য নিয়ে সমাজ-সংস্কার একদল অপছন্দ করছেন। অবশ্য নিজেরদের ঘর নিজেরা শুছিয়ে নিতে পারলেই ভালো; কিন্তু যতদিন জমাদার ক’জন দরজাদা থেকেও প্রভুত্ব খাটাচ্ছে, ততদিন ঘর এবং ঘরের লোকও যে তাদের খপ্পরে বন্দী এ-কথাটা যদি সত্যি না হতো, তবে অস্ত-সব ব্যাপারে খাঁর সর্বপ্রেম সদস্ত

অগ্রসর নেতা হস্তে ব্যস্ত, তাঁরা এ-সময়ে  
আটনের স্বপক্ষ-দলকে মিষ্টি কথায় গোপনে  
সহানুভূতি জানিয়ে বিদায় কোরে নিজের-  
নিজের সাক্ষাৎয়ের পথ পরিস্কার রাখতে  
ব্যস্ত হতেন না। এবং বুড়োদের খবরের  
কাগজে কেবল বিপক্ষ-দলের সভার খবরগুলো  
বার করবার ও স্বপক্ষদের খবর চেপে-যাবার  
চেষ্টা চলতোনা। হিন্দু-সমাজের দরওয়ান  
ক'জন যদি শুধু পাহারওয়াল হতো, তবে  
তাদের হাতে হিন্দু-সমাজ এ-পর্যন্ত যা হয়েছে  
ও সইছে তার শোধ নিশ্চয় নিতো—খুনোখুনি  
ব্যাপার কোরে। কিন্তু জমাদারগুলো বন্দীদের  
সঙ্গে নানা কুটুন্নিতা, আত্মীয়তা এমনি পাতিয়ে  
বসেছে, যে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া কোরে  
বন্দীদের দিন চলা দায়। ধোবা-নাগিত বন্ধ  
হতে পারে, জাতঃপাত থেকে আরম্ভ কোরে  
নির্যাতন কতটা যে এগোতে না-পারে তার  
ঠিক কি। কাজেই হিন্দুসমাজ নিজের ভিতর  
থেকে যে আপনার ক্ষত আপনি শুধরে  
নেবে, তার আশা খুবই কম। ডাক্তার-  
সাহেবের দরকার আছেই-আছে। ভিতরটা  
বখন এমন অপটু যে ভিতরের রোগ নিজে  
দূর কোরে দেবার সাধ্য নেই, তখন বাইরের  
বোলে ডাক্তারের চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে শুধু  
তো গলোদকে নির্ভর কোরে নেতারাও  
একদিন থাকেন না। তবে এক্ষেত্রে কেন যে  
তাঁরা আমাদের আর-এক মহুস জম্বানো  
পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছেন তা বোঝা  
যায় না। বড়-কবিরাজের অনিশ্চিত  
আগমনের আশা ও ধৈর্য্য বতখানি তাঁদের  
আছে, বেচারী রোগীর জীবন ততখানি  
অপেক্ষা করতে চাইবে কিনা বলা যায় না।

আমার ভয় হয় তাঁরা বখন কবিরাজ এনে  
হাজির করবেন, তখন দেখা যাবে এদেশে  
সমাজটি ঠিক শিবেরও অসাধ্য অবস্থায়  
গিয়ে পৌঁচেছে।

অসবর্ণ বিয়ের আইন পাল হলেই যে  
দেশতন্ত্র কোমর-বেঁধে সেই কাজে লেগে  
যাবে, সে-আশা খুবই কম। সত্যি-আইনের  
পশ্চাতে ব্রিটিশ-রাজশক্তি ও ইচ্ছা ছিল।  
কাজেই সে শুভ কাজটা চটু করে নিরীক  
হয়ে গেল। কিন্তু বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ  
বিবাহ—এমনি সব আইনগুলির সঙ্গে মুখ্য-  
ভাবে আমাদের নিজশক্তির ও ইচ্ছার  
যোগ। সত্যি-আইন ধরতে গেলে সাহেবরা  
বন্ধ করেছেন—সত্যকে আগুনের মুখ থেকে  
জোর করে টেনে এনে এবং ধর্মের নামে  
নরহত্যাকারীদের কঠিন শাস্তি দিয়ে।  
বিয়ের আইনের বেলায় তো তা হবার  
যো নেই। কাজেই বালিকা-বিধবার দুঃখ  
ঘুচতে, চারবর্ণের আত্মীয়তা বাড়তে নিশ্চয়  
আরো-গোটা-কয়েক যুগ কেটে যাবে,  
তাবনা নেই। তবে এ-আইন হ'লে আপাতত  
এইটুকু লাভ হবে—কড়া পাহারা শিথিল  
হবে, জেলখানার নিরেট দেয়ালে আর-  
একটা ফাঁক বাড়বে, দুই জমাদারের অবস্থা  
ধমক মানতে না চাইলে বাঁধের এদেশে  
টিকে থাকা, এমন কি পৃথিবীতে টিকে থাকা  
দায় ছিল, তারা রক্ষা পাবে; এরা জাত-  
হাড়কাঠের কাছে মানুষকে পত্তর মতো  
বখন-খুঁসি যেমন-খুঁসি ধোরে-ধোরে গণা-  
কাটতে পারবেনা; আর ছেলের বাজারও  
কিছু সত্তা হবে।

হিন্দুসমাজের দরজার বাইরে দরওয়ানদের

যতই দাপট থাকুক, এটা নিশ্চয় যে মদ্র আমলের খাঁচা-কলের অনেকগুলো কাঠি ও খিল ভেঙে, খাঁচার মধ্যকার পূর্ণতা ক্রমেই কমে চলেছে। এবং বেরিয়ে যারা যাচ্ছে, বাইরে থেকে ফিরে এসে সেই খাঁচা-কলের পূর্ণতা পুনরায় ভর্তি করবার অস্ত্রে তারা মোটেই ব্যস্ত হচ্ছে না। এতে যদি কার মনোকাষ্ট হয় তো সে মদ্র; এবং অন্ন-বাবার ভয় যদি কার হয় তো সে আমাদের দরওয়ানগুলোর।

একালে মদ্র যদি বর্তমান থাকতে পারতেন, তবে হয়তো তাঁর কলটা তিনি মেরামৎ কোরে, শুধরে এখনকার উপযোগী কোরে নিতে পারতেন। কিন্তু মদ্র নেই—যিনি বানালেন খাঁচা ও খুটিনাটি; রয়েছে কেবল ভাঙা খাঁচার-খরা মাছুবগুলি; এবং দরজায় মদ্র আমলের থেকে বহাল-করা দরওয়ানীর উপযুক্ত জন-হুই;—বাদের কলকজা-জ্ঞান করেদী বারা, তাদের চেয়েও কম। তারা বংশাঙ্কমে এ-পূর্ণাঙ্গ ধমকেই এসেছে এবং সেইটেতেই তারা মজবুদ। একেত্রে মদ্রস্তর পর্যন্ত খাঁচা-কলের কোনো ব্যবস্থা হওয়া কঠিন; এবং করেদীর সব-ক'টিকেও সেখানে ধোরে রাখা শক্ত—যদিবা করেদী বইচ্ছায় স্বস্থানে থাকে এমন-একটা ব্যবস্থা করা না হয়। হ'লে তারা ফাঁক পেলেই পালাবে এবং খাঁচার শিক আরো ফাঁক হয়—এই প্রার্থনাই বৃটিশ-গভমে'টকে জানাবে।

'কিংকর্তব্য' ? এই-জাতীয় একটা সমস্তার মীমাংসা একবার সত্যিকার পাখীদের নিয়ে আমাদের করতে হয়েছিল। একসময়ে খাঁচার দরজায় ডবল-তালা

লাগিয়ে কতকগুলি হুপ্রাপ্য পাখী—আমি লালন-পালন করছিগেম। খাঁচাটা ছিল বহু-কালের; কাজেই পাখী সেখানে তালা-সঙ্গেও আঙে-আঙে কমতে লাগল। আজ এ-ফাঁক বন্ধ করি, কাল ও-ফাঁক দিয়ে পাখী পালায়; অথবা নিজেরাই নতুন-নতুন ফাঁক আবিষ্কার করে। বারা পালায় তারা দেশ ছেড়ে নয়তো পাখী-লীলা সাদ করেই পালায়। সব বার দেখে 'অর্জু' তাজতি পণ্ডিতঃ—বুদ্ধিই আমি করলেম। খাঁচাটাকে আর খাঁচা রাখলেম না। ডবল-তালা সরিয়ে সেটাকে আশ্রয় এবং আহ্বারের স্থান, আর, সমস্ত-বাগানটাকে পাখীদের বিহারের স্থান করে দিয়ে আমি সরে দাঁড়ালেম। দেখলেম তখন পাখীরা ইচ্ছা-স্থখে খাঁচার মধ্যে আনাগোনা করতে লাগতো এবং আমার বাগান ছেড়ে আর কোথাও নড়া আর প্রয়োজন বলেই বোধ করলে না। শুধু যে এতে পোষা-পাখীরাই কাছে রইল তা নয়, বাইরেরও পাখী নিকটে পেতে আমাকে কোনো মারা-জালই বিস্তার করতে হ'ল না। হিন্দুসমাজের খাঁচা-ও-কলে-পড়াদের অস্ত্র উপরের মতো কিছু-একটা ব্যবস্থা ভালো কি মন্দ তা স্ত্রাবাগীশেরা বুঝুন; আমি যখন ব্যাধ নয়, তখন ফাঁদ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে ফাঁদেরও ছরবস্থা, নির্জেরও বিপদ ঘটবে। কিন্তু এটা ঠিক যে হিন্দুসমাজের চাবি কতকটা খুলে গেলে সমাজ পরিত্যাগ কোরে বারা বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে বা অস্ত্র সমাজে গিয়ে মিলছে, তাদের আর সেটা করবার কারণ থাকবে না। কিন্তু ঐ ছই দরওয়ান—দরজার

সঙ্গে যাহোক—আমরা জানিও যার, তারা বলবে—ডবলের উপরেও ডবল তালি নইলে চলছে না, হজুর !

চারবর্ষ এ-ওর সঙ্গে মেলবার সুযোগ পেলে হিন্দুশ্রমিকের চেহারা কতকটা যে বদলে যাবে, তার সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-বদলটা যে খুব ভীষণ-আকারের একটা-কিছু হবে, তাতে মনে হয় না। চারবর্ষ কেন, রাম-ধনুকের সব-ক'টা বর্ষ নিয়েই আমি বাল্যকাল থেকে এ-পর্যন্ত কারবার করে আসছি। এটা দেখেছি বর্ষকে স্বপ্ন-হানে অমিত্র-অবস্থার রেখে চালাচিৎ পর্যন্ত করা চলে, তার উপরে আর ওঠা যায় না। জীবন্ত ছবির বেলায় এক বর্ষকে আর-এক বর্ষে না মেলালে উপায় নেই।

এই আইন যদি-বা পাশ হয়, তবে এদেশের জল-হাওয়ার গুণে তার ফল ফলতে এত বিলম্ব হবে যে ততদিন খুব-বুড়োর দল নিশ্চয়ই লোপ পাবে; সুতরাং তাঁরা নির্ভয়ে থাকুন। ভয় কেবল তাদেরই, যারা কচি-বয়েস থেকেই প্রেতলোকের ভাবনা খুব বেশি-কোরে ভেবে মাথা ধরাচ্ছে।

আর আমরা—যারা এই অসবর্ণ বিয়ের সমর্থন করতে এসেছি, আমাদেরও যে কোনো ভয় নেই, তা কেনন কোরে বলি, যখন অপর-পক্ষের হাতে কাগজের খাঁড়ার এখনি শান পড়ছে জানিছি; এবং জানিছি তালিবাঁসা, আত্মীয়তা, বন্ধুতা এমনি সব সোনার কোটোর ভিতর কোটোর মধ্যে 'বেথানে' আমাদের আগটুকু মুকিয়ে রেখেছি, সেখানেও যুগ-ধরাবার পরামর্শ গোপনে চলেছে—এরি মধ্যে।

এই যুগ এবং কাগজের খাঁড়া—হুটোই আমাদের সোনার ঘরের আশেপাশে অনেকবার দাঁত বসিয়ে বুড়োদেরই মতো এমন ভরসার ফোঁগুলা হয়ে পড়েছে যে অনায়াসে সে-হুটোকে আমরা উপেক্ষা কোরে কাজ করে যেতে পারি—নতুন কোরে অস্ত্র-আইনের দরখাস্ত না লিখে। প্রাচীনের দলকে এটা আমাদের স্পষ্ট করে বোঝাতে হবে যে চীনের প্রাচীরের মধ্যে বাঁধা থেকে আমরা মরতে রাজি নই এবং তোমাদের জাতরূপী-জাতাকলের মুঠো হয়ে নিজের জাতকে নিজেরা পিশে মারতেও রাজি নই।

খুব নরম কোরে বলিও, অসবর্ণ বিয়ের সমর্থন কোরে যতগুলো সভা, সবগুলোকেই বিপক্ষ-দলের কাগজগুলো বলবে নাস্তিকের সভা;—যদি-না এই-সব স্বপক্ষ-সভার বিবরণ যুগাক্ষরেও প্রকাশের সংসাহস দেখাতে সাধারণ খবরের পেয়াদা যে, সম্পাদকরা এ-পর্যন্ত যা কোরে আসছে, তা না করে—অর্থাৎ তাদের কাগজটা দেশের সবদিকের সব-রকমের খবরের অন্তে নয়, কিন্তু নিজাদের ঘরে পরসা মুড়ে আনবার থলি প্রজ্ঞতের জন্ত, এইটেই মনে না করে। আর খুব গরম কোরে যদি আমাদের কোনো খবরের কাগজে এই আইনের বিপক্ষ-দলের গালাগালির প্রতিবাদ করা চলে, তবে ভক্তলোক এই পর্যন্ত বলতে পারে—“ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং। ন নাস্তিকোহহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন। সন্নীক্য কালং পুনরাস্তি-কোহভবং, ভবের কালে পুনরেন নাস্তিকঃ।” ওগো আমরা নাস্তিকও নয়, অহিন্দুও নয়, এবং তোমাদেরই মতো আমরাও পরলোকের

প্রিয় চিন্তা কোরে থাকি ; কিন্তু সময় এসেছে যখন নাস্তিক হতে হবে—“স চাপি কালোহয়-মুপাগতঃ শনৈর্বখা ময়া নাস্তিকবাণ্ডদৌরিতা।” —এমন সময় এসেছে তোমরা যাতে ভালো-মামুষটি বলবে এমন-সব ভোম্বাদের মন-যোগানো কাজ কোরে জাতাম্বরের জাঁতার চাপনে দেশস্বত্বকে মরতে দিলে গোলোকে স্থান দেবে বল্লও সে কাজে রাজি নই। কেননা, ইহলোকের জীবন-যাত্রা তাহ’লে আমাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠবে—পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কাজেই বা বলবার, তা বলতে হবে। হিন্দুস্থানের হিন্দু একজাত নয়, কাজেই একও নয় ; কিন্তু এক হতে পারে। কেননা ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জর্মানিতে সেটা হয়েছে। ভারতবর্ষেই বা সেটা হওয়া আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু ঐ জাতের জাঁতা নিয়ত ঘুরে-ঘুরে এককে শতখণ্ডে যতদিন চূর্ণবিচূর্ণ করতে থাকবে, ততদিন সেটা কিছুতে হবে না।

সময়ের সঙ্গে যদি আমরা চলতে চাই, তবে আমাদের সমাজের পুরাতন ডিঙিধানাকে বেশ-কোরে নতুন ও মজবুৎ কোরে মোতে ভাগাতে হবে। মিউজিয়ামের উপযুক্ত বোলে সেটাকে ডাঙার তুলে আগলে বসে থাকলে তো চলবে না। ডিঙিও চলবে না, আমরাও চলবো না—যদি জল ছোঁরা কিনা এই তর্ক নিয়েই কাল কাটাতে থাকি। যে-সব ধর্ম্মের কর্ম্মের ও চিন্তার মোত আমাদের কাছ দিয়ে বহে যাচ্ছে, তা থেকে দূরে থাকারই পরামর্শ ঠাৱা কচ্ছেন, ঠাৱাও কি জানেন না যে বাণ যেদিন এসে উপস্থিত হয়ে—যে-অবস্থার আছি সে-অবস্থার থাকা আর সেদিন সম্ভব হবে না, —ভেসে যেতেই হবে এবং সে-সময় অকর্ম্ম

মাঝি এবং অচল ডিঙি—দুটোই বখা চেঁচা করবে যাত্রীদের বাণের মুখে ভাসিয়ে রাখবার জন্তে। আমরা ডুববোই ! ভব-সাগরের পারে যাবার আশায় যে-ডিঙিধানা ডাঙার উপরে নিয়ে বসেছিলুম, সেটা যখন সত্যিকার সাগরের তোড়ে চুম্বার হয়ে যাবে, তখন তার যুগ-ধরা কোপরা কাঠগুলো আমাদের দুই-মুঠোর চাপনে গুঁড়ো হয়ে গঙ্গামুক্তিকার চেয়েও তরল পদার্থে পরিণত হ’বে এবং তারি বর্ণ সর্কাজে মেখে আমরা চট্-কোরে রসান্তরের দিকে চলে যাবো। যদি যেমন চলছে এমনিভাবে হিন্দু-সমাজরূপ ডিঙি-ধানিতে একটুও অদল-বদল, একটুও সংস্কার না কোরে, জল-ছোঁরা প্রভৃতি দরকারি কাজ থেকে একেবারে আগলে রেখে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি—ইহকাল-পরকাল, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—দুটো ভাল-পাকিয়ে, আজগুবি লাড়ু হাতে লাড়ু গোপালটির মতো ভালোমামুষ, তবে ভরা-ডুবি রক্ষা হবে না। পূর্ব্বতন ঋষিদের কালে হিন্দুসমাজের মধ্যে নানা সংস্কার নানা দিক দিয়ে আসতে দেওয়া হতো বোলেই, সমাজ তখন এপার ওপার ছপারেই যাত্রীদের বহন করে চলেছিল। এখন ঠাৱা সমাজের খবরদারি করতে বাস্ত, ঠাৱা সমাজকে প্রধানত ইহকালের সুবিধা-অসুবিধার জন্য না প্রস্তুত রেখে, পরকালে সাক্ষী দেবার জন্যে পোটলা বেঁধে রাখতে চান। এটা ঠাৱা ভুলে যান যে সমাজ হচ্ছে জীবন্ত মানুষদের নিয়ে এবং ইহজীবনের কাজে লাগবার জন্যই তার বিশেষ প্রয়োজন। প্রেতলোকে গিয়ে পিণ্ড দেবার জন্য সমাজের সৃষ্টি

হয়নি; ইহলোকের কাণ্ডকারখানার জন্যই রয়েছে সমাজ; কাজেই ইহলোকের কাজে লাগাতে হলে সময়-মতো সংস্কারাদি তোর সমাজের কল-বল্ ঠিক রাখতে হবে না হলে আর বেশীক্ষণ সে আমাদের কাজে আসবে না। সংস্কারের দ্বারা হিন্দুসমাজের কতটা বিপদ, নে-ভাবনার চেয়ে সংস্কারের অভাবে তার কি দুর্দশা হবে সেইটেই বেশী কোরে ভাববার বিষয়। কিন্তু ভাবতে বসেই দ্বারা চটে উঠে মনুসংহিতা আউড়ে যান, তাঁদের সঙ্গে চেষ্টা করে তো আমরা পারবো না। লেখালেখি করেও যে পেরে উঠি তা নয়। কেননা খবরের কাগজের প্রায় সব বাঙালী তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতিয়ে বসেছে। এ অবস্থায় গভর্নমেন্টের কাছে আইনের সাহায্য না চেয়ে, মনুসংহিতার সামনে দাঁড়িয়ে হা-হতাশ করে সময় নষ্ট করা বুঝা। ভিতর থেকে সমাজসংস্কার যখন একপ্রকার অসম্ভব, তখন বাইরে থেকেও যদি সেটা না আসে, তবে বলতেই হবে ভিতরে-বাইরে আমরা একে-বারেই মলেম! একমাত্র তখন বুড়োর দলের শীঘ্র বিলুপ্তির কামনা বিধাতার কাছে করা ছাড়া আর যে আমরা কি করবো ভেবে পাইনা। কিন্তু হায় বিধাতা যে অভিসম্পাত দিয়ে বসেছেন যে বুড়োর দল এদেশে অনেক যুগ বাঁচবে!

কিন্তু অকস্মাৎ বোলে একজন জেঁ আছে, —যে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে গেল! যার বন্বাবর কথা শোনার জায়গায়, তাকে বসিয়ে দিলে সভাপতির সিংহাসনে! যখন এমন অবতন চোখের সামনে ঘটছে, তখন হঠাৎ এই অবসর্গ

বিয়ের বিলের সঙ্গে হিন্দু-সমাজের সংস্কারও ঘটে যেতে পারে এবং যাকে শাপ বলে ঠাউরে ছিলেম সে বর হয়েও দেখা দিতে পারে। বিয়ের আইন নিয়ে যখন গড়াই, তখন যে-পক্ষে যুবাবর মেলা, সেই-পক্ষেই জয়ের মালা নিশ্চয়ই এসে পড়েছে, এই বিশ্বাসেই নয়সের ধর্ম না মেনেই আমি এ-দলে ভিড়েছি এবং এর অন্তে বুড়োরা হয় তো আমাকে কিছু একটা উপাধি দিয়েছেন এবং হয় তো আমার ছবি খুব জাঁকালো-রকমে কাগজে ছাপিয়ে ঘরে-ঘরে বিলি করছেন। কিম্বা দেখলেম হয়তো এর একটাও হল না; অকস্মাৎ সব উন্টেপাণ্টে গিয়ে বুড়োরই গলায় পড়লো বরণ-মালা, আর আমি যে ফাঁকে সেই ফাঁকাতেই অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়লেম। এই ভাবে অকস্মাৎও যদি হিন্দু-সমাজের মধ্যে একটা সংস্কার ঘটে যায়—যেমন একবার আমার এক দূর-সম্পর্কে বড়দাদার ঘটেছিল, তা হলেও ভালো। দাদার ঠাকুরদাদা ছিলেন খুব ছোটোখাটো মানুষটি। তিনি নিজের মালা আফিস-গাড়িখানি বানিয়েছিলেন। সেখানি খুব বুড়ো হয়ে মরবার সময় নাটিকে বর্ণশিল্প দিয়ে গেলেন। এদিকে দাদার শরীর হল তাঁর ঠাকুরদাদার চেয়ে আড়াই-গুণ লম্বা-চওড়া, কাজেই পিতামহের গাড়িখানি চড়ে-বেড়াতে তাঁর কষ্ট বাড়ছিল বই কমছিল না।

আমি একদিন বসেই দাদা, গাড়িখানি একটু কেটে-কুটে এদিক-ওদিক করে বাড়িয়ে নিই, আরাম পাবেন। পিতামহের গাড়ি, তার উপর করাং চালাতে দাদার মায়া হ'ল।



কেবল আমার অনেক অজরোধে গাড়ির চারখানা চাকা মোটা লোহা আর কাঠ-কাটরা দিয়ে মজবুৎ করে নিলেন। তারপর একদিন যিনি অকস্মাৎ তিনি এক ছুঁয়ে দাদার সেকেন্দ্রে গাড়ির কচ্ছবের পিঠের মতো ছাদ-খানা রাস্তার মধ্যে থেকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন। দাদা দেখলেন, সেই ছাদ-খোলা গাড়িতে গলির মোড়ে উপস্থিত—হাতা-মুড়ি দিয়ে। আমি কোনো চুখটিনার আশকা করে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে শুধোলেন—দাদা, এ কি কাণ্ড! দাদা খুব গভীরভাবে বলেন—ছিল পাঙ্কি, হল কেটিন! একটু হাওয়া-খাবার আর হাত-পা ছড়িয়ে বস্তার সুবিধে হল! ভাগ্যি তুমি বলেছিলে চাকা-চারখানা মজবুৎ রাখতে; না হলে, আজ কি বিপদই হতো।

দাদার ফিটেনের মতো এই অবসর্গ ঘিরের আইনটা সবখানি অকস্মাতের জিন্দার রেখে

কিন্তু বাড়ি যেতে আমার সাহস হয় না। কি জানি অকস্মাৎ হয় তো বুড়োদের ভাবগতিক দেখে আমাদের রাজপুরুষেরা ভাবতে পারেন এ-আইনের সমর্থন এ-দেশের জনপ্রাণীও করেনি। তাই আমরা-সবাই—যায়া এখনো বুড়োদের মতো ভয়ঙ্কর বুড়ো হইনি এবং হতেও চাইনে, তারা এই সংস্কারের সমর্থন করে সোজা হাত ওঠাবো নির্ভয়ে; কেন না জর্নি যে জাতির কল্যাণের জন্ত যা, তাকে সমর্থন করে হাত ওঠালে যদি যা চাই তা এখনি নাও পাই, তবু কার কাছে লজ্জা পেতে হবে না। আর যে-হাত সবার উপরে রয়েছে সে-হাতের ইজিত মেনে যদি সংস্কারের সব কাজে সার স্নিয়ে যেতে পারি, তবে আমাদের নিরাশও হতে হবে না—হারও মানতে হবে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## পাতিল-প্রমাদ

বা

## প্রমহ-প্রতিবাদ

আমরা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইছ সবে,

বর্ণ-গর্ব রাধিব—পন ;—

এই চিঁড়ে-ফণারিয়া চিড়িতন আর

ইক্ষু-দাঁতন ইক্ষুবন!

পাতিলের বিল নাকচ বাতিল

করিব আমরা পট কই,

হরবোলা-গাঁই হরতন মোরা,

মোরা হেঁজিপেঁজি মোটেই নই!

দ্যাখ তাসের মতন আমরা চারি জাতি,

আমরা সবাই জাস্ত তাস,

তাসের কেলা সাকিম, রয়েছি

ভরে ভরে পাছে লাগে বাতাস!

অধরে ঈজাতে বিয়ে হবে নাকি?

ছিছি শুনে লাগে মরিয়া বাই!

তাতে যে বর্ণ-সঙ্কর হয়

গীতাকার বাস বলেছে ভাই!

মন্তগন্ধার ছেলে  
অজ্ঞাতে অঘরে বিবাহ নয়,  
সত্যবতী ও আশ্ববতীরে  
খামা-চাপা দিয়ে পাওঁরে জয় !  
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং  
Inter-caste marriage hang !  
পাতিল বিল বাতিল—এই—  
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

হো হো পাতিলের বিল করিতে বাতিল  
উদয় হয়েছি আমরা হে,  
এই তামাটে ও মেটে ভুলটে পাণ্ডটে  
কুচ্ কুচে কালো আমরা হে !  
ছি ছি ভিন্ন বর্ণে বিয়ে কতু হয় ?  
বধির হও রে কর্ণ—উঃ !  
আরে বিয়ে হয়নাকো, বিয়ে হয়নাকো,  
নিকে হয় অসবর্ণ—হঃ !

দ্যাক উচ্চবর্ণ আমরা বেজার,  
আমরা দেশের ভরসা তাই,  
তধু কলিকাল বোলে রংটা বেতর,  
একটু কলি দিলে হব কর্মী তাই ।  
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং  
Inter-caste marriage hang !  
পাতিল-বিল বাতিল—এই—  
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

দ্যাক জব্বুপে রাস কোরে হ'ল  
আমের মতন জেলাটা হে !  
মোদের Arctic Home এ কিঁরে যদি বাই,  
মেরে দিই তবে কেলাটা হে !  
তধু জার খেরে রঙে আম্‌ডো পড়েছে,  
নইলে আর্থ্য আমরা খাঁটি ও সাঁজা,

তাই প্রতি পরিবারে চাতুর্ঘর্ষা  
কিবা কালো, ধলো, বুলু, ব্রাউন্ বাচ্চা !  
তবে রঙের বড়াই কর একজাই,  
কৃষ্ণচর্ম শর্ম্মা আগো !  
খেঁটে খুঁতি-কলমে লেখ বক্তৃতা  
সাড়ে-সাতার কর্ম্ম! হাগো !  
তখ রঙে আছি মেরা রঙের গোলাম  
রঙের টঙের সঙের পাতি  
রঙে আছি, তাই টঙে বোসে আছি,  
কেউবা কাগ'জী, কেউবা পাতি ।  
কেউবা মাচার, কেউবা তলায়,  
কেউ ঘেঁষাঘেঁষি, কেউ তকাত্তে,  
সব সঙই যদি টঙে ভিড় করে  
ধপাং হবে বে অধঃপাতে ।  
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং  
Inter-caste marriage hang !  
পাতিল-বিল বাতিল—এই—  
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

তখ সতীদাহ রহ, বিধবা-বিপদ  
বাধিরে তো ডেকে এনেছ কাঁড়া,  
বাস রহিত-গোত্র রুইতন বলে  
রঙের এ টঙে দিরো না নাড়া ।  
তখ ভেঙে দিরো না রঙের খেলাটা,  
কেলোনাকো দেখে হাতের তাস,  
(কিন্তু সনাতন হরতনের টেকা ?—  
আরে ! কোথা গেল ? সর্কনাশ !)  
আহা জলিরে দিরো না, রোসো বাপু, রোসো,  
এই বে—চিঁড়ের তিরির গায়—  
তখ লেখা আছে হরতনের টেকা,  
আর তর মেরা করি কাহার ?

- তবে ভেঁজে নাও তাস, বাস ভায়া বাস, তিনি করিলেন কিয় হনুদ-বরণ—  
 লগা টিকিতে লাগাও মাজা, উমারে,—এহের কের দাদা রে ।  
 মোদের সেট-ভাঙা তাস, কোরোনাকো কাঁস, তাহে কি যে অঘটন ঘটিল, শ্রবণ  
 কসে খেলো,—হবে ছকা পাঞ্জা ! • কর যদি থাকে কর্ণ, আহা !  
 (কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং হল পার্বতীমুত লম্বোদরের  
 Inter-caste marriage hang ! চুনে-হলুদিয়া বর্ণ ডাহা !  
 পাতিল-বিল বাতিল—এই— (কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং  
 ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ! Inter-caste marriage hang !  
 পাতিল-বিল বাতিল—এই—  
 ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !
- তাপ অ-আ-ই-উ বলি হাই যদি খালি তোলা যায় স্বরবর্ণেতে,  
 টিকটিকি তবে কি করিতে পারে ?—  
 তোলে না তা কেউ কর্তে । তাপ ছাপাখানা হয়ে ছত্রিশ আতে  
 কিস্তি স্বরে ব্যঞ্জনে ঝকটি বাই শাস্ত্র বেবাক পড়িছে হার,  
 বাক্যের হ্রস্ব সৃষ্টি গো, নাই পেরে-পেরে অলপ্পেরা  
 অমনি অর্ধেরও খোঁজ পোড়ে যায়, পড়ে মাথার ক্রমশঃ চড়িতে চার ।  
 আইনেরও খর-সৃষ্টি গো ! • আহা ভালো ছিল যবে শাস্ত্র শিকার,  
 তাহে ক্যাসাদের পর ক্যাচাং আসিয়া ধর্ম ছিলেন টিকিতে ভোঃ !  
 করয়ে সমাচ্ছন্ন হে, এখন ছোট-মুখে শুনি বড় বড়-কথা,  
 এর হেতুটা কি জানো ?—স্বরে-ব্যঞ্জনে তর্কে না ছায় টিকিতে, ওঃ !  
 বিবাহটা অসবর্ণ যে ! আরে শাস্ত্র-তর্ক তোরা কি জানিস ?  
 (কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং তারি দেখি আশ্পর্কি যে !  
 Inter-caste marriage hang ! জোড়া-ঠ্যাং-ওলা শাস্ত্র আয়রা  
 পাতিল-বিল বাতিল—এই— আমাধিগে নাই শ্রদ্ধা রে !  
 ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ! ভর্ক তোদের শুনে হাসি পার,  
 হার রে গণ্ডমূর্খ হার !
- তাপ বর্ণধর্মের করি অবহেলা শাস্ত্র-তত্ত্ব সোজা নয় মুঢ়,  
 দেবতারও নাহি অব্যাহতি— পূর্ণ সে গুঢ় সূক্ষ্মতায় !  
 হেইহে ক্যালক্যালাটার কি দেখিছ বাপু ? (কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং  
 বোসো ঐখানে শুনিবে যদি । নাস্তিক সব তর্কিক hang !  
 ঐ বুটিঙের চুন চেয়ে সাতশত রং ছিল মহেশের সাদা রে পাতিল-বিল বাতিল—এই—  
 ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

হেঁহেঁ ~~পাতিল~~ তনয়া তপতীর কেন  
 নমকুলে বিয়ে হটল রে,  
 আর ঋষি বশিষ্ঠ বিলোম বিবাহে  
 ষট্‌কালি কেন কৈল রে।  
 মাহুকের ছেলে দেবতার মেয়ে—  
 এ ত অমূল্য বিবাহ নয়,  
 এই ত প্রশ্ন?—প্রজ্ঞাবৃত্ত  
 চিন্তে গুনহ কিসে কি হয়।—

জ্ঞাথ স্বর্গ্যস্ততারে বিবাহ করিলে  
 বম শনি হয় বড়-কুটুম,  
 তাই তপতীর সাথে বের কথা হ'লে  
 দেবতাকুলের ঘুচ্চিত্ত গুম।  
 কারণ শনি কি যমকে শ্রালক বলিলে  
 হন যদি গুঁরা ক্রুদ্ধ হে,  
 তবে হয়ত দণ্ড পড়িবে মুণ্ডে  
 কিম্বা উড়িবে মুণ্ড-স্কন্ধ রে!  
 আবার জায়া যদি কতু বারনা ধরেন

ভায়ের বাড়ীতে বাইতে গো,  
 তবে বম-ঘরে তাঁরে হয় পাঠাইতে,  
 আশা ছেড়ে দাও তার চাইতে ও।  
 কিন্তু স্বর্গ্যের মেয়ে ধুবড়ো থাকিবে  
 সে বে মহাপাপ শাস্ত্রে কয়,  
 তাই ষট্‌কালি করি বিলোম বিবাহ  
 দিল বশিষ্ঠ হয়ে সদয়।

জ্ঞাথ সকল অবিধি বিধি হয় ভেঙ্গী  
 ভেঙ্গপাতাদের পক্ষেতে,  
 আর যমকে তো লোকে বলেই প্রমলক—  
 তাই বাধিলনা সম্পর্কেতে।

(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং  
 Inter-caste marriage hang!  
 পাতিল—বিল বাতিল—এই—  
 ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

হ'হ' ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি,—ওকি ও!  
 ফের লোকগুলো আসে যে খুঁকে,  
 বলে হরের ঘরগাঁ গঙ্গা কেমনে  
 করিল বরণ শাস্ত্রজুকে?  
 বলি অত খবরে কি দয়াকার শুনি  
 তামাসা পেয়েছ? ভারি যে ইয়ে?  
 গঙ্গার কথা গঙ্গা জানেন,  
 বা না সেখা দড়িকলসী নিয়ে!  
 হেসে কুটিকুটি, ভারি যে আমোদ,  
 কুটিনটি সবাকি কাছে;

বলি যাওনা ঢেউয়ের বহর দেখগে,  
 হ'হ' হাঁ-করা মকর মুখিয়ে আছে।  
 (কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং  
 Inter-caste marriage hang!  
 পাতিল-বিল বাতিল—এই—  
 ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

ওকি ফের গুজ্জাঙ্ কণ্ড কি আজ,  
 ফের হাউচাউ, চাও কি বাপু?  
 হেরে হেরে দেবো হারিয়ে সবধে,  
 বচনে কখনো হব না কাবু।

কি? শৈব বিবাহ? গোবামী-মত?—  
 বাধ্য নহিক শুনিতে অত;  
 গোবামী-মত হবে সে পণাহে,  
 প্রজ্ঞাহৌনের তর্ক বত!

জ্ঞাথ শুনে যাও শুধু, তর্ক কোরো না,  
 কথার উপরে করো না কথা,  
 নিজের গলাটা জাহির করিতে  
 বাহির কোরো না ছুতো ও নত  
 আমরা বলিব, তোমরা শুনিবে,—  
 এই সনাতন দেশের রীতি,

মোদের দিয়ে-থুরে তোরা শুষ্ক করিবি,  
 নিম্নে-থুরে যোরা জানাব প্রীতি ।  
 তর্ক কোরো না, তর্কের শেষ  
 হয় না কখনো জাননা তা কি ?  
 হেঁহে গণেশের কলা-বোকে দেখিয়ে  
 শেষে উদ্ভিদ-বিরে চালাবি নাকি ?  
 (কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং  
 Inter-caste marriage hang !  
 পাতিল-বিল বাতিল—এই—  
 ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

তাপ মোরা সনাতন রঙের গোলাঘ,  
 বর্ণের দাস আমরা সব,  
 ভিন্ন রঙের টেকা যে মারি  
 সে কথা স্বীকার করিতে হবে ।  
 ওই পরের নহা কেবলি ন কোঁটা,  
 আমার নহা চোঁদ সে,  
 একথা যেজন জানে না সে মুঢ়,  
 মানে না বে—চোর বোঁদ সে ।  
 আমরা কাশানের কোঁকে হব না নেশান,  
 যা আছে তা মোরা রব নাগাড়,  
 দলাদলি কোরে, কিলোকিলি কোরে  
 ভাগে ভাগে সোড়ে বাব ভাগাড় !  
 শত্রুর বলে চোটে গেছে রং,  
 বা আছে সে শুধু রঙের ঢং,  
 বাক্ রং, থাক্ ঢং আমাদের,  
 রঙের চঙের আমরা সং ।  
 (কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং  
 Inter-caste marriage hang !  
 পাতিল-বিল বাতিল—এই—  
 ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ।

তাপ ছুঁৎ-বার্গের আমরা পাতিল—  
 বর্ণ-গর্বে বনেদ পাঁথা,  
 মোদের বর্ণ যদিচ বর্ণনাভীত,  
 কিছু তামা কিছু তামাক-পাতা !  
 তবু বর্ণে আমরা শ্রেষ্ঠ ওনেছি,  
 প্রতি সে, যে হেতু শোনা সে যায়,  
 অহো প্রতি অমাত্র করিবি কি তোরা  
 ইহ পরকাল ধোঁরাখি হার !  
 আগো আগো তবে ভাই, ওঠ তবে ভাই,  
 আগহ, কিন্তু মেলা না চোখ,  
 বর্ণ মানে যে রং হয়, সেটা  
 জানা ভালো নয় বতই হোক ।  
 চক্ষু কর্ণে বিবাদ বাধায়  
 বলতো মানিবি কারে সালিস ?  
 তবে জেগে চোখ বুজে চোঁচায়ে,—যদি এ—  
 নিরেট গুফর সন্না নিস্ ।  
 সোনাযুগ কালো কলায়ে তিসিতে  
 ভুসিতে মিশিয়া রয়েছি বেশ,  
 বর্ণগর্ক রয়েছে বজার  
 চোখ খুলে কেন বাড়ানো ক্রেশ ?  
 বর্ণ সত্য জাতি সনাতন,  
 Inter-caste ? কখনো নয় ।  
 সনাতন চিড়িতন হরতন  
 ইক্কাবনের গাহরে জয় !  
 (কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং  
 Inter-caste marriage hang !  
 'পাতিল-বিল বাতিল—এই—  
 ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ।

# টুকনি

( গল্প )

দার্জিলিং একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে দেখি খোকা এই-এতটুকু একটা ছোট্ট ভুটিয়া ছেলের সঙ্গে খেলার মত্ত হয়ে আছে। ভুটিয়া ছেলোটো কখনো হামাগুড়ি দিয়ে খোকাকে পিঠে-চাপিয়ে ‘ডংকি’ হয়ে ছুটছে, কখনো গলার একটা ফিতে-বেঁধে কুকুর সঙ্গে খোকার সঙ্গে-সঙ্গে ভেঁটে-ভেঁটে-করতে-করতে ঘুরছে, কখনো-বা একখানা বেতের মোড়াতে তাকে বসিয়ে ‘রিক্স’ ঠেলছে ;—এমনি নানারকম খেল। আমি খোকাকে জিজ্ঞাসা করলুম—“এ কে রে ?”

খোকা বলল—“ও টুকনি।”

আমি বললুম—“কোথায় পেলি ?”

খোকা বলল—“রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।”

মোটামুটি ইতিহাসটা এই যে খোকা বিকেলে চৌরাস্তায় বেড়াতে গিয়েছিল ; সেইখানে টুকনির সঙ্গে তার দেখা ; যেমন দেখা অমনি ভাব ; এবং যেমন ভাব, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে বাড়ি আসা।

খোকাকে যখন প্রায় করছিলুম, টুকনি তার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল। বাহিরের দেহটা তার চুপ করে থাকলেও, বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তার ভিতরটা ভারি ছটফট করছে। খোকার সঙ্গে তার খেলা অকালে ভেঙে যাওয়াতে সে ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এবং সেই-খেলা পুনরায় জোড়বার জন্তে তার আর তরু-সইছিল না।

আমি তার এই অধীরতা চেয়ে-চেয়ে লক্ষ্য করছিলুম।

টুকনি খুবই ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তার চেহারার মধ্যে ভারি-একটা মজা ছিল। তাকে দেখলে মনে হয়, যেন একটা একাণ্ড কাঁচা মাটির পুতুলকে খেবড়ে-খেবড়ে ছোট্ট করে ফেলা হয়েছে। মোটা-মোটা—যেন পাহাড়ের গা থেকে কুঁদে বার-করা হাত-পা ; খুব চাটালো বুক ; এবং মত্ত-একখানা মুখের উপর ছোট্ট-একটু নাক ও আধ-বোঝা চোখের টানের একটু ইসারামাত্র। দেহটি স্বাভাবিক ভরসা ; কিন্তু সেই-দেহের নানা অঙ্গ যেন নানা-বয়সের মানুষের দেহ থেকে নিরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দেহের কোনোখানটা তার বয়সকে ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে গেছে, কোনোখানটা পিছিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এত অসামঞ্জস্য থাকলেও মোটের উপর তার চেহারা যে খুব বিক্ৰী, কি খুব অদ্ভুত বলে চোখে ঠেকে তা নয়। ছেলে-বয়সের একটা অকুরন্ত ক্ষুধা বিদ্রোহের আভার মতো তার দেহের উপর এমন-একটা চিকণ ছড়িয়ে দিয়েছে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য একেবারে ঢেকে গেছে। এই ক্ষুধা যদি তার না থাকত, তাহলে তার চেহারা ভয়ানক ভীষণ হয়ে উঠত এবং খোকা আকৃষ্ট না হয়ে তার দিক থেকে ভয়ে পালিয়ে আসত।

খোকাকে আমি ছেড়ে দিলাম। টুকনি

বেন হাঁপ-ছেড়ে বাচল! লাকাত-লাফাতে ছুটে গিয়ে খোকার সঙ্গে আবার খেলা জুড়ে দিলে। আমি আমার কাজ কর্ষে মন দিলুম।

রাত্রিবেলা শোবার সময় ঘরে গিয়ে দেখি খোকার পাটিরার নীচে টুকুনি জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে। আমি ব্যস্ত হয়ে তাকে ঠেলে তুলে বলুম—“এই টুকুনি! তুই বাড়ি বাসনি যে?”

টুকুনি আমার দিকে চোখ-পাকিয়ে বলে—“হুম্ নেই যারেগা!”

—“নেই যারেগা কি রে?”

—“হাঁ, হুম্ নেই যারেগা!”

টুকুনি এমন সুরে “নেই যারেগা” বলে, বেন আমার বাড়িতে তার থাকা, না-থাকার উপর কথা-বলবার কর্তা যদি কেউ থাকে তো সে নিজেই! আমি আমার জীকে ডেকে বলুম—“এই জাখো, খোকা এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসল! কার ছেলেকে এনে ঘরে পুস্লে, এখন বার করা দায়!”

জী বলেন—“আঃ, থাকুক না বাপু আজকের রাতটা। কাল থাইয়ে-দাইয়ে বিদেয় করলেই চলবে।”

আমি মহা ব্যস্ত হয়ে বলুম—“তুমি বুঝচ না! এই এতটুকু ছেলে—ওর বাপ-মায়ের প্রাণে কি হচ্ছে বল দেখি!”

● জী বলেন—“তাহ’লে ওর বাপ-মাকে একটা খবর পাঠাও।”

আমি টুকুনিকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে দেখি, সে এরই মধ্যে শুয়ে-পড়ে দিবি ঘুম দিচ্ছে। তাকে আবার ঠেলে তুলে বলুম—“এই! তোর বাড়ি কোথায়?”

টুকুনি আমার চোখের দিকে ~~দেখ~~ সেই আধ-বোজা ঘুমন্ত চোখজুটো টেনে তুলে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল; তারপর একটা ঝটকা-মেয়ে বলে উঠল—“নেই বোলেগা!” বলেই সে ধপাস-করে শুয়ে পড়ল।

আমি ধমক দিয়ে বলুম—“তোকে বলতেই হবে।”

টুকুনি আমার দিকে পিছন-ফিরে শুয়ে অত্যন্ত একটা তাজিল্যের সঙ্গে বলে—“নেই বোলেগা!”

আমি তাকে আরো দু-চারবার ডাকাডাকি করলুম; সে সাড়াই দিলে না। শেষে নিরুপায় হয়ে চাকরদের কাছে খোজ করতে লাগলুম; কিন্তু কেউই কোনো খবর দিতে পারল না। গিন্নী বলেন—“তবে আর কি করা যাবে!”

আমি তখন হাল ছেড়ে দিলুম।

পরদিন সকালে চা খাচ্ছি, খোকা এসে বলে—“বাবা, টুকুনি আমার ডংকি ভাগিয়ে দিচ্ছে।”

আমি বলুম—“কেন?”

সে বলে—“জানি না। যতবারই উঠতে খাচ্ছি, সে আমার হাত-ধরে খালি বলতে—‘নেই’!”

আমি টুকুনিকে ডেকে বলুম—“এই! কি বলছিস?”

সে ঝড়টাকে গৌ-ভরে নীচু করে বলে—“হুম্ ডংকি হার!”

আমি তার হাউথানা ধরে বলুম—“তুই তো ভুটিয়ার বাচ্চা, তুই ডংকি হাবি কি করে?”

সে সজোরে হাত টেনে মিরে বলে—

“সেই ডংকি হায়র” — বলেই খোকাকে পিঠের উপর তুলে গট-গট-করে ঘর-থেকে বেরিয়ে গেল। তার রকম-সকম দেখে গিন্নীর ভয় হল। তিনি বলতে লাগলেন — “ছেলেটা যে-রকম কাঠ-গোয়ার, ভয় করে বাপু! ওরে নন্দ, দেখ্ দেখ্, খোকাকে নিয়ে কোথায় গেল!”

নন্দ-বেহারী তাদের পিছন পিছন ছুট দলে।

দশটার সময় খোকা বেড়িয়ে ফিরে এল। শুনলুম সমস্ত-কণ টুকুনি তাকে পিঠে-করে ঘুরেচে — একবারও নামতে দেখনি। তা-ছাড়া খোকার হাতে একটা গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে বলে দিয়েছিল খোকার বখন ডংকিকে ছুট-করাবার ইচ্ছে হবে সে যেন ঐ ডালের বাড়ি খুব-কসে মাঝে। টুকুনির গায়ের হু-জায়গা দেখলুম প্রহারের দাগে রাঙা হয়ে রয়েছে। আমি খোকাকে বলুম — “হি খোকা, এমনি-করে মারতে হয়!”

খোকা কাদো-কাদো হয়ে বলেন — “আমি তো মারতে চাইনি; টুকুনি যে ভয় দেখালে, না মারলে ডংকি খদের দিকে নেমে যাবে। আমি একটুখানি আস্তে মেরেছিলুম; ও বলে, আরো জোরে মারো, নইলে ডংকি তারি ছুট মিস করবে!”

গিন্নী আঁতকে-উঠে বলেন — “এই দেখ কী কাণ্ড! ছেলেটাকে খদে ঝুলেই যদি মিত! না বাপু, — তুমি ওকে বিদেয় কর। — এখনই বিদেয় কর।”

টুকুনি হাঁ-করে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল; কি বুঝলে তা জানিনা; কিন্তু গিন্নীর কথা শেষ হতেই সে চিম্নির তলা থেকে ধাঁ-

করে একখানা আধ-পোড়া কাঠের চালা তুলে নিয়ে গিন্নীর হাতের সামনে ধরে বলেন — “হম্ বদাম্ হায়র, হম্‌কো মার লাগাও।” — বলেই পিঠ-পেতে দাঁড়াল।

গিন্নী তার রকম দেখে হেসে উঠলেন। সে হাসি টুকুনির মনে ধরলনা, প্রহার না পাওয়ার্তে তার মুখখানা ভারি ক্ষুন্ন দেখাতে লাগল।

গিন্নী বলেন — “তারি মুন্সিল বাথালে দেখ্‌চি! ঐ বুনাটাকে তাড়াতেও মারা কসে, মাথতেও ভয় হয়।”

খাবার সময় টুকুনি আবার গোল-বাথিয়ে বসল। গিন্নী এসে বলেন — “দেখো এসে কি কাণ্ড!”

আমি গিয়ে দেখি খোকার খাবার টেবিলের নীচে টুকুনি চুপ-করে জুড়ি-মেরে বসে আছে। তার খাবার নিয়ে ডাকাডাকি হচ্ছে, সে কিছুতেই যাবেনা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম — “কি হয়েছে রে টুকুনি?”

সে বলে — “হম্ কুভা হায়রি!”

খোকা বলে — “বাবা, ও বলছে যে ও আমার কুকুর; আমি খেয়ে-খেয়ে টেবিল থেকে যা ফেলে দেব, ও তাই জুড়িয়ে-জুড়িয়ে খাবে।”

টুকুনি কিছুতেই সেখান-থেকে নড়ল না; গৌ-হয়ে বসে রইল। অগত্যা টেবিলের উপর-থেকে মাটিতে খাবার ফেলে তাকে কুকুরের মতনই খাওয়ানো হল। তাতে তার

দেখে কে!

খাওয়া শেষ হলে আমি তাকে ডেকে বলুম — “টুকুনি, তুই এইবার বাড়ি যা- তোয়



বাপ-মারের কাছে। তার হর ত তোর  
জন্মে কাঁদে।”

কাঁদচে।—এই কথাটাতে হঠাৎ টুকুনি  
বেন ধমকে গেল; কেমন-একরকম ক্যাল-  
ক্যাল-করে চাইতে লাগল—তার চোখের  
পাতাগুলো ক্রমে ভারি হয়ে এল। সে ছুটে  
গিয়ে জানলার উপর উঠে দূর-পাহাড়ের  
কোন-এক ঝাপসা কোণের দিকে একদৃষ্টিতে  
খানিকক্ষণ চেয়ে রইল; তারপর আন্তে-আন্তে  
আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি বলুম—“কি যে বাবি না?”

সে ধীরে-ধীরে ঝড়-নেড়ে বল্লেন—“না।”

আমি বিস্মিত হয়ে তার পিঠে হাত-রেখে  
সেহের স্বরে বল্লুম—“কেন বল্ দেখি?”

সে খানিকক্ষণ চুপ-করে রইল। মনের  
মধ্যে কি বেন হাত-ডাঙাতে লাগল। তারপর  
তার হাতখানা একটু-একটু-করে উঠতে-উঠতে  
বুকের মধ্যখানটিতে এসে থেমে-পড়তেই  
বুক-থেকে একটি কথা ঠেলে উঠল—  
“খোকাবাবু!”—আর-কিছু সে বলতে  
পারলেনা।

টুকুনির ধরণ-ধারণ সবই অদ্ভুত; সে  
বে কি বলতে চায়, ভালো করে বুঝতে  
পারলুম না। কিন্তু তবু তার সেই চোখের  
চাহনি, তার সেই-ধীরে-ধীরে বুকের মধ্য-  
খানটিতে হাত-দেওয়ার ভঙ্গী, তার ঐ  
একটি কথার উচ্চারণের সুর আমাকে  
কেমন অভিভূত করে কেন্নে। আমি  
অনেকক্ষণ কোনো কথা কইতে পারলুম না;  
—তাকে বিদায় দেবার ভাষা মুখে আনতে  
পারলুম না। সে বে চোখের আভাসে  
কাতর মিনতি আমিয়ে আমাকে বশ করলে

তা নয়,—তার ব্যবহারের মধ্যে একাধাও  
দয়-ভিক্ষার একটুখানি ইসারাও ছিলনা,  
মমতা-প্রার্থনা করবার মতো ভঙ্গীও দেখিনি;  
তবু আমি অভিভূত হয়ে পড়লুম।

আমি স্ত্রীকে ডেকে বল্লুম—“আমি ওকে  
বিদেয় করতে পারবনা; তুমি পার ত কর।”

গিন্নী বল্লেন—“তবে ও থাক। যখন খুশী  
হবে, যাবে।”

আমি যেন নিশ্বাস কেলে বাঁচলুম।

কিন্তু খানিক বাদে আবার গোল বাধল।  
গিন্নী অগ্নি-মূর্তি হয়ে এসে বল্লেন—“ঐ  
সর্বনেশে ছোঁড়াটাকে কিছুতেই বাড়িতে রাখা  
হবে না।”

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লুম—“ব্যাপার কি?”

গিন্নী বল্লেন—“আর একটু হলেই  
সর্বনাশ হত।”

আমি বল্লুম—“কেন? কি হয়েছে?”

গিন্নী বল্লেন—“ঐ টুকুনির কাণ্ড।  
খোকাকে পিঠে-করে সিঁড়ি-বেয়ে তুলতে গিয়ে  
ফেলে দিলে। তার কপালটা এই এতখানি  
ফুলে উঠেছে। যদি অজ্ঞান হয়ে যেত।”

আমি বল্লুম—“কৈ, দেখি খোকাকে।”

বলতে-বলতেই খোকা এসে হাজির হ’ল;  
সঙ্গে টুকুনি। দেখলুম তার মুখখানা শুকিয়ে  
গেছে; সে থেকে-থেকে খোকার কপালের  
ফুলোটীর দিকে কাতর-চোখে দেখছে।

আমি বল্লুম—“দেখ-দিকিন্ টুকুনি, কি  
করেছিল।”

বলতেই টুকুনির চোখ ছল-ছল-করে  
এল; সে খোকার কাছে ছুটে গিয়ে  
ভাড়াভাড়ি তার সেই কপালের ফুলোটীর  
উপর হাত-দিয়ে চেপে ধরতে গেল, বেন

তার ~~খোকার~~ চাপে ঐ ফুলোটা এখনই সমান করে দিতে পারলে সে বাঁচে! কিন্তু খোকা উঃ-করে উঠতেই সে হাত সরিয়ে নিলে। গিন্নী তাড়তাড়ি খোকাকে টুকুনির কাছ থেকে টেনে নিলেন। তারপর আমার মুখের ভাব দেখে বল্লেন—“না। টুকুনিকে কিছুতেই রাখা হবেনা।”

আমি চুপ করে রইলুম।

গিন্নী বল্লেন—“টুকুনি, তুই এ-বাড়ি থেকে বেরো।”

টুকুনি সিঁধে দাঁড়িয়ে রইল।

গিন্নী আবার বল্লেন—“বেরো বল্চি!”

টুকুনি ষাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে, হাতের একটা আঙুল ধরে সজোরে মোচ্‌ডাতে লাগল;—পা তার নড়লনা।

গিন্নী ডাক্লেন—“নন্দ!”

নন্দ-বেহারী এসে হাজির হ’ল। গিন্নী তাকে বল্লেন—“যেমন কোরে পারিস্ ঐ ছোঁড়াটাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আয়।”

নন্দ টুকুনির হাত ধরতে গেল। আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—“মুখ দেখছনা? টুকুনি অপ্রস্তুত হয়েছে। অমন-কাজ ও আর করবেনা;—এবার ওকে মাক কর।”

গিন্নী বল্লেন—“না, না! ও বাড়ি থাকলে আমার আর স্বস্তি থাকবেনা। খোকাকে নিয়ে দিনরাত কি করে বেড়াচ্ছে দেখচনা? খোকার উপর যে-রকম টান, যদি কুরি করে নিয়েই পালায়!”

আমি হেসে বল্লুম—“না, অঁটটা হবেনা।”

গিন্নী বল্লেন—“তা না-হলেও কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব? ও যদি আদর-করে খোকাকে বুকে চেপে ধরে, তা হলেও যে

খোকার হাড় ক-খানা শুঁড়িয়ে বাবে। সত্যি কথা বলতে কি, ওর সামনে খোকাকে ছেড়ে-রাখতে আমার আর সাহস হচ্ছেনা।”

আমি নিকপার হয়ে বল্লুম—“বিদেশ যদি করতে চাও, অমন মার-মুষ্টি হয়ে বিদেশ দিয়োনা! একটু আদর-করে বিদেশ দাও।—হাজার হোক ছেলেমানুষ!”

গিন্নী নরম হয়ে এলেন। আদর-করে টুকুনিকে ডাক্লেন—“আর, শোন, আমার কাছে আয়।”

টুকুনি এই আদরের আহ্বানে চোখ-তুলে একবার চাইলে, কিন্তু এগিয়ে গেলনা। তার চোখ দেখে বোঝা গেল ঐ ডাকে তার মন সাড়া তো দিলেইনা বরং কেমন সন্ধিগ্ন হয়ে উঠল। টুকুনি বতই ছেলেমানুষ হোক, আমাদের ভাষা তার বতই অজানা থাক, দেখলুম, আমাদের মনের ভাব বুঝতে তার আটকায় না। আশ্চর্য্য!

গিন্নী আরো ডাকাডাকি কর্লেন, তবু সে কাছে এলনা। এক-এক-সময় পিছনে লাঠি নুকিয়ে কুকুর কি বেড়ালিকে আদর-করে ডাকলে যেমন সে কিছুতেই কাছে আসেনা—এ ঠিক তেমনি! গিন্নী তখন উঠে গিয়ে তার হাত-ধরে কাছে এনে বসালেন। হাতে একটা টাকা শুঁজে দিয়ে বল্লেন—“মেঠাই কিনে খাস্, বুঝলি!”

টুকুনি টাকার দিকে দেখলেওনা; তাড়া-তাড়ি টাকাটা টেবিলের উপর কেলে দিয়ে, হাতখানা ঝেড়ে কেলে; তারপর ঘরের এক-কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

গিন্নী হতাশ হয়ে বল্লেন—“আদর তো করলুম, এখন যা-করবার, ভুঝি কর।”



আমি চুপ করে রইলুম দেখে গিন্নী নন্দকে ইসারা করলেন। নন্দটা যমদূতের মতো এসে টুকনিকে টানতে-টানতে ঘর-থেকে বার করে নিয়ে গেল। টুকনি কিছুতেই যাবেনা সেইটে জানাবার অন্তে সমস্ত শরীরটা নেতিয়ে দিয়ে মাটির উপর চিৎপাত হয়ে পড়ল। নন্দ তাকে কিছুতেই রেহাই দিলেনা—সজোরে হ্যাঁচ-ডা-হেঁচ-ডি করতে লাগল। আমি সেই দৃশ্য আর দেখতে পারলুম না; চোখ ফিরিয়ে নিলুম। তারপর হঠাৎ দেখি টানাটানির কোন্ ফাঁকে নন্দের হাত-ছাড়িয়ে ছুটে এসে টুকনি গিন্নীর পায়ের উপর ঝপাৎ-করে পড়ল;—ছ-চাত দিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে। গিন্নী বাস্তব হয়ে বসেন—“ছাড়, ছাড়!” কিছুতেই সে ছাড়েনা,—মাথা গুঁজে পড়ে রইল। ছ-ফোঁটা চোখের জল বোধ হয় তাঁর পায়ের উপরে পড়েছিল। কারণ, হঠাৎ দেখি গিন্নী টুকনিকে কোলের উপর তুলে নিয়েছেন,—টুকনি তাঁর বকের মধ্যে মুখ-লুকিয়ে ফোঁপাচ্ছে!

বলা বাহুল্য, টুকনিকে বিদেয় করা হ'ল না।

ছপুরবেলা খোকা যখন ঘুমতে গেল, টুকনি বাড়ির সব ঘরগুলোর ভিতর চুক, কোচের গায়ে হাত বুলিয়ে, চোকির উপরে বসে, ম্যাটিঙের উপর গড়াগড়ি খেয়ে, আয়নার সামনে মুখ-ভেংচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাকে সব-চেয়ে আশ্চর্য্য করেছিল ইলেকট্রিকের বাতি। সে একখানা টুল টেনে এনে তার উপরে দাঁড়িয়ে-উঠে হাত-বাড়িয়ে বাতির চাবি অনবরত খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল। বাতি যেমন দপ্ করে জলে ওঠে,

সঙ্গে-সঙ্গে তার স্ট্রেই আধ-বোঝা চোখছুটো বিষয়ে জল্জল্ করতে থাকে। সে এক-একবার টুল থেকে তড়াক্-করে লাফিয়ে ইলেকট্রিকের তারগুলোর পথ চোখ-দিয়ে অনুসরণ করতে-করতে যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেইখানে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল; তারপর ছুটে গিয়ে আবার সেই টুলের উপর দাঁড়াতে লাগল। আমি তার কাছেই বসেছিলুম; প্রতিমুহূর্তেই আশা করছিলাম সে হয় ত এখনই এসে তার এই বিষয়টা আমার কাছ থেকে ভাঙিয়ে নেবে। কিন্তু সে আমাকে কোনো প্রশ্নই করলেনা; আপনার বিষয়কে আপনি পরিপাক করতে লাগল। তার এই একঘেয়ে কৌতূহলের ছুটোছুটি দেখে-দেখে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়লুম; কিন্তু তার বিন্দুমাত্র অবসাদের লক্ষণ দেখা গেল না। তারপর, ঘুম-থেকে-উঠে খোকার গলার আওয়াজ যখন বার হ'ল তখন সে একবার কান-খাড়া করে শুনেই নিজের পেলা ছেড়ে ছুটে গেল।

সেদিন সমস্ত-ছপুর-বেলাটা মনের মধ্যে কেবলই একটা আশঙ্কার মতো হচ্ছিল যে এইবার টুকনির বাপ-মা ছেলের সন্ধানে এইখানে এসে পড়ল বলে! কিন্তু ছপুর থেকে বিকেল হ'ল, বিকেল সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু টুকনির বাপ-মায়ের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বিকেলে সে যখন খোকার সঙ্গে চৌরাস্তায় খেড়াতোঁ গেল, তখন ভাবলুম নিশ্চয় সে রাস্তার তার বাপ কিম্বা মায়ের হাতে গ্রেফতার হবে; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা দেখি সে দিবিা ফিরে এল। তাকে জিজ্ঞাসা

করলুম—কি রে, তোর মা-বাপের সঙ্গে দেখা হয়নি?”

সে বললে—“নেই!”—বলেই ছুটে পালিয়ে গেল; আর প্রশ্ন করবার অবসর দিলে না।

রাত্রে খানার পর আবার দেখি টুকুনি মহা কুস্তির সঙ্গে খোকাকে পিঠে-করে দোতলায় তুলছে। গিন্নী ধমক দিয়ে বলেন—“টুকুনি, আবার!”

গিন্নীর স্বরে বোঝা গেল খোকাকে পিঠে-করা একেবারে বারণ হয়ে গেছে।

টুকুনি গিন্নীর ধমকে খতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গিন্নী বলেন—“তুই ফের যদি খোকাকে পিঠে করবি তাহলে তোর গলা-টিপে বাড়ি-থেকে বার করে দেব।”

টুকুনি আস্তে-আস্তে খোকাকে নামিয়ে দিলে; খোকা ছড়দাড়-শব্দে উপরে উঠে গেল; টুকুনি সিঁড়ির রেলিং ধরে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়ি-বেয়ে ওঠবার যেন আর ক্ষুর্তি নেই,—শক্তিও নেই। খানিক পরে সে আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে এক-পা-এক-পা-করে উপরে উঠে গেল। তারপর চূপ-করে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে দেখি টুকুনির চেহারা একেবারে ফিরে গেছে। তার গায়ের রং যে অত ফর্সা আগে তা বৃকতে পারিনি। অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছি দেখে গিন্নী বলেন—“উঃ, ওর গায়ে এণ্ড ময়লাও ছিল! যত সাফ্ করি, তত ময়লা বেরায়। হুখানা আস্ত-সাবান ধরচ হয়ে গেল! খোকার সঙ্গে বেড়াবে, অত নোংরা থাকলে তো চলবে না, তাই আজ ওকে সাফ্ করে দিলুম।”

দেখলুম, ময়লা উঠে গিয়ে টুকুনির টোপো-টোপো গাল-ওটোয় রক্তের আভা ফেটে পড়ছে; মাথায় তেল পড়ে শুকনো চুলগুলো চকচকিয়ে উঠেছে; জুতো, জামা, টুপি পরে একেবারে ফিটকাট! গিন্নী তার দিকে চেয়ে বলেন—“এতক্ষণে মানুষের মতন হ'ল;—ছিল যেন একটা জানোয়ার কি ভূত!”

গিন্নী ঘটা-করে তাকে সাজিয়েছেন বটে, কিন্তু আমি দেখলুম সেই সজ্জার ভাবে আসল টুকুনি কোথায় তলিয়ে গেছে! তার সেই ফুলে-ফুলে-হুলে-হুলে-ওঠা ক্ষুর্তিটা আঁটসাঁট কোট-পেট্‌লেনে যেন ভুবড়ে চূপসে গেছে। তার মুখ দেখে মনে হ'ল যেন বেচারী নিতান্ত অসহায়! চলছে, ফিরছে—প্রতিপদে যেন বাধা ঠেকে-ঠেকে। এটভাবে সে খোকার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফিরে যখন এল, তার সে-মূর্তি আর নেই! জামা-কাপড়ের বাঁধন ছিঁড়ে তার সেই চঞ্চল ক্ষুর্তি তখন সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। আঠেপৃষ্ঠে ধূলা মাখা; জুতোর গোড়ালি উড়ে গেছে, পায়জামার একটা পা নেই, জামার বোতামগুলো কোথায় কে জানে, এবং পিঠের দিকটা সামনের মতোই খোলা হাঁ-হাঁ করছে!

এই অবস্থা দেখে গিন্নী তাকে খুব ধমকাতে লাগলেন। তার মুখ দেখে আমি বুঝলুম মার হজম করা তার পক্ষে পূব্ সহজ, কিন্তু এই ভিরস্কার সে সহ্যেতে পারে না। সে বকুনি খেয়ে খানিকক্ষণ তাঁর দিকে ক্যাল-ক্যাল করে চেয়ে রইল, তারপর একদোড়ে একেবারে খোকার খাটিরার নীচে গিয়ে স্বেথলো। গিন্নী হেসে বলেন-



“আচ্ছা-ছেলে বাপু, ওর সঙ্গে পার্শ্বার  
যো নেই।”

খানিক বাদে খোকা এসে বললে—“বাবা,  
টুকনি কোথায়?”

আমি বললাম—“চল, খুঁজে বার করি।”  
বলে খোকার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম।  
ঘরে ঢুকতেই খাটির নীচে থেকে কান্নার  
একটা কোঁস-কোঁস আওয়াজ কানে এল।  
নীচু হয়ে দেখি হাত-দিয়ে চোখ-ঢেকে,  
টুকনি উবুড়-হয়ে মাটিতে পড়ে কঁাদছে।  
খোকা ডাকলে—“টুকনি আর।”

টুকনি কোনো সাড়া দিলে না।

আমি বললাম—“টুকনি বেরিয়ে আর।”

তবুও কোনো সাড়া দিলে না।

শেষে গিন্নীকে ডাকলুম। টুকনিকে মাটিতে  
পড়ে কঁাদতে দেখে তাঁর যে মায়া  
করছিল সে তাঁর মুখ-চোখ দেখেই বোঝা  
গেল। তিনি ডাকলেন—“টুকনি।” আর-  
একবার ডাকলেন—“টুকনি।” শুধু ঐ  
ডাক! বাঁশরী হুরে সাপ যেমন-করে আসে,  
ঠিক তেমনি-করে টুকনি বেরিয়ে এল।  
একবার কাতর-চোখে গিন্নীর দিকে চাইলে,  
কিন্তু যেমন তাঁর উপরে চোখ পড়া অমনি  
তাঁর মুখের উপরকার কালো ছায়াটা কুয়াশার  
মতো মিলিয়ে গেল। সে লাকাত-লাকাত  
ঘর থেকে ছুট দিলে।.....

গিন্নীর শাসনে পড়ে টুকনি সিঁধে হয়ে  
আসছিল। হৃদয় পত্তকে যেমন-করে বশ  
করে, বোধ হয় তেমনি কোনো কোশলে গিন্নী  
তাকে বশ করছিলেন। কিন্তু আমি বুঝতে  
পারতুম না, কিসের দ্বারে টুকনি এই শাসনের  
বশতা স্বীকার করছে। বাবুও বাহুবের বশ

হয় আনি, কিন্তু কিসের অশ্রুতা আমি বুঝতে  
পারিনা!

টুকনির চঞ্চলতাটাকে মুক্ত রাখলে  
ভাবনার কারণ আছে জেনে গিন্নী তাঁর ঘাড়ে  
কাজের বোঝা চাপিয়েছিলেন। অবশ্য  
সেগুলো খোকারই খুঁটিনাটি কাজ। সে-গুলো  
সে করত; কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বোঝা যেত  
যে তা-থেকে সে যেন কোনো রস পাচ্ছে  
না। সকাল-বিকেল দুবেলা খোকা যখন  
তাঁর চোখের সামনে ডংকির পিঠে উঠত,  
সে এমন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত যে  
দেখে মায়ী হয়! মনে হ’ত সে ঐ ডংকিটাকে  
হিংসে করছে। সে তখন আমাদের দিকে  
বারবার চেয়ে দেখত,—যদি আমরা-কেউ  
তাকে একবার বলি, তা’হলে সে এখনি  
খোকাকে পিঠে করে ছুট-দিয়ে মনের আশটা  
মিটিয়ে নেয়।...

তিন-চার দিনের মধ্যেই টুকনির এমন  
বদল হয়ে গেল যে তাকে দেখলে মনে হ’ত  
না, এ সেই-টুকনি;—যেন একটি শাস্তিশিষ্ট  
ছেলে! কিন্তু এক-একবার দেখতুম হঠাৎ  
তাঁর এই শাস্ত্যাব তেলে হৃদয় বোড়ার  
একটা তড়বড়ানি ভিতর থেকে ঝাঁকি-মেরে  
উঠছে। সে তখন ছুটে-ছুটে খোকাকে পিঠে  
তুলতে যেত; কিন্তু গিয়েই হঠাৎ থেমে-পড়ে  
খোকার হাত-ছটোকে পিঠের দিক থেকে  
আন্তে-আন্তে গলায় জড়িয়ে-নিরে গৌ-হয়ে  
বসে পড়ত। তারপর খোকাকে ছেড়ে  
কোথায় ছুটে বেরিয়ে যেত!

নানারকম খেলনা নিয়ে খোকা তাকে  
প্রায়ই ডাকত; সে খোকার সঙ্গে খেলায়  
যোগ দিত বটে কিন্তু তাতে তেমন ফর্তি

বোধ হয় হত না। সে খেলতে-খেলতে হঠাৎ পুতুলগুলোকে বিরক্তির সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠত। খোকা ধমক দিলে আবার সেই ছড়ানো-পুতুলগুলোকে জড়ো করে যেন দায়ে পড়ে খেলতে বসত।

খেলায় তার মন ছিল না বটে কিন্তু খোকা যে-পুতুলগুলি তাকে বিলিয়ে দিয়েছিল সেগুলির প্রতি তার মায়া ছিল অসীম। সেগুলিকে সে দিন-রাত কাছে-কাছে রাখত। খোকা হুপুংবেলা ঘুমুলে সেগুলি বার করে ঝেড়ে-পুঁছে আবার তুলে রাখত—ছোট্ট বুক-পকেটটির ভিতর খুব ঠেসাঠেসি করে। এই পুতুলের গায়ে কারো হাত দেবার যো ছিল না। আমি একদিন আদর করে ঐ পুতুল নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম, সে অমনি বাঘের মতো খাবা তুলে ফোঁস করে উঠল। ভাড়িভাড়ি নুকিয়ে ফেলল।

গিন্নী টুকুনিকে দেখতেন আর বলতেন—  
“নিশ্চয় আর-জন্মে টুকুনি খোকার ভাই ছিল! বোধ হয় এ-জন্মে মনে-মনে চিন্তে পেরেছে, নইলে অজানা অচেনা ছেলের উপর ঐ ছেলেমানুষের এতটা প্রাণের টান কোথা থেকে এল?”

যে-জন্মেরই হোক, টুকুনি যে খোকার ভাই এই ধরনের একটা সংস্কার গিন্নীর মনে নিশ্চয় জন্মে গিয়েছিল; কারণ টুকুনিকে তিনি যে-চোখে দেখতেন, যে-রকম মেহ, যে-রকম আদর দিতেন, তাতে<sup>১</sup>কিছুতেই মনে হত না যে টুকুনি পরের বাড়ির ছেলে!

টুকুনি কি-চোখে আমাদের দেখতো তা টুকুনিই জানে! কিন্তু আমাদের বাড়িতে

সে যে দিন-দিন মুসড়ে পড়ছিল, আর-কেউ লক্ষ্য না করলেও, আমি তা স্পষ্ট দেখতে পেতুম; মনে হত তার বা খোরাক, তা যেন এ-গৃহস্থের বাড়িতে দিন-দিন বাড়ন্ত হয়ে আসছে। এই বাড়ির আবহাওয়া প্রথম-দিন তাকে যে কোতুলক দিয়ে আকর্ষণ করেছিল, আজ তা কোথায়? ইলেকট্রিকের বাতি এখন রোজই জলে, কিন্তু তার সেই আধ-বোঝা চোখ আর তেমন করে জলে ওঠে কৈ? মেজের ম্যাটিং তেমনই পড়ে আছে, তাতে সে কখনো শোর, কখনো বসে-মাত্র, কিন্তু তেমন-করে লুটো-পুটি দিয়ে গড়াগড়ি খাবার কুখা যেন আর নেই। কোচগুলোর সঙ্গে এখন যা সম্পর্ক, সে কেবল ঝাড়-পোছের মতো;—তেমন-করে সস্তর্পণে তার স্পর্শটি চুরি-করবার প্রলোভন আজ কোথায় উবে গেছে! কোথাও যেন আর তেমন আকর্ষণ নেই; কেবল দেখতুম আমার আয়নার টেবিলের উপরে ফ্রেমে-বাঁধা খোকার যে-ছবিখানি ছিল, তার দিক থেকে তার চোখ অন্য দিকে করে না। তার পানে সে অনবরত চেয়ে-চেয়ে দেখত — একটা হৃদমনীয় লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে-দিয়ে!

আমি তাকে বলতুম—“নিবি?”

সে সমস্ত দেহস্থ-বাড়খানা নেড়ে বলত —“হঁ!”

আমি যেই বলতুম—“আচ্ছা, দেব এখন!”  
অমনি সে আমার গায়ের কাছে এসে কুকুরের মতো গা-ঘস্তে থাকত। টুকুনি আর-কোথাও আমার গ্রাস করতনা, কেবল এই ছবির প্রলোভনে একটুখানি আকর্ষণ আমার অন্তে রেখেছিল। সেই অন্ত এই ছবিখানি



আমি হাতে-রেখেছিলুম; তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে ফেলতে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল না।...

টুক্নির বাপ-মায়ের কথা আমরা এক-রকম ভুলেই বসেছিলুম।—সে আমাদের কাছে এমন সহজ হয়ে এসেছিল যে সে যে আমাদের বাড়ির ছেলে নয় এ-কথা মনেই হ'ত না। কিন্তু আমরা ভুলেও, টুক্নির বাপ-মায়ের কোনো ভুল হ'ল না। একদিন বিকেল-বেলা বেড়াতে বাচ্ছি, এমন-সময় সেই বাপ-মা একসঙ্গে এসে হাজির হ'ল। তাদের মুখে শুনলুম বাড়ি-থেকে পালানো টুক্নির স্বভাব। প্রায়ই সে বাড়ি-ছেড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। এবার যে জঙ্গল ছেড়ে মাছবের বাড়িতে চুকেছে, বাপ-মা তা কেনন করে টের পাবে? কাজেই এই এক-হণ্টা তারা জঙ্গলে-জঙ্গলে খুঁজে-খুঁজে হররান হচ্ছিল। শেষে এই হাটের হিন সহস্রে এসে ধোঁজ পেয়েছে।

টুক্নির বাপ গভীর স্বরে বলে—“টুক্নি ঘর চল।”

আমি আশী করছিলাম টুক্নি সেই প্রথম-দিনের মতো এখনই বলে বসবে—“নেই যাবে গা!” কিন্তু দেখি টুক্নি স্লুড-স্লুড করে বাপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মুখে তার আর কথা নেই। কেবল তার চোখ-

থেকে মায়ার টাঙবর একটি ~~হাট~~ ছালানি সন্ধ্যার স্নান আকাশকে ভার-করে তুলতে লাগল। আমাদের কারো মুখে কোনো কথা বেরুল না। গিন্নীর চোখের পাণ্ডা ভেরে এল; খোকার মুখ কঁাদো-কঁাদো; বাড়ির চাকর-বাকর সবাই পুতুলের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

টুক্নির বাপ বলে—“সেলাম হজুর!” বলেই টুক্নির হাত-ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। যতক্ষণ দেখা যায়, তার দিকে আমরা চেয়ে রইলাম। দেখতে-দেখতে দূর-আকাশের পাখীর মতো সে মিলিয়ে গেল। গিন্নী আর বেড়াতে গেলেন না; সাক্ষসজা ছেড়ে ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার আবছায়ায় চূপ-করে বসলেন; খোকা কোথায় লুকিয়ে পড়ল দেখতে পেলুম না। সবাই একে-একে নীরবে সরে গেল; আমি কেবল একা সেই সন্ধ্যার আলোয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বাপ-মা-চোখে দেখতে লাগলুম—কাকুনজত্বার বৃকের মাঝের খেতপদ্মটি বিদীর্ণ হয়ে রক্তের ধারা ঝরে-ঝরে পড়ছে!

হঠাৎ মনে হ'ল সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝড়ের মতো কে ছুটে এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি খোকার সেই ছবিখানি নেই।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

## নাদিরশাহের শেষ

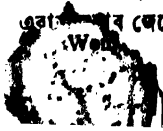
[ হান—প্রান্তর-বধ্যস্থ শিবির। কাল—হুতা-রাত্রি, নিশীথ। ]

তুমি চলে' বাও এখনি এ রাতে উজ্জ্বল-সদ্য !  
আমি একা রব'—কোনো ভয় নেই, দেবী আছে মরিবার ।  
কে মারে আমারে !—এখনো ছেঁড়েনি আকাশের গ্রহভারা,  
অমিন্ ফাটিয়া নীলশিখা কই ? প্রলয়ের বারিধারা ?  
অতলের তলে এখনো নামেনি 'আলবোরজের' চূড়া,  
সুলেখমান আর হিন্দুকুশের পাজর হয়নি গুঁড়া !  
আমি না শাহান্-শাহা !  
কার ভয়ে বাজ আকাশে ফিরিবে এখনি ?—বাহারে বাহা !

চলে' বাও কিরে ইমাম জাকর ! ডেকে দিও চুরাশিরে,  
কাল প্রাতে যেন আফগান-সেনা দাঁড়ায় শহর ঘিরে' ।  
কাল, কোহিনূর-তাজ শিরে আর তখত-ভাউসে চাঁড়',  
আর একবার খুন-খুসরোজ্ খেলিব পরাগ ভরি' !  
দিল্লীর শাও রেখেছিল পা'র উজ্জীষ তরবার,  
তাই নিয়ে যাও, পরে' যেন কাল আবদালি-সদ্য ।  
আলির বংশধর !  
মনে থাকে যেন ইমাম হুসেন, কারবালা-প্রান্তর ।

সেখ শিরা হুকু দরবেশ যত বাঁচে না যেনই কেহ,—  
কাটিয়া পাড়িবে সবার যুগ, খণ্ড করিবে দেহ ;  
ওমরাহদের শঙ্ক-বাহারে পাকাও পলিতা-ধূপ,—  
ভাল্লা-মগজের চর্কি-চেরাগে রোস্‌নাই হবে খুব !  
জাকর ! তৈমার কাকের গুলাকে রাখিব না কাল প্রাতে,  
'রোজ্-কেয়ামত' দেখো দাঁড়াইয়া জুআ-বাড়ীর ছাতে ।  
—কোনো কথা নয় আর !

বাও, চলে' বাও ! এরা সব যেনো এই হাতিয়ার ।





আঃ বাঁচা গেল ! তবু মনে হয় কে যেন রহিল পাছ !  
 না না, কেহ নয়,—আমারি ও ছায়া পর্দার পড়িয়াছে ।  
 একি হ'ল একি ! বড় ভাবব !—ছায়া নয়, ও যে ছবি ।  
 একবার সেই দেখেছিহু ওরে, ভুলে গিয়েছিহু সবি ;—  
 দিল্লি-শহরে দুইপহরের মহামারী-চীৎকার,  
 একা বসেছিহু, মসজিদ সেই কখনোজোয়ার,—  
 হঠাৎ ঘেরালে ছায়া,  
 ঠিক 'এইমত ঘুরে' গেল মাথা, হঠে' গেল চোপায়া !

দূর দূর ! আরে দেখ দেখ—যেন পাহাড়ী সাপের চোখ !  
 অবশ করিয়া বেছ'স করিল, হরিল সকল রোখ ;  
 ওর পানে চেয়ে সেদিনের মত আজো জাগে 'আক্শোষ',  
 মনে পড়ে যায় বালক-কালের দিনগুলি নির্দোষ ।  
 দেখ, সন্নতান মিলাইয়া যায় স্মরণে সে কথা 'আনি',  
 চোখ দিয়ে বুকে বিব ঢেলে' দিয়ে, মাথায় সুগুণ হানি',  
 —এ কি হল, হায় হায় !  
 এ বুড়া বরসে সে দিনের মত আবার দাঁড়ান' যায় !

মাথা হ'তে যেন সকল রক্ত শুবে' নের নাভি-শিরা !  
 কি যেন বাঁধন বেঁধেছিল বুকে, খুলে যায় তার পিরা !  
 'হাশিশ' খাওয়ারে, অজ্ঞান করে' রেখেছিল এতদিন—  
 'জমজম'-জলে ধুয়ে দিল মাথা দিল্লীর কোন্ তিন !  
 রক্তের নেশা একেবারে যেন ছুটে' যায় লহমায়,  
 পরীর আঙুলে পরাইল চোখে তাখুলি স্মার ।  
 —ডুবে' বাই, গলে' বাই !  
 তাজ সন্শের কেলে দিহু এই, কিছুতেকৈ কাজ নাই ।

নাহির ! এখনি ভুলে গেলে, তুমি ছনিয়ার ছব'ম্ন !—  
 বাতিল করেছ কারকোবাদের ধর্ম-সিংহাসন ;  
 কোটা শবদেহে দেয়াল তুলিয়া আলার আসমান  
 আধারিয়া তুমি দিনের রাতি দিহাছ মান ;

পাথরে আছাড়ি' মারিয়াছ শিক্ত, জননীর কোল ছিঁড়ে',  
ক্রোশ হ'তে ক্রোশ আগুন দিবেছ মাহুঘের স্বখ-নৌড়ে;  
আপন ছেলের চোখ,  
নখে করি' ছিঁড়ি' উপাড়ি' ফেলেছ, কিছু কর নাই শোক !

সে নহে নাদির, মাহুঘ নহে সে,—খোদারি সে কারসাজি—  
সমতান, সেও পারে কি এমন দেখাবারে ভোজবাজি ?  
হির হও মন, ভেবে দেখি আজ কে করেছে সেই খেলা—  
আমি ত' মাহুঘ সবারি মতন, কাদা ও মাটির ঢেলা !  
বুকে মারো ছুরি, গলগল করে' বাহিরিবে রাঙা-জল,  
এই দেখ চোখে এখনি অশ্রু করিতেছে টলটল,  
—এত কুদ্রৎ তার !  
আল্লা তালা আকুবর ! এয়ে মতলব বোকা' তার !

বাকদের মত কালোমেঘে বাজ তোপ দাগে, দেখ নাই ?  
আগুন ছুটিয়া পাহাড়ের মুখে কত দেশ হ'ল ছাই !  
সাগরের জল-স্তম্ভনে আর ভূমিকম্পনে যঁার  
হুকুম তামিল করে দেবদূত পৃথিবীতে বার বার,  
ইসরায়েল তাঁরি জেগেছিল দূর ইরানের সীমানার  
যুবা আফসারী—নাদির, এ নাম দিবেছিল বাপ মা'র ;  
মেঘ-পালকের আজি,  
হুনিয়ার সেরা হুম্মন্ নাম,—এ কাচার কারুসাজি ?

সেই কথা মোর ছিল নাক' মনে, থাকে না বোধ হয় কা'রো,  
ভুলেছিহু আমি মাহুঘ যে শুধু—ভেবেছিহু, বড় আরো !  
লক্ষপরাণ হানিয়ার কালে ভুলেছিহু এক প্রাণ—  
সে যে সেই-মত করে ধুক্ ধুক্, তেমনি দয়ার দান !  
তাঁরিসাথে আজ মুখোমুখী করে' দিবে গেল মাঝরাতে,  
দেখিতেছি তাঁ'র আগাগোড়া ছুরি মারিয়াছি এই হাতে—  
বিস্মিতা রহমান !

নাদির তোমার বাক্যে হোক বেইমান ।



নাহির ! নাহির !—সাত্তা নাহি দেয়, একেবারে তুলিয়াছে !  
 আরে সরতান ! সরতানী তোর বেইমানী ধরিয়াছে !  
 সেই বাহু এই লোহার সমান, ওই সেই করবাল,  
 তুর্কি-শোণিত-মেহেদির রঙে নথ যে এখনো লাল !  
 বোখারা-বিজয়-উৎসব-দিনে নয়-শির-পর্কত  
 করে নাই খুসী, ক্রৌণ মনে হ'ল দরবার-নহবত,—  
 আজ তার হ'ল ভয় !

নাহির ! নাহির ! এতদিনে তোর এই হ'ল পরিচয় !

মরিয়াছি আমি, চলে' গেছি আজ সেট পাশাড়র ধারে—  
 প্রেত হয়ে আজ সন্ধান করি, জীবনে তুলেছি যা'রে ;  
 জ্যোৎস্নার মত প্রভাত-রোদ্দ্র মিশে আছে ক্রয়াসার,  
 ঝিক্ ঝিক্ করে' বহিছে নদীটি গিরিদের পা'র-পা'র,  
 দেবদারু-শাখে জড়িয়েছে লতা সোণালিঝুমুকাতরা,  
 আখ'রোট-সারি ঝুরিছে শিশিরে, আশেল পাকিবে স্বরা—  
 এই সেই গ্রামপথ,  
 এর ধূলা ছেড়ে চেরেছিহু আমি বাহালাহী মসনদ !

নওরোজ-বেলা হ'ল অবসান, আকাশে স্ততালী চাঁদ ;  
 তরুণী ইরাণী সারাদিন কত পাতিরাছে ফুল-ফাঁদ !  
 কস্তুরী-কালো পশ'মিনা চুলে বিনায়ে চামেলি-মালা  
 আজ গোলাপের অপমান কেন ? গজল্ গাহনি বালা ?  
 আজুরের রস কোথা পেরালার ?—

তহমিনা ! তহমিনা !

চাও, কথা কও ! কোথা স্থখ নাই নাহিরের তোমা বিনা !

আজ নওরোজ-রাত্রে,

আশেক এসেছে বৌতুক দিতে দিল্ ত্বর ওই হাতে ।

কবেকার কথা ! আমি তুলেছিহু, তহ'মিনা তুলিল না !

স্বপনেও তার চোখছটি মোর মুখ 'পরে তুলিল না !

তুবার-রশ্মি অশেল ছুটি তুলিয়া তুবার মত  
 নয়নে বিধিল বড় দুখ, এই কত ।

লুট্টিহু পা'র, বলিহু বাঁচাও, — সঞ্জীবনী সে পাতা  
 জেনেছিল তার মায়ের নিকটে, আর কেহ জানে না তা !  
 তহ্মিনা চলে' যায়,  
 দূরে, দূরে—শেষে মিশে গেল ওই আকাশের তারকার ।

চাঁদ ডুবে গেল, নিবে' যায় ওই 'পার্বিন' 'মস্তারা'—  
 একি থম্ থম্ করে আস্মান্ নীল-হিম্মাত পারা !  
 মাঝখানে তার আগুনের চাকা ঘুরে' ঘুরে' উঠে নামে,  
 জ্বলন্ত-বালু পার হ'য়ে আসে সুদীরা তাঙ্গামে ।  
 ঘুনি ঘুরিছে দক্ষিণে বামে রক্তের দরিয়ায়,  
 দব্ দব্ করে বাতাস, যেন সে মার খেয়ে মূরছায় !  
 ঢাল যেন তরবারে—  
 সারা মরদান বন্ বন্ করে, ফেটে যায় হাহাকারে !

কি ঘোর পিপাসা ! জিহ্বা তালু যেন ফুলে' যায় সবাকার !  
 কালো হয়ে গেল ওষ্ঠ-অধর, জল নাই তিজাবার ।  
 দূরে দেখা যায় বরুণা বরিছে, কাঁছে গেলে আর নাই !  
 এ কি দিল্লগী আত্মা গাফুর ! মাক চাই, মাক চাই ! --  
 আঃ বাঁচা গেল ! বোঝার ছুটেছে,—কি যেন আওরাক হয় ?  
 বাহিরে বুঝিবা পাহারা-বদল ? নাঃ, ও কিছুই নয় ।  
 খোদা বে মেহেরবান্ !  
 স্বপনে এখনি দেখাইল তাই 'হাশের'র মরদান ।

কে পশিল ওই চোরের মতন ? কারা আসে পাছে পাছে ?  
 ছুরাণীর লোক,—হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি, এস তাই এস কাঁছে ।  
 ফিরিচ্-খোলাবে ! আরে বেভমিজ্ বজ্বেল্ কাপুরুষ !  
 নাদির দাঁড়ারে সমুখে ভোদের, এখনো হয়নি হুঁস্ !  
 হা হাঁ, হঠে' যায় !—মারিবে, তবুও 'সর শুনে' হঠে' যায় !  
 আর চলে' আর, ধব্ গদান, কাজ নাই তাবাসার ।

আকসারী সর্দার !

তুমিও এসেছ !—



হিবে এইবার ?

ভয় নাই, এস ; নাদির মরেছে,—নহিলে এখনো তুমি  
দাঁড়ারে রয়েছ মাথা না নোমারে, জাহ্নু পাতি' মাটি চুমি' ।  
ফেলিয়া দিয়াছি তাজ দেখ ওই, কাছে নাই হাতিয়ার,—  
তোমাঘেরো আগে পেরেছি সমন মৃত্যু-ক্ষেত্রেত্তার ।  
এসেছিস বড় ওকত বুঝিয়া, তা না হ'লে কুকুর !  
আর কিছু আগে বুঝিতাম তোরা কত বড় বাহাদুর ।

নসীবের কেরামত !—

এতদিনে বুঝি শেষ হয়ে এল জাহান্নামের পথ !

তক্তার রেখে ধরু তরবার ! আহমদ আব্দালী  
এখনি আসিবে, শিরশুলা কাটি' কুন্তারে দিবে ডালি' ।  
পিঠে কেন ? আহা, ঘাড়ে মারে কের ! স্থির হ'য়ে মার বুক—  
বড় সে কঠিন !—খুব করে' ছুরি বসা'ও, মরিব স্নেহে ।  
আহা! আল্লা ! বহুৎ মেরেছি, মরিতেও জানি তবে !  
বিচারের কালে এ-কথা ধরিয়া, গুণা কিছু মাক হ'বে ?

শেষ হয়ে গেল—বাণ !—

ইরানের ধ্বজা, ইরানের-মানি, বিধাতার অভিষাপ !

ঐমোহিতলাল মজুমদার ।

## আধুনিক ভারতের শ্রমশিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা

( ফরাসী হইতে )

ভারতের শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও দিল্লীতে কাগজ বা হস্তিদন্তের উপর  
ক্রমোন্নতি কিরূপে হইল তাহা ঠিক বুঝিবার সুজ্ঞাকারের চিত্ত; লক্ষ্যে পোড়া মাটির  
পক্ষে কতকটা সাহায্য হইবে বলিয়াই আমরা ছোট ছোট মূর্তি, সাকৌতিক যন্ত্রাদি, খোদাই-  
ইতিপূর্বে ভারতীয় নগরের বর্ণনা করিয়াছি । কাজ করা কাঠের জিনিস, রত্নালঙ্কার,

শ্রমশিল্প

সোণার রূপান্তর ও তাঁবার দ্রব্য, মিনার কাজ,

প্রাচীন ভারতের শ্রমশিল্প প্রধানত কলা-স্বর্ণরেখাঙ্কিত ফুলকাটা ইম্পাৎ, লাক্সা, কাঠ  
শিল্প বা বিলাস-শিল্প ছিল ; অরপুর, লাক্সা, ফুলিয়া, কল্লের উপর খোদাই-চিত্র ( আগ্রা ),

মুগ্ধ পানজি, কাচের জব্বাতি, পেটা চামড়ার জিনিস, জরির কাপড়, গালিচা, কাশ্মিরী কাপড়, মসলিন, রেশম ও তুলার কাপড়।

প্রাচীন অভিজাতবর্গের নৈশ্রম্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরেজের প্রতিযোগিতা-নিবন্ধন এই সমস্ত শিল্প-ব্যবসায়ের অবনতি ঘটানোয়। বিলাতি জিনিসের নকল করায় ভারতীয় শিল্প-সামগ্রীর রক্ষণীয়তা ও মৌলিকতাও নষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে যুরোপের নিকট হইতে ভারত সুদ্রাক্ষণবিত্তা, এন্থ্রোক্সিট, ও কোটোগ্রাফিক শিখিয়াছে (১)



ভারতে, যুরোপে-প্রচলিত বড় বড় শ্রমশিল্প খুব কমই সংস্থাপিত হইয়াছে। রেলও-কোম্পানীরা তাহাদের উপকরণ-সামগ্রী নির্মাণ করে। পশ্মী কাপড়, মাটির বাসন, চর্মশোধন, মদ-চুরানো, কাগজ-ভেঁজারি এই সমস্তের কারখানা আছে; কিন্তু উহাদের সংখ্যা খুবই কম। (২)

১৮৯৯-১৯০০ অব্দে, ১৮৬ তুলার কারখানা, মূলধন ১৫৬,৯৭৪,০০০ টাকা; টাকু—৪,৭২৮,৩২৪; মজুর :—১৬৩,২৪১ ;—

১৯০০-১৯০১ অব্দে মূলধন—১৬৫,৩০৫,০০০ টাকা; টাকু—৪,১৩২; ৩০২। জুট ও শনের ৩৩টা কারখানা; ১৮৯২-১৯০০ অব্দে মূলধন—৫১,২০০,০০০; টাকু ২৯৩,২১৮; মজুর—১০১,৬৩০; ১৯০০ অব্দে, মূলধন—৫৪,০৫০,০০০; টাকু ৩১৫,২৬৪।

১৮৯২ অব্দে ২৬টা যুরোপীয়নিগের, ১৮টা পাশ্চাত্যনিগের, ৬৪টা হিন্দুনিগের, ৭টা মুসলমাননিগের ও ৩টা উচ্ছাদীনিগের তুলার কারখানা। বেতনের হার এখনও নিম্ন।

মোটের উপর বলা বাইতে পারে যে ভারতবাসীরা বৃহৎ-শ্রমশিল্পের চেষ্টা সবে-মাত্র আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের চেষ্টার পথে অসংখ্য বাধা আছে। কতকগুলি বাধা উপকরণ-সম্বন্ধীয় :—যথা লৌহখনি ও করলার অভাব। কতকগুলি বাধা সামাজিক ধরণের, যথা—বর্ণভেদপ্রথা ও পারিবারিক সাধারণ স্বত্বাধিকার-প্রথা। আর কতকগুলি বাধা মানসিক ও ধর্মনৈতিক : সকলের মধ্যেই মনোযোগের অভাব, ব্যবসায়িক শিক্ষা-সম্বন্ধে আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব; অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত লোকের মধ্যে লিখন-পঠন-সাপেক্ষ কাজেই ( liberal ) বেশী অভিরুচি (৩)।

(১) আধুনিক ভারতের শিল্পকলা আরি আলোচনা করিব না। উহার কোন আকর্ষণ নাই। ইংরেজ বস্ত্র-শিল্পীরা, ইংরেজী ধরণেরই হটক, আধা-বিলাতী আধা-প্রাচ্য ধরণেরই হটক, বড় বড় সূতিসম্মির নির্মাণ করিয়াছে। প্রস্তর-মূর্তিগঠনের অস্তিত্বই আর নাই। আর যদি ছবির কথা বল, পারসীকনিগের অনুকরণে শুধু সুদ্রাক্ষণ ধরণের চিত্র আছে।

(২) এই সব শ্রমশিল্পের অধিকাংশই আনুসঙ্গিক সাধ-সজ্জার শ্রমশিল্প। তাই, রেলওয়েতে যে-সব যন্ত্রপাতি লাগে সে সমস্তই যুরোপ হইতে আনিব হয়,—পেরেক, ইট, ছোট ছোট ঢাকা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি—

(৩) ভারতীয় শ্রমজীবীর শারীরিক দুর্বলতার কারণ করা আবশ্যিক; এই দুর্বলতার কারণ—পুষ্তিকর আহারের অভাব ও বাণ্যবিবাহ।



## বাণিজ্যব্যবসায়

কোম্পানীর আমলের আরম্ভভাগে রপ্তানি  
১০ লক্ষ পোণ্ড ছাড়াইয়া যায় নাই।

১৮২৪-১২-এর পূর্বে ভারতের বহি-  
বাণিজ্য—গড়ে ৭৩,১৫২,৫৩৪ টাকার রপ্তানি  
মাত্র ছিল।

কোম্পানীর আমলের শেষাংশে—১৫৮,  
৫১২,৩২৬ ও ২০০, ১৭১, ২৫০।

১৮৭০-৭১ অব্দে—৩২২, ১৩২, ৪১৮ ও  
৫৭৫, ৫৬২, ৫০৬।

১৮৯৮-৯৯ অব্দে—৮২২, ২৭১, ৪০০৬ ও  
১, ২০২, ১১১, ৪৪৫।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (১৮৭০)। (১২ মাস  
কাল) গড়ে সাহায্য পায়—

পূর্ভকর্মে ৫৫৭,০০০ লোক নিযুক্ত হয়, ১৩,  
৭৫০ জনকে আশ্রমে আশ্রয় দেয়া হয়।  
মৃত্যুর বৃদ্ধি ১,২৫০,০০০।

মাত্রাজ (১৮৮৪)।

মাত্রাজ, বঙ্গ, ব্রহ্মদেশ, আজমীর  
(১৮৯২)।

ভারতের উত্তরাঞ্চল, বাঙ্গলা, ব্রহ্মদেশ,  
মাত্রাজ, বোম্বাইতে (১৮৯৭) সরকারী  
বিবরণ অনুসারে ১৮৭৯ জুন মাসের দ্বিতীয়  
সপ্তাহে ৪, ২৪০,০০০ লোক সরকার হইতে  
সাহায্য পায়। মৃত্যুর বিবরণ-তালিকায়  
দেখা যায়—১৮৯৭ অব্দে ৭, ৬৫৮, ৬৪২ এবং  
১৮৯৮ অব্দে ৫, ৬৯, ৫৫২ জনের মৃত্যু  
হয়। বিভিন্ন কারণে—১, ৪৪৬, ১৪১;

পর বৎসরে ঐ জারগার ১, ৩৩৩, ২২৭  
লোক মরে : আমাশা ও উদরাময় ২০২,০৩৫-  
এর জারগার ৩২৬, ৭০৪। জ্বর : ৩, ৮১৭  
৪৫৬ এর জারগার ৪,৯৮২,৯১১। ওলাউঠা :  
১৫০,৮১৭ এর জারগার ৫৫০,৭৪৭। বসন্ত  
রোগ ৫৫, ৭১৩-এর জারগার ১৬০, ২১৭  
মৃত্যুর এই বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের উপর আরোপ  
করিতে হইবে।

গজাব, রাজপুতানা, মধ্য-প্রদেশ, বোম্বাই  
(১৯০০-১৯০১) ১৯০০-র আগষ্ট মাসে প্রথম  
সপ্তাহে সাহায্য পায়—৬, ৫৫৬,০০০ ( বাহার  
মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ দেশীয় রাজার রাজ্যের  
লোক )। মৃত্যু-সংখ্যা—৮, ৩৩৪, ১৫৫।

এখন দেখা যাক পুনঃ পুনঃ সম্বাদিত এই  
সকল দুর্ভিক্ষের কারণ কি ? অবশ্য ভারতের  
কৃষিকার্য্য, মোসুমের বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর  
করে। উত্তরাঞ্চলে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে  
তিন মাস বর্ষা। জুন মাসের মাঝামাঝি ও  
সেপ্টেম্বরের শেষ। যথেষ্ট বৃষ্টি না হইলে,  
আদৌ কসল হয় না, কেন না, বৎসরের  
অবশিষ্ট অংশে আর বৃষ্টি হয় না। যেখানে  
সরকার হইতে খাল বাঁধ প্রভৃতি পূর্ভকর্ম্মের  
অহুষ্ঠান হইয়াছে কেবল সেই সকল  
প্রদেশেরই রাজস্ব সুনিশ্চিত ; পক্ষান্তরে  
ভারতের যে-সব প্রদেশে বাঁধ নাই, খাল  
নাই, জলের চোবাচ্চা নাই, সেই সকল  
প্রদেশের অবস্থিতি অনিশ্চিত।

তথাপি দুর্ভিক্ষ বলিলে সচরাচর বাহা

চরিত্রের সহিত খাপ খায় না এইরূপ কতকগুলি অশ্লিষ্ট উপবোধী জনের পরিচয় দিয়াছে; বঙ্গ ও  
আসামের বাস্পগোতে যেসব লোকেরাই কাপড়-চোপড়ের কাজ করে; যেখানে যন্ত্রপাতি খুব  
জটিল যন্ত্রের সহায়তায় কল-কারখানাতেও সমস্ত কাজ হেঁচ-মিচাই ভারতবাসী লোক।



বুঝায় ভারতের হুর্ভিক্ষ সেরূপ নহে।  
সুদূরবর্তী জিলাভেও রেল যোগে খাদ্য আনা  
যাইতে পারে এবং ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য  
এত বেশী, ভারতবাসীর অভাব এত অল্প,  
ও বহির্দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য এত  
সচল ও সচেষ্ট যে ভারতের কোন প্রদেশেই  
বৈশ্বদিন খাদ্যের অভাব থাকিতে পারে না।  
ভাটার প্রমাণ,—১৮৯৬-১৭০৭ ও ১৮৯৭-৯৮  
—কঠোর হুর্ভিক্ষের এই কয়েক বৎসর  
ক্রমাগত ২৭, ৮২৭, ২৬২ ও ২৬, ৩৫৯, ৯৮৮  
(hundred weight) চাউল; ১, ৯১০, ৬২৬  
ও ২, ৩৯২ ৬০৭, গম; ২, ৬৯৬, ২১৭ ও ২,  
২৩২, ৬৯৪ (hundred weight), অন্যান্য  
শস্য রপ্তানি হয়। ১৮৯৯-১৯০০-হুর্ভিক্ষের  
এই বৎসরে,—৩১, ৮৬৯, ৫৯১, ৯, ৭০৪,  
০৯৭ ও ৩, ০৭৬, ৪০৯ (hundred weight)  
রপ্তানি হয়। ১৮৯৮-৯৯ এই অল্পকাল  
বৎসরে :—৩৭, ৩৯৭, ৪০৭,—১৯২২-২৩, ৪৯৬  
ও ৪, ৫১৩, ২০৮ রপ্তানি হয়। ঐ সকল  
বৎসরে শস্যের আমদানিও ছিল (১৮৯৭-  
৯৮) ১, ০৭২, ৪১৫ (hundred weight)  
মাত্র, (১৮৯৯-১৯০০)—, ৫০২, ৫৭৫;  
(১৯০০-০১) ১, ৯৫৫, ০৯৫—পক্ষান্তরে  
সচরাচর স্বাভাবিক অবস্থার বৎসরে (১৮৯৪-  
৯৫) শস্যের আমদানি হয় ৮৪৩, ৫২৩  
hundred weight।

১৮৯৯-১০০—১৯২২, ৭৮১, ৬৫৬ ও ১,  
১৭০, ৩৯৭, ০৯২।

১৯০০-০১—৫৭০, ৪০৪, ০২৩৭, ৫৪১,  
২৯৭, ৩০৭

১৮৯৯-১৯০০—আমদানির অঙ্কে—মূল্য-  
বান খাত ছিল ৫১৩, ৯৮২, ৪৫৭।

১৯০০-০১ অঙ্কে—৫১৬, ৩৫৪, ৫০৮;  
১৮৯৯-১৯০০ অঙ্কে রপ্তানির অঙ্কে ছিল  
৫৫, ৩০৪, ২৫০।  
১৯০০-০১ অঙ্কে রপ্তানির অঙ্কে ছিল ৫৯,  
৪৮৭, ৯৩০।  
১৯০০-০১ অঙ্কে আমদানি অপেক্ষা  
রপ্তানির অতিরিক্ত (মূল্যবান খাত-সমেত)  
ছিল ৫১০, ৯৩৩, ০৭৩।

পক্ষান্তরে উল্লেখ করা যাইতে পারে,  
সমস্ত রপ্তানিই কাঁচা মাণ এবং সমস্ত  
আমদানিই কারখানার তৈয়ারী জিনিষ।

অতএব দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ড কর্তৃক  
পরিচালিত ভারত এখনো হুর্ভিক্ষ, কৃষ্টিত  
—ভারতের বিপত্তার ও জন-সংখ্যার হিসাবে  
জগতের বিপণিতে যোগ্য আসন অধিকার  
করিতে এখনো সমর্থ হয় নাই।

অর্থ নৈতিক অবস্থা

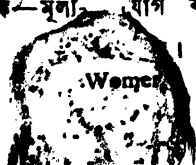
আধুনিক ভারতের বৈষয়িক অবস্থা ত  
এইরূপ। নৈতিক অবস্থা আলোচনা করিয়া  
পূর্বের আমাদের যে ধারণা হইয়াছিল এই  
বৈষয়িক অবস্থার আলোচনাসেই ধারণা  
আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে :—ভারত দরিদ্র।

\*

\* \*

ইহার প্রমাণ আমরা দেখাইতেছি।

Lord Curzon অনুমান করেন,  
ব্রিটিশ ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য  
৪৫০ কোর টাকা হইবে। কৃষি হইতে  
প্রত্যেক ব্যক্তির আর গড়পড়তায় ২০  
টাকা, উহার সহিত শ্রমশিল্পোৎপন্ন আর  
যোগ করিলে, ৩০ টাকা পর্যন্ত উঠিতে  
পারে। অতএব গতবর্ষের অল্পকাল





হিসাব অনুসারেও, প্রত্যেক ভারতবাসীর  
বাৎসরিক আয় গড়পড়তায় হয় ৫০ ফ্রাঙ্ক,  
কিন্তু আমরা পরে দেখিতে পাইব, ভারতে  
ধন অত্যন্ত অসমানভাবে বিতরিত এবং  
কৃষককে স্বল্প আয়েই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

এই দারিদ্র্যের আরও প্রমাণ আছে।  
আয়ের উপর কর :—৪৮২, ৪৮২ ব্যক্তির  
আয় ৫০০ টাকার উপর, তন্মধ্যে ৮১,০৬৯  
ব্যক্তির আয় ২০০০, টাকার উপর। আয়ের  
অঙ্ক সবশুদ্ধ ধরিলে ৫০, ৬৩০, ০০০ হয়।

ব্যাঙ্কের মূলধন ১৮৮৯ অঙ্কে নির্দ্ধারিত  
হয় ;—ভারতে অধিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক-সমূহের মূলধন  
৪৪, ০২৮, ৭১০ টাকা ; ভারতের বাহিরে  
অধিষ্ঠিত ব্যাঙ্কসমূহের মূলধন ৮, ৯৪৪, ৯৬৩  
পৌণ্ড।

সমস্ত যৌথ-কোম্পানীর ( ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য,  
প্রশিক্ষণ, নৌ-চালন, খনি, চাষ ) মূলধন,—  
১৮৯৯-১৯০০ অঙ্কে,—২৩, ৬২৫, ৫৫০ পৌণ্ড  
মাত্র উঠিয়াছিল।

বেতন—( ১৯০০ ) গড়পড়তায় কতক-  
গুলি বেতনের হার দিতেছি :—রাজমিস্ত্রী,  
ছুতোর কিংবা কামার :—কলিকাতায় ১৮,  
হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত ; দিল্লিতে ১৫, ৫।—  
কন্সলম বসন্ত বয়সের কৃষি-মজুর—কানপুরে  
৩, ৫৬ হইতে ৫ ; দিল্লিতে, ৭, ৭৫ ; বোম্বায়ে  
১১ ; নাগপুরে ৫।

\* \*

কিন্তু ভারতে গুরুতর রকমের দুর্ভিক্ষ  
পুনঃপুনঃ হইয়া থাকে—ইহাই ভারতের  
দারিদ্র্য সৰ্ব্বদা একটা দারুণ প্রমাণ।

১৭৭০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত

দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী সংগলপত্রে  
স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

শেষের দুর্ভিক্ষগুলার বিবরণ :—

মাদ্রাজ বিভাগে ( ১৮৭৭ )। খুব সঙ্কট-  
কালে ( সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ ) ২, ২১৮, ০০০  
লোক সাহায্য পায়।

অতএব দেখা বাইতেছে, ভারতের  
দুর্ভিক্ষ খাদ্যের অভাবে হয় না, অর্থের  
অভাবেই হয়। ইংরেজি বাক্য-অনুসারে  
ইহা money-famine অর্থাৎ অর্থের দুর্ভিক্ষ !  
ভারতের চাষা এত দরিদ্র ও এত-কম  
মিতব্যয়ী যে তাহার কোন সঞ্চিত অর্থ থাকে  
না। মাঝামাঝি ফসলের বৎসরের পর, যে  
বৎসরে একেবারেই ফসল হয় না, সে বৎসরে  
চাষা একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে ;  
সুতরাং গভর্ণমেন্ট দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশে  
যে খাদ্য পাঠাইয়া দেন, চাষা তাহা ক্রয়  
করিতে পারে না। আবার সরকারও দুর্ভিক্ষ-  
পীড়িতদিগকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত  
সাহায্য করিতে পারেন, তাহার অধিক  
নহে। সরকার ধার করিতে পারেন কিংবা  
টেক্স বসাইতে পারেন। কিন্তু ভারতের  
রাজকোষ ঋণভারে ভারাক্রান্ত ; এবং  
করের কথা যদি বল ; ভূমি-করই একমাত্র  
কর যাহা উৎপাদক ; কিন্তু সমস্ত দেশ  
কর-ভারে অতিমাত্র ভারাক্রান্ত। যে প্রদেশে  
দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেই প্রদেশের সাহায্যার্থ,  
অল্প সমস্ত প্রদেশকে ত দুর্ভিক্ষে পরিণত  
করিতে পারা যায় না।

পুনঃ পুনঃ ধার করিতে না হয়, কর

বাড়াইতে না হয়—এইজন্য সরকার “দুর্ভিক্ষ-

সংগলপত্রে” স্থাপন করিয়াছেন ; বিশেষ

বিশেষ টেক্স হইতে এই ভাণ্ডার পূর্ণ করা হয়। সররাচর বৎসরে, এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে রেল-পথ ও খাল তৈয়ারী হয়; যে সকল প্রদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বেশী, এই রেল-পথ ও খালের দ্বারা সেই সব প্রদেশে খাদ্য চালান দেওয়া হয়; এই ভাণ্ডারের কিয়দংশ ঋণ শোধ করিবার জন্য (এই ঋণের মুখ্য অংশ পূর্ববর্তী দুর্ভিক্ষের ধরচের দরুণ) প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দুর্ভিক্ষের বৎসরে কর্মশালা খোলা

হয়, এট কর্মশালার অভাব-ক্লিষ্ট দৈনন্দিন লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসারের কাজ চালাইতে পারে।

১৮৯৭-৯৮ অব্দে দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার হইতে ৩, ৫৪৮, ৫২২ পৌণ্ড এবং ১৯০০-১৯০১ অব্দে ৪, ১৭৯, ৪২৮, পৌণ্ড সাহায্য দেওয়া হয়। ভারতের গ্রাম, ইংলণ্ডেও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত-দিগের সাহায্যার্থে প্রায়ই প্রভূত ব্যক্তিগত দান প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৪)

ক্রীজ্যোতিরজ্ঞানাথ ঠাকুর।

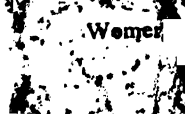
## দুর্ঘটনা

(১৭)

খেলায় হারিল বিজনকুমার, শরৎকুমারের কণ্ঠে উঠিল রাজকুমারীর ফুলমালা; ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে বন্ধপরিচর হইলেন সূজন রায়। জ্যোতিষ্ময়ীকে পূত্রবধু করিবেন— এই সংকল্পে কিছুদিন যে উপদ্রব-বাণ কার্য্যকাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, আবার রীতিমত ভাবে তাহার বিচ্ছেদ-আয়োজন আরম্ভ হইল। নদীতে একটা নূতন চড়া পড়িতেছিল; সে চড়া যে রাজার জমীদারী-ভূক্ত, তাহাতে

কোন সংশয়ই নাই; আইন-আদালত বুঝিয়া এতদিন সূজন রায় নিজেই তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন; চঠাৎ এক রাত্রে রাজ-প্রজাদিগের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া এই চরের একাংশ নিজ এলাকাভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইল; জিতিল রাজদলই,—কিন্তু উভয়পক্ষেই অর্থম হইল অনেক লোক। ইহার মধ্যে রাজসর্দার বলবন্তসিং গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল। এই সংবাদ পাইয়া দেওয়ানের সহিত পরামর্শে

(৪) সরকারের প্রতিপক্ষীয় লোকেরা বলে, পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষের সংখ্যা এখন বেশী কিন্তু ইহা কথার মার-প্যাচ মাত্র। পূর্ব্বে, যে দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক অনশনে মরিত; সেই দুর্ভিক্ষকেই দুর্ভিক্ষ বলা হইত; আজকাল এইরূপ বলী হয় যে, বঙ্গদেশেও অবোধায় ১২০০০০১ অব্দে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তখন এই বৎসরেও উক্ত দুই প্রদেশের কোন প্রদেশেই মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। ১২০০০০১ অব্দে যে সকল প্রদেশে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় সেখানেও অনশনে অল্প লোকই মরিয়াছিল। খরাপ খাদ্যের দরুন আমাশা, ওলাউঠা ও জ্বর হইয়া, এই মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে, সঠিক বিবরণ-তালিকার অভাব ছিল; যে ওলাউঠায় মরিত, তাহার মৃত্যু দুর্ভিক্ষ-নিহিত মৃত্যুর মধ্যে পরিগণিত হইত না, তাহাজ্জা লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মৃত্যু হইয়াছে।



ব্যাপ্ত থাকায় আজ বিকালে বধাসময়ে রাজা গৃহে ফিরিতে পারেন নাই।

পিতাকে আগত করিয়া লইতে সিঁড়ির ঘরে আসিবামাত্র তাঁহার চিন্তা-বিষয় মুখ দেখিয়া জ্যোতির্ময়ী অল্প সব কথা ভুলিয়া গেল। তাহার সৌৎসুক্য কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল—“বাবা!”

এই ক্ষুদ্র সঙ্ঘোধন-শব্দের মধ্যে একটা মর্শ্বাস্তিক আকুল প্রশ্ন অভিযুক্ত হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন—“চল রাণি, ঘরে গিয়ে সব কথা বলছি।” বলিয়া কস্তার স্বক্ষে স্নেহহস্ত সংস্থাপনপূর্বক পার্শ্ববর্তী হরকরাকে কহিলেন—“ডাক্তারকে ডেকে আন।” জ্যোতির্ময়ী কহিল,—“ডাক্তার-দা তোমার অপেক্ষায় বারান্দাতেই আছেন। তিনি কাল বাড়ী যেতে চান।”

পিতা, কস্তা গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিবার পর শরৎকুমার নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন—“বস ডাক্তার। তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে বাও, কিন্তু আমরা তোমাকে ছাড়তে পারি কই।” শরৎকুমারের মুখ হাস্য-প্রফুল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন—“আমি তোমার কথা এখনো আপনাকে জানাইনি।”

—“মনের কথা মুখের অপেক্ষায় সব-সময় যে অব্যক্ত থাকেনা এই তো হয়। কিন্তু আপাততঃ একটা যে মহা দ্বারে পড়া গেছে, তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে হবে।”

বলিয়া রাজা সংক্ষেপে তাঁহার লাঠিয়াল-গণের অধম হওয়ার বৃত্তান্ত বলিলেন। শরৎ কহিলেন—“রোগীর চিকিৎসা তো

কর্তব্য কর্ম; আপনি যদি সেজন্য আমাকে অমন করে অনুরোধ করেন ত লজ্জায় পড়তে হয়। আপনার হাসপাতালে এত প্রবীণ চিকিৎসক থাকতেও আপনি যে আমার মত নবীন চিকিৎসকের উপর এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করছেন এতে তো আমিই কৃতজ্ঞ।”

জ্যোতির্ময়ীর মন হইতে কিছু-পূর্বের অপ্রসন্নতা একেবারেই মুছিয়া গিয়াছিল; সে তাহার আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি শরতের মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া কহিল—“ডাক্তার-দা, আপনার বিনয়ের এক-কড়াও যদি পেতুম আমি!”

“বিনয় না রাজকুমারি, সত্যই আমি আপনাদের সদয় ব্যবহারে সর্বপ্রাণে”— এই পর্য্যন্ত বলিয়া শরৎ সহসা থামিয়া গেলেন; ক্ষণপূর্বে এইরূপ ভাবার পর রাজকুমারীর নয়নে, স্বরে, কথায় যে বিরক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া গেল,—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই—রাজার দিকে চাহিয়া শরৎ কহিলেন—“ঘটনাটা ঘটেছে কোন্ সময়? আঘাত পেয়েছে তারা কখন?” রাজা কহিলেন—“শেষ-রাত্রি থেকে মারামারি শুরু হয়ে আজ সকাল আটটা পর্য্যন্ত চলেছিল।”

—“এ পর্য্যন্ত তাদের ক্ষতস্থানে কোন ডাক্তারের হাত পড়েনি বোধ হয়?”

—“না। তবে লাঠিয়ালরা সাধারণতঃ নিজের চিকিৎসা নিজেরাই করে। অনেক ডাক্তারের চেয়ে তাদের মধ্যে কেহ-কেহ এরকম ডাক্তারিতে বরঞ্চ বেশী পটু। তবে এবারকার দাঙ্গায় আমার লোকজনেরা

আত্মলিঙ্গ প্রস্তুত ছিলনা; তাই বেশী লোকও

অপম হয়েছে আর হুএকজন বেশী রকম চোটও পেয়েছে। সর্দারের অবস্থা এতই খারাপ যে তুমি আছ বলেই ভরসা হচ্ছে যে তবুও হয়ত বেঁচে যাবে।”

—“কিন্তু এ-রকম আঘাতের চটপট প্রতিবিধান আবশ্যিক। আমরা কি সেখানে যেতে হবে?”

—“না। পালকী করে তাদের আনা হচ্ছে। এখনি এসে পড়বে।”

বলিতে বলিতে খবর পাওয়া গেল,— আহতেরা হাসপাতালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নীচে মোটার প্রস্তুত ছিল—শরৎকে সঙ্গে লইয়া পবন-বেগে অবিলম্বে রাজাবাহাদুর হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অত্যাশ্রয় আহতদিগের শুশ্রূষা-ভার হাসপাতালের চিকিৎসকগণের উপর দিয়া শরৎ সর্দারের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—তাহার এক-দিকের কণ্ঠস্থি ভাঙিয়া গিয়াছে,—মনে হয় যেন ভোঁতা খড়্গের আঘাতে স্বল্প বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; রোগী অর্ধ অচেতন। শরৎকুমার ক্রোড়াকর্ষ দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া ক্ষতস্থান ছেদনপূর্বক সতর্কতা এবং তৎপরতার সহিত ভগ্নস্থিগুলি যথাস্থানে পুনঃসংযোজিত করিয়া ঔষধাদি লেপনপূর্বক সুনিপুণ-ভাবে বাঁধিয়া দিলেন। রাজা মুগ্ধনেত্রে, তাহার হস্ত-নৈপুণ্য দেখিতে লাগিলেন।

শরৎকুমারের কার্য শেষ হইবার পূর্বেই দারদেশে একটা গোলযোগ উত্থিত হইল; রাজা তাড়াতাড়ি বারান্দার আসিয়া দেখিলেন হাসপাতালে প্রবেশ-উদ্ভূত একজন ক্রান্তি রাজার পা ধরিয়া কহিল—

দেখিয়া প্রহরা সেলামপূর্বক স্থির হইয়া দাঁড়াইল; সেই অবকাশে বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল—  
—“জুজুর, ধর্ম্মাবতার! রক্ষা করেন, আমার ছাইলার মুখের চাপা (চোখাল) ভাঙ্গা গেছে—ডাক্তরের নামডাক শুইনা আইছি।”

রাজা বুঝিলেন ইহারা বিপক্ষ-দলের লোক। কহিলেন—“কোথায় তোমার ছেলে?”

—“ঐ ডুলির মধ্যে গাছের তলায়; জকুম হইলেই আনি।”

একজন কম্পাউণ্ডার একটু দূরে বারান্দারই এক-অংশে দাঁড়াইয়াছিল, সে রাজার পিছন হইতে বৃদ্ধকে মুখ-খিঁচাইয়া চাপাকণ্ঠে কহিল—“তোর জমীদারের কাছে যা না। যার শিল বার নোড়া—তার ভাঙ্গলেন মাথা,—আবার এখানে ডাক্তর দেখাতে এসেছেন—মলো যা!” তাহার সকল কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ করিল না তবে সে যে বৃদ্ধকে ভৎসনা করিতেছে—হহা বুঝিয়া বলিলেন—“চুপ করহে! মন্তব্য-ধর্ম্মের নিকট পক্ষবিপক্ষ শত্রুমিত্র নাই। যাও সর্দার তোমার ছেলেকে নিয়ে এস।”

হুমুখ কম্পাউণ্ডার রাজাদেশেও আশ্রয়-স্বরণ করিতে না পারিয়া মুখের কথা-গুলি চিবাইতে চিবাইতে অস্পষ্ট স্বরে কহিল—“ই্যা তারপর আরাম হয়ে আবার আমাদের রাজার বিকড়ে লড়।” এই কথা বলিয়া রাজাকে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ রূপের অবসর না দিয়াই সরিয়া পড়িল।

ক্রান্তি রাজার পা ধরিয়া কহিল—  
—“Werner! আপন এলাকার আমাগো

একরত্তি ভিটা দিতে আজ্ঞা হয়—আমরা আর কোনখানে যাবু না—চিরদাস হইয়া থাকিমু।”

রাজাজ্ঞার তাহার পুত্র তৎক্ষণাৎ হাস-পাতালে আনীত হইল।

রাজ-সর্দারের কঠোর বাঁধন শেষ করিয়া শরৎকুমার বিপক্ষদলের লোকেরও চোয়াল ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। কার্য শেষ হইলে হস্তাদি প্রক্ষালনের পর রাজাকে বলিলেন—“এদের ব্যাণ্ডেজ ছুদিনের আগে আর খোলার দরকার হবে না। ইতিমধ্যে আমার একবার কলকাতা থেকে ঘুরে এলে ভাল হয়। ব্যাণ্ডেজ খোলার পর বে-রকম ঔষধাদির দরকার—সে সব প্রায়ই এখানে কিছু নেই। আমি নিজে গিয়ে সে সব দেখে শুনে আনতে চাই। আজই রাতে যদি ছাড়ি তাহলে জিনিষ-পত্র নিয়ে ঠিক সময়েই আবার ফিরে আসতে পারব।”

তাহাই স্থির হইল। অনাদি নামে একটি বালককে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই শরৎকুমার কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ফিরবার পথে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল।

রাত্রিকাল,—ফাট ক্লাশ ট্রেনের একটি কামরায় তাঁহার দুইজনমাত্র আরোহী। অনাদি এক-প্রান্তের শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া, টেসন হইতে কেনা আট আনা মূল্যের ডিটেক্টিভ নভেল একখানা পাঠে মগ্ন; অস্ত্র-প্রান্তের শয্যায় শুইয়া শরৎকুমার মুক্ত বাতায়ন পথে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কত উজ্জল নিকজল, কত পরিচিত অপরিচিত, একই তারকারাশি ট্রেনের গতির সঙ্গে তুলিয়া

ভাসিয়া উঠিতেছিল। গতির দ্রুততীর চেনা তারাগুলিকেও সহসা তিনি চিনিতে পারিতেছিলেন না। ‘ওয়ারেন’র রাজ-সিংহাসনের অর্ধেকখানা একবার তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন,—তাহার দুইটি নক্ষত্র পরিচিত সহস্র দৃষ্টিতে তাঁহাকে যেন সম্ভাষণ করিয়া গেল। শরতের নেত্র তখন ঘুমে ভরিয়া আসিতেছে—ঘুমের ঘোরে তাঁহার মনে হইল, উহার মধ্যে অলঙ্কালে বড় তারাটি জ্যোতির্ষ্ময়ী আর ছোটটি হাসি। দেখিতে দেখিতে তাঁহার তন্মানিমীলিত নেত্রে সেই দুইটি তারা মিলিয়া-মিশিয়া এক-হইয়া গেল; —শরৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অর্দ্ধরাত্রে একটা ছোট ট্রেনে ট্রেন থামিবা মাত্র একজন স্থলকায় পাশ্চাত্য মুষ্টি সজোরে দ্বার খুলিয়া অমুবর্তী ভৃত্যের সহিত কামরায় উঠিয়া পড়িল। মুষ্টিটি এতই রোজ-দণ্ড যে তিনি যে কোন্ জাতীয় জীব—অর্থাৎ খাটি ইয়োরপীয় বা ফিরিঙ্গি—তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাঁহার ভৃত্য কামরার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নিম্নস্থ কুলির নিকট হইতে সাহেবের আসবাব-পত্র উপরে তুলিতে লাগিল। সাহেবের দৃষ্টি ঘুরপাক খাইতে লাগিল—নৌচের শয্যা দুইটার উপর। বিজুলি-আলোকে দুইটা ‘বাথই’ নিগার-অধিকৃত দেখিয়া তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতে লাগিল—ইহাদের একটাকে অন্ততঃ বজ্রবলে ধরিয়া জানালায় বাহিরে নিক্ষেপ করেন। সূত্থের বিষয় এই যে, এ যুগে—ইচ্ছামাত্রেই সুরাসুরেরও

বাহকৃত—বিরিবার চেটে করিবেন—তাহারও সময় নাই। তখনই গাড়ী-ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল। ভৃত্য জিনিষপত্রগুলো কামরার এক পাশেই স্তুপাকৃতি করিয়া রাখিয়া শয্যাটা উপরের বার্থের উপর ফেলিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। সাহেবের নিজের হাতে ছিল একটা ম্যাডষ্টোন ব্যাগ। তিনি সেটাকে অনাদির পায়ের কাছে রাখিল। জায়গার উপরে রাখিয়া—তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাকে একবার ভাল করিয়া দেখিলেন, তাহার পর পুনরায় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উপরের বেঞ্চ দুই হাতে ধরিয়া ঝলিত বাকো বলিলেন—“Sir Babooneau—will you get down.” তাহার মুখ হইতে তখন ভূঁড়ু করিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। অনাদি জ্যোতিষ্মতীর ব্যায়াম-সমিতির মেম্বর, ইংরাজ ফিরিঙ্গি দেখিয়া সে দমিবার পাত্র নহে, সাহস দেখাইবার এমন সুযোগও কদাচিত ঘটে, সুতরাং সে নভেলখানা বন্ধ করিয়া—সাহেবের ব্যাগটার উপরে বেশ ভাল-রূপেই পা লগা করিয়া দিয়া বলিল—“Why should I get down, you sir pigledy? You may go out if you like!” বানরটার স্পর্ধার সাহেব অবাক হইয়া গেলেন। উপরের বেঞ্চ হইতে হাত নামাইয়া বিকৃত কণ্ঠে—“all right sir” বলিয়া তাহার প্রতি ঘুঁষা বাগাইলেন। অনাদি লাফাইয়া শয্যা ত্যাগ করিল, কিন্তু সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্বেই সাহেবের এক ঘুঁষি তাহার মাথায় পড়িল। যদি সেই উদ্ভূত বজ্রমুষ্টি সুরাপানের কালে পড়িত, তাহা হইয়া না পড়িত, তবে অনাদির

দায় হইয়া উঠিত। কিন্তু এই ঝালত মুঠা-ঘাতের বিনিময়ে সাহেবের মাথায় অনাদির ঘেঁসবল ঘুঁষি দুইটি পড়িল, তাহাতে সাহেব বেশ সচেতন হইয়া উঠিলেন।

তখন বাম হস্ত চালরূপে মুখের সম্মুখে রাখিয়া, ডান হস্ত বাড়াইয়া কহিলেন—“Beg your pardon sir—We are quits now, let us be friends.” পদানত শত্রুকে ক্ষমা করা হিন্দুর পক্ষে সহজ ধর্ম, সাহেবের আহ্বান বাক্যে অনাদি প্রফুল্ল-ভাবেই হাত বাড়াইয়া দিল।

গোলমালে ইতিপূর্বেই শরতের নিন্দ্রা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ডভয়ের দম্বযুদ্ধে অনাবশ্যক তৃতীয় হস্তক্ষেপ করিতে হইয়া না করিয়া প্রিন্স নীরবে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। যেমন মিটমাট হইয়া গেল অর্মান্তি তিনি অনাদিকে ক্রমাল ভিজাইয়া আনিতে আজ্ঞা করিয়া সঙ্গের ব্যাগটা খুলিয়া ঔষধ বাহির করিলেন। সাহেব এ-সময়েও নিজের ব্যাগটার কথা ভোলেন নাই; তাড়াতাড়ি সেটা অনাদির বেঞ্চ হইতে টানিয়া লইয়া পাশে রাখিয়া, শরতের পরিত্যক্ত শয্যায় বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন—আর শরৎ সুনিপুণ হস্তে তাহার আহত মস্তকে পটি বাধিয়া দিলেন। কার্য শেষ করিয়া তাকে কহিলেন—“আমি বরঞ্চ উপরে বাহতেছি আপনি এইখানেই শয়ন করুন।”

শরৎ উপরে উঠিলেন; নভেল পড়িবার প্রবৃত্তি আর অনাদির তখন ছিল না,—বঠখানা বালিসের নীচে গুঁজিয়া সেও শুইয়া পড়িল। সাহেব বিনাবাক্যব্যয়ে কিছুক্ষণ তাবেই বসিয়া রহিলেন। তাহার পর

বাগটা খুলিয়া একটা শিশির তীব্র উপাদান  
—একনিঃশ্বাসে পান করিয়া শয্যা গ্রহণ  
করিলেন। কামরা আবার নীরব হইয়া  
পড়িল।

খানিক পরে অনাদির মনে হইল,—  
তাহার বুকের উপর যেন পাথরের ভার  
চাপিয়াছে—নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে।  
অতি কষ্টে ঘুমের ঘোরেরেই সে চোখ মেলিয়া  
দেখিল,—সাহেব দুই হাতে তাহার বক্ষ  
চাপিয়া বলিতেছেন—“You savage, you  
niggard, you dared to insult me!  
Don't you know who I am! My  
nick-name is Satan!”

অনাদির তখন সকল শক্তি অবসিত,  
মুচ্ছার পূর্বে লোকের যেরূপ অবস্থা হয়  
সেইরূপ অবস্থা,—দারুণ কষ্টের একটা চেতনা  
ছাড়া অন্য কোনরূপ জ্ঞান নাই। সেই  
অবস্থায় সে অক্ষুট কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া  
উঠিল। শরৎকুমার সে শব্দে সহসা আগ্রিত  
হইয়া—লাফাইয়া নামিয়া পশ্চাৎ হইতে  
সাহেবের কোট ধরিয়া সজোরে টানিলেন।  
সাহেব পড়িতে-পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।  
অদূরে দরজার কাছে তাহার ফুলগাছের  
টুকরিতে একখানা কুকড়ি বেঁধান ছিল;  
সেই কুকড়ি থানা তুলিয়া লইয়া বাঘ যেমন  
মুখের শীকার ফেলিয়া আক্রমণকারীকে  
ক্ষেপে সেইরূপ ভীষণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে  
আক্রমণ করিলেন। তখনও নেশায় তাহার  
পা টল মল করিতেছিল, হাতেরও জোর ছিল  
না স্তত্রাং কুকড়ি থানা কাড়িয়া লওয়া  
শরতের পক্ষে কঠিন হইল না। তখন  
পিপড়ারও মরণ-কামড়ের জোর

সাহেবের স্থলিত হস্তের আক্রমণও একে  
বারে ব্যর্থ হইল না। টানাটানির সময়  
কুকড়ির অগ্রভাগ শরতের হাতের ত্বজার  
উপর একটু বিধিয়া গিয়া দু'এক ফোঁটা  
রক্ত পড়িল। কুকড়ি থানা জানালায়  
বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া শরৎ বাথরুমে  
গিয়া হাতটা জলের নীচে রাখিতেই রক্তপড়া  
বন্ধ হইয়া গেল। ঘরে আসিয়া দেখিলেন,  
—সাহেব তাঁহার শয্যায় শুইয়া স্থলিত  
বচনে অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করিতেছেন  
আর অনাদি যেন তখনো ঠিক সচেতন  
হইয়া উঠে নাই; কেমন যেন মুগ্ধনেত্রে  
চাহিয়া আছে। তাঁহার ভয় হইল—হয়ত  
বা সে বক্ষে বিশেষ আঘাত পাঠিয়াছে।  
নিজের হাতের কথা একেবারেই ভুলিয়া  
গিয়া তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিতে  
বসিলেন। তাঁহার স্পর্শে অনাদির সে  
মোহভাব কাটিয়া গেল; তিনি তখন  
প্রকৃতিতে তাহার কপালে আর্দ্র হাত  
বুলাইতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে ভৃত্য আসিয়া সাহেবের  
নিদ্রাভঙ্গ করিল। প্রসাদপুরের একটা  
ষ্টেশন আগে বিবাদপুর—সেইখানে তাহার  
নামিয়া গেল। শরৎ পরে জানিলেন—এই  
ফিরিজিপুর বিবাদপুর-সরকারের আসাম-টি-  
ষ্টেটের দুর্দান্ত ম্যানেজার।

( ১৮ )

অনাদি বাড়ী আসিয়া, টুেনের বিপদের  
খটনা বেশ মজাইয়া-জমাইয়া যখন-তখন  
রাজকুমারীর নিকট গল্প করে। সেই এক  
তবার শুনিয়াও রাজকুমারীর বিরক্ত  
তিনি শুনিয়া হাসেন, কোতুক






এই যুক্তি-সমর্থক প্রমাণও তিনি যথেষ্ট দেখাইলেন। প্রথমতঃ, সাহেব অনাদিকে বিছানা হইতে উঠিতে বলায়—অনাদি যে তাঁহাকে ঘৃষি মারিয়াছিল তাঁহার ক্ষৌত কপাল এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যে কুকড়িখানা তিনি শরৎকুমারের হাত হইতে টানিয়া গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, সে কুকড়ি খানাও বখান্ধানে পাওয়া গিয়াছে। একথাও যে সাহেবের বানানো কথা নহে—ইহাঘারা তাহাই প্রমাণ হইতেছে। অতএব ইহারাই দুইজনেই অপরাধী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপ যুক্তির বলে মুন্সেফ-মহাশয় সামান্ত মারামারির (assaulting charge) অপরাধে অনাদির সশ্রম একমাসের কারা বাস ব্যবস্থা করিলেন; আর শরৎকুমারকে খুন অভিপ্রায় জনিত (culpable homicide) গুরুতর দোষে দোষী করিয়া সশ্রম পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। জামিনে অবশ্য তাঁহারাই উভয়েই আপাততঃ মুক্তিলাভ করিলেন। —ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পুনর্বিচারের জন্য তাঁহাদের দরখাস্ত পড়িল।

মুন্সেফের বিচারে রাজা আশ্চর্য্য হইলেন না,—কিন্তু বালিকা জ্যোতিষ্মারী ক্লেভ বিম্বর এবং ক্লেভের সীমা রহিল না। বিচারক বিনি, তিনি ত নিরপেক্ষরূপে সত্য বিচার করিবেনই—ইহাই তাহার বিশ্বাস। ক্লাউডেন সাহেবের আদর্শে এ সম্বন্ধে তাহার মতামত রচিত হইয়াছে। আর নিজের দেশের লোক হইয়া মুন্সেফ মহাশয়—এরূপ অবিচার করিলেন।

কেবল ক্লেভ নহে—ইহার সহিত  তার উপদেশ এখানে সার্থক হইল।

লজ্জার বাণী একটা নৈরাশ্র তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল।

ব্যারামশিখার কি কল, যদি দেশের লোকের নৈতিকবল, ধর্মবল না থাকে? যে দেশের কাব্য-গাথা, পুরাণ-ইতিহাস সত্যের, ত্রায়ের জয় ঘোষণা করিতেছে, সেই দেশের লোকের আজ এত অধোগতি! তাহার প্রাণের মধ্যে একটা নিদারুণ হাহাকার উঠিল। ছরাশা! ছরাশা! তাহার চারিদিকে কর্শনাশা হুর্ভেদ্য অন্ধকার! হৃৎকতি-তরঙ্গময় সাগর হস্তর,—! সাধ্য নাই তাহার সাধ্য নাই, তরঙ্গী রক্ষা করিতে সাধ্য নাই তাহার!

রাজ-লাইব্রেরিতে ধিয়র্সফিষ্ট পত্র স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া ছিল। আজ-কাল জ্যোতিষ্মারী ক্রমাগত তাহাই পড়ে, পড়িয়া একজন আগ্রত গুরু পাইবার জন্য মর্শ্বাস্তিক আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণে জাগে! •

সে আজ কাতর প্রার্থনায় আকাশের দিকে চাহিয়া করবোড়ে মনে-মনে কহিল—“ভগবান সর্বশক্তিমান্ কর্ণধার, কোথায় তুমি কোথায়? আলোক দেখাও, গুরুবেশে—ঋষ-তারারূপে উদয় হইয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চল তুমি—এই দুর্বলা শক্তিহীনা ক্ষুদ্র নারীকে।” মেঘভেদ করিয়া একটি জ্যোতি-রেখা যেন সহসা তাহার নয়নে চমকিয়া উঠিল।

\* \* \* \*

এই কষ্টের উপর তাহার আর একটা কষ্টের কঙ্কণ ঝটিল। কোর্ট হইতে ফিরিয়া শরৎকুমার প্রবল অরাজক হইলেন। ‘Physician heal thyself’—এই প্রবাদ-

রাজকুমারীর আক্রান্ত রোগীগণ শরতের চিকিৎসায় সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে—তাহার নাম-যশ দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ট্রেনে নিজের হাতে কুকড়ির যে আঘাত লাগিয়াছিল সামান্য বোধে তাহা অগ্রাহ্য করায়—হঠাৎ কয়েক দিন পরে তাহার বিষময় ফল দেখা দিয়াছে। তাঁহার উপদেশ অবলম্বন করিয়াই রাজচিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। সম্ভবত কোন রোগযুক্ত পশু-বধের পর কুকড়িখানা ভালরূপে পরিষ্কার করা হয় নাই সেইজন্য বিষাক্ত হংরা পড়িয়াছিল; এবং শরৎকুমার স্নান সৎকাল বলিয়াই ইহার আঘাতের ফল বখাশীজ প্রকাশ পায় নাই;—ডাক্তারেরা এইরূপই মনে করিতেছেন।

অস্ত্র করার পর শরতের অবস্থা প্রথম দিন খুবই খারাপ ছিল; দ্বিতীয় দিন অপেক্ষাকৃত ভাল—কিন্তু এখনো আশানুরূপ ভাল নয়। সকলেই চিন্তিত; রাজা, রাজকন্যা উভয়েই এ ঘটনায় নিতান্ত অসুখী। সেবার ফ্রটি নাই,—অনাধির সহিত আরও দুই একটি বালক তাহার গুঞ্ঝায় নিযুক্ত। কিন্তু অনাদি যেক্রপ প্রাণপণে সেবা করিতেছে, মাতা ভগিনী স্ত্রীও তদপেক্ষা অধিক যত্নে সেবা করিতে পারে না। দ্বিতীয় রাজিও কোনরূপে কাটিয়া গেল। তৃতীয় সন্ধ্যায় ডাক্তারেরা প্রফুল্ল মুখে ভরসা দিয়া গেলেন। রাজা গৃহে গিয়া অনেক দিনের পর সেই রাজিতে কবিতা লিখিতে বসিলেন; জ্যোতিষ্মতী

ঘোরে বারাণ্ডার আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহে তখন অনাদি ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে নিকটে আসিয়া বলিল—“আসবে দ্বিদিমণি ঘরে?—কেউ নেই এখন,—এস।”

বালিকা বলিল—“একটু ভাল দেখছ—অনাদি?”

—“নিশ্চয়। আজ আর তেমন ছটকট করছেন না,—তেমন অচেতন-ভাবও নেই,—সহজভাবে যেন ঘুমচ্ছেন।—এস না রাণি দ্বিদি ঘরে—আজ দেখে গুলী হবে।”

জ্যোতিষ্মতী শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। রোগীর মুখ প্রশান্ত—তিনি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—তজ্রাঘোরে বলিলেন—“হাসি তুমি? আর ঐ তারাটি—ঐ উজ্জল—তোমার চেয়েও উজ্জল বড় তারাটি—কে ও? চেন না,—হাসি? জ্যোতিষ্মতী উনি—রাজকুমারী।” জ্যোতিষ্মতীর অশ্রুজল সঞ্চরণ হঃসাধ্য হইয়া উঠিল;—তিনি আশ্চর্যবৃত্ত হইয়া রোগীর কপালে স্নেহহস্ত বুলাইলেন; সে স্পর্শে পরৎ চক্ষু উজ্জ্বলিত করিলেন—রাজকুমারীর দিকে দৃষ্টিপাতি করিয়া মুহূর্ত্তল কিন্তু স্বাভাবিক স্বরে কহিলেন—“তুমি রাজকুমারি?” রাজকুমারী অশ্রুগদগদ-কণ্ঠে কহিলেন—“চিনিয়াছেন?” একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া শরৎ কহিলেন—“চিন্বে না কেন? আমার কি হয়েছে?”

তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করায় রাজকুমারী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন—“কিছু হয় নাই,—কিন্তু উঠবেন না—আপনি ঘুমোন—আমি বাই।”

“বাবেন না রাজকুমারি—বসুন আপনি।”



অনাদি নিকটে একথানা চৌকি আনিয়া দিল,  
—জ্যোতিষ্ময়ী বসিলেন। শরৎ বলিলেন—  
“রাজকুমারি?”—বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া  
নিতর হইয়া রহিলেন। জ্যোতিষ্ময়ী ভীত  
বরে কহিলেন,—“ডাক্তার দা?” শরৎ আবার  
কথা কহিলেন,—বলিলেন—“রাজকুমারি—  
বড় চরম—বড় একলা মনে হচ্ছে,—আপনার  
চাতখানি দিন।” রাজকুমারী তাহার  
চাতখানি ধরিলেন,—অশ্রুতে সে হাত সিক্ত

হইয়া উঠিল; অনাদিও বাসকের ~~দা~~ মুখ  
চাকিয়া কাদিতে লাগিল। জ্যোতিষ্ময়ীর  
হাতখানি হাতের মধ্যে ধরিয়া রোগী আবার  
ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে হাতখানি  
আন্তে আন্তে টানিয়া লইয়া জ্যোতিষ্ময়ী  
ধীরপদে গৃহত্যাগ করিলেন।

পরদিন শরৎকুমারের অর ত্যাগ হইল;  
—বিপদ-মেঘ কাটিয়া গেল।

শ্রীশ্রীকুমারী দেবী।

## বাংলার ব্রত

( ৫ )

ব্রতের ছড়াগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার  
যে যোগ, ব্রতের আল্পনাগুলির সঙ্গে ঐক  
সেই যোগটিই দেখা যায়। কতকগুলি ছড়া  
রয়েছে কেবল কামনা উচ্চারণ করাই যার  
কাজ—

বাঁশের কোঁড়া, শালের টোঁড়া,  
কোঁড়ার মাথার ঢালি বি;—  
আমি বেন হই রাজার বি।

কিছা—

আমরা পূজা করি পিটালীর চিকনি।  
আমাগো হয় বেন সোনার চিকনি।

ইত্যাদি।

আর-কতকগুলি ছড়া, যার উদ্দেশ্য  
শুধু কামনাটা উচ্চারণ নয়, কাজের জন্ত  
যেটুকু তার চেয়ে অনেকটা বাজে সুর-সার,  
চলা-বলা তাতে রয়েছে;—যেমন ‘দেখলেম  
মাঘমঙল-ব্রতের সূর্য্যের বিয়ের ছড়াগুলি’—  
আল্পনাগুলি তেমনি দেখি হই

একরকম আল্পনা—সেগুলি কেবল অক্ষর  
বা চিত্রমূর্ত্তি,—কতকটা ইঞ্জিণের চিত্রাঙ্কনের  
মতো। এই সব আল্পনায় মানুষ নানা  
অলঙ্কারের কামনা করে পিটুলীর সব গহনা  
এঁকেছে। সেকুতী-ব্রতের ‘আল্পনায় ঘর-  
বাড়ি, চন্দ্র-সূর্য্য, স্থপুরীগাছ, রামাঘর,  
গোয়ালঘর সবই মানুষ এঁকেছে কিন্তু এদের  
তো শিল্পকার্য্য বলে ধরা যায় না—এগুলি  
মন বা চায়, তারি মোটামুটি মানচিত্র। কিন্তু  
এই যে নানারকমের পদ্ম মানুষ কল্পনা  
থেকে সৃষ্টি করেছে, কিছা এই যে কলা-লতা  
খুস্তি-লতা শঙ্খ-লতা চালতা-লতা ঐচ্ছিক  
লতামণ্ডন, এই যে নানারকম আসনের  
পিঁড়ি-চিত্র এগুলি মণ্ডনশিল্প,—মানচিত্র  
নয়। যেখানে অন্নপ্রাশনের পিঁড়ি, সেখানে  
শুধু অন্নের গাটিগুলি যেমন-তেমন করে  
এঁকে দিলেই কামনা সফল হতে পারতো,  
কিছা তা নয়; মানুষ সেখানে দেখছি অনেক  
পাখা এঁকে পিঁড়িখানিকে সুন্দর করতে

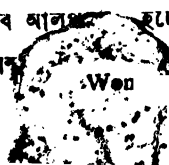


চেয়েছে, কালের অতিরিক্ত অনেকখানি লেখা তাতে রয়েছে। তারপর এই “তার-ত্রতের” স্বর্ষ্য, চন্দ্র, তারা—এরা কিছুই অমূল্য নয়; শিল্পীর কল্পনা থেকে এদের সৃষ্টি হয়েছে। পিঁড়িগুলিতে কামনার প্রতিচ্ছবি দেওয়ার চেয়ে কারিগরি করবার ইচ্ছাটাই প্রবল দেখা যাচ্ছে। আর, বছরের শেষে পৃথিবীকে নমস্কার দিয়ে “পৃথিবী-ত্রতের” এই যে আল্পনাখানি,—নরনারীর জীবনের ক্ষণিক ইতিহাস নিয়ে পদ্মপাতার উপরে একবিন্দুর মতো এই যে টলটল একটি সৃষ্টি—এটিকে তো কি পরিকল্পনার দিক দিয়ে, কি কারিগরির দিক দিয়ে মানচিত্র কিছুতে বলা যায় না। পূর্বকালে মানুষ যে-কোনো-কারণে-হোক মনে করতো যে-জিনিষ সে কামনা করছে তার প্রতিচ্ছবি লিখে কিংবা তার প্রতিমূর্তি গড়ে তাতে ফুল ধরে কামনা জানালে সিকিলাভ করবে। সে-হিসেবে আল্পনায় জিনিষটির প্রতিক্রিয়া দিলেই তো কাজ চলে; কিন্তু দেখছি মানুষ শুধু সেইটুকু করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; এবং তার মনও তৃপ্তি মানছে না—বতকণ-না শিল্পসৌন্দর্য্যে সেগুলি ভূষিত করতে পারছে। অথচ কামনা পরিভূষণের পক্ষে আল্পনা সুলভ, হল কি না হল তাতে বড় আসে-যায় না।

এই যে লক্ষ্মীপূজার আল্পনাতে মানুষ বিচিত্র-রকমের পদ্মফুল এঁকেছে, একটির সঙ্গে বার আর-একটির মিল নেই—এমন-কি আসল পদ্মফুলের সঙ্গেও নয়, “এরি বা উদ্দেশ্য কি? মানুষের মনে কোথায় একটা গোপন উৎস রয়েছে, যেখান-থেকে এই-সব আল্পনা হচ্ছে শিল্পের জন্মবার অমূল্য অবস্থা। নতুন-নতুন এক-একটি সৃষ্টির বিদ্যমানতা

বেরিয়ে আসছে? ত্রতের আল্পনাগুলি থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মানুষের অন্তরের কামনার সঙ্গে তার হাতের কাজগুলির বেশ-একটি যোগ রয়েছে—কিন্তু অন্তরের কামনার সঙ্গে বাহ্যের চেষ্টার যোগ থাকলেই যে সব-সময়ে শিল্প-আকারে কাজটা দেখা দিচ্ছে তাতো নয়; বরং দেখি কামনা আর তার সিদ্ধির চেষ্টার মধ্যে যত কম অবসর এবং বাধা ততই মানুষের ক্রিয়া সুলভ হয়ে দেখা-দেবার সুবিধা পাচ্ছে না।

শিল্পের সৃষ্টির মূলে মানুষের মনের তীব্র আবেগ আছে সত্য, কিন্তু আবেগের বেশ ঘাঁড়ি করি তাহঁতো শিল্প হয় না। অনেকদিনের পরে বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, আনন্দের উচ্ছ্বাসে তার গলা-জড়িয়ে কত কথাই বলা হল, কিন্তু সেটা কাব্যকলা, কি নৃত্যকলা ছয়ের একটাও হল না। কিন্তু বন্ধু আসবার আশায় ভাবে ডগমগ হয়ে যেন মন নৃত্য করছে, তার জন্তে ফুলের মালা গাঁথছি, নিজেকে সাজছি বর সাজাচ্ছি—নিজের আনন্দ নানা খুঁটিনাটি কাজে, এটা-ওটা জিনিষে ছড়িয়ে যাচ্ছে—এই হল শিল্পের দেখা দেবার অবসর। অতৃপ্তির মাঝে মন জ্বলছে—এই দোলাতেই শিল্পের উৎপত্তি। কামনার তীব্র আবেগ এবং তার চরিতার্থতা—এ ছয়ের মাঝে যে একটা প্রকাশ আছে, সেই বিচ্ছেদের শূন্য ভরে উঠছে নানা কল্পনার, নানা ক্রিয়ার, নানা ভাবে, নানা রসে। মনের আবেগ সেখানে ঘনীভূত হয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রকাশকে। মনের এই উন্মুখ অথচ উৎকণ্ঠ নয় অবস্থাটিই শিল্পের জন্মবার অমূল্য অবস্থা। মানুষ সুলভ-অসুলভ বেছে নেবার



সময় পায়, যেমন-তেমন করে একটা-কিছু করবার চেষ্টাই থাকে না। হঠাৎ যদি বাঘ এসে সামনে পড়ে তবে তার গায়ের চিত্র-বিচিত্র ছাপ, তার গঠনের সৌন্দর্য্য, এসব কিছুই চোখে পড়ে না; ভয় এবং পালানো তখন এতই কাছাকাছি আসে যে সৌন্দর্য্য বোধ করবার অবসর মন পায়না বলেই হয়। কিন্তু খাঁচার ওদিক বাঘ, এদিকে আমি; কিম্বা দূরে বাঘ লাফিয়ে চলেছে; তখন আবেগ আর ক্রিয়ার মাঝে অনেকটা অবসর; সেখানে বাঘের নানা সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে।

ব্রতের অমুঠান, শিল্পের উৎপত্তির অবসর কেমন করে এনে দিচ্ছে সেটা দেখা যাক। ব্রত-আচরণ আর শিল্প-ক্রিয়া—দুয়ের যে নৈকট্য দেখা যায়, তাতে করে দুয়েরই উৎপত্তি যে মানব-মনের একই প্রবৃত্তি থেকে, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকছে না। দুয়েরই মধ্যে দেখছি একটা জিনিষ রয়েছে, যা দুইকেই চালাচ্ছে। সেটি হল কামনার আবেগ। যা কামনা হল, তাই পেলেম তখনি,—এ হলে ব্রত হল না। আবেগ থাকে চাই—যেটা নানা ক্রিয়ার মধ্যে গতি পেয়ে পরিসমাপ্তি পাচ্ছে। এই হল ব্রতের মূল কথা।

ব্রতগুলির মধ্যে এই আবেগটির অবসর কোন্‌খানে রয়েছে দেখবো! এটা বেশ দেখা যাচ্ছে যে মানুষ বধনকার যা, তখনকার অস্ত্রে ব্রত করছেন। ভবিষ্যতের একটা-কিছু পাবার অস্ত্রেই ব্রতগুলির অমুঠান হচ্ছে দেখি। ‘গদা শুকুশুকু, আকাশে চাই’।—সেই সময় বর্ষার জলধারা কলনা করে ‘বসুধা কুটুম্বা’। ব্রতের আল্পনাতেও তেমনি। সোনার ব্রতের অমুঠান। এই যে জ্যোতের দান, চাই, পিটুলীর চিকনি এঁকে ব্রত

আঘাটের ছবি মনে লাগিয়ে মাথ পতীক্ষা করছে—এটা বড় কম অবসর নয় আবেগ বনীভূত হয়ে নানা শিল্প-ক্রিয়ার প্রকাশ হবার জন্ত। এমনি যখন খুব জল—আঘাট প্রাণে দুইমাস—তখন কুমারী-ব্রত নেই। এর পরে ভাদ্র মাস পড়তেই শরতের দিনগুলির অস্ত্রে ব্রত শুরু হল। শস্ত হবে, যারা বাণিজ্যে গেছে তারা ফিরবে—এমনি সব নানা কামনা ‘ভাদ্রলী-ব্রতটি’র মধ্যে নাট্যকাব্য হয়ে দেখা দিলে এবং আশ্বিনের শস্ত-উৎসবে তার পরিসমাপ্তি হল। এমনি প্রায় প্রত্যেক ব্রতেই দেখি কামনা অনেকদিন পর্যন্ত—কোথাও একমাস কোথাও বা দুইমাস—অতৃপ্ত থাকছে—চরিতার্থতার পূর্বে। শস্ত-কল্বার আগেই শস্ত-উৎসবের ব্রত আরম্ভ হল এবং শস্তের প্রকৃত উৎসবের ও কামনার মাঝের দিনগুলো মনের আবেগে নানা কল্পনায়, নানা ক্রিয়ার ভরে উঠে নাট্য, নৃত্য, আলোচ্য—এমনি-সব নানা শিল্পের জন্ম দিতে লাগল। চিত্র করতে হলে বড়-শিল্পী তো যেমন দেখলেন, তেমনিটি আঁকলেন না। দেখলেন, দেখে সেটা মনে রাখলেন, এবং হয়তো দেখার থেকে অনেক পরে সেটাকে মন-থেকে প্রকাশ করে দিলেন,—দেখা ও প্রকাশ-করার মাঝে যে-সময়টা, সেই হল বর্ষার শিল্পকাজের অমুঠান। দেখলেম, কল টিপলেম কটো উঠলো, এ হলে জিনিষটা ঠিক অমুকরণ করি গেঁদে বটে কিন্তু শিল্প বলতে অমুকরণের চেয়ে বড় যে-জিনিষটা তা হল



করলুম ~~এখানে~~ আল্পনার অহুত্ব পৰ্য্যন্ত  
রইলো। কিন্তু আশ্বিন মাসে লক্ষ্মী ধানের  
ক্ষেতের মধ্যে দেখা দেবেন কিম্বা বসন্তে  
ফুল ফুটবে, সূর্য্য উঠবে—এই আকাজ্জক  
অতৃপ্তি যখন মনকে তোলাপাড়া করে  
রয়ে-বসে প্রকাশ হতে চল্লো, তখন দেখি  
বিচিত্র-আল্পনার পদ্ম, লতা, পাতা;  
সূর্য্যোদয়ের নানা রূপক ও ছড়া এবং ফুলের  
ডালার গান, আমের মুকুলের গান; নানা  
রঙ্গ-রস।

আল্পনা যে কত সুন্দর এবং কত  
রকমের, তার হিসাব নিলে দেখা যায়,  
এখনকার আর্টস্কুলের ছাত্রদের চেয়ে ঢের  
বেশি জিনিষ মেয়েরা না-শিখেই লিখেছে  
এবং সৃষ্টিও করেছে। শ্রেণীবিভাগ করলে  
আল্পনার ফর্দটা এই রকম দাঁড়ায় :—প্রথম  
—পদ্মগুলি। দ্বিতীয়—নানা লতা-মগুন বা  
পাড়। তৃতীয়—গাছ, ফুল, পাতা ইত্যাদি।  
চতুর্থ—নদ, নদী ও পল্লী-জীবনের দৃশ্য।  
পঞ্চম—পশু-পক্ষী মাছ ও নানা জন্তু।  
ষষ্ঠ—চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র। সপ্তম—আভরণ  
ও নানা আসবাব। অষ্টম—পিড়ি-চিত্র।

আল্পনার শিল্প হচ্ছে সমতল-ভিত্তিকে  
চিত্রণ, এবং বা আঁকছি তার পরিষ্কার  
চেহারাটি দেওয়া। হাতা হাতার মতো না হয়ে  
হাতের মতো হলে চলেনা—ব্রতের কাজে।  
একটা জিনিষের ঠিক চেহারাটি প্রচার টানে  
আঁকা যে কতখানি ক্ষমতার কাজ তা  
চিত্রকরমাত্রেই জানেন একজন এমএ  
ক্লাসের ছাত্রকে তার হাতের কলমটা  
আঁকতে বললে সে মাখায় হাত দিয়ে বস—  
কিন্তু তারি হরতো পাঁচবছরের ভগিনী

আল্পনার সব-ক-খানা অনায়াসে একে যাবে  
নিভুল—হাতা, বেড়ি, গহনা, ফুল, পাতা,  
সবই। মাহুঘ আর জানোয়ারের বেলায়  
মেয়েরা একটু গোলে পড়েছে। কিন্তু এ-ছাড়া  
যেখানে কল্লনা-খাটানো চলে এমন-সব বড়-  
বড় আল্পনা এবং নানা লতা ও পাড়ের  
আবিষ্কারে তারা সিদ্ধহস্ত।

সুবচনী-পুজোর আল্পনাটিকে আমরা  
সুবচনী-ব্রতকথার প্রতিকল্প-চিত্র বলে ধরতে  
পারি। রাজার পুকুরে অনেক হাঁস। তার  
সর্দার ছিল এক খোঁড়া হাঁস। এক ব্রাহ্মণ-  
কুমার সেই খোঁড়া-হাঁস ঘেরে খেয়েছিল  
এবং সুবচনীর কুপায় তার মা সেই  
হাঁসকে বাঁচিয়ে তবে রাজার কোপ থেকে  
নিস্তার পেয়েছিল। এই গল্পটাকে দেখাচ্ছে  
এই সুবচনীর আল্পনা। সেকুলার  
আল্পনা, ভাঙ্গলী-ব্রতের নদী ও তালগাছ—  
এ-দুটির মধ্যেই নিছক কামনা জানানোর  
চেয়েও একটু বেশি কাজ মাহুঘে করেছে,—  
কৌচা-হুলিয়ে সুপুরীবাগানে কর্তা ঘুরে  
বেড়াচ্ছেন, জোড়া-বাংলার দরজায় দুই পেপাই  
পাহারা দিচ্ছে। এই সুপুরী-বাগানের কর্তার  
সঙ্গে হাতে-পো কাঁখে-পো মাহুঘের  
প্রতীকটির অনেক তফাত। যদিও খুব  
কাঁচা-হাতের কিন্তু কর্তার ছবিতে বাস্তবিকতা  
অন্তটির চেয়ে ঢের বেশি রয়েছে। এমনি  
নদীর আল্পনা। এখানে প্রাণের মাঝ দিয়ে  
যে-নদীটি বয়ে চলেছে, তার বাস্তবিক  
চেহারাটা দেবার চেষ্টাই নেই; সমস্ত দৃশ্যটি  
একটি স্বন্দর মগুন-নিসেবে চিত্রকারী  
হয়েছেন। এর পর, বাঁশের কোঁড়া—শালের  
মতো। তারপর নানা মন্দিরের

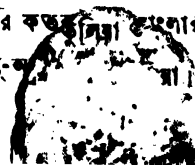


আল্পনাগুলি; এগুলিকে খাটি মণ্ডন-চিত্র বলা যেতে পারে, যদিও এগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার খুব যোগ। কিন্তু তাই বলে এগুলি যেমন-তেমন করে মানুষে আঁকেনি। মন্দিরের কার্কাৰ্খ্য, তার গঠনের তারতম্য, চিত্রকারিণী প্রত্যেকদিন নজর করে দেখে-দেখে তবে মন থেকে এগুলি প্রকাশ করেছেন বেশ বোধ হয়।

পদ্মের আল্পনাগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার খুব কমই যোগ দেখা যায়। ছ-রকমের পদ্ম দেখা যাচ্ছে। প্রথম-শ্রেণীর পদ্মগুলিতে পদ্মের বাস্তব-আকৃতি কতকটা দেওয়া হয়েছে এবং জ্যামিতির ধরগুলিকে পদ্মের আকারে বাঁধা হয়েছে। কোনো-কোনো জায়গায় পদ্মের সঙ্গে শঙ্খ জুড়ে সেটিকে লক্ষ্মীর আসন বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু অল্প যে-সব অষ্টদল পদ্ম এবং সেই-সব পদ্মকে ঘিরে যে-সব নানা লতামণ্ডন, সেগুলিকে মণ্ডন ছাড়া আর কি বলা যাবে? বারো-রকম লতায় ঘিরে আল্পনা বিবাহের সময় বরের বাড়ির উঠানে লেখা হয়। কল্পার বাড়ীতেও এই রকম একটি বো-ছত্র দেবার নিয়ম। এগুলো ব্রতী বা ব্রতের নয়। বোধাই অঞ্চলে অতিথির সম্মানের জন্তে ভোজনের জায়গাটি রজোলী (আল্পনা) দিয়ে সজ্জা করে দেওয়া প্রথা। উৎসবের দিনে বিশেষ-ব্যক্তির সম্মানের জন্তে যে সাজানো-গোছানো করতে হয়, এই আল্পনাগুলিকে সেই কোঠায় কেলাই ঠিক। বোধায়ের অতিথি-অভ্যর্থনার জন্তে যে-আল্পনা তারি কতকগুলি প্রান্তরূপ হচ্ছে আমাদের নববধূ-কালীর আল্পনা ছাড়া, কি মাজাজে, কি কোথাও এত সজ্জা এই ধরনের

পান-সুপারী-লেখা আল্পনাটি। এই ধরনের আল্পনাগুলির সঙ্গে মনের নানা ভাবের যোগ থাকলেও এগুলি ব্রতীর কামনা জানাচ্ছেনা। লক্ষ্মীর আসনে শঙ্খ, ইন্দ্রের আসনে বজ্র, আবার অন্নপ্রাশনের পিঁড়িতে নানা ব্যক্তির বাটি আর বর-কণের পিঁড়িতে ‘একবৃন্তে দুই ফুল’—এগুলো প্রধানত জানাচ্ছে আসনের পার্থক্য;—এটি দেবীর, এটি দেবতার, এটি নবকুমারের, এটি বরবধুর। এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্রটি-অমুসারে এই-সব আল্পনায় অদল-বদল হয়। যেমন, বিয়ের পিঁড়িতে পদ্ম ও ভ্রমর ইত্যাদিও চলে; এবং এই অদল-বদলে বিবাহাদি ক্রিয়ার অমুষ্ঠানে কোনো ব্যাঘাত হয় না। এমন কি, পিঁড়িতে ধানিক পিটুলী-গোলা মাথিয়েও কাজ চলে। কিন্তু ব্রতের আল্পনা ব্রতীর কামনার পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি না হলে ব্রত করা অসম্ভব। প্রথমে কামনা মনে উঠলো, তারপর সেটা আল্পনায় অথবা পিটুলি দিয়ে চিত্রিত গঠিত এবং সজ্জিত হল, শেষে ছড়ার মধ্য দিয়ে সেটা ব্যক্ত হল। আগে কামনা, তারপর আল্পনা, তারপর ছড়া; শেষে ব্রতের কথা বা ইতিহাস—এই কটা মিলে ব্রত পূর্ণতা পেল।

মেয়েলী ব্রতের কথাগুলি কেমন সেটা দেখবার পূর্বে আল্পনার শঙ্খলতা-মণ্ডনটির বিষয়ে একটু বিচার করে দেখা প্রয়োজন। আল্পনার সমস্ত লতামণ্ডনগুলিতে একটা বিশেষত্ব দেখা যায় এই যে সেগুলি মেয়েরা নিজে-থেকেই আবিষ্কার করেছে, এবং এক



লতামগুন দেখিনি। মাস্তাজের দড়ির কাঁস এবং বিন্দুই আল্পনা-চিত্রের ভিত্তি। কিন্তু বাংলার মেয়েরা প্রকৃতির মধ্যে যে-সব পাতা-লতা, তাকেই ভিত্তি করে আল্পনার কলালতা, কলমৌলতা, খুস্তিলতা, চালতালতা, চাপালতা, শঙ্খলতা সৃষ্টি করেছে দেখি। শঙ্খের ঘোর-পেঁচগুলি প্রাচীন গ্রীস ও ক্রীটদেশের একটি প্রধান মগুন। কিন্তু এই বাংলাদেশের শঙ্খলতার শঙ্খের স্বরূপটি যেমন সুস্পষ্ট এমন আর কোনো দেশেই নয়। এই শঙ্খলতার ঘোরপেঁচ শঙ্খ থেকে কি জলের আবর্ত থেকে সেটা ইউরোপের মগুনগুলি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় না এবং এ নিয়ে সেখানকার পণ্ডিতে-পণ্ডিতে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলেছিল। কোনো পণ্ডিতে বলেন এই লতামগুন প্রথম ইজিপ্তে; কেউ বলেন ক্রীটদেশে; আবার কেউ বলেন ইউরোপ-খণ্ডে গ্রীসদেশেই এর প্রথম উৎপত্তি। কিন্তু কোথাও বাংলার মতো শঙ্খলতার নিখুঁত চেহারাটি আমরা পাইনে। ক্রীট, ইজিপ্ত এবং গ্রীস—সব থেকে দূরে এই বাংলাদেশ, এবং ঐ-সব প্রাচীন সভ্যতা থেকে কতদূরে এখনো রয়েছে বাংলার এককোণ বশোর। সেখানকার মেয়েদের হাতের এই শঙ্খলতাটি! এই লতামগুন যে খুবই প্রাচীন, আধুনিক কোনো-কিছু থেকে নকল নয়, তা নিশ্চয়ই বলা যায়। বাঙালীর মেয়ের সব-চেয়ে পুরোনো এবং সব-চেয়ে সুন্দর ও যত্নের অলঙ্কার শাঁখ। শাঁখ-লতায় চিহ্ন এবং কড়ি ছিল এককালে এ-দেশের পরম। কাজেই শাঁখ এবং তা-থেকে শঙ্খলতা আবিষ্কার এ-দেশে কেউ করেন খুবই প্রাচীন কালে হবেনা,

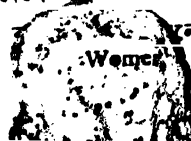
তাছাড়া বাঙালী-জাতিও বড় কম-দিনের নয়। ইজিপ্তের রাণীরা এবং গ্রীসের সুন্দরীরা ঢাকার মসলিন পরতেন যখন, তখন যে বাংলাদেশ ও বাঙালী বস্তুমান ছিল অন্তত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না; এবং পূর্বকালের কোনো ঢাকাই-সাড়ির পাড়ে লুকিয়ে এই শঙ্খলতা গ্রীসে ও ইজিপ্তে চালান যায়নি, তাইবা কে বলতে পারে? একই চিন্তা, একই শিল্প, একই মগুন পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে—এটা মানুষের ইতিহাসের একটা সাধারণ ঘটনা; কাজেই এ-বিষয় নিয়ে তর্ক চলেইনা।

বাংলার ব্রতগুলির মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব শিল্প-সাহিত্য ধর্ম-কর্ম সবই এক-দোলায় অনেকগুলি ছেলের মতো গলাগলি করে রয়েছে দেখাছি। এখন ব্রতের সব-শেষের অংশ যে ব্রত-কথা তারি দু-একটি নমুনা কেমন দেখবো।

#### ব্রতকথা

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি পুরাণ-কালে যেখানে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার কথাগুলিকে ঠিক বাংলার ব্রতকথা বলে ধরা কিছুতে চলে না; শুধু তাই নয় কথা-সাহিত্য হিসেবেও সেগুলির মূল্য বেশী নয়। একটি নমুনা দিই :—

নৃসিংহ-চতুর্দশী ব্রতকথা—“প্রহ্লাদ অনাস্তরে সুরাপায়ী অতি-কদাচার এক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সর্বদা নর্তকী ও বেস্তা-ভবনে দিনযাপন করিতেন। দৈবযোগে নৃসিংহ-চতুর্দশীর দিনে ঐ বেস্তার সহিত সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রের কলহ হয় এবং কলহ করিয়া কেন খুবই প্রাচীন কালে হবেনা, তখনই সেইদিন রাত্রি অনাহারে আগরণে”





অতিবাহিত করে। অজ্ঞানতঃ তাহাদের উক্তপ্রকারে নৃসিংহ-ব্রতের ফললাভ হয় ও সেই ফলে ব্রাহ্মণপুত্র পরজন্মে প্রহ্লাদ এবং সেই বেষ্টা স্বর্গের অপ্সরা হয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার জন্ত এই ব্রত করিয়াছিলেন, মহাদেব ত্রিপুরা-বধের জন্ত এই ব্রত করিয়া ছিলেন, বহুতর ঋষি অনেক রাজা এই ব্রত করিয়া স্বপ্ন অতিষ্ঠ সাধন করিয়াছিলেন। ব্রতের ফল কোটীকল্প বিম্বলোকবাস, পুত্র-হীনের পুত্র, ধনধান্য, সার্বভৌম সুখ, অধিক কি বলিব ব্রহ্মাও চারিসুখে নৃসিংহ-ব্রতের ফলের কথা বলিয়া উঠিতে পারেন না।”

এটা থেকে হয়তো প্রহ্লাদচরিত্র-উপাখ্যান খুব বড়-করে লেখা যেতে পারে, কিন্তু এখন এটি যা, তা পেটেন্ট-ওষুধের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এইবার খাঁটি মেয়েলী-ব্রতের কথাটিকে মন দেখা যাক। মেয়েলী ব্রতকথা যতগুলি বাংলার ছাপা হয়েছে, তার প্রায় সব কথাই সংগ্রহকারেরা মেয়েলীভাষাকে কোথাও নিজেরা, বেশিও-বা বড়-বড় সাহিত্যিকের সাহায্যে সাধুভাষার রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেছেন। একমাত্র ত্রিদিবঙ্গীয়ারজন মিত্র-মজুমদার-মহাশয় তাঁর ব্রতকথার কথাগুলির স্বরূপ অনেকটা বজায় রেখেছেন, যেমন—

ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রতকথা—“এক সওদাগরের দুই কন্যা। একজনে ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত করত, একজনে অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত করত —(বলা যেতে পারে ভুবন-চতুর্থী আর ভূষণ-চতুর্থী) যে অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত করত তার নাম কাঁকন। আর যে ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত করত তার নাম মাখন।

চতুর্থীর ব্রত করে কাঁকনের গায়ে অলঙ্কার ধরে না, ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত করে মাখন কিছুই পায় না।” এর পরে কাঁকন পড়ল রাজার ঘরে, মাখনের বিয়ের হল রাখালের ঘরে। “মাখন রাখালের ঘরে গিয়ে, খুব পান্ন কুড়া পান্ন, ফুলজল দিয়ে কচি কাঁটালের পাতা দিয়ে ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত করেন। দেখতে দেখতে রাখালের ঘর ধানে-কলায়ে ভরে উঠলো। এদিকে পক্ষীর ডাক, ওদিকে গাই-বাছুরের হামা, এদিকে ধানের গোলা, ওদিকে কলারের ধামা, মিষ্টি গাছের ফল, নদীর জল,—যাকে যা দেবার দেন্-খোন্ জ্যাং-গোষ্টি নিয়ে থাকেন.....ওদিকে কাঁকনের রাজার রাজ্যে যত জিনিষ ছিল অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত করে সব অলঙ্কার হয়ে উঠলো। রাজার রাজ্যে অলঙ্কার, সিঁফাই লঙ্করের চাল-তরোরালে অলঙ্কার, হেলে চাষার হাল লাঙ্গলে অলঙ্কার, কামারের হাতুরে অলঙ্কার, কুমারের চাকে অলঙ্কার, জেলের জালে অলঙ্কার, তাঁতি নাপিত খোঁবা যার যা-কিছু সব তা’তে অলঙ্কার! কেউ কোন কাজ করে না, যে করতে যায় করতে পারে না! হাড়ি-পাতিলে অলঙ্কার, আখার অলঙ্কার, কাট-কুঁদায় অলঙ্কার, কেমন করে পাক করবে? চালে অলঙ্কার রাখতে পারে না, ফল-ফুলে অলঙ্কার, তরিতরকারিতে অলঙ্কার। সকলে অলঙ্কার নিয়ে বসে থাকে খেতে পায় না কেঁদে মরে। না, শেষে রাজার রাজ্যে হাহাকার উঠলো—হাল কৃষি হয় না, কিনতে গেলে কেউ বেচেনা, বেচতে গেলে কেউ কেনে না—কে বেচবে কে কিনবে? কতে যায় তা’ও অলঙ্কার—” রাজা সন্ধান

পেলেন—রাণী দেশসুখ লোককে অলঙ্কার-  
চতুর্থা করিয়ে এই বিপদ ঘটিয়ে বসেছেন।  
রাণীকে বলে তিনি বলেন—এর উপায়  
আমার সেই রাখাল-বৌ ছোট বোন যদি  
করতে পারে। রাজ্যসুখ গিয়ে রাখাল-বোয়ের  
শরণাপন্ন হল, সেদিন রাখাল-বৌ মাখনের  
ভূবন-চতুর্থা ব্রতের প্রতিষ্ঠার সময়। রাজা-  
রাণীর কথায় মাখন বলেন—“কি বা বলি ?  
—সোণা-পিতলের অলঙ্কার, খাওয়া না, দাঁওয়া  
না, বোন বা তা’র ব্রত করলেন কেন ?  
সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকেন, ষা দিবে মাটির প্রদীপ  
জালবেন, হাল চলবে, গাই খলবে, লক্ষ্মীর

হাতের ক্ষীর-অলঙ্কার কেত-ভরে ফুটে উঠবে,  
বোন, সেই ব্রত করুন।”

—‘সরাটোপা কাঁটালের পাত  
ব্রত করলে ঘরের ভাত।’

রাণী কাঁকন তখনি ভূবন-চতুর্থা ব্রত  
করলেন। অমনি রাজ্যের অলঙ্কার খসে  
পড়ল।—“যেমন ছিল তেমন চাকের মত  
চাক বাজে, হালের মত হাল চলে, মাটির  
গারে ফুল ফুটে, কুমারের চাকে হাঁড়ি,  
জেলের জালে কই-কাংলা।” সকলে নিশ্বাস  
ছেড়ে বলে—আঃ বাঁচলাম !

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## স্বরলিপি

মিশ্র—খেমটা।

সমর-সঙ্গীত

কে উহারা নবীন সৈনিক ?

বুদ্ধিতে উজ্জল, তেজোদৃগ্ধবল, সাহসী নির্ভীক ?

(কোরাস্)

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই বন্ধ-পদাতিক !

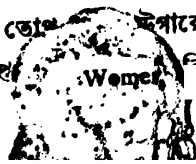
বল, জয় জয় জয় জয় জয়,

বাহাদুরী সৈনিক, বাহাদুরী সৈনিক, ওরা বাহাদুরী সৈনিক

(১) বিশ্বভালে প্রলয়-অগ্নি জ্বলিছে ধক্ ধক্ !

শোণিতভূক্ত রূপাণ মুক্ত চমকে লক্ লক্ !

বজ্রবলে কামান তোপে ইগারে ভীষণ কোণ

কল্পিত করি সপ্ত  দিক্ ।

জার্মান সেনে করিছে যুদ্ধ করাসী ব্রিটানিক্ ;  
 মার্কিন গ্রীক্, বেলজিন্ ইতালীক্, মারাঠা গুর্খা শিখ ।  
 তার মাঝে কে উহার নবীন সৈনিক ?  
 সমর-রঙ্গে, মত্ত মনে, সাহসী নির্ভীক ?

( কোরাস্ )

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই বঙ্গ-পদাতিক !  
 বল, জয় জয় জয় জয় জয়,—  
 বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক ।

(২) ধরণী বংশ হইল ধ্বংস রক্ষা নাহি নাহি !  
 সুরাসুর নর অঙ্গুর কিম্বর করিছে জাহি জাহি !  
 রক্ত-তুফান সাগরে বয়, শবের তুণ পৃথুমর,  
 প্রোত পিশাচ ভঞ্জে লঞ্জে, তাসিয়া হা হা হা হিক্ !  
 বিকট বিষম দৃষ্ট-নাট্য ভীষণ সঙ্গাসিক !

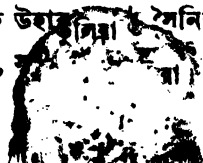
জার্মান সেনে করিছে যুদ্ধ করাসী ব্রিটানিক্ ;  
 মার্কিন গ্রীক্, বেলজিন্ ইতালীক্, মারাঠা গুর্খা শিখ্ !  
 তার মাঝে কে উহার নবীন সৈনিক ?  
 যুঝিছে রণে, হরষ মনে, সাহসী নির্ভীক ?

( কোরাস্ )

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই, বঙ্গ-পদাতিক ।  
 বল, জয় জয় জয় জয় জয়,  
 বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক ।

(৩) সমর-বাণ্ড ভীমনাগে ঘোষণা করিয়া বলে,  
 ধর্মযুদ্ধে হও প্রবুদ্ধ এস এ পতাকা তলে ।  
 বিপুল দক্ষ মহা মহা বীর, বলবান দেহ উন্নতশির  
 ছোট বড় মিলে আসে দলে দলে জাতি বিজাতিক ।

জার্মান সেনে করিছে যুদ্ধ করাসী ব্রিটানিক্ ;  
 মার্কিন গ্রীক্, বেলজিন্ ইতালীক্, মারাঠা গুর্খা শিখ্ ।  
 তার মাঝে কে উহার নবীন সৈনিক ?  
 অগ্রগামী বীর, সাহসী নির্ভীক ?



( কোরাস্ )

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই, বঙ্গ-পরাতিক ।

বল জয় জয় জয় জয় জয়,

বান্ধালী সৈনিক, বান্ধালী সৈনিক, ওরা বান্ধালী সৈনিক !

(৪) আকাশ হঠতে বর্ষা-ধারে হইল পুষ্পবৃষ্টি !

কুদ্র কাণ্ড শ্মিত সাদ্ধ রক্ষা পাইল সৃষ্টি !

উঠিল রব ধনু ধনু, দেবতা মানব সুপ্রসন্ন,

আশীষপূর্ণ মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিছে অনিমিষ—

কে উহারা নবীন সৈনিক ?

অসাধ্য কাজে, অগ্রে সাজে, অসম সাহসিক ?

( কোরাস্ ).

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই, বঙ্গ-পরাতিক ।

বল, জয় জয় জয় জয় জয় !

বান্ধালী সৈনিক, বান্ধালী সৈনিক, ওরা বান্ধালী সৈনিক ।

কথা—ঈশ্বরী স্বর্ণকুমারী দেবী । সুর—শ্রীযুক্ত প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় ।

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ।

II গা - গা । গা - - I রা - - - - - I রা রা - গা ।  
কে . উ হা . . রা . . . . . ন বী .

। সা - না সা I রা - - - - - I গা - খা । পা - কা ।  
ন . সৈ নিক্ . . . . . বু . দ্বি তে . উ

I গা - - - - - I সা - গা । রা - না I সা - - - - -  
অবল . . . . . তে . জো দ্ . গু বল . .

। - - - I না - না - না I পা - - - - -  
. . . সা . . . . . নি ভীক . .



## ( কোরাস্ )

I -। রা রা I রা রা গা। ক্ষা পা পা I পা না ধা।  
 ০ ও রা আ মা দে র্ ছে লে আ মা দে

I গ্গা পা -। I পা -। পা। না -ধা না I সী -। -। -। সী সী।  
 র্ ভাই ০ ব ০ জ প ০ দা তিক্ ০ ০ ০ ব ল

I গী গী রী। রী সী সী I নধা না সী। -। -। -। I  
 জ য জ য জ য জ য জ য় ০ ০

I না না -।। সী -। না I পা -। -। -। -। -। -। I  
 বা জা ০ লী ০ সৈ নিক্ ০ ০ ০ ০ ০

I ক্ষা ক্ষা -।। পা -। ক্ষা I রা -। -। -। রা রা I  
 বা জা ০ লী ০ সৈ নিক্ ০ ০ ০ ও রা

I রা -। -।। গা -। -। I ক্ষা -। -।। গ্গা -। -। I পা -। -।।  
 বা ০ ০ জা ০ ০ লী ০ ০ সৈ ০ ০ নিক্ ০ ০

এই কোরাস্ সর্বজ এক সুর

-। -। -। II  
 । ০ ০ ০

II সরা -গা রা। পা পা -। I গা রা গা। রা -। সা I  
 (১) বি ০ ০ শ ভা ০ লে প্র ল য় অ ০ য়ি  
 (২) ধ ০ র গী বং ০ শ হ ই ল ধ্বং ০ স  
 (৩) স ম র বা ০ দ্য ভী ০ ম না ০ দে  
 (৪) আ কাশ্ ০ হ ই তে ব ০ ধী ধা ০ রে

I সা ধা সা। গা -। -। I সা -। -। -। -। -। I  
 (১) জ লি ছে ধক্ ০ ০ ধক্ ০ ০ ০ ০ ০  
 (২) র ০ ক্ষা না ০ হি না  
 (৩) ঘো ষ গা ক রি ষা ব ০ লে ০ ০  
 (৪) হ ই ল পু ষি ০ ০

I	পা	পধনা	না	ধা	না	পা	I	জা	ধা	পা	জা	না	রা	I
(১)	শো	নি	ত	ভু	০	কু	কু	পা	৭	মু	০	কু		
(২)	সু	রা	সু	এ	ন	র	অ	পস	র	কি	ম	র		
(৩)	ধ	০	ম্ম	যু	০	কে	ই	ও	প্র	বু	০	ক		
(৪)	রু	০	জ	কা	০	গু	শ	মি	ত	সা	০	জ		

I	গা	জা	পা	না	না	না	I	পা	না	না	না	না	না	I
(১)	চ	ম	কে	লক্	০	০	লক্	০	০	০	০	০	০	
(২)	ক	রি	চে	ত্রা	০	হি	ত্রা	০	০	হি	০	০	০	
(৩)	এ			প	তা	কা	ত	০	০	লে	০	০	০	
(৪)	র		জা	পা	ই	ল	স্ব	০	০	ষ্টি	০	০	০	

I	সাঁ	না	সাঁ	না	না	I	ধা	ধা	ধা	পা	জা	পা	I
(১)	বি		ধ	ভা	০	লে	প্র	ল	য়	অ	০	গ্নি	
(২)	ধ	র	গী	বং	০	শ	০	ই	ল	ধ্বং	০	স	
(৩)	স	ম	র	বা	০		ভী	০	ম	না	০	দে	
(৪)	আ	কাশ	০	হ	ই	তে	ব	০	ধা	ধা	০	রে	

	রা	গা	রা	গমা	রা	না	I	সনা	না	রা	সা	না	না	I
(১)	জ	লি	ছে	ধক্	০	০	ধক্				০	০	০	
(২)	র	০	জা	না	০	হি	না				তি	০	০	
(৩)	ঘো	ষ	গা	ক	রি	য়া	ব				লে	০	০	
(৪)	হ	ই	ল	পু		প্প					ষ্টি	০	০	

	পা	না	পা	সাঁ	না	সাঁ	I	রা	সাঁ	সাঁ	সাঁ	না	না	I
(১)	ব	০	জ	ব	০	লে	কা	মা	ন	তোপ্	০	০	০	
(২)	র	০	কু	তু	ফা	ন	সা	গ	রে	বয়্	০	০	০	
(৩)	বি	পু	ল	দ	০		ম	হা	ম	হা	বীর	০	০	
(৪)	উ	ঠি	ল	স			ধ	০	হা	ধ	০	০	০	



I    সর্গা    রা    গা ।    গা    পা    পা    I    গা    র্গা    রা ।    সর্গা    -।    -।    I  
 (১)    গ    র    জি    উ    গা    রে    ভী    ষ    ণ    কোপ্    ০    ০  
 (২)    শ    বে    র    স্তূপ্    ০    ০    প্    ০    থা    ময়্    ০    ০  
 (৩)    ব    ল    বান্    ০    দে    হ    উ    ০    ম    ত    শির্    ০  
 (৪)    দে    ব    তা    মা    ন    ব    স্ত    ০    প্র    স    ০    ম

সর্গা -গা    রা ।    রা    সর্গা    সর্গা    I    না -রা    সর্গা ।    পা    -।    -।    I  
 (১)    ক    ০    স্পি    ত    ক    রি    স    ০    গু    লোক্    ০    ০  
 (২)    র    ০    ক্ত    পি    শা    চ    ভ    ০    ক্ষে    ল    ০    ক্ষে  
 (৩)    ছো    ট    ব    ড়    মি    লে    আ    সে    দ    লে    দ    গে  
 (৪)    আ    শী    ষ    প্    ০    ণ    মু    ০    ঞ্    দ্    ০    ষ্টি

I    ধা    -।    ধা ।    -।    ধা    পা    I    সর্গা    -।    -।    -।    -।    -।    I  
 (১)    ছার্    ০    ধার্    ০    ক    রি    দিক্    ০    ০    ০    ০    ০  
 (২)    হা    সি    যা    হা    হা    হা    হিক্    ০    ০    ০    ০    ০  
 (৩)    জা    ০    তি    বি    ০    জা    তিক্    ০    ০    ০    ০    ০  
 (৪)    দে    খি    ছে    অ    ০    নি    মিখ্

I    সর্গা    সর্গা    সর্গা ।    না    -।    না    I    ধা    -।    ধা ।    পা    -।    পা I  
 (২)    বি    ক    ট    বি    ষ    ম    দ্    ০    শ্চ    না    ০    টা

I    গা    গা    গা ।    রা    -।    রা    I    সা    -।    -।    -।    -।    -।    I  
 (২)    ভী    ষ    ণ    স    ০    স্তা    সিক্    ০    ০    ০    ০    ০

• I    পধা    না    না ।    না    ধা    ধা    I    পী    জা    পা ।    জা    -।    রা I  
 (১),(২),(৩),(৪)    জা    ০    ঞ্চা    ন    স    নে    ক    রি    ছে    যু    ০    ক

I    রা    গা    ধা ।    ধা    -।    জা    I    পা    -।    -।    -।    -।    -।    I  
 ক    রা    সী    ত্রি    ০    গিয়া



১. —  
I না — — । সী — না I পা — — । — — — I জা — জা  
মা . . কি . ন গ্রীক . . . . . বেল . ঙ্গিন্

। পা — জা I রা — — । — — — I রা গা জা । জা গা জা I  
ই . তা লিক . . . . . মা রা ঠা গু . থা

I পা — — । — — — I গা — — । গা — গা I গা — গা ।  
শিখ . . . . . তার . . . মা . বে কে . উ

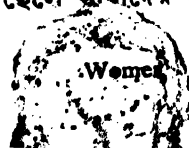
। গা — — I রা — — । — — — I রা রা গা । সা না সা I  
হা . . রা . . . . . ন বী . ন . সৈ

I রা — — । — — — I গা — ধা । পা — জা I গা — — ।  
নিক . . . . . (১) স . ম র . র স্রে . .  
(২) যু . ণক চে . র গে . .  
(৩) অ . গ্র গা . মী বীর . .  
(৪) অ সা . ধা . কা জে . .

। — — — I সী — গী । রা — সনা I সী — — । — — — I  
(১) . . . ম . . . . . স্রে . . . . .  
(২) . . . হ . র য . ম নে . . . . .  
(৩) . . . স . . . . . টে স্থির . . . . .  
(৪) . . . অ . . . . . সা জে . . . . .

I না — না । সী — না I পা — — II  
(১),(২),(৩) সা . হ . সী . নি ভীক . .  
(৪) অ স ম সা . হ সিক . .

(কোরাস্) ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই বন্ধ-পদাভিক ইত্যাদি।





## ডাক-পিস্নন

( গল্প )

আমাদের পাড়ায় চিঠি বিলি করিত সুন্দররাম। জাতিতে সে হিন্দুস্থানী কাহার। পশ্চিমের এক পল্লীতে তাহার বাড়ী; সেখানে আপনার-জনদের ফেলিয়া পেটের দারে সে কলিকাতায় আসিয়াছিল চাকরি করিতে। বৎসরান্তে ‘পূজা’র কিছুদিন পূর্বে ছুটি-লইয়া সে একবার বাড়ী বাইত।

আমার ও আমার প্রতিবেশীদের কাছে তাহার পাওনা ছিল, বৎসরে দুইবার :— দোলের পরে ও পূজার কিছুদিন পূর্বে। তাহার এই পাওনা দাবী করার মধ্যে একটু মজার কথা আছে।

আমার সমান কথা আমার চেয়ে বড়-দের লোকের কাছে সে যে-জায়গায় আট-আনা পাইবার আশা করিত, আমার কাছে সেখানে, কি জানি কেন, সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল চার টাকার কম কিছুতেই লইবে না। কিন্তু আমি যে কি দিতাম, সে-কথা বলিতে আমার এখন লজ্জা করে।

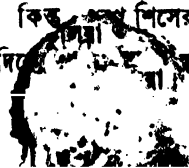
সে আশা করিত, উপেনবাবু তাকে অন্তত চারিটি টাকা দিবে, কিন্তু যথাসময়ে সেই চারি-টাকার চেয়ে ঢের কম যখন তার হাতে পড়িত তখন সে যে খুব নিরাশ হইয়াছে এমন বোধ হইত না। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতাম, সে মনে করিতেছে, এখন বাবু দিতে পারিল না বটে কিন্তু আগামী বারে নিশ্চয় পোষাইয়া দিবে।

—অথচ আমি তাহাকে ভবিষ্যতের কোনো আশাসই দিতাম না। এবারেও যেমন, আর-বারও তাহার ভাগ্যে সেই একটি-সিকির বেশী কখনো জুটিত না। তব্রাচ আমার প্রতি তাহার আশা শেষপর্যন্ত সমান বজায় রাখিয়াছিল।

সে-বছর পূজার মাস-তিন পূর্বে একটা বড় মকদ্দমা জিতিয়া আমার বেশ মোটা লাভ হইয়া গেল।

অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে হাতে পাইয়া মনে করিলাম প্রতি-বৎসর মনের মধ্যে যে-সব অতৃপ্ত বাগনাগুলো জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া থাকে, এবার এই পূজার সময় তাহার কতক পূর্ণ করিয়া লইব। মনের নোট-বুকে তারই একটা ফর্দ লিখিতে বসিয়া গেলাম।

রাত্তার ধারের বারান্দায় বসিয়া আছি—এমন সময় সুন্দররাম বরাবর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া আমার হাতে এক-খানি পত্র দিল। তারপর আমার মুখ-পানে চাহিয়া বলিল—“পূজার এখোনো কোতো দিন দেবী আছে বাবু?” আমি বলিলাম,—“এখনও এক মাসেরও বেশী।” সে বলিল—“এখোনো এতো দেবী!” বলিয়া সে আপন-কাজে চলিয়া গেল। পূজার কথা তুলিতেই আমার মনে পড়িয়া গেল তার



সে-কিটো বিনি সংশোধন করিয়া লইলাম। একটু মোটা-রকমের অঙ্কই ফেলিলাম;—আহা বেচারী, অনেকদিন হইতে আশা করিয়া আছে! এবারে তাহাকে খুসি করিবই।

দেখিতে-দেখিতে কুড়ি দিন কাটিয়া গেল। পূজার বাজারে, মনের নোট বুকের সেই ফর্দের মতো খরচ করিতে লাগিলাম। প্রায় সবই সমাধা হইল; এখন বাকি কেবল সুন্দররামের দাবী। কিন্তু কোথায় সুন্দর-রাম? চুপিচুপি চিঠি বিলি করিয়া সে সরিয়া পড়ে;—আমার সঙ্গে কৈ দেখা করেনা ত! তাবিলাম—এখনো পূজার কিছু বিলম্ব আছে, তাই বোধ হয় তার ভেতর তাড়া পড়ে নাই।

পূজা আরো নিকট হইয়া আসিল; অল্পবৎসর এর অনেক আগে সে পাওনা চুকাইয়া লইয়া যায়, কিন্তু এ-বৎসর তাহার কি হইল বুঝিতে পারিলাম না। মনে-মনে একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। প্রতি-মুহুর্তেই মনে হইতেছিল সে এখনই আসিয়া হাত-পাতিয়া দাঁড়াইবে কিন্তু কৈ, শেষ-মুহুর্ত পৰ্যন্ত সে বখশিশ চাহিতে আসিল না।—কেন? তবে কি সে রাগ করিয়াছে? না, অভিমান?

বড়ী দিন পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখি—সুন্দররাম পাশের বাড়ীতে চিঠি বিলি করিয়া বাহির হইতেছে। আমার চোখে চোখ পড়িতেই সে ষ্টেন মুখটা ঘুরাইয়া লইল। আমি হাসিলাম—বুড়ার অভিমান বড়ই বেশী দেখিতেছি! মনে হইল ডাকিয়া উহার হাতে একখানা নোট শুদ্ধিরা দি। আহা, বেচারী!

একটু পরেই সুন্দররাম ঘুরিয়া আসিয়া এসে কুলচুক না করনা।

আমার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে এক-খানি চিঠি দিল, কোনো কথা না বলিয়াই ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া আমার এই আনন্দ হইতেছিল যে এখনই সে বখশিসের কথাটা পাড়িবে, কিন্তু তাহাকে গৌ-ভরে চলিয়া বাইতে দেখিয়া আমার তারি রাগ হইল। ইস্—বেটা যেন নবাব! নিবি ত ভিক্ষা, এত দোমাক কেন তবে! আমি আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না। চিঠিখানা খুলিতে গিয়া দেখি ব্যাটা ভুল করিয়াছে। চিঠি আমার নয়।

সেইদিন বৈকালে বাড়ীর বাহির হইতেছি, এমন সময় দেখি, সুন্দররাম আর-একজন পিরনের সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে চলিয়াছে। আমি তাহাকে ডাকিয়া সকালবেলাকার চিঠিখানা কেবল দিয়া ধম্কাইয়া বলিলাম,—“তুহ কার চিঠি কাকে দিস? এ আমার নয়!”

সুন্দররাম অস্তমনস্কে আমার হাত হইতে চিঠিখানা লইল। দেখিলাম তাহার চলা-ফেরা ধরণ-ধারণ সমস্তই একটা অস্তমনস্কতার আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এমন কি, যে বখশিসের অল্প অল্প-বৎসর এ-সময় তাহার সমস্ত মন ব্যস্ত হইয়া থাকে, এখন তার কথা যেন তার মনের দ্বিসীমানার মধ্যে নাই। ব্যাপার কি, আমি অবাক হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় সেই পিরনটু বলিয়া উঠিল—“ইয়ে দেখো!—ইস্ লিরে মাষ্টার না উস্রোজ তোমরা ঘো রুপেরা ফাইন কিয়া থা।” বলিয়া সে আরও গভীর ভাবে হইয়া বলিয়া উঠিল,—“গবরবিক্তিকা



সুন্দর সে-উপদেশ কানে তুলিল বলিয়া  
মনে হইল না; সে চিঠিখানা ব্যাগে পুরিয়া  
অন্তমনস্কে চলিয়া গেল। আমার ইচ্ছা  
হইতেছিল তাহাকে ডাকি কিন্তু সে তার  
অবসর দিল না।

বিজয়া দশমী। পূজার আনন্দ-অসানের  
সঙ্গেসঙ্গে সুন্দররামের কথাটা কেবলই মনের  
মন্যে তোলাপাড়া হইতেছিল। আর সে-  
দিনকার তার সেই অন্তমনস্ক মুখ আমি  
ভুলিতে পারিতেছিলাম না। কি জানি কেন,  
তার উপর আমার আর রাগ ছিল না।  
মনে কেবলই ক্ষোভ হইতেছিল বেচারাকে  
ডাকিয়া টাকা-কয়টা দিলাম না কেন?  
সে বোধ হয় কাজে কিছু ভুলচুক করিয়া  
বিপদে পড়িয়াছে, তাই বখশিসের দিকে  
তার খেয়াল নাই,—আমার উপর রাগও  
নয়, অভিমানও নয়।

সুন্দররামের নামে তুলিয়া-রাখা টাকা কয়টা  
লইয়া আমি ভারি অস্বস্তি বোধ করিতে-  
ছিলাম। আমার মনের সাধ এ-সৎসর মোটা-  
মুঁ মিটিয়াছে—কেবল এইটাই যে বাকি!  
দান করিবার জন্ত মাহুকের মন যে এতটা  
উত্তলা হইতে পারে, পূর্বে জানিতাম না;—  
আর নিজে অনুভব না করিলে বোধ হয়  
এ-কথা কেহ তামা-তুলসী-গজাঙ্গল ছুঁইয়া  
বলিলেও বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

একটা অস্বস্তির বোঝা বৃকে লইয়া আমি  
সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।  
বিসর্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে-  
সঙ্গে সুন্দররামের মূর্তি পথের উপর দেখা  
দিল। আমি একটা শাস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া  
ডাকিলাম,—“ওরে সুন্দর, উপরে আর

সে শাস্ত বাজকটির মত ~~বাসি~~-ধীরে  
আমার হৃদয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি একটু অভিমানের স্বরে বলিলাম—  
“তা বেশ ‘ক’রেচিস্ সুন্দর,—আমার কাছে  
পাওনাটা বৃঝি ছেড়ে দিয়েছিস্?—তা’ বেশ,  
বেশ,—কোথায় পাব বল—গরীব মাহুঘ  
আমি—”

শুনিতে-শুনিতে সে কেমন বিবর্ণ হইয়া  
গেল; আমার দিকে খানিকক্ষণ ক্যাল-ক্যাল  
করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে কাঁদো-  
কাঁদো স্বরে বলিল—“আপুনির কাছে কি  
হামার পাওনা হামি ইচ্ছে করিয়ে ছোড়েছি  
বাবু—জগবান্ ছোড়িয়ে দিয়েছে হুজুর—”  
কথাটা শেষ না করিয়াই সে বসিয়া পড়িল।  
তারপর একটু সামলাইয়া, পকেট হইতে  
একখামি হিন্দুস্থানী-ভাষায় লেখা ছেঁড়া  
চিঠি বাহির করিয়া বলিল—“এই দেখুন  
বাবু, আর হামার টাকার কি দোরাকার  
আছে—!”

আমার বুকটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল।  
প্রশ্ন করিয়া কেলিলাম—“ভাল বুঝলুম না  
সুন্দর—কি হয়েছে তোর?”

সে বলিল,—“বাবু মুল্লক্কে হামার জর  
আছে। একটা সাত ব’ছরের লেড়কীও  
ছিল—বছর-বছর তা’রই জন্তে কেতো  
কি খেলানা-উলানা, কেতো ভাল ভাল  
পোষাক-উষাক্ নিয়ে যেতুম বাবু—”

বুঝিতে পারিলাম। বাধা দিয়া বলিলাম,  
—“থাক সুন্দর, আর তোকে বলতে হ’বে  
না—” আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল;

সামলাইয়া লইলাম

আমার নিবেদন মানিল না

বলিল—“না বাবু, আপুণিকে শুনে তোবে।  
 আপনার বড় দয়া। আমি এমনি আপুণির  
 কাছে আমার বোকসিন্ ছোড়েনি ছজুর ”  
 বলিয়া সে আরও যাহা বলিল, তাহাতে  
 বুঝিলাম যে, তাহাদের বাড়ীর পাশে এক  
 বড়লোকের একটি ছোট্ট মেয়ে আছে,  
 তারই দেখাদেখি সুন্দরের মেয়ে নানা দামী  
 জিনিসের আবদার ধরিত। তার অর্থ সে—  
 আমি বলিলাম, “ও কথা পাক না  
 সুন্দর—”

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুন্দর  
 বলিল—“গেল বারে মেয়ে হায়ার একজোড়া

জরির জুতা মেডেছিল বাবু—দিতে পারিনি।  
 সেই মেয়ে আমার মোরে গেলো—” বলিয়া  
 সে ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় কোথা হইতে আমার ছর  
 বৎসরের মেয়ে আসিয়া ওই হাতে আমার  
 গলা জড়াইয়া ডাকিল—“বাবা—”

সেই শব্দে চোখের জল মুছিয়া সুন্দর  
 তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাড়াইল; আমার মেয়েটির  
 দিকে একবার সববেগে অগ্রসর হইয়া আসিল;  
 তার পর হঠাৎ পিছু হটিয়া ধীরে-ধীরে ঘরের  
 বাহির হইয়া গেল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

## গগন

আরেক জগতে আছি গগনের কাছাকাছি,  
 হ’ল সত্য আশঙ্কা-কল্পনা!

আছে মেহ, নাই শোক, কোথা সে অমর লোক,  
 রে নন্দন আনন্দের কণা?

কপাল হইতে হাত সরাইয়া অকস্মাৎ  
 হেরি তায় রক্ত দরদর—

লুকান’ সজীন কা’র খোঁচা দেয় বার বার,—  
 ঝরে ধারা তপ্ত ঝরঝর।

কোথা রে হুলাল কই, এ-আমি সে-আমি নই,  
 আমা-ছাড়া একা সে কোথায়?

কথা কই স্বপ্ন দেখে’ যেন কত দূর থেকে  
 বাছা এসে শিররে দাঁড়ায়।

চাশা কান্না পড়ে ঝরে’ অশ্রু-লোণা পথ ধরে’,  
 গলে’ যায় একমুষ্টি ছাই,—

এ কি কই, কি কুরাসা কর্তব্যে বাঁধে বাসা,  
 সাধিনার প্রাণে শান্তি নাই।

এ ঘব পছন্দ তোব হ’ল না কি বাছা মোর?  
 নিবে গেলি মাণিক আমার!—

এসেছিল স্বপ্ন দিয়া অফুরন্ত আলো নিয়া  
 চমকিয়া খনির আধার।

আজি যে চুকিতে ঘরে কি-যে বুক চেপে’ ধবে,  
 নিঃস্নানতা ফেলে দীর্ঘশ্বাস,

সাধ-না-মেটার দেশে বৃষ্টি তোর ভালবেসে  
 পূরোপুরি মিটিল না আশ!

আচম্কা থেকে থেকে নাম ধরে’ উঠি ডেকে,  
 কি বলিয়া গেলি ইসারায়?

ছিঁড়ে যদি বাবি হেন’ এত গোরে তবে কেন  
 গিরা দিলি শিরায় শিরায়!

কা’রা যেন আসে সরে’ অশ্রু-কণা বিদ্ধ করে’  
 চোখে পড়ে যুথের ‘আদল’—

নিবস্ত চাঁদের ফালি, গলে’ পড়ে জ্যোৎস্নাকালি  
 প্রহরেরা ছায়ার পাগল।



ভাদ্রে আধ-জাগা ঘুম, বাই তারে দিতে চুম,  
 ভাবি, আছে কোলটিতে শুয়ে,  
 অন্ধকারে রত খুঁজি বিছানা ছাড়িয়া বুঝি  
 অভিমানে ঘুমায় সে ভূঁয়ে।  
 আচম্বিতে মনে হয় চোখ টুটে' জল বয়,  
 সব আছে সেই না কি নাই,  
 লুকোচুরি খেলা দিতে এত বড় পৃথিবীতে  
 লুকাতে কি পেল না রে ঠাই ?

কাঁদে রাতি বাধা-ঝড়ে, তারি কথা মনে পড়ে,  
 সেই কাঁদে হিয়ার মাঝার,  
 স্বপনের আরসীতে যাই তারে পরাশিতে,  
 ছায়া হাতে ঠেকে বায়ে বায়।  
 কাঁদে পেও মোর মত মরমে দারুণ ক্ষত,  
 চায় ছুঁতে আমারি মতন ;  
 হৃৎকনের মাঝখানে কি যে বাধা সেই জানে,  
 রূপ-হারা তার পরশন।

জীবনের বালুঘড়ি ঝিরি-ঝিরি পড়ে ঝরি,  
 কত পল, অল্পপল আছে !  
 আয়ু-বিহগের পাখা কি মোচড়ে রক্ত-মাখা,  
 আঁখিছটা ছেঁচে দিয়ে গেছে !  
 পথের বালকে দেখে' কথা কই শত ডেকে,  
 গগনের মত সে তাকায়,  
 তেমনি মুখের ছাঁদ, অধরে সে চারু কাঁদ,  
 তারি মত হাসিটি বিলার।

মর্ত্য দিবা-স্বপ্নভরা কচি চোখে এত স্বরা  
 • কে পরাল ভোলায় কাজল।  
 নূতন অধর-পুটে নূতন অমৃত লুটে'  
 কোথায় আছিল ওরে বল।  
 তোর সে-চোখের খেলা না হেরিলে ভোর-বেলা  
 আলো যে হ'ত না মোর ঘরে'

তোরি স্নেহেরগুণে মোরে নিরমল রূপ ধরে'  
 নিশিদিন ছিল পুণ্য করে' !

এই যে নিখিল খেলা মিলন-প্রয়াগ-মেলা,  
 খেলা বলে' ভুলেও ভাবিনি—  
 আকুপাকু হ'ল সার যুদ্ধশেষ পুরস্কার,—  
 দংশে আঁখি সাগর-নাগিনী।  
 তিলার্জ আমারে ছেড়ে থাকিতে হইলে যে রে  
 চাহিতিস্ মিনতি-কাতর,  
 এবে না দেখিয়া মোরে 'আছিল্ কেমন করে'  
 রে তরুণ পারুল-কেশর !  
 তুহারি আঁতুল ধরে' আমি যে নতুন করে'  
 শিখেছিছু চলিতে হাঁটিতে,  
 ধূলার আল্পনা-আঁকা পা হু'খানি ছন্দমাখা  
 পারিজাত ছড়াত মাটিতে !  
 তুহারে তুলিয়া পিঠে সরেছি প্রহার মিঠে  
 খুঁসি-ভরা হাতের মুঠায়,  
 বারনা আব'দার ধরে' মেঝের আছাড়ি' পড়ে'  
 দিই নি তো লুটাতে ধূলায়।  
 খেলার পুঁতুল তোর ফেলিছে আঁখির লোর,  
 গুমরিছে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া,—  
 হেরি বাতায়ন খুলি' মুর্ছে বসন্তের তুলি  
 সে জগৎ গিয়াছে উপিয়া।

ওরে বাছ, মোর সাথে না থাকিলে এক পাতে  
 খিদে তোর মিটিত না যে রে,  
 কি ভালই বেসেছিলি! হাসি-খেলা নিরিবিলি  
 ফুরাইল কি গ্রহের কেরে !  
 আল্লাদ-পুতুলি এলি, আদরে-আদরে গেলি  
 দেখারে আসল হাসিরেখা,  
 শেষ আঁখিনীয়ে ভাসি' ফুটল সোনার হাসি,  
 সে হাসি কাঁদার মোরে একা !



কলিয়ার ভাঁজে তাঁজে স্রাবনের ফুলকি-মাঝে  
আমি সেই হাসির কাঙাল !

দরদ-ভুলান' সেই সুধার তুলনা' নেই,  
কোথা গেলে পাব রে নাগাল !

আজিকে ভিতর মোর ছেয়েছে বিধের ঘোর,  
'বাহির' সে মিলাইয়া আছে,  
ওই বাহিরের সাড়া হয়ে' গেছে আমা-ছাড়া  
চোখের জলের ঘসা-কাচে ।

শূন্য এ কায়ার দিন, ভয়ের জোয়ার ক্ষীণ  
থম্‌থমে ক্ষয়ের ভাঁটায়—

উবার অতল-স্পর্শ হারিয়েছে মোর হর্ষ,  
সোনালি বুধুদ টুটে' যায়'।

কৃষ্ণচ্ছায়া বাপ্পে ভরি' আকাশে নিবিড় করি'  
তার-শিশু বলে কি উতলা !

এ বক্ষে দক্ষিণে বামে কি দোলা দিবস-বামে—  
দোলে ছই অয়নের দোলা !

কী বে এবে অমুভবি ভাষাতে সে ব্যথা-ছবি  
ফুটাইতে রাখায় প্রয়াস -

তুনি শুভ-শ্রদ্ধাঝরে কি মহাবেদনা বাজে,  
ভরা চোখে ভরে জলোচ্ছাস !

এ কি রে দম্‌কা হাওয়া পিছনে করিছে ধাওয়া ?  
খুঁপিপাকে ঘোরে সারা মন,—

চক্রবালে তারা ফোটে তেমনি সে জেগে ওঠে,  
মনে-মনে-চেনা সে নয়ন ।

আসিবে আসিবে ফিরে' সে মোর মেহের তীরে  
প্রত্যাত যেমন ফিরে আসে,—

মৃত্যু কি জ্বলায়ে তারে তিলান্ন রাখিতে পারে,  
হেল শক্তি নাহি তার পাশে ।

পাঁজরে পোড়ার দাগ ঢাকা দিয়ে রাত্রি আগু,  
রাত্রি সে ব্যথার রূপান্তর,

পলকে-পলকে-গাঁথা এক বেড়া-জাল পাতা,—  
কি নিশ্চয় মমতার ঘর !

সত্যই কি হ'ল শেষ, মেহের আকুণ রেশ  
তোলে না সুদূর প্রান্তধ্বনি ?

এই আছে, এই নাই, আঁখি পাণটির চাই,  
না হেরি আলোর আগমনী ।

সে যে গেছে এক হয়ে' অনন্ত ধারায় বয়ে'  
জীবনের ফেনবিষে ভাসি'—

ব্যাপি' চিরন্তন-অদ্য অমর-জনম-পদ্ম  
রসে-রাগে ওঠে পরকাশি' ।

পূর্ণিমার কোন্‌ পারে চির-জ্যোৎস্না ডাকে তারে,  
সরে অজগর রাত্রিরূপ,

মৃত্যু সে চুম্বকি-প্রায় ঝিকমিকি' নিবে যায়,  
প্রশ্ন করে নক্ষত্র নিশ্চূপ ।

মহানিশা বাপ্পময়ী ছেয়েছে আমার মহী,  
সঙ্কুচিত ব্যোম চরাচর,

একটি অগুর মাঝে রূপাভীত হয়ে রাজে  
অভীজিৎ তন্ত্রা ও জাগর ।

তিমির-কুহেলি থেকে ফিরে এসেছিল কে কে ?  
জগৎ-ডুবান' ছথামুত

মুখে তার উথলার, পলাতক বেদনার  
কি ধূসর ছায়ায় বিবিত !—

কা'র মৃত্যুজিৎ মেহে ফিরে প্রাণ শবদেহে ?  
কবে তাঁর দেউলে, গগন,

ভোকে বৃকে করে' সেট দেবতার সন্মুখেই  
নভ-শিরে হব নির্বেদন ।

এই মর্গকাতরতা কোথা শেষ হে দেবত  
নিতে বাকি আরো কতখানি !

কি বিচিত্র কল্প তব পূর্ণ কর চিরনব  
মায়-রঙা যবনিকা টানি' ?

অগণিত প্রাণী নিয়ে কি-নিষ্ঠুর দাগা দিয়ে না-না তুমি স্বৈররূপে গলে' পড়' চূপে,  
 একি খেলা খেল' মহেশ্বর ? জলে' ওঠ হুঃখরূপ ধরে'—  
 না যদি স্বজিতে হয় কিবা ক্ষতি ছিল তায়, লীলাময়, এ কি দীক্ষা, মর্যাদাস্তিক কি পরীক্ষা,  
 —অপার যে ব্যথার গহর ! কি, বহুস্ত জন্ম জন্মান্তরে !  
 যদি এ রাতের বাসা ভরে' দিলে ভালবাসা, মনোবনে অগিগালি রাঙা করে' এ বিজলি  
 কেন তবে ভাগ' গো নিষ্ঠুর ? বজ্রফাণে পাঠাইছ কেন ?  
 পুটপাকে লোহাশ্রয় পোড়াইয়া নিরুপায় তারি মাঝে পোড়া পথে জয়-ভরা তব রথে  
 কি করুণা দেখাও ঠাকুর ? ক্ষুভেরী শোনাইছ হেন !  
 ত্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ।

## স্বপ্ন

( পূর্বাহ্নবৃত্তি )

স্বপ্নের উপর স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রভাবের  
 সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে পারা যায় ;  
 কিন্তু আমাদের সংক্ষেপেই সারিতে হইবে ।  
 আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সহিত এই  
 স্পর্শাত্মক সন্নিহিত হইয়া স্বপ্নের প্রয়োজন-  
 মত বৃত্তিটি গঠন করে । রাতে আমরা  
 হাল্কা কাপড় পরিয়া নিদ্রা বাই, সেইজন্য  
 যুমন্ত অবস্থাতেও প্রায়ই আমাদের এই  
 কথাটি মনে লাগিয়া থাকে যে, আমরা হাল্কা  
 কাপড় পরিয়া আছি । যদি স্বপ্নে আমরা  
 পণে বাহির হই, তবে তাহা এই রাজির  
 কাপড়েই ; পথের লোক কিন্তু এই অপূর্ণ  
 পরিচ্ছদের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করে না ।  
 এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে,  
 এরূপ স্বপ্ন খুব সাধারণ । আরো একটা  
 স্বপ্নের কথা লিখিতেছি—এ বিষয়ে অনেকেই  
 অভিজ্ঞতা আছে । এটি বানুপ্রবাহে উদ্ভূত হইলে  
 সে জ্ঞান না থাকায়, অথচ তাহার  
 যাওয়া কিবা শূন্যে ভাসিয়া চলার স্বপ্ন ।  
 একবার এই স্বপ্ন দেখিলে আবার যে  
 দেখিতে হইবে তাহা একরূপ অনিশ্চিত ;  
 এবং ইহার প্রত্যেক বারের পুনরাবির্ভাবের  
 সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নজটিল মনে হয়, “এর পূর্বেও  
 স্বপ্নে আমি আপনাকে শূন্যে ভাসিয়া যাইতে  
 দেখিয়াছি । কিন্তু এবার এ আর স্বপ্ন নয়,  
 প্রত্যক্ষ সত্য ! শেষটা বেশ ভাল রকমই  
 জানা গেল যে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মেরও  
 নড়চড় হইতে পারে ।” এই শ্রেণীর স্বপ্ন  
 হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াই যদি কেহ  
 চেষ্টা করেন, তবে অবস্থার বিশ্লেষণ দ্বারা  
 স্বপ্ন দেখিবার কারণাবলী নির্ণয় করিতে  
 পারিবেন । তিনি লক্ষ্য করিবেন, তাহার  
 পায়ের নীচে কোন অবলম্বন নাই ।  
 যুমন্ত অবস্থায় তিনি যে শয়ন করিয়া  
 ছিলেন সে জ্ঞান না থাকায়, অথচ তাহার

পদদ্বয় বিকৃম্পষ্ট নহে, এ অমৃতুতিটুকুও বর্তমান থাকায়—তাহার মনে হয় যেন তিনি শূন্নে ভাসিতেছেন! ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, স্বপ্নে মানুষ যখন ওড়ে, তখন কাৎ হইয়াই ওড়ে! আগিয়া উঠিলে বুঝিতে পারিবেন যে তিনি যে-পাশে ফিরিয়া বিছানায় শুইয়াছিলেন, স্বপ্নে ঠিক সেই পাশেই কাৎ হইয়া উড়িতেছিলেন! সেই উড়িয়া চলিবার চেঁচায় পার্শ্বদেশে যে একপ্রকার সঙ্কোচন অমৃতুত হইতেছিল—বাস্তবিক তাহা শয্যার সহিত দেহের স্পর্শমৃতুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই প্রকার স্পর্শমৃতুতি আমাদের দৃষ্টি-মণ্ডল অবধি সঞ্চারিত হইয়া দৃষ্টি-মণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ উজ্জ্বল বর্ণ-বিন্দু-গুলিকে কিরূপ নানা মূর্তি ও আকৃতিতে রূপান্তরিত করে, তাহার আলোচনা বিশেষ কোতুহলোদ্দীপক। ম্যাক্স সাইমন একটি অদ্ভুত স্বপ্নের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তাহার সম্মুখে যেন পাশাপাশি দুইটি স্বর্ণস্তূপ রহিয়াছে। ইহার উচ্চতায় সমান নয়। কোন কারণে তাঁহাকে যেন স্বর্ণ-স্তূপ দুইটিকে সমান-উচ্চ করিতে হইল। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা করিতে পারিতেছিলেন না এবং না-পারায় দরুণ মনে মনে বিষম অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। প্রতি বারের ব্যর্থতা যখন তাঁহার হৃদয়ের গুরু ভার বাড়িয়া তুলিতেছিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাহার একখানি পা বিছানার চারদেয় জড়িত হইয়া পড়ায় পদদ্বয় অসম-অবস্থায় রহিয়াছে—খুমস্ত অবস্থায় পদদ্বয়কে সম-অবস্থায়

তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল না। এই অসামঞ্জস্যের অমৃতুতির সহিত দৃষ্টি-মণ্ডলের কোন বিশেষ অবস্থার সন্মিলনে স্বপ্নে দুইটি অসমান বর্ণ-বিন্দুর সৃষ্টি হইয়াছে।

নিদ্রাকালে দেহের উপরের স্পর্শমৃতুতি অপেক্ষা দেহের অভ্যন্তরের অগ্র ও মাঝ মণ্ডলীর বিপর্যয়ের অমৃতুতি অধিকতর প্রখর হয়। আগ্রহ অবস্থায় কাজে ব্যস্ত থাকি বলিয়া দেহের অভ্যন্তরীণ এই পারবর্তন আমরা সহজে অমৃতুত করি না। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে যে, কঠোরপ্রভৃতি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্বে রোগী স্বপ্ন দেখে যেন তাহার ঐ রোগ হইয়াছে। স্বপ্নাবস্থায় কঠিনাণীতে একরূপ বিজ্ঞ প্রদাহও অমৃতুত হয়। আগিয়া উঠিয়া কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই অমৃতুত করা যায় না এবং স্বপ্নকে স্বপ্ন ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু কয়েকঘণ্টা পরেই হয়ত স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার সত্যো পরিণত হয়। সুগী রোগ, হৃৎপিণ্ড-সঙ্কীর্ণ পীড়া প্রভৃতি নানা ব্যারামে রোগীর পূর্বাভূতির অনেক কথা শুনা যায়। কাজেই সপেন্দ্রের মত দার্শনিক পণ্ডিত যে স্বপ্নের ভিতর হৃদয়ে এক আকস্মিক ব্যাকুলতা এবং বিবেকের দ্বারা এক অপূর্ণ বাণীর প্রতিধ্বনি অমৃতুত করিয়াছিলেন, কিংবা আটিগুন্সের ভ্রাতা চিকিৎসক যে কোন কোন বিশেষ ব্যাধি-নির্ণয়ে স্বপ্ন-বিবরণের উপর নির্ভর করিবার প্রণালী-সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই। সম্প্রতি মস্ টিসি—বাহার কথা আমরা পূর্বে





পাকস্থলী, ফুসফুস এবং ধমনীর বিপর্যয়তার ফলে আমরা কিরূপে বিশেষ বিশেষ স্বপ্ন দেখিরা থাকি।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহার মোক্ষা কথাটা এই—আমরা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় নিদ্রা বাই, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়াদি বহির্জগতের সহিত সকল সম্পর্ক চূঁকাইরা কেলে—অর্থাৎ তাহাদের বাহ্য অস্তিত্ব বা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, এরূপ ধারণা ভুল। কারণ, তখনও আমাদের ইন্দ্রিয়াদি পূর্বের ভায়ই সজাগ থাকে। তাহাদের অস্তিত্ব-শক্তি জাগ্রৎ অবস্থায় ভায় তেমন অস্তিত্ব হয়না সত্য, কিন্তু তৎপরিবর্তে পূর্বাশ্রয় অনেক পরিমাণে সম্প্রসারিত হইরা থাকে—অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় এমন-সব জিনিষ আমরা অস্তিত্ব করিতে পারি, আগিয়া যাহা করা যায় না। ইহার কারণ এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা সর্বসাধারণের সম্পর্কিত যে জগৎ, তাহাতেই বাস করি, কিন্তু নিদ্রাকালে আমাদের সম্পর্ক শুধু নিজেদের সঙ্গেই। এ-অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্যক্ষেত্র একদিকে সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য অনেক বিষয়ে আমাদের অস্তিত্ব-শক্তি বিশেষভাবে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তবে ইহার তীক্ষ্ণতা একটু ক্রম হইরা পড়ে; তাই নিদ্রাকালে আমরা যাহা অস্তিত্ব করি, তাহা প্রায়ই এলোমেলো স্বাপ্নাতাবে। যাহা হউক, এই সমস্ত অস্তিত্বই কিন্তু আমাদের স্বপ্নের প্রধান উপাদান।

শুধু এই অস্তিত্বই স্বপ্ন ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে; কারণ ইহা অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং অনিশ্চিত। স্বপ্নের অস্তিত্ব উপা

পূর্ববর্ণিত বর্ণ-বিন্দু আকৃতিরই, যাহা চোখ বুজিলে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়; তাহাদেরও কোন নির্দিষ্ট আকার নাই। সাধা জমিতে কতকগুলি কালো দাগ,—অল্পভ্রষ্টার নিকট ইহার কোন একখানা পুঁথির পাতার নৃষ্টি, কিংবা নবনির্মিত গৃহের কালো পর্দা-ঝুলানো সমুখ ভাগ, কিংবা অল্প আরো নানাপ্রকার রূপও গ্রহণ করিতে পারে। এই-সব অনির্দিষ্ট উপকরণ হইতে কে একটি নির্দিষ্ট ছাব ফুটাইরা তুলিবে?—আমাদের স্বপ্ন। স্বপ্নই স্বপ্নের বিষয় নির্দেশ করিয়া দিবে।

স্বপ্ন সাধারণতঃ নুতন-কিছুই সৃষ্টি করে না। অবশ্য এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, যাহাতে স্বপ্নে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সৃষ্ট হওয়ার কথা শুনা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেহালায় গীত-রচয়িতা ভার্গিপি সৎকীর একটি সুপরিচিত কাহিনীর এখানে উল্লেখ করিব। একটি Sonata রচনা করিবার চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইরা তিনি ঘুমাইরা পড়িলেন। ঘুমাইরা স্বপ্ন দেখিলেন শয়তান (The Devil) আসিয়া তাঁহার বেহালাটা তুলিয়া লইল এবং তাঁহার জপিত Sonataটি চমৎকার ওস্তাদী হাতে বাজাইয়া গেল। আগিয়া উঠিয়া ভার্গিপি স্বপ্নের স্বপ্ন হইতে সেই Sonata টা লিখিয়া লইলেন—তাঁহাই পরে “Devil’s Sonata” নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে। এই-সব প্রাচীন কাহিনীর কোনটী ইতিহাস আর কোনটী কল্পনাস্রোত তাহা নির্ণয় করা শক্ত। এরূপ স্থলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ভিন্ন কোন



যার নাম ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্টীভেন্সনের কথা বলিতেছি,—একটি অতি-বিস্ময়কর প্রবন্ধ (A Chapter on Dreams) তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত মৌলিক গল্পই তিনি একরূপ স্বপ্নে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, স্টীভেন্সনের জীবনে এমন এক সময় গিয়াছে, যখন তিনি এক অদ্ভুত অবস্থায় (in a psychical state) জীবন নির্বাহ করিয়াছেন। সে সময় তিনি কখন জাগিয়া আর কখন যে ঘুমাইয়া থাকিতেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। আমাদের ত ইহাই ধারণা। কোন সমস্তার সমাধান, অসুবিধা-দূরীকরণ, কল্পনা হইতে সাহিত্য-সৃষ্টি প্রভৃতির পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় সমাবেশ ও বিশ্লেষণ করিবার মত মনের অবস্থা যখন মানুষের থাকে, তখন তাহারা বাস্তবিক-পক্ষে নিদ্রিত থাকিতে পারে না। অন্ততঃ মানুষের যে বৃত্তি-সমূহ এই-সব কার্য্য করে, সে বৃত্তিগুলিকে ঘুমন্ত-অবস্থায় বলিতে পারি না। নিদ্রার আমাদের সমস্ত ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব বিদূরিত হয়; তখন কেবল আমাদের স্বত্বই স্বপ্নের কাল বুলিয়া থাকে। কিন্তু প্রায়ই এই স্বত্বকে তখন আমাদের পরিচিত বলিয়া

মনে হয় না। হয়ত ইহা বহুদিনের পুরাতন স্বত্ব—আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার আভাসও কোন দিন পাই নাই,—এখন নিদ্রিত অবস্থায় সেই স্বত্ব অতীতের গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে; আবার এমনও হইতে পারে যে জাগ্রৎ অবস্থায় নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে—অস্বমনস্কভাবে, যে সকল বিষয় আমরা অনুভব করিয়াছি, ইহা সেই সকল ব্যাপারের স্বত্ব! অথবা এমনও হইতে পারে, যে, ইহা নানা ঘটনার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বত্ব, এখান-সেখান হইতে ভাসিয়া আসিয়া ঘটনাচক্রে একত্র জোড়া লাগিয়া এক সামঞ্জস্য-হীন অজ্ঞাতপূর্ব অভিনব বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি নিদ্রাকালেও বৃত্তির অনুশাসন মানিয়া চলে, তাই সে এই অসংখ্য ও দুর্য্যোগ স্বপ্নেরও কারণ-নির্ণয়ে প্রয়াস পায়।—যাক, যে প্রশ্ন আমরা তুলিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি স্বপ্ন-রচনায় এই যে মাল-মসলার জোগান দেয়, তাহা ঐ স্বত্বের সাহায্যেই দেয়—এবং এই যে বিবিধ অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অনুভূতি, স্বপ্নপ্রভৃতি স্বপ্নে বাহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, এগুলিকে সঠিক, সুসমঞ্জস এবং সুস্পষ্ট আকারে ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা, ঐ স্বত্বেরই শুধু আছে!

শ্রীমুখাণ্ডকুমার চৌধুরী।

## ঝরা-পাতার গান

লুটিয়ে আছি গাছের তলে  
 ব্যথার ভরা প্রাণ,  
 পথের শত পথিকজনে  
 গাইব হৃথ-গান।  
 ছোট্ট বটে এ-বুকখানি,  
 ছোট্ট কথা নয়;—  
 আলো-বাতাস অনেক-দিনের  
 এই বুকেতে রয়।  
 শাখার শিরে কাণ্ডন-প্রাতে  
 মেলত যবে আঁধি,  
 আকাশ থেকে চুমা দিলে  
 সপ্ত-রঙের পাখী।  
 বাতাস এসে কানে-কানে  
 দিবে গেল গান;  
 রোজ-ঝরা ফুটিয়ে গেল  
 বুকের মাঝে প্রাণ।  
 গাইল কোকিল কোন্ বনেতে—  
 উছল সুখ-স্বর,  
 বইছে আঝে শিরায়-শিরায়—  
 পুরাণ পরিপূর।  
 বৈশাখের রক্ত হাওয়া,  
 মেঘের গরজন,

তাদের সাথে কতই খেলা  
 —ভয়ের আলোড়ন!  
 গাথা আছে এই বুকেতে  
 বর্ষা-ধারার গান,  
 চক্কে-বেগুরা তড়িৎ-শোভা,  
 নদীর কলতান,  
 মেঘের মায়া, শরৎ-রাতের  
 নুপন-পূর্ণিমা,  
 অস্ত-যাওয়া রক্ত রবির  
 স্বপ্ন-গরিমা।  
 হুই-শালিখের গোপন-কথা  
 এই-বুকেতে রয়,  
 পাপিরারি আকুল উচ্চাস,  
 প্রেমের অভিনয়।  
 রঙের ভাতি, পাখীর গীতি,  
 ঋতুর অভিনয়,  
 বা' মেখেছি, বা' পেয়েছি  
 সবাই বুকে রয়;—  
 লুটিয়ে আছি ধুলার সাথে  
 আজকে ভাঙা-প্রাণ,  
 তাদের কথা—হাজার বাধা  
 জাগছে অকুরাণ।  
 ত্রিপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।



# শ্রাবাইন-রমণী \*

নাটক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ চারিধারে অম্বাট অন্ধকার পত্নী-বিরহ-  
কাতর পতিগণের দুরবস্থা স্থাপন করিতেছে  
—বোধ হয়, বৃষ্টি পড়িতেছে, হ-হ করিয়া  
বাণাস বহিতেছে এবং সম্ভবত আকাশ বন  
মেঘারত ]

যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—ছইধারে  
ছইদল শ্রাবাইন রীতিমত ব্যায়াম-চর্চা  
করিতেছে, মুখে বুলি, “পঁচিশ মিনিট ব্যায়াম  
করলেই শরীরের সব অস্থি আর বেদনা সেরে  
যায়”। মঞ্চের মাঝখানে পুত্রবান পিতার দল  
একসার লম্বা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে ;  
প্রত্যেকের কোলে একটা করিয়া সন্তান—  
তাহাদের মাথা ক্লাস্তভাবে একপাশে ঢুলিয়া  
পড়িয়াছে এবং তাহাদের ভঙ্গীতে গভীর  
হতাশা! বড় করণ ও ছদয়-ভেদী দৃশ্য।  
অনেককণ আর কিছু শোনা গেল না, কেবল  
সেই অশ্রুট স্বর, “পঁচিশ মিনিট রোজ  
এমনি ব্যায়াম করলে...” ]

মারটিয়াসের প্রবেশ, তাহার হাতে একখানা  
চিঠি।

মারটিয়াস। মিলেছে! শ্রাবাইনগণ,  
আমাদের স্ত্রীদের ঠিকানা—মিলেছে!

অম্পট স্বর। বাস, বাস, ঠিকানা পাওয়া  
গেছে!

( মারটিয়াস তাড়াতাড়ি পকেট হইতে  
ছোট ঘণ্টা বাহির করিয়া বাজাইতে লাগিল )

অনেকে। চুপ, চুপ!

মারটিয়াস। শ্রাবাইনগণ, দীর্ঘস্থতা  
আর কর্তব্যবিস্মৃতির প্রকৃত ইতিহাস কখনই  
আমাদের নিশ্চয় করবে না—দীর্ঘস্থতা বা  
অনিশ্চয়তা শ্রাবাইনদেরই চরিত্রগত নয়—  
তাদের প্রবল প্রচণ্ড স্বভাব যুক্তি কি  
অভিজ্ঞতার লোহহার-পথে রুদ্ধ হবার নয়।  
হে পত্নী-হারা স্বামীগণ, শ্রবণ করুন—হীন  
দম্মাদল যে-রাত্রি আমাদের অসহায়  
রমণীদের হরণ করে, তার পরদিনকার সেই  
সকালবেলার কথা একবার শ্রবণ করুন।  
স্থানের সীমা লঙ্ঘন করে সমস্ত বাধা-বিপত্তি  
পায়ে ঠেলে বিকট হৃদয়ে দেশ প্রতিধ্বনিত  
করে চঞ্চল পদ-ক্ষেপে আমরা কতদূর অগ্রসর  
হয়েছিলাম, ভ্রমগণ, একবার সে কথা শ্রবণ  
করুন—

( শ্রাবাইনগণ ভীতভাবে চুপ করিয়া  
রহিল )

মারটিয়াস। সমবেত ভদ্রবৃন্দ, শ্রবণ করুন,  
কৈ—?

ভীতস্বর। প্রসারপিনা, প্রসারপিনা—  
প্রেরণী আমার—ওহো, কোথায় তুমি!

( শ্রাবাইনগণ নীরাকৃতভাবে বক্তার মুখের  
দিকে চাহিয়া রহিল। )

মারটিয়াস। ( উত্তরের অপেক্ষা না  
করিয়া, সজোরে )। সেই খবরের আকিসে  
—হাঁ, সেইখানে কিন্তু আমাদের হৃর্ভাগ্যের  
কথা কি আপনাদের মনে আছে? সে  
হতভাগা আকিস এ-পধ্যস্ত কোন খবরট

পায়নি আর পুরানো ঠিকানা ছাড়া কোন সংশোধিত তালিকাও তাদের নেই... সাতদিন ক্রমাগত সন্ধানের পর আমরা কি বিষম বিড়ম্বিত হয়েছি। শেষে একদিন জলন্ত উত্তর এল—‘কোথায় চলিয়া গিয়াছে’—কিন্তু বন্ধুবর্গ, আমরা তাতে কি সন্দেহ ছিলাম?—মনে করে দেখুন।

[ স্ত্রাবাইনগণ নির্ঝাঁক রহিল ]

মারটিয়াস। না। আমরা তাতে সন্দেহ হয়ে স্থির থাকিনি। নীরস হলেও কথাটা একবার শুনুন—এই আঠারো মাসে কি করেছে, তা একবার শুনুন। সমস্ত বিখ্যাত খবরের কাগজে সংবাদ-দাতাদের পুরস্কার ঘোষণা করে’ বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছি, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের আহ্বান করেছি, তাঁরা প্রতিরাত্রে নক্ষত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে আমাদের অসহায় জীদের ঠিকানা ঠাওরাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন—

ভীত স্বর। প্রসারপিলা—প্রিয়সী আমার—ওহো :—

মারটিয়াস। আমরা যে কেবল এক হাজার মুরগির ছানা, হাঁসের বাচ্চা, আর খাড়ি রাজ হাঁস বলি দিয়েছি, তা নয়—উদরস্থ পাখী বা জন্তুর কাছ থেকে পবর পাবার আশায় হাজার হাজার বেরালেরও পেট চিরেছি! কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের সমস্ত অমাহুযিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ঐ আকাশের নক্ষত্রগুলো, যাদের পানে আমরা প্রত্যহ সন্ধ্যায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতুম—নিষ্ঠুর অবজার তারা আমাদের কোন খবরই দেয়নি! খবরের আকস্মিক বরং খবর একটু মিলেছিল,—চলে

গেছে, তারা চলে গেছে! কিন্তু, কোথায়? কোন্ অজানার দেশে?

[ স্ত্রাবাইনদের মধ্যে চাপা কান্নার শব্দ শোনা গেল ]

ভীত স্বর। প্রসারপিলা! প্রসারপিলা—মারটিয়াস। বন্ধুগণ—নক্ষত্রমণ্ডলীর কাছ থেকে কি আশ্চর্য্য উত্তরই আমরা পেলুম! ওরা অত উপরে থেকে জগতের সমস্ত জানে, কিন্তু—যাক, আমাদের সাফল্যের কথা আমি সগর্বে বলছি, শুনুন। যে-সময় বিখ্যাত জ্যোতির্বিদরা নক্ষত্রের অবস্থান-পর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় আমাদের বিজ্ঞ আইন-বেত্তারা কি করছিলেন, সে কথা একবার আপনারা স্মরণ করুন—কৈ, স্মরণ হয় কি?

[ সকলে নির্ঝাঁক ]

মারটিয়াস। ভক্তমহোদয়গণ, স্মরণ করুন। আপনারদের সঙ্গে কথা কওয়া দায় হল, দেখছি। আপনারা সব মুন্ডির মত মুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে! আশ্চর্য্য! আপনারদের সকলের সে সব কথা মনে আছে বলেই আমার বিশ্বাস, কেবল বিনয়াদিক্য-বশত মুখে প্রকাশ করছেন না। না? বলুন, মনে করুন, কৈ, বলে ফেলুন। সে-সময় আমাদের আইন-বেত্তারা কি করছিলেন?

ভীত স্বর। প্রসারপিলা—ও হো হো—কোথায় তুমি?

মারটিয়াস। কে ওখানে? চুপ! এর মধ্যে বার বার প্রসারপিলাকে টেনে আনছি কেন? আচ্ছা, আমি আপনারদের সাহায্য করছি—আমরা ব্যায়াম অভ্যাস করছি কেন, তা আপনারা জানেন ত—কেন, বলুন।

ভীষণ। (পিছুক হইতে) আমাদের  
দেহ সবল করবার জন্ত—

মারটিয়াস। (সোম্মাসে) হাঁ—ঠিক  
বলেছেন। কিন্তু বলুন দেখি, সরল দেহে  
আমাদের কি প্রয়োজন? আপনারা ধৈর্য্য-  
রক্ষা অসম্ভব করে তুললেন, দেখছি,  
আপনাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে দিলুম—এখন  
বলুন, সবল দেহ নিয়ে কি হবে?

দ্বিধাপূর্ণ স্বর। আমরা যুদ্ধ করব।

মারটিয়াস। (হতাশভাবে আকাশের  
দিকে হাত তুলিয়া) হা ভগবান— যুদ্ধ করব!  
আর এ-কথা একজন শ্রাবাইনের মুখে  
শুনতে হল! যারা আইনের বন্ধু, নিয়মের  
দাস, বিবেকের পুত্র, শ্রায়-পরায়ণতার  
অবতার,—তারাও বলবে, যুদ্ধ করবার জন্ত  
সবল দেহের প্রয়োজন! এ কথা বলুক সেই  
নীচ দস্যুরা—আমাদের সম্পূর্ণ আইন-সম্বন্ধ  
জ্ঞীদের যারা চুরি করে নিয়ে গেছে, সেই  
রোমানদের মুখেই শুধু এ কথা সাজে।

ভীত স্বর। প্রসারপিনা, প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। তুমি চুপ করবে কি?  
প্রসারপিনা! যেমনই কাজের গোড়ায় তাকে  
গিয়ে পৌঁচেছি, অমনি তুমি প্রসারপিনা  
প্রসারপিনা বলে ডাক ছাড়ছ! ভদ্রমহোদয়গণ,  
আমি বৃদ্ধিতে পেরেছি, এ বিরহ-যাতনায়  
আপনাদের স্বতঃ-উজ্জ্বল স্মৃতি আজ কঁাপ  
হয়ে এসেছে, তাই বেশ, আমি নিজেই সব  
সংক্ষেপে বলছি, শুনুন। সেই রোমানদের  
ঠিকানা জোগাড় করে তাদের বিরুদ্ধে  
অভিযান শুরু করে,—বুঝেছেন কি—সে  
সমস্ত পথ ভারী ভারী আইনের বইগুলো—  
সমস্ত বিধিবিধান আর পুনর্বিচারের মীমাংসা-

সংগ্রহ—অর্থাৎ একটা পাবছেন কি—  
আমাদের বিবাহের শ্রায়সম্বন্ধ আর ওর নাম  
কি, হরণের বে-আইনী অপরাধ প্রমাণের  
জন্ত ডাকলেরা যে চারশো' বগু পুস্তক  
সংকলন করেছেন—সে সমস্ত বয়ে নিয়ে  
যাবার জন্তই আমাদের আজ শক্তির  
প্রয়োজন! শ্রায়-সম্বন্ধ অভিযোগ আর নান্দল  
বিবেকই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। আমরা  
সেই দস্যুদের আইনের জোরে বুঝিয়ে দেব  
যে, তারা চোর, আর জ্ঞীদের বুঝিয়ে দেব যে  
তারা অপরাধ—শুনে 'আকাশ-পাতাল' কেঁপে  
উঠবে! এখন যখন তাদের ঠিকানা পাওয়া  
গেছে, তখন তাদের দিনও ঘনিয়ে এসেছে।  
চেষ্টা দেখুন, বন্ধুগণ—

(চিঠিখানি নাড়িতে গাংগল এবং  
শ্রাবাইনরা পায়ের আঙুলে ভর দিয়া চাহিয়া  
রহিল)

—একজন 'অমৃতপুত্র' এই নাম দিয়ে  
একখানি চিঠি এসেছে। না কেনে-শুনে পাপ  
করার জন্ত এক অজানা বন্ধু যথেষ্ট অমৃত্যুপ  
করে এ চিঠি লিখেছে—সে জানিয়েছে  
যে, আর কখনও এরকম ভাবে কারো জ্ঞিকে  
সে হরণ করবে না; তা ছাড়া ভগবানের  
কাছে সে দয়া প্রার্থনা করেছে। নামটা  
ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা বড় জলের ফোঁটার  
অস্পষ্ট হয়ে গেছে—বোধ হয়, চোখের জলেই;  
—দেখুন, এই ত বিবেকের শক্তি! সে আরও  
জানিয়েছে যে, আমাদের জ্ঞীদের হৃদয়  
একেবারে ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেছে—

ভীত স্বর। প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। আবার! তুমি শুনবে না?  
তোমার প্রসারপিনা তো একটা ঘরের ব্যাপার

বট নয়! ঠিক যে-সময় আমরা সাধারণ সমস্ত-সমাধানে লেগে গেছি—একটা মতলব ঠাণ্ডা করে এনেছি—সে সময়ে সব কথা এখনি বলছি—যে সময় আমরা জয় বা মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হচ্ছি, সে সময় তুমি কিনা কোথাকার এক তুচ্ছ প্রসারপিলা না কি নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছো! এ সমবেত-মণ্ডলীর নামে আমি তোমার চুপ করতে বলছি। চুপ কর। ভদ্রবৃন্দ, আপনারা অগ্রসর হোন! সোজা হয়ে দাঁড়ান! সারবন্দী হয়ে দাঁড়ান—বেশ ক্ষুধি করে এগিয়ে আসুন। না, পাগল করলে, দেখছি! ডান দিক কোন্টা, বাঁ দিক কোন্টা, তাও কেউ জানেন না? বলি, যাচ্ছ কোথায় হে তুমি? থামো—

[ একটি সার-ছাড়া শ্রাবাইনকে ধরিয়ে বুঝাইতে লাগিল ] তোমার ডান পা কোন্টা জানতে চাও ত সোজা হয়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াও,—এবার উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াও। না, না, মুখ দক্ষিণ দিকে আর পিঠটা পূবে। আরে, তোমার মুখ কোথায়? ওহে, ওটা তোমার মুখ নয়, ওটা তোমার পিঠ, পিঠ—এই তোমার মুখ—বুঝেছ? নাঃ, এ অসম্ভব! তোমার ডান পা কোন্টা জানতে চাও ত পাশের লোকের দিকে চেয়ে দেখ। আপনাদের কারও কাছে ছুরি আছে? সব পকেট ওন্টান। অত্যাচারের কোন চিহ্ন যেন সঙ্গে না থাকে! যাতে কাটে বা খোঁচা লাগে—এমন কোন অস্ত্রও কাছে রাখা সম্ভব হবে না! জানেন বঙ্গগণ, শ্রায়সম্মত অভিযোগ আর নির্মল বিবেকই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। এবার বিধি-বিধানের এক-একখানা বই সব হাতে নিন। বেশ!

—বাধা হলে ভালই হুঁত—যাক, ~~এই~~ পরে দেখা যাবে। এখন বুঝলে কি, সবল দেখে কি প্রয়োজন? চমৎকার, সুন্দর! ভেরীবাদক, তোমরা সব আগে যাও, মনে রেখো—“অপস্কৃত স্বামীর অভিযান” সেটাই হুঁরটা বাজাতে হবে! চল—না, না, থামো—কেমন করে? চলতে হয়, জানো?

[ শ্রাবাইনগণ নির্বাক রহিল। ]

মারটিয়াস। জানো না? বেশ, আনি দেখিয়ে দিচ্ছি। হুঁ'পা এগোও, এক পা পেছোও। সামনে হুঁ'পা এগিয়ে যাওয়ার অর্থ, আমাদের প্রচণ্ড আশ্রয় অনির্বাক অনল-তুলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অদম্য অগ্রগতির চিহ্ন এ—আর এক পা পেছুনো অর্থৎ এ যুক্তি, অভিজ্ঞতা—পরিণত মনের চিহ্ন। এতে বোঝাচ্ছে যে আমরা কাজের ফলাফল বিচার করছি—ঐ এক পা পেছিয়ে যাওয়াতেই আমাদের সম্মান অতীত, আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের সনাতন কুলধর্মের সঙ্গে সঙ্গ রেখে চলছি। ইতিহাস লাকিয়ে লাকিয়ে চলে না, আর আমরা শ্রাবাইনরা এই গৌরবময় মুহূর্তে আমরাই ত ইতিহাস। ভেরীবাদক, ভেরী বাজাও, ভেরী বাজাও!

[ ভেরীর কাতর বিলাপধ্বনি একবার যেন হঠাৎ সামনের দিকে হেলিয়া ধীরে ধীরে পিছনের দিকে ছলিয়া গেল এবং সমস্ত শ্রাবাইন-গণ সেই সঙ্গে অগ্রসর হইল, দুই পা সম্মুখে—এক পা পিছনে—এই নিয়মে ধীরে ধীরে তাঁহারা রক্তময় অতিক্রম করিল ]

### তৃতীয় অঙ্ক

[ দৃষ্ট, প্রথম অঙ্কেরই মত, তবে এখানে-ওখানে অশ্রুজলতার চিহ্ন বর্তমান। একটি

কুটারে—এই একজন রোমান অলসভাবে দাঁড়াইয়া বেশ ক্ষুধিত্তে নাকে হাত ব্লাইতেছে—বামদিকে পশ্চাতে সেই একই ধরণে গম্ভীরভাবে স্বামী-সৈন্যদল নিয়মিত পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে—ছইপা আগাই-তেছে, এক পা পিছু হঠিতেছে। তাহাদের দেখিয়াই রোমানরা একটু উত্তেজনার ভাব দেখাইল; পরে নাকে হাত না ব্লাইয়াই কোতূহলের সহিত তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল—তাহাদের মধুর গতি দেখিয়া সেই রোমানটি যেন তন্ম্রাবিষ্ট হইল এবং জোরে হাই তুলিয়া অলসভাবে হাত পা নাড়িয়া পাশের একটা পাথরে অবশভাবে বসিল—মারটিয়াসের ইঙ্গিতে ভেরী ধামিয়া গেল।]

মারটিয়াস। (হতাশভাবে) স্যাবাইনগণ, থামো, থামো, সব থামো—

(স্যাবাইনরা স্থিরভাবে দাঁড়াইল)

মারটিয়াস। ওহে, সব থামো, থামো। আরে, এ গড়ানে পাথরকে কি কিছুতেই থামানো যাবে না! থামবে না? হাঁ, হাঁ, এবার থেমেছে। সব ঠিক হও—ভেরীবাদক, তোমরা সব পিছনে যাও—অধ্যাপকগণ, আপনারা সামনে আনুন—ওহে, সব এবার ঠিক হয়ে দাঁড়াও—

[ভেরীবাদকের দল পিছনে এবং অধ্যাপকগণ সম্মুখদিকে গেলেন এবং বাকী সকলে যেন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল]

মারটিয়াস। অধ্যাপকগণ, আপনারা সব ঠিক হোন—

[অধ্যাপকগণ তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া বসিয়া এক একটি ছোট টেবিল পাতিয়া

তাহার উপরে হাতের সেই আইনের মোটা বইগুলি রাখিলেন, তারপর গড় গড় শব্দ করিয়া বই খুলিলেন, যেন বন্দুক-ছোড়া মত শব্দ হইল—রোমানটি (সে সিপিও) উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু ব্যস্ততার ভাব দেখাইয়া পরিচিতের মত কথা কহিল]

সিপিও। বলি, মশায়রা এখানে কেন? ব্যাপার কি? আমায় কিছু করতে হবে নাকি? যদি সার্কাস করতে এসে থাকেন, তাহলে আগে থেকেই বলে রাখছি, মঞ্চ এখনো সব তৈরি হয়নি—

মারটিয়াস। (গম্ভীরভাবে) চুপ করো, নীচ দন্ডা—(স্যাবাইনদিগকে)—স্যাবাইনগণ, এতদিন পরে আমরা সেই অভীষ্ট স্থানে এসে পৌঁচেছি। আমাদের পিছনে আছে, দারিদ্র্য, বৃত্তুকা নির্জনতা—কিন্তু সামনে দ্বন্দ্ব, ভাষণ দ্বন্দ্ব—ইতিহাস যা কখনো শোনে নি! স্যাবাইনগণ, উত্তেজিত হয়ে না—নিজেদের সংযত করো—শাস্ত হও—ভিতরের ক্রোধকে সংযত রেখে অদৃষ্টের ফলের জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা করো—স্বরণ রেখো—আমাদের এখানে আসার কারণ কি!

(স্যাবাইনগণ সব নিস্তব্ধ রহিল)

মারটিয়াস। স্বরণ করো—ওহে সব স্বরণ করো, এ-সব মোটা মোটা আইনের বইগুলো নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই বেড়াতে, আসিনি—বলো, বলো, আমরা এসেছি কেন?

সিপিও। কৈ, মশায়রা স্বরণ করুন, চটপট বলুন, বলুন—

মারটিয়াস। (সিপিওকে) ওহে, ভেবে



দেখচো কি ! তোমরা সব সময়েই এটরকম  
নির্দ্বন্দ্ব—

সিপিও। আপনার কিন্তু বোধ হয় তা  
হচ্ছে নয়—

মারটিয়াস। সেইটেই একমাত্র সত্য—  
পাথরের মূর্তির মতই এরা দাঁড়িয়ে থাকতে  
পারে—কেবল চোখের পাতা কাঁপানো  
ছাড়া এরা আর কিছুই করতে পারে না।  
আচ্ছা, “স্বরণ করুন, সব স্বরণ করুন” এই  
কথাগুলো জোর করে না বলে কেউ ভাল  
বক্তৃতা দিতে পারে ?

সিপিও। [ মাথা নাড়িয়া ] না, তা পারে  
না—আর তা না হলে অল্পত শোনাবে কি  
করে ?

মারটিয়াস। ঠিক, ঠিক বলেছো—এটা  
দেখচি, তুমি বুঝতে পেরেছো—কিন্তু এদের  
জ্ঞান—

স্যাভাইনদের ভিতর হইতে কম্পিতস্বর।  
প্রসারপিলা, প্রসারপিলা, প্রেসসী আমার—  
ওঃ, কোথায় তুমি ?

সিপিও। ( আশ্চর্য্য হইয়া ) ঐ যে,  
উনি বোধ হয় স্বরণ করেছেন !

মারটিয়াস। [ অবজ্ঞাভরে ] হ্যাঁ—ও সব  
সময়েই স্বরণ করছে। স্যাভাইনগণ, সব ঠিক  
হও—এইবার আমাদের জীদের উপর চূড়ান্ত  
দাবী বসাবো—যদি ওদের বিবেক এখনো  
না জেগে থাকে, তাহলে ওদের ধিক্ ! ওহে  
নীচ দম্ভ, তোমার বন্ধুদের সব ডেকে নিয়ে  
এসো—ভীষণ শাস্তির জন্ত সকলে প্রস্তুত  
হও—

সিপিও। আচ্ছা, আমার জীকে ডেকে  
নিয়ে আসি—

[ কুটীরে গিয়া ডাকিতে লাগিল—  
“ক্লিওপেট্রা, ও ক্লিওপেট্রা—বাইরে এসো—  
এরা কারা সব তোমাদের দেখতে চাইছে”—  
এককোণ হইতে উকি মারিয়া স্যাভাইনদের  
চিনিতে পারিয়া পলাস সানন্দে বলিল—  
“এদের স্বামীরা এসেছে। রোমানগণ চীৎকার  
করে সব ওঠো, ওঠো, দেখ, এদের স্বামীরা  
সব এসেছে”—অলভরা চোখে মারটিয়াসের  
দিকে দৌড়িয়া গিয়া তার গলা জড়াইয়  
ধরিল—মারটিয়াস একেবারে হতভম্ব হইয়  
দাঁড়াইয়া রহিল। পলাস বারবার বলিতে  
লাগিল,—“এদের স্বামীরা এসেছে—এদের  
স্বামীরা এখানে এসেছে”—

বুম-ভরা চোখে রোমানরা ঘে-বার ঘা  
হইতে হাতড়াইতে হাতড়াইতে বাহির হইল  
এবং মঞ্চের দক্ষিণদিকে দাঁড়াইল—যতক্ষণ  
না তাহারা সকলে একত্র হইল, ততক্ষণ  
মারটিয়াস বেশ নটের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়  
রহিল। ]

স্থলকার ভক্তলোক। সত্যি, কি ঘুম  
ঘুমিয়েছি ! এমন সুখের ঘুম অনেকদিন  
ঘুমুনো হয়নি ! রাজ্য বসাবার দিন সেই  
ঘুমিয়েছিলুম, আর আজ এই ঘুমুলুম  
এ সব নির্দ্বন্দ্ব অভিনেতার। এখানে বি  
করছে ?

প্রথম রোমান। ওহে, এরা সব ওদের  
স্বামীরা—

স্থলকার রোমান। ও তাই বুঝি—কি  
আমার যে বঁড় ভেঁটা পেয়েছে। প্রসারপিলা  
একটু সরবৎ আনো তো—

স্যাভাইনদের ভিতর হইতে কীর্ণস্বর  
প্রসারপিলা—ওঃ—ওঃ—ওঃ—

হুলকায় রোমান। ও আবার কি চায় ?  
ও কি আমার জীকেই ডাকছে নাকি ?

প্রথম রোমান। যে ডাকছে, সে যে  
আমী—

হুলকায় রোমান। ওঃ, তাই বুঝি! ভুলে  
গেছলুম—আমার যে বড় তেষ্ঠা পেরেছে—  
সেই গরম গরম খাবার খেয়ে আর তোকা  
মনের স্তূপে ঘুমিয়ে আমার পিপাসা বড়  
বেড়ে গেছে—এখন একটা আন্ত পুকুর  
বোধ হয় স্তূপে ফেলতে পারি! কি  
বলবো, প্রসারপিণা খাবার যা তোর  
করে! আহা, চমৎকার! সত্যি—তাই সব  
—রাগায় এমন ওস্তাদী হাত—সত্যি, কি  
বলবো ?

প্রথম রোমান। থাক, চুপ করো—

হুলকায় রোমান। আচ্ছা—কিন্তু ভাই,  
কেমন একটা ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম—  
ভাবলুম, খুব ঘুমচ্ছি আর হঠাৎ দেখলুম  
রোমটা পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে—তারপর  
একেবারে ঝপ করে পড়ে গেল—

প্রথম রোমান। কিন্তু আমাদের জীদের  
কি হোলো ? তাদের সব ডাকাডাকি করা  
হচ্ছে, অথচ আসছে না কেন ? কি বিশী  
স্বভাব সব—

দ্বিতীয় রোমান। বোধ হয় কাপড়-  
চোপড় বদলাচ্ছে—

প্রথম রোমান। হায় রজনী, তোমার  
নামই হচ্ছে মায়া—হয়তো এসেই বলবে—  
অ, এরা বুঝি—এরা যে আমাদের সেই  
আগেকার স্বামীরা! সত্যি, জীলোকদের  
মনস্তত্ত্বটা আমি মোটেই বুঝতে পারলুম না—  
ও আমার ধারণার বাইরে একেবারে—নাঃ!

চতুর্থ। ওহে, আমারও যে তেষ্ঠা পাচ্ছে  
এ মরা মানুষগুলো কতকাল এখানে  
দাঁড়িয়ে থাকবে ? ঐ যে, এরা আবার বাজনা  
এনেছে—নিশ্চয়, একটা মূবও লম্বত বাজাবে  
—দেখ, দেখ—এবার ওরা নড়ছে—না,  
জ্যান্তই!

মারটিয়াস। রোমানগণ, এতদিন পরে  
আজ আমরা সামনা-সামনি মিলেছি। আচ্ছা,  
সত্য করে আমার কথার স্পষ্ট জবাব  
দাও। ওহে রোমানগণ, সেই বিশেষ-একুশে  
এপ্রিলের মাঝামাঝি রাতে তোমরা যে কাজ  
করেছিলে, তা কি তোমাদের মনে আছে ?  
[ রোমানরা অপ্রতিভ হইয়া পরস্পরের  
দিকে চাহিয়া রহিল ]

মারটিয়াস। ওহে, সব স্মরণ করো,  
তোমাদের মনেই পড়ছে না, এ কি  
সম্ভব ? ভাবো, চেষ্টা করো, স্মরণ করে  
বলো, সত্যি বলছি, তোমাদের স্বতন্ত্র না  
মনে পড়ে, ততক্ষণ এক-পাও আমরা নড়বো  
না—

হুলকায় রোমান। (স্মিত হইয়া পাশের  
রোমানকে চুপিচুপি বলিল)—তোমার  
বোধ হয়, মনে আছে, এগিগ্লা ? এ্যা,  
তোমারও মনে নেই! নিশ্চয় একটা বিশেষ  
কিছু ব্যাপার হবে—কি বল ?

রোমানরা। না, না, আমাদের কারোরই  
মনে নেই—এত বেশী ঘুমিয়েছি যে  
আমাদের স্মরণ-শক্তি বিলকূল নষ্ট হয়ে গেছে  
—সব ভুলে গেছি! আচ্ছা, আমরা বরং বখান  
যাবো, তখন বলো, কি ব্যাপার—ভাঙত,  
এদের মতলব কি ?

মারটিয়াস। [ উচ্চসরে ] আচ্ছা, আমি

তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি—রোমানগণ, সব শোনো, বিশেষ এক্ষেপে এপ্রলের মাঝামাঝি রাতে এমন ভীষণ একটা অজ্ঞায় পাপ কাজ তোমরা করেছ, যা ইতিহাসের পিঠে ঘন কালি লেপে দিয়েছে!—তোমাদেরই একদল লোক, তাদের পরিচয় আমি পরে দিচ্ছি—আমাদের হুম্মরী স্যাবাইন-রমণীদের হুবৃত্তের মত হরণ করে নিয়ে এসেছে—

সকলের মনে পড়াতে রোমনরা আনন্দে মাথা নাড়িয়া বলিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো, ব্যাপারটা বুঝেছি—সত্যি কথা, খুব সত্যি হ্যাঁ, সেদিন বিশেষ এপ্রিলই বটে—

হুলকার রোমান। (গভীরভাবে) সত্যি, স্যাবাইনদের মাথা আছে, দেখচি। খুব মনে রেখেছে ত!

মারটিয়াস। আর তোমরাই হচ্ছেো সেই দস্যুরা। হ্যাঁ, আমি জানি, এ কথা ঠিক! এখন হয় ত তোমরা গোলমাল করবে—কথাটা ওটাএব জ্ঞে কুট ওক তুলে নিতান্ত হিনের মত আইনের অপমান করবে—কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না—সেইজ্ঞেই আমরা একেবারে ঠিক হয়ে এসেছি—অধ্যাপকগণ, আরম্ভ করুন, আপনারা আরম্ভ করুন...

সারের শেষ থেকে একটানা সুরে অধ্যাপকরা পড়িতে আরম্ভ করিলেন—স্বরটি মনে হইল, স্থান ও কালের ও-পারস্থিত দেশ হইতে আসিতেছে—“স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি-হরণ—প্রথম খণ্ড, প্রথম বিভাগ, প্রথম অধ্যায়, প্রথম পৃষ্ঠা; সাধারণ দস্যুতা বিষয়ে বলা হইতেছে—অতি পুরাকালে—বর্তমান

সময়ের বহু বহু হ্রস্ব বৎসর ~~হ্রস্ব~~ বহন পত্ৰ-পক্ষী, কাট-পতঙ্গাদি নির্ভয়ে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহাদের মনে সুবিচারের কথা মোটেই জাগে নাই, যেহেতু তাহাদের মন বলিয়া কোন পদার্থই ছিল না—সেই অতি-পুরাকালে—”

মারটিয়াস। শোনো, সব শোনো, রোমানগণ, মন দিয়ে সব শোনো—

সিপিও। আচ্ছা, একটু খাটো করে বলে ফেলো হে! মন্ত ভূমিকা ফেঁদে বসচে যে! অত কথা শোনবার যে সময় নেই!

মারটিয়াস। না, এ আর খাটো করা যাবে না—

সিপিও। কিন্তু দেখছো না, তোমাদের শ্রোতার যা ঘুমোতে যাবে—সব ঘুমে হুলছে—মারটিয়াস। এমন অবস্থা নাকি!

সিপিও। দেখছো না, চুলতে তো আরম্ভ করেইছে, আর ঘুমে হুলছে বলেই তোমাদের একটি কথাও ওদের কানে যাচ্ছে না—আচ্ছা, ভাল কথা, শেষ দিক থেকে আরম্ভ কর না—যাক—আচ্ছা, যা বলবার তা বল, মোদা স্পষ্ট সোজা করে বলো—

মারটিয়াস। এ ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত রকমের। যাক, তোমার বন্ধুদের অক্ষমতা গ্রাহ্য না করেও আমি স্পষ্ট বলছি—শোন—ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমরা আমাদের স্ত্রীদের হরণ করে খুব একটা বড়-অজ্ঞায় কাজ করেছো আর তোমরাই হচ্ছেো সেই নীচ দস্যুরা। কৈনরকম বিচার মারপ্যাচ দিয়েও এ কাজকে জ্ঞার-সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে পারবে না—আর তা করতে গেলে, আকাশ-পাতাল এখন কেঁপে উঠবে—

সিপিও। সত্যি—সত্যি কথা, এমন-কি, এটাও আমরা অস্বীকার করি না—

মারটিয়াস। অস্বীকার কর না? বেশ, তা হলে বল, আমরা এখানে এলুম কেন?

সিপিও। কি করে জানবো? বোধ হয় বেড়াবার মতলবে—

মারটিয়াস। না, তা নয়, এ সব প্রশ্ন করবার জন্যেই আমরা এসেছি—তা হলে স্বীকার করছো, তোমরাই সেই দস্যু?

সিপিও। নিঃসঙ্কোচে। কিন্তু ঐ দস্যু কথাটা, মনে হচ্ছে, যেন ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

মারটিয়াস। ব্যাপারটা তোমরা সবাই বুঝেছ তো—না বুঝে থাকো, বলো—অধ্যাপকরা সব এখনও ঠিক হয়ে আছে। অধ্যাপকগণ, আপনারা ঠিক আছেন?

সিপিও। না, না, আর অধ্যাপক নয়। আগাগোড়া আমরা সব বুঝতে পেরেছি—ভাই সব, আমার কথায় সায় দাও, না হলে আবার অধ্যাপকের দল শুরু করবে—

রোমানরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব বুঝতে পেরেছি—বেশ বুঝতে পেরেছি—

মারটিয়াস। আচ্ছা, তাহলে—এ-সব কিসের জন্তে?

সিপিও। আমরা কি করে জানবো?

মারটিয়াস। এইখানেই তো বোঝবার গোলমাল। শ্রাবাইনগণ, আনন্দধ্বনি করো, জয়ধ্বনি করো—এরা দোষ স্বীকার করছে। আমাদের ভয় দেখানোর ব্যবস্থাতেই এরা বিবেকের প্রচণ্ড স্বর শুনেতে পেয়েছে, ঐ যে আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে! আমাদের কর্তব্যের বাকী এখন শুধু ফিরে যাওয়া, আর—

কম্পিত স্বর। আমার হাস্যরসিনা—

মারটিয়াস। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো—ঠিক

কথা মনে করিয়ে দিয়েছ—বন্ধু, ঠিক বলেছো।

রোমানগণ—আমরা এনাঁছ আমাদের স্ত্রীদের

নামের সম্পূর্ণ নিভূর্ণ তালিকা—সে ফর্দ

মিলিয়ে এখন ভদ্রলোকের মত তাদের ফিরিয়ে

দাও—সব অনিষ্ট, সব ক্ষতি-সম্বন্ধ—ওর নাম

কি, অধ্যাপকগণ, আইনের কথায় কি বলে...

অধ্যাপকগণ। ঝড়তি-পড়তি...

মারটিয়াস। না, না, না—ক্ষতি—হ্যাঁ,

সব ক্ষতির জন্যেই তোমরা দায়ী। অধ্যাপক-

গণ, পাতাটা সব পড় তো—থাক—আমাদের

স্ত্রীরা সব আসছে—ভাই-সব, ঠিক হয়ে দাঁড়াও

—মনকে দমন করে রাখো—তোমাদের

বিশেষ করে বলছি, যতক্ষণ না বিচারের

মৌমাংসা হয়, ততক্ষণ হৃদয়ের আবেগকে

সংযত করো। হু পা এগোও, এক পা

পেছোও। থামো, থামো—শ্রাবাইন-রমণীগণ,

এসো, এসো—এই যে ক্লিওপেট্রা, এসো—

[রমণীরা মাটির দিকে চাহিয়া গম্ভীর অগচ বিনয়-নম্রভাবে মঞ্চের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল]

ক্লিওপেট্রা। (নতমুখে) যদি আমাদের

তিরস্কার করতে এসে থাকো, মারটিয়াস,

—তাহলে আগেই বলছি, আমাদের তিরস্কার

করো না। আমরা অনেক বাধা দিয়েছি,

অনেক চেষ্টা করেছি, এমন কি অভিযাচার

করবার আগে পর্যন্ত আমরা মাথা নোয়াই

নি—সত্যি বলছি, প্রিয়তম—

মারটিয়াস। তোমার জন্যে কানিনি,

এমন এক মুহূর্তও আমার কাটেনি! সারা-

দিনরাত তোমার জন্যে কেঁদেছি—

( কাদিতে আরম্ভ করিল এবং তাঁহার আভাসে অপর রমণীরাও কাদিতে লাগিল )

মারটিয়াস । শাস্ত হও, ক্লিওপেট্রা—এরা নিজেদের দস্থ্য বলে স্বীকার কবেছে—চলো, ক্লিওপেট্রা, এখন বাড়ী ফিরে চলো—

ক্লিওপেট্রা । ( মুখ না তুলিয়া ) আমার ভয় হচ্ছে, আবার তিরস্কার করবে। কিন্তু এখানে এদের সঙ্গে থেকে থেকে এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে—মারটিয়াস, এসব পাছাড় তোমার ভাল লাগছে না ?

মারটিয়াস । ক্লিওপেট্রা, এ কি বলছো, বুঝতে পারছি না। পাছাড় নিয়ে কি হবে ? কি বলছো তুমি ?

ক্লিওপেট্রা । তোমাদের বোধ হয় রাগ হবে, কিন্তু সত্যি কথাটা বোঝ, আমাদের মোটেই দোষ নেই—মারটিয়াস, সত্যি বলছি, তোমার নিরম-মত আমরা কৈদেছি কিন্তু তোমরা কি বলছো বা চাইছো, তার কিছুই বুঝতে পারছি না—আরও কাদিতে বসো, কাদবো, আরও কাদবো। ভয়গণ, এরা ভাবছে, আমরা এদের জন্যে যথেষ্ট কাদিনি। এসো ভয়গণ, এদের সে ভুল শুদ্ধ করে দাও—কাদো, কাদো সকলে,—মারটিয়াস, তোমায় কত ভাল বাসতুম—

[ রমণীদের চোখ অশ্রুর ধারা বহিল ]

সিপিও । ক্লিওপেট্রা, শাস্ত হও—তোমাদের এ সময় উত্তেজিত হওয়া ভাবি খারাপ। আর, মশাইরা, শুনছেন, আপনারা বাড়ী যান, বাড়ী ফিরে যান। ক্লিওপেট্রা, এসো—চলো, শোবে চলো—তুমি শোওগে—আমি খাবার-দাবার দেখছি—

মারটিয়াস । খাবার নিয়ে কি হবে ?

কি সব বলছো—ক্লিওপেট্রা, ~~শাস্ত~~ হও, —ভিতরে একটা বোঝার গোলমাল হয়েছে—তোমরা বুঝতেই পারছো না যে, তোমরা অপছন্দ করেছো—

ক্লিওপেট্রা ( কাদিতে কাদিতে ) বলুন ত, তোমরা এখন তিরস্কার করবে। সিপিও, প্রিয়তম, আমার ক্রমালখানা কি তোমার কাছে ?

সিপিও । হ্যা, এটা যে নাও—

মারটিয়াস । আচ্ছা, ক্রমাল কি হবে—

ক্লিওপেট্রা । ( কাদিতে কাদিতে ) একটা ক্রমাল নিয়ে ঠাট্টা ! কাদবার সময় আমার ক্রমাল না হলে চলে না যে ! আর এ সব তোমারই দোষ মারটিয়াস ! তুমি কি নিষ্ঠুর—

রমণীরা সকলেই কাদিতে লাগিল—স্যাবাইনরা এবং জন-কয়েক রোমানও কাদিতে লাগিল।

ভীত স্বর । প্রসারপিনা, প্রসারপিনা—মারটিয়াস । ( গম্ভীর স্বরে ) স্যাবাইনগণ, শাস্ত হও, সংযত হও—ঠিক থাকো, নড়ো না। এক পলকের মধ্যেই আমি সব ঠিক করছি। বোধ হয়, আইনের দিক থেকে কোন গোলমাল হয়েছে ! এ দুর্ভাগা রমণী ভাবছে যে, ওর ক্রমাল চুরি করেছে বলে ওকে দোষী করা হচ্ছে—স্বপ্নেও ভাবছে না যে, ও অপছন্দ করেছে। এইটাই আমাদের এখন প্রমাণ করতে হবে—অধ্যাপকগণ, আরম্ভ করুন ( অধ্যাপকগণ পড়বার উদ্যোগ করিলে রোমানরা ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল ; সিপিও ক্লিওপেট্রার হাত ধরিল )

সিপিও। স্বীকার কর, স্বীকার কর ক্রিওপেট্রা, তাড়া-তাড়ি স্বীকার কর, নৈলে এখনি ওরা আবার শুরু করবে—

ক্রিওপেট্রা। আমার স্বীকার করবার কিছু নেইত! এ-সবই মিথ্যা নিন্দা—

মারটিয়াস। অধ্যাপকগণ, আরম্ভ কর—  
সিপিও। স্বীকার করো ক্রিওপেট্রা, বলো তাড়াতাড়ি! হায় হায়, ওরা মুখ খুললো বলে—এখনি আবার আরম্ভ করবে। সাবাইনগণ, থামো, থামো, একটু দেরী কর—এরা স্বীকার করেছে—তোমাদের মুখ বুজোও অধ্যাপকগণ, এই যে, এই যে ক্রিওপেট্রা স্বীকার করেছে—

ক্রিওপেট্রা। আচ্ছা, ভালো—আমি স্বীকার করছি—[ অগ্র রমণীদিগকে ] ভয়ী-গণ, স্বীকার কর—

সিপিও। তাড়াতাড়ি, হ্যা, এরা সবাই স্বীকার করেছে। সব ঠিক হয়ে গেছে—ঠিক হয়ে গেছে—বাস্, চুকে গেছে—

মারটিয়াস। ( হতবুদ্ধি হইয়া ) মশায়রা, আর একমিনিট দেরী করুন। আচ্ছা ক্রিওপেট্রা, বিশেষ-একুশে এপ্রিলের মাঝামাঝি রাতে তুমি আর এই সব রমণী এদের দ্বারা অপহৃত হয়েছো—এ কথা স্বীকার করছো?

ক্রিওপেট্রা। ( অবজ্ঞাভরে ) না, আমবা নিজেরা পালিয়ে এসেছি! গল্প হয় না বলতে?

মারটিয়াস। বলেছি, বুঝতে পাচ্ছে না।  
অধ্যাপকগণ—

ক্রিওপেট্রা। মারটিয়াস, তোমরাই অতি নীচ কাজ করেছে, তোমরাই ঘুমিয়ে ছিলে,

আমাদের রক্ষা করনি—তোমরাই আমাদের এদের হাতে তুলে দিয়েছ—তোমরাই আমাদের তুলে ছিলে, আমাদের তাগ করেছো, আর এখন এসে আমাদেরই ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলছো—আমরা পালিয়ে এসেছি। মারটিয়াস, আমরা দৃত হয়েছি, অতি হীনভাবে অপহৃত হয়েছি। ( কাদিতে কাদিতে, ) বিশ্বকোষ খুলছ কেন! যে-কোন রোম-ইতিহাসে এ-বিষয় পড়তে পারো ত, তাতে জলজলে অন্ধরে লেখা হয়ে গেছে।

সিপিও। ( খুব জোরে ) অধ্যাপকগণ, মুখ বুজোও, বুজোও বলছি। ( অধ্যাপকদের মুখ খোলাই রহিল—রোমানরা অতিশয় ভয় পাউল এবং জনকতক মঞ্চ ছাড়িয়া পলাইল )

মারটিয়াস। রোমানগণ, সাবাইনগণ—সব শোন—এক মুহূর্তেই সব গোলমাল আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। এ গোলমালটা যত্নগত—অধ্যাপক, দেখি, তোমাব অবস্থাটা দেখি। এই তো—হঁ, এটা আমার জানা উচিত ছিল। কব্জা ভেঙে গিয়েছে সেইজন্তে মুখ বন্ধ হচ্ছেনা। যাক, বাড়ী গিয়ে ঠিক করে নেবো। এদের যে চুরি করে আনা হয়েছে সেইটে এরা স্বীকার করেছে—তাই ষায়েট! আমি নিজের কানে সে কথা শুনেছি—এতদিনে আমাদের কাজ সফল হলো—আকাশ-পাতাল একসাথে কেঁপে উঠেছে—ক্রিওপেট্রা চলো, এবার বাড়ী ফির—বাস্তবদেবতার—

ক্রিওপেট্রা। আমি তোমার বাস্তবদেবতার কাছে ফিরে যেতে চাই না—

সাবাইন রমণীগণ। চুণায় যাক তোমাদের বাস্তবদেবতা! আমরা আর ফিরে যাব

না—এখানেই আমরা থাকবো। বেশ আছি এখানে। আমাদের অপমান করছো তোমরা! আমাদের সব হরণ করে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। রোমানগণ, আমাদের রক্ষা কর,—আমরা যাব না।

(অস্ত্রের বন্ বন্ শব্দ করিতে করিতে রোমানরা ক্রমশঃ পশ্চাতে সরিয়া গেল এবং রাগতভাবে স্যাবাইনদের পানে দেখিতে লাগিল)

একজন রোমান। রোমানগণ, সব অস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হও—তোমাদের জীবনের রক্ষা করতে হবে—রোমানগণ, সব অস্ত্র নাও—সজ্জিত হও—

মারটিয়াস। (ঘণ্টা বাজাইয়া) ব্যাপার কি? এখনি একটা যুদ্ধ ঘটবে যে! ওঃ, আমার মাথা ঘুরছে। স্যাবাইনগণ—আমার মাথা ঘুরছে—

প্রসারপিনা। (অগ্রসর হইয়া ধীর অথচ গভীর স্বরে) রোমানগণ, উত্তেজিত হয়ো না—একা মারটিয়াসের সঙ্গে আমি একটু কথা কইবো—

(স্যাবাইনদের সার হইতে কম্পিত কণ্ঠের বিরহ-কাতর আহ্বান—প্রসারপিনা, প্রেমসী আমার...ওঃ...)

প্রসারপিনা। [ ধীরে ] কে? প্রিয়তম! কেমন আছ? মারটিয়াস, এখানে এসো, ভয় পেছো না—তোমার সব সৈন্তেরা পালাবে না। তোমার জী ক্লিওপেট্রা কি আমরা কেউই জ্বাৰ বাড়ী ফিরে যাবো না—বুঝতে পারছো? ব্যাপারটা বুঝতে পারছো?

মারটিয়াস। অবাক হয়ে গেছি, ক্লিওপেট্রা, তা হলে আমি বাচবো কি করে? ক্লিওপেট্রাকে

ছেড়ে যে আমি থাকতে পারি না—আর সে যে আমার একেবারে আইন-সঙ্গত জী—আচ্ছা, তুমি কি ভাবো, কোনরকমেই পে আসবে না?

প্রসারপিনা। না, কোনরকমেই না...

মারটিয়াস। তবে আমি কি করবো?—দেখতে পাচ্ছো, তাকে আমি কত ভালবাসি—তাকে না পেলে কি করে বাঁচবো?

(কাঁদিতে লাগিল)

প্রসারপিনা। আরে, কাঁদছ কি! মারটিয়াস—(আন্তে-আন্তে বলিল) সত্যি, তোমার জন্তে আমি হুঃখ হচ্ছে—আচ্ছা, তোমার চুপি চুপি লছি, শোন, একটা উপায়, কেবল এক উপায় আছে—তাকে চুরি করো...

মারটিয়াস। কিন্তু সে কি আসবে?

প্রসারপিনা। [ বাড় নাড়িয়া ] যদি চুরি করো, তাহলে না এসে কি করে থাকবে?

মারটিয়াস। কিন্তু সেটা তো ভারি অত্যাচার কাজ হবে। বুঝছি, আমার কু-মতলব দিচ্ছ তুমি, যাতে অত্যাচারিত করি—তাহলে আমার জায়-বুদ্ধির কি হবে—না, তোমরা জীলোক, তাই ভাবো, জোর বার যুদ্ধে তার। হায় নারী—

প্রসারপিনা। থাক, ও-সব কথা আগে অনেকবার শুনেছি। মারটিয়াস, দেবতার বেদিন তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিনটা ভারি খারাপ ছিলো। তোমরা যে কি রকম মুখু, তা বলা যায় না—যদি আমাদের পুরুষের অধীনে থাকতেই হয়, তাহলে যারা বলবান, তাদেরই বেছে নেবো। আর বলবান ঐ ওরাই। তুমি কি ভাবো, আমরা বারবার

চুইয়েত, আবাত ফেরত্ চাইলেই ফিরে যেতে অর্থাৎ এই রকম একবার হারাতে আরবার ফেরত্ যেতে খুব ভালবাসি?

হর। প্রসারপিলা, প্রেসসী আমার ..

প্রসারপিলা। হ্যাঁ, এই যে প্রিয়তম, কেমন আছ?.. আর লোকেরা আমাদের নিয়ে জিনিষপত্রের মত নাড়া-চাড়া করবে—যেই একজনের কাছে দুদিন কাটিয়েছি অমনি আর-একজন চুরি করে নিয়ে যাবে,—আবার যেই সে-নতুনটির কাছে দুদিন থেকে সরে গেছি, অমনি সে পুরোনো নোকটি এসে বলবেন—চলো, ফিরে চলো! সত্যি, মারটিয়াস, যদি এর বিরুদ্ধে লাগতে চাও, যদি আপনার জ্বাকে নিজের করে' নিতে চাও, তাহলে এক-কাজ করতে হবে—বেশ বলবান হতে হবে—কারো কাছ হতে মেগে নিয়ো না! আর জ্বার জন্তে প্রাণপণে লড়া অর্থাৎ যদি মরতে হয়, তাহলে তার রক্ষার্থেই মরো। সত্যি বলছি, মারটিয়াস, শোন, যে-বামা তার জ্বাকে রক্ষা করতে-করতে প্রাণ দিতে পারে, সেই স্বামীর সমাধির উপর লুটিয়ে মরাই জ্বালোকের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, গোরব সে! মারটিয়াস, এটাও ঠিক জেনো, বামা খারাপ হলে জ্বাকেও খারাপ হতেই হবে—

মারটিয়াস। কিন্তু ওদের যে সব অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে, আমাদের যে কিছুই নেই...

প্রসারপিলা। যাও, 'অস্ত্রশস্ত্র' যোগাড় করে আনো—

মারটিয়াস। তাছাড়া ওদের গায়েও বেশ জোর, কিন্তু আমাদের তো তা নেই—

প্রসারপিলা। যাও, গায়ে জোর করগে—সত্যি, মারটিয়াস—তুমি এমন মুখ্য।

মারটিয়াস। (তার কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া) তুমি কি মুখ, নারা, আমার পরীক্ষা করছ! প্রলোভন দেখাচ্ছ! কিন্তু মারটিয়াস ভুলছে না! বেঁচে থাক আমাদের এই আইন! পাশব অত্যাচারে পন্ন-জ্বীদের হরণ করতে চায় যারা, তারা তা করুক—বাড়ী ধ্বংস করতে হয় করুক—জিনিষপত্র ভাঙে ভাঙুক—আমরা কখনো কোনও আইন-বিরুদ্ধ কাজ করব না—আইন অমান্য করব না। এ হতভাগ্য স্যাবাইনদের দেখে জগৎ যদি হাসে হাসুক—তারা কখনো আইনের অপমান করবে না—আইনের বিরুদ্ধে যাবে না। সংলোক দরিদ্র হলেও সম্মান পায়—সম্মানের দাম অনেক বেশী! আমরা সে ভায়াতার সম্মান খোঁষাব না। স্যাবাইনগণ, ফিরে চলো, ফিরে চলো বন্ধুরা। সব কাঁদো, স্যাবাইনগণ, নয়নে ধারা বইয়ে কাঁদো—শোক করো সব, বুক চাপড়াও—আর কাঁদতে লজ্জা করো না—ওরা ঢিল মারিতে মারুক, ঠাট্টা করে করুক, তাতে কান দিও না, তোমরা শুধু কাঁদো—ওদের যা ইচ্ছে হয়, করুক! স্যাবাইনগণ, কাঁদো,—আজ লাক্ষিত অপমানিত আইনের জন্তে তোমরা কাঁদো মনুষ্যত্ব পদদলিত দেখে কাঁদো। কাঁদো, আর কাঁদো। সেই সঙ্গে এই কথাটি মনে রেখো—আইনের মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। স্যাবাইনগণ, চলো—সব ঠিক হও—ভেরৌবাদকগণ, এবার অভিযানের সুর ধর। হুপা এগোও, এক পা পেছোও—হুপা এগোও, একপা পেছোও—

[রমণীরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল]



ক্লিপেট্রা। মারটিরাস, দেয়ী কর, একটু দেয়ী কর—

মারটিরাস। দূর হয়ে যা, মায়াবিনী নারী—  
—আমি তোকে চিননা, চাই না! আইনের  
অপমান! না, কখনো তা হবে না। ওহে,  
অত তাড়াতাড়ি নয়—আন্তে আন্তে চল  
সব—

[ ভেরোতে ককণ সুর বাজিয়া উঠিল—  
রমণীরা কাদিতে কাদিতে স্যাবাইনদের দিকে

বাঁহেতে চাহিল; কিন্তু রোমানরা ~~কোঁর~~ করিয়া  
তাহাদের ধরিয়া রাখিল। জয়ী রোমানরা  
আনন্দধ্বনি করিল। হাস্য বা ক্রন্দন, কোন-  
দিকেই লক্ষ্য না করিয়া, আইনের মোটা  
মোটা বইয়ের ভায়ে নত হইয়া স্যাবাইনরা  
একই ভাবে চলিতে লাগিল—ছুই পা  
আগাঠিয়া, একপা পিছাইয়া—মুখে এক-কণা,  
—“হুপা এগিয়ে, একপা পেছিয়ে ... ..” ]

শ্রীহরবোধ চট্টোপাধ্যায়।

## সমালোচনা .

উগ্র-ক্ষত্রিয় পরিচয়। শ্রীযুক্ত হরিরচরণ  
বহু কর্তৃক সঞ্চলিত। প্রকাশক, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী,  
বর্ধমান। কলিকাতা, সেট্রাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে  
মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে  
শাস্ত্রাদি হইতে তথ্য-সংগ্রহ-দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে,  
উগ্র-ক্ষত্রিয়গণ রাজপুত জাতি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন;  
এবং তাঁহারা বেদোক্ত বাহুল্যত উগ্র-রাজত্ববংশধর  
ক্ষত্রিয়। রচনাটি কথোপকথনের আকারে প্রণীত।

উষসী। শ্রীমতী শান্তা দেবী প্রণীত। প্রবাসী  
কাৰ্যালয়, ২০১-৩-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাহ্ম  
মিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি ছোট  
গল্পের বহি। “স্বমনা”, “পৌষ-পার্বণ”, “পিতৃদায়”,  
“আনন্দ-প্রদোপ”, “ময়না” ও “রূপকথা”—এই ছয়টি গল্প  
এই গ্রন্থে আছে। “ময়না” গল্পটি ব্রেট-হার্টের একটি  
গল্প-অবলম্বনে লিখিত; বাকী গল্পগুলি মৌলিক।  
“পৌষ-পার্বণ” ও “পিতৃদায়” গল্পদ্বয়টি আমাদের সবচেয়ে  
ভালো লাগিয়াছে—গল্পদ্বয়টি নিখুঁত। “পৌষ-পার্বণের”  
গোপাল ও হরমা, এবং “পিতৃদায়ের” অলকা—এই  
তিনটি চরিত্র বেশই ফুটিয়াছে। অল্প ঘটনার ও  
বিনা-আড়ম্বরে তাহাদের চিত্র-বৃত্তি হৃদয় কর্তৃক লাভ

করিয়াছে। অপর গল্পগুলির বর্ণনায় লেখিকা ভাবকে  
স্থানে-স্থানে বড় মোচড় দিয়াছেন—মাঝে মাঝে  
অনাবশ্যকভাবে ভাবকে ফেনানোও হইয়াছে। বাই  
হোক, এ ক্ষুদ্র সামগ্রী; কালে সারিয়া যাইবে। ছোট  
গল্প-রচনার লেখিকার হাত আছে। বইখানির ছাপা-  
কাগজ-বঁধাই চমৎকার।

বিনেয়কানন্দ। (সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা)।

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক,  
গ্রন্থকার। কলিকাতা, লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত।  
মূল্য ছয় আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে মহাত্মা  
বিনেয়কানন্দের অগুরু কণ্ঠ-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়  
প্রদত্ত হইয়াছে। বিনেয়কানন্দ ভারতের অসাধারণ  
প্রতিভাশালী কর্মবীর। তাঁহার কীর্তি-কথার যত  
অধিক প্রচার হয়, ততই দেশের স্বতন্ত্র। গ্রন্থের রচনা  
চলনসই, তবে মাঝে মাঝে একটু মূকতার ধরণে  
পাঠককে চুপক লাগাইবার চেষ্টা আছে—সেটুকু, অশা  
করি, দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ পড়িবে। কারণ হৃদয়ের রাগি  
দেখাইতে বাস্তব জীবনের প্রয়োজন হয় না। বইখানির  
ছাপা-কাগজ ভালো।

শ্রীসত্যব্রত শর্মা।

কলিকাতা—২২, হাকিম স্ট্রীট, কাস্টিক প্রেসে শ্রীহরিরচরণ দ্বারা কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, হাকিম স্ট্রীট হইতে

শ্রীকালচাঁদ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত।



ସ୍ତ୍ରୀ



# ভারতী

৪২শ বর্ষ ]

চৈত্র, ১৩২৫

[ ১২শ সংখ্যা

## বসন্ত সঙ্গীত

বেঙ্গাগ—টিমে তেতাল।

বসন্ত জেগেছে আজি প্রাণে :

নিশা মোর সুখে ভোর, তুখের' গানে।

দখিণা বায়, বুলায়ে যায়—

সুবাস হাত গায়, মমতা দানে।

কভু শশি-অম্বর, কভু তারকা ভরা,—

নিশীথিনী ;

নিদ্রা মাঝাবিনা গো—

কি মন্ত্র ঢালে তার কানে কানে,—

জোছনা সে চুষনে ঢুলে পড়ে,—

তারকা চেসে ওঠে বুকের ঘোরে,—

ভবনে শান্তি নামে, বনে থামে গাথা,

প্রান্তি-নিমলিত অবনো-আঁখি ;

বার্ষ এ ফাগুন রাত্তি সবথানে,

গো সবথানে।

বসন্ত জেগেছে শুধু আমারি প্রাণে।

তন্দ্রাহীন ছনয়ন, ভাব বিহ্বল মন

ছুটে চলেছে কোন্ অজানা পানে

কে জানে !

( আমার ) গানের সাধী, ধ্রুব তারকাটি

জোগায় আশার ভাষা সুরতানে।

বসন্ত জেগেছে শুধু আমারি প্রাণে।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেনলাল গাঙ্গুলী।

## স্বরলিপি

II সা না -পা না। সা সা গরা -গা। পঙ্কা -গা মা।  
ব স স্ত জে গে ছেং আং জি

। গা -রা সা -।। সসা -রগা -মপা -কা। পা -। -। -।  
প্রা ০ গে ০ নিশা ০০ ০০ মোর ০ ০ ০

। সী<sup>+</sup> না -পক্ষা -। পা<sup>১</sup> -। -মা -গা। -। -। -। -।  
 সু খে ০০ • ভোর ০ • • • • •

। গা<sup>১</sup> মা -। পা। মা<sup>+</sup> -গা -রা -সা। সা<sup>১</sup> -। -। -। II  
 হু খে • র গা • • • • •

II -। না না না। সী<sup>১</sup> -। -। না। ধনসরী<sup>১</sup> -সনা -ধপা ক্ষা।  
 • দ খি গা বায়্ • • • • •

। পা<sup>১</sup> -। -। -।। ক্ষা<sup>১</sup> ক্ষা -। ক্ষা। পা<sup>১</sup> পা ক্ষপধ -পমগা।  
 যায়্ • • • • •

। গা<sup>+</sup> মা পা মা। -গা<sup>১</sup> -। রসা -নসা II  
 ম ম তা দা • • • • •

II মা<sup>১</sup> পা না না। না<sup>১</sup> -। না না। -সী<sup>+</sup> সী সী সী  
 ক ভু খ শি অ • খ রা • ক ভু তা

। সী<sup>১</sup> সী<sup>১</sup> রী সী। সী<sup>১</sup> রী না সী।  
 র কা ভ রা নি নী পি নী

। সী<sup>১</sup> -গী গী গী। রগর্মপী<sup>১</sup> -মর্গর্মসী<sup>১</sup> না না। সী<sup>১</sup> -। -। -।  
 নি • দ্রা মা যা••• •••• বি নী গো • • •

। সী<sup>১</sup> না -। পা। মা<sup>১</sup> -গা গা -মা। পা<sup>+</sup> মা গা -।  
 কি ম • দ্র চা লে তার্ • • • • •

। রসা -। -নসা -।। সা সা সা -না। সা সা গা গা।  
 নে• • • • •

। গমা রগা -মপা মা। গা -। -। -। পা পা জা -পা।  
 ১. চু. লে. . প ড়ে . . . তা র কা .

। সঁা না পজ্জা পা। মগা মা পা মা। গা -। রসা -সঁা।  
 হে সে উ. ঠে যু. মে র ঘো . . রে. .

। মা পা পা না। . না না না। সঁা সঁা সঁা রঁা।  
 ড় ব নে শা . শ্রু না মে ব নে থা মে

। সঁা -। সঁা -। সঁা -। না না। ধপা -। জা পা।  
 পা . খা . শ্রা . শ্রু নি মো. . লি ত

। পা না না -সঁা। ধনসঁরঁা -সঁা -ধপা জপা।  
 অ ব নী ঔ. . . . . খি.

। পা -। পা -। পা -। পা -। মা গা রগা -মপা। -মা -। গা -।  
 ব্য . র্থ . এ . ফা . গু ন রা. . . . . তি .

। গা মা পা -। না না সঁা রঁা। ধনা -সঁরঁা -সঁা -।  
 স ব খা . নে গো স ব খা. . . . .

। সঁা -। -। -। . সঁা গাঁ গাঁ রঁগাঁ। -সঁপাঁ সঁা গাঁ সঁা।  
 নে . . . . . ব স স্ত জে. . . . . গে হে শুধু

। পা জপা -মগা মা। গা -রা সঁা -সা II  
 আ মা. . . . . রি শ্রা . . . . .

II সা সা না -প্ৰা। সা সা সা -। নুসরা -গমা পা কপা  
ত জা হীন্ ০০ ছ ন যন্ ০ ভা০০ ০০ ব বি০

। মা মা গা -। গা মা -। পা। না না না সা।  
হ্র ল মন্ ০ ছু টে ০ চ লে ছে কোন্ ০

। সা না -। পা। মা -। -। গা। -। -। -। -। গমা পা -। -।  
অ জা ০ না পা ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ কে ০ ০ ০

। মা -। গা -। -। -। রা -সা ।। না না না না।  
জা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র গা

। সা সা । । ধনা সর্না -সর্না -ধপা। কপা -। -। ।  
নে র ০ ০ সা ০ ০ ০ ০ ০ থা ০ ০ ০

। পা জা জা পা। কপা -ধপা মা -। গা -। -। -।  
হ্র ব ভা র কা ০ ০ ০ ০ টা ০ ০ ০

। সা গা -মা -। পা না -। না। না । সা -।  
জো গায় ০ ০ আ শা ০ র ভা ০ ষা ০

। সা গা রসনা -ধপা। মা -। -। গা। সা গা গা রগা।  
হ্র র ভা ০ ০ ০ ০ ০ ০ নে ব স স্ত জে ০

। -মর্পা মা গা সর্না। পা কপা -মগা মা। গা -রা সনা -সা II  
০০ গে ছে শুধু আ মা ০ ০ ০ রি প্রা ০ ০ ০

## মধ্য-এসিয়ায় বৌদ্ধ শিল্প-কল

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম

ভারতবর্ষ হইতে কোন্ সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম চীনে প্রথম প্রবেশ লাভ করে, সে সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান হইয়াছে ; এবং এই সন্ধানের ফলে পরস্পর-বিরোধী নানা মতের উদ্ভব হইয়াছে । ফেনপুঞ্জের আদ্য এই বিবিধ মতরাশি এখন সঙ্কুচিত হইয়া হুইয়াই দাঁড়াইয়াছে যে সম্রাট সিঙ্‌টির রাজ্যকাল (৬৫ খৃষ্টাব্দ) হইতে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে ও চীন-দেশ-বাসীগণের লৌকিক ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয় । প্রায়ই দেখা যায় যখনই কোন দেশে কোন যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি কাল্পনিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে । গল্পগুলি হয়তো একেবারে নিছক কল্পনার বস্ত্র নহ—বাস্তবের পোড়েনে ও কল্পনার টানায় তাহা বোনা হইয়াছে ।

সুপ্রাে আমরা অনেক ভবিষ্য ঘটনার সূচনা পাইয়া থাকি । সম্রাট সিঙ্‌টি এইরূপ একটি স্বপ্ন দেখিলেন ;—একজন সুবর্ণময় পুরুষ যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন । রাজভ্রাতা এই স্বপ্নের বিচার করিয়া বলিলেন যে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ পশ্চিম দেশের (১) সুবিখ্যাত ধর্মপ্রবর্তক শাক্যমুনি বুদ্ধদেব ভিন্ন আর কেহই নহেন ; চীনে যে তাঁহার ধর্মের বহুল প্রচার

হইবে, এহ স্বপ্ন তাহারই দ্যোতক । বুদ্ধ-দেব ও তাঁহার ধর্মের বিষয়ে চীনদেশ-বাসীগণের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু জ্ঞান না থাকিলেও তাহারাজানিতেন যে পশ্চিমে ভারতবর্ষ বলিয়া এক দেশ আছে ও সেখানে একজন মহাপুরুষ এক অভিনব ধর্মের প্রচার করিয়াছেন । প্রবাদ আছে যে খৃষ্টপূর্ব ১১৭ সালে কয়েকজন বৌদ্ধ শ্রমণ চীনদেশে সন্ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া কারাগারে নিষ্কপ্ত হন; দৈব-প্রভাবে তাহারাজানিত লাভ করেন । গভীর নৈশ নিস্তর্রতা ভঙ্গ করিয়া কারাবার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল, বন্দী শ্রমণগণের দেহ হইতে লোহ জ্বিল্লির স্রুত হইয়া পড়িল এবং এক সুবর্ণবর্ণ পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন ! ইহা হইতে অনু-মিত হয় যে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম আবির্ভাব এই সময়েই ঘটে । ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চীনাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না । অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ভূগোল-সম্বন্ধে গ্রীকদের সে ধারণা ছিল তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন । কেহ বা ভারতকে ত্রিভুজ, কেহবা ট্রাপিজ, কেহ বা চতুর্ভুজ মনে করিতেন । চীনাদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে । আমরা চীনের প্রাচীন ইতিহাস-পাঠে জানিতে পারি, ইনি বংশের (খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়

(১) অর্থাৎ ভারতবর্ষের । ভারতবর্ষ চীনদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া চীনসাহিত্যে ও চীনপরিব্রাজক-দের লিপিতে ইহা “পশ্চিমদেশ” বলিয়াই অভিহিত হইয়া আসিয়াছে ।



শতাব্দী) সম্রাট হোয়েটি (Hwei-Ti বা Wu-Ti) প্রবল-পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল ১২৪-১৭২ খৃঃ পূঃ। তাঁহার শৌর্য্যে বহিঃশত্রুগণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল; দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন-হেতু সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল। এই সুখ-শান্তির একমাত্র কণ্টক ছিল—পার্বত্য জাতি হুগুং-নুগ (Hing-nu)। কিন্তু তাহাদের উৎপাত বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারি নাই। এই জাতি তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে চীনের পশ্চিম-সীমান্ত কানসু প্রদেশে অবস্থিত ইউয়েছি (Yueh-chi) নামক আর একটি জাতিকে স্রোতোমুখে নিক্ষিপ্ত ভগ্নপুঞ্জের মত আরও পশ্চিমে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সম্রাট হোয়েটি হুগুং-নুগের অরাতি ইউয়েছি জাতির সহিত সখ্য-স্থাপনোদ্দেশ্যে তাঁহার সেনাধ্যক্ষ চাঙ-কৌয়েনকে (Chang-K'ien) ইউয়েছি সভায় দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন। (২) ইনি ইউয়েছি জাতিদ্বারা সমধিক সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাহাদের সদ্যঅধিকৃত ব্যাক্টিয়া দেশ (বহলীক) পর্য্যন্ত তিনি আগমন করেন এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া সম্বন্ধে নানা অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ

করেন। এই ব্যাক্টিয়াতেই ~~ক~~কবার সময় তিনি ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং ঐসংস্রা প্রথম কয়েকটি অভিযান মধ্যপ্রদেশে হইলেও ভারত-আবিষ্কার ইহারই গোণ ফল বলিয়া ধরিতে হয়। এই সময়ের পর হইতেই চীন ও ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের সঙ্কল্প-প্রচার-প্রচেষ্টাই এই দৃঢ় সম্পর্কের মূল কারণ। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ প্রচারকগণ পশ্চিমে গ্রীস, উত্তরে মধ্য এশিয়া ও পূর্বে সুবর্ণভূমিতে (ব্রহ্মদেশে) প্রচার-কার্য্যে ব্যাপ্ত ছিলেন। মধ্য এশিয়ার শত শত মঠ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কুকুমবর্ণ কাষার বাস-পরিহিত সমস্ত ক্ষৌরিতলীষ ভিক্ষুগণের গাথা-গীতে উবর মরুও যেন সজীবিত হইয়া উঠিয়াছিল! কুন্তনের (বর্তমান খোটান) গোশ্ব মঠ ইহার সাক্ষী। শুধু খোটানই বা বলি কেন, সমগ্র প্রদেশেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এখনও বর্তমান। ক্রমে তাহা বলিতেছি।

পূর্বে বলিয়াছি যে সম্রাট সিঙ্টির সময় হইতেই চীনে বৌদ্ধধর্মের উত্তরোত্তর প্রসার হইতে থাকে। এই সিঙ্টির প্রখ্যাত সেনাধ্যক্ষ প্যান চাঙ (Pan

(২) স্যার অর্নল্ড হাইন মধ্য-এশিয়ার স্রিণ হইতে চীন-হরাণ্ড যাত্রা করিবার সময় প্রাচীনকালে এইখান দিয়া কোন্ কোন্ পথ ছিল, তাহা জানিবার জন্য পুরাতন পুস্তক খেঁজিতেছিলেন। তিনি লিখিতেছেন—  
(Ruins of Desert Cathay. Vol. I. p. 512)—

"Ever since the remarkable mission of Chang-Ch'ien whom the Emperor Wu-ti had sent westwards to open communications with the Great Yueh-chi tribe (the later Indo-Scythians then settled on the Oxus) for an alliance against their common enemy the Hsiung-nu or Huns the Chinese knew of two main routes by which to reach the 'Western regions' i. e. the Tarom basin and the countries on the Yaxartes or Syr-Daria and Oxus."

Ch'ao, মধ্য-এসিয়ায় শেন-শেন, খোটান, কুচা ও কাশঘর নামক রাজ্যসমূহ জয় করিয়া, চীন-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই প্রদেশের চীনাগণ যে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিবেন ও তৎপ্রচারে সহায়তা করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? এই ঘটনার পর ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ সংখ্যক চীনা লইয়া একটা দৌত্যসমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতি বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য খোটানে প্রেরিত হয়। ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (৩) তাঁহারা কতকগুলি বৌদ্ধ পুঁথি ও মূর্তি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন, আর তাঁহাদের সঙ্গে আনেন, ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষু কশ্যপ মদঙ্গকে। ইহার শুরু গোভরণ পরে চীনে আসিলে তাঁহাদের জন্য তদানীন্তন চীন রাজধানী লো-সাঙে একটি বিহার নির্মিত হয়। এই দুইজন ভিক্ষু চীনা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং বহু বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থ চীনাঙ্গের সুবিধার জন্য ভাষান্তরিত করেন। (৪) পরে সার্ব্বিক দুই শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই অনুবাদের কাজ করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সাধারণ লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। অনেককেই

আগার পরিত্যাগ করিয়া উপসম্পদা গ্রহণ পুষক অনাগারী ভিক্ষু হইলেন।

ভারতে চীন পরিব্রাজকগণের আগমন  
ও চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার-লাভ

চীনদেশে প্রচলিত বিনয় অর্থাৎ সঙ্ঘের নিয়ামক শাসন সূত্রসমূহ খাটি আছে কিনা অথবা তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, এই সন্দেহ অনেক চীনা ভিক্ষুর মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। ভারতবর্ষে গেলে প্রকৃত বিনয়ের অনুসন্ধান হইতে পারে, এইজন্য, আর শাস্ত্রা পরিভ্রাতা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি সুত্রাং গরায়ান তীর্থক্ষেত্র বলিয়াও বহু চীনা ভিক্ষু দূরগম পথের বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া এখানে আসিতে লাগিলেন। সুদূর চীনে থাকিয়া উপাধায় অথবা আচার্য্যের নিকট হইতে তাঁহারা তথ্যগত শ্রদ্ধের কত কাহিনী মুগ্ধ চিত্তে শুনিয়াছেন—কেমন করিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন, কেমন করিয়া দেবতারা চতুর্পূর্ব-নিমিত্ত দেখাইয়া সংসারে তাঁহার বৈরাগ্যোৎপাদন করিলেন, কেমন করিয়া রাহুলবক্ষোদয়া নিদ্রিতা বশোধরার মায়ী কাটাইয়া গভীর নিশীথে তিনি নগর ত্যাগ

(৩) This is the date of the arrival of the first Indian Sramans Kasyapa Matanga and Bharana (or Dharmaraksha) who were invited by the Chinese Emperor Ming-ti (A. D. 58—75), and it is the historical beginning of Buddhism in China, though there are some traces of it in the earlier literature"—TAKAKUSU, *A Record of Buddhist Practices* p. XVII. Footnote.

(৪) These two were the first Indian Buddhists in China ; they came to China in A. D. 671 and translated several Sutras,—Ibid, p. 183, Footnote.

...First translators of Buddhist texts which are said to have been brought loaded on a white horse. The White Horse monastery was built at Lo-yang. One work of translation is ascribed to Kasyap Matanga and five to Dharmaraksha. Ibid p. 207 Footnote.

করিলেন, ছয় বৎসর কঠিন তপস্চর্যা পার্শ্ব-  
কলেবর হইয়া কঠোর শরীর-পাউনের অসারতা  
উপগন্ধি করিলেন, আর শেষে কেমন  
করিয়া বোধিদ্রুম-মূলে নিষিদ্ধ-অবস্থায় ধ্যান-  
সমাধিতে পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি ভাগরিত  
হইয়া তাঁহার দিবা চক্ষুর বিকাশ হইল,  
প্রতীতাসমুৎপাদ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার  
পক্ষ স্বপ্নের বিনাশ হইল, কেমন করিয়া মাব  
ও মার-কন্তাগণের প্রলোভন কাটাইয়া তিনি  
নির্দোষপন্থার আবিষ্কার করিলেন—জ্ঞানিতে  
জ্ঞানিতে তাঁহাদের পুণক সঞ্চার হইয়াছে,  
শরীর রোমাঞ্চিত অথবা কটকিত হইয়াছে,  
আর ভগবানের সাধনক্ষেত্র, লীলাক্ষেত্রের  
নানাবিধ দৃশ্য কল্পনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে!  
কপিলাবস্ত্র প্রোথারাম, শ্রাবীস্তর ক্ষেত-  
বনারাম, রাজগৃহের বেণু-বনারাম, গুপ্তকূট  
পর্বত; গয়াধর্ম, ষষ্টিবন, বোধিদ্রুম—এ  
সবের কথা কি তাঁহারা পিটকত্রয় পড়িয়াই  
জানিবেন? না। এই পীঠসমূহ একবার  
দেখিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ আকুল হইয়া  
উঠিল। হুম্ম জ্যা গিরির উচ্চতা, মরুকাস্তারের  
মরোচিকাময় বালুকারাশির তপ্ততা, মকর-  
কুন্তীরাশিসমাকীর্ণ হস্তর ক্ষিপ্ৰগতি নদী-  
সমূহের গভীরতা, হিংস্র খাপদ-সঙ্কুল বনানীর  
ভীষণতা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।  
ভারতে চীনা ভিক্ষুগণের প্রবাহ ক্রমেই  
বাড়িতে লাগিল। গয়াতে নাকি কতকগুলি  
চীনা মঠও স্থাপিত হইয়াছিল! ইহাদের মধ্যে  
ফা—হিসেন (অথবা ফা—হিসেন)।  
হোয়েন সাঙ (হুয়ান—সাঙ, উয়াম—  
চোয়াস্ত্ না কি ভুল!) ও ই-ৎপিঙের নাম  
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বোক্ত হইল

ভিক্ষু স্থলপথে আসিয়াছিলেন—মধ্য-এশিয়ার  
ভিতর দিয়া। ভারত হইতে তখনও  
ভিক্ষুগণ চীনে যাহতেছিলেন। ৪০১ খৃষ্টাব্দে  
কুমারজীব ইয়া ও—হিস্ত্ নামক সম্রাটের  
নিকট বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন ও বহু  
(ক্ষেদিকা) স্বত্বের অমুবাদ করিয়াছিলেন;  
পরে তিনি রাজপুরোহিতও হইয়াছিলেন। ইনি  
অশ্বঘোষ ও নাগার্জুনের জীবন চরিত রচনা  
করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৫২০ খৃষ্টাব্দে  
বোধি-ধর্ম কান্টন হইয়া নানকিঙে গিয়া-  
ছিলেন। সেখানে রাজা তাঁহার ধর্ম-প্রচারে  
অসন্তুষ্ট হইলোঁতিনি স্বীয় অমুভাবের দ্বারা মাত্র  
একটা মলকে উড়ুপ করিয়া তরঙ্গ-ফৌত ঠাণ্ড-  
টালি নদ অবলোকাক্রমে পার হইয়াছিলেন।  
চীনদেশীয় শিল্পীগণের নিকট এই ঘটনাটি  
চিত্রাঙ্কনের উপজীব্য হইয়া আছে। এইরূপে  
চীনে বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল।  
তাও ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধ ধর্মের ঘোর শত্রু  
ছিল ও মাঝে মাঝে বৌদ্ধগণ যেমন প্রতিকূল  
সম্রাটের আনলে অমানুষিক অত্যাচার  
সহিয়াছেন, তেমনি আবার অমুকুল  
নৃপতিবর্গের সহানুভূতির ছায়ায় শীতল হইয়া  
নিজেদের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। সে  
কাহিনী এ প্রবন্ধের বিষমীভূত নহে।

হান ও পরবর্তী রাজবংশের সময় চীন-  
দেশের প্রভাব সম্যক বর্দ্ধিত হইয়াছিল,  
এবং তাহাঁ মধ্য এশিয়ার সম্যক  
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পর  
চীনদেশে নানা ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে।  
তাহাতে চীনার প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ  
হইয়া তুর্কীদের প্রভাব বাড়িতে থাকে।  
টাঙ (Tang) বংশের (৬১৮—৯০৮ খৃঃ

অঃ) ~~অন্য~~মাংশে এইসময়ই হইয়া থাকে। পরে এই বংশের সম্রাট তাইৎ সুঙ্ (Tai-tsung) ৬২৭—৬৫০ খৃষ্টাব্দ) তুর্কাদিগকে পরাজিত করিয়া চীনের লুণ্ঠ গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। হামি ও তুর্কান চীন সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়, ও তুচা, খোটান, খরস্থান ও কাশঘর চীনা শাসনকর্তার অধীনে আসে। কাশপিয়ান হৃদ পর্য্যন্ত চীন সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। নেপাল ও মগধ হইতে দ্রোতা আসিতে লাগিল, ক্রমের সুলতান ও পারস্তের বাদশাহ চীন সম্রাটকে ৬৩৫ পাঠাইয়া আপনাদিগকে কৃতজ্ঞ মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমেই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। জাতীয় একতার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সাহিত্য ও মুকুমার কলারও উৎকর্ষ সাধিত হইল। এই টাঙ্-বংশ এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠে যে ভারতবর্ষ তাহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই—ইহার ফল অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের অনুকূলই হইয়াছিল। বিজিত ভারত চীনের বিজয় করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধ ধর্মের মূল চীনেক্ষেত্রে সুদৃঢ়ভাবে অন্ত-প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা বিপুল মহারুচ হইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ফেলিল।

## চীন শিল্পকলায় বৌদ্ধ ভাব ও আদর্শের বিকাশ

চীন কল্পনার নূতন রঙ্ ধারণ, চীনা আদর্শ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিল। প্রসিদ্ধ চীন শিল্পী উ—তাওং সু (Wu. Tao-tzu) এই যুগের আদর্শ চিত্রকর। বুদ্ধদেবের নিকরূপ-চিত্র-অঙ্কনে তিনি তাহার শিল্প-চাতুর্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব মল্লদের শালবনে যুগল শালতরুর মধ্যস্থলে শাস্ত্র নিদ্রায় মগ্ন, আর রাজা' প্রজা, অর্হং সম্রাসী, পদ্ম-পঙ্কী সমগ্র স্থূহে জগৎ তাহার শোকে মুগ্ধমান। (৫) তাহার কোন চিত্র এখনও বর্তমান আছে। ক না জানা যায় না। তবে মধ্য এসিয়ার যে শিল্পকলার কথা বলিতে যাচ্ছি, তাহা এই উন্নত টাঙ্ বংশের আমলেই আত্মপ্রকাশ করে।

স্তর অরেল হাইন সাহেব বিস্তর শ্রম স্বীকার পূর্বক মধ্য এসিয়াতে সুগভীর বাসুকা-স্তরনিহিত যে লুপ্তরত্নের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার কতক পরিচয় Ruins of Desert Cathay নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কালে মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের

(৫) Cf. "We must return for a time to China, to consider the classic art of the T'ang epoch (A. D. 618—905), for this is the great creative age of the Far East, by which the whole future development both of Chinese and Japanese art is mainly determined; the part that Greece had played for Europe was played for Japan by China—Dr. Coomarswamy's *Buddha and the Gospel of Buddhism*—p. 341.

"The Tang era stands in history for the period of China's greatest external power—the period of her greatest poetry and of her grandest and most vigorous, if not, perhaps, her most perfect art. Buddhism now took hold on the imagination of the time. China was never in such close contact with India, numbers of Indians including three hundred Buddhist monks, actively preaching the faith, were to be found in the T'ang capital of Loyang. And Buddhist ideas permeated Tang painting—*Binoyon Painting in the Far East* p. 105. et seq.

কিরূপ বিস্তার ঘটয়াছিল, কিরূপে তৃকী, সগুদিন্নান, উইন্তর প্রভৃতি শেমিটিক জাতিগণ সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, কিরূপে চীনের সীমান্তে জল-বৃষ্ণদের সৃষ্টি ও বিলয়ের মত কত-শত ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান-পতন ও সমাধি হইয়াছিল, অধীন রাজ্য-সমূহে চীনের আধিপত্য কিরূপ ছিল, আজ তমিস্রাবৃত ভূগর্ভে প্রোথিত ভাস্কর রত্ন-রাজির পুনরুদ্ধারনে তাহা দিবালোকের মত প্রতিভাত হইতেছে। এমন কত সামগ্রী-সম্ভার বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বাহাতে অর্দ্ধাবলীনস্থিতি সেই পুরাতন যুগের দৈনন্দিন চঞ্চল আবনের স্পন্দন অদৃশ্য করিতেছি। কত কাজের অকাজের আসবাব, কাঠ-কাঠার সরঞ্জাম, চেয়ার, টেবিল, ইঁহর-ধরার কল, ঘর-কন্নার নানান খুঁটিনাটির সামগ্রী, দলিল-দস্তাবেজ ও অস্ত্রাস্ত্র কাগজ-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, দেখিয়া মনে হয় যেন এ-সব কলাকার! আর তখনকার গৃহস্থালীর সুস্পষ্ট ছবিটা যেন নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়া উঠে। আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে পড়িয়াছি যে কাঠে কাঠে বর্ষণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করা হইত। যে সমস্ত জাতি সভ্যতার পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাকি অরণি-সাহায্যে অগ্নিমহন-প্রথা প্রচলিত আছে। তুখারা ও ইরামেনে মন্বনের জন্ত ছুইটী অরণি ও টুঙ-ছরানে

একটা মন্বনদণ্ড পাওয়া গিয়াছে (১) কিন্তু এই মন্বকুক্ষি হইতে যে শিল্প-সম্পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এ-সব কিছুই নয়। তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

### কয়েকখানি চিত্রের ব্যাখ্যা ও বিবরণ

পাথালিক, নিরা, মিরণ ও টুন হুয়াঙে যে-সমস্ত বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিতে গ্রীক-বৌদ্ধ অর্থাৎ গন্ধার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির প্রভাব বর্তমান। কোন কোন স্থলে ইহার পরিবর্তনও ঘটয়াছিল। তাহা বলিতেছি। খাদালিকের একটি বৌদ্ধ মঠের অন্তরভাগ অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্তির দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে—কোথাও বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেছেন, কোথাও তিনি উপবাস-ক্লিন্ন আর কোথাও বা অর্হংগণ কর্তৃক পূজিত। নিম্নাতে কাঠের জিনিষগুলির উপর খোদাইয়ের কাজ গান্ধার আদর্শে করা হইয়াছে। এষ্ট সকল স্থলে ঐতিহাসিক মূল্য-বিশিষ্ট যে-সমস্ত কাগজ ও গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’ পত্রিকায় “মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধ ধর্ম্ম” শীর্ষক প্রবন্ধে দিয়াছি, অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন। মিরণের শিল্পকলায়—কি চিত্রে, কি ভাস্কর্য্যে সেট

(১) “H. G. Evelyn while recognised them as regular fire-flocks meant for the production of fire by the churning of small wooden sticks which fitted the holds” —Ruins of Desert Cathay Vol. I. p. 313.

“...By the side of so much evidence of a highly organised civilization, it was strange to come upon a small block of wood which had undoubtedly served for producing fire in the manner current at all times among savage races”—Ibid Vol. I p. 393.

(গাথার আদর্শের অন্তর্গত) পারলক্ষ্য ও  
 ৩য়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মূর্তি সর্বত্র  
 বর্তমান। আসনোপবিষ্ট এবিধ বৌদ্ধ  
 মূর্তিগুলির একরূপ ভাবে পারচ্ছদ্য সন্নিবেশিত  
 হইয়াছে যে সেই সুদূর লপ-নর নরুর ভায়র  
 কি নিপুল ভাবেই যে গ্রীক-বৌদ্ধ অঙ্কন-  
 রীতির অনুকরণ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে  
 বিস্মিত হইতে হয়। বিহার-প্রাচীর-গায়ে  
 বিবিধ বিষয় অবলম্বনে চিত্রসমূহ লিখিত  
 হইয়াছে—উড্ডীন গন্ধর্ব্ব, উপদেষ্টা বুদ্ধদেব,  
 অবহিত রাজপুত্র। ধ্যান, অভয়, বর,  
 বিতর্ক, নানাবিধ মুদ্রায় বুদ্ধদেব চিত্রিত  
 হইয়াছেন। বুদ্ধদেবের গায়ে সৌম্যমিতিক  
 রীতির বেশ, ও মুখে গ্রীকরীতির ভাব  
 লক্ষিত হয়। কোণাও বা আনন্দ-প্রমুখ  
 শিষ্যগণ তাঁহার বন্দনা করিতেছেন, আর  
 কোণাও বা তিনি ধর্ম্মের অপবাদ করিতে-  
 ছেন, বুদ্ধকরপুট রাজপুত্র অবহিত হইয়া  
 তাহা শ্রবণ করিতেছেন। গাণ্ডিত, ভাক্ত,  
 অজ্ঞতা, অসুখাধার বিহারে যেমন জাতক  
 চিত্রসমূহ অঙ্কিত আছে, এখানেও সেইরূপ।  
 আচার্য্য কুমারস্বামী লিখিত Mediaeval  
 Sinhalese Art নামক গ্রন্থে বেসসাস্তের  
 জাতকের ঘটনাবলম্বনে যে অনবদ্য চিত্র  
 অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি দেখিয়া  
 মুগ্ধ হইয়াছি। এখানেও সেই বিষয়  
 চিত্রিত হইয়াছে; কিন্তু এই ছবি শিল্পকলার  
 মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না। মিরণের চিত্রে  
 গ্রীক-বৌদ্ধ পদ্ধতিই বর্তমান ?

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে জাতক-চিত্রের  
 কণ্ঠদেশে (নিম্নভাগে) সুষমায় পুষ্পরাশির  
 দ্বারা গ্রন্থিত অগ্গদ্য তরঙ্গায়িত হইয়া

চলিয়াছে ও তাহার কঁকে কঁকে পূর্ণ-  
 ঘোবনা গন্ধমালাপরিশোভিত কতকগুলি নর-  
 নারীর মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে। এগুলিতে  
 গ্রীক ও রোমীয় চিত্রাঙ্কন-রীতির স্পষ্ট ছাপ  
 বর্তমান; তাহাদের সহিত বৌদ্ধ পূজা-পদ্ধতি  
 অথবা বৌদ্ধ দেবদেবীর কোনও সম্পর্ক  
 আছে বলিয়া মনে হয় না। এক স্থলে  
 একটী গৌণময়ী কামিনী চারি-তীর-বিশিষ্ট  
 মাণ্ডোলিন বাজাইতেছে, তাহার চক্ষু সলজ্জ  
 ও ভূমিনাবিষ্ট, ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলের উপর  
 দিয়া শুভ্রকুম্ম-মালা ঘুরিয়া গিয়া শুচাক  
 গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে লাল কিতায় গ্রহিবন্ধ  
 হইয়াছে। লোচনিত পুষ্পবয় কণ্ঠভূষণের  
 কায় করিতেছে। পূর্ণায়ত সৌন্দর্য্যের  
 সামঞ্জস্য-বিধায়ক গুণগুণ গলিতভাব-  
 ব্যঞ্জক। হহার পাশ্বে একটী বালিকা  
 মালা ধারিয়া আছে ও একজন সুপুরুষ যুবা  
 তাহার দিকে চাহিয়া আছে। রোমীয় আঁট  
 গল কিংবা গাধারদগের বেরূপ আলেখ্য  
 রচিত হইত, এও সেইরূপ। পুরুষের  
 দক্ষিণহস্তে বক্ষের সম্মুখে ধৃত একটী  
 ক্ষটিক পাত্র। তাহার পরেই একটী সুন্দরী  
 লোহিতাভ দ্রাক্ষাগুচ্ছ ধারণ করিয়া আছে।  
 তুকাঁস্থানে ও তৎসান্নিধ্যে অবস্থিত জনপদ-  
 বাসীগণ জীবনের আনন্দ পারিপূর্ণ ভাবেই  
 লইতে শিখিয়াছিল। জীবনের আনন্দ-  
 মদিরা পাত্র ভরিয়া পান করিয়া বিতোর  
 হইয়া থাকার এই ছবি। ওমর খৈয়ামের  
 কথা মনে পড়ে না কি ? পরে যে সব  
 চিত্র আছে, তাহাতে গ্রীক অথবা  
 লিভান্তের আঁট প্রকট। এই ছবিগুলি  
 দেখিয়া ঠাইন সাহেব ভুলিয়া গিয়াছিলেন

যে সিরিয়া অথবা রোমের কোন অধীনস্থ প্রদেশের ধ্বংস-বিধেয়ের মধ্যে না থাকিয়া তিনি চীন সীমান্তের কোন বৌদ্ধ মঠে আছেন !

উপরিভাগে জাতক-চিত্রে দেখিতে পাই—এক রাজপুত্র অশ্বারূঢ়, সম্মুখে চারিটি ধ্বলতুরঙ্গম-বাহিত রক্তবর্ণ রথ, একটি রূপসী ললনা সে রথ চালনা করিতেছেন, আর তাঁহার পার্শ্বে দুইটা বালক গহন কাননের নির্দর্শন-স্বরূপ একটি ঘন সবুজ রঙের বৃক্ষ, তৎপার্শ্বে ধনরত্নমণ্ডিত সুসজ্জিত খেতকুঞ্জর চিত্রিত হইয়াছে—যেন জীবন্ত ! অতিশয় দক্ষতার সহিত কুঞ্জরের চোখে ও মুখের ভাব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে—উহার পশ্চাত্তাগের দক্ষিণ পাশে ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর ধরোটি অক্ষরে দুই পঙ্ক্তি লেখা আছে। হস্তার সম্মুখে একজন রাজপুত্র রহিয়াছেন, তাঁহার ঐতি, গ্রীবা, বাহু, মণিবন্ধ বহুমূল্য রত্নভরণে মণ্ডিত। বামহস্ত দ্বিরদের গুণ্ডে স্থাপিত, দক্ষিণ হস্তে ~~ক~~ নগ্ন। তিন্দু তথা বৌদ্ধ শাস্ত্র-মতে দান-কর্ম পূতবারি-সহযোগে সিদ্ধ হয়। ইহাকে “দক্ষিণোদকম্” বলে। ভারতচিত্রে অনাথাপিণ্ডিক সঙ্ঘকে জেত-বনারাম দান করিতেছেন, হস্তে তাঁহার দক্ষিণোদকম্, ইহার পরের চিত্রে চারজন সামান্ত্রবেশ-পরিহিত ঘনকেশ-অশ্রুজাঙ্ঘিত সুদীর্ঘ দণ্ডধারী সন্ন্যাসী।

উপরি ও নিম্নভাগের চিত্র যে একই চিত্রকরের, তাহা উভয় চিত্রে সন্নিবেশিত রাজপুত্রের অঙ্গন হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। নীচের চিত্র যেমন শিল্পীর ছন্দাঙ্গ

হইয়াছে—রোমীয় ~~আর্কটের~~ ~~অ~~ গ্রহণ করিয়াও শিল্পী তাহারই ভিতর স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি উপরের চিত্রে পারিপার্শ্বিক দুই-একটা ক্ষুদ্র বিষয়ে রোমীয় আর্টের অমুবর্তন ভিন্ন মূল বিষয়-সম্বন্ধে ভারতীয় আদর্শ পারস্পর্য্য উপেক্ষা করিয়া স্বীয় বান্ধিত্বের পরিচয় দিতে ভরসা করেন নাই।

চিত্রের বিষয় সম্বন্ধে দুই-একটি কথা না বলিলে জ্ঞানিগণ ভুল বুঝা যাইবে না। জাতক কথায় রাজপুত্র বেস্‌সান্তরের গল্প আছে—এস্থলে তাহাই চিত্রের উপজীব্য। শেষ বোধিলাভের পূর্বে বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব বেস্‌সান্তর হইয়া জন্মিয়াছিলেন। জাতক গ্রন্থে ইহাই শেষ জাতক। যাহারা মূল পালি না পড়িয়া অমুবাদ পড়িতে জানেন, তাহারা Cowell এবং Rouse দ্বারা অমুবাদিত ৫৮৭ নং জাতক পড়িবেন। সংক্ষেপে কথাটা হইতেছে এই—জন্মবার পর হইতেই রাজপুত্র খুব দানধ্যান করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের অমুভাব-যুক্ত একটি খেতকুঞ্জর ছিল; সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারিত। এক সময়ে কলিঙ্গ জনপদে অনাবৃষ্টিবশত অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইয়া বড় লোকক্ষয় হইতে লাগিল। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কলিঙ্গবাসীরা অবশেষে স্থির করিল যে তাহারা শিবরাজ্যের রাজকুমার বেস্‌সান্তকের নিকট খেতকুঞ্জর ভিক্ষা করিয়া নিজেদের দেশে বৃষ্টি করাইলে তদ্বারা উৎপন্ন শস্য দ্বারা তাহাদের জীবন অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তাই চিত্রের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—ঐ নারীমুণ্ডি

তাহার দুঃখভাগিনী সহধর্মিণী মাত্রী ও বালকদুইটা তাহার পুত্র। কেন্দ্রশিল্পপার-শাভিত্তি ব্যক্তিগণ তাহার নিকট অশ্ব ও রথ ভিক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি একপ্রকার নিঃশ্ব হইয়া পুত্রপত্নী-সমভি-বাহারে নির্কাসনে চলিলেন। সেখানেও তিনি পুত্রদ্বয়কে (মূল জাতকে পুত্র ও কন্তা) পূজক নামে এক ব্রাহ্মণের হস্তে দান করিলেন। পাছে ত্রীকেও এইরূপে দান করিয়া ফেলেন, সেইজন্য স্বয়ং শক্র (ইক্ষু) ব্রাহ্মণের বেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া মাত্রীকে ভিক্ষা চাহিয়া গইলেন; ও পরে তাহার দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রথ, পত্নী, পুত্র সব ফিরাইয়া দিলেন।

### অগ্ন্যান্ত চিত্র

টুন-স্থানাঙে আবিস্কৃত চিত্রগুলির সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। এখানে ষ্টাইন সাহেবের আবিস্কৃত কতকগুলি (canvas) অতিসূক্ষ্ম রেশম অথবা লিনেনের তৈয়ারী। বেণু-পেশিকালয় রজু দেখিয়া বোধ হয় যে সেগুলি মন্দির-চূড়াবলম্বী ধ্বজা। উহাতে দুই পার্শ্বেই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের চিত্র। বহুমূল্য রেশমের উপর যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা কখনই নিম্ন অঙ্গের নহে—এ কথা বলিলে কোন

দোষ হয় না। বাস্তবিকই চিত্রগুলিতে উচ্চ শ্রেণীর পর্বকল্পনার চিত্র আচ্ছাদ্যমান। পূর্বে বলিয়াছি যে খৃষ্টীয় প্রথম হইতে নবম শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত কাণে চীনের টাঙ-রাজ্যগণ প্রাচুর্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ের তাহাদের রাজ্যের ত্রী, সম্রাট, ও সাধারণ উন্নতির সঙ্গে শিল্প-কলাও চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ধর্মসম্বন্ধীয় আসল চিত্রকলার নিদর্শনস্বরূপ সেই শিল্প-সামগ্রী চীন ও জাপান হইতে লুপ্ত হইয়াছে। যে চিত্রের কথা বলিতেছি, তাহা ঐ সময়ের। চিত্রাঙ্কনে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম মধ্য এসিয়ায় আসিয়া সমধিক রূপান্তরিত হইয়াছিল। সেই ধর্মের গ্রন্থাস্তর-নিবিষ্ট বিষয়গুলিকে মডেল ধরিয়া লইয়া চিত্রগুলি অঙ্কিত হইলেও চিত্রকরণ স্থানীয় শিল্পকলার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাজেই ঐ চিত্রগুলিতে স্থানীয় রঙের ছোপ লাগিয়া আছে। (৭) .

কোথাও দেবগণ মিলিত হইয়াছেন, কোথাও বা বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থ-বর্ণিত স্বর্গের দৃশ্য—এইগুলি বড় বড় ধ্বজার অঙ্কিত। আর অন্যান্য পতাকাগুলির বিষয়,—কোথাও পৃথক পৃথক দেবতা রহিয়াছেন, আর কোথাও বা বুদ্ধদেবের

(৭) Cf.—The Buddhist art of China is on another footing, for notwithstanding it repeats the forms of Indian art, China had already an old, and from a technical standpoint, exceedingly accomplished art, and a profound philosophy of her own, before the Buddhist pilgrims and missionaries carried across the wastes of Central Asia the impulse to a new development of thought and of plastic art, ... Chinese Buddhist art is not entirely Indian but essentially a new thing, almost as much Chinese as Indian.—Coomarswamy *Buddha and the Gospel etc.* p. 338.



জীবনের ঘটনাবলী পর্যায়ক্রমে এক একটা করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। শৈবোক্ত চিত্রগুলি সংখ্যায় কম হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব ও মনোহারিত্ব এবং শিল্পকলার চাক্তার হিসাবে সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বোধিদ্রুম-মূলে তাঁহার সমুদ্রকৃত্য করা পর্যন্ত, তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাগুলি বহন করিতে ভারতীয় চিত্রকরগণ ভাল জানিতেন। টুম হুয়াঙের শিল্পগণও এই বিষয়গুলিই গ্রহণ করিয়াছেন। লুঘিনি উজ্জানে গৌতমের জন্ম, শৈশব ও যৌবনের অতিমামুষ অকৃত ঘটনাবলী, ক্ষতঃপুর-প্রাসাদের রম্য জীবন, চতুর্পুংসনিমিত্ত-দর্শন ও সংসার-ত্যাগের কল্পনা, নিজ্জিতা বশোধরা ও শিশুপুত্র রাজুলের নিকট নিঃশব্দ বিদায়-গ্রহণ ও প্রাসাদ-পরিত্যাগ, মহাভিনিক্ষমণ্ডের অমুবর্তী বিবিধ অবস্থা, ছয় বৎসর কঠোর তপশ্চর্যা, এবং নৈরঞ্জার নদীতীরে শেষ বোধিস-অবস্থার বিসর্জন, ও সমুদ্রস্বের বিকাশ—এই বিষয়সমূহ অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মূর্তি-তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ Foucher সাহেব এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—“In short we meet again with almost the whole catalogue of episodes which have remained classic since the Greeco-Buddhist School of Gandhara. The most important point to note is *the frankly Chinese fashion in which these traditional subjects have been treated*. Under the hands of local artists they have

undergone the same ~~transformation~~ <sup>transformation</sup> which Christian legend has under those of Italian and Flemish painters.”

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য হয় যে চিত্রোক্তগত বিষয়গুলি পরম্পর ক্রমে চলিয়া আসিলেও চীনা ছাঁচে তাহাদিগকে ঢালা হইয়াছে, জীবনের পরিবেষ্টনের মধ্য দিয়াই উক্ত বিষয়গুলিকে স্ফুরিত হইবার অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। চিত্রের প্রতিলিপি দিয়া আমার বক্তব্য বুঝাইতে পারলেই ভাল হইত; তদভাবে সংক্ষেপে উহার বর্ণনা করিয়া কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

বেণুপেশিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার একটা ধ্বজাকে যেমন-তেমন করিয়া জোড় দেওয়া হইয়াছে। এই পতাকার উপরিতন অংশে বুদ্ধদেবের জননী মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন বুদ্ধদেব খেতকুঞ্জর হইয়া তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছেন। মূল পাণি গ্রন্থ “নিদান কথা” হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“অথ বোধিসত্ত্ব সেতবরবারণো হত্বা—  
ততো অবিন্দুরে একো সুব্রহ্মপবতো—  
তথ চরিত্বা ততো ওরুথহ রজত পবতম্  
অভিক্রিষ্ট্বা উত্তরদিগতো আগম্য রজত-  
দামবল্লায় গোণ্ডায় সেতপদ্রুমম্ গাহত্বা  
কোকনাদম্ নাদত্বা কনকবিমানম্ পবিগত্বা  
মাতু শয়নম্ তিক্ষত্বম্ পদকিন্মম্ কত্বা  
দক্কিণ সগুগম তলৈত্বা কুচ্ছিম্ পবিট্টসদিশো  
অহোসি।”

অনুবাদ।—“অতঃপর বোধিসত্ত্ব খেত-  
কুঞ্জর হইয়া—তাঁহার অনতিদূরে একটা

সুবর্ণ ছিল—যেখানে চরিত্রা তথা  
হইতে অবরোহণ করিয়া রজতপর্কিতে  
আরোহণ করিয়া উত্তরদিক হইতে আগমন  
পূর্বক রজতবর্ণ শুণ্ড দ্বারা শ্বেতসরোজ  
গ্রহণ করিয়া ক্রৌঞ্চ নাম করিয়া কনক-  
বিমানে প্রবেশ করিল; মাতার শয্যা বারজয়  
প্রদক্ষিণ পূর্বক দক্ষিণপার্শ্ব ভেদ করিয়া  
যেন কৃষ্ণিতে প্রবিষ্ট হইলেন।”

এই চিত্রের নীচেই মায়াদেবী চীনা-  
পরিচ্ছদ পরিহিত চারিজন লোকের স্বর্কে  
স্থাপিত শিবিকারোহণে লুধিনি’ উদ্ভান-  
অভিমুখে চলিয়াছেন। শিবিকা-বাহকগণের  
হরিত পতি-ভঙ্গী চিত্রে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাহার পরের চিত্র হইতেছে, লুধিনি  
উদ্যানে মায়াদেবীর কৃষ্ণচ্যুত হইয়া বুদ্ধ-  
দেবের জন্ম। “গালগাপং গহেত্বা তিট্ঠমানায়  
এব চ অস্যা গবত্ভবট্ঠানং অহোমি।”  
শালশাখা গ্রহণ করিয়াই তিনি বুদ্ধদেবকে  
প্রণাম করিলেন। এই চিত্রে টাডিসনের  
কোন ব্যতিক্রম হয় নাই বটে, কিন্তু  
গাছার শিল্পের আদর্শ রক্ষিতও হয় নাই।  
চীনাবেশ-পরিহিতা মায়াদেবীর জামার  
পকাণ্ড হাতা হইতে শিশুবুদ্ধ স্রষ্ট হইয়া  
পাড়িতেছেন ইহাই চিত্রিত। এই প্রদেশে  
বুদ্ধদেবের জন্ম-গ্রহণ-প্রসঙ্গের একটু পদ্ধতির  
অনুসরণ হওয়ায় নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে  
পারা যায় যে স্থানীয় প্রভাবকে বলবান।

পরের দৃষ্টটি বড় মনোহর। শিশুবুদ্ধ  
‘চলি চলি পা পা’ করিয়া বৈড়াইতেছেন,  
ও যে যে স্থান তাঁহার চরণশৃষ্ট হইতেছে,  
সেই সেই স্থানে কমলদল ফুটিয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয় পতাকায় দুইটি চিত্র আছে,—

সংসার-বন্ধনচ্ছেদনাভিলাষা ইঞ্জিয়-সংগ্রাম-  
বিজয়ী বীর গৌতম গভীর নিদ্রাধে প্রাসাদ  
পরিভ্রমণ করিতেছেন, আর তাঁহার প্রমোদা-  
গারে চতুর হাব-ভাব-শালিনী বিলাসিনী  
কামিনীগণ নিদ্রায় চেতন-হার্য—“একচ্চা  
পগ্ধরিতথেলা, লালাকিণিয়গণ্ডা, একচ্চা  
দাস্ত খাদন্তিযো, একচ্চা বিপ্লল গণ্ডিকা,  
একচ্চা বিকটমুখা, একচ্চা অপগতবখা।’  
ইহা দেখিয়াই কামে তাহার বিতুষ্টা  
জন্মিয়াছিল। দৈবপ্রভাবে রক্ষাবর্গ গভীর  
নিদ্রায় অভিভূত, চিত্রে উপরদিকে একখণ্ড  
মেঘ দেখা যাইতেছে, তাহারই উপর বুদ্ধদেব  
প্রিয় তুরঙ্গম কণ্টকের পৃষ্ঠে চলিয়া-  
ছেন, আর সারাধ ছন্দক পাশে পাশে।  
পর্কত ও বনানীর রঙ দেখিলে কোন  
সময়ে তিনি নগর ত্যাগ করিতে ছিলেন,  
অহা বেশ ব্যথিতে পারা যায়। নিম্নের  
চিত্রে গৌতম গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,  
এই নিদারুণ সংবাদ-শ্রবণে রাজা শুদ্ধোধন  
তাঁহাকে ফিঙ্গিয়া আনিবার নিমিত্ত যে  
চারিজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা  
অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে রাজা  
ও মন্ত্রী সমক্ষে তাহাদের বিচার হইতেছে,  
তাহাদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাধা হইয়াছে,  
পশ্চাতে রক্তাধর-পরিহিত দুইজন দাতক  
দাঁড়াইয়া আছে।

ইহা ছাড়া বৌদ্ধ মহামান তত্ত্বের  
দেবদেবী, বোধিসত্ত্ব, লোকপাল, দারপাল  
প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে। তাহার পরিচয়  
দিতে গেলে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া প্রবন্ধ  
পাঠ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। প্রবন্ধান্তরে  
সে কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

গান্ধার আর্ট, গান্ধার আর্ট করিয়া অনেক বকিয়াছি, কিন্তু বিষয়টি কি, তাহা বলা হয় নাই। সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতেছি। আচার্য্য কুমারস্বামী শিল্প-সম্বন্ধে একজন প্রামাণিক authority। এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তিনি বলেন, নিম্নলিখিত কারণে এই গান্ধার অথবা গ্রীক বৌদ্ধ শিল্পের এইরূপ নাম-করণ হইয়াছে। নিম্ন বুদ্ধমূর্তি সম্পূর্ণ ভারতীয়; ইহা ব্যতিরেকে বৌদ্ধ দেবসমাজের যাবতীয় প্রধান আদর্শস্থানীয় মূর্তিগুলি, যথা, দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি; অর্দ্ধশায়িত বুদ্ধমূর্তি বোধিসত্ত্ব ও অস্ত্র বৌদ্ধদেবতার মূর্তি, অথবা

স্বয়ং বুদ্ধদেবের জীভা-দৃশ্যের অল্প পরিচয়-সমূহ তথা স্থাপত্য মণ্ডলের কতকগুলি ক্ষুদ্র বিষয়, হয় গ্রীক-রোমীয় মডেল-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা তদ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত। বাস্তবিক প্রাদেশিক রোমীয় কলার একাংশই হইতেছে গান্ধার শিল্প, তবে এই রোমীয় কলার সহিত ভারতীয় উপাদানের বিন্দু সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং ইহা দ্বারা বৌদ্ধ পুরাণকথিত বিষয়গুলির প্রকৃষ্ট ক্ষুরণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্পের ধরণ যে উত্তর কালের ভারত-বৌদ্ধ ও চীন-বৌদ্ধ শিল্পে সংক্রমিত হইয়াছে, তাহা অতি স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়। (৮)

জীকালীপদ মিত্র।

## মনের কুয়াসা

( ১৯ )

জ্যোতিষ্ময়ী এইবার আপনাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি।—বসর পাইল।—কি দৃষ্টিভঙ্গি, কি ঔৎসুক্যের মধ্যে সপ্তাহ কাল কাটিয়া গিয়াছে! এমন কি ব্যায়ামসমিতিকে পর্যাপ্ত এ করদিন তাহার মনে পড়ে নাই। এ কিরূপ ভয়স্রতা! কই পিতার অস্ত্রের সময় ত

জ্যোতিষ্ময়ী এতদূর কাতর হইয়া পড়ে নাই।

তাহার মজ্জাসমুচ্চিত মন উত্তর স্বরূপ কহিল, —“কোন কারণ ছিল না ত তাহার, পিতার ত জীবনসংশয় হয় নাই।—তবুও”—

ইহার অর্থ,—তবুও একজন অনায়াস পরের কৃত্রিম এত কেন ভাবনা! প্রতিদিন ত রোগে তাপে পৃথিবীর কত লোক মৃত্যু

(৮) 'This art is so called, because apart from the seated Buddha form, which must of course, be wholly Indian, the leading types of the Buddhist pantheon—viz. the standing Buddha figure, the reclining type, the figures of Buddhi-Swatta and other Buddhist divinities, as well as the types of composition of some of the scenes of the Buddha's life, and likewise certain details of architectural ornament, are either directly based upon or strongly influenced by Greeco-Roman proto types. Gandhara art is in fact a phase of provincial Roman art mixed with Indian elements and adapted to the illustration of Buddhist legends. The influence of the western forms on all later Indian and Chinese Buddhist art is clearly traceable...'

—Ibid. p. 329.

প্রাণে মৃত্যু হচ্ছে; কার জন্য এত ভাবে? এখানে কুসাল কথটা মনে আনিয়াছা বালিকার মনের মধ্যে একটা কঠোর শিহরণ উঠিল।

তখন বিগ্রহের সজীভ হইয়া গিয়াছে। আহায়াবির পর সোকার তইয়া জ্যোতির্পরী বিশ্রাম করিতেছিল। পাশেই হাতের কাছে একটি ছোট টেবিলে, ফুলতরা ফুলদারী একটির চারিদিকে নানারকম কাগজ পত্র, বহি সাজান। জ্যোতির্পরী তাহার মধ্য হইতে একখানি খিরসকিট পত্র টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। একটা প্রবন্ধ আপোষোড়া শেষ করিয়া তখন তাহার হৃৎ হইল,—এক অক্ষরও মন্তিকে প্রবেশ করে নাই। পাঠিকার ফুল অক্ষি বহির পাতার নিবন্ধ ছিল বটে—কিন্তু স্বপ্ন আঁধি ঘুরিতেছিল অস্ত্র ঘরে। আজ ইচ্ছা করিয়াই প্রাতঃকালে শরৎকুমারকে সে দেখিতে যায় নাই,—তাল আছেন ত তিনি! তিনি কি জ্যোতির্পরীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিতে চাহিতে-ছিলেন? .

এ কিরূপ প্রশ্ন? সে তাঁহাকে দেখিবার তত্ত্ব ব্যাকুল বলিয়া তিনিও কি ব্যাকুল থাকিবেন? এ কি পিপাসা! এখন ত তিনি আরাম হইয়া উঠিয়াছেন—এখনো তাঁহার চিন্তাতেই সে মগ্ন কেন? তাঁহার সারিখ্য লাভের জন্য কেন সে এত ক্লান্ত? এ কি সর্বগ্রাসী ভাব? ইহাই কি প্রেম?

কতি কি? প্রেমের বর্তাকে মনে মনে পূজা করিতে কতি কি? কিন্তু ইহার পরিণাম? এই আকাঙ্ক্ষা—এই চিন্তা, এই পূজার পরিণাম; দোহক বলে দিবে।

হাতের বইখানা জ্যোতির্পরী হুঁকিয়া কেনিয়া দিল।—“না তাহা হইতে পারে না—পারে না,—আমি জ্যোতির্পরী,—চিরকুমারী ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—দেশের জন্য জীবনদান করিয়াছি—আমি ব্যক্তি বিশেষের পরিশ্রিতা গরী।—অসন্তুষ্ট;—অসন্তুষ্ট।” একবার সে অতি চুপে চুপে—বগত উচ্চারণ করিল—“মিশেব চৌকুরী—” তাহার চিন্তা-বলিন মুখে সহসা একটা কৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। ঘরের বাতান্দার বাঁচার রক্তিত পোবা কোকিলটি এই সময় কুহ কুহ করিয়া উঠিল, বাহিরের আন-বাগানে হুই ভারিটা কোকিল এক সঙ্গে ইহার উত্তর পাইল; সহসা—কুহ কুহতানে আকাশ ভরিয়া গেল।—জ্যোতির্পরী মনে মনে বলিল,—“বনের পাখী তোমরা বাঁচার পাবীকে ধরা দিতে চাও ত নাও, আমি কিন্তু ধরা দিব না।” সে প্রতিজ্ঞা করিল আজ সন্ধ্যাতেও শরৎকুমারকে দেখিতে যাইবে না। তাহাতে ভাবিতে অস্তমনস্কভাবে জ্যোতির্পরী ফুলদারীর একটি ফুল তুলিয়া লইয়া আভাষণ করিল। ঐক হইবার সময় কুহ গৃহে আসিয়া হাঝির হইল। আজই সন্ধ্যায় সে বাড়ী হইতে করিয়াছে। হাসির চিঠিখানা, রাজকুমারীর হাতে দিয়া কহিল—

“এই নিম্ন রাজকুমারী। চিঠিখানি আপনাব হাতে ধরে দিতে আমি প্রস্তুত আছি। আজ দায়বৃত্ত হইব।”

জ্যোতির্পরী চিঠিখানা গ্রহণ করিলেন, কুহ খিরসকিটখানা কুড়াইয়া বখানানে রাখিয়া, আনন্দারি খুলিয়া রাজকুমার বৈকানিক সন্ধ্যায় আয়োজনে রত

হইল। আজ তাঁহাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী  
চা-পানের নিমন্ত্রণ।—

হাসির চিঠিখানা পড়িয়া জ্যোতিষ্ময়ী  
বলিলেন—

“সুশুণা দেবী—কে কুন্দ ? আমাকে  
তিনি এত প্রশংসা করে লিখেছেন—লজ্জা  
করে যে।”

কুন্দ বলিল—“ও আমাদের হাসি। সকলে  
ওকে হাসি বলেই ডাকে। এমন সুন্দর  
য়েটে, কি বলব। আপনি যদি দেখেন রাজ-  
কুমারি ত আপনিও নিশ্চয়ই ভালবাসবেন।”

শরৎকুমার প্রলাপের ঘোরে যে হাসির  
নাম উচ্চারণ করিতেন, সেই হাসি নয় ত এ ?  
একটা কিরূপ অস্বস্তি চাঞ্চল্য রাজকুমার  
মন দিয়া বহিয়া গেল ? ইহা কি ভীষণ  
আন্দোলন ?

জ্যোতিষ্ময়ী বলিল—“বিয়ে হয়নি বোধ  
হয় তাঁর ?”

“না। কোন বরকেই যে তার বাপমার  
মনে ধরে না। যা হ'ক এবার শুনিছি—একটি  
মনের মত দেখছেন, সম্বন্ধ চলছে তার সঙ্গে।”

“কে সে ভাগ্যবান ?” জ্যোতিষ্ময়ী  
বন্ধে শোণিতপ্রবাহ সহসা বন্ধ হইয়া  
গেল,—এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎকুমারের  
নাম শুনিবার জন্য সে অপেক্ষা করিয়া  
রহিল। কুন্দ বলিল—“তিনি আপনাদেরই  
আত্মীয়, বিজনকুমার রায়।

বালিকার বন্ধ নিখাস ধীরে ধীরে মুক্তি  
লাভ করিল,—সে হাসিয়া কহিল—“তা  
বেশ, হ'লে মন্দ হয় না। আমি বরণ করে  
কনেকে ঘরে তুলে নেব। তোমাদের  
হাসি, কুন্দ, ডাক্তারদার কে হন ?”

“জানিনে ঠিক, কতটা কোম্পর্ক  
থাকতে পারে। কই তার কথা ত হাসির  
কাছে কখনও শুনি নি। তবে আমার-সঙ্গে  
হাসির দেখা শুনা খুব কমই হয়—বেশী কথা  
কবার অবসরই ঘটে না।”

“সম্বন্ধের কথা কার কাছে শুনলে ?”

কে জানে কেন জ্যোতিষ্ময়ীর মন  
বলিতেছিল খবরটা ঠিক নয়।

কুন্দ করেকথানা কাপড় ও জ্যাকেটের  
মুট মিলাইতে মিলাইতে বলিল—

“ও কথা অবশ্য হাসির কাছে শুনি নি।  
বিদায় দিতে বাবার সময় দিদিমা বলে-  
ছিলেন।—বিকালে কোন্ কাপড়খানা  
পরবেন রাজকুমারি ?”

“দেখ কুন্দ, কতবার তোমাকে বলেছি  
—ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না,  
তোমার বৈখানা হচ্ছে—”

“না না বলুন রাজকুমারি—কোন্খানা  
পরবেন ?”

“আচ্ছা শাদা রঙের যা হয় একখানা  
রাখ।”

“রাজা বাহাদুর কিন্তু রঙিন কাপড়ই  
পসন্দ করেন।”

“তবে তাই রাখ।”

“কিকে নীল বা গোলাপী কি দেব ?”

“তোমার সঙ্গে আর পারা যায় না।  
আচ্ছা—নীলই রাখ। চিঠিখানা পড়েছ  
কুন্দ ?”

“না। মতিরমালা-ছড়াই পরবেন শুধু ?

“সে হবে এখন কুন্দ ; চিঠিখানা আগে  
পড় না। কলকাতার গিরে সর্কাগ্রে এবার  
তোমার হাসির সঙ্গেই দেখা করুব।”

সে আপনাকে হাসি হয়ে বাবে।”

“মাতর মালা ও ত্রেসলেট আপনার জন্তে বার-করে রাখছি।—অন্ত কিছু ত আপনি পরেন না।” এ কথার কোন উত্তর না দিয়া জ্যোতিষ্ময়ী হাসির চিঠিখানা বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“এই নেও।”

কুন্দ নিকটে আসিয়া পত্রখানা লইয়া তাহাতে নেত্রপাত করিল। জ্যোতিষ্ময়ী বলিল—“চৈচিয়েই পড়না—” কুন্দ পড়িতে লাগিল—

সম্মানীয়া রাজকুমারি—

আপনার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ নাই, কিন্তু আপনার গুণের কথা এত শুনিতে পাই—যে না দেখিয়াও আপনাকে ভাল বাসিয়াছি। আপনাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। যখন কলিকাতায় আসিবেন—একবার যদি দেখা দেন ত পরমানন্দ লাভ করিব। সত্য কথা বলিতেছি, বিশ্বাস করিবেন।

ইচ্ছা করে আপনার নিকট আমিও দেশব্রতমন্ত্র গ্রহণ করি,—আমার শক্তি অতি সামান্য কিন্তু আপনার মত গুরুর উপদেশে সেই ক্ষুদ্র শক্তিও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে।

আপনি বয়সে ছোট হইয়াও জ্ঞান বৃদ্ধি ও শক্তিতে আমার অনেক বড়, তাই পরিপূর্ণ প্রীতিভক্তি ভরে আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে ছোট বোন বলিয়াই মনে করিবেন।

আপনার গুণমুগ্ধা ভগিনী—

ঐশ্বর্য গুণ দেবী

পুঃ

শর-দা যদি এখনো সেখানে থাকেন ত আমার নমস্কার দিবেন।

চিঠিখানি পড়া হইলে কুন্দ তাহা রাজ-কন্ডাকে ফিরাইয়া দিয়া কহিল—“সুন্দর লিখেছে; চিঠিখানি পড়ে হাসিকে বেশ ঠিক চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি।”

“ভায়ার ঘনঘটা নেই এইটে আমার বড় ভাল লেগেছে।”

“কেবল কি তাই? চিঠিখানি আগা-গোড়া আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাবে পূর্ণ—আমার সেইটেই বেশী ভাল লাগছে।”

“এই শ্রদ্ধা দিয়ে তিনিই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন?”

“যেমন গজা জলে গজাপুঞ্জো সেইরকম আর কি!”

“এ উপমা এখানে ঠিক সম্ভব হোল না কুন্দ, পণ্ডিত মশায় শুনলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতেন—”

এই সময় একজন দাসী “পণ্ডিত মশায় আইছেন গো” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিল। বাঙ্গালী ঘরে, রাজা সম্রাটের আলয়েও দাসী চাকরের আদব কায়দার বড় একটা আড়ম্বর থাকে। যার না। পণ্ডিত মহাশয়ের নাম শুনিয়া কুন্দ বলিয়া উঠিল, “নাম করতেই হাজির তিনি, লোকটার আয়ু দেখছি অনেক—”

জ্যোতিষ্ময়ী দাসীকে বলিল—“আচ্ছা লক্ষ্মীর মা, তোমাকে কতবার বলেছি অত চৈচিয়ে কথা কবে না,—কিছুতে কি শিক্ষা হবে না তোমার?”

লক্ষ্মীর মা শিরে করাঘাত করিয়া কহিল—“হারেরে কপাল! মারে তোমার ঘরে আইনা শিখাইলাম আমি—আর আমারে শিখাইতে চাও এখন তুমি সেদিনকার

থুকা, পলতে দিয়া যারে কত দুখ খাওয়াইছি !  
কলিকালই হইছে।”

“বেশ বেশ আর বকতে চবে না, নাকি-  
গান আমার ভাল লাগে না। যাও  
পণ্ডিতমশায়কে বল গিয়ে আমরা আসছি  
এখনি।”

লক্ষ্মীর মা তবুও বিড় বিড় করিয়া  
বকিতে বকিতে সোনার তাগা পরা হাত  
ঢলাইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সোনার  
কণ্ঠমালা ও কোমরের রূপার চাবি  
শিকলিও ঢলিয়া উঠিল।

জ্যোতিষ্মরী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে  
যাইবার অভিপ্রায়ে কুন্দর সহিত বারান্দায়  
আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—এই সময় অনাদির  
আবির্ভাব হইল। তাহাকে দেখিয়া রাজ-  
কন্ডার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল,—প্রথমেই মনে  
হইল—“ভাল আছেন ত তিনি?” কিন্তু  
কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই অনাদি কহিল  
—“একটা কথা আছে দ্বিদিমণি।” রাজ-  
কন্ডা কুন্দকে বলিলেন “যাও কুন্দ তুমি  
পণ্ডিত-মহাশয় কাছে বসে একটু গল্প  
কর গে—আমি এখনি আসছি।” কুন্দ  
চলিয়া গেলে জ্যোতিষ্মরী কণ্ঠাগত ভাষা  
রসনামুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—“ডাক্তারদা  
ভাল আছেন ত অনাদি দা?”

“হ্যাঁ ভাল আছেন,—কিন্তু তুমি আজ  
সকালে তাঁকে দেখতে যাওনি—তাই তিনি  
বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি  
ভাবছেন—তোমার বুঝি কোন অসুখ  
করেছে—তিনি তোমাকে দেখতে আসতে  
চান।” জ্যোতিষ্মরীর পণ ভঙ্গ হইল—  
বলিল—“না না তাঁর আসতে হবেনা—

চল আমি এখনি তাঁকে এক দেখতে  
আসি।”

পণ্ডিত-মহাশয় যে তাহার অপেক্ষায়  
আছেন সে-কথা জ্যোতিষ্মরী একেবারেই  
ভুলিয়া গিয়া অনাদির অগ্রবর্তী হইয়া চলিল।

রাজকুমারী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র—  
তাহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থে শরৎকুমার শয্যা-  
তাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অসুস্থতার  
পর এই প্রথম তাহার স্থির হইয়া দাঁড়াইবার  
প্রয়াস। তাহার পা কাঁপিয়া উঠিল; দেখে  
ঈষৎ টলমল করিতে লাগিল। কিন্তু এই  
কম্পন কি কেবলই দুর্জলতাজনিত, কিম্বা  
আনন্দের অধীরতাও ইহার মধ্যে অনেকখানি  
লুকায়িত ছিল? রাজকুমারী উদ্বিগ্নভাবে  
অনুন্দের স্বরে বলিলেন “কি করেন  
ডাক্তারদা,—বসুন বসুন—দাঁড়াবেন না?”

“আমি ভাল হয়ে উঠেছি রাজকুমারি।”

“তবুও বসুন; এখনি বিছানা থেকে  
ওঠবার অবস্থা আপনার ঠিক হয়নি,—পা  
কাঁপছে আপনার।”

“আপনি বসুন আগে।” প্রত্যুত্তরে  
এইরূপ অসুস্থ হইয়া রাজকুমারী আর  
কথা বাড়াইলেন না; শরৎকুমারের শয্যার  
নিকটেই তাহার জন্ত অনাদি একখানি চৌকি  
আগে হইতেই রাখিয়া দিয়াছিল সেইখানিতে  
বসিয়া পড়িলেন। শরৎকুমার তখন শয্যায়  
উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—“আপনি সকালে  
আসেননি—তাই মনে হচ্ছিল—”

শরৎ হঠাৎ খামিয়া গেলেন, রাজকুমারী  
বলিলেন—“না আমার কোন অসুখ  
করেনি,—ভালই আছি।—আপনি ত ভাল  
হয়ে উঠেছেন—তাই আর—”

রবি শরীরও কথাটা এইখানে বাধিয়া গেল—কেননা—যাহা বলিতে যাইতে ছিলেন,—তাহা সত্য নহে। শরৎকুমার তাঁহার পালায় রাজকন্ডার অসম্পূর্ণ কথা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া কহিলেন—

“তাই আর আসার দরকার মনে করেন নি?” বলিতে বলিতে তাঁহার রুগ্ন মুখ—একটা বাথার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। জ্যোতির্শ্রমীর হৃদয়-তন্ত্রীতেও সে বেদনার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে হাসির চিঠিখানা শরৎকুমারের হাতে দিয়া বলিলেন “দেখুন দেখি চিঠিখানা পড়ে ডাক্তারদা; আপনার ভাল লাগবে মনে করে এনেছি।”

শরৎকুমার চিঠিখানি গ্রহণ পূর্বক পড়িয়া রাজকন্ডার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন— “যিনি লিখেছেন—তিনি দেখছি গুণগ্রাহী।”

“তিনি আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন— দেখেছেন ত, কি উত্তর দেব?”

“ফিরিয়ে দেবেন নমস্কারটা।” এমন উদাসীন্তের, সহিত কথাটা শরৎকুমার বলিলেন—যে জ্যোতির্শ্রমীর পূর্বগতি বিবাস বেশ-একটু টলমল করিয়া উঠিল। বলিল— “চিঠি পড়ে ত মনে হয়—আপনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ আত্মীয়তা আছে।”

“ভুল আপনার।—মোটাই না।” বিদায় দিনে হাসির প্রত্যাখ্যানের কথা মনে জাগিয়া উঠিল,—কিন্তু আজ আর সে স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘ নিখাস পড়িল না। শরৎকুমার নিজেই যেন তাহাতে একটু বিস্মিত হইলেন।—জ্যোতির্শ্রমী বলিল “আপনার আত্মা কিন্তু চুপি চুপি অল্প কথাই প্রকাশ করেছে।”

“কি রকম?”

“অনুখের সময় অনেক বারই হাসির নাম আপনার মুখে শুনেছি।”

শরৎকুমারের রক্তহীন পাংশুমুখে সহস্র লজ্জার আভা চমকিয়া গেল। “সত্যি না কি? প্রলাপের ঘোরে কি কথা না জানি শরৎকুমার বলিয়াছেন—আর রাজকুমারী তাহা শুনিয়া কি না জানি মনে করিয়াছেন, ছিঃ!” সব কথা রাজকন্ডাকে খুলিয়া বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু চন্দ্রালোকে বা স্নান দীপনিধার নিকট বসিয়া যে সব কাহিনী বলা যায়,—দিনের ক্যাক্ ক্যাকে উজ্জল আলোক তাহার পক্ষে প্রতিকূল।—তাহা ছাড়া অনাদি ছোকরা ঘরের কোণে বসিয়া আছে, যদিও সে নভেল পাঠে মগ্ন—তবুও ত একজন তৃতীয় বর্জিত ঘরে উপস্থিত।

শরৎকুমার মৌন হইয়া রহিলেন—তাঁহার ভাষা এই সঙ্কটের সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল,—বাড়িটা ও কি ছাই এই মুহূর্তে তাঁহার প্রতিকূল হইবে—সশব্দে এই সময় চটা বাজিয়া উঠিল। জ্যোতির্শ্রমী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “উঠি তবে আজ, ৪টে বেজে গেল, আমাদের আবার আজ চায়ে বৈতে হবে। একটু সাবধানে থাকবেন—এখনো দুর্কল আছেন।”

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বালিকা চলিয়া গেল। শরৎ চোখ বুজিয়া শয়ান হইয়া পড়িলেন। একটা কষ্টের অবসাদে তাঁহার দুর্কল শরীর একান্ত ক্লান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে সত্য এতদিন তাঁহার নিকট লুক্কায়িত ছিল—আজ তাহাতে



তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন,—তিনি বুঝিলেন,—অস্ত্রের পূর্বে যে-তিনি ছিলেন—আজ সে-তিনি নাই। হাসির যে হাসিটুকু তিনি এতদিন হৃদয়নিভে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন আজ ত আর তাহার সন্ধান পাইতেছেন না! জ্যোতিষ্ময়ী জ্যোতিঃসাগরে তাহার শেষ রশ্মিটুকুও যে সহসা মিলাইয়া পড়িয়াছে!—কেমন করিয়া কোন্ মুহূর্ত্তে এ ঘটনা ঘটিল তাহা তিনি বুঝিলেন না,—এইটুকু শুধু বুঝিলেন—যে জ্যোতিষ্ময়ী এখন তাঁহার মনে একমাত্র আগ্রহ দেবতা!

অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর উপহাস! তিনি হাসিকে ভুলিতে চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এমন করিয়া তপ্ত হইতে তপ্ততর অনলদাহের মধ্যে ডুবিয়া কি? হাসিকে যখন তিনি ভাল বাসিয়াছিলেন—তখন তাহাকে দুঃখপ্যা মনে করেন নাই, সেইজন্য তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে কখনও তাঁহার কুঠী বোধ হয় নাই,—কিন্তু জ্যোতিষ্ময়ী তাঁহার পক্ষে একান্তই দুঃখ বস্তু; তাঁহার কাছে আত্মবেদনা জানাইতেও যে সাহস নাই, জ্যোতিষ্ময়ী স্বর্গের তারকা—আর শরৎকুমার মর্ত্যের মানব! চিরদিন এই অনলদাহ নীরবে তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে বহন করিতে হইবে যে।

“ভগবান এমন নিষ্ঠুর তুমি! অথবা ইহাই তোমার করুণা? গৃহী হইবার জন্য আমাকে তুমি সৃষ্টি কর নাই। এ জীবন পরার্থে দান করিতেই তুমি ইচ্ছিত করিতেছ। তাহাই হউক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক,—বল নাও প্রভু বল নাও।”

( ৬০ )

জ্যোতিষ্ময়ীও বেশ স্বচ্ছন্দমনে গৃহে ফিরিল না। অল্প দিন শরৎকুমারের অজ্ঞাতে তাঁহার উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বিকিরণ হইতে সে যে কণিকারাপি কুড়াইয়া আনে সেই আলোকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার হৃদয় আলোকিত করিয়া রাখে,—কিন্তু আজ তাহার পরিবর্তে একটা অন্ধকার বেদনা তার লইয়াই সেখানে হইতে সে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহাদের দুজনের মধ্যে এ কি কুয়াসার ব্যবধান “আজ! তাহার অন্তরতম প্রাণ “হায় হায়” করিয়া উঠিল,—কিন্তু সে তাহাকে সবলে কশাঘাত করিয়া—শাসন বাক্যে বারবার করিয়া কহিতে লাগিল—“ভালই ত সে ভালই! রে অবোধ মন,—তুমি এতদিন যাহা চাহিয়াছিলে—ভগবান আজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন,—এখন দুঃখ করিলে চলিবে কেন? তাঁহার মঙ্গলদান কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সুখ অমুভব কর। ব্যক্তি বিশেষের জন্য হতাশ করা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তুমি দেশের কাজে জীবনদান করিয়াছ ইহা ভুলিও না গো—ভুলিও না।”

গৃহে ফিরিয়া দেখিল—কুন্দ উপস্থিত নাই,—যে দাসী তাহার অপেক্ষায় ছিল—সে বলিল—“কুন্দ-দিদি এসে চলে গেছেন,—আপুনি এলেন ডাক্তারে বলেছেন—” জ্যোতিষ্ময়ী বলিল “না ডাক্তারে হবে না—” দাসী কাঁকুইখানা লইয়া তাহার চুল আঁচড়াইতে গেল। জ্যোতিষ্ময়ী তাহাকে নিরস্ত করিয়া নিজেই তাড়াতাড়ি কোনরূপে দীর্ঘ কেশ-দাম সংযুক্ত করিয়া ফিরাইয়া বাঁধিয়া লইল,

তাহার ঘর ঘণাসা বিনা ঘরে—এবং  
অল্প সময়ের মধ্যে সাজপাক সমাধা করিয়া  
লইয়া পিতার নিকট ছুটিল। বাইবার সময়  
দাসীকে বলিয়া গেল—“পণ্ডিত মহাশয়কে  
গিয়ে বল আজ আর পড়ব না,—তিনি ঘরে  
যেতে পারেন।”

পিতৃকক্ষে আসিয়া জ্যোতিষ্ময়ী দেখিল,  
রাজা তখনো প্রস্তুত নহেন, তিনি বেশ মথ  
ভাবেই খাতার উপর কলম চালাইতেছেন।  
তাহার জন্য পিতা অপেক্ষা করিয়া নাই  
দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইল,—কোন কথা না  
কহিয়া দার পদে আসিয়া তাহার স্বকের  
উপর হাত রাখিয়া দাড়াইল। রাজা তখন  
মুখ তুলিয়া, ঘড়ির দিকে চকিত দৃষ্টি  
নিষ্ক্ষেপ করিয়া কহিলেন—“এই ত! চটে  
বেজে গেছে যে? আচ্ছা তুই একটুখানি  
অপেক্ষা কর রাণি, আমি এখন আসছি।”  
তিনি পাশের ঘরে কাপড় ছাড়িতে গেলেন।  
জ্যোতিষ্ময়ী দেখিল,—টেবিলের উপর খুব  
দামী ফ্রেমের আঁটা—কালোঘাটের ওই পয়সা  
মূল্যের একখানি কালীর পট। সেই ছবিখানি  
হাতে লইয়া বালিকা মনোনিবেশ পূর্বক  
দেখিতে লাগিল।—

এ কি ভাষণ মুক্তি জগদম্বা প্রকৃতির!  
শিবকে পদদলিত করিয়া তিনি এখন  
অশিবা! মধুর প্রেমমিলনকে অগ্রাহ্য করিয়া  
তিনি এখন ভয়ঙ্করা,—নিষ্ঠুর! কিন্তু প্রকৃতির  
পক্ষে এই নিষ্ঠুর ভাবেরও যে প্রয়োজন।  
প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই অন্ত্যায় দমন-  
কারিণী প্রকৃতি এখন যুগ্মমালিনী, ভীমা।

দেয়ালে আধুনিক কোন চিত্রকর-অঙ্কিত  
মাতৃমূর্তির একখানি পট টাঙ্গান ছিল।

একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাহার দিকে নিরীক্ষণ  
করিল। বিশ্বমাতার এই স্নেহ করুণা-  
রূপিণী ভাব কি সুন্দর!—তাহার এই  
ভুবনমোহনী মাধুর্য ও প্রয়োজনে করুণা  
কালীরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে! বালিকার  
জীবনের মধুর ভাবও প্রয়োজনের পদতলে  
এইরূপ অবসর্জন দিতে হইবে,—মাতৃরূপা  
হইবার সৌভাগ্য লইয়া সে জন্ম গ্রহণ  
করে নাই!”

জ্যোতিষ্ময়ীর কোমল মধুর স্বভাবের  
অংশে একটা দারুণ শিহরণ উঠিল,—সে  
চক্ষু মুদ্রিত করিল। রাজা সেই সময় প্রস্তুত  
হইয়া দ্বারদেশে পদার্পণ করিয়া বালিকা উঠিলেন,  
—“ঐ পটখানি মা আমাকে বাঁধাবার জন্যে  
দিয়েছিলেন, বেঁধে এসেছে, তাঁকে পাঠাতে  
ভুলে গেছি।” জ্যোতিষ্ময়ী ছবিখানি টোবলে  
রাখিয়া কহিল,—“এখন এঁইখানেই থাক।  
ক্ষিরে এসে আমি ঠাকুরমার কাছে নিজেই  
এখানি নিয়ে যাব।”

মোটরে চড়িয়া রাজা জ্যোতিষ্ময়ীকে  
বলিলেন—“ওঃ একটা খবর তোকে দেওয়া  
হয় নাই। একটু আগে ম্যাজিস্ট্রেটের রায়  
পেয়েছি। মকদ্দমায় আমাদের জিত্ব হয়েছে।  
অনাদি ও শরণ বেকসুর খালাস।”

জ্যোতিষ্ময়ী আহলাদ প্রকাশ করিয়া  
কহিল, “আমি ক্লাউডেন সাহেবকে প্রাণ  
ভরে ধন্যবাদ দেব। জানতুম যদিও যে,  
জিত্ব আমাদের হবেই, আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট  
যথার্থই ধর্ম্মাবতার—তার কাছে অপচার  
নেই।”

“না না—এ কথা আমাদের তরফ থেকে  
ওঠান ঠিক হবে না। দেখছ না এই

মকদামা তাঁর হাতে গিয়ে অবধি আমি সেখানে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করেছি। তবে যদি তাঁরা একথা তোলেন—তখন ধন্বান দিতে ঘোষ নেই।”

তাঁহারা বধাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানে টেবিল চৌকি পাতা,—চায়ের আয়োজন,—বাহিরের লোকও আজ এখানে কেহ নাই, পিতা কন্যাকে দেখিয়া উভয়েই সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মেম সাহেব নূতন বাংলা শিখিতে ছিলেন, জ্যোতির্শ্মীকে আলিঙ্গন-পাশে বন্ধ করিয়া মুখ চুর্ষন পূর্ব্বক কহিলেন “তোমাকে বড় অধিক দেখতে ইচ্ছা করছিলাম, আমার প্রিয়তম সন্তান। ( My dearest child ) ঠিক হইল কি?”

জ্যোতির্শ্মী হাসিয়া কহিল,—“খুব ঠিক হয়েছে মাদার।” জ্যোতির্শ্মী ইহাকে মাদার বলিয়াই সম্বোধন করিত। মেম সাহেব জ্যোতির্শ্মীকে বাহুপাশ হইতে মুক্তিদান-পূর্ব্বক সুকন্থকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া বৈদ্যলোকে চা চালাতে বাস্ত হইলেন। সাহেব জ্যোতির্শ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার সমিতি কেমন চলছে my dear girl?”

সে যে একদিন সমিতির খোঁজ লয় নাই—সে কথা প্রকাশ না করিয়া কহিল—

“ভালই।”

“আর উৎসব দিনের সেই hero—ডাক্তার চৌধুরী তিনি কেমন আছেন?”

এই প্রশ্নে রাজকন্ডার মুখ ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল, সে আশ্বে আশ্বে উত্তর করিল—“তিনি সেয়ে উঠেছেন।” কিন্তু

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার লজ্জা লক্ষ্য করিলেন না,—তিনি চাপূর্ণ পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইয়া—রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“এমন পচা মকদামা আমার কাছে জীবনে আসে নাই! কি করে যে মুন্সেফ তাকে জিঁত্রে দিলেন।”

রাজা নীরবে হাতের পেয়ালা হইতে সস্তর্পণে—বেশ সুন্দর কাঁদার সহিত একটুখানি চা মুখে গ্রহণ করিলেন। ইংরাজী দস্তুরে পেয়ালার চামচখানা এ সময় একরকম অনাবশ্যক শোভাস্বরূপ। তিনি ঘাঁটার কাজে লাগা ছাড়া ইহা চাপানের কাজে লাগে না। দুএকবার চা মুখে লইবার পর রাজা বলিলেন, “কিন্তু সুজন রায়ের দল—আপনার নামে নানা কথা রটনা করবে।”

“Indeed! কিন্তু সেই ভয়ে ত আমি ন্যায়-বিচারের অপমান করতে পারিনে।” জ্যোতির্শ্মীর মুখকান্তি একটি অপ্রাকৃত জ্যোতিঃসৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে গম্ভীরভাবে কহিল—“আপনার এই ভায়পরতা জগতের অস্থিমজ্জায় স্থান পাক্ সর্বাস্তঃকরণে আমি এই প্রার্থনা করি।” জ্যোতির্শ্মীর বালোচিত সরল উৎসাহে মুগ্ধ হইয়া—ক্লাউডেন সাহেব তাহার পিঠে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিলেন—“Thank you, dear girl—” বলিয়া পত্নীর দিকে চাএর পেয়লাটা বাড়াইয়া দিলেন। মেমসাহেব তাঁহার পেয়ালা পূর্ণ করিয়া দিয়া রাজাকে কহিলেন, “আপনার পেয়ালাটি রাজা বাহাদুর?” রাজার পেয়ালাও তখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল তিনি মেম-সাহেবের অহুরোধ অগ্রাহ করিলেন না।

চা চা লিখা, দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী জ্যোতিষ্ময়ীর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, “তোমার আধ পেয়ালা চা-ও ত এখনো শেষ হোল না,—আর কখনো যে শেষ হবে না তাও জানি।”—তিনি কতকগুলি চকোলেট মিষ্ট জ্যোতিষ্ময়ীর ‘পিরচে’ তুলিয়া দিলেন। সাহেব বলিলেন—“ঠিক হয়েছে—sweets to the sweet.”

জ্যোতিষ্ময়ী হাসিয়া কহিল—“আমি কি এখনো ছেলেমানুষ আছি—মিষ্টার ক্লাউডেন?”

সাহেব হাসিয়া কহিলেন—“By Jove, —তুমি কখনই ছেলেমানুষ ছিলে না—তুমি একজন born sage,—একটি ক্ষুদ্র লামা।”

রাজা বলিলেন—“ঠিক বলেছেন মিষ্টার ক্লাউডেন,—জানেন, ও যখন তিন বছরের মেয়েটি,—তখন আমাকে কি রকম জব্দ করেছিল?”

শেষবে নৃত্য করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া কিক্রপ অটল ভাবে জ্যোতিষ্ময়ী রাজার সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, রাজা সেই গল্পটি করিলেন।

জ্যোতিষ্ময়ী হাসিয়া কহিল—“জানেন মিষ্টার ক্লাউডেন, আমি আমাদের দেশের স্বা-জাতির ‘প্রেস্টিজ’ রক্ষা করেছিলুম।”

“হ্যাঁ ঠিকই করেছিলে, বিজ্ঞবাক্তির (sage) মতই কাজ।”

জ্যোতিষ্ময়ী কহিল—“হ্যাঁ, ফ্রেন্স দেশের লোকের সহস্র অনুরোধ অগ্রাহ্য করে গভর্ণমেন্ট—বঙ্গবিভাগে স্বয়ংক্রিয় নিজের প্রেস্টিজ রক্ষা করতে যাচ্ছেন—।”

কণার গতি ফিরিল—ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, “বঙ্গবিভাগে ত আমি ক্ষতি বুঝি না,—তবে

দেশের লোক যখন এই বিভাগের বিরোধী—তখন গভর্ণমেন্টের এ থেকে নিরস্ত হওয়াই উচিত।”

রাজা কহিলেন “আমাদেরও ত আপত্তির প্রধান কারণ আপাততঃ তাই। যদি গভর্ণমেন্ট আমাদের আবেদন গ্রাহ্য না করেন তাহলে আমরা বিদেশীপণ্য বয়কট করব—”

এই কথা লইয়া তাঁহারা যুক্তিতর্কে পরামর্শে মার্তলেন। বিশেষ ক্লাউডেন এই অবসরে জ্যোতিষ্ময়ীকে তাঁহার বাগান দেখাইতে লইয়া গেলেন,—খানসামা চায়ের সরঞ্জাম উঠাইয়া লইয়া গেল।

আখিনের আরম্ভ। বাগানের কেয়ারিতে, রাস্তার পটিতে রকম বিরকম বিলাতি ফুলের বসন্ত বাহার জমিয়া নাই। জিনিয়া দোপাটি প্রভৃতি হুঁচাচি রকমের ফুল সবে নাত্র এখন অল্প অল্প ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোলাপফুলই এখন ফুলবাগানের প্রধান শোভা। কিন্তু জয় এ-সময় সবজি বাগানেরই। কপি, শালগম, বিট, গাজর, পেয়ারা মটর প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট মিশেব ক্লাউডেনের সবজি-বাগান ভরপুর। ফুলবাগান ও সবজিবাগানের মধ্যস্থিত বাঁশের খিলান-দরজার উপরে ‘মার্সেল নিল’ গোলাপ লতা ফুলে ফুলে ভরা। এই লতা-গাছ জ্যোতিষ্ময়ীর উপহার। রাজবাগানের চুচটি কলম আনিয়া একবৎসর পূর্বে নিজের হাতে সে খিলানের দুই প্রান্তে পুঁতিয়া গিয়াছিল। মেমসাহেবের যত্নে এত শীঘ্র সেই কলম দুইটির এমন মধুর রূপ : এখনো প্রত্যহ তিনি এই গোলাপগাছে স্বহস্তে জল সিক্তন করেন। তাঁহাদের দেপিয়া মালী ছোট জল পান

একটি আনিয়া ধরিল। এই জলপাত্র লইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। মালী বেগতিক দেখিয়া আর একটি বোমা আনিয়া দিল। উভয়ে বরষার মতই হাসি গিলে, বিবাদ কোতুকে বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাগানের আশে পাশে ক্রমশঃ হাসমুহুরা ও রজনীগন্ধার দলও খুলিতে আরম্ভ করিল। মিশেষ ক্লাউডেনের স্নেহাদরপূর্ণ, মুক্ত বায়ুস্বাস—নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া জ্যোতিষ্ময়ীর মনের অবচ্ছন্ন ভাব-প্রকল্পতা চকল হইয়া উঠিল। হৃদয় স্বভাব অবচ্ছন্ন মুক্তির ছন্দে নাচিয়া উঠিল।

কিছু পরে রাজাবাহাদুরের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইখানে আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা বলিলেন—“রাণি, কলকাতা থেকে আজ ম্যানেজারের আসার কথা আছে, একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে চাই।”

জ্যোতিষ্ময়ী একবার আকাশের দিকে চাহিল, পশ্চিমে নদীর পরপারে সূর্য্যদেবের ধানময় তপস্বীমূর্তি, তৎবিকীর্ণ আলোকে দিগ্দিগন্ত লালে লালে সমুজ্জল; নদীর জল বিছাৎবগায় প্রবাহিত। জ্যোতিষ্ময়ী ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—কে জানে কেন? তাহার কি হঠাৎ শরৎকুমারকে মনে পড়িয়া গেল?

মেমসাহেব ক্ষুরমনে বলিলেন,—“এখনি যাবেন রাজা-সাহেব?”

রাজা আবার ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—“একটু দরকার আছে মিশেষ ক্লাউডেন,—নইলে এমন সঙ্গ ত্যাগ করতে চাই এখনি।” ম্যাজিষ্ট্রেট দম্পতি উভয়েই গাড়ী পর্য্যন্ত

আসিয়া তাঁহাদের নির্দয় দিকে মেমসাহেব জ্যোতিষ্ময়ীকে পুনরায় সন্নেহে আলিঙ্গন পুরুক চেষ্টা করিলেন।

ফিরিবার বেলা রাজা নিজে মোটরের কল ধরিলেন। শরতের দিন, সূর্য্য এখন দিগন্তনিম্নে, তবুও সান্নিধ্যগগন উজ্জল আলোকে দীপ্তমান! বিলাতের twilight কি এত রকমই?

ম্যাজিষ্ট্রেটের কমপাউণ্ড ছাড়াইয়া রাজা আর একবার ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—“মিনিট পাঁচেক আমরা আস্তে যেতে পারি।” নদীর ধার দিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে চলিলেন। ওপারে কাশফুলের কি সুন্দর শোভা! মাঝে মাঝে বাতাস শেফালিফুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিতে লাগিল, একজন মালী কেতকীফুল মাথায় লইয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছিল, তাহার সৌরভ পথে ছড়াইয়া দিয়া গেল। নদীর ধারে একটি বটগাছের তলার একখানা সিন্দূরলোপিত প্রস্তর মূর্তি! এ মূর্তি কাহার স্থাপনা কে জানেনা। পাথকজন অন্নপূর্ণার মূর্তি বলিয়া ইহাকে প্রণাম করিয়া যায়।

এই প্রস্তর সন্নিধানে বসিয়া একজন ভিখারী খজনী বাজাইয়া গান করিতেছিল—

মঙ্গল শব্দ বাজে ঘরে ঘরে—

এলেন আনন্দময়ী ভুবন আলো করে!

আজি স্নানালোকে ঝলকে আনন্দ,

বহে কুসুমের মধুর গন্ধ

উথলে দিকে দিকে গীতিচন্দ,

বরষা দিবস পরে।

রাজা গাড়ী থামাইয়া চাপরাশিকে দিয়া তাকে পারিতোষিক পাঠাইলেন—।

গানটি রচনা করিয়াই রচিত। প্রথম যে আশ্বিনে তাঁহার হৃদে কল্পা স্বপ্নরূপে হইতে পিতৃ ভবনে আসিয়াছিল; সেই সময় তিনি এই গানটি রচনা করেন। পুরাতন কত স্মৃতি ইহার সহিত জড়িত; তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। জ্যোতিষ্ময়ী পাশ হইতে তাহা দেখিতে পাইল না। গানটি শুনিতে শুনিতে সে বলিয়া উঠিল—“আশ্বিন মাস পড়েছে বুঝি?”

রাজা চক্ষের জল—চক্ষেই ধরিয়া লইয়া কহিলেন “রাণীর কাছে বুঝি সে খবর এখনো পৌঁছয় নি।” রাণী হাসিয়া পিতাকে আদরের বাহপাশে জড়াইল,—রাজা পুরাতন হৃৎখ ভুলিয়া গেলেন।—চাপরাশী ফিরিয়া আসিলে তিনি এবার মোটার সতেজে চালাইয়া দিলেন।

ম্যানেজার যে কাজের জন্ত আসতেছিলেন,—তাঁহার কাগজ পত্র সব ঠিক আছে কি না—তাহা দেখিবার জন্ত বাড়ী ফিরিয়া রাজা প্রথমেই গেলেন দপ্তরখানায়, আর জ্যোতিষ্ময়ী কালীর পট লইবার জন্ত গেল রাজার ঘরে। কাছেই থাকেন শরৎকুমার, —হয় ত বা এখন তিনি বারান্দাতেই আসিয়া বসিয়াছেন,—একবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবার জন্ত সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু হাতের কালী-মূর্তির দিকে চাহিয়া সেই বিষম পিপাসাও সে সবলে চাপিয়া গৃহ নিষ্কান্ত হইল। সেখান হইতে আপনার ঘরে গিয়া বৈকালিক স্নান ত্যাগ করিয়া মন্দিরে বাইবার বেশ পরিয়া লইল,—তাঁহার পর দ্বিধিমার মহলে প্রবেশ করিল। দ্বিধিমা মন্দির গমন উদ্দেশে তখন বারান্দায় পদার্পণ

করিয়াছেন—জ্যোতিষ্ময়ীকে দেখিয়া চরণ সংযত করিয়া কহিলেন—“আজ যে আমার রাখারাগীর অসময়ে উদয়? মন্দিরে যাবি বুঝি? সাজ সজ্জা যে সেই রকম?”

“হাঁ ঠাকুর-মা, অনেকদিন দেব দর্শনে বাইনি তাই আজ ইচ্ছে হোল। দেখ দেখি তোমার জন্তে কি এনেছি?”

ঠাকুর-মা ছবিখানি হাতে লইয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া আফ্লাদ সহকারে কহিলেন—“ঠিক সময়েই এনেছিস—রাশি, —এখনি মন্দিরে গিয়ে টাঙ্গিয়ে দেব। কালী মূর্তি সেখানে একখানিও নেই। তাই বুঝি দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখার পরই পটখানি কালীবাট থেকে আনিয়াছি।”

“আচ্ছা দাও ঠাকুর-মা,—আমি নিয়ে যাচ্ছি।” বলিয়া জ্যোতিষ্ময়ী ছবিখানি তাঁহার হাত হইতে গ্রহণে পুনঃগ্রহণ করিল। ঠাকুরমা তখন তাঁহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন—“দিন দিন যে তুিকরে ~~আমি~~ নাতনি! বিরচআলা পুষ্টিস যে বুকে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সবাই যা বোঝে তোর বাপ ত তা বোঝে না। বাপের তোর ধনুর্ভঙ্গ পণ যে অর্জুন জামাই করবে। আরে ঐ ত সেই। যুদ্ধ জিতলে, মালা নিলে,—ছদ্মবেশী অর্জুনই ত সে,—তোর বাবাকে কে তা বোঝার বল দেখি।”

জ্যোতিষ্ময়ীর মনের বেদনা মুখে রক্তরাগে আপাইয়া উঠিল—পাছে ঠাকুরমা তাহা লক্ষ্য করেন—সে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“না ঠাকুর-মা আমি বিয়ে করব না।”

“কেন নো?”

“সবাই যে বিয়ে করে।”

দিদিমা খুশী হাসিয়া উঠিলেন,—নাতনির পিঠি চাপড়াইয়া বলিলেন—“ওঃ সেইজন্মে? যেমন বাপ ঠিক তেমন মেয়ে! সবাই যা করে তা করতে নেই—কেমন? সেইজন্মে তোর বাপও ত বিয়ে করলে না।”

মেয়ে বলিল—“আচ্ছা ঠাকুর-মা, বাবা বিয়ে করেননি বলে তোমার এত হুঃখ আমি সে হুঃখ নিবারণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করব। আমারও অনেক সময় মনে হয়—বাবার বিয়ে হলে ভাল হয়। তুমি একটি ভাল মেয়ে দেখ—তারপর এবার আমরা দুজনে মিলে বাবাকে ধরে পড়ব।”

ঈর্ষার পরিবর্তে নিজেই যে জ্যোতিষ্ময়া পিতার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে ইহাতে ঠাকুর-মা অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। মনে মনে বলিলেন—“হ্যাঁ অসাধারণ মেয়ে বটে।” মুখে বলিলেন—“বেশ কথা! আগে ত তোর হাতে বান্ধন পড়ুক—তখন বাপের চাপড়ার ভয়ে দিস।”

রত্ন-চৌকীর পুরবীরাগ সহসা মন্দিরের আশ্রয় ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে খামিয়া পড়িল। রাজমাতা বলিলেন “চল রাণি চল আরতির সময় হোল, ফিরে এসে এ পরামর্শ করা যাবে।”

মন্দির-অঙ্গনে পৌছিয়া প্রথমেই রাজ-

মাতা কাণী-মূর্তিখানিক একজন দেবদেবী হস্তে দিয়া, কোথায় হইয়া টাঙ্গান হইবে বলিয়া দিলেন। পুরোহিত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ আশ্রয়গণ এতক্ষণ রাজমাতার আগমন-অপেক্ষায় ছিলেন। তাহার মন্দিরে আসিবামাত্র স্তোত্রপাঠ এবং আরতি আরম্ভ হইল। রাজকুমারীর সহিত মহারাজী সপ্তবার দেব-প্রদক্ষিণ করিয়া দেব-সম্মুখে প্রণত হইলেন। প্রণামান্তে জ্যোতিষ্ময়া নজর রাখিয়াই করষোড়ে মূর্তি যুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্রকৃতি পুরুষের মিলন ভাব—এই যুগল মূর্তিতে আজ সে সর্ব-প্রথমে মন্দির মন্দির উপলব্ধি করিল। এই মিলনরূপ—এক স্নানপুর,—এক মনোমোহন! জ্যোতিষ্ময়া মনে করিয়া আসিয়াছিল, গ্রামস্থানের চরণতলে সে তাহার উন্মোচিত প্রেমকে আজ অঙ্গলিগদন করিয়া—চির কোমরায় ব্রতে শপথ বদ্ধ হইবে। পারিল না—সে তাহা পারিল না। ভগবানের প্রেমমিলনরূপে তন্ময় হইয়া মোহাচ্ছন্ন ভাবে করষোড়েই সে বসিয়া রহিল। আরতি শেষ হইয়া গেল, স্তোত্র পাঠ বদ্ধ হইল—ঠাকুর-মা তখনো রাজকন্যাকে সেই ভাবে বাসিতে দেখিয়া একটু ঘেন ভীত ভাবে ডাকিলেন—“রাণি?” রাণী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঐশ্বর্যকুমারা দেবী।

## প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ এতদিনে শেষ হইল। এই ভীষণ যুদ্ধে পৃথিবীর কি-যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উত্তেজনার বশে কেহ হিসাব করিবার অবসর পান নাই; যুদ্ধ-শেষে এখন সেগুলি ঝটাইয়া দেখিলে বোধ হয় সকলেই স্তম্ভিত হইয়া উঠিবেন।

আমরা আজ ক্ষতির হিসাব করিতে বসি নাই। চারি-বৎসর-ব্যাপী এই অবিশ্রাম রক্তপাতের ফলে মানব-জাতির কোন্ লাভ হইয়াছে কি না, তাহারই আজ হিসাব করিতে চাই। কারণ, অমঙ্গলের মতোই ভগবানের মঙ্গল-ইচ্ছা দেখা যায়, এটা দার্শনিক ভাবুকতা নহে; মানব-জীবনের ইহা পরীক্ষিত সত্য।

এতদিন ধরিয়া মানুষ যে সভ্যতা সম্বন্ধে গড়িয়া তুলিয়াছিল, নিজেই আজ সেই সভ্যতা সে চূর্ণ করিয়া দিল। যে সকল বড় বড় সাম্রাজ্য, স্বরক্ষিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এই সভ্যতার আব-হাওয়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ঝড়ের মুখে ধুলিরাশির মত কোণায় যে সে উড়িয়া গেল, কেহ তাহা জানিতেও পারিল না। নিষ্ঠা-নব যন্ত্রবিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, অতি সুন্দর রাজনীতি-তত্ত্ব কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। বলদর্পিত যদুবংশীধারা যেমন হানাজানি করিয়া ঝরিয়াছিল, তেমনই এই সভ্যতা নিজের ঐশ্বর্যের মধ্যেই আত্মহত্যা করিয়া বসিল।

যে দ্রাস্ত নীতি এই সভ্যতার প্রাণ-স্বরূপ ছিল—তাহার নাম প্রতিযোগিতা। বলবানের

জয়, দুর্বলের পতন ইহার মন্ত্র, ভোগবিলাস ইহার দেহ, বাণিজ্য ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ভীষণ অক্টোপাসের মত এই প্রতিযোগিতা-মূলক সভ্যতা বিশ্ব-মানবকে তার সহস্র বাহুর জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছিল।

জাতিতে জাতিতে রেবারেষি এই প্রাতিযোগিতার এক প্রধান রূপ। যে জাতিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেইই অপর দুর্বল জাতিকে চিরকাল পদানত করিয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত জাতি যে প্রবলের পেষণে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ধরা-পৃষ্ঠ হঠতে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠ্য মাত্রই জানেন। অপরকে পদানত করিবার এই যে ক্ষমতা, ইহাই ছিল জাতির শক্তির মানদণ্ড। বাহারা যত-বেশী পর-রাজ্য জয়, ~~যত-বেশী~~ পারিত, যত-বেশী দুর্বল জাতিকে ~~আত্মরক্ষা~~ করিতে পারিত, তাহারাই তত-বেশী সভা বলিয়া গণ্য হইত। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিসর, রোম, গ্রীস, পারস্য, তাহার সকলেই এইরূপ উপায়ে সভ্য হইয়াছিল। আধুনিক পৃথিবীর সভ্যতম জাতিদেরও যে এইটিই মূলমন্ত্র ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। আধুনিক কালে আবার “নেসনালিজম” বলিয়া একটা জিনিষ চুকিয়া এই পরজাতি-জিগীষাকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছিল। দেশ-ভক্তি বা স্বদেশবাৎসল্য অতি-পবিত্র স্বর্গীয় বস্তু,



সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার যে বিকৃতি “নেসনালিজম” বা স্বাদেশিকতা-রূপে বর্তমান জগতে দেখা গিয়াছিল, তাহা ছদ্মবেশী নয়ন-মনোহর শরতানী ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা প্রবল জাতির ঘোরতর স্বার্থপ্রিয়তা মাত্র। খাঁটি স্বদেশ-বাৎসল্যে পরজাতি-বিদ্বেষের গন্ধও নাই। কিন্তু এহে যে আধুনিক “স্বাদেশিকতা,” ইহার মূলে পরজাতির বুকের রক্ত পান করিয়া বদ্ধিত হইবার হচ্ছা! এই হচ্ছা বা শরতানী আদেশের কাছে কেহ ভায়-অভয়, ধর্ম-অধর্ম বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি এই উদ্দেশ্যে ধর্মকেও বস্ত্র-স্বরূপ করিয়া লইতে কিছুমাত্র বাধে না। বর্তমানে জর্মানিই এই ভীষণ “নেসনালিজম”-এর আদর্শকে চরমভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার উদ্ভাবিত “Kultur” নামক অপূর্ণ পদার্থ বিশ্বজুড়ে লোককে জোর করিয়া গিলাইয়া দিতে সে বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ইহার সে শুভ-ইচ্ছা(?) পূর্ণ হইল না। গতাব্দে প্রেষ্ঠ প্রতিনিধি-রূপে সে দাঁড়াইয়াছিল, নিজের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া তবে সে নিবৃত্ত হইল।

এই প্রাতিযোগিতার আর এক মূর্তি, বাণিজ্যে প্রাতিদ্বন্দ্বিতা। সাক্ষাৎ রক্তারক্তির মত তরঙ্গরূপে দেখা না দিলেও ইহার কাঙ্ক্ষাকারিতা আরও ভীষণ। নীরবে অস্ত্র জাতির বুকের রক্ত পান করিয়া তাহার জীবনী-শক্তি ক্ষয় করিয়া দেওয়াই ইহার কাজ। কঠোর হৃদয়হীন বড়-বড় কারখানা ইহার সহায়, আধুনিক বস্ত্র-বিজ্ঞান ইহার

বাহন। অর্থ-নীতি-ব্যবসায়িক ক্রটি ~~কর্তৃক~~ মন্ত্র আঙড়াইতে আঙড়াইতে দুর্বল জাতির দেশের মধ্যে ইহা মৃত্যুর মত প্রবেশ করে এবং বশীর, ফলকের মত রক্তপান করিয়া আসে। ডাকিনী-বোগিনী যেমন শ্রম-বাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, কামান-গোলা-গুলিও যেমনই ইহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। বিগত মহাযুদ্ধের একটা প্রধান কারণ যে এই বাণিজ্যে প্রাতিদ্বন্দ্বিতা, তাহা দূরদর্শী ব্যক্তি-মাজেই জানেন। স্বর্গীয় অ্যামি টলষ্টয় তাহা দিবা চক্ষে দেখিয়া ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রাতিযোগিতার সব-চেয়ে ব্যাপক মূর্তি, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব—ধনী ও দরিদ্রে দ্বন্দ্ব—শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে দ্বন্দ্ব। আর বালিতে গেলে ইহাই প্রাতিযোগিতার অন্তরতম রূপ; অস্ত্র সকল রূপ ইহারই প্রতিরূপ মাত্র। সর্বকালে সকল সমাজেই এই দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। ধনী ও শিক্ষিতেরা দরিদ্র অশিক্ষিতদের বলে ও কোশলে চাপিয়া রাখিয়া নিজেরা সকল সুখ ও সুবিধাগুলি ভোগ করিয়াছে। দেশের নামে এই বে যুদ্ধ চলিয়াছে, মূলতঃ ইহা কি? জনকয়েক ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক নিজেদের অভিপ্রায়-সন্ধির জন্ত বলে ও কোশলে অপর-সকলকে মৃত্যুর মুখে পাঠাইতেছে। যদি সাধারণ লোকদের এ বিষয়ে কত থাকিত, তবে হয়ত এরূপ রক্তপাত ঘটিতে পারিত না। কারণ এই রক্তপাতে সর্বকালের ক্ষতি এই সাধারণ লোকদেরই। বাণিজ্যে প্রাতিদ্বন্দ্বিতার ফলেও সাধারণ লোকদের—যাহারা কুণী-মজুর, কারিগর, মিস্ত্রী প্রভৃতি নামে অভিহিত

হয়, তাই—বিশেষ—কিছুত লাভ নাই। জনকরেক ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকের উচিত, মধ্যে লাভবান হইয়া থাকে। অনেক দিন হইতেই সাধারণ লোকেরা এই কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে, এবং বুঝিয়া এই অজ্ঞান দাসত্ব হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা করিতেছে। সকল দেশের শ্রমজীবীদের মধ্যে আন্দোলনটা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যুদ্ধের ফলে “নেশনা’লিজ্‌ম্” বস্তুটা হয়ত ধ্বংস হইয়া বাইবে, এবং দরিদ্র অশিক্ষিত সাধারণ লোকদের দাসত্বও যে আর বেশীদিন টিকিবে, এমন মনে হয় না। পৃথিবীর চারিদিকে শ্রমজীবী-দলের মুক্তি-লাভের প্রবল চেষ্টার লক্ষণ ইহার মধ্যেই দেখা বাইতেছে। নিন্দনীয় “বলসিভিজ্‌ম্” জিনিষটা ইহারই এক শোচনীয় বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রতিযোগিতা যে মানব-সমাজেই আবদ্ধ তাহা নহে, ইহা প্রকৃতির একটা সাধারণ নিয়ম। জীব-রাজ্যে সর্বত্রই ইহার বিস্তার। আচার্য্য ডারউইন সর্বপ্রথমে পরিষ্কারভাবে এই সত্য অনুভব করিয়াছিলেন এবং জীব-বিজ্ঞানের প্রধান সত্য প্রচার করিয়াছিলেন,—“জীবন-সংগ্রাম” (Struggle for existence) ও যোগ্যতমের উত্তরণ (Survival of the fittest)। এই উই রূপে সহ্যার-রূপিনী প্রকৃতিকে তিনি সর্বত্র দেখিয়াছিলেন এবং বিশ্ববিকাশের চির-গোপন রহস্যটুকু ঐ দুই সূত্রের মধ্যে বাঁধিয়া কেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পরবর্তী শিষ্য-প্রশিষ্যেরা তাহারই মূল তত্ত্বের টীকা-ভাষ্যের

দ্বারা আধুনিক জীব-বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন।

কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়মকে একরূপ সঙ্কীর্ণভাবে দেখা যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ দেখা, একথা আমরা সাহস করিয়া আজ বলিতে পারি। নব্যযুগের জীবতত্ত্ববিদগণ একথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে কেবল জীবন-সংগ্রামই জীব-বিকাশের একমাত্র নিয়ম নহে—উহা তাহার একটা ধারা মাত্র। উহারই পাশাপাশি আর একটা প্রবলতার নিয়ম প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে—তাহার নাম সহযোগিতা (mutual aid)। জীবরাজ্যের কি নিয়ম কি উচ্চ উত্তর স্তরে সর্বত্রই এই সহযোগিতার প্রভাব সমান বিস্তৃত। ইহার অভাবে সৃষ্টির সমস্ত বিকাশ, সমস্ত সৌন্দর্য্য একেবারে অন্ধকারে মগ্ন থাকিত। কি অন্ধবিকণিত উদ্ভিদ-নামধারী জীবগণের মধ্যে, কি অণুপরিমাণ কীট-পতঙ্গের মধ্যে, কি দলবদ্ধ পশুপক্ষীর মধ্যে অথবা সমাজবদ্ধ শ্রেষ্ঠকৃষ্ণমাংসভক্ষের মধ্যে—একদিকে যেমন বস্তু সংঘর্ষের ব্যাপার চলিতেছে, অপরদিকে তেমনই আবার তদপেক্ষা প্রবলতরভাবে সহযোগিতা ও প্রেমের লীলাও অচরই দেখা যাউতেছে। তাই নব্যজীবতত্ত্বের মূলমন্ত্র আর জীবন-সংগ্রাম বা প্রতিযোগিতা নহে—তাহা সহযোগিতা বা প্রেম।

এই সহযোগিতার নিয়ম জীবরাজ্যের নিম্ন স্তরে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও উচ্চ স্তরে অর্থাৎ মানব-সমাজে ইহার প্রভাব খুবই বেশী। মানবের সমাজ এই সহযোগিতার ভিত্তির উপরই অধিষ্ঠিত।

তাঁহার গণ, জাতি, গোষ্ঠী, সন্ত, পরিবার, সকলই এই নিয়মের ফল। অবশ্য মানব-সমাজেও প্রতিযোগিতার কিছু প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই সহযোগিতা ও প্রেমই তাঁহার নিজস্ব বস্তু। তাঁহার মধ্যে টকার যত বিকাশ হইতে থাকিবে, ততই সে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে; আর যতই সে প্রতিযোগিতাকে আশ্রয় করিবে, ততই তাঁহার ধ্বংস বা অসন্নতি হইবে। এতদিন এই পশুনীতি অবলম্বন করিয়াই মানুষ ত যুদ্ধ ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে তাহারই চরমফল।

মহাযুদ্ধের যজ্ঞভস্ম হইতে যে নবীন সভ্যতা জাগিয়া উঠিবে—আশা করা যায়, সে সহযোগিতা ও প্রেমের অমৃতপূর্ণ কলস লইয়াই সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবে। সেই অমৃত-পানে মানুষের সকল মানি, সকল দুর্দশার অবসান হইবে; সাম্য ও মৈত্রীর ফলে অচিরে তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বেশে দেখা দিবে।

যে ~~দুর্দশার~~ পররাজ্য-জিগীষা সকল ব্যাধির মূল, আশা করি, তাহার অবসান হইবে। “নেসনালিজম্” নামক যে ছদ্মবেশী লোভী শয়তান আপনার পসার জম্কাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাকেও বোধ হয় দূরে সরিয়া বাইতে হইবে! পৃথিবীময় যে সকল দুর্দর্শন, দরিদ্র জাতি প্রবলের দাসত্ব করিয়া আসিতেছে, “নিজবাসভূমে পরবাসী” হইয়া আছে, তাহাদের শৃঙ্খল-মোচন হইবে। সকলেই নিজ নিজ স্বাভাব্য, ও আদর্শ-অনুসারে নিজেদের দেশে জাতীয় স্বাধীনতার

সুখভোগ করিতে পারিবে। ~~Self-~~de-termination কেবল রাজনৈতিকদের কথার কথা নয়, পৃথিবীর ছোট-বড় সকল জাতিই তাহার সুবিধা লাভ করিবে।

নবযুগের বাণিজ্য-ব্যাপারেও আর সেরূপ ক্ষমতাশালী ও অক্ষমের দ্বন্দ্ব চলিবে না। সেই ভীষণ অক্টোপাস-নীতির পরিবর্তে ছোট-বড় সকল জাতির মধ্যে co operation বা মেলা-মেশার কারবার প্রবর্তিত হইবে। ছোট গরিব জাতিরা তাহাদের নিজেদের দেশের সম্পদ নিজেদের ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারিবে; বড় ধনী জাতিদের জন্ত কেবল “কাঠ ও জল” বহিয়াই মরিবে না।

সর্বোপরি সকল দেশের সকল মানুষ ধনীদের ও বড়দের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। জনকয়েক ধনী, শিক্ষিত ও বল-শালী মিলিয়া দেশের সাধারণকে আর তেমন গুরু-ভেড়ার মত তাড়াইতে পারিবে না! কেবল দেশে ও রাষ্ট্রে নহে—সমাজে ও পরিবারে সর্বত্রই যেন মানুষ স্বাধীনতা লাভ করে! আচারে ব্যবহারে, শিক্ষায় দীক্ষায় সকল বিষয়েই যেন তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা হয়! ধন কেবল জন-কয়েকের বিলাস-ভোগের জন্ত নহে—সর্ব-সাধারণের সেবায় তাহা উৎসৃষ্ট হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো দরিদ্রের কুটীরেও যেন পড়িতে পারে, তাহা হুইলেই জগদ্ব্যাপী দুঃখ-দারিদ্র্য রোগ-শোক মুহূর্ত্তে অস্তিত্ব হইবে।

এই সকল বিষয়েই নবযুগের মানুষের সম্মুখে প্রধান সমস্যা; ইহাদের সম্যক সমাধানেই তাহার মঙ্গল এবং মুক্তি।

ঐপ্রফুল্লকুমার সরকার।



## “মাতৃগুপ্ত”

কবি মাতৃগুপ্ত উজ্জয়িনীতে রাজা হর্ষ-  
বর্দ্ধনের সভায় অতি-তুঃখে দিন কাটাচ্ছেন ;  
রাজার সেবা তিনি প্রাণপণে করছেন, কিন্তু  
রাজার স্নহজর একদিনও তাঁর উপব পড়েছে  
একথা কেউ বলবেনা—সেই মলিন মুখ,  
ছেঁড়া-কাঁথা মাতৃগুপ্তকে দেখে। ঋতুবাজের  
মতো রাজা হর্ষ সবাইকে সুখেই হাল্লালে  
পূর্ণ করলেন ; কিন্তু তুঃখ—সে শীতের মতো  
কবির চারিদিকে জড়িয়ে রইলো। রাজা  
মাতৃগুপ্তের কবিতা থেকে সেটার ইঙ্গিত  
পেয়েও উদাসীন রহিলেন। এইভাবে কবি  
কত শীত যে বিনা-পুষ্টকারে হর্ষবর্দ্ধনের সেবায়  
কাটালেন তার ঠিক নেই। রাজা যখন  
শোধান—“কবি কি সংবাদ ?” কবি উত্তর  
দেন ছেঁড়া-কাঁথা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে—  
“বড় শীত মহারাজ ! তত্বশের গবম নিশ্বাস  
বুকের মধ্যে না যদি থাকতো, আর যদি  
হর্ষের কথা ত-একটা মাঝে মাঝে আগাম  
বসন্তের আশার মতো গুনতে না পেতাম,  
তবে নিশ্চয়ই মরেছিলেম।” রাজা মনে-মনে  
কবির কথায় তুঃখ পান ; আর এতদিন  
কবিকে অনর্থক যে নানা ভোগ ইচ্ছে কোরে  
ভোগাচ্ছেন সেটা ভেবেও লজ্জা পান ;  
কিন্তু মুখে বলেন—লক্ষ টাকার কাশ্মীরী  
শাল নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে—“শীততো  
মোটটাই রোধ হচ্ছেনা কবি !” কবি একটু  
জ্ঞান হেসে উত্তর করেন—“লোকেব হর্ষবর্দ্ধন  
বসন্ত কাল ; শীতের খবর তো তার কাছে  
পৌছতেই পারেনা মহারাজ !”

একদিন বসন্তকালে রাজা উপবনে  
বিহার করছেন, মলিন-মুখে মাতৃগুপ্তকে  
ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে আসতে দেখে  
রাজা বলেন—“তুমি ও আমি দুজনে কি  
আজ সমান সুখী নয় ? এই বসন্তকালে  
শীত তো পালিয়েছে দেশ ছেড়ে, তবে  
এখনো তোমার মলিন-মুখ ছেঁড়া-কাঁথা  
কেন বলতো কবি ?” কবি উত্তর দিলেন—  
“মহারাজ আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা ?  
আপনি ওই সম্মুখের ক্রৌড়া-পর্কতটির মতো  
বসন্তের দিনে বিচিত্র বাসন্তী ফুলের সাজে  
সেজে অপূর্ণ শোভা বিস্তার করছেন ;  
আপনার যশের সৌরভ পেয়ে দিগ্দিগন্ত  
থেকে দেখুন কত মধুর এসে গুণগান  
করছে—আজ আপনার চারিদিকে আনন্দে  
হর্ষের মধুরষ্টি কোবে ! আর আমি ঐ হিমা-  
চলটার মতো যে শীতে ফেঁসে পড়া  
বয়েছি এখনো !”

রাজা বলেন—“তবে কে বড় ভাল কবি ?  
হিমাচল ? না এই ক্রৌড়া-পর্কতটা ?”

কবি বলেন—“ক্রৌড়া-পর্কতটি বসন্তের  
হর্ষবর্দ্ধন ফুল-ফলের ঐশ্বর্য্যে, ছায়ায় মহিমায়  
বড় ; আর হিমাচলটা কায়ায় যেমন, তেমনি  
তুঃখেও বড় মহারাজ ! শীত ওর আবাবার  
নয় দেখছি।”

মহাবাজ কিছুদিন যুববাজের হাতে  
রাজ্য-ভার দিয়ে বিশ্রাম করছেন—গরমের  
দিনে ; কাঁপাখানা চারপাট কোবে স্বচ্ছ

রেখে কবি উপস্থিত—বিষম গোদ্রে, গোলা মাথায়। চর্যবর্কন বলে উঠলেন—“এতধিনে শীত দূর হল কবিরবের!”

মাতৃশুশ্রূষ উত্তর করলেন—“মহারাজ, শীত একটু অবসর নিয়েছেন বটে, কিন্তু দাক্ষণ গ্রীষ্মকে এই হতভাগা কবিটিকে পুড়িয়ে মারবার জন্তই বেধে গেছেন! শীতের আমলে কেবল কৈপেই মরতেম, কিন্তু এ-আমলে জংকম্প আর শ্বেদ দুইই হচ্ছে;—মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা পড়ছে মহারাজ!”

রাজা মৃদু হেসে বলেন—“কবিরব, ওই কাঁথাটা স্বপ্নে না রেখে ওটার মায়া ত্যাগ কোরে যদি আমার হাতে সঁপে দাও, তবে ওটা দিয়ে তোমার জন্তে এমন-একটা ছাতা বানিয়ে দিতে পারি—বেশ বড়-গোছের—যার ছায়ায় তুমি স্নেহে থাকতে পারবে।”

মহারাজের সামনে কবি সেই শতকুটি কাঁথা বিছিয়ে তার উপরে বোসে বলেন—“দুঃখের দিনের সম্বল এই কাঁথা দিনে-রাত্রে কাজ দিচ্ছে এখনো। এমন কি এ-কাজেই মহারাজেরও পদধূলি মুছে নেওয়া কিম্বা সিংহাসনের গদীর আর-এক-পুরু ধোলাসও করা যায় একে দিয়ে একদিন! কিন্তু ছাতা হলে এই ফুটোকাটা কাঁথায় রোদ-বৃষ্টি মোটেই আটকাবে না; উপরন্তু যে-কাজগুলো এখন করছে তাও করতে পারবে না।”

মহারাজ বলেন—“কবিতা আর কাঁথা আর তার উপর আমি ধরলেম ছাতা।” বোলে রাজা উঠে কবির মাথায় রাজছত্র ধরলেন। আনন্দে সভাসদ সবাই ধস্তা ধস্ত বোলে উঠলো।

কবি ছলছল-কেশে বলেন—“এত এ দাসকে কোন দূরদেশের রাজছত্রের তলায় নির্বাসন দিয়ে নিশ্চিত হতে চাচ্ছেন?”

“বন্ধু, এতখানো”—বোলে রাজা ছাতা রেখে কবিকে বুকে ধরলেন।

মাতৃশুশ্রূষ বলেন—“বন্ধু, ছাতার আড়াল সরে গিয়ে তোমার পা পড়েছে দীনের কাঁথায়, অমনি খোলা আঙিনার শেষপর্যন্ত তোমার ছায়া নিস্তারিত হল দেখ।”

রাজা বলেন—“বন্ধু, এই ক্রাড়াপর্বতের তপ্ত মাটি ওই দেখ তোমারও ছায়া পেয়ে অনেক দূর-পর্যন্ত শীতল হচ্ছে।”

গ্রীষ্মকাল এই ভাবে কাটলো। বর্ষা এসে উপস্থিত হল। উজ্জয়িনী-রাজপ্রাসাদের চূড়ায় ময়ূর সব পাখা বিস্তার কোরে মেঘের দিকে চেয়ে কেকা রব করছে; আকাশে ইন্দ্রধনু মেঘের উপরে সাত রং নিয়ে ফুটে উঠেছে। রাজা বলেন—“ছাতার দরকার এখনো কি অনুভব করছোনা কবি?” কবি বলেন—“এখনো নয় মহারাজ! কেননা এখনো গুনছি ময়ূরেরা বলাবলি করছে—হায় অসার ইন্দ্রধনুর রং দেখে মেঘ মোহিত হয়ে রইলো আর চিত্তবিচিত্র পাখা মেলে আমরা যে তার গুণগান কোরে রূপাবারি ভিক্ষা করছি, তার জন্তে মেঘপুলক বিন্দু যা দিচ্ছে তাতে তৃষ্ণা মেটা দূরে থাক, পালকগুলো যে ধুয়ে নেবো তাও হচ্ছে না। ইন্দ্রদেব যতক্ষণ আকাশ ফুটো-কোরে জল না ঢালছেন ছাতার কথা মনেও আসছেন। এখন কেবল মনে আসছে—‘সন্তপ্তানাম্ ত্বমসি শরণং’।” রাজা বলে উঠলেন—“যদি তাই

হয় তবু মাতৃগুপ্তের মণীষ্য যোষিতাং চিত্তহারী,  
তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নিকরিকারঃ। জলদ-  
সময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো, দিশতু তব  
হিতানি প্রায়শো বান্ধিতানি॥”

এই বোলে রাজা মাতৃগুপ্তকে একখানি  
পত্র দিয়ে বলেন—“আমার এই পত্র নিয়ে  
আপনি কাশ্মীরে গমন করুন এই মুহুর্তে।”

মন্ত্রী রাজার কাছে এসে বলেন—  
“কবিবরের যান-বাহন পাথের—”

রাজা ঘাড় নেড়ে বলেন—“কিছু  
প্রয়োজন নেই।”

মন্ত্রী অবাক হয়ে কবির দিকে চাইলেন।  
কবি ছেঁড়া-কাঁথায় রাজার শাসন-পত্র বেধে  
নিয়ে পথে বার হলেন—আর-কিছু প্রয়োজন  
নেই বোলে।

কবি চলেছেন মেঘে ছায়া-করা দিনগুলির  
মধ্যে দিয়ে নদী-তীরে-তীরে—গ্রামে গ্রামে  
বিশ্রাম কোরে। বনের পথে পাখীদের গান  
শুনতে-শুনতে, মাঠে-ঘাটে নানা ছবি, নানা  
শোভা দেখতে-দেখতে সারা পথ তিনি  
আনন্দে ভরপুর হয়ে চলেছেন। শেষে একদিন  
দূরে হিমাচলের পার্বের কাছে কাশ্মীরে এসে  
কবি উপস্থিত। তখন সেখানে ফুলের সময়।  
কবি দেখলেন সমস্ত দেশ ফুলে ফলে-সবুজে  
যেন একখানি বিচিত্র রাজাসনের মতো  
বিছোনো রয়েছে। তার উপরে বরফের চূড়া  
খেত-ছত্রটির মতো শোভা ধরেছে। কবির  
পথের ক্লেষ দূর কোরে পর্বতের বাতাস  
ফোটা-ফুলের সুগন্ধে উপবীণা আদ্যাদ করেছে;  
ছেঁড়া-কাঁথায় মাথা রেখে মাতৃগুপ্ত সুখে নিজা  
যাচ্ছেন; কখন দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা আসছে  
তাঁর খবরেও আসেনি। ইঠাৎ স্বপ্ন দেখে

যেন জেগে উঠলেন—যেন মনে হল একটা  
সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে গায়ের কাথাখানা  
কাঁথা কেড়ে নিতে চাচ্ছে আর তিনি  
প্রাণপণে ঠাঁকছেন—মহাবাজ রক্ষে করুন!  
আমার কাথা আমি কিছুতে ছাড়বোনা!  
মহাবাজ কিছু বগছেন না কেবল হাসছেন।  
—কবি চেয়ে দেখলেন সত্যিই এক হরিণশিশু  
তাঁর কাঁথার উপরে আরামে মাথাটি রেখে  
নিদ্রা দিচ্ছে; কবিকে উঠতে দেখে বনের  
হরিণ পালিয়ে গেল। স্বপ্নের অর্থ ভাবতে-  
ভাবতে মাতৃগুপ্ত সে-রাজির মতো সুবপুরের  
চটিতে এসে আশ্রয় নিলেন। তার পর  
হর্ষবর্দ্ধনের দানপত্র যথাসময়ে কাশ্মীরের  
প্রধান মন্ত্রীর হাতে দিয়ে মাতৃগুপ্ত প্রত্যুত্তর  
চাইলেন; তখন মন্ত্রী কবিকে প্রণাম কোবে  
বলেন—“অমুমতি দেন তো অভিষেকের  
আয়োজন করি। সিংহাসন কেন আর শূণ্য  
থাকে?” কবি আশ্চর্য হয়ে শোণালেন—  
“কর অভিষেকের অমুমতি চাচ্ছেন আপনি  
আমার কাছে?” মন্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে—“হে  
সুর্কবি—আপনারি?” কবি হঠাৎ হর্ষবর্দ্ধন  
তাঁর মাথায় রাজছত্র না দিয়ে ছাড়লেন না।  
তিনি মন্ত্রীকে ছেঁড়া-কাঁথা দেখিয়ে বলেন—  
“মন্ত্রী, এখানা সিংহাসনে বিছিয়ে দিতে বল,  
আর অভিষেকের আয়োজন কর।”

মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরের সিংহাসনে বসবার  
অল্পদিন পরে হর্ষবর্দ্ধন স্বর্গে গেলেন এ-খবর  
যেদিন কাশ্মীরে পৌছল সেই দিন কবি  
রাজছত্রের মায়া পরিত্যাগ কোরে ছেঁড়া-  
কাঁথা স্বন্ধে ফেলে যে-পথে এসেছিলেন সেই  
পথে বারাণসীতে চলে গেলেন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## ভারতের দারিদ্র্যের কারণ

ভারত যে দরিদ্র তাহার ৩ প্রত্যক্ষ  
প্রমাণ পাওয়া গেল, এখন দেখা যাক এই  
দারিদ্র্যের কারণ কি ?

যদি ভারতবাসী ও কতকগুলি উদার-  
নৈতিক ইংরাজের কথায় বিশ্বাস করিতে  
হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় ইংলণ্ড ভারতের  
উচ্ছেদসাধন করিয়াছে, অন্তর্জাতীয় কোম্পানী  
যে রূপ বঙ্গের সার-শোষণ করিয়াছে সেইরূপ  
ইংলণ্ডও দেড়শত বৎসর যাবৎ ভারতকে  
দোহন করিয়াছে।

এই প্রশ্নের সমাধানার্থ, এহ প্রশ্নটিকে  
বিস্তারিত করিয়া দেখা আবশ্যক। ইংলণ্ড  
কর্তৃক ভারত-বিজয়ের পূর্বে ভারতের  
আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল প্রথমতঃ তাহার  
আলোচনা করা আবশ্যক ; তাহার পর  
উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যে ভারত বাস্তবিকই  
দরিদ্র হইয়া উঠিয়াছিল কিনা তাহা অনুসন্ধান  
করা। বিশেষতঃ বিশেষ ইংলণ্ডের কি  
নাড় হইয়াছে এবং সেই নাড়ের অধিকার  
ভারতের কি উপকার হইয়াছে তাহা পরীক্ষা  
করা আবশ্যক।

\*  
\*

ইংরেজ-সরকারের প্রতিপক্ষীয়েরা মোগল-  
লের সময়কার ভারতের ধন-ঐশ্ব্যের গল্প  
করিতে বিরত হন না। সেই সময়  
রাজস্বের পরিমাণ কত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল,  
তাহার সংখ্যাত্ত তাহার উদ্ধৃত করিয়া  
দেখাইয়া থাকেন।

কিন্তু তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক, তখন  
অর্ধেক রাজস্ব ভূমিকর হইতে উৎপন্ন হইত।  
কিন্তু এই ভূমি-উৎপন্ন রাজস্ব কর-হিসাবে  
ধর্তব্য নহে, যেহেতু ভূমি সরকারের নিজস্ব  
ছিল, এবং সরকারের স্বেচ্ছামুসারে ফসলের  
পরিমাণ ধরিয়া পূর্ব হইতেই রাজস্ব নির্ধারিত  
হইত।

\* মোগল-সম্রাটদিগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা  
উদার সেই আকবর, ফসলের এক-তৃতীয়াংশ-  
গ্রহণ করিতেন ; পক্ষান্তরে—ইংরেজ-সরকার  
যাহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই  
দস্ত-মহাশয়ের কথা-অনুসারেও, বঙ্গদেশে  
ফসলের উপর শতকরা পাঁচ, ভারতের  
উত্তরাংশে শতকরা ৮, মাদ্রাজে শতকরা ১২  
এইরূপ ভূমি-কর ছিল। বোম্বাইয়ের ভূমিকর  
তিনি শতকরা ৩৩ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত  
ধারিয়াছেন।

অতএব ইংরেজ-সরকারের একজন  
প্রতিকূল-বাদীর হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা  
যায়, কেবল কতকগুলি এলাকা এবং এক  
প্রদেশমাত্র হইতে—সর্বাপেক্ষা উদার মোগল-  
সম্রাটের আমলে সর্বাধিক অনুগ্রহপ্রাপ্ত  
ভূমির যে রাজস্ব ছিল,—সেই রাজস্ব আদায়  
হইত। সরকারের নিজ-অনুষ্ঠিত পূর্ত-কার্যের  
অল্প সরকারের প্রাপ্য সুদও তাহার অন্তর্ভুক্ত  
ছিল।

আরজেবের আমলে, যে সকল বিদেশী  
পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন তাহার  
সকলেই জন-সাধারণের দুঃখ-দৈন্তের কথা,

কৃষিকার্যে বর্জ্যমান, দাস-কৃষকের কথা,

বাহ্য বাণিজ্য।

ভোগ্য কারিগরের কথা বলিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতা, যুদ্ধ-বগ্রহ, বিজয়-অভিযান দেশকে উচ্ছন্ন করিয়াছিল। ইংরেজ-বিজয়ের দ্বারা কতকগুলি জেলা ছাড়া, সমস্ত দেশ দৌলগস্ত ছিল।

১৮৩৮-৩৯ অর্ধে। আমদানী : টাকা ৬৮, ২২০।

৪২, ২২০।

১৮৩৯-৪০... ১, ৮৮১, ১০।

১৮৬০-৬১... আমদানী : টাকা ২৪১, ৭০৭, ২০০

৭০৭, ২০০

১৮৮০-৮১... আমদানী : টাকা ৬২১, ০৪২, ৮৮৩

০৪২, ৮৮৩

১৮৮০-৮১... আমদানী : টাকা ৭৬০, ২১০, ৪২৮

১৮৯০-৯১... আমদানী : টাকা ২৬২, ৭৪১, ৫৫৬

৭৪১, ৫৫৬

১৮৯০-৯১... আমদানী : টাকা ১, ১৭০, ৩২৭, ০২২।

১৮৯০-৯১... আমদানী : টাকা ১, ১৭০, ৩২৭, ০২২।

ব্যাঙ্ক।

১৮৭১ অর্ধে মূলধন : টাকা ৩৬, ১০৭, ৬১০।

৬১০।

১৮৭১ অর্ধে ডেপজিট : টাকা ১১২, ৬৬০, ৪২৭।

৪২৭।

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

১৮৮০... মূলধন... ৩৬, ৮০০, ৮০০

পক্ষান্তরে নিম্নে-প্রদত্ত সংখ্যাক্ষের দ্বারা সপ্রমাণ হইবে, ১৫০ বৎসর যাবৎ ভারতের ধন-গ্রন্থা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর আয়ব্যয়ের হিসাব ( গায় )

( প্রথমে বিশেষরূপে Lord Wellesly

ও Lord Dalhousie's শাসনামানে রাজ্য-বুদ্ধির কথা ধরিতে হইবে )

১৭২৩ অর্ধে... টাকা ৮, ২২৫, ৬৮৮

১৮৮০-৮১... টাকা ১৫, ২২৫, ০৫৫

১৮৮০-৮১... টাকা ২১, ০০০, ০০০

সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব ( গায় )

১৮৭৬-৭৭... টাকা ৫৮৬, ৫০২, ০৭০

১৮৮০-৮১... টাকা ৭৫, ১৬৬, ০০০

১৮৮০ অর্ধে... ভূমিরূপ হইতে পাওয়া যায়

১২, ৫০০, ০০০।

১৮৮০-৮১... ১২, ৫০০, ০০০

৬০ বৎসর যাবৎ পৃষ্ঠকন্মের অগুণ্ঠিত অমুগ্ধান আরম্ভ হয়।

টেলিগ্রাফ :—গাইন ৫২, ২০২ মাইল ;

তার :—১৭১, ০৮২ মাইল।

রেল-পথ :—৫, ০৩৫ ই মাইল।

খাল :—৭, ৪১২ মাইল বড় খাল ও ১৮, ৩৩৭ মাইল ছোট খাল।

ভূগার কল-কারখানা ( এই প্রমাণ )

১৮৫৫ হইতে সূত্রপাত হয় )

১৮৭৮-৭৯ মাকু : ১, ৪ ৩৬, ৮৬

মূলধন টাকা ৫৭, ০৬৭, ৫০০

১৮৮০-৮১ মাকু :—৪, ২২২, ৬০২

মূলধন টাকা ১৬, ৩০৫, ০০০

প্রমজীবীদের মত্ববী।



কৃষকাদিগের মজুরী, ১৮৭৩ হইতে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-তৃতীয়াংশ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, ও কামারের মজুরী ২১৭ চইতে ১০০ এই অল্পপাতে (কলিকাতায়), ১৫০ হইতে ১০০ এই অল্পপাতে দিল্লিতে (ইত্যানি) বৃদ্ধি পাইয়াছে। বড় বড় শ্রমালয়ের ব্যবসায়ে মজুরীর বেশী বৃদ্ধি দেখা যায়: ১৮৮৫ অব্দে যে হেড-মিস্ত্রী ১৭ টাকা পাইত, আজিকার দিনে সেই মিস্ত্রী প্রায় ৪০ টাকা পাইয়া থাকে।

অবশ্য ভারত এখনো দরিদ্র, অতিশয় দরিদ্র; কিন্তু ভারত ইংরেজের শাসনাধীনে দরিদ্র হয় নাই, বরং সমৃদ্ধ হইয়াছে

\*  
\*  
\*

ভারত উচ্ছন্ন হওয়া দূরে থাক, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার ভারতের বৈষয়িক উন্নতির পক্ষে বরং সাহায্য হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আরও এই কথা স্বীকার করা যাইবে যে, ইংরেজ শাসনশক্তির উদার রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ড ভারতের সমাধিক উন্নতিসাধন করিয়াছেন

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে, আমরা দুই যুগ সিদ্ধারণ করিব।

ক্লাইভ ও ওয়ারেন-হেস্টিংসের আমলে কোম্পানী হিন্দুরাজাদিগের নিকট হইতে সমস্ত টাকা জোর করিয়া আদায় করিয়াছে। এই সমস্ত টাকা ভারত হইতে বাহির হইয়াছিল কিন্তু তাহার বদলে ভারত কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয় নাই। তথাপি সাধারণের যেক্রপ বিশ্বাস, তদনুরূপ

কোম্পানীর যে খুব বেশী লাভ মনে হয় না।

১৭৭২ অব্দে আয় £২, ৩০, ০০০, ব্যয়—£ ১,৭০৫, ২৭৯। ১৭৮৫ অব্দে, আয়: £ ৫, ৩১৫, ১২৭; ব্যয়—£ ৪, ৩১২, ৫১৯। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে;—আয়ের অঙ্কে এইরূপ ঘাটতি হইয়াছিল, যথা ১৭৯৭-৯৮ অব্দে £ ১১৪, ৭৪৬; ১৮০৮-০৯ অব্দে £ ২৬, ০৪২।

পক্ষান্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের স্বার্থপর রাষ্ট্রনীতি আয়র্লণ্ডের দুঃস্থবস্থার কারণ হইয়াছিল, এবং আমেরিক-উপনিবেশদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছিল। ভারতের সহিত ব্যবহারেও সেই একইরূপ কঠোরতা: যে সকল ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের কারখানায় তৈয়ারী হইয়া ইংলণ্ডের মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ইংলণ্ডে সেই সকল জিনিসের প্রবেশ রহিত করা হয়। পক্ষান্তরে ইংরেজী তৈয়ারী মাল শতকরা দশ হিসাবে মাসুল দিলেই ভারতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত।

কোম্পানীর আমলে ভারত, ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার সম্বন্ধে সভ্যসভায় অভিযোগ করিতে পারেন; অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী যে টাকা জবরদস্তি আদায় করিত বলিয়া কথিত হয়—তার চেয়ে আসলে কম। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে উহা একেবারেই রহিত হয় এবং তখন অবাধ-বিনিময় ১০ বৎসর ব্যবৎ চলিতেছিল। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থার খারাপ পরিণাম একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভারতের মধ্যে স্বত্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ—বঙ্গলা,

এবং দেশের বাঙ্গলাট কেবল এই শাসনাধীনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রথমে আমরা সরকারী ঋণের বিষয় আলোচনা করিব; ইহাকে সচরাচর home charge বলা হয়।

এই টাকা প্রতিবৎসর ভারত-সরকার ভারতের ষ্টেট-সেক্রেটারিকে পাঠাইয়া থাকেন—যেমন মনে কর ১৮৯-১৯০০ অব্দে পাঠাইয়াছিলেন £ ১৬, ৩৯২, ৮৪৬; ১৯০০-০১ অব্দে পাঠাইয়াছিলেন £ ১৯, ২০০, ৯৫৭।

ভারত-সরকার ইংলণ্ডে যে টাকা খরচ করেন ও রেল-কোম্পানীকে প্রতিভূস্বরূপ যে টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, উক্ত ঋণের মধ্যে ৯ লক্ষ পৌণ্ড তাহারই মূল। ঐ ধার-করা টাকার অধিকাংশ উৎপাদক পূর্তকন্ঠে খরচ হইয়াছে। ধারের মূল অপেক্ষা এই পূর্তকন্ঠের আয় বেশী। উহার মধ্যে আবার কতক টাকা বিজয়-কার্য ও বিদ্রোহের বাবৎ খরচ হইয়াছে। কিন্তু এই পক্ষের ভার সমস্ত ভারত-বাসীর হৃদয়ে পড়ে না কি? কিন্তু ভারতের একাশাধন বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে সকলেরই কি ভাগ্যস্বীকার করা কর্তব্য নহে? পরিশেষে, বজেটের বাস্তবিক বাটতি পূরণ করিবার জন্যও টাকা ধার করিতে হইয়াছে। কেবল এই বাবদেই কিছু টাকা হাতে রাখিলে সুবিধা হয়। ভারত-সরকার ও ভারতের ষ্টেট-সেক্রেটারি বজেটের এই বাটতি একটু বেশী সজ্ঞতায়ে দেখেন:

যে দেশ প্রতিনিধি-সভার দ্বারা পরিচালিত নহে, সে দেশের স্বার্থসংক্ষেপ একটু বেশী চিন্তা করা আবশ্যিক।

রাজস্বের এই টাকা যাচা বিলাতে পাঠান হয় তাহা খুব বেশী নহে এবং অনেক স্থলেই (বিশেষত উত্তর-বঙ্গের) এই টাকা পাঠান অপরিহার্য হইয়াছিল।

আরও যে যে বাবদে ভারত-সরকার ষ্টেট-সেক্রেটারীর নিকট টাকা পাঠাইয়া থাকেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ধর্তব্য:—

### সৈনিক-ব্যয়।

ভারতের ইংরেজ-সৈন্য পোষণের সমস্ত ভার ভারতের হৃদয়ে ফেলা উচিত নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাজে যে সকল যুদ্ধ-আভিযান চালিত হইয়াছে—যেমন সোদান ও চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ—সেই-সব আভিযানের পক্ষা ভারতকে দিতে বাধ্য করা জারসঙ্গত নহে।

### রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যয়।

ষ্টেট-সেক্রেটারির বজেট ইংরেজ-সরকারের হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত। ভারত-সরকারের ইংরেজ কর্মচারীগণ তাঁহাদের কার্যকালে বেতনের কিয়দংশ এবং মূল্য হইতে অবসরের পর সমস্ত পেনসনে টাকার ইংলণ্ডে খরচ করেন; কাজে ইহা ভারতের একটা সুস্পষ্ট ক্ষতি—এই সকল ইংরেজ-কর্মচারীর জায়গার যদি দেশীয় কর্মচারী ক্রমশ অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভারতের এই ক্ষতি হয় না। কেননা, তাহার তাহাদের

বেতনের সমস্ত টাকাট ভারতে খরচ করিবে। তথাপি এখানে আমি এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই :—

ইংরেজেরা ভারতের প্রকৃত উপকার করিয়াছে এবং এখনো করিতেছে। সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীর দ্বারা শাসনকার্য্য নিরীহ হওয়া অসম্ভব।

ইংলণ্ডের সাহায্য বাতীত, ভারত এত কম সুদে টাকা ধার করিতে পারিবে না। সরকারী পৃষ্ঠকর্ম্মের খরচই ধরনা কেন; ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে এই টাকা ৫২৮ মিলিয়নে উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন ভারতবাসীর দ্বারা শাসন-কার্য্য নিরীহ হইলে ভারত শতকরা ১০ টাকার নীচে কখনই টাকা ধার করিতে পারিত না। ৫০ কোটির বেশী টাকা এই হারে কি ভারত ধার পাইত? এখন দেখ, এই ২০৮ মিলিয়নের সুদ হইতেছে শতকরা ২½ হইতে ৩½ পর্য্যন্ত মাত্র।

পূর্বেই বলা হইয়াছিল, সেই কথায়

ভারত সরকারের খরচের কথা— বিশেষতঃ যে টাকা ইংলণ্ডে খরচ করা হইয়া থাকে সেই খরচের কথা অতিরঞ্জিত;

যে দেশে মূলধনের স্বাক্তি, সে দেশে সরকারের অতিরঞ্জিত বর্ণনা বিপদজনক;

ভারতের দারিদ্র্য এই সকল খরচের উপর আরোপ করা অসম্ভব।

\*\*\*

সরকারী ঋণের সহিত ব্যক্তিগত ঋণও আছে; অর্থাৎ ইংরেজেরা ভারতীয় ব্যবসায়-উদ্ভূমে যে টাকা খাটাইয়া থাকেন তাহার

সুদ :—যথা চারের চাষ, নীচের চাষ, কাফির চাষ; খনি, তুলার কল-কারখানা, পাটের কল-কারখানা; জাহাজ-চালানোর কোম্পানী, বেঞ্চ ইত্যাদি। বিদেশী মূলধন আকর্ষণ করা সকল দেশের পক্ষেই সুবিধা; যে দেশের মূলধন খুব কম, তাহার পক্ষে ত নিতান্তই আবশ্যক।

“অমুপস্থিতির” (absentism) উপর যে দোষারোপ করা হয়, তাহা এই সব স্থলে খাটে না। ‘অমুপস্থিতি’ ব্যবসাদার অধিবাসীদিগের প্রমোৎপন্ন জিনিস বিদেশে খরচ করেন, এবং তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে নূতন মূলধন দেন না। কিন্তু বিদেশী ঋণগ্রাহী নিজের দেশে সেই মূলধন আনয়ন করেন, যে মূলধনের অভাব দেশে ছিল— অর্থাৎ অল্প দেশের লোকের প্রমোৎপন্ন দ্রব্য স্বদেশে আনয়ন করেন। অবশ্য ঐ মূলধন নিজস্ব হইলে ঋণগ্রাহী দেশের লোকের পক্ষে আরও সুবিধা হয়। কিন্তু মূলধনের অমুরূপ যে প্রমোৎপন্ন দ্রব্য তাহা ত উহারা যোগান দেয় নাই। অতএব এই বাগদে ইংলণ্ডে যে টাকা দেওয়া হয়,—ভারত ইংলণ্ডের নিকট যে উপকার পাইয়াছে ঐ টাকা তাহারই মূল্য-স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাক্, ভারত যে উপকার পায়, তাহার তুলনায় ইংলণ্ডের লাভ বেশী হয় কিনা?

এইখানে একটু পৃথকভাবে দেখা আবশ্যক : ভারতে যে টাকা খাটে, তাহার সুদ, সহজ ভাবের চির-প্রচলিত সুদ। এই সুদের হারে, ভারত বিদেশী মূলধন আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

আমাদের একজনকার মত আছে, যাহা লভ্যজনক। এই লভ্যজনক সুন্দর কিয়দংশ দেশের লোকেরই হাতে থাকিতে পারিত যদি তাহাদের মূলধন থাকিত, কিংবা ইংরেজেরা যে সকল ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয় সেই সকল ব্যবসায় যে বিজ্ঞানের আবশ্যক সেই বিজ্ঞান যদি তাহাদের জানা থাকিত। তথাপি ইহা বলা আবশ্যক যে, ভারতভূমি এত বৃহৎ এবং এখনো উহার সারোদ্ধারকল্পে (exploitation) উৎসাহে একতম খাটানো হইয়াছে যে, বাস্তবিক বলিতে গেলে, এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কথাই

আসিতে পারে না। অতএব ইংরেজ কোম্পানীর লাভের দরুন, ভারতের শ্রীবৃদ্ধি স্থগিত হয় নাই।

ভারতের যাহা কিছু সমৃদ্ধি ও উদ্যম উদ্যোগ তাহার জন্ত ভারত ইংলণ্ডের নিকট ধনী হইয়াও সম্ভবত অপেক্ষাকৃত প্রবল, সমৃদ্ধ ও স্বয়ংপার্জিত-সমায়িত ইংলণ্ডের শাসনাধীনে ভারত কতকটা ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া হইয়াছে এই সমস্তা "Drain of India" (ভারত শোষণ) এই বাক্যের উদ্ভাবকগণ যত সহজ বলিয়া মনে করেন তাহা তত সহজ নহে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## অলঙ্কার-শাস্ত্র ও কাব্যের ধারণা

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনা কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া জানিবার উপায় না থাকিলেও, এ কথা স্বীকার করিয়া সত্তয়া যাইতে পারে যে আগে কাব্য তাহার পর কাব্যের লক্ষণ-নির্দেশ, আগে সাহিত্য তাহার পর সাহিত্যের বিশ্লেষণ, আগে আদর্শ তাহার পর আদর্শের বিচার। সংস্কৃত অলঙ্কারিকগণও এ রূপা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বাম্বীকি-রচিত মহাকাব্য বহুশত বর্ষ ধরিয়া 'আদি কাব্য' হিসাবে এই আদর্শ-রচনার স্থান অধিকার করিয়াছিল; পরে বাম্বীকি ও তদনুবর্তী কবিগণের রচনাসমূহের বহুকাল ব্যাপী অনুকৃতি ও আলোচনার ফল-স্বরূপ,

বোধ হয়, ক্রমশঃ অলঙ্কারশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। রামায়ণের সময় না হইলেও অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই শাস্ত্রের আলোচনা ও তৎসঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আলোচনা ও একটা ধারণা যে বর্তমান লক্ষণ-বিশেষ অনুমান করা যায়। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ বাধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অলঙ্কারিক গ্রন্থ; ইহা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে রচিত এইরূপ সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু দণ্ডীর পূর্বেও যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

বেদাদি রচনার সময় অলঙ্কারশাস্ত্র বর্তমান ছিল কি না সন্দেহ। দণ্ডী (১) হইতে সাহিত্যদর্পণকার (১) পর্যন্ত অলঙ্কারিকগণ

‘একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সমাগজ্জাতঃ স্বর্ণে  
লোকে কামধুগ্ ভবতি’ প্রভৃতি যে সকল  
প্রামাণিক বৈদিক-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন  
তাহা হইতে বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া  
যায় না। রসের ধারণা বহুকাল হইতে  
কোনও না কোনও আকারে প্রচলিত ছিল,  
সুতরাং ছান্দোগ্যোপনিষদের “বাক্ বৈ রসঃ”  
এই নির্দেশ আলঙ্কারিক-সম্মত বাচ্যরসের  
স্পষ্ট সূচনা বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু  
নিকটকার যাহ ‘উপমা’র যে লক্ষণ দিয়া  
গিয়াছেন (১) তাহা আলঙ্কারিক মন্ত্রের  
নির্দেশ অপেক্ষা কোন অংশে নিকট নহে।  
পাণিনির সূত্রের (২) মধ্যেও ‘উপমান’  
‘উপমেয়’ ও ‘সামান্য’র উল্লেখ দেখিতে  
পাওয়া যায়। পাণিনি অষ্ট দুইটি সূত্রে (৪)  
কুশাখ ও শিলালি এই দুইজন নটসূত্রকারের  
নামোল্লেখ করিয়াছেন। কেশবমিশ্র তাঁহার  
‘অলঙ্কারশেখরে’ শৌকোদিনি (৪) নামক  
কাব্যসূত্রকারের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।  
প্রথমের মতে (৫) এইরূপ হইয়াছিল; ইহার  
বর্তমান ছন্দোবদ্ধ আকার পরবর্তী কালের

কৃতিত্ব। ভারত স্বয়ং, কোনও স্থলে  
(৬) স্পষ্ট নামোল্লেখ করিয়া, এবং কোনও  
স্থলে ‘অন্তে’ এই বেনামী নির্দেশ দিয়া, (৭)  
তাঁহার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক আচার্য্যগণের  
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে  
অস্বাভাবিক যাহ যে বৈদিক সময়ে না  
হইলেও অন্ততঃ সূত্ররচনার সময়ে, অজ্ঞাত  
শাস্ত্রের জ্ঞায়, অলঙ্কারশাস্ত্রও আলোচিত ও  
সূত্র-আকারে গ্রথিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত  
সংস্কৃতসাহিত্যে কাব্যের যে বহুল চর্চা ও  
বিকাশ দেখা যায়, তাহার পূর্বে অলঙ্কার-  
বিষয়ক মোটামুটি কোনও ধারণা যে  
একেবারেই ছিল না তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ  
হয় না। গুপ্তসম্রাটদিগের আমলে তদনুগত  
কবিস্তাবকেরা শিলালিপিগাড়ে যে দীর্ঘচ্ছন্দ  
কাব্যবহুল প্রশস্তি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা  
হইতে বেশ বোঝা যায় যে এই সকল প্রশস্তি-  
রচয়িতাগণের নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র অজ্ঞাত  
ছিল না। (৮) কালিদাসাদির কাব্য ছাড়িয়া  
দিলেও অশ্বঘোষের ‘বৃদ্ধচরিত’ কাব্যরীতিতে  
লিখিত, সর্গবন্ধে গ্রথিত, এবং মহাকাব্য

(১) অথাত উপমা যদন্তং তৎসদৃশমিতি গার্গ্যভট্টদাসাং কথং জায়সা বা ভুগেন প্রখ্যাততমেন বা কণ্ঠস্বাসং  
ব্যপ্রখ্যাতম্ বা উপমিমীতে, অথাপি কনীরসা জায়সংসম্ (নিকট, ৩১৩)।

(২) পাণিনিসূত্র, ২।১।৫৫; ২।১।৫৬

(৩) পাণিনিসূত্র, ৪।৩।১১০; ৪।৩।১১১

(৪) অলঙ্কারশেখর (কাব্যমালা সংস্করণ), পৃঃ ২

(৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909, p. 351 et seq.

(৬) ভারত, নাট্যশাস্ত্র, পৃঃ ৬০ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)। ‘ক্রহিণ’ অর্থে ত্রুষ্ণা হইতে পারে; কিন্তু রাজশেখর  
তাঁহার ‘কাব্যমীমাংসায়’ (গায়কবাড় সংস্করণ) ‘ক্রহিণ’ বা ‘ক্রৌছিণি’ নামক আলঙ্কারিকের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৭) ভারত, নাট্যশাস্ত্র, পৃঃ ৪৮।

(৮) Buhler, Indian Inscriptions and the Kavya, in the *Indian Antiquary* 1913,  
p. 146, p. 243 etc.

সংজ্ঞায় অভিহিত। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'র স্রষ্টা রচনা যে শুধু অলঙ্কার-বহুল তাহা নহে, উক্ত গ্রন্থে 'শৃঙ্খলাবদ্ধ-রচনা' এবং 'শ্লেষ' 'উৎপ্রেক্ষা' 'আক্ষেপ' (১) প্রভৃতি কাব্যলঙ্কারের স্পষ্ট উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে গ্রন্থকার, অলঙ্কার শাস্ত্রের চর্চা না করিয়া, তাঁহার আধ্যাত্মিক রচনা করেন নাই। এমন কি তাঁহার গ্রন্থের শেষে সুবন্ধু সগর্বে বলিয়াছেন যে তাঁহার রচনার প্রত্যেক অক্ষরে 'শ্লেষ'-প্রয়োগচাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। (২) বাণভট্টের 'কাবচরী' ও 'হর্ষচরিত'র সময় অলঙ্কারশাস্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ করিবার নাই; কারণ বাণভট্ট 'উপমা' 'দীপক' 'শ্লেষ' 'জাতি' (স্বভাবোক্তি) (৩) ভিন্ন 'অক্ষরচ্যুত' 'মাত্রাচ্যুত' 'বিন্দুমতী' ও 'প্রহেলিকা' প্রভৃতি (৪) বিশিষ্ট অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 'আলঙ্কারিকনিদ্রিষ্টে' 'কথা' 'আখ্যানক' ও 'আখ্যানিকার' ভেদ (৫) তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

দ্বিতীয় বর্ষ বা সপ্তম শতক হইতে ডামহ দণ্ডী প্রভৃতির গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহার পর অলঙ্কারশাস্ত্রের চর্চা ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে আর কোনও কথা থাকে না।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল বলা যায় না, তবে ইহার বর্তমান ছন্দোবদ্ধ কারিকান্যস্ত আকারও যে বষ্ট শতাব্দির বহু পূর্বের রচনা তাহা অনেকের স্বীকার করিয়াছেন। ভরতের গ্রন্থে প্রধানতঃ নাট্য, অভিনয়, নৃত্যকলা, ও সঙ্গীতশাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা থাকিলেও, কতকগুলি অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ নাট্যে সঙ্গীতে এবং কাব্যে প্রযোজ্য অলঙ্কারাদির বিবৃতি আছে (৬)। পূর্বাচার্য্যগণ কাব্যের দৃষ্টান্ত এ শ্রবাস্তভেদ (৭) না করিলেও পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ নাটককে কাব্যের ভেদবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভরতের মত সর্বত্রই শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত কাব্যের

(১) বাসবদত্তা (শ্রীবাণীবিলাস সংস্করণ) 'শৃঙ্খলাবদ্ধ' বর্ণগ্রন্থনাথ, 'উৎপ্রেক্ষা' 'আক্ষেপ' (পৃ: ১৪৬)। 'ভতো দীর্ঘোচ্ছাসরচনাকুলং ব্রহ্মবল্লভটনাপটু সংকাব্যবিরচনামিব' (পৃ: ২৩০)। 'সংকবিকাব্যবদ্ধ ইবানববদ্ধ-ভূ-হি-নিপাতঃ' (পৃ: ১৮৮)।

(২) ভ্রাতাকরশ্লেষময়প্রণকবিত্তাসবৈদ্যকানিধিঃ প্রবন্ধম্।

'সরস্বতীদত্তবরপ্রদাসদ্বন্দ্বঃ' (পৃ: ৩৫৭-৮)।

(৩) কাবচরী (Ed. Peterson, পৃ: ২)—'হরস্তি কং নোদ্বন্দ্বদীপকোপমৈবৈঃ পদার্থৈরুপমাধিঃ' কথা:। নিরন্তরশ্লেষবনাঃ হজাতয়ো মুহাস্রজ্ঞস্পককুটুলাৈরিব'।

(৪) 'কমাচিরক্ষরচ্যুতকমাত্রাচ্যুতাবিন্দুমতীগুচ্চভূষণপ্রহেলিকাপ্রদানাদিভিঃ' (পৃ: ৭, পংক্তি ২২-৩)।

(৫) হর্ষচরিত (Intr. v. verses), 'উচ্ছাসাস্ত্রেহপাখ্যানান্তে যোবাং বন্তে সরস্বতী! কথমাখ্যানিকাকারাদীভবন্যাঃ কথিথরাঃ।' কাবচরী (পৃ: ৭), 'কাব্যনাট্যকাখ্যানকাখ্যানিক' ইত্যাদি।

(৬) ৬ষ্ঠ অধ্যায় (রসার্থায়); ৭ম অধ্যায় (ভাবব্যঞ্জনাধায়); ১৬শ অধ্যায় (অলঙ্কারলক্ষণাধায়) ইত্যাদি।

(৭) দণ্ডী নাটককে পদ্মপত্রের মিশ্রকাব্য ধরিয়াছেন (১৭৩১); কিন্তু 'ভেদমিশ্রিত বিস্তরঃ' বলিয়া এক কথায় শেষ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাসন নাটককে সর্বপ্রধান রচনা বলিয়াছেন—'সমস্তেবুৎপত্তকং শ্রেয়ঃ' (১৭৩০)।

বিশেষ কিছু বলেন নাই, সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত তাঁহার মতাদির আলোচনা নিম্নয়োজন। তিনি পূর্বোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে ভাব ও অলঙ্কারাদির কথাই বেশী বলিয়াছেন; তবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাটকের উপজীব্য রস সঙ্ক্ষে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পরে দেখিব যে আনন্দবর্দ্ধনাদি কাব্যগত রসের ধারণা মুখ্যতঃ ভরত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা পরে আলোচ্য। কিন্তু ভরতের কাব্যবিষয়ক ধারণা সম্পূর্ণ নাট্যাঙ্গক (dramatic)। এ কথা নাট্যশাস্ত্র ১৬.১১৮ ও অজ্ঞাত স্থল হইতে জানা যায়, এবং অভিনব-গুপ্ত ইহা বেশ স্পষ্টই নির্দেশ করিয়াছেন—‘কাব্যং তাবন মুখ্যতো দশরূপাঙ্গকমেব’; কিন্তু এই নাট্যের মূলবস্তু রস। গুণ দোষ অলঙ্কার সমস্তই এই রসাভিব্যক্তির অধীন (১।১০৪)। সুইজ্ঞ ভরত প্রথমেই বলিয়াছেন—‘ভরতঃ রসঃ ৬২’ ‘তত্র রসানেব তাবদঙ্গকম্’ (৬২) ‘ন হি রসাদুতে কলিঙ্গ প্রবর্তত ইতি’ অভিনবগুপ্ত আর পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—‘নাট্যাৎ সমুৎপাদ্য রসাঃ। যদি বা নাট্যমেব রসাঃ কসিমুদায়ঃ। নাট্য এব চ রসাঃ, কাব্যেহপি

নাট্যাগমান এব রসঃ কাব্যার্থঃ’। ভরতের মতে, গুণ দোষ অলঙ্কারাদি ‘বাচিক অভিনয়’ বা ‘অভুভাবোৎ’ অঙ্গস্বরূপ এবং এই অভুভাব বা বাচিক অভিনয়ের দ্বারা রসানিষ্পত্তি হইয়া থাকে। (ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৬২; ৭৫; ৮৬; ৮৯)। বাচিক অভিনয়ের কথা ভরত চতুর্দশ হইতে বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বলিয়াছেন; অলঙ্কারাদি বোড়শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং প্রসঙ্গতঃ অলঙ্কারাদিকে তিনি বাচিক অভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

ভরতের পরে এবং দণ্ডী বা ভামহের পূর্বে আরও কয়েকটি আলঙ্কারিকের নাম পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহাদের কোনও গ্রন্থ বর্তমান নাই। দণ্ডী তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে পূর্বাচাৰ্য্যগণকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—“পূর্বশাস্ত্রাণি সংজ্ঞতা প্রাষণাগ্নপলভা চ। যথাসামর্থ্যমস্মাভিঃ ক্রিয়তে কাব্যলক্ষণম্॥” (১২)। ইহার ব্যাখ্যায় কাব্যাদর্শের কোনও অজ্ঞাতনামা টীকাকার (১) দণ্ডীর পূর্ব-বর্তী কাশ্যপ ও বরহাচর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভামহের গ্রন্থে (২) মেধাবীর নামও পাওয়া যায়। ‘বাসবদত্তা’র ‘বুদ্ধসঙ্গতি’-র চরিতা ধর্ম্মকীর্তি নামক (৩) কোনও আলঙ্কারিকের নাম দৃষ্ট হয়; কিন্তু বৌদ্ধ

(১) রজাচাৰ্য্যসম্পাদিত কাব্যাদর্শে হৃদয়সমাখ্য টীকা, পৃঃ ৩—‘পূর্বোক্তাঃ কাশ্যপবরহচিপ্রজ্ঞাতনামা-চাৰ্য্যাণাং লক্ষণশাস্ত্রাণি সংজ্ঞতা’ ইত্যাদি।

(২) কমলাশঙ্কর ত্রিবেদীসম্পাদিত অতাপকৃত্তীরের পরিশিষ্টে মুদ্রিত ভামহের কাব্যলঙ্কার, পৃঃ ২১৭ ও ২২১। কৃত্তকের কাব্যলঙ্কারটীকায় নমিসাধুও (১।১; ১১২৪; ১২।১৪৫) এই মেধাবী বা মেধাবিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। এই মেধাবী যে জন্মাক ছিলেন তাহা রাজশেখরের ‘কাব্যমীমাংসা’ (পৃঃ ১২) হইতে জানা যায়।

(৩) কন্দর্পকেতুর মুখে বাসবদত্তার বর্ণনাবদরে ‘বৌদ্ধসঙ্গতিমিব অলঙ্কারভূষিতাম্’ এই পাঠ কলিকাতার মুদ্রিত সংস্করণে দৃষ্ট হয়। এবং ইহার শিষ্যমকুণ্ড টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা দেথা যায়—‘অলঙ্কারো নাম ধর্ম্মকীর্তিকৃত্তো প্রথুবিশেষঃ’। কিন্তু জীবগিবিলাস সংস্করণে এই পাঠ নাই; তৎপরিবর্তে ‘সংকাবারচনামিব

ধর্মকাণ্ডি কোন সময়ের লৌক্য তাত্ত্বিক জানা যায় না। রাজশেখর (১০ম শতক) তাঁহার 'কাব্য-মীমাংসা'র প্রারম্ভে তাঁহার পূর্ববর্তী আলঙ্কারিক ও তদধিকৃত বিষয়ের তালিকা দিয়াছেন। 'তত্র কবিরহস্যঃ সহস্রাঙ্কঃ সমাম্রাসাং, ঔক্তিকমুক্তিগর্ভঃ, রীতি-নিয়মঃ সুবর্ণনাভঃ, আনুপ্রাসকঃ প্রচেষ্টায়নঃ, যমকানি চিত্রং চিত্রাঙ্গদঃ, শব্দশ্লেষঃ শেষঃ, বাস্তবঃ পুঙ্খাঃ, ঔপম্যামোপকারনঃ, অতিশয়ঃ পারাশরঃ, অর্থশ্লেষনুত্যাঃ, উদ্ভাঙ্গলঙ্কারিকঃ কুবেরঃ, বৈনোদিকঃ কামদেবঃ, রূপক-নিক্রপণীয়ঃ ভরতঃ, রসাধিকারিকঃ নন্দিকেশ্বরঃ, দোষাধিকরণঃ ধ্বংসঃ, গুণোপাদানিকমুপমত্বাঃ, ঔপনিষদিকঃ কূচভারঃ ইতি'। (পৃঃ ১) ইহা ভিন্ন তিনি সুরানন্দ, গ্রামদেব, অপরাঞ্জিত, কালিদাস, অবন্তীসুন্দরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। অবন্তীসুন্দরী রাজশেখরের পত্নী ছিলেন, তাহা 'কপূরমঞ্জরী'র প্রস্তাবনা হইতে জানা যায়। 'অগ্নিপুরণে' কাব্যলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায় আছে, কিন্তু তাঁহা পরবর্তী কালের রচনা হইলেও, তাহাতে ধ্বংসকারের মতের কোনও উল্লেখ নাই এবং স্থানে স্থানে দণ্ডীর বাক্য যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং

ইহার রচনাকাল বোধ হয় 'কাব্যাদর্শ' ও 'ধ্বংসলোকের' (৬ষ্ঠ হইতে ৯ম শতকের) মধ্যবর্তী।

এ পর্যন্ত অলঙ্কার সম্বন্ধে যে কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে, ভামকের 'কাব্যলঙ্কার' (১) ছাড়িয়া দিলে, দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। কাব্যের লক্ষণাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দণ্ডীর গ্রন্থেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।

দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে কুজাপি স্পষ্ট করিয়া কাব্যের (Poetry) লক্ষণনির্দেশ করেন নাহ, তবে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে কাব্য-সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। 'কাব্যাদর্শ' এই গুরুত্ব নামে অভিহিত হইলেও, তাঁহার গ্রন্থ প্রধানতঃ কাব্য-গত গুণ, দোষ, রীতি, ও অলঙ্কারের আলোচনা-তেই পর্যাবসিত। অলঙ্কার শব্দ কাব্যলক্ষণাদি-শাস্ত্রে (Poetics) সূচক শব্দ। কিন্তু বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'কাব্যো যাহা কিছুতেই চিত্তা-কর্ষক তাহাই অলঙ্কার। "সৌন্দর্য্য-লঙ্কারঃ" বামনের এই হুত্রে (২) এই বিস্তৃত তথ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সঙ্গীর্ণ করণব্যাপ্তি সম্পন্ন

অলঙ্কারপ্রসাধিতাম' এইরূপ আছে। এই ধর্মকাণ্ডি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকাণ্ডি কি না তাহা অনুসন্ধানের। তাহা যদি হয় তবে ইহার আবির্ভাবকাল ৬শ শতকের মধ্যভাগ। সন্দেহান্বিত (পৃঃ ২১৬-৭) ইহার উল্লেখ আছে।

(১) ভামক ও দণ্ডীর পৌল্লিপাধ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে, কিন্তু ভামক আগে কি দণ্ডী আর সে বিষয়ের হুত্রে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে নিম্নয়োজন। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ সমূহ দ্রষ্টব্য:- J. R. A. S. 1905, p 555 sq; K. P. Trivedi. Introd. to *Prataparudriya*, p xxviii, sq; J. R. A. S. Bomb. xxiii; Rangacharya, Introd. to *Kavyadarsa*; *Indian Antiquary* 1912, p 90 sq and p. 232 sq; *Indian Antiquary* 1913, p. 258 sq; Jacobi, ZDMG. vol. 64, p. 134.

(২) বামন, কাব্যলঙ্কারসূত্র, ১।১।২



অর্থে, অলঙ্কার উপমারূপকাদ্বিত্বরূপ শব্দার্থের শোভাতিশায়ি ধর্ম বা প্রয়োগ বুঝায় (১); চংরাজিতে যাহাকে figure of speech বলে। দণ্ডী ভামহ উদ্ভট রূপট (২) প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণ এই সঙ্কীর্ণঅর্থজ্ঞাপক, অলঙ্কারকেই যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছেন। যদিও দণ্ডী অলঙ্কারকে “কাব্যশোভাকর ধর্ম” (৩) মাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি কাব্যাদর্শের বেশীর ভাগ ইহারই আলোচনায় প্রযুক্ত করিয়াছেন। কাব্যের ‘আত্মা’ কি সে বিষয়ে দণ্ডী কোনও বিচার করেন নাহি, এবং পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ কাব্যের যে তিনটি ভাগ করিয়াছেন তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল। অজ্ঞ এক স্থলে দণ্ডী অলঙ্কার অর্থে স্নেহ প্রসাদ-সমতা-মাধুর্যাদি কাব্যের ‘গুণ’ (qualities of style) বুঝিয়াছেন (৪); এবং কাব্যরীতির যে দশটি গুণের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে একজন, *harmony*) গুণকে

এত প্রাধান্য দিয়াছেন যে তাহাতে মনে হয় যে তিনি ইহাকেই কাব্যের সর্বস্ব (৫) নেন করেন। তাহার নিকট কাব্যের ‘ব্যঙ্গ্য অর্থ’ (suggested sense) যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল তাহা বলা যায় না, কারণ ‘সমাসোক্তি’, ‘ব্যাঙ্গস্ততি’ ‘অপ্রস্তুতপ্রশংসা’ প্রভৃতি অলঙ্কারের লক্ষণে ব্যঙ্গ্যার্থের অঙ্গবিস্তার ধারণা অসম্ভবমান করা যায়। বিশেষতঃ পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ ধ্বনি (‘suggestion’) অর্থে যাহা বুঝেন তাহা দণ্ডী (৬) (এবং ভামহ ও উদ্ভটও) ‘পর্যায়োক্তে’র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন (৭)। তথাপি আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি ‘ধ্বনি’ বা ‘ব্যঙ্গ্য অর্থ’ কে বেক্রপ প্রাধান্য দিয়াছেন তাহা এই সকল গ্রন্থে দেখা যায় না। রস সম্বন্ধে দণ্ডীর ধারণা বিশেষ পরিচ্ছিন্ন না হইলেও, এ বিষয়ে দণ্ডী যে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন তাহা বলা যায় না। মাধুর্য্য গুণের বিশ্লেষণে তিনি ‘বাচি বস্তুত্বাপি

স্বপ্নের বৃত্তিতে বামন বলিয়াছেন—‘করণব্যাংপত্ত্যা পুনরলঙ্কারলঙ্কারঃ উপমানিষু বর্ততে।’

ভরত অলঙ্কারকে ভূষণ হিসাবেই ধরিয়াছেন এবং রসব্যক্তিই কাব্য ও নাটকের উদ্দেশ্য এ কথা বলিয়াছেন। অলঙ্কার ও গুণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—‘অলঙ্কারে গুণৈশ্চৈব বহুভিঃ সমলঙ্কৃতম্। ভূষণৈরিব

ঐশ্বর্য্যভূষণমিতি স্মৃতম্। (নাট্যশাস্ত্র, ১৬৪)। ‘প্রয়োগমেবাং চ পুনর্ব্যাক্যমি রসসংগ্রহম্।’ (১৬১০৪)।

(৩) কাব্যাদর্শ, ২১৩

(৪) কিন্তু দণ্ডী ‘গুণ’কে মূল্য অলঙ্কার এবং উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারকে ‘গৌণ’ অলঙ্কার হিসাবে ধরিয়াছেন এইরূপ বোধ হয়।

(৫) ‘তদেতৎ কাব্যসর্ব্বং সমাধিনাম যো গুণঃ। কবিসাধঃ সমগ্রোহপি তদেনমসুগচ্ছতি’ (কাব্যাদর্শ, ১১০০)

(৬) কাব্যাদর্শ ২১২৪

(৭) এ সম্বন্ধে আনন্দবর্দ্ধন বলেন—‘পর্যায়োক্তেহপি যদি প্রাধান্যেন ব্যঙ্গ্যং তত্ত্ববু মাম ধ্বনাবস্তর্ভাবঃ। নতু ধ্বনেন্দ্রাঙ্গতর্ভাবঃ। তন্ত মহাবিষয়েতাদ্বিত্বেন চ প্রতিপাদয়িতব্যম্। ন পুনঃ পর্যায়োক্তে ভামহোদ্যোক্তসমুপে ব্যাঙ্গ্যস্তেব প্রাধান্যম্। বাচ্যত তত্রোপসংকীর্ণাভাবেনাবিবাক্যত্বাৎ। (ধ্বন্যালোক, পৃ: ৩৯)।

রসবিদগণ এই নির্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি আর এক স্থলে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে অলঙ্কার অর্থকে রসানুভূতি করে (২। প্রেমসু ও রসবদ এই দুই বিশিষ্ট অলঙ্কারের লক্ষণেও (৩) তিনি রসের স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন। ভট্টলোচন প্রভৃতির জ্ঞান দণ্ডীও রসসম্বন্ধে ‘উৎপত্তিবাদী’। কিন্তু দণ্ডী ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ আনন্দবর্দ্ধনাদির জ্ঞান রসকে প্রাধান্য দেন নাই এবং দর্পণকারের জ্ঞান ‘কাব্যের আত্মা’ বলিয়া সর্বত্রো অভিব্যক্ত করিয়া, গ্রন্থারম্ভ করেন নাই।

ইহা হইতে বোঝা যাইবে ‘কাব্য সম্বন্ধে দণ্ডীর ধারণা অত্যন্ত আদিম, সঙ্কীর্ণ, এবং পরবর্তী ঔটিলতার দ্বারা অনাক্রান্ত। দণ্ডী একস্থলে কাব্যের ‘শরীর’ এবং (এই শরীরের) ‘অলঙ্কারের’ উল্লেখ করিয়াছেন; (৪) কিন্তু এই শরীরের অন্তর্ভুক্ত শক্তি-স্বরূপ ‘আত্মা’র (soul of poetry)

কথা কোথাও বলেন নাই। বোধ হয় তাঁহার ধারণা এই কাব্যের ‘শরীর’ আওতায় করিয়া বেষ্টি দূর যায় নাই। ‘কাব্য-শরীর’ কি তাঁহার উত্তরে বলিয়াছেন—“শরীরং ভাবদীপ্তার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী”। কিন্তু ইহাই তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে সমগ্র ধারণা বলিয়া বোধ হয় না। কারণ গুণদোষ ও অলঙ্কার ভিন্ন তিনি রীতির (style) উপরেও অনেকখানি জোর দিয়াছেন। প্রকৃত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কাব্যে অর্থ ও ভাবাদি উপযুক্ত ভাষায় ও ভঙ্গীতে ব্যক্ত হওয়া উচিত এ কথা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে বামনাচার্য্য ‘রীতির আত্মা কাব্যাত্ম’ (৫) বলিয়া রীতিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ধরিয়াছেন, দণ্ডী ততদূর যান নাই। তথাপি ভামহ যেরূপ রীতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন (৬) দণ্ডী তাহা করেন নাই। এবং ইহাকে কাব্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বা উপায় বলিয়া ধরিয়াছেন। দণ্ডী বৈদগ্ধী

(১) কাব্যাদর্শ, ১৫১।

(২) ‘কামং সর্কোহপলঙ্কারো রসমর্থো নিষিক্তি’ (কাব্যাদর্শ, ১৬২)।

(৩) কাব্যাদর্শ, ২২৭৫। তথা ২২৮১—৩ দ্রষ্টব্য।

(৪) কাব্যাদর্শ, ১১০। কাব্যাদর্শের পূর্বেকৃত টীকাকার ‘শরীর’ অর্থে “কাব্যানাং স্বরূপম্” এইরূপ ধরিয়াছেন। কিন্তু ভট্টরচনাচলিত [Rangacharya Edition পৃঃ ৬] এবং প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ [Bibliotheca Indica Ed. পৃঃ ১০] সাধারণ অর্থেই লইয়াছেন। প্রেমচন্দ্র টীকা করিয়াছেন “কাব্যানাং শরীরকং ভূতং রসাদিবাস্তবং দেহভূতপ্রায়ম্”। অবশ্য এখানে ‘আন্তরীক্স রসাদিবাস্তব’ কথাটা দণ্ডীর নহে, তাহা ‘নিজের, প্রত্যয়লোকাদি ইহাতে দণ্ডীর উপর আরোপিত করাইয়াছে। ‘রসগঙ্গাধরে’ লগ্ননাথ বলিয়াছেন—‘রসগঙ্গাধর-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্’। (পৃঃ ৪)

(৫) বামন, কাব্যালঙ্কারমত, ১২৬

(৬) ‘বৈদগ্ধমন্তবজীতি মন্তব্ধে সুবিদ্যোহপরে। তদেব চ কিল জ্ঞায়ঃ সধর্ম্মমপি নাপরম্। গোড়ীয়মিদ-মেতত্ত বৈদগ্ধমিতি কিং পৃথক্। পণ্ডিতগণিকস্তাশ্রয়ানাথো রসমেধসাম্’। ইত্যাদি (ভামহ, কাব্যালঙ্কার ১৩১-৩২)

ও গোড়া এই দুই রীতিভেদ করিয়াছেন এবং মোটামুটি ধরিলে ইহারা অনাড়ম্বর রীতি (plain style) এবং প্রাজ্ঞরীতি (learned style) বুঝায়। এই দুই রীতির সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া দণ্ডী দেখাইয়াছেন যে বৈদর্ভীই শ্রেষ্ঠ রীতি (১৪১-১০০)। এই দুই প্রকার সৌম্যসুগত রীতির মধ্যস্থলে যে নানা প্রকার মিশ্র বা অন্তর্বর্তী রীতি থাকিতে পারে তাহা দণ্ডীর অজ্ঞাত ছিল না (১৪০; ১১০১) কিন্তু কাব্যের রীতি যে সর্বত্র ভাব বা অর্থের অনুযায়ী হওয়া উচিত এ কথাই আলোচনা দণ্ডী কোথাও বিশেষভাবে করেন নাই। দণ্ডীর পূর্বে ভরত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কাব্যের বা নাটকের রীতি যে কেবল উপযুক্ত শব্দের দ্বারা অর্থের অনুসরণ করিবে তাহা নহে, পরন্তু কবি সাধারণ মুখে ইহা বিস্তৃত করিয়াছেন তাহারও স্মৃতি বা প্রকৃতির অনুযায়ী হওয়া উচিত। রীতি যে ব্যক্তিগত (individual) তাহার উল্লেখ দণ্ডীতে নাই। দণ্ডীর মতে কাব্যাদিশিল্পের অন্তর্গত কোথাও রীতি (style) কেবল প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। দণ্ডী মাধুর্য-প্রসাদাদি যে দশটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন (১) তাহাও রীতির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। দণ্ডীর বর্ত্তী বামন এই দশগুণের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহার মতে ইহা কেবল

রীতির গুণ নহে, কাব্যের অর্থের মধ্যেও উপলব্ধি হয়।

রীতির প্রসঙ্গে দণ্ডী বলিয়াছেন যে 'কাস্তি' (heightened speech) বৈদর্ভী রীতির বিশিষ্ট গুণ; গোড়া রীতির বিশিষ্ট গুণ 'অত্যাতি' (exaggeration) [ ১৮৫-৯২ ]। দণ্ডী যে কাস্তিগুণের কথা বলিয়াছেন তাহা ভামহের 'বক্রোক্তি' ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা 'ধ্বন্যালোক' ও 'লোচন'টীকা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় (পৃ: ২০৭-৮)। সুতরাং দণ্ডী সাধাকে গুণমাত্র বলিয়া ধরেন ভামহ তাহাকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন।

অত্যাতি দণ্ডী মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দেশ (২) করিয়াছেন তাহা হইতেও তাহার কাব্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা অনেকটা পাওয়া যায়। অত্যাতি বিশিষ্টতার মধ্যে তাহার মতে মহাকাব্য 'সদলঙ্কারযুক্ত' এবং 'রসভাব নিরন্তর' হওয়া আবশ্যিক।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে দণ্ডীর মতে তন্মায়োগ্য প্রত্যেক কাব্যে অন্ততঃ চারিটি জিনিস থাকা উচিত—কাব্যের সম্প্রতিস্বরূপ মাধুর্যাদিগুণযুক্ত রীতিতে রচনা, কাব্যের বিপত্তিস্বরূপ দোষের বিসর্জন, কাব্য-শোভাকর অলঙ্কারের সম্ভাব, এবং বোধ হয় আনন্দবর্জক রসের সমাবেশ। এই চারিটি কাব্য-ধর্মের সমবায় তিনি 'সৌভাগ্য' (৩) নামে অভিহিত করিয়াছেন

(১) ভরতও এই দশগুণের উল্লেখ করিয়াছেন (নাট্যশাস্ত্র ১৬৯২) কিন্তু রীতির প্রসঙ্গে নহে। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ এই 'গুণ' শব্দে কাব্যের গুণ বলিয়া ধরিয়াছেন।

(২) কাব্যাদর্শ, ১১৩৪-১২

(৩) কাব্যাদর্শ, ২১৫৪; ( Bibl-Indica ) ৩১৫১ বা ( Rangacharya Edithin ) ৪২৮

এবং এই সভাগোর অন্যরূপ সমগ্র কাব্যে 'মাধুর্য্য' (১) নামক আত্মবোধের উৎপত্তি হয়; অবশ্য এই মাধুর্য্য ও রীতির গুণস্বরূপ মাধুর্য্য (২) এক জিনিস নহে।

দণ্ডী সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা ভামহ ও উভটেও অল্প বিস্তার প্রযোজ্য। ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' ত্রিযুক্ত কমলাশঙ্কর ত্রিবেদী তৎসম্পাদিত প্রতাপরুদ্রায়ের পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিয়াছেন। (৩) প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যলক্ষণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও, প্রধানতঃ গুণ, দোষ, ও অলঙ্কারের বিচারেই ভামহের সমগ্র গ্রন্থ নিয়োজিত হইয়াছে। শব্দার্থই কাব্য এবং রূপকাদি প্রসাধনস্বরূপ, (৪) কারণ "ন কান্তমপি নিভূষণং বিভাতি বনিতামুখম্"। (৫) কিন্তু ইহা শুধু কাব্যশরীরের কথা। তৎপরে ১৬০ সংখ্যক শ্লোকে অলঙ্কার বা figures of speech এর বিবৃতি। তদনন্তর দোষের বিচার। শেষ ৬৮ অধ্যায়ে ত্রায়নির্ঘণ (logic of poetry) এবং শব্দশুদ্ধি (grammatical purity) সম্বন্ধে আলোচনা। দণ্ডীর ত্রায় ভামহও অলঙ্কারকেই বেশী প্রাধান্য দিয়াছেন।

ভামহের মতে, কোনও প্রবন্ধের চিত্তাকর্ষক বিশিষ্ট গুণের নাম 'ভাবিক' বা 'ভাবিকত্ব' (৩৫২); এই ভাবিকের কথা দণ্ডীও (২১৬৩) বলিয়াছেন। কিন্তু ভামহ

বলেন যে রচনার এই ভাবিকত্ব 'বক্রোক্তি' ভিন্ন পরিণ্মুট হয় না; কারণ বক্রোক্তিই সমস্ত গুণ বা অলঙ্কারের মূলস্বরূপ, এবং বক্রোক্তি ভিন্ন কোনও অর্থ প্রতীয়মান হয় না—

সৈষা সপত্র বক্রোক্তিরনয়াহাথো বিভাব্যতে।  
যত্রোহস্যাঃ কবিনা কার্য্যঃ কোহলঙ্কারোহনয়া  
বিনা ॥ (২৮৫)

ভামহ কবিগণ 'বক্রবাক্য' বলিয়াছেন (৬২৩) এবং অমৃত (২৮১) 'অতিশয়োক্তি' দ্বারা বাক্যের যে পোকাতিক্রান্ত-গোচরতা বুঝাইয়াছেন তাহা অলৌকিক 'বক্রতা' ভিন্ন আর কিছুই নহে। অভিনব-গুণ্য ('দ্বন্দ্ব্যালোকলোচন', পৃঃ ২০৮) এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'শব্দস্ত তি বক্রতা অভিধেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তরীণেন রূপেণাবস্থানম্'। কবিপ্রতিভাহীন ব্যক্তি সাধারণতঃ যে বাক্য ব্যবহার করে তাহার মধ্যে দ্বন্দ্বাতা, বৈচিত্র্য, বা বক্রতা নাই, তাহা 'স্বভাবোক্তি' (natural speech, স্বাভাবিক বাক্য) ইহা হইতে ভিন্ন। বৈচিত্র্য আছে, (na-  
tive speech)। সেইজন্য ভামহ বলে—

'বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কারি'।  
(১৩৬) এবং বক্রোক্তি-শূন্য বলিয়া বি-  
হেতু, অস্ম, লেণ প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারেই  
অলঙ্কারের মধ্যে গণ্য করেন না। (২৮৬)

(১) কাব্যাদর্শ, ১১০২

(২) কাব্যাদর্শ, ১৫১

(৩) প্রতাপরুদ্রবংশোদ্ভব (Bombay Sans. series) App. viii pp. 209-231

(৪) ভামহালঙ্কার, ১৯ হইতে ২৩ উক্তব্য, পৃঃ ২১০-১১। ভামহ গুণ ও অলঙ্কারের পার্থক্য করেন নাই।

ভাবিকত্বকে তিনি গুণও বলিয়াছেন, অলঙ্কারও বলিয়াছেন।

(৫) ই ১১৩; এই শ্লোকংশ কাব্যপ্রকাশে (২১) উদ্ধৃত হইয়াছে।

রসভাব প্রভৃতির ধারণা অজ্ঞাত না থাকিলেও, তাহাদিগকে ভ্রামহ বিশেষ প্রাধান্য দেন নাই। তিনি উল্লিখিত শ্লোকে বলিয়াছেন যে, বক্রোক্তিদ্বারা সমস্ত অর্থ 'বিভাবিত' হয়। 'বিভাবাতে' অর্থে অভিনবগুণ বলেন (ধ্বন্যালোকলোচন, পৃ: ২০৮)—“বিভাবতাং নীয়তে বিশেষণ চ ভাবাতে রসময়াক্রিয়ত ইতি”। এই বাধ্য যদি ঠিক হয়, তবে ভ্রামহের ‘বিভাবাতে’ শব্দটি স্বার্থবাক্যক এবং ইহার দ্বারা ভ্রামহ বুঝাইতে চান যে বক্রোক্তি হইতে অলঙ্কার (বা গুণ) ও রস এই দুয়ের উৎপত্তি। রসব্দ অলঙ্কারের মধ্যেও ভ্রামহ বলিয়াছেন—“রসবদ্বিশিতম্পষ্ট-শৃঙ্গারাদি রসম্” (৩৬)। কিন্তু তাঁহার মতে কাব্যে নিরন্তর রস-স্থিতির প্রয়োজন নাই; বক্রোক্তির প্রয়োজন আছে (১৩০)।

বক্রোক্তির যে আধুনিক সংকীর্ণ অর্থ ‘সাহিত্যাদর্শ’ (১৩১) দিয়াছেন তাহা (২১৪-১৭)।

ৱ্যক, অলঙ্কারসংকীর্ণ পৃ: ১ (৩) ও কাব্য, পৃ: ১৬, ৩৬, ৩৭, ৪৩-৪৪

(২) উক্তটির গ্রন্থ প্রথম J. R. A. S. vol. xxix N. S. 1897, p. 829-853তে মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়বারে প্রতীহারেন্দুরাজের টীকার সহিত ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ নতুনভাবে সন্নিবেহ আছে, কারণ ত্রিপুরার গোপাল রচিত বামনের টীকার (Benares Sans. Series Ed. p. 5) এবং ত্র্যম্বকের অলঙ্কার সংকীর্ণ (Trivandrum Ed. p. 7) উক্তটির যে শোকাংশ পাওয়া যায় মুদ্রিত পুস্তকে তাহা নাই। উক্ত ভ্রামহের উপর ভ্রামহবিবরণ নামক একটি অধুনালুপ্ত টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এ কথা যে কেবল প্রতীহারেন্দুরাজ (পৃ: ১৩) বলিয়াছেন তাহা নহে, অভিনবগুণের ধ্বন্যালোক-লোচনেও (পৃ: ১০) এ কথা আছে।

(৩) বুহলার (Buhler) (Kashmir Rep. J. R. A. S. Bomb. 1877) উক্তটিকে কাশ্মীরীধিপতি জয়গীড়ের সমকালীন বলিয়াছেন (১৭২-৮১৩ খ্রি: অ:)। প্রতীহারেন্দুরাজ অনেক পরবর্তী। পিশেলের (Pischel) মতে ইহার আভির্ভাবকাল ১০ম শতাব্দির মধ্যভাগ।

‘বক্রোক্তিবিত’ক’ ক’ ক’ ভ্রামহের বক্রোক্তিকে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিলেও, (১) পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ বক্রোক্তিকে ভ্রামহের অর্থে ব্যবহার করেন নাই, সামান্য অলঙ্কারপর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রামহের ‘বক্রোক্তি’ একেবারে লুপ্ত হয় নাই ‘কাব্যপ্রকাশে’ ও ‘সাহিত্য দর্পণে’ কবি ‘প্রোক্তোক্তি’ এই নূতন নামে আত্মগোপন করিয়া পুনরায় দেখা দিয়াছে।

উক্তটির ‘অলঙ্কার-সংগ্রহে’ (২) ছয়টি অধ্যায়ভুক্ত ১৭৫ শ্লোকে কেবলমাত্র ৪১টি অলঙ্কারের লক্ষণনির্দেশ আছে। কাব্য-লক্ষণসম্বন্ধে কোনও কথা নাই। ভট্ট উক্তট বোধ হয় অলঙ্কারকেই কাব্যের সর্বস্ব বলিয়া ধরিয়াছেন। প্রতীহারেন্দুরাজ তাঁহার বিস্তৃত টীকায় অনেক নূতন কথা আনিয়াছেন এবং উক্তটির মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু তাহা কতটা তাহার নিজের এবং কতটা উক্তটির তাহা বলা কঠিন। (৩) প্রতীহারেন্দুরাজের প্রতিটির উপর নির্ভর করিয়া

(১) মহিমভট্ট, ব্যক্তিবিবেক, পৃ: ২৮, ৩৭, ৫৮, ৬৪,

যাকোবী ~~বিশ্বকোষ~~ অনুবাদ, উপক্রমণিকা পৃঃ ৫ এবং পৃঃ ১৭) বলেন যে উদ্ভট রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ধরিয়াছেন। অবশ্য উদ্ভট রসসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু যাকোবি যে শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহা উদ্ভটের নহে, প্রতি-হারেন্দুরাজ 'তদাহঃ' বলিয়া কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ('কাব্যালঙ্কার-সংগ্রহ' পৃঃ ১৭)

রুদ্রট তাঁহার 'কাব্যালঙ্কারে' যে ভ্রামহাদির উপর বেশী উন্নতি করিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে কাব্যের প্রশংসা ও কাব্যের প্রয়োজনসম্বন্ধে যাচা বলিয়াছেন তাহাতে নূতন কথা খুব কমই আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব্যলক্ষণের বিচার করিবেন বলিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত কাব্য-লক্ষণ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই আছে। প্রথম শ্লোকে "নমু শব্দার্থো কাব্যম্" এই পৃষ্ঠপ্রতিবচনে শব্দার্থই কাব্যের মূল এইরূপ নির্দেশ করিয়া প্রধানতঃ শব্দ এবং অর্থের আলোচনা করিয়াছেন। তাহার পর বক্রোক্তি ও অমুপ্রাসের কথায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বসক-লক্ষণ, চতুর্থ অধ্যায়ে শ্লেষের ব্যাখ্যা, পঞ্চম অধ্যায়ে চিত্র নামক শব্দালঙ্কারের বিবৃতি, ষষ্ঠ অধ্যায়ে শব্দালঙ্কারের দোষ-

নিরূপণ। সপ্তম হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত অলঙ্কারাদির নির্ণয়, একাদশ অধ্যায়ে অর্থালঙ্কারের দোষবিচার, এবং পরিশেষে চারিটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে নায়কনায়িকাদির বিবরণে গ্রন্থের সমাপ্ত। উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রধানতঃ শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের প্রতি-পাদনই রুদ্রটের অলঙ্কারগ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। "জলদ্রজ্জলবাক্ প্রসরঃ সরসঃ কুপলনু মহাকবিঃ কাব্যম্" (১) এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় খেতাঘর নমি-সাধু 'সরস' অর্থে শৃঙ্গারাদি রসের সূচনা করিয়াছেন। (২) কিন্তু এক নায়কনায়িকা প্রকরণে (৩) ৪টি শ্লোক ভিন্ন রুদ্রট অত্র কোথাও রসের অবতারণা করেন নাই। রস সম্বন্ধে রুদ্রটের ধারণা নমিসাধু এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'উচ্যতে, কাব্যস্ত হি শব্দার্থো শরীরম্। তন্ত চ বক্রোক্তিবাস্তবাদয়ঃ কটক-কুণ্ডলাদয় ইব কৃত্রিমা অলঙ্কারাঃ। রসান্ত সৌন্দর্যাদয় ইব মামিধে-বাসাঃ।' সুতরাং রস বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট সৌন্দর্যাদির ম-ব-সংগ-প্রসঙ্গেই ইহার অভিযুক্তি। রুদ্রট (৫) অমুসরণ করিয়া শৃঙ্গারাদি উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতে (৬) রসনাদ্রসহমেষাং মধুরাদীনামিবোক্তমাচা-নিবেদাদিষপি ভগ্নিকামস্তীতি তেহপি রসাঃ

(১) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার ১।৪

(২) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ৩

(৩) দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক ১-৪ ইত্যাদি

(৪) ১২।১ শ্লোকের উপর টীকা, পৃঃ ১৫০

(৫) ভরত নাট্যশাস্ত্রে ৮টি রসের উল্লেখ করিয়াছেন (নাট্যশাস্ত্র ৬।১৭)। রুদ্রট শাস্ত্র ও প্রেরান এই দুটি অধিক রসের কথা বলিয়াছেন।

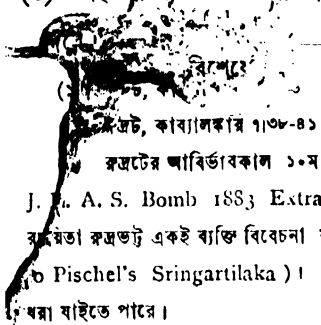
(৬) ভরত, নাট্যশাস্ত্র ৬।৩০-৩৪ ট্রটব্য। Jacobi, Introd. to his translation of Dhvanyaloka: p. 3 et seq.

রুদ্রট 'রীতি' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা দণ্ডীর মতামুযায়ী নহে। রুদ্রট বৈদভী রীতির কোনও উল্লেখ করেন নাই; পাকালী লাটী (দাক্ষাণাত্য) ও গোড়ী এই তিন রীতিভেদ করিয়াছেন। এই ভেদ সম্বন্ধেও দণ্ডীর সহিত মতপার্থক্য আছে। রুদ্রটের মতে বাকাগত লঘু মধ্য আয়ত সমাসবিবরণ লাইয়াই এই ত্রিবিধ ভেদ। (১)

রুদ্রট 'ভাব' এই অলঙ্কারের (২) যে লক্ষণ এবং উদাহরণ দিয়াছেন তাহাতে ব্যঙ্গার্থের (suggested sense) সূচনা আছে কিন্তু ব্যঙ্গার্থের স্পষ্ট ধারণা কোথাও নাই। রুদ্রট যদি আনন্দবর্দ্ধনের পরবর্তী হন তবে ইহা আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই। (৩)

তাহার পর বামন। (৪) বামনের গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিত এবং ইহার বৃত্তিও তাঁহার স্বকৃত। বামনের মতে "রীতিরাম্মা কাব্যাস্য" এবং "বিশিষ্টপদরচনা রীতিঃ"। (৫) এই

উত্তরে বামন বলিয়াছেন "বিশিষ্টপদা" অর্থাৎ মাধুর্যাদি-গুণাঙ্করচনাই বিশিষ্টরচনা। এবং এইরূপ গুণবিশিষ্ট-রচনা-মূলক রীতিই কাব্যের আত্মস্বরূপ। বামনের মতে রীতি ত্রিবিধ—(৬) বৈদভী, গোড়ী, ও পাকালী। এ বিষয়ে বামন রুদ্রটের মত অনুসরণ করেন নাই; বরং বৈদভী সম্বন্ধে দণ্ডী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বামনের সহিত বিশেষ মত ভেদ নাই। যে রীতিতে মাধুর্যাদি দশটি গুণই দেখা যায় তাহাকে দণ্ডী ও বামন উভয়েই গ্রাহ্য ও উপাদেয় বৈদভী রীতি বলেন। কিন্তু স্পষ্ট শিথিল অল্প-প্রাণাঙ্করবহুল গোড়ীরীতিকে দণ্ডী বৈদভীর বিপরীত রীতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বামনের মতে কতকগুলি বিশিষ্টগুণের সম্ভাব লাইয়াই গোড়ী ও পাকালী রীতির ভেদ; অর্থাৎ শুধু ওজঃ ও কাস্তিগুণ থাকিলেই গোড়ী এবং মাধুর্য ও সৌকুমার্যগুণ থাকিলেই পাকালী রীতি।



রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার ৭৩৮-৪১

রুদ্রটের আবির্ভাবকাল ১০ম শতকের মধ্যভাগ এইরূপ Peterson নির্দেশ করিয়াছেন (Report J. L. A. S. Bomb 1883 Extra no. p. 17); কিন্তু Pischel প্রভৃতি রুদ্রট ও শৃঙ্গারতিলক-ভাগ সম্বন্ধে রুদ্রভট্ট একই ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া ৯ম শতাব্দির মধ্যভাগ এইরূপ কালনির্ণয় করিয়াছেন (Indrod. Pischel's Sringartilaka)। তাহা যদি হয় তবে রুদ্রট আনন্দবর্দ্ধনের পরবর্তী বা সমসাময়িক এইরূপ ধরা যাইতে পারে।

(৪) বামনের আবির্ভাবকাল কেহ ৮ম (Pathak in J. L. A. S. Bomb. 1892) কেহ ৯ম (Ganganath Jha, Preface to his Trans. of Vamana), কেহ ১১ম শতকের মধ্যভাগ (Buhler, Kashmir Report P. 65) ধরিয়াছেন। সম্ভ্রান্তলোকে বামনের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে হৃত্যঃ বামন আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ববর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৫) বামন, কাব্যালঙ্কারমুদ্র, ১২৬-৮

(৬) বামন, কাব্যালঙ্কারমুদ্র ১২৯-১৪

‘রীতি’ কাব্যের আত্মা হইলেও, শব্দ ও অর্থের সমবায়েই কাব্য, (১) এবং সকল কাব্য গুণ ও অলঙ্কারের জন্ম উপাদেয় হয়। (২) গুণ ও অলঙ্কার কি তৎসম্বন্ধে ‘বামন বলিয়াছেন—‘কাব্যশোভায়াঃ কস্তারো ধর্ম্মাঃ গুণাঃ’ এবং ‘তদতিশয়চেতবন্তুলঙ্কারাঃ’ (৩) অর্থাৎ গুণ কাব্যশোভার উৎপাদক এবং অলঙ্কার তাহার বর্জক। এস্থলে অবশ্য অলঙ্কার শব্দ সঙ্গীর্ণ অর্থে লওয়া হইয়াছে এবং কেবল figure of speech বুঝাইতেছে। কিন্তু ‘সৌন্দর্য্যমলঙ্কারঃ’ (৪) এই প্রসিদ্ধ শ্লোকে অলঙ্কার অর্থে বামন কাব্যের সমগ্র সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছেন। কাব্যের এই ‘অলঙ্কার’ বা ‘সৌন্দর্য্য’ কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে তাহার উত্তরে এই কয়টি উপাধের উল্লেখ আছে— (১) গুণবিধিষ্ট রীতিতে রচনা (২) দোষের বর্জন এবং (৩) অলঙ্কারের (figure of speech) সমাবেশ। (৫)

উল্লিখিত সাক্ষ্যপুত্র বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে বামনের সিদ্ধান্ত দণ্ডী হইতে বিভিন্ন না হইলেও অনেক বিষয়ে তদপেক্ষা পরিণত, সুস্পষ্ট এবং সুবিস্তৃত। তথাপি তখনও অলঙ্কার-শাস্ত্রের সব কথা বলা হয় নাই। গুণ (qualities) ও অলঙ্কার (figure of speech)

যে কাব্যে সহকারীমাত্র এবং আকাংক্ষা, তাহা বামন দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু গুণালঙ্কার যুক্ত শব্দার্থ যে কাব্যের একমাত্র উপজীব্য, এ ধারণা তিনি এখনও ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। দণ্ডী রসকে অলঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (২১৭৫; ২১৮০-২২২); কিন্তু বামন এ বিষয়ে দণ্ডীকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। বামন বলিয়াছেন রচনার মধ্যে নাটকই শ্রেষ্ঠ (১১৭ ০-৩৩) এবং বোধ হয় নাটকের প্রাতি এই পক্ষপাতিত্বের জন্ম ভরতাদিশ্রোত নাটকের উপজীব্য রসকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ‘কাবিত্ব’ গুণের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন ‘দীপ্তরসবৎ কাবিত্বঃ’ এবং এইরূপে তিনি রসকে গুণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কাব্যের মুখ্য লক্ষণ-সমূহের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ‘বক্রোক্তি’ (৬) অলঙ্কারের ব্যাপ্যায় বাস্তব অর্থের (suggested sense) অস্পষ্ট মূঢ়তা থাকিলেও, ইহাকে বামন লক্ষণ ‘শোভা’ (vân) বলিয়াই পরিচয় করিয়াছেন (নিবন্ধিত করিতে পারেন না)। কোনও আশঙ্কায় সন্দেহ হইতে পারে না।

‘কাব্যপ্রকাশ’ (৭) উল্লিখিত প্রশঙ্ক নামক অলঙ্কারিকও বোধ হয় এ সময়ে বর্তমান ছিলেন। যদি ইনি ‘রাজতরঙ্গিনী’

(১) ‘কাব্যশোভায়ঃ গুণালঙ্কারসংস্কৃতয়োঃ শব্দার্থয়ো বর্ততে’ (১১১২ বৃত্তি)।

(২) বামন, কাব্যালঙ্কারতত্ত্ব ১১১১, ‘কাব্যঃ শ্রীহৃদমলঙ্কারাৎ’।

(৩) এ, ৩১১১-২। বামন পূর্বে বলিয়াছেন যে রীতি কাব্যের আত্মা এবং গুণবিশিষ্টপদরচনাই রীতি তাহা হইলে গুণ কাব্যালঙ্কার অংশবিশেষ। তাহার উপসর্গ (fit to be adorned); উপসারক (ornament) নহে। কিন্তু এখন বামন গুণকে কাব্যোপসারক বা কাব্য-শোভাকর ধর্ম বলিয়া অসঙ্গতি আনিয়াছেন।

(৪) এ, ১১১২, ইহার বৃত্তিতে পুনঃ বলিয়াছেন—‘করণব্যুৎপত্ত্যা পুনরলঙ্কারলঙ্কোহয়ং উপমাধিভূ বর্ততে’,

(৫) ১১১৩, ‘স মোদগুণালঙ্কারহানাদানাত্যাম্।’


(৬) বামন, কাব্যালঙ্কারতত্ত্ব ৪৩৮

(৭) কাব্যপ্রকাশ (Bomb. Sans. Series Ed.) পৃঃ ৯০

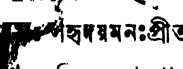


গ্রন্থে উল্লিখিত (১) রাজা অজিতাপীড়ের সমকালীন কবি হন তবে ইতার আবির্ভাব-কাল নবম শতকের পূর্বসীম। (২) তরতের 'রসোৎপত্তি' বিষয়ক সিদ্ধান্তসম্বন্ধে, মন্মট ত্রিশঙ্কর যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে ত্রিশঙ্কর রসসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তৃতীয়াংশে ইহার গ্রন্থ পাওয়া যায় নাহি। ঝালকৌরুর তাঁহার কাব্য-প্রকাশের টীকায় (৩) বলিয়াছেন যে ভট্টলোচন, ত্রিশঙ্কর, ভট্টনাথক, এবং অভিনব-গুপ্ত এই চারিজন পর্যায়ক্রমে মীমাংসা ত্রায় সাংখ্য ও অলঙ্কার মতামুযায়ী তরত-নাট্য-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কথা তিনি কোনও প্রাচীন টীকায় পাইয়াছেন (৪)।


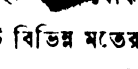
অলঙ্কার-শাস্ত্রে ধ্বনি (suggestion) বা ব্যঙ্গার্থের প্রথম প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃত বিচার 'ধ্বন্যালোকের' সময় হইতে। 'ধ্বন্যালোকের' প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

“কাব্যস্যাত্মা  সমান্নাতপূর্ব-  
মতম্।

কেচিৎ  বীরঃ

তেন  প্ৰিয়মমঃপ্রীত্যে তৎস্বরূপম্॥”

সুতরাং ধ্বনির ধারণা যে আনন্দবর্দ্ধনের পূর্বক প্রসিদ্ধ ছিল এবং এ বিষয়ে

বাদামুবাদও প্রচলিত  তাহা  যায়; কারণ এই শ্লোকে চারিটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইয়াছে (১) কাব্যের আত্মা ধ্বনি (২) ধ্বনির অন্তিম নাই (অভাববাদ) (৩) ধ্বনি লক্ষণার (indication) অন্তর্গত (৪) ধ্বনি বা ব্যঙ্গার্থ (suggested sense) ব্যাচ্যর্থ (expressed sense) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই সকল বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত ও সুস্থ আলোচনাপূর্বক ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্থাপনাই 'ধ্বন্যালোকের' প্রধান উদ্দেশ্য।

'ধ্বন্যালোক' দুইভাগে বিভক্ত; একভাগ কারিকা, তাহার নাম 'ধ্বনি'; অপরভাগ এই কারিকার বৃত্তি, তাহার নাম 'আলোক'। অভিনবগুপ্তাচার্য এই ধ্বন্যালোকের এক অশেষপাণ্ডিত্যপূর্ণ 'ধ্বন্যালোক-লোচন' নামক টীকা করিয়াছেন। জহ্নগ-সঙ্কলিত 'শুদ্ধ-মুক্তাবলী' নামক সংগ্রহে উদ্ধৃত রাসেশ্বরের রচিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে ধ্বনি ও আলোক, কারিকা ও বৃত্তি, উভয়েরই রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধন। (৫) কিন্তু অভিনব-গুপ্তের 'লোচনে' কারিকাকার ও বৃত্তিকার এই দুইজন পৃথক ব্যক্তি, এইরূপ অনেকস্থলে সূচিত হইয়াছে। (৬) অভিনবগুপ্ত বোধ-হয় আনন্দবর্দ্ধনকেই কারিকাকাররূপে নির্দেশ

(১) রাজতরঙ্গিনী (Bomb. Ed) ৪৭০৫

(২) S. P. Pandit in his preface to *Gaudavaho* p. lxxxvii and Peterson in his preface to *Subhasitavali* p. 127

(৩) কাব্যপ্রকাশ (Bombay, Second Ed.) পৃ: ৮৩

(৪) পৃ: ১৮। কাব্যপ্রকাশের প্রাচীন টীকারও এইরূপ আছে। ধ্বন্যালোকের লোচনটীকা হইতে বোঝা যায় যে ইহার তরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন।

(৫) ধ্বন্যালোক (কাব্যমালা সংকরণ) সম্পাদকীয় মন্তব্য ব্রহ্মব্যা। ধ্বন্যালোকের অন্ত নাম 'কাব্যলোক' 'সুধবদ্যালোক' ইত্যাদি।

(৬) ধ্বন্যালোক, পৃ: ৫১, ৬০, ১২৩

করিয়াছেন (১)। যদ্যপি দেখাইয়াছেন যে কারিকাকার ও বৃত্তিকৃত এই দুজনের মতের অনেকস্থলে পার্থক্য দেখা যায়। আনন্দবর্দ্ধন, বোধহয় কাশ্মীরদেশে ৯ম শতকের উত্তরাধিকে বর্তমান ছিলেন। (২)

পূর্বাচাৰ্য্যগণ অলঙ্কারের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ মূলতঃ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ‘ধ্বজালোক’ হইতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূক্ষ্মসূক্ষ্ম বিচারের সূত্রপাত। আনন্দবর্দ্ধনের সময় হইতে মৌর্যাসা ত্রায় সাংখ্য বেদান্ত ও ব্যাকরণাদির বিভিন্ন মতবাদ অলঙ্কারিকদের বিচারে ক্ষুণ্ণপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, এবং সূক্ষ্মসূক্ষ্মানে নিণীত অলঙ্কার-শাস্ত্র কঠিন ও দূরবর্গাহ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অভিনবগুপ্ত তাঁহার টীকাকে ধ্বজালোকের ‘লোচন’ বলিয়া আভাষিত করিলেও, এই ‘লোচন’ আমাদের কাছে দীবা চক্ষুদান না করিয়া অনেক সময় আরও অন্ধ করিয়া দেয়; কারণ কারিকা ও বৃত্তি অপেক্ষা তাঁহার টীকা আরও কঠিন এবং তাঁহার অদ্বুত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। মন্যট হইতে বিশ্বনাথ বিজ্ঞানাথ পর্য্যন্ত সমস্ত পরবর্তী

অলঙ্কারিকগণ ধ্বজালোকের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এবং ধ্বজালোককে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা স্বয়ং মতবাদের স্থাপনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আনন্দবর্দ্ধনই সর্বপ্রথম একটা সম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্ত অলঙ্কারশাস্ত্রের ধারণা গঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধ্বনি বা বাস্তব্য তাঁহার গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, শব্দ অর্থ, গুণ দোষ, অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতি কয়েকটি মূলতত্ত্বের পরম্পরিক সম্বন্ধ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে তাহার বিরূপ স্থান তাহা আনন্দবর্দ্ধন প্রথম সুবিচারপূর্বক নিকৃপিত করিয়াছেন। রসের স্বরূপ-নির্ণয় এবং রসবাস্তব্যনাই যে কাব্যের উদ্দেশ্য এই কথা তিনি ‘ধ্বজালোকে’ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এত রসাব্যক্তি আশ্রয় করিয়াই গুণদোষ ‘অলঙ্কার রীতি’দির কাব্যে যথাযোগ্য স্থিতি। গুণ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে তিনি বলেন—  
‘আমাদের প্রামাণ্যে রসতাবাদি নিরাসিত করিতে পারেন না। অলঙ্কার তান্ধ্র হইতে সঙ্গীতমতের তমর্থমবলম্ব্যে প্রাপ্ত হইতে পারে।’  
অপ্রাপ্তিতা স্বলঙ্কার মন্তব্যঃ কটক। (৩)

(১) ধ্বজালোক, পৃঃ ২৩৩। ক্ষেমেন্দ্র ও তাঁহার ‘উচ্চিষ্টা-বিচার’ গ্রন্থে (কাব্যমালা সংস্করণ পৃঃ ১৩৪) আনন্দবর্দ্ধনকেই কারিকাকার বলিয়াছেন। কিন্তু মন্যট আনন্দবর্দ্ধনকে কারিকাকার হইতে বিভিন্ন করিয়াছেন; কারিকাকারকে ধ্বনিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী অলঙ্কার গ্রন্থে ধ্বনিকার এই নির্দেশ কাব্যগুণের কারিকা ও বৃত্তি হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। যদ্যপিও কারিকাকার ও বৃত্তিকার দুইই বিভিন্ন ব্যক্তি।

(২) Buhler, Kashmiri Report (J. R. A. S. Bomb. 1877. Extra no.) p. 65-66. Jacobi, Introd. to his translation of Dhvanayaloka.

(৩) ধ্বজালোক পৃঃ ৭৪ ও ৭৮। শেষোক্ত স্লোকের বৃত্তি এইরূপ—‘যে তমর্থঃ রসাদিলক্ষণমলিনং সঙ্গমবলম্বন্তে তে গুণাঃ শৌধ্যাবিবৎ। বাচ্যবাচকলক্ষণান্তদানি যে পুনরাশ্রিতান্তেহলঙ্কারা মন্তব্যঃ। কটকাদিবদ্বিতী।’ (পৃঃ ৭৮)। কাব্যপ্রকাশেও এইরূপ ধরা হইয়াছে।

শৌর্য্যাদি বৈরূপ মানবাত্মার ধর্ম, গুণও সেইরূপ কাব্যাত্মার ধর্ম বিশেষ। অলঙ্কার শুধু কটককুণ্ডলাদির মত সৌন্দর্য্যবর্জক প্রসাধন স্বরূপ। মনুটাদি পরবর্তী আলঙ্কারিক-গণ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

আনন্দবর্দ্ধন কাব্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) ধ্বনিকাব্য (১) ( অর্থাৎ বাহ্যতে ধ্বনির প্রাধান্য ) (খ) গুণীভূতব্যাখ্যা (২) ( অর্থাৎ বাহ্যতে ব্যাখ্যার্থ থাকিলেও তাহা সুস্পষ্ট নহে ) (গ) চিত্রকাব্য (৩) ( অর্থাৎ বাহ্যতে ধ্বনির লেশমাত্র নাই )। ‘কাব্যপ্রকাশ’, ‘সাহিত্য-দর্পণ’, ‘একাবলী’, ‘প্রতাপরুদ্রবিশোভূষণ’ প্রভৃতি পরবর্তী প্রায় সমস্ত প্রধান অলঙ্কার-গ্রন্থে ধ্বন্তালোকনির্দিষ্ট এই শ্রেণীবিভাগ গৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চিত্রকাব্যকে সকলেই অধমকাব্যরূপে নিরূপিত করিয়া-ছেন, (৪) কারণ ইচ্ছাতে রসভাবাদির অভিব্যক্তি আত্মসম্বাদিতব্যাক্যাকাব্য-রূপে কল্পিত। এই ধ্বনি কল্পিত হইলে ধ্বনির বিচারে এবং রসের নিরূপণে প্রায় সমগ্র ধ্বন্তালোক নিয়োজিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে,

কারণ ধ্বন্তালোক হইতে আরও বারম্বার এ বিষয়ে এত কথা লিখিত হইয়াছে এবং এত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে। যে তাহার বিবরণ এই ক্ষুদ্রাত্তন প্রবন্ধে দেওয়া যায় না। (৫) মোটামুটি বলা যায় যে সমস্ত উত্তম কাব্যে ধ্বনি ( বা suggestion ) লক্ষিত হয়। শব্দের অভিধা (denotation) ও লক্ষণা (indication) ভিন্ন ব্যঞ্জনা নামক একটি শক্তি আছে; কাব্যেও শব্দার্থসম্ভব ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাবৃত্তি আছে। রসাদির অনুভব এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি ( function of suggestion )-ভিন্ন হয় না। কারণ শুধু অভিধা দ্বারা রসাবিব্যক্তি হইতে পারে না; অথবা, “ইহা অদ্ভুত রস” এইরূপ শুধু নির্দেশ করিয়া দিলে রসের কোনও প্রতীতি হয় না। লক্ষণার দ্বারাও রসের উদ্গম হয় না, কারণ অনুভূতির পূর্বে রসের কোনও বিভিন্ন সত্তা নাই। লক্ষণা, শব্দের গৌণশক্তি মাত্র; এবং বৈরূপ লক্ষিতার্থ না থাকিলেও ব্যাখ্যার্থ থাকিতে পারে, সেইরূপ লক্ষিতার্থ থাকিলেও ব্যাখ্যার্থ না থাকিতে পারে। নৈয়ায়িকের অনুমানের দ্বারাও রস ব্যক্ত হয় না, কারণ স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ রসের আশ্রয় ও

(১) ধ্বন্তালোক ১।১৬

(২) ধ্বন্তালোক ৩।৩৫

(৩) ধ্বন্তালোক ৩.৪২-৪৩

(৪) ধ্বন্তালোক ৩।৪২-৪৩, পৃঃ ২২০-২২১। কাব্যপ্রকাশ, বট উল্লাস। সাহিত্যদর্পণ (বোম্বাই সংস্করণ) ৪র্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৩৬। সাহিত্যদর্পণকার ইহার কাব্যত্বই অস্বীকার করেন নাই। প্রতাপরুদ্র, পৃঃ ৭১০

(৫) এ বিষয়ে নিয়োজিত পুস্তকগুলি ত্রৈলোক্য—কাব্যপ্রকাশ ১ম হইতে বট উল্লাস। ব্যক্তিবৈক (Trivandrum Sans. Series)। সাহিত্যদর্পণ, ২য় পরিচ্ছেদ, ৪র্থ এবং ৫ম পরিচ্ছেদ। একাবলী, উদ্বোধন হইতে ৪ পর্য্যন্ত। প্রতাপরুদ্র, কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৪২-৯৫। রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৯-২০ ইত্যাদি।

অনুমান এক কল্পিত নহে। সেইজন্য ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনির অলঙ্কার কাব্যাত্মক রসের অনুভবের জন্য আবশ্যিক। ব্যঙ্গনার্ভুত্ব দ্বারা হইবার প্রকাশ সম্ভব হয়। রসই যে কাব্যের আত্মস্বরূপ একথা আনন্দবর্দ্ধন স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, অতিনবগুপ্ত তাহা স্বাকার করিয়াছেন। ৬৫ পৃষ্ঠায় রসাদিধ্বনি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—‘নহি চক্ৰতঃ কাব্যং কিকিঞ্চিৎ।’ ‘যতপি চ রসেনৈব রসঃ জীবতি কাব্যম্’ ইত্যাদি। পুনশ্চ ২৭ পৃষ্ঠায়—‘রস এব বস্তুত আত্মা বস্তুলঙ্কারধ্বনি তু সর্বথা রসঃ প্রতি পর্যাবস্তেতে’।

এইরূপ ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের স্থাপনা করিয়া হইবার ‘বস্তুধ্বনি’, ‘অলঙ্কারধ্বনি’, ‘রসধ্বনি’ প্রভৃতি কল্পিত বিভিন্ন ভেদ হইতে পারে এবং কল্পিতে ইহা সমানাদিত হয়, আনন্দবর্দ্ধন তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধনের মতবাদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে হইবার উপর বৈরাগ্য-করণের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হইবে; কারণ অলঙ্কারিক মত হইলেও মূল্যতঃ শব্দব্যাপারের আলোচনার উপর ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আনন্দবর্দ্ধনও ‘শব্দতত্ত্বাবদ’-দিগের কথা অনেকস্থলে প্রকার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন (যথা পৃঃ ১৯৯) এবং একস্থলে বলিয়াছেন—‘প্রথমে হি বচাসো

বৈরাগ্যকরণা ব্যাকরণমূলহাং সর্ববিজ্ঞানাম্’ (পৃঃ ৪৭)।

অত্যাশ্চ দার্শনিক ও আনন্দারিকগণ ব্যঙ্গনার্ভুত্বের স্বাকার করেন না; কেহ বা ইহাকে অভিধা ও লক্ষণের মধ্যে কেহ বা অনুমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। এইরূপে অভাববাদী, অসুভাববাদী, অনুমানবাদী, অভিহিতাব্যববাদী ও অতিথিভিধানবাদী, দীর্ঘব্যাপারবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধানতঃ ইহার আলোচনা, তায় মৌনাসা ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদের সহিত বিন্দু সম্বন্ধযুক্ত। আনন্দবর্দ্ধনের গ্রন্থ প্রথমে যখন প্রভাব সমালোচিত হইয়াছিল। উদ্ভটের টীকাকার প্রতিহারেন্দু-রাজ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আনন্দবর্দ্ধনাদি যাহাকে ধ্বনি বলেন তাহা উদ্ভটনির্দিষ্ট কতকগুলি কাব্যালঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (১) ‘বাক্যজীবিত’কার কৃত্তক পদে ‘নিরলঙ্কারিত’—‘রস’ ইত্যাদি এবং ‘হি রসঃ’—‘তত্ত্ব’—‘পট্টারি’ বা ‘সাদৃশ্যমূলক’ (২) ‘ভেদ-বিশেষে’ মধো ভব্য। (৩) ইহার অসুভাববাদী অর্থাৎ ইহার ধ্বনিবোধ্য ও অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরেন। তট্ট পোরট বলেন যে শব্দের অভিধান

(১) ‘নহু যত্র কাব্যো সহস্রধ্বনিস্থাধ্বনিঃ প্রধামভূতস্ত শব্দব্যাপারান্দুর্ভবেন পতীহমানৈকরূপত্বার্থে সম্ভাব্যস্ত তথাবিধার্থাভিব্যক্তিহেতুঃ কাব্যজীবিতভূতঃ কলিঙং সহস্রৈশ্ব ধ্বনি নাম ব্যঙ্গকরভেদাত্মা কাব্য-বর্ণোচ্চিহিতঃ। স কস্মাবিহ নোপদিষ্টঃ। উচ্যতে। গ্রন্থেবালঙ্কারেনসম্ভবত্বাবাৎ।’ (উদ্ভট, কাব্যালঙ্কারসার লঘুবৃত্তি টীকা পৃঃ ৭১)।

(২) ‘বক্ত্রোক্তজীবিতকারস্ত বৈদধ্যভাবিত্ত্ববিত্ত্বভাবাং বহুবিধাং বক্ত্রোক্তিমৈব প্রাধান্যে কাব্যজীব-মূলকান্.....উপচারবক্ত্রাদিভিঃ সমন্তো ধ্বনিপ্রপকঃ স্বীকৃতঃ।’ (কথ্যক, অলঙ্কারতত্ত্ব, Triv. Ed. পৃঃ ৭৮)।

নিষ্কিন্ত শরের মত, একরূপ 'দীর্ঘব্যাপার', যে তাহাতেই সমস্ত অর্থ ব্যক্ত হয় (১)। ইনি দীর্ঘব্যাপারবাদী। এই সমস্ত মতবাদভিন্ন 'ব্যক্তিবিবেকে'র টীকাকারের কথায় জানা যায় যে ভট্টনারক (২) একখানি "হৃদয়-দর্পণাখ্যো ধ্বনিসংগ্রহঃ" রচনা করিয়াছিলেন। (৩) 'ব্যক্তিবিবেকে' গ্রন্থেও মহিমভট্ট আনন্দবর্দনকে যথেষ্ট আক্রমণ করিয়াছেন। মহিমভট্ট ধ্বনিকে অমুমানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম প্রোকেই এইরূপ বলিয়াছেন—

অমুমানেহস্তর্ভাবং সর্বসৌভ ধ্বনে:

প্রকাশয়িতুম্।

ব্যক্তিবিশেষং কুরুতে প্রণম্য মহিমা

পরং বাচম্ ॥

কব্যক 'অলঙ্কারসর্বশ্বে', মন্মট 'কাব্যপ্রকাশে' বিখ্যাত 'সাহিত্যদর্পণে', বিদ্যাধর 'একা-বলী'তে 'ব্যক্তি বিবেকে'র মত নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

হইলেও, 'ধ্বন্যালোচনায়' কালক্রমে পদ্যবাদী সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং মন্মট কব্যক জগন্নাথ হইতে নিখণ্ড বিদ্যাধর বিদ্যানাথ পর্যন্ত সমস্ত পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ ইহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছেন।

সুতরাং মন্মট প্রভৃতি পরবর্তী আলঙ্কারিক-গণের কাব্যের ধারণায় বিশেষ কোনও নূতন কথা পাওয়া যায় না, কেবল পূর্বো-ল্লিখিত মতাদির বিস্তৃত ও সুস্থ আলোচনা আছে। মন্মটের পরবর্তী অসংখ্য আলঙ্কারিক-গণের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। শুধু 'কাব্যপ্রকাশে'রই এ পর্যন্ত ৫০টি টীকা পাওয়া গিয়াছে। (৪) ইহাদের ছাড়িয়া দিলেও ভোজ তাঁহার 'সরস্বতী-কণ্ঠভরণে' (৫) কাব্যের যে লক্ষণনির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে পূর্বোক্ত মতাদির সহিত বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

দীর্ঘদীর্ঘো ব্যাপার ইতি মহানা: শব্দপ্রবণসমস্তরং যাবতোহর্থস্ত প্রতিভানং  
তাবদ্যাব্যাপারঃ ( 'সমধতি' ইত্যাদি ( বিদ্যাধর, একাবলী, Ed. K. P. Trivedi, p. 42 ) ।  
একাবলী গ্রন্থেই উল্লেখ এই সকল বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা ও খণ্ডন আছে।

(২) পিটারসন্ ( সুভাষিতাবলী ভূমিকা ) ইহাকে কাম্বীরাদিগণিত অবজীবর্ধার সমকালীন ( ৯ম শতকের শেষভাগ ) বলিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত তাঁহার ধ্বন্যালোকলোচনে ( পৃ: ১৫, ১৯, ২২, ২৯, ৬৩, ৬৭ ) অনেকবার মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন। কব্যক ( অলঙ্কারসর্বশ্ব পৃ: ৯ ) ইহার মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—  
'ভিনারকেন চু ব্যঞ্জনব্যাপারস্ত দ্রোণোক্ত্যভ্যুপগত্যস্ত কাব্যে সৎস্ব ক্রবতী ন্যগ্ভাবিতশব্দার্থরূপস্ত ব্যাপারস্তৈব  
বিধান্যমুক্তম্। তত্রাপ্যভিধাতবকতলক্ষণব্যাপারম্বোক্তৌর্ণৌ রসচর্কণাস্তৈব ভোগাপরপর্যায়ো ব্যাপারঃ এধান্যেন  
ব্রহ্মান্ডস্থানতরঙ্গীকৃতঃ।' ইহার অধুনা লুপ্ত গ্রন্থের নাম 'সহস্র-দর্পণ'।

(৩) ব্যক্তিবিবেকে ( Triv. Ed. ) পৃ: ১ এই 'হৃদয়দর্পণ' ভরভের নাট্যশাস্ত্রের টীকা, তাহা অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন।

(৪) Ganganath Jha, Kavyaprakasa, Preface p. viii—ix.

(৫) সরস্বতীকণ্ঠভরণ—১১২—'নির্দোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্। রসাদিতং কবি: কুর্সন্ কর্ণিঃ  
প্রীতিক-বিন্দতি।'

‘রসগদ্য’-এর জগৎ, দত্তী প্রভৃতির প্রাচীন মত অনুসরণ করিয়া—‘রমণীয়ার্ণ-প্রতিপাদকশব্দঃ কাব্যম্’ (১) এইরূপ বলিয়াছেন সত্য কিন্তু ইহার বিশ্লেষণে তিনি গুণ দোষ অলঙ্কার ধ্বনি রস প্রভৃতি সকল কথারই উল্লেখ করিয়াছেন। যেতান্বর জৈন হেমচন্দ্র, মন্যটকে অনুসরণ করিয়া, তাঁহার ‘কাব্যানুশাসনে’ কাব্যের স্বরূপ “প্রদোষৌ সগুণৌ সাংলঙ্কারৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্” (২) এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ধ্বনি, ব্যঙ্গার্থ, ও রসের কথাও আলোচনা করিয়াছেন। ‘অলঙ্কার শেখরে’ (৩) “উক্তঞ্চ ভগবতা শব্দার্থৌ কাব্যসা শরীরং, আত্মা রসঃ, গুণাঃ শৌর্যাদিবং। দোষাঃ কাণ্ডাদিবং। অলঙ্কারাঃ কুণ্ডলাদিবং” প্রভৃতি যে সকল বাক্য অলঙ্কার-সূত্রকার ভগবান্ শৌক্লোদিনিব মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা সাহিত্য-দর্পণকারের মত হইতে বিশেষ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। ‘একাবলী’ ও ‘প্রতাপরুদ্রায়’ ‘ধ্বন্যালোকে’র ও মন্যটকের মতই সাধারণতঃ অনুসৃত হইয়াছে।

“তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণৌ অনলঙ্কারৌ পুনঃ কাপি” (৪) বলিয়া মন্যট কাব্যলঙ্কারে যে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বনাথ তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই (৫) তীব্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্বনাথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এই নির্দেশ যুক্তিসম্মত নহে এবং ইহা যদি গৃহীত হয় তবে কোন কাব্যই ত্রুটিময়োগ্য হইতে পারে না, কারণ কোনও কাব্যই নির্দোষ নহে। (৬) বিশ্বনাথ শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রসই কাব্যের আত্মা; গুণ অলঙ্কার ও রীতি রসের উৎকর্ষবিধায়ক এবং দোষ রসের অপকর্ষক। তর্কের কথা ছাড়িয়া দিলে মন্যট ও সাহিত্যদর্পণকারের মতে যে বিশেষ গুরুতর পার্থক্য আছে তাহা বোধ হয় না। কাব্যপ্রকাশকার গ্রন্থারম্ভেই বলিয়াছেন—‘নির্যতিকৃতনিয়মরহিতাঃ ক্লাদৈক-ময়ীমনস্তপসতত্ত্বাম্। নবরসকুচিরাঃ নিশ্চীতি-মাদধতী ভারত-বাসীঃ।’ এবং দ্বিতীয় স্লোকের বৃত্তি-নিয়ম-করিত্ব-বিশেষ-বিশেষ উক্ত হইয়াছে। ‘হরে সর্বত্র’ [ভূতং সমনস্তরমেব রসস্বাদিনসমুদ্ভূতঃ

(১) জগন্নাথ, রসগদ্যধর (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ৪। সাহিত্যদর্পণকারের রসবিষয়ক মত সন্ধ্যা এইরূপ বলিয়াছেন—বস্তু রসবশেষ কাব্যমিতি সাহিত্যদর্পণে নির্ণীতম্ তন্ম। বহুলঙ্কারপ্রধানানাং কাব্যানাং কাব্যত্বাপত্তেঃ। ন চেষ্টাপত্তিঃ—মহাকবিসম্প্রদায়ভ্রাতৃলীলাব্রহ্মসংস্রাং (পৃঃ ৪)।

(২) হেমচন্দ্র, কাব্যানুশাসন (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ১৬

(৩) কেশব মিশ্র, অলঙ্কারশেখর (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ২০

(৪) কাব্যপ্রকাশ ১।১ (বোম্বাই সংস্করণ পৃঃ ১৩)।

(৫) সাহিত্যদর্পণ (বোম্বাই সংস্করণ পৃঃ ৬-২২), ১ম পরিচ্ছেদ। সাহিত্যদর্পণের নির্দেশও যুক্তিসম্মত নহে এবং অসম্পূর্ণ, একথা প্রত্যাচীকার বিহীন আলোচনা আছে (কাব্যপ্রদীপ, কাব্যমালা সংস্করণ, প্রত্যাচীকা ৮-১১)

(৬) কাব্যপ্রকাশ-প্রদীপের উদ্বোধন-চীকার ইহার জবাব দেওয়া হইয়াছে। (চন্দোরকর সম্পাদিত কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ১৫ উদ্বোধনচীকা প্রট্যা)

বেদান্তরমানন্দঃ প্রভুসম্মিতশব্দপ্রধান-বেদাদি-  
শাস্ত্রেভ্যঃ সূত্রসম্মিতার্থত্বাপগম্যবৎপূরণাদী-  
তিহাসেভ্যশ্চ শব্দার্থগো ভূতভাষ্যেন রসাসক্তত-  
ব্যাপারপ্রবণতয়া বিলক্ষণং যৎ কাব্যং  
লোকোত্তরবর্ণনানিপুণং কবিকর্ম্ম..." ইত্যাদি  
(১)। তবে সাহিত্যদর্পণকার রসকেই  
কাব্যাত্মা বলিয়া কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ  
করিয়াছেন এবং রসের ধারণা সঙ্ক্ষে তাহার  
মত আলোচনার যোগ্য।

রাজশেখর রসাদিকরণে নন্দকেশ্বরের  
নামোল্লেখ করিলেও, রসের আলোচনা ভারতের  
নাট্যশাস্ত্রে (২) সর্বপ্রথম দেখা যায়। ভারতের  
মতে শূদ্রাদি অষ্টরসের বিস্তারিত নাটকের  
প্রধান উদ্দেশ্য। কেশব মিশ্রের 'অলঙ্কার-  
শেখরে' (৩) সূত্রকার শৌক্লদিনির 'বাক্যং  
রসাদিমং কাব্যম্' অলঙ্কারান্ত শ্লোকেই,  
রস আত্মা' ইত্যাদি যে সকল বাক্য উদ্ধৃত  
হইয়াছে তাহা সঙ্ক্ষে অনুমান হয় যে রসের  
কাব্যাত্মতা ইত্যাদি ইচ্ছামত বহুপক্ষেই  
আনন্দবন্ধন  
তাহা সঙ্ক্ষে আলোচনার সময়

কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯-১০

(২) ভারত, নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়।

(৩) অলঙ্কারশেখর, পৃঃ ২, ৬, ২০ ইত্যাদি।

(৪) দ্বিত্যালৌক, পৃঃ ১৮১-১৮২

(৫) নাট্যশাস্ত্র পৃঃ ৬২। (কাব্যপ্রকাশে ধৃত পৃঃ ৮৩, সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৯)। ইহা অনুসরণ করিয়া  
ধনঞ্জয় দশরূপকে (পৃঃ ১৩৬) বলিয়াছেন—'বিভাবৈবরসভাবৈশ্চ সান্নিকৈ বার্ভিচারিভিঃ'। আনন্দবন্ধন  
স্বামীভাবো রসঃ স্তবঃ। মোহানি (Bhandarkar Comm. Volume p. 388) ভারতের নাট্যশাস্ত্র  
(১ম অধ্যায় পৃঃ ৭০) ইহাতে নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই সকল বিভিন্ন মতবাদের  
অস্পষ্ট সূচনা ভারতের মধ্যেই রহিয়াছে। "যদ্য অস্ত্রোত্তার্থসমুৎত বিভাবানুভাবব্যক্তিতেরেকানপকাশ্যত। ভাবৈঃ  
সামান্যগুণযোগেনাভিনন্দ্যন্তে রসাত্মকং কথং স্থায়িন এব ভাব। রসমহাগুণবন্তি। উচ্যতে.....। বহুপ্রিয়ত্বাৎ  
স্বামিত্বতঃ স্থায়িনো ভাবাঃ।.....যদ্য নরেন্দ্রো বহুজনপরিবাবোহপি স এব নাম লভতে নানাঃ হুমহানপি  
পুরুষত্বা বিভাবানুভাবব্যাক্তিগরিষ্ঠতঃ স্থায়িত্বাবো রসতাং লভতে।"

যে ভারত ও শৌক্লদিনির নাম দ্বারা  
প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়।  
দ্বিত্যালৌকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—'এতচ্চ  
রসাদিত্যংপযোগ কাব্যানিবন্ধনং ভারতাদৌ  
অপি স্প্রসিদ্ধমেব...' ইত্যাদি। (৪) কাব্যের  
ভেদরূপ নাটকে যাহা ভারতাদি-কর্তৃক  
সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা যে সমস্ত কাব্যের ধারণায়  
প্রযুক্ত হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

রস কাহাকে বলে এবং তাহার উৎপত্তি  
কিরূপ তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত  
আছে। সাধারণতঃ 'রসাস্তে ইতি রসঃ'  
( 'রস আত্মাদনে চুরাদিঃ' ) এইরূপ ব্যুৎপত্তি  
করিয়া, যাহা আত্মাদ বা উপভোগ করা  
যায় তাহার নাম রস এইরূপ নির্দেশ  
করা হইয়া থাকে। কাব্যে যাহা আত্মাদনীয়  
তাহাই কাব্যরস। ইহা মনের একটি  
স্থায়ীভাব। এই আত্মাদ কিরূপে সম্ভব  
তাহার সম্বন্ধে ভারত বলিয়াছেন—'বিভাবানু-  
ভাবব্যাক্তিগরিষ্ঠতঃ রসানুপত্তিঃ (৫)  
বিভাব (Excitant), অনুভাব (Ensuant)  
এবং ব্যাক্তিগরিষ্ঠতঃ (Accessory) ইহাতে

রসের সঞ্চারিত। অর্থাৎ যখন বস্তু বা জ্ঞানভাবকে সংবেদনযোগ্য (capable of being sensed) করিতে পারে; যথা শৃঙ্গাররসে গলনাউত্তানাদি। অতএব উহাকে স্পষ্ট সংবেদিত (sensed) করে; যথা আলিঙ্গনকটাকাদি। ব্যভিচারিভাব সহকারি হিসাবে ইহাকে বর্ণিত করে; যথা হর্ষানর্বেদাদি। এই সমস্ত হইতে রসস্বরূপ স্থায়ী ভাবের (permanent mood) নিম্পত্তি হয়, কিন্তু ইহাদের সহিত আশ্বাস্তময় রসের কি সম্বন্ধ? উল্লিখিত ভরতোক্তি অবলম্বন করিয়া এই সম্বন্ধে নানা প্রকার বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভট্ট লোল্লট প্রভৃতি মীমাংসামতবাদীগণ বলেন (১)—“স্থায়িনাং বিভাবৈঃ গলনাদি-রূপৈরালম্বনকারণৈঃ উত্তানাদিভিকল্পাদি-কারণৈঃ, অনুভাবৈঃ কটাক্ষভূত্যোৎক্ষেপ-প্রভৃতিভিঃ কাঠৈঃ, ব্যভিচারিভিঃ নিবেদাদি-রূপৈঃ সহকারিণ্যে সংযোগাৎ ক্রমেণোৎ-পাদ্যোৎপাদক ভাবরূপাৎ, গম্যগমক ভাবরূপাৎ পোষ্যপোষক ভাবরূপাচ্চ সম্বন্ধাৎ রসস্ত নিম্পত্তিরভিব্যক্তিঃ পুষ্টিশ্চ ভবত্যতি-সুত্বার্থঃ।” এই রসবাদকে উৎপত্তিবাদ বলা যায়। ইহাতে পারে, কারণ ইহাদের মতে বিভাবাদি কারণ (cause) হইতে রসরূপ কার্যের (effect) নিম্পত্তি। রাসমীমাংসাদির মধ্যে স্থিত যে শৃঙ্গারাদি রস এবং বাহ্য অভিনয়াদির দ্বারা নটনটীর মধ্যে অবস্থমান থাকিলেও প্রত্যক্ষমান, তাহা এইরূপে দর্শক

বা শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইহা এইরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে— “যথা অসংখ্য সপে সর্পতর্য অবলোকিতাৎ দামোহপি ভীতকদোহঃ, তথা সীতাবিষয়ী অনুরাগরূপা রামরচিতবিদ্যমানাহপি নন্তকে নাট্যনৈপুণ্যেন তস্মিন্ স্থিতেব প্রতীয়মানা সঙ্গদয়-জগদয়ে চমৎকারমপ্যস্তোব রসপদবী-মধিরোচতি।” কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে বাহ্য দর্শকের মধ্যে অবস্থিমান, তাহা কিরূপে তাহাকে চমৎকৃত করিতে পারে তাহা বোঝা যায় না। সেইজন্য কাব্য-প্রকাশের ‘প্রদীপ’-টীকাকার বলিয়াছেন—“সামাজিকে তদভাবে চমৎ-কারণভাববিরোধাৎ” (২) রস প্রতীয়মান (cognised) হইতে পারে না, কারণ রাস-মীমাংসা দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত নহে; ইহার উৎপত্তি (produced) হইতে পারে না, কারণ বিভাবাদির বাস্তবিকত্বের (reality) অভাব। অতএব ইহাও অসম্ভব হইতে পারে না, (নিষিদ্ধ করিতে পারা যায়) (৩) তাহারই, ইহাও সম্ভব হইতে পারে, তাহা, অভিব্যক্তির সম্ভব।

সেইজন্য নৈয়ায়িকমতানুসারী অনুমান-বাদীগণ বলেন যে অনুমানের দ্বারা রসের নিম্পত্তি হয়। শ্রীশঙ্করপ্রভৃতি এইরূপ বলেন— “স্থায়িনো বিভাবাদিভিকল্পরূপৈঃ সংযোগাৎ অনুমাপ্যানুমানকরূপাৎ সম্বন্ধাৎ রস-নিম্পত্তিরনুমানিরিতি সুত্বার্থঃ।” (৩) এইরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা বোঝান হইয়াছে : যেমন

(১) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৮৭ (ঝালকীর টীকা)

(২) প্রদীপ (কাব্যমীমাংসা সংস্করণ) পৃঃ ৩৩।

(৩) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৮৮



কুস্মটিকাকুলিত দেশে ধূম না থাকিলেও ধূমসাদৃশ্যের অভিমানে হইতে ধূমনিয়ত বহির অনুমান হয়, সেইরূপ নটনটীর মধ্যে রস-বিষয়ক বিভাবাদি না থাকিলেও, নিপুণ অভিনয় দ্বারা তাহাদের মধ্যে ইহার প্রতীয়মান অস্তিত্ব হইতে রাসমীতাদির রতির অনুমান করা যায়। এই অনুমিত রত্যাগি স্বীয় চমৎকারিত্বের বলে দর্শনের প্রতীতিগম্য হইয়া তাহাদের মনে রসস্বরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহাতে আপত্তি এই যে রসের প্রত্যক্ষ আনন্দ ও অনুমিতির দ্বারা আনন্দ একই প্রকার সুখকর নহে। সেই জন্য উল্লিখিত ‘প্রদীপ’কার বলিয়াছেন—‘এতদপাশ্চদয়গ্রাহি। যতঃ প্রত্যক্ষমেব জ্ঞানং সচমৎকারং নাশুমিত্যাদিরিতি লোক-প্রসিদ্ধিমবধূরাত্ত্বাকল্পনে মানাভাবঃ।’ (১)

ভট্টনারকাদি সাংখ্যমতাবলম্বীগণ এই দুইটি কোনও মত স্বীকার করেন না। ইহাদের মতে রসের সার্থকতা যাইতে পারে না। রসের সংযোগাদি ভোজ্যভোগ্যের বিশেষণ। ‘ভোজ্য’ (enjoyable) এবং ‘ভোজক’ (enjoyer) সম্বন্ধ হইতেই বিভাবাদি দ্বারা রসের নিম্পত্তি। একটু বিস্তৃতভাবে ইহা বুঝিতে হইবে। ইহাদের মতে শব্দের তিনটি শক্তি আছে—‘অভিধা’, ‘ভাবকত্ব’ এবং ‘ভোজকত্ব’। ইহারা বলেন যে ‘অভিধা’ (denotation) এবং লক্ষণা

(indication) ইহাদের বৃত্তান্ত। ‘অভিধা’ অর্থ ‘সাধারণীকরণম্’ (generalisation) (৩)। এই শক্তির দ্বারা বিভাবাদি এবং স্থানিভাব ‘সাধারণীকৃত’ হয় অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ প্রকৃতি (general character) বুঝায়, ইহাদের কোনও বিশিষ্ট ধর্ম (specific properties) বুঝায় না। যেমন ‘সীতা’ এই বিভাবের দ্বারা ‘সীতা’ নামক কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝায় না, ‘কামিনী’ এই সাধারণ বিষয় বুঝায়। এবং রাসের সীতাবিষয়ক অনুরাগ এই স্থানিভাব কেবল সাধারণ রতি বা অনুরাগ (love in general) বুঝায়। রতির কোনও বিশিষ্ট কারক (agent) বা বস্তু (object) বুঝায় না। ‘ভোজকত্ব’ শক্তির দ্বারা, এই সাধারণীকৃত বিশিষ্টধর্মবজ্জিত স্থানিভাব এবং বিভাবাদির উপভোগ হয়। সুতরাং রসের আনন্দ আলৌকিক, সাধারণ লৌকিক সুখের আনন্দ হইতে বিভিন্ন। সম্বন্ধগোপন্য আনন্দময় জ্ঞানের দ্বারা ইহার উপভোগ। এই মতবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি যে এক্ষণ শব্দের ‘ভাবকত্ব’ ও ‘ভোজকত্ব’ শক্তির কল্পনা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক। (‘এতাদৃশ ব্যাপারদ্বয়কল্পনে প্রামাণ্যভাবঃ।’ প্রদীপ পৃ: ৬৬)।

অভিনবগুপ্তাদি আলঙ্কারিকগণের মত এক্ষণ;—‘স্থানিভাবঃ বিভাবাদিভিঃ সমঃ সংযোগাদ্ ব্যাক্যব্যক্তভাবরূপাৎ সম্বন্ধাদ্ বিভাবাদীনামেব বা পরস্পরঃ সংযোগাৎ

(১) প্রদীপ পৃ: ৬৪-৬৫, সাহিত্যদর্পণ পৃ: ২৪৮-২৫৫। রসের আলোচনা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত গ্রন্থ তির একাবলী পৃ: ৮৬-৮৮, প্রতাপরুদ্রীয় পৃ: ২১৯-২২৯, রসগঙ্গাধর পৃ: ২২-৩১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

(২) কাব্যপ্রকাশ পৃ: ৯১

(৩) প্রদীপ পৃ: ৬৬। সাহিত্যদর্পণ পৃ: ৭৯ দ্রষ্টব্য।

মিলন। রসাত্মক নিম্পত্তিরাভিব্যক্তিরিতি  
সূত্রার্থ:।' (১) ইহাকে অভিব্যক্তিবাদ বলা  
যাইতে পারে। রসি প্রভৃতি স্থায়ীভাব,  
ললনা উজ্জ্বল কটাক্ষ প্রভৃতি লৌকিক কারণ  
হইতে অমুমিত (২) হইয়া, সংস্কার বা  
বাসনা (impression) রূপে সজ্জন-সুন্দরে  
থাকিয়া যায়। যখন কোন কাব্য পঠিত  
বা নাটক অমুমিত হয়, তখন সজ্জন-সুন্দরে  
অধিষ্ঠিত এই সকল সংস্কাররূপী রত্নাদি  
ভাব পূর্কোক্ত ললনাদি কারণ দ্বারা অভিব্যক্ত  
(suggested) হয়; কিন্তু এই সকল  
কারণ এখন আর লৌকিক কারণ থাকে  
না, তাহারা বিভাব অমুভাব ও ব্যতিচারি-  
ভাব নাম গ্রহণ করে এবং পূর্কোক্ত  
'ভাবকল্পশক্তি'র দ্বারা ইহারা 'রাসমীমাংসা' এই  
রূপ নির্দিষ্ট (specific) ব্যক্তি বা বস্তু  
না বুঝাইয়া সাধারণ 'কামিনী' প্রভৃতি অর্প  
বুঝায়। তখন বিভাবাদি 'ইহা আমার,  
ইহা পরের', এইরূপ কোনও বিশিষ্ট সম্বন্ধ  
(specific connexion) না বুঝাইয়া  
দর্শক বা শ্রোতার দ্বারা আনন্দাদক্ষম হয়।  
(৩) স্থায়ীভাবও কোনও নির্দিষ্ট দর্শক  
সম্বন্ধে প্রযোজ্য থাকে না, দর্শকমাত্রই  
প্রযোজ্য হয়, সুতরাং সর্বসম্বন্ধী হইয়া যায়  
( 'পরিমিতাবনধীতা' )। যদিও ইহা কোনও

নির্দিষ্ট দর্শক কর্তৃক আনন্দিত হয় বটে,  
তথাপি আনন্দনের সময় সে 'আমারই এই  
বিভাবাদি আমিই রসের আনন্দিত' এই-  
রূপ ভাবে না, বরং বিভাবাদির সাধারণী-  
করণের দ্বারা ইহা সকল সজ্জন লোকের  
আনন্দ এইরূপ তাহার প্রতীত হয়। এই  
আনন্দই রস। সুতরাং বাহ্যদের কখনও  
রত্নাদি অমুভব হয় নাই এবং বাহ্যদের এ  
বিষয়ে কোনও বাসনা (impression) নাই,  
তাহারা কখনও রস আনন্দন করিতে পারে  
না। এইজন্য সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন  
যে ইহা বাক্যে বুঝাইবার বস্তু নহে, কারণ  
ইহা 'বেদান্তরস্পর্শশূন্য' (৪); কেবল  
'সজ্জনসুন্দর-বেদ্য' (৫)। এই বাসনা  
(impression) স্মৃতি দ্বারা উৎপন্ন হয়। সেইজন্য  
বৃদ্ধ মীমাংসক বা বৈয়াকরণগণ অথবা  
যাহারা সংসারবিরমিত, তাহারা রসানন্দে  
বঞ্চিত, এক নিরাসিত হইয়া পড়িয়া থাকে।  
বলিয়াছেন ( 'হিরে সঙ্গ' )। সুতরাং  
বাসনা (suggestion) দ্বারা, দর্শক বা  
শ্রোতার মনে অভিব্যক্ত হয়। ইহা অভিধা  
(denotation), তাৎপর্য (import), লক্ষণা  
(indication), প্রত্যক্ষ (cognition)

(১) কাব্যপ্রকাশ পৃ: ৯১। প্রদীপ পৃ: ৬৭

(২) এই অনুমান কিরূপ তাহা কলকাত্তরী টীকা ( Benares Ed. ) এইরূপ বুঝাইয়াছেন—'অনন্ত-  
ধ্বনি-রতিমান। তৎকার্যকটাক্ষাদিত্যাবাৎ। যো মৈবং স নৈবম্। যথা বিরক্তঃ ॥'

(৩) সাহিত্যদর্পণ পৃ: ৮১

(৪) সাহিত্যদর্পণ পৃ: ৭২

(৫) সাহিত্যদর্পণ পৃ: ৮৮

(৬) সাহিত্যদর্পণ পৃ: ৭৯। প্রদীপ পৃ: ৬০। কলকাত্তরী টীকার উক্ত হইয়াছে "রসিকা এবং রসানন্দে  
যোগ্য নতু বিরক্তাঃ।"

অহ্মান ( inference ) বা স্বরণ ব্রহ্মানন্দাশ্রমের মত সম্পূর্ণ। ইহার ( recollection ) ইহাদের কাহারও বিষয়ভূত নহে। (১) যদিও বিভাবাদি অপরিহার্য্য এবং তদ্বিন্ন রসের অস্তিত্ব নাই, তথাপি ইহার রসের কারণ (cause) নহে, রসও ইহাদের -কার্য্য (effect) নহে। যাহা কার্য্য তাহা কারণের তিরোভাবের পরও থাকিতে পারে; কিন্তু রস বিভাবাদি না থাকিলে থাকিতে পারে না। (২) সুতরাং ইহা 'বিভাবাদিবিভাবাদিঃ' ইহা অলৌকিক বলিয়া সাধারণ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাপ্য নহে। যেমন খণ্ডমরীচ, শর্করা, কর্পূর প্রভৃতির সম্মেলনসম্বৃত পানীয়ে, ইহার প্রত্যেকের আশ্রয় হইতে বিভিন্ন, আশ্রয় পাওয়া যায়, রসেও সেইরূপ। (৩) বিভাবাদির দ্বারা সম্পন্ন হইলেও রস এক (single or indivisible); এবং ইহা হইতে বিভাবাদি বিভিন্ন প্রতীতি হয় না। সুতরাং ইহা পানীয়ের মত রস (৪)। 'চর্য্য-মান' (state of being relished)। ইহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম (৫)।

রসের আশ্রয় অলৌকিক; কারণ ইহা

ব্রহ্মানন্দাশ্রমের মত সম্পূর্ণ। ইহার আশ্রয়দানে অন্য কোনও বস্তুপ্রতীতি থাকে না ('বিগলিতবেদ্যাস্তরঃ')। কেবল ব্রহ্মানন্দাশ্রম ও কাব্যরসাস্রমের পার্থক্য এই যে কাব্যরসাস্রম বিভাবাত্মকসম্মানসাধ্য কিছু ব্রহ্মানন্দাশ্রমের দ্বারা সম্ভব। সুতরাং এই রসপ্রতীতি 'সকল-সুন্দর-সুন্দর-সংবেদন সাক্ষিক' অথবা মনুষ্যের কথায় 'সকল-সুন্দর-সংবাদভাজা প্রমাত্রা গোচরীকৃতঃ' (৭)।

তাহা হইলে দেখা গেল যে কাব্যের আদর্শ অতি সঙ্কীর্ণ আদিম ধারণা হইতে ক্রমে ক্রমে রসের চরম নিষ্পত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। অলঙ্কারের ভেদ (classification) এবং লক্ষণনির্ণয় (definition) বহুপূর্বেই হইয়া গিয়াছিল। শুণ দোষের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে রীতি বা style যে কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহা দণ্ডীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই রীতির সংস্থানে সমাধি (harmony) বা সৌন্দর্য্যের (beauty) উৎপত্তি, কারণ এই রীতি 'রসাদীনাং উপকর্ত্তী'মাত্র। অভিধা লক্ষণাদিরূপ শব্দের শক্তিরূপণ এবং তাহার পর ব্যঞ্জনার স্থাপনা দ্বারা শব্দব্যাপারের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পপঙ্ক্তির যে ভেদ নাই এবং ছন্দ

(১) সাহিত্যদর্পণ ৫ম পরিচ্ছেদ।

(২) সাহিত্যদর্পণ পৃ: ৬৬। কাব্যপ্রকাশ পৃ: ৯৪

(৩) সাহিত্যদর্পণ পৃ: ৮৩ 'প্রপাণকরসম্মানভাজক্যমানো রসো ভবেৎ'। কমলাকরী—'পানকে অন্নখণ্ড-রীচকাণীনাং চিত্ররসবৎ সংবলিতানাং রসবৎ'। কাব্যপ্রকাশ পৃ: ৯৩। দণ্ডীপ ৬৮-৬৯।

(৪) সাহিত্যদর্পণ পৃ: ৮২। কাব্যপ্রকাশ ৯৪। দণ্ডীপ ৬৮-৬৯।

(৫) 'চর্য্যমাত্রিকপ্রাপ্তঃ' কমলাকর।

(৬) 'ব্রহ্মানন্দসংহারঃ' (সাহিত্যদর্পণ পৃ: ৭২), 'ব্রহ্মানন্দাসমবাস্তবায়ন' (কাব্যপ্রকাশ পৃ: ৯৩)।

(৭) কাব্যপ্রকাশ পৃ: ৯২, সাহিত্যদর্পণ পৃ: ৭২



কেবল কবির মধ্যে থাকিলে হইবে না, পাঠকের মধ্যে থাকিও একান্ত আবশ্যক। 'রসিক' বা 'সহদয়' (man of taste) কাহাকে বলা যাইতে পারে তাহা হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসনে' এইরূপ বুঝাইয়াছেন—'বস্ত তু কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুগ্ধে বর্ণনীর তন্ময়ীভবনাবোগ্যতা-সহদয়সংবাদভাক্ স সহদয়ঃ' (চূড়ামণি টীকা পৃঃ ৩)।

রসের ধারণাই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এই রসের ধারণা কিরূপ সূক্ষ্ম অথচ উন্নত তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। কাব্যানুশাসনান্নামকে আলঙ্কারিক-গণ প্রকাশনান্ন অজ্ঞাপ্য অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মরসান্বয়ের সমান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাব্য (Poetry) এবং ব্রহ্মজ্ঞান (Religion) প্রায় এক পইঠায় আদ্রিয়া গড়াইয়াছে। সুতরাং এই কাব্যরসান্বাদে সকলেই আনন্দিত এবং ইহার সত্ত্ব ভাষ্যে সাধারণী বৃত্তির (common sense) আবশ্যক। রসের অনির্ব্বচন্যতা (wonder) হইতে সমুদ্ভূত। অদ্ভুত (বা marvellous or sublime) কে রসভেদে বলিয়া নিরূপিত করিলেও, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন—

রসে সারস্বতমংকারঃ সর্বত্রাপ্যাহুত্বতে  
তচ্চমংকারসারস্বতঃ সর্বত্রাপ্যাহুত্বতে, রসঃ ॥

চমৎকার (splendid wonder) কাব্যের মূল তাহা বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে এবং এই 'লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণ' কাব্যরসের আবাদ কেবল সহদয় ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণ যোগীদিগের দ্বারা অমুদ্রব করিতে পারেন—  
পুণ্যবস্তঃ প্রমিষন্তি যোগিবস্ত্ররসন্ততিম্।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যেমন সকলকেই কাব্যরসান্বাদনের অধিকারী বিবেচনা করেন না, সেইরূপ তাঁহারা বলেন যে সকল কবিই এই কাব্যরসের সৃষ্টি করিতে পারেন না। দণ্ডী বলিয়াছেন—

ন বিদ্বতে বস্তপি পূর্ব্ববাসনা

শৃণামু বন্ধি প্রতিভানমুদ্ভূতম্

তাহা হইলে কাব্যরচনা নিম্নলিখিত; কারণ—  
'কবিত্ববীজং প্রতিভানম্' (বামন ১৫১৩)।  
এই 'প্রতিভান'—'জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ কশ্চিৎ। যন্মাদ্বিনা কাব্যং ন নিষ্পত্ততে। নিষ্পন্নং বা হস্তায়তনং জ্ঞাতং।' কিন্তু এই কবিত্বশক্তি থাকিলেও চেষ্টা, একাগ্রতা, লোকশাস্ত্রবৈচক্ষ্য, লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস অভিজ্ঞান ছন্দ কলাবিদ্যা দণ্ডনৌতি প্রভৃতির অনুশীলনও 'কাব্যাদ' বা কবিত্বের উদ্দেশ্যক। (বামন, ১৫; কাব্যপ্রকাশ ১৫)। সেইজন্য দণ্ডী বলিয়াছেন—

তদন্ততঃস্বৈরনিঃ সন্নতী

শ্রমাচপায়া থলু কীর্তিমীপ সৃতিঃ।

ঐশ্বরীলকুমার-প্রঃ ১

## স্মরণে

জনম-জনম বাহার পাণি পীড়ন করে' আসছ বহু যৌর,  
আবার সে যে পড়ল ছিঁড়ে তোমার তরুণ কাশ্মিন ফুলের ডোর।  
শুঁড়িয়ে গেল পাঞ্জর-তলা বিদার-বোঝার পাষণ-ভাঙ্গা ভারে,  
জীবন-নায়ে জল ভরিল, পৌছিল না সুখ-দরবার পারে।  
মৃত্যু-বাণো শূন্য নিখিল, উদাস-করা সকল হাসির সুর—  
উষার এলে ভাসানু দিয়ে, নতুন শ্রোতে বার সে কতদূর!

ছাইএর সনে ছাই মিশেছে, বে-টুকু তার অমর চিরস্তন,  
সেই-টুকু-বাগ্‌দস্ত সে যে, নতুন যুগে কল্পে নিবেদন।  
বন্ধতলের স্প্রাসবে রসিয়ে হিমার ব্যাকুল ওষ্ঠাধর,  
চির-নারীর বরণ-মালা সেই তোমারে পরায় নিরস্তর।  
আকাশ-পাণ্ডের আব্‌ছা-বীকে মহানৌলের মিলন-মোহানার,  
অনন্ত সেই অন্তঃস্রব—বৃকের তলায় হারাও নি তো তার।  
চোখের জলের মানস-হ্রদে, সেই তো অমল স্মৃতির শরৎ-ভস্ম  
গৌরবেরি নগ্ন কমল, সেই ফুটেছে শিশির-মোহিত-বাসি  
পরশ-মণির সোনার ছোঁরা পেয়েছে আজ তো  
শুকিয়ে গেছে প্রাণের স্নায়ু, ধমনীতে জমাট শোণিত-কানি।  
সামনে তোমার স্মৃতি পথ, ছায়াপূরীর ছায়ার-প্রান্তে শেষ,  
নাইকে। আলো, নাইকে। ছবি, পেরিয়ে চল' দীর্ঘ-বাসের দেশ।  
কান্না-ধোয়া ভস্ম-রাশে দাঁও নুটারে সিক্ত বৃথার হার,  
বাহির থেকে নেই গো কিছুই, ভিতরকার এহ দরদ জুড়াবার।

ঐকল্পানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

## স্বপ্ন

( পূর্বানুভূতি )

আমাদের আগ্রহ অবস্থায় স্থিতি যে আমাদের মনের রাজ্যে আনাগোনা করে, তাহা প্রত্যক্ষই অনুভব করিতে পারি। এই সব স্থিতি আমাদের বর্তমান অবস্থা, বর্তমান কার্য, বর্তমান চিন্তা প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

ইতর প্রাণীর উপরও স্থিতির প্রভাব অল্প নহে। কোন সুদূর অতীতে অমুরূপ অবস্থায় ঠিক কি ফল ফলিয়াছিল—স্থিতিই সে বিষয়ে তাহাদিগকেই সচেতন করিয়া তোলে; এবং সেই সুদূর স্থিতির সাহায্যেই সমস্ত প্রাণী বর্তমান ক্ষেত্রে কর্তব্য-নির্ধারণ করে।

কিন্তু বর্তমানের সহিত সংশ্লিষ্ট এই স্থিতিগুলির অন্তরালে আরো বহু সহস্র এমন স্থিতি আছে, যাহা আমাদের পশ্চাতে অসংখ্য প্রজন্মের জন্ম হইতে আসিতেছে। আমাদের স্থিতি যে এই অসংখ্য রাজ্যে স্থর আছে, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই—স্বপ্নাতিস্বপ্ন—নেহাৎ নগণ্য বিষয়ের স্থিতিও অবহেলিত হয় না—কোনটিই বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া পড়িয়া না। এই অজ্ঞানময় পাতাল-পুরীর স্থিতিগুলি কতকটা অদৃশ্য ছায়া-মুণ্ডিতে রূপান্তরিত হইয়া আছে। হয়ত তাহাদের জ্ঞানের আলোক-রাজ্যে প্রবেশের সাধ খুবই হইতে পারে, কিন্তু এই সাধ মিটাইবার চেষ্টা মোটেই থাকে না। তাহার কারণ, সচেতন মানুষ আমি—তাহাদের

দিকে মনোযোগ দেওয়া ছাড়া আমার অন্ত্র অনেক কাজ আছে। কিন্তু যদি কোন মুহূর্তে আমি, বর্তমান অবস্থা ও বর্তমান কার্যের উপর—অর্থাৎ যাহা-কিছু এতাবৎকাল আমার স্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, তাহার উপর বাতরগ হই—কিন্তু যে-মুহূর্তে আমি অচেতন বা নিদ্রিত হইয়া পড়ি, সেই মুহূর্তে উল্লিখিত অতীত স্থিতিগুলি জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের বাধা দূর হইল বুঝিয়া আমার মনের রাজ্যে সজাগ হইয়া উঠে। অতীতের এই অসংখ্য স্থিতি একসঙ্গেই ছুটিয়া আসে—সকলেই ফুটিতে চায়—কিন্তু মনে এতগুলোকে ঠাই দিই কি করিয়া? কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে আসিতে দিব?—এ সমস্তার সমধান কঠিন নহে। ইতিপূর্বে বখন আমি আগ্রহ ছিলাম—তখন যে স্থিতিগুলি আমার মনের তদানীন্তন অবস্থার সঙ্গে একটা কোন রকম সম্পর্ক পাতাইতে পারিয়াছিল, সেই সব স্থিতিই সর্বপ্রথমে প্রবেশাধিকার পাইবে। নিদ্রিত অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্পষ্ট দৃষ্টগুলি আমার চোখে পাতাইতে—অপেক্ষাকৃত অল্পষ্ট শব্দ কাণে আসিতেছে—দেহের উপর যে স্পর্শ লাভ করিতেছি, তাহাও তেমন স্পষ্ট বোধ হইতেছে না—তা ছাড়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে কত সব নানা প্রকারের মিশ্র অনুভূতি আছে। ছায়া-স্থিতিগুলির মধ্যে বাহারা এই গন্ধ

শব্দ-সম্প্রদায়ের সাহিত্য অর্থাৎ এক কথায় বাস্তবতার সহিত যুক্ত হইতে অভিলাষী, তাহাদের মধ্যে কেবল সেইগুলিই প্রবেশাধিকার পাইতে পারে, যেগুলি আমার দৃষ্টি মণ্ডলের বর্ণ-বিন্দু, আমার বাহিরের ও অন্তরের যাবতীয় অমুভূতির সহিত আপনাদের অন্তিম জুড়িয়া দিতে সমর্থ হয়। ইহা ছাড়া আমাদের সাধারণ প্রকৃতির সহিত তাহাদের খাপ খাওয়াও চাই। যখন এইভাবে স্মৃতি ও অমুভূতির সম্মিলন ঘটে—তখনই আমরা ‘স্বপ্ন দেখি’।

স্বপ্নের ভিতর হ্রস্বোপদেহ কিছুই নাই।  
—স্বপ্ন দেখা ও আমাদের কোন বিষয়ে ধারণা করার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ-কিছু নাই। কোন একটি বাস্তব পদার্থের সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করিবার সময় আমরা প্রত্যক্ষ বাহ্য দেখি, শুনি, তাহা অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ অমুভূতি স্মৃতি-সমুদ্ভূত অমুমানের সহিত সংযুক্ত হয়। অমুমানের সহিত তুলনার প্রত্যক্ষ অমুভূতির কার্য্য খুবই সামান্য। যখন আমরা কোন গ্রন্থ বা সংবাদ-পত্র পাঠ করি—তখন কি সমস্ত ছাপার অক্ষরগুলিই আমাদের জ্ঞানরাজ্যে পৃথক পৃথকভাবে স্পষ্টীকৃত হয়? না, তাহা হইলে বোধ হয় সমস্তদিন ধরিয়া পড়িলেও একখানা কাগজ শেষ করা হইত না। আসল ব্যাপার দাঁড়ায় এই, পড়িবার সময় একটা শব্দে এমন কি এক-একটা ছত্রের দুই-একটা অক্ষর, দুই-একটা বিশেষ বিশেষ চিহ্নই সেই-সেই শব্দ বা ছত্রের সম্বন্ধে আমাদের মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দেয়। আমরা দুই-একটা অক্ষর ও শব্দমাত্র প্রত্যক্ষ করি, বাকীটা অমুমানের

বুঝিয়া লই। গোল্ডস্মিডের এবং মলার যে-ভাবে এই ব্যাপারটি প্রমাণ করিয়াছেন—তাহারই উল্লেখ করিতেছি। ইহার কতকগুলি সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত বাক্য, যেমন “Positively no admission,” “Preface to the Fourth Edition” প্রভৃতি কথা একখণ্ড কাগজে লিপিবদ্ধ করেন; ইচ্ছা করিয়াই ইহার শব্দগুলি তুল করিয়া লেখেন—এমন কি মধ্যে মধ্যে দুই-একটা অক্ষর একেবারেই বাদ দেন। পরে এক অঙ্কার গৃহে এই লেখাগুলি, যাহাকে দিয়া পরীক্ষা করা হইবে—তাহার সম্মুখে ধরা হয়। এই ব্যক্তি কাগজে কি লেখা রাখিয়াছে, তাহা অবশ্যই জানিতেন না। বৈজ্ঞানিক আণোকে এই বাক্যগুলিকে অতি অল্প সময়ের জন্য পরিদৃষ্টমান করা হয়—এত অল্প সময় যে পর্য্যবেক্ষণকারীর পক্ষে সে সময়ের কনিষ্ঠ অক্ষরগুলি পড়িতে পারা যায় না। পরে পড়িতে কত দূর হইতে পারে নির্ণয় করিয়া নেওয়া হয়। পড়িতে পড়িতে চলিষ্ঠ পদ্যটি অক্ষর-বিশিষ্ট এক একটা বচনের আট-দশটি মাত্র অক্ষর পড়িতে যত সময় লাগিবার কথা—ঠিক ততটুকু সময়মাত্র আলো জালিয়া রাখা হয়। দর্শক কি তবুও বাক্যগুলি ঠিক-মতই পড়িয়াছিলেন। এই পরীক্ষার ব্যাপারে যে বিষয়টি লইয়া আমাদের প্রয়োজন, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি।

পর্য্যবেক্ষণকারীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কোন্ কোন্ অক্ষর তাহার চোখে পড়িয়াছে বলিয়া তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস—




তবে তিনি সন্তুষ্ট: যে অক্ষরগুলি প্রকৃতই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—তাহাদেরই দুই-চারিটা উল্লেখ করিবেন। কিন্তু ইহা হওয়াও অসম্ভব নয় যে, যে-সমস্ত অক্ষর বাদ দেওয়া হইয়া ছিল বা ভিন্নরূপে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যেও কোন কোন অক্ষর দর্শক নিশ্চয় দেখিয়াছেন, বলিবেন, অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণকারী পূর্ণ আলোকে বাক্যের ভিতর এমন-সব অক্ষর স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন বলিবেন—যেগুলি সে বাক্যে থাক। উচিত ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লিপিকৃত হয় নাই। এই পূর্ণপরিচিত বাক্যের কয়েকটা মাত্র অক্ষর প্রত্যক্ষ করাতেই অবশিষ্ট অংশগুলি মনে পড়িয়া যাওয়ার স্বাভাবিক কতকগুলি বাস্তবিক-অদৃষ্ট অক্ষরকেও মনের রাজ্যে আঁকিয়া তুলিয়াছে। স্বতন্ত্র দ্বারা দর্শক এ অক্ষরগুলি শুধু অনুভব করিয়াছেন—দিয়া প্রত্যক্ষ করে নাই।

আমাদের বাস্তব জগতের অক্ষরগুলির মধ্যেও—যদি দেখার সময় বাহ্যিক ঘটনা থাকে—সেইরূপ একটা ব্যাপার ভিতরে ভিতরে ক্রমাগতই ঘটনা চলিয়াছে। সমস্ত জিনিষেরই আমরা একটা মোটামুটি খসড়া ছবি (sketch) প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ করি। এই অসম্পূর্ণ ছবিটাই আমাদের স্বতিকে উদ্ভূত করে এবং আমাদের পূর্ণ স্বাভাবিক—বাহ্যিক এককাল উদ্ভাবনা অবস্থার চিত্রের রাজ্যে লুপ্ত হইতে সমর্থ হয়। এই প্রকার অনুমান (hallucination) সত্যের সঙ্গে বিভ্রান্ত

হইয়াই আমাদের বোধ-শক্তিকে জাগাইয়া দেয়। নিমেষ-মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। কোন জিনিষকে প্রত্যক্ষ করিতে যত সময় লাগে—মনের ক্রিয়া তদপেক্ষা বহু দ্রুত সম্পন্ন হয়। পূর্বে উল্লিখিত ব্যাপারে স্বাভাবিক-স্বত্বগুলির আচরণ বিশেষ কোতূহলোদ্ভূতক

কোন বস্তুর আকৃতি প্রত্যক্ষ করার যখন এই স্বাভাবিক উদ্ভূত হয়—তখন ইহার ঠিক যেন, সাদৃশ্য ও সঙ্ক-অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে, এরূপ মনে করা যায়। মলার এবং গোল্ডসিডের পরীক্ষারও পূর্বে মন্টারবার্গের যে-সমস্ত পরীক্ষার কথা আমরা অবগত আছি, (যদিও এই সমস্ত পরীক্ষা ভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল) সেগুলি আমাদের উল্লিখিত অনুমানকে সমর্থন করে। মন্টারবার্গের লিখিত শব্দগুলি তেমন সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত ছিল না। এগুলোও শব্দের সমস্তটা প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে যে সময় আবশ্যিক—তদপেক্ষা অনেক কম সময়—চোখের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। পর্য্যবেক্ষণকারী যখন শব্দগুলির পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, সেই সময় এক ব্যক্তি তাহার কানে কাণে সম্পূর্ণ ভিন্ন-অর্থের অন্তরূপ শব্দ বলিয়া বাইতেছিল। কালে ঘটনা হইল এই যে, দর্শক এমন একটা শব্দ পাইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিল, বাহ্যিক লিপিবদ্ধ শব্দ হইতে বিভিন্ন; অথচ লিখিত শব্দের সহিত এই নুতন শব্দের মোটামুটি সাদৃশ্য ছিল—এবং ইহার অর্থের সহিত বৈপরীত্য মিল ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বাক্য—

লি.  ছিল- “বাস্ট”। দ্রষ্টার কাণে কাণে বলা হইল, “রেলরোড”—সে পড়িল—“টনেল”। টিউমাণ্টে-টনেলে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু “টনেলের” অর্থগত সাদৃশ্য “রেলরোডের” সহিত। “রেলরোড” শব্দটা কাণের কাছে উচ্চারিত হওয়ার আমাদের অজ্ঞাতসারে—আমাদের মনে রেলরোডের ‘আইডিয়া’ বা ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এক দল স্বাতি (যেমন গাড়ী, রেলপথ, ভ্রমণ প্রভৃতি) সুপ্রকাশিত হইবার আশায় সজাগ হইয়া পড়ে।

অনুভূতির এবং স্বপ্নের ইহাই হইল ভিতরকার কথা। উভয়ক্ষেত্রেই—একদিকে ইন্দ্রিয়দ্বারা গন্ধ কতকগুলি বাস্তব ধারণা—এবং অপরদিকে কতকগুলি স্বাতি—বাহ্যারা এই সমস্ত ধারণার মধ্যে পুষ্ট হয়; পরে এই ধারণা ও স্বাতি উভয়ে একত্র মিলিয়া স্বপ্নরূপে পুনর্জীবন লাভ করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—এই যে, অনুভূতি ও স্বপ্ন—উভয়ের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কি? নিদ্রা ব্যাপারটাই বা কি? অবশ্য নিদ্রার (physiological) কায়িক ব্যাখ্যার কথা হুলিতেছি না। সে একটা ভিন্ন প্রশ্ন এবং তাহার সমাধানও সুদূরপরাহত। আমি প্রশ্ন করিতেছি, (psychologically) মনস্তত্ত্বের দিক হইতে নিদ্রার ব্যাখ্যা কি?—কারণ, আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মন, আমরা ঘুমাইয়া পড়িলেও আপনার কার্য্য করিয়া যায়। জীবাশ্ম ও নিদ্রিত উভয় অবস্থাতে একই ভাবে আমাদের মন যে অনুভূতি ও স্বাতির উপর কার্য্য করে—তাহা আমরা এইমাত্র দেখিয়াছি এবং আরো

দেখিয়াছি, এই স্বাতি ও অনুভূতিকে ঐ একই ভাবে সংমিশ্রিতও করিয়া থাকে। বাহ্য হউক—আমাদের এক অবস্থায় পাইতেছি কতকগুলি অনুভূতি মাত্র—অপর অবস্থায় পাইতেছি কতকগুলি স্বপ্ন। তাই প্রশ্ন করিতেছি—পার্থক্যটা কোথায়? মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া নিদ্রিত অবস্থার বিশেষত্বই বা কি?

আমরা কোন খিওরি বিশ্বাস করিতে চাহি না। এ বিষয়ে খিওরি আছেও বিস্তর। কেহ বলেন, নিদ্রা হইতেছে বহির্জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা—বাহিরের জিনিসকে ইন্দ্রিয়াদির অনধিগম্য করা। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, নিদ্রিত অবস্থাতেও আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্যকরী থাকে—ইহারাই আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নের বাহ্য আকৃতিটা জাগাইয়া তোলে। কেহ বলেন—“নিদ্রিত হওয়ার অর্থ মনের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির (superior faculties) কার্য্য স্থগিত করিয়া দেওয়া।” ইহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। নিদ্রিত অবস্থায়ও বৃত্তির কণিক নিদ্রিততার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কিন্তু এটা তেমনি হিঁসে সদৃশ যে, স্বপ্নের মনে করি না। স্বপ্নে স্বাতি-বৃত্তি-তর্কের উপর ধারি না বটে, কিন্তু এ-বিষয় যে আমাদের ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হয়, এমন নহে। এমন সব স্বপ্ন আছে যেখানে আমরা বেশ সহজ ও শুদ্ধ ভাবেই যুক্তির অনুশাসন মানিয়া চলি, এমন কি এ কথা বলিলেও অস্বাভাবিক হয় না যে স্বপ্ন-দ্রষ্টার ভুল-ভ্রান্তির মূল একটু আত্মবিশ্বাস মাত্রার স্বক্তি-তর্কের বশীভূত হওয়া। যদি স্বপ্ন-দ্রষ্টা, সহজ সরলভাবে স্বপ্নের ভিতর যে সমস্ত ব্যাপার ঘটয়া যায়, শুধু তাহা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তবে তাহার স্বপ্নের

মধ্যে অস্তুত বিষয় কিছুই থাকিত না। কিন্তু তাহা না করিয়া যে সে সমস্ত ব্যাপারের একটা স্বার্থ-নির্ণয়ে প্রয়াস পায়—অসম্বন্ধ বিষয়বস্তুকে যুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করিতে চায়—ইহাতেই তাহার অসঙ্গমল যুক্তি-তর্কের জালে আবদ্ধ হইয়া বাস্তব ঘটনাবলী এক অস্তুতরূপে রূপান্তরিত হইয়া পাকে। অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি যে, আমাদের উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিগুলি নিদ্রিত অবস্থায় ম্লানমান হইয়া পড়ে—স্বপ্ন-দ্রষ্টার যুক্তি ও বিচার-ক্ষমতাই যথেষ্ট দুর্বল, এমন কি সময় সময় স্বপ্ন-দ্রষ্টার যুক্তি-বিচারকে নিতান্ত হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় শুধু বিচার-ক্ষমতা কেন—সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলির সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। কাজেই ক্ষমতার অভাব বা ইন্দ্রিয়সমূহের অমুভব-শক্তির লোপ হইলেই আমরা স্বপ্নের জ্ঞান লাভ করি, এটা সন্দেহ নহে।

স্বপ্ন-দ্রষ্টার যুক্তি ও বিচার-ক্ষমতা নিদ্রিত অবস্থায় ম্লানমান হইয়া পড়ে—স্বপ্ন-দ্রষ্টার যুক্তি ও বিচারকে নিতান্ত হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় শুধু বিচার-ক্ষমতা কেন—সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলির সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। কাজেই ক্ষমতার অভাব বা ইন্দ্রিয়সমূহের অমুভব-শক্তির লোপ হইলেই আমরা স্বপ্নের জ্ঞান লাভ করি, এটা সন্দেহ নহে।

স্বপ্ন-দ্রষ্টার যুক্তি ও বিচার-ক্ষমতা নিদ্রিত অবস্থায় ম্লানমান হইয়া পড়ে—স্বপ্ন-দ্রষ্টার যুক্তি ও বিচারকে নিতান্ত হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় শুধু বিচার-ক্ষমতা কেন—সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলির সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। কাজেই ক্ষমতার অভাব বা ইন্দ্রিয়সমূহের অমুভব-শক্তির লোপ হইলেই আমরা স্বপ্নের জ্ঞান লাভ করি, এটা সন্দেহ নহে।

স্বপ্ন-দ্রষ্টার যুক্তি ও বিচার-ক্ষমতা নিদ্রিত অবস্থায় ম্লানমান হইয়া পড়ে—স্বপ্ন-দ্রষ্টার যুক্তি ও বিচারকে নিতান্ত হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় শুধু বিচার-ক্ষমতা কেন—সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলির সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। কাজেই ক্ষমতার অভাব বা ইন্দ্রিয়সমূহের অমুভব-শক্তির লোপ হইলেই আমরা স্বপ্নের জ্ঞান লাভ করি, এটা সন্দেহ নহে।

ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য—কিন্তু ইহা একেবারে অসম্ভবও নহে। লেখকের নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। অনতিকালপূর্বে তিনি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সে স্বপ্নটি কি এবং স্বপ্নভঙ্গের পর যাহা ঘটয়াছিল—তাহাই বলিতেছি।

স্বপ্ন-দ্রষ্টা স্বপ্ন দেখিলেন—তিনি যেন কতকগুলি শ্রোতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। যেন রাজনীতি বিষয়ে বলিতেছেন। তারপর শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেমন একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। সেই গুঞ্জনধ্বনি ক্রমে অস্পষ্টতর কলরবে পরণত হইল—অতঃপর গভীর গর্জন, ও ভয়ঙ্কর চীৎকার-শব্দ উঠিল। অনতিবিলম্বে চারিদিক হইতে সমস্ত “বেরিয়ে যাও”, “বেরিয়ে যাও” এই রব উঠিল। পাশের বাড়ীর বাগানে তখন একটা কুকুর ডাকিতেছিল এবং তাহার প্রত্যেক বারের “ভেউ ভেউ” ডাকের সহিত “আউট, আউট” (অর্থাৎ “বেরিয়ে যাও” “বেরিয়ে যাও”) শব্দ স্বপ্ন-দ্রষ্টার কাণে ধ্বনিত হইতেছিল। এই অতি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তটিতে অনেকখানি মজার ব্যাপার ঘটয়া গেল।

জাগ্রত-আমি মুহূর্ত্তে আবিভূত হইয়া নিদ্রিত ‘আমি’কে এখন বলিব—“এইবার আমি তোমায় ঠিক ধরিয়াছি।—তুমি ভাবিতেছিলে—শ্রোতৃমণ্ডলী চীৎকার করিতেছে? না। বাস্তবিক পক্ষে ও একটা কুকুর ডাকিতেছিল। যতক্ষণ না তুমি আমায় বল—তুমি সত্য সত্য কি করিতেছিলে, ততক্ষণ তোমায় আমি ছাড়িব

না।" আমি আমার উত্তরে বলব—  
—“আমি কিছুই করিতেছিলাম না; এবং  
এইখানেই তোমার-আমার প্রবেশ। তুমি  
মনে কর যে একটা কুকুরকে ডাকিতে শুনা  
এবং ও ডাকটা যে কুকুরেরই তাহা বুঝিতে  
পারা—এই ছই ব্যাপারের জন্য তোমার  
কিছুই করিতে হয় না? সেটা মস্ত ভুল।  
এইগুলিও বুঝিবার জন্য তোমার যথেষ্ট  
প্রয়াস পাইতে হয়। তুমি বুঝিতে পার না,  
যে তোমার সমস্ত স্বত্তি, তোমার যাবতীয়  
সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কতখানি সাহায্য এই  
একটা বিষয়ের জন্য তুমি গ্রহণ কর। যে  
শব্দটা শুনিতে পাইলে—তাহার সহিত ঠিক  
তোমার কোন স্বত্তিটির সাদৃশ্য আছে—সেটা  
তোমার নির্ধারণ করিতে হয়—কেবল তাই  
নয়—এই স্বত্তি ও তোমার শুনা শব্দ উভয়ে  
মিলিয়া যাওয়া চাই—একটু অমিল বা পার্থক্য  
থাকিলে চলবে না—তাহা হইলে তোমার  
কেবল স্বপ্ন দেখাই সার হইবে—প্রত্যক্ষ  
অমুভূতি ঘটিবে না। এই সর্বাঙ্গীন সমতা  
কেবল স্বত্তি ও অমুভূতির প্রয়োগ-দ্বারাই  
সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ যেমন দর্জী একটা  
নূতন কোট তৈয়ার করিতে হইলে—সেলাই  
করিবার পূর্বে কাপড়টা টানিয়া ভাঙ্গিয়া  
ঠিক তোমার শরীরের কাঠামোর সঙ্গে মিশ  
খাওয়াইয়া লয়, তেমনই আর কি। কাজেই  
তোমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তিতে তোমার  
খাটিতে হইতেছে। কাগজত অবস্থায় তোমার  
জীবন, পরিশ্রমের জীবন; এমন কি যখন  
তুমি কিছুই করিতেছ না ভাব—তখনও তুমি  
প্রকৃত পক্ষে কাজ হইতে নিষ্কৃতি পাওনা।  
কারণ প্রতিমুহূর্ত্তেই তোমাকে কিছু গ্রহণ

করিতে হইতেছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে  
কিছু ত্যাগও করিতে হইতেছে। সজ্ঞান  
অবস্থায় শত সহস্র অমুভাবের বিষয়  
হইতে এই প্রকারেই অধিকাংশকে বাদ  
দিয়া কয়েকটা মাত্র বিষয় তুমি সত্যসত্য  
অমুভব কর। যে পরিত্যক্ত বিষয়াবলী রাজে  
তোমার নিদ্রাবস্থায় পুনরাবিভূত হইয়া থাকে,  
তাহা তোমার স্বত্তির ভাণ্ডার হইতে অতি  
সম্পূর্ণণে ও অভ্রান্তরূপে তুমি নির্বাচন করিয়া  
লও—কেননা তোমার বর্ত্তমান অবস্থায়  
সহিত যেগুলি সম্পূর্ণভাবে মিশ খাইবে না  
সেগুলি তোমায় বর্জন করিতে হয়।  
এই যে নির্বাচন যাহা তুমি ক্রমাগতই  
করিয়া চলিয়াছ—এই যে সামঞ্জস্য যাহা  
তুমি প্রতিনিয়তই বিচার করিয়া চলিয়াছ  
—ইহাই মানুষের সাধারণ জ্ঞান বা সাধারণ  
বুদ্ধির (common sense) গোড়ার কথা।  
এবং এই-সব তোমাকে অহরহ অবিস্মৃতভাবে  
ব্যাপৃত রাখি। বায়ুর চাপ যেমন  
তুমি অমুভব করিতে না পার, এই  
যে তুমি সর্বাঙ্গীন সমতা বোধ করিতে  
অমুভব কর না—অথচ ইহা তোমার ক্রান্ত  
করিয়া ফেলে। সাধারণ জ্ঞান বড় প্রাজ্ঞদায়ক।

“কাজেই আবার বলিতেছি, তোমার  
সহিত ঠিক এইখানেই আমার পার্থক্য যে,  
আমি কিছুই করি না। যে নিরবচ্ছিন্ন  
কল্প-প্রাণতা, নির্বাচন-প্রচেষ্টা তুমি মানুষের  
ঘাড়ো চাপাও—আমি শুধু তাহা হইতে বিরত  
থাকি। প্রাণের সহিত নিভেকে সংযুক্ত না  
করিয়া—আমি প্রাণ হইতে নিভেকে বিযুক্ত  
করিয়া লই। কোন বিষয়ের উপরই আমার  
কোন স্পৃহা বা পক্ষপাতিতা নাই—সমস্ত

বিষয়েই আমি নির্ভীকার, নিঃস্পৃহ। ঘুমাইয়া পড়াই হইতেছে, নিঃস্পৃহ হইয়া পড়া। মানুষ যে পরিমাণে স্পৃহার অভীত হইয়া থাকে—ঠিক সেই পরিমাণে সে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সন্তানের পার্শ্বে নিদ্রিতা যে মাতার বক্ষ-পতনের শব্দেও নিদ্রা ভঙ্গ হয় না—সন্তানের একটা দীর্ঘশ্বাসেই তিনি শ্বাবার জাগিয়া উঠেন—তিনি কি তাঁহার সন্তানের সম্বন্ধে বাস্তবিক নিদ্রিত হন?—যে বিষয়ের উপর নিদ্রাতেও আমাদের সহানুভূতি থাকে, সে বিষয়ের সম্পর্কে আমরা নিদ্রিত হইতে পারি না।

তুমি আমার জিজ্ঞাসা করিতেছ—আমি যখন স্বপ্ন দেখি, তখন আমি কি কর? আমি তোমায় বলিব—তুমি যখন জাগিয়া থাক, তখন তুমি কি কর? তুমি আমাকে গ্রহণ কর—স্বপ্নের-আমাকে, তোমার অভীত জীবনের সমষ্টি আমাকে, এবং তুমি আমাকে ক্ষুদ্র হইয়া ক্ষুদ্রতর করিয়া তোমার বর্তমান জীবনের সীমার মধ্যে আঁকিয়া ফেল, এই ক্ষুদ্র বৃত্তের সহিত অবিকল খাপ খাওয়াতেই চাও। ইহাই হইতেছে জাগ্রত অবস্থার স্বরূপ। ইহার অর্থ, সংগ্রাম করা। ইহার অর্থ, ইচ্ছা করা। তারপর স্বপ্নের কথা—সত্যি কি আমার এবিষয়ে কিছু বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে, 'বোধ' কর? ইহা হইতেছে সেই অবস্থা—যে অবস্থায় তুমি তোমাকে হারাইয়া ফেল—যখন তোমার কোন এক বিষয়ে মনঃসংযোগ পরিবার শক্তি থাকে না—যখন তোমার জ্ঞান-বৃত্তির কার্য বন্ধ থাকে।"

স্বপ্নের-আমি বলিবে, তাহা উপরে উল্লিখিত হইল। যদি আমরা ইহাকে মন খুলিয়া কথা বলাইতে পারি, তবে ইহা ছাড়া আরো অনেক তত্ত্ব সে আমাদের কাছে শুনাইতে পারে। থাক—এখন আমরা যে বিশেষ পার্থক্য জাগ্রত অবস্থা হইতে স্বপ্নকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে—সংক্ষেপে তাহা প্রতিপাদন করিব। স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় একই প্রকার বৃত্তির পরিচালনা ঘটয়া থাকে কিন্তু একক্ষেত্রে উহার কার্যবদ্ধনে বিশেষভাবে আবদ্ধ, অপর ক্ষেত্রে বদ্ধন-মুক্ত। স্বপ্ন হইল সম্পূর্ণ মানসিক জীবন হইতে কর্ম, উত্তম এবং দৈহিক পরিচালনার বিযুক্তি। এ অবস্থাতেও আমরা অনুভব করি, এ অবস্থাতেও আমরা স্মরণ রাখি—স্বপ্নাবস্থাতেও আমরা বৃত্তির অনুশাসন মানিয়া চলি। এ সমস্তই স্বপ্নে বর্তমান থাকিতে পারে। ইহাদের অস্তিত্ব থাকিলেই যে কর্মোদ্ভবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল, এমন নহে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোন বিষয়কে অপর কোন বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য করিতেই উদ্ভবের প্রয়োজনীয়তা। একটা কুকুরের চীৎকার শব্দের সহিত শ্রোতৃমণ্ডলার গুঞ্জন ও হুকার-ধ্বনির স্রুতির সম্পর্ক-স্থাপনের মধ্যে কোন উদ্ভবের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐ শব্দ যে কুকুরেরই ডাক, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে মস্তক চালাইবার প্রয়োজন হয়। স্বপ্ন-জটিল এই উদ্ভবেরই অভাব। কেবলমাত্র এই উদ্ভবের অভাব হইতেই স্বপ্ন-জটিল জাগ্রত মানুষ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

সুপ্নের এই পার্থক্যটী অনুসরণ করিলে

আরো অনেক পাঁখা নিশীত হইতে পারে। এই উপায়ে আমরা স্বপ্নের প্রধান প্রধান বিশেষত্বগুলি জানিতে পারিব। বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে। স্বপ্নের অসামঞ্জস্য, স্বপ্নের ভিতর সময়ের ব্যাপকতা অমুভবের অভাব এবং কোন্ অমুভূতির সহিত সংমিশ্রিত হইবে তাহার সন্ধানে ব্যাপ্ত স্বতীসমূহের স্বপ্ন-দ্রষ্টার মনে উদ্ভিত হইবার প্রণালী।

স্বপ্নে অসামঞ্জস্যের অর্থ সহজেই নির্ণয় করা যায়। স্বপ্নের বিশেষত্বই এই যে, ইহা স্বতীচিত্র এবং অমুভূতির মধ্যে পরস্পরের পূর্ণ ভাবের ক্ষমতার দানী করে না—বরং তাহাদের একটু লুকোচুরিরই সমর্থন করে—সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের স্বতীও একই অমুভূতিতে সংমিশ্রিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—দৃষ্টিমণ্ডলে হয়ত একটি সবুজ স্থান অমুভূত হইল; তাহাতে যেন শাদা শাদা কতকগুলি চিহ্ন আছে। স্বপ্নে ইহা শুভ্রকৃষ্ণম-পরিপূর্ণ একটি উদ্ভান হইয়া দেখা দিতে পারে—কিন্তু বল-সমেত বিলিয়ার্ড খেলিবার টেবিলও হইতে পারে, আরো কত-কি হইতে পারে। বিভিন্ন স্বতী-চিত্রগুলি—যাহাদের সকলেই উল্লিখিত দৃষ্টিমণ্ডলের অমুভূতিতে সংমিশ্রিত হইতে পারে—ইহার পশ্চাতে ধাবিত হইবে! কখনও কখনও এমনও হয় যে, একাধিক স্বতীও ক্রমাগত সেই অমুভূতিতে মিশ্রিত হইতে সমর্থ হয়। এবং তাই উদ্ভান বিলিয়ার্ড টেবিলে রূপান্তরিত হয় এবং আমরা সন্নিহনে এই অসাধারণ রূপান্তর-ব্যাপার দর্শন করি; কখনও কখনও একই সময়ে একত্র এই

স্বতীগুলি অমুভূতিতে গীন হয়—তখন উদ্ভানই বিলিয়ার্ড টেবিল হইয়া দাঁড়ায়। এবং দুইটিকে তখন আর দুইটা ভিন্ন জিনিস বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থাতেই সেই সব আজগুবি পপ আমরা দেখিয়া থাকি—যাহাতে কোন বিষয়, যেমন আছে তেমনি থাকিয়াও অস্ত-কিছু বলিয়া মনে হয়।

আমাদের অনেক স্বপ্নে সময়ের ব্যাপকতা অমুভব করিবার ক্ষমতার যে অভাব দেখা যায়, তাহা এই একই কারণের জন্ত। কয়েক সেকেন্ডের ভিতর আমরা স্বপ্নে এত সব বিষয় দেখিয়া কেলি—যাহা জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হইতে কয়েকদিনও সময় লাগিতে পারে। যখন আমরা জাগিয়া থাকি, তখন আমরা আমাদের অস্তান্ত সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া চলি—বাহিরের এই সামাজিক জীবনের প্রতি আমাদের যে লক্ষ্য থাকে, তাহা বিশেষভাবে আমাদের হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে স্বপ্নে ইহার অস্তিত্ব নাই। বাহিরে সংযোগের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য স্বতীসমূহের কোনোবাগ আবশ্যক—এবং অন্তরে অমুভূত সময়ের ব্যাপ্তির সহিত সাধারণ ঘটনার ব্যাপ্তির সমতা রক্ষার জন্ত বতদূর মনঃসংযোগ প্রয়োজন স্বপ্ন-দ্রষ্টার উহার বিশেষ অভাব থাকে।

এখন স্বপ্ন-দ্রষ্টার মানসিক অবস্থায় কিরূপ বিশেষত্বের দৃষ্টি বস্তুত্ব অমুভূতির সহিত সন্নিহিত হওয়ার তুল্য উপযোগী স্বতী-সমূহের মধ্যে কোন কোনটির প্রতি অধিকতর পক্ষপাত প্রদর্শিত হয়, তাহা আলোচনা করিব। আমাদের মধ্যে একটি কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে দিনের বেলায় যে-যে

বিষয় আমরা অধিক ভাবিয়া থাকি—রাত্রে সাধারণতঃ তাড়াই স্বপ্ন দেখি। একথা কোন কোন স্থলে সত্য। কিন্তু আগ্রত অবস্থার মানসিক জীবন যে এইভাবে নিদ্রা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে—তাহা এই ক্ষুদ্র যে, সে নিদ্রা বাস্তবিক নিদ্রা নয়। এই প্রকার স্বপ্নময় নিদ্রা আমাদের ক্লান্তি অপনোদন না করিয়া ক্লান্তি বাড়ায়। যে-সব চিন্তা পূর্বে আমাদের মনের ভিতর দিয়া অতি দ্রুত বহিয়া গিয়াছে; সাধারণ নিদ্রায় সেই সঞ্চিত লইয়াই আমরা স্বপ্ন দেখি অথবা এমন সব বিষয় লইয়া দেখি, যাহা আমরা অনুভব করিয়াছি মাত্র কিন্তু সে-দিকে তৎপ্রতি বড় একটা মনোযোগ দিই নাই। যদি আমরা একই দিনের ব্যাপার রাত্রে স্বপ্ন দেখি, তবে তাহা এমন সব বিষয় লইয়া, যাহাদের তেমন একটা কিছু গুরুত্ব নাই—তেমন কোন বিশেষত্ব নাই।

এবিষয়ে ডিলেঞ্জের ক্যার, Robert এর এবং Freud এর/বৃত্ত তোমারহত আমাদের মতের মিল আছে। ক্যার-রাস্তায় দাঁড়াইয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—একেবারে রাস্তার উপরেই দাঁড়াইয়াছিলাম—অথচ কোন গাড়ী চাপা বা এরূপ কোন দৃষ্টিনাই চোখের সম্মুখে ঘটে নাই। কিন্তু যদি রাস্তায় কোন গাড়ী আমাদের অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় আমার মনে বিপদের আশঙ্কামাত্রও স্থান পাইয়া থাকে অথবা আমি জ্ঞাতসারে কোন আশঙ্কা না করিয়া থাকিলেও—অলক্ষ্যে আমার দেহ যদি একটুও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে—তবে আমি সে রাত্রে এরূপ স্বপ্ন

দেখিতে পারি যেন আমার শরীর উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। একজন মরণোন্মুখ রোগীর শয্যাপার্শ্বে আমি দাঁড়াইয়া আছি। যদি কোন মুহূর্তে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেও আমি এরূপ ভাবিয়া থাকি যে হয়ত রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, তবে আমি হয়ত স্বপ্ন দেখিব, রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আরোগ্য-লাভের বিষয়ই স্বপ্ন দেখিব—খুব সম্ভব রোগের অবস্থা স্বপ্ন দেখিব না। স্থূল কথা এই যে যে-সব বিষয় আমরা অলক্ষ্যে অনুভব করিয়াছি—সাধারণতঃ সেইগুলিই স্বপ্নে পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে। ইহাতে বিশ্বস্তের কি আছে? স্বপ্নের সত্য—অস্পষ্ট সত্য; যে সব স্মৃতি অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে স্বপ্ন সংগ্রহ করে—সেগুলি সাধারণতঃ অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট স্মৃতি।

ইহা সত্য যে খুব গভীর নিদ্রায় যে নিয়মে স্বপ্নে স্মৃতির পুনরাবির্ভাব হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। আমরা এইরূপ গভীর নিদ্রার অবস্থার বিষয়ে কিছুই জানি না। এ অবস্থার যে স্বপ্ন আমরা দেখি, তাহা সাধারণতঃ আমরা আগিয়া উঠিবার পূর্বেই ভুলিয়া যাই। কাঁচৎ একটু আধটু মনে থাকে।

যাহা হউক এই গভীর নিদ্রার অবস্থা মনস্তত্ত্ববিদ্যায় গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। ছায়া-দর্শন প্রভৃতি ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানা, মৃত আত্মার আবির্ভাব প্রভৃতি আত্মিক ব্যাপারও উক্ত বিজ্ঞানেরই অনু-সন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত। এ-সব বিষয়ের উপর কোন মতামত প্রকাশ করা চলে না।

কিন্তু Psychological Research Society চলেনা যদি আমাদের স্বপ্নের উপর  
বলিয়া এইসব আর্থিক ব্যাপারের বে এক টেলিপেথির কোন প্রভাব আসিয়া থাকে—  
অনুসন্ধান সমিতি আছে, তাহার সভ্যদের তবে খুব সম্ভব এই গভীর নিদ্রাকালেই  
অক্লান্ত পরিশ্রম ও আশ্চর্য উৎসাহের ফলে ইচ্ছা নিজ প্রভাব বিস্তার করিবে। কিন্তু  
যে সব তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, যে সব এবিষয়ে কোন অভিমত ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।  
সত্য নির্ণীত হইতেছে, তাহা অশ্রদ্ধা করা

ঐশ্বর্যশঙ্কর চৌধুরী।

## সুসময়

বসন্ত বায় বহে নাই হায়

কুসুম-বনে।

হাওয়াটুকু তার লাগিয়াছে শুধু

আমার মনে!

না-জানি কেমনে নিমেষের ভুলে

ছেয়েছে হৃদয় পবন-কূলে,

গুঞ্জন আর কুঞ্জন জেগেছে

মনের কোণে!

বসন্ত নাই হাওয়া তারি তবু

লেগেছে মনে।

আজিকৈ তোমরা দিয়োনা আমারে

দিয়োনা বাধা;

সারাদিন ধরি হবে আজি মোর

বীণাটি সাধা!

নিবিড় নিষ্ঠুর পীড়ন মধুর

জাগায়ে তুলিবে বিহ্বল হৃদয়,

তারি সাথে সাথে দুখানি নুপুর

আজি আসা!

গাঁহিবার দিনে আজিকৈ তোমরা

দিয়োনা বাধা!

নবীন আশা আসেনি এখনো

আকাশ জুড়ে।

সজল বাতাস গেয়ে গেছে তবু

হৃদয়-পুরে!

যে নদী লুকায়ে ছিল বালুনাঝ

কূলে কূলে ছেপে উঠেছে সে আজ,

বিপুল আবেগে কল্লোল তুলি

চলেছে ঘুরে!

শ্রামল আশা আসেনি যদিও

করিয়েছে

সব গুণ-গুণ

আজি এই স্রোতে ভাসাবো আমার,

কুত্র তরী।

শপথ তোমার, ডেকেনা আমার,

রেখোনা ধরি!

ডোবে যদি তরী, ডুবে বাবে হায়

পারিবেনা কেহ কিরাতে আমার,

লব সযতনে শীতল মরণ

বরণ করি!

ডুবে যদি যায় তবু আজি হায়

ভাসাবো তরা।

ঐবিমানবিহারী সুখোপাধ্যায়।



## বরণ

এস এস ঋতুরাজ ! তোমাতে বরিব আজ

পল্লব মুকুল ফুল ফলে,

প্রভাত-অরুণ-রাঙা কোকনদ-দলে !

ভব পীত উত্তরীয় নূতন রঙায়ে নিয়ে।

আমাদের পরাণের রঙে,—

বাসন্তী নহে ত তাহা, রক্তিম বরণে !

৭.

কণ্ঠে শিশুল গায় যে লালে ছাইয়া যায়

তাই দিয়ে রচিব কেতন,—

বাথা পেয়ে যে অশোকে চেতনা নূতন !

কাঁচ কিশলয়-দল সাজাবে আসন-তল, .

বর্ষে বর্ষে আরক্ত নবীন,

জরার শাসন যারা ভাঙে চিরদিন ।

অপরাজিতার পাতি কণ্ঠহারে দিব গাঁধি,

নৌককণ্ঠ নৌককাস্তি বার,

বর্ষা স্রীতে মরেনাক চিরনির্জিকার ।

দ্রাক্ষাগুচ্ছ অর্ঘ্য করে' দেব করপুট ভরে'

পীড়নে যে রসধারা চাণে,—

তদ্রাহত মন্মথমাঝে অগ্নিময় জ্বালে !

ঐশ্রিয়তলা দেবী ।

## সমালোচনা

নরদেব শিবচন্দ্র তোমার ৩ তৎসহ-  
ধর্ম্মগীর আদর্শ জীবন-রূপে। ঐযুক্ত  
অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, বি, এল কর্তৃক সম্বলিত।  
প্রকাশক, ঐযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, বি, এল,  
১২ শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা। গিরিশ  
প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা।  
গ্রন্থকার 'উপকরণিকার' বলিয়াছেন, শিবচন্দ্র 'দ্বি-  
জ্ঞানী বীর, অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি, বাগ্মী, সুস্বাদু  
দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, অলৌকিক ধীশক্তি সম্পন্ন ও  
সামান্যতম গণিত, লক্ষপ্রতিষ্ঠ কলাবিৎ, বিচক্ষণ রাজ-  
নীতিজ্ঞ, প্রব্রের জ্ঞাত, দেশের জ্ঞাত বা লোকহিতের  
জ্ঞাত সর্বব্যাপী সন্ন্যাসী—এ সকলের কেহই ছিলেন  
না। সচরাচর বড় লোক বলিলে যে খ্যাতি-প্রতিপত্তি  
সুচি হই, তাহাও তাঁহার ছিল না।' তবে তাঁহার  
জীবন-চরিত লেখা কেন? কারণ আছে। তিনি

একজন মানুষ ছিলেন। গ্রন্থকারের কথায়, "তিনি  
বিষয়বস্তুর অথবা বিষয়ে যে সমস্ত দৈহিক,  
মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিনিচয়ের অধিকারী  
হইয়াছিলেন, ন্যস্তধনের স্তায় তাহার এক কপর্দকও  
ব্যয় করেন নাই এবং আজীবন সেই বৃত্তিগুলির  
সংরক্ষণে ও পরিষ্কৃতিতে যত্নশীল ছিলেন।" এই  
বিপুল জীবন-সংগ্রামের দিনে এ বড় সহজ কাজ নহে।  
হুগলি জেলার কোরগর গ্রামে শিবচন্দ্রের জন্ম হয়।  
তাঁহার পিতা ছিলেন, সেকালের সামান্য চাকুরে,  
একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। শিবচন্দ্র হিন্দু কলেজে  
পড়িতেন,—সেখানে ডিরোজিও ছিলেন তাঁহার শিক্ষক।  
তখনকার দিনে ছাত্রেরা পানাহার-স্বথকে উচ্ছ্বলতার  
খুবই পক্ষপাতী ছিলেন,—শিবচন্দ্র কোনদিন তাঁহাদের  
সঙ্গ ভাগ না করিলেও পানাহারের রীতিমত সংযমী  
ছিলেন। তাঁহার কয়েকজন সতীর্থ একবার তাঁহাকে

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল সেটা করিয়া ছিলেন কিন্তু প্রতিজ্ঞাপূরণ দৃঢ়চিত্ত শিবচন্দ্রকে স্মরণ করাইতে পারেন নাই। বলিকালের আর একটি ঘটনায় শিবচন্দ্রের ভিতরের মানুষটিকে সহজে বুঝা যায়। তাঁহার বয়স তখন দশ-বারো বৎসর; 'বাড়ীর পুজারী ঠাকুর তাঁহার হাত দেখিয়া বলেন, "তুমি হাকিম হইবে। যদি হাকিম হও, তাহা হইলে আমাকে কি দিবে?" বালক শিবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমি যদি হাকিম হই, তাহা হইলে আমি তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিব।" ইহার বৎ বৎসর পরে হাকিম হইয়া সত্যনিষ্ঠ শিবচন্দ্র ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত মাসিক পাঁচটাকা হিসাবে বৃত্তি দিয়াছিলেন। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু ইহা হইতে যে-মুহুরার আভাষ পাই, তাহা অসামান্য।

পনেরো বৎসর বয়সে শিবচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের পর হইতেই শিবচন্দ্র পত্নীর শিক্ষায় মনঃ-সংযোগ করেন। তখনকার দিনে এ ব্যাপার রীতিমত বয়সস্থূল ছিল, কিন্তু শিবচন্দ্রের অকুতোভয়তা ও তাঁহার প্রীর নিষ্ঠার কোন বিশ্বই তাঁহাদের সত্য-পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। স্নান দুই-চারিটা গল্পনা একান্ত শ্রুতিতে হইয়াছিল, কিন্তু আদর্শ সহধর্মিণী স্বামীর আদেশের প্রতি প্রজ্ঞা রাবিয়া সে সকল গল্পনা গ্রাহ্যও করেন নাই। ১৮৫২ খ্রীঃাব্দে শিবচন্দ্র "কোম্পাগর হিতৈষিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সভা শিবচন্দ্রের সাহায্যে গ্রামের রাস্তা, মেরাস্ত, সাকো নির্মাণ, দরিদ্রদের সাহায্য-দান, দশভায়-নিবারণের জন্য সরদার পাইক নিযুক্ত করা বাতলা, পাঠশালার জীর্ণ সংস্কার, ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণে অর্থ সাহায্য প্রভৃতি বিবিধ ক্ষিতিকর অমুষ্ঠান-সাধনে" সক্ষম হইয়াছিল। শিবচন্দ্র ডেপুটি করিয়াও এসব সংস্কারের কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন,—এখানেই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। পরে গ্রামে-সুসংগঠন রহিত করাইবার জন্য নদের দোকানগুলি উঠাইবার উদ্দেশ্যে ছয়মাস স্ববিজ্ঞান চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় তাহা ঘটে নাই। কোম্পাগর যে রেলওয়ে স্টেশন ও ডাকঘর খোলা হয় তাহারও মূলে শিবচন্দ্রের চেষ্টা।

একলা গেল বাহিরের কক্ষকে-এর কথা। পারি-বারিক জীবনে তিনি আদর্শ গৃহী ছিলেন; সকলের সহিত মিশিতেন, তুচ্ছ ব্যতিক্রম গণ্য করিতেন না

—আত্মীয়-পরিজনদের সহিত আচারে-ব্যবহারে খাঁটি ছিলেন। তাঁহার সকল কাজ ঘড়ি-ঘরা ছিল; নিয়মের কখনো এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিত না। ডিরোজিওর কাছে শিক্ষাকালে তিনি একেশ্বরবাদী হন; পরে বাংলা ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার গ্রাহক হন এবং ঐ পত্রিকায় লিখিত উপাসনা-পদ্ধতি-অনুসারে গৃহ উপাসনায় অনুরক্ত হন। কুচবিহারের ভূতপূর্ব অধিপতির সহিত নব-বিধান ধর্মের অবতীর্ণ কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ প্রস্তুত পক্ষে হিন্দুমতে আচরিত হইলে ব্রাহ্মসমাজে যখন তলধূল বাধিয়া যায়, কেশবচন্দ্র তখন নীরব ছিলেন। ইহার ফলে কেশবচন্দ্রকে আচার্যের পদ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, তখন পাত্ত বজ্রবৃক্ষ গোথামী এবং শিবচন্দ্র প্রভৃতি পণ্ডারক্রেমে আচার্যের কার্য করিতেন। পাত্ত গায়ত্রী শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস" গ্রন্থে শিবচন্দ্র-সম্বন্ধে লিখিয়া-ছেন—“তিনি বিনয়ী ও সদাশয়, দয়ালু ও সৌজন্য বিশিষ্ট ছিলেন; তিনি যথাসময়ে ও গৃহস্থালার সহিত সকল কাব্য করিতেন; এবং তিনি পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার-কাজে অদ্বৈত ছিলেন।” শিবচন্দ্রের জীবন সাধারণ বাড়ালীর জীবন, তাহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য বা অসামান্যিক বিশেষত্ব নাই সত্য, তবে এই Principle প্রভৃতির শিথিলতার যুগে তাঁহার চরিত্রে এমন অনেকখানি তেজ ও দার্ঢ্য দেখা গিয়াছিল, বাহাতে তাঁহার জীবন-কথা প্রকাশিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। এই দীর্ঘ প্রস্থানিতে শিবচন্দ্রের জীবনের বহু গুণের কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিবৃত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনের এমন বহু কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে, বাহা উপন্যাসের মত অল্পপাঠ্য, অথচ সমুদায়ের গৌরব-মহিমায় সেগুলি রীতিমত সমৃদ্ধ। গ্রন্থের রচনা-ভঙ্গী বেশ সরল ও স্বাভাবিক, আগাগোড়া কোতুলক জগাইয়া রাখে। তবে ক্রটিও যে একবারে নাই, এমন নয়। পারিবারিক

এমন অনেক কথা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, আরীর-বন্ধুর পরিচর্য্য যথো যথো এমন অনাবশ্যক বর্ণনা করা হইয়াছে যে সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। জীবনী-রচনার একটা বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়—যেন Boswellism না আসিয়া পড়ে। কারণ জীবন-কথা ঠিক ঘরের লোকগুলির জন্য ত নয়—ইহার কতটা সাধারণকে দিবার সামগ্রী এবং কতটাই বা শুধু ঘরে রাখিবার, তাহা খুব পাকা হাতে ওজন করা প্রয়োজন। সেই ওজনের মাত্রা থাকে নাহে এ গ্রন্থে লিখিল দেখিলাম। আর একটা কথা;—অবশ্য গ্রন্থকার যেন কথাটা অন্যভাবে গ্রহণ না করেন—আমাদের আপত্তি, ঐ গ্রন্থের নামে “নরদেব” কথাটায়। শিবচন্দ্র যে একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ঐ “নরদেব” কথাটার অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে—বর্জ্যগত আপত্তি। আমাদের আপত্তি আছে, অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না। গ্রন্থকার এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। ধর্মবীজগণকেই এদেশের লোকে দেবতার আসন দিয়া থাকে—তাই কথাটা তুলিলাম।

মহাত্মা গান্ধী। (জীবনী ও অভিমত সংগ্রহ)। শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত কলিকাতা, রক্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। হাণ্ডা পানিত্রাস হইতে প্রবৃত্ত কব্জক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভারতের অবিভীত আদর্শ কর্মবীর অসাধারণ স্বার্থত্যাগী জনবন্ধু দখীচ-কজ মহাত্মা গান্ধীর জীবন-কাহিনী অপূর্ণ কৌতুহলোদ্দীপক ভঙ্গীতে সুস্পষ্ট সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি এমন উপভোগ্য হইয়াছে যে উপন্যাস ফেলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। গ্রন্থের পাতার পাতার গান্ধীর অসাধারণ মহত্বের মহিমাময় ছবি উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে গান্ধীর বহুবর্ণী ও সংগৃহীত হইয়াছে; সেগুলির মূল্য মনি-মানিক্যের চেয়েও বেশী। বর্ণীগুলি স্বতন্ত্র কার্ডে লিখিয়া ঘরে-দুয়ারে ছবির মত খুলাইয়া রাখিবার যোগ্য। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

বাঙলার ঘরে ঘরে বিরাট ক্রিয়াকর্ম। বাঙলা দেশের এ গ্রন্থের প্রতিপৃষ্ঠা সুবহু করিয়া মজ্জাপিত করিয়া ফেলুক। গান্ধীর গুণের স্ববাসে তাহাদের নবমুকুতি চিত্ত আনোদিত হোক, পরিপূর্ণ হোক; গান্ধীর আদর্শ পথের তাহার পথিক হোক—ইহার চেয়ে বড় কামনা এ-মুগে বাঙালীর আর থাকিতে পারে না। এই সঙ্গ্রহ রচনা করিয়া গ্রন্থকার দেশের সুখ উজ্জল করিয়াছেন—নিঃস্বার্থ মহত্বের ছবি আঁকিয়া বাঙলা সাহিত্যকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন; তিনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

পানিপথ। শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র নন্দী বি. এ. প্রণীত। চট্টগ্রাম, মিটেটা প্রেস, কে. বি. বহু ছাত্রী মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এখানি ঐতিহাসিক কাব্য। প্রথম সর্গে দেখি, ‘স্বর্গ-সিংহাসনে বসি দিল্লীর ইব্রাহিম’ ও সম্রাটগণ—কাছে ‘নবকোঁচের \* \* \* চপলা চমকে অঙ্গে বেষ্টিয়া নয়ন—’ ‘করিতেছে হুসুমুদ সম্রাট-অন্তরে উদ্দাম লালসা-পূর্ণ কাম উদ্দীপিত।’ ‘কর্ণগরেই “শ্রেষ্ঠ নর্তকীর কণ্ঠে উঠিল সঙ্গীত, মধুর পঙ্কমে গৃহ করি উচ্ছ্বসিত”—এই ব্যাপারটি এবং গানের ভাব ও ধরণ একেবারে হুবহু ‘পলাশীর যুদ্ধ’ স্মরণ করাইয়া দেয়! দ্বিতীয় সর্গে, দৌলত খাঁর প্রমোদ বন—সেখানেও গান আছে, নারী আছে, এবং থিয়েটারী ধরণে কথা-বার্তাও প্রচুর আছে। একে পানিপথ, তার উপর গোড়াতেই ‘নর্তকী আর প্রমোদ-বন—কাছেই অধিক দূর অগ্রসর হওয়া গেল না। রচনা বিশেষত্ব-হীন, নকলের নকল, ছন্দ পঙ্গু, ভাব এবং কবিত্ব উভয়েরই অভাব! একটা কথা, যুদ্ধ নাছিল কি কাব্য হইবে না? এখার বোধ হয় বাঙলার কাব্য-ভগ্নে “অশ্রু-গুরার” দেখা দিবে! সাধারণ নর-চিন্তে ভাবের যে বিচিত্র দীপা অহরহ ফুটিতেছে, তার কি বাঙলার কাব্য-কারগণের চোখে পড়ে না? থিয়েটারের সেই ভীম গজ্ঞন শেষে কাব্যের ক্ষেত্রেও রীতিমত দস্ত-আফসান শুরু করিয়া দি!।

শ্রীমত্যত্রয় শর্মা।









